বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
শহীদ ইকবাল

কথাপ্রকাশ
বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪
স্বত্ব : নৈরিত ইকবাল
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
ফোন : ০১৭৬৬৫৯০৪০৪
প্রধান কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ৯৫৮৪৪৩৬, ৯৫৮৯৮৫২
বিক্রয় কেন্দ্র
৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
মুদ্রক
সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা
ফোন : ৯৫৩৩০২৯, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩
মূল্য :
প্রচ্ছদ :

উৎসর্গ

আহমদ শরীফ, আহমদ ছফা ও হুমায়ুন আজাদ

আমাদের সময়ের সক্রেটিস

সূচি

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় বাংলাদেশের সাহিত্যের বীজ রোপিত হয়। কিন্তু নির্ধারিত সাল-তারিখ দিয়ে তো সাহিত্য শুরু হয় না। তবে সময়খণ্ডই মূল কারণ। এর ভেতরেই চেতনা গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট কৃষ্টি, আত্মসত্তার প্রকাশ, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন—কার্যত দ্বান্দ্বিক জীবন পরিক্রমারই একটি স্ফটিকস্বচ্ছরূপ। সেটি চিরায়ত নৃ-সংস্কৃতির ধারায় স্নাত এবং ক্রমবর্ধিতও। তা স্থিতি পায় সিক্ত মাটি-হাওয়ার নির্দিষ্ট ভূগোলে। স্থান অস্তিত্বশাসিত পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশ। বস্তুত, ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যের অনুসৃত ধারাটিই এই বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারা। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় এ ধারাটির পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান মসৃন নয়। কবিতার সার্বভৌম শক্তি, কথাসাহিত্যের সংস্কারমুক্ত চিন্তা, নাটকের নিরীক্ষা ও পরিচর্যা সাহিত্যিকের কল্পনা ও প্রেরণার প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। কিন্তু তা মোটেই সহজ ছিল না। বিভাগোত্তর সময়ে কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক-প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতিচর্চায় দ্বিধা ও আড়ষ্টতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতাও অনুল্লেখ্য নয়। এ পর্যায়ে ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের পর ভাষার অধিকার, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকার, বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ রচিত হওয়ার পথ তৈরি হয়। ক্রমাগত আর্থ-রাজনীতিক সচেতনতাও সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে সমাজ গভীরে প্রোথিত করে, চিনিয়ে দেয় আত্মসত্তার বিচিত্র অভিমুখ। বিপরীতে রাষ্ট্রের স্বার্থ-তৎপরতা, স্বেচ্ছাচারি সামরিক শাসন, ব্যক্তিতন্ত্র কায়েম প্রভৃতি নব্য-উপনিবেশ মনস্ক (neo-colonial mentality) চিন্তা আগ্রাসী রাজনীতির চাদরে বিস্তৃত হতে থাকলে, সদ্য গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত মুসলিম বাঙালি সংঘবদ্ধ শক্তিতে তার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ শক্তির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তৎকালীন পুর্ব-বাংলার সাহিত্য। যা বাংলাদেশের সাহিত্য নামে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত সংশ্লিষ্ট। প্রসঙ্গত, এ সংশ্লিষ্টতা আরোপিত নয়, লোকায়ত ও সমন্বিত ধর্ম-সংস্কৃতিচেতনার কেলাসিত রূপ। যার পরিচয় বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভূখণ্ডের কৃষ্টি ও প্রবাহিত দ্বান্দ্বিক নৃ-জীবনের ভেতরে সংস্থিত। ১৯৬১ তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আড়ম্বর আয়োজন বা শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মধ্যবিত্তের মুখরিত আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্বের শক্তিকে দৃঢ়তর করে। সাহিত্য এক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত পরিবেশটি গ্রহণে সামর্থ্য হয়। কবিতার ভেতরে উঠে আসে জীবনের প্রভূত মন্ত্রণা। আহসান হাবীব ১৯৪৭ সালে *রাত্রি শেষ* কাব্যগ্রন্থে যে রাষ্ট্রের স্বপ্নচালিত হয়ে তার প্রেরণাটুকু যুক্ত করেন কথা ও কবিতায় পরবর্তীতে দীর্ঘ এক

যুগেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতায় *ছায়াহরিণ* কাব্যের ভেতরে শাশ্বত ও সমন্বিত চেতনাধারাটি অন্বিষ্ট করতে সামর্থ হন। প্রায় একই সময়ে শামসুর রাহমান প্রথম কাব্যে ত্রিশ-অনুবর্তী বাংলা কবিতার চেতনাধারায় স্বীয় শক্তির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। 'নতুন কবিতা' সংকলনের পরিস্রুত চেতনারই বিপুল বিস্তার ঘটে এ কাব্যে। স্মর্তব্য, বুদ্ধদেব বসুর শার্ল বোদলেয়ার চর্চা কিংবা লোকনাথ ভট্টাচার্যের আঁতুর র‍্যাবোর অনুবাদ এ পর্যায়ের কবিদের আরাধ্য হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকের বাসি, পচা, কর্কশ শূন্যতার মরুভূমিতে ষাটের দশক প্রাচুর্যময়তা পায়। শুধু কবিতায় নয়, কথাসাহিত্যে আবুল ফজল, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু ইসহাক, শওকত ওসমান প্রভৃত হয়ে ওঠেন। নাটকে মুনীর চৌধুরীর পর শীর্ণ ধারাটি প্রস্তুত হতে থাকে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণের অপেক্ষায়। একই সঙ্গে মননশীলতার উৎকর্ষও ঘটতে থাকে। ষাট-উত্তর সময়খণ্ডে যা নির্দিষ্ট অবয়ব পায়। কৃতী ও কুশলতায় তা যে মানেরই হোক, বাংলাদেশের সাহিত্যের রূপরেখাটি জনমানসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রঙে-বর্ণে-রূপে ফুটে ওঠে আস্থাশীল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধঃক্ষেপ। প্রসঙ্গত, বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক বাস্তবতা যেমন দুর্ভিক্ষ, বিচ্ছিন্নতা, নৈরাশ্য, বহির্মুখি টান, অন্তরের জটিলতা, সংক্ষোভ, বেকারত্ব সাহিত্যের বিষয়কে অধিকার করে। এক্ষেত্রে ত্রিশোত্তর পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের অনুকরণ বা শক্তির তুলনা নয়, স্বতন্ত্র ও স্বদীক্ষিত কল্পনা-অভিজ্ঞতাকেই তারা কাজে লাগান। পূর্ব-বাংলার ঢাকা আলাদারূপে আলাদা বাস্তবতায় চিহ্নিত হয়, এই বাংলার লেখকদের কাছে। বিভাগপূর্ব কলকাতা তাদের কাছে কর্ম-অভিজ্ঞতা আর পাশ্চাত্য-প্রভাবিত লেখকতীর্থের স্বপ্ন-অনুপ্রেরণা। কিন্তু বিভাগ-পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র বাস্তবতায় গড়ে ওঠা ঢাকার জীবনসংগ্রাম ও রাজনীতি তাদের দিতে থাকে স্বনিয়ন্ত্রিত আত্মপরিচয়ের নিশানা। পঞ্চাশের দশক থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকা জীবনের প্রসূন, দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপ আর লোকায়ত জীবনাচারণের প্রক্রিয়া ভাষায় প্রতিচিহ্নিত হয়। ষাট-উত্তর অনেক লেখক নিযুক্ত হন, বিচিত্র নিরীক্ষায়, নদী-নক্ষত্রের প্রতিজ্ঞায়। ধ্যানে ও অনুরক্তিতে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিক থাকলেও প্রত্যয়টিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এদেশের বাউল-বীক্ষণ ফেলা আসা গ্রামীণ নিসর্গ নীলিমা আর বয়ে যাওয়া শান্ত নদীর কূলুধ্বনি কিংবা প্রান্তিক কিশোর-কৈশোর। ষাটের এরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিজ্ঞা রৌদ্রছায়ায় মিশে রাজনৈতিক প্রবাহে ঊনসত্তর পেরিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছয়। সাহিত্যে রাজনীতি যুক্ত হয়, পরিণতি ও মীমাংসায় ধৃত হয় নারীর স্বর, মানবতাসম্পৃক্তি সংহতি, শ্রেণিচেতনার আদর্শ ও প্রান্তিক কণ্ঠস্বরের অপরিমেয়তায়। প্রায় দুই যুগের অভিজ্ঞতা, পাঠচিন্তা, কল্পনাকারুণ্য বাংলাদেশ ভূমিতে, বাংলাদেশের সাহিত্যরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কলকাতার বিপরীত

পীঠে ঢাকা নবরাষ্ট্রের কেন্দ্র হতে চাইলে সাহিত্যধারাটিও যেন তার অঙ্গে বিহঙ্গ পায়।

দুই.

মুক্তিযুদ্ধের পর বিভাগোত্তর সাহিত্যধারা অনর্গল অবিচ্ছিন্নরূপে সম্মুখে ধেয়ে চলে। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কবি-কথাকার-নাট্যকার পেয়ে যায় প্রভূত প্রতিবেশ। প্রেরণার স্মারকপুচ্ছটি প্রগাঢ় হয়। ৪৭-এর পরে বেড়ে ওঠা প্রতিরোধের কিনারাসমূহ প্রেরণার দর্পণে আভাসিত হয়। যুদ্ধ-প্রজন্মের লেখকবৃন্দ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠেন ভাষায়, ভাবনার কল্পকুঠিরে। স্বদেশের ভূমে গড়ে ওঠে রোম্যান্টিক প্রহরাসমূহ। একই সঙ্গে সমাজ বদলের চিন্তাও চেতনাশাসিত হতে থাকে। দুই মেরুর বিশ্বে তাদের আস্থা ও অনুরক্তি শ্রেণিশাসনের বিপক্ষে। সাহিত্যের বিষয়-ব্যক্তি আধুনিক গড়ন পায়। লেখকগণের কল্পনা-স্ফূর্তির পাশাপাশি নবরাষ্ট্রের ভেতরে ক্রমঘনায়মান দীর্ঘশ্বাস বাড়ে। সাতের দশকের শেষার্ধে স্বপ্নাশ্রিত নবরাষ্ট্র বিক্ষতরূপে পরিদৃশ্যমান হলে অবক্ষয়-বিচ্ছিন্নতার ভেতরের রূপ স্বার্থ ও পুঁজির বলয়ে আটকে যায়। ক্ষমতার মৌরসিপাট্টায় ব্যক্তির অনিকেত সত্তা তল খুঁজতে ব্যর্থ হয়, উন্মূল-শেকড়হীন উঞ্ছবৃত্তির অবলুপ্ত অব্যর্থ রূপ মোটা দাগে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সাহিত্যের ভেতরে একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষত ও ক্ষেদ জমাটবদ্ধ হয় অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অবগাহনে বিষয়ের উপকরণে আলোছায়ার শিল্প-আত্মা গোপন-সন্ধানী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সাহিত্য নিজস্ব পথে এগিয়ে চলে, প্রবহমান প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের আত্মা স্বচিত্রিত করে। পর্যবেক্ষণে মানে হয়, প্রতিকূলতা সাঁতরে ষাটের উপকূলে যে স্বপ্নতরী ভিড়েছিল– তা তুলনায় অনেক পরিশুদ্ধ, শৈলিসিদ্ধিগত। অপরদিকে, স্বাধীন দেশে সত্তরে-আশি-নব্বুই-শূন্যে এক গরল-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতাপিত জীবন একপ্রকার নিরীক্ষায় রূপায়িত হয়। এ পথটুকু ক্রমাগত সম্মুখগামি। একাত্তর-উত্তর কিশোর বয়সী রাষ্ট্রে পুঁজির প্রসার, মানুষের সম্পর্কের বন্ধন বিচিত্ররূপ লাভ করেছে, আয়-ব্যয়ের সীমানা বা সামাজিক মর্যাদা কুশৃঙ্খলে আচ্ছন্ন। সাহিত্য-দর্পণে কিছুই অনালোকিত থাকে না– কিন্তু শিল্প তো তার চিরন্তন পারিপার্শ্বিকতাকে ছাড়িয়ে যায়, রচনা করে উত্তরপ্রজন্মের অনিঃশেষ অবারিত অভিসার। স্বাধীন বাংলাদেশে সে পরিচর্যা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ষাটোত্তর লেখকবৃন্দ বিস্তর অভিজ্ঞতায় সাহিত্যের আধার আধেয়র চর্চা করেছেন। বিস্তর সময় ব্যবধানে তা একপ্রকার উত্তীর্ণ-অবমুক্ত বলা যায়। যে অভিমুখে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যকারগণের হাতে সৃজিত হয়েছিল, শেষাবধি সে স্বপ্নকল্পনা ততোধিক হয়ে উঠেছিল– এই স্বাধীন দেশে।

নব্বুই ও শূন্যের দশক বেয়ে এদেশের সাহিত্য এখন অপরিমেয়। মুক্ত ও মনোপোলার বিশ্ব, তথ্য-প্রযুক্তির প্রবাহ, মানুষে মানুষের সম্পর্ক, ভঙ্গুর সমাজ

ব্যবস্থার বিচ্ছিন্ন অবসাদ, গূঢ় ও রহস্যের বিচিত্র ফাঁদ সাহিত্যের ভাষাকে পাল্টে দিয়ে। শ্রেণি-ব্যবস্থায় কর্পোরাল সংস্কৃতি মনুষ্যচেতনাকে প্রবলরূপে শাসন করছে। কবিতা কঠিন, ছোটগল্প নেই, উপন্যাসের বদলে উপন্যাসিকা, প্রবন্ধ সংকুচিত, নাটক বিজ্ঞাপনের ছায়ায় বন্দি বাজারচলতি দোষে দুষ্ট। এরূপ অভিজ্ঞতায় ভাষা-সাহিত্য নেই তা বলা যাবে না। ভাষার উৎকর্ষ ঘটেছে, সাহিত্যে বিশ্ব-অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পেরুনো সাহিত্য পূর্ব-বাংলার সেই মুসলিম সংস্কারাশ্রিত সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়। পরিবর্তনের সূত্রটুকু তাতেই ধরা পড়ে।

তিন.

শিল্পে নাটক প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ভরতমুণির কাল থেকেই নাটকের চর্চা হয়েছে। নাটক ও অভিনয় মানুষের জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচীনযুগে গৎবাধা জীবনের বাইরে এক-আধটু শিল্পসৌন্দর্যের চর্চা হতো। মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ পরবর্তীতে কালিদাস, কৌটিল্য রচনা সবই প্রাচীন নিদর্শন। এসব নিদর্শনের পরতে নাটক ছিল। নাট্যরস ছিল। প্রকাশভঙ্গির গড়নে-গঠনেও নাটকীয়তা কম ছিল না। পরে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, এদেশীয় আধুনিক সমাজের অভিমুখ রচিত হলে নাটক একাডেমিক বিষয়ই শুধু নয়, সমাজপরিবর্তনের এবং জীবনাচরণের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। আধুনিক বাংলা নাটকে শেক্সপীয়র প্রভাবিত নাট্যকার। বাংলা নাটকে তাঁর প্রভাব উচ্চস্পর্শী। বঙ্গীয় অঞ্চলে নাটকের বীজ রোপিত হয় বস্তুত গদ্যরচনা ও নগর-নাগরিক জীবনের স্পর্শে। তখন সাহিত্যের ভাষা সর্বগামী নয়, প্রয়োগও সর্বশ্রেণি-আশ্রিত নয়। একটা আভিজাত্যপূর্ণ ভাষায় নাটকের যেমন চর্চা হয়, তেমনি সাধারণ মানুষও পাওয়া যায় নি সেখানে। এ পর্যায়ে সংস্কার ছিল প্রচণ্ড রকমের। কিন্তু উনিশ শতকের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ঐতিহাসিক চরিত্র পরে দ্বন্দ্বমুখর শ্রেণিচরিত্র নাটকে উঠে আসে। প্রমাণ বিশ শতকের তৃতীয় দশকে স্বাধীনতা-উন্মুখ জাতির সম্মুখে নাটকের চরিত্র ও অভিনয়রীতির মাত্রিক উদ্ভাসন। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা সমন্বয়ে ব্যক্তির আত্ম-জাগরণের মুখে নাটক বিস্তৃত পরিসর পায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, তুলসি লাহিড়ী এ পর্যায়ে উল্লেখনীয় নাট্য ও মঞ্চদ্রষ্টা। এর বাইরেও অনেক নাট্যকার আছেন, বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর ঘরানার নাট্যকারগণ তো ছিলেনই। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে এক বিরাট সাংস্কৃতিক প্রতীভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের শাখায় বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে উদ্ভাসিত হন। শুধু সদম্ভ উপস্থিতিই নয়, বলয়ও সৃষ্টি করেন। ফলে বাংলা নাটক বিশের প্রথমার্ধে অনেকদূর সম্প্রসারিত হয় এবং বলা যায় আন্তর্জাতিক মাত্রাও লাভ

করে। প্রসঙ্গত, বলা চলে নাটকে প্রতিরোধী বিবেচনা প্রকাশ্য হয়ে উঠতে থাকে। তবে তুঙ্গস্পর্শী শিল্পধারণাও তাতে ব্যাহত হয় না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বা বাঙালি মুসলমান নাট্যকারগণ ইতিহাসগত নিয়তির নির্বন্ধে পিছিয়ে পড়েন। শিল্প-সংস্কৃতি ভাবনা দুর্বল ও পশ্চাৎ-অনুগামী হওয়ায় নাটকের মতো অন্যান্য লিখনশৈলির প্রগতির বাহিত চিন্তাও তাদের ভেতরে তেমন ছায়াপাত ফেলেনি। ফলে নাটক-চর্চা তেমন হয় না। হলেও তা ধর্মীয় প্রচার আর মধ্যযুগীয় ভক্তির রসনায় বায়বীয়। কিন্তু গ্রন্থিমুখ খুলে যায় ভারত স্বাধীন হলে। বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় অনেকের মধ্যে মুনীর চৌধুরী বেশ সাফল্যের সঙ্গেই পদচারণা শুরু করেন। যদিও পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি লেখকদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ মুখ্য ছিল। কিন্তু সদ্য-গড়া মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সৃজনশীলতায় নিজস্বতা অর্জনের পথ খুঁজে পায়। যা প্রভূত হয়ে উঠেছে একাত্তর-পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের নাটক সাতচল্লিশ থেকেই সৃজ্যমান। কারণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনও পরবর্তী আর্থ-রাজনীতির স্বাধীকার মূলত বাংলাদেশ নামক ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রেরই জন্মের সূতিকাগার। গ্রন্থটি ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত নাটক ও নাট্যকারগণের সালতামামি। কোনো প্রবণতা ধরা হয়নি, নাট্যকারের ভেতর দিয়েই প্রবণতা ও স্বরূপ জানা সম্ভব। এখানে কার্যত একটি খসড়া প্রতিলিপির পরিকল্পনা অঙ্কিত হয়েছে।

চার.

সৃজিত *বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটিতে প্রবন্ধ-অনুবাদ-শিশুসাহিত্য-আত্মজীবনী-স্মৃতিকথা-ভ্রমণসাহিত্যের ইঙ্গিতটুকুও গৃহীত হয়েছে। এতে করে ষাটোর্ধ্ব বয়সী সাহিত্যের চকিত পদচিহ্ন এতে অবয়ব পেয়েছে। ধারণাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা তো মিলবেই। স্মর্তব্য, এটি পূর্ববর্তী *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থটির সম্প্রসারিত রূপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিবর্ধন পরিমার্জন চলবে। এ সময়ের অনেক লেখকই এতে যুক্ত হয়েছেন। ক্রমশ আরও যুক্ত হবেন।

সৈকত হাবিব ও মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে অশেষ কৃতজ্ঞতা। কথাপ্রকাশের সাফল্য কামনা করি।

আটই ফাল্গুন ॥ ১৪২১

শহীদ ইকবাল
shiqbal70@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

কবিতা

বাংলাদেশের কবিতার ধারাটি বীজতলা পেয়েছে চল্লিশের দশকে। ত্রিশোত্তর আধুনিকতা বাংলা কবিতায় যে বিপুলতা অর্জন করে, পেয়ে যায় বিশাল ব্যক্তিত্বের মার্জনা তা কবিতাকে করেছে বৈশ্বিক, অনেকাংশে আধুনিক ও কালাতিক্রমী। বলতেই হয়, বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ, আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা ও মূল্যবোধের রূপান্তর কবিতার ভেতরে-বাইরে সাবালকত্ব এনে দেয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এটি বিশাল ব্যাপ্তি অর্জন করে। এরপর বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে জীবনের অন্ধকার পর্বের অধিকার ভাষায় আনবার চেষ্টাটি তৈরি হয়। এর ভেতরে মুসলিম অধিকারচেতনা, জাতীয়তাবাদী ধারণা সম্প্রসারিত হতে থাকে। আমরা দেখতে থাকি ‘কল্লোল’ (১৩৩০) যে চেতনা বা প্রবণতার জন্ম দিল সেখান থেকেই আরও অনেকেই ‘ইকারুশের আকাশ’কে পেয়ে গেলেন। ক্রমশ পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা (জাতিচেতনায় বাঙালি) নিজস্ব ভূমির দস্তুর বুঝে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। সেটি ত্রিশের দশকেরই সম্প্রসারিত রূপ। যদিও তাঁদের আধুনিকতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবে এ সময়েই প্রত্যয়টি জমে ওঠে। যদিও মুসলিম চেতনা নিয়ে সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৭), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রমুখ কবি একটি বৃত্তেই আবর্তিত হন। দোভাষী পুঁথি যার আদর্শ। সময়টা ভাষা ও সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা নিয়ে দ্বিধা বা দোলাচলতায়, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস-সংস্কারাচ্ছন্নতা এক পর্যায়ে যে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে—তাতে আর সন্দেহ কি? যেমন গোলাম মোস্তফা কিংবা তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯)—এমত কবিবৃন্দ একটা পর্যায়ে এ থেকে আর সরে আসতে পারেননি। অনেক অভিজ্ঞতা ও তথ্য প্রমাণ থাকলেও মূলধারাটি আর তাঁদের অনুধাবনে আসেনি। সে কারণে কাব্যলক্ষ্মীও অনেকটা হাতছাড়া হয়ে যায় তাঁদের নিকট। এ পর্যায়ে বলা যায়, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)ই প্রথম আধুনিক। অন্যরা আধুনিকতার নক্শা আঁকার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তবে চল্লিশের মধ্যেও প্রকৃতিচেতনা ও প্রেমের মর্মর রূপটি তৈরি হয়। দেখা যায় *নব-বসন্ত* (১৯৪০)র কবি আবুল হোসেন (১৯২২-১৯১৪) কে রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙালি মুসলমান আধুনিক’ বলেছেন, কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির রঙকে নিরঙ্কুশ বর্ণমাত্রা দানের জন্য। নিম্নোক্ত কবিকুল কবিভূমে চেষ্টা রাখেন অব্যাহত :

মহীউদ্দিন (১৯০৬-১৯৭৫) প্রতিবাদী চেতনা, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে কবিতা লিখেছেন। প্রধানত, নজরুল চেতনার অনুসারী এ কবির অন্তর্প্রবাহে রয়েছে মানবতার অনুধ্যান। দীর্ঘ কবিযাত্রায় তাঁর ছন্দে উঠে আসে ঐকান্তিক *পথের গান* (১৩৩৬), *স্বপ্ন সংঘাত যুদ্ধ বিপ্লব* (১৩৪৯), *অন্ধকারে ষড়যন্ত্র* (১৩৪৯), *এসো বিপ্লব* (১৩৪৯), *গরীবের পাঁচালী* (১৯৬২), *দিগন্তের পথে একা* (১৯৬০), *শিকারে চলেছে প্রভু বাশ্যা কলন্দর* (১৯৬৬), *মল্লিকা* (১৯৭৮), *গান্ধিজী নিহত হয়েছেন* (১৩৫৬) কাব্যগ্রন্থ। কবির মৃত্যুর পর বের হয় *গরীব দুঃখী গলায় গলায় বিশ্বসাথে গান গেয়ে যায়* (১৯৮২), *সোনার গোলাপ* (১৯৮৩) কাব্য। মানবতার পরিচয় তাঁর কবিবীক্ষণে প্রগাঢ়। **মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা** (১৯১০-১৯৭৯) বিভাগ-পূর্ব কবি হলেও বাংলাদেশের কবিতায় অন্তর্মুখি আত্মমগ্নতায় কবিতার চর্চা তার। 'জীবনের অনিত্যতা, ব্যক্তিগত স্মৃতি, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, জাতীয় জাগরণ ও কদাচিৎ রোমান্টিকতার প্রশ্রয় আছে কাব্যে।' আধুনিক ও প্রগতিমনস্ক লেখক। পর্দাপ্রথা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ছবি আঁকা এবং সঙ্গীতে প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম বাঙালি মহিলা যিনি গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন এবং সনেট রচনা করেছেন। *পশারিণী* (১৩৩৮), *মন ও মৃত্তিকা* (১৩৬৭), *অরণ্যের সুর* (১৯৬৩) কাব্যে নারীর স্বর চিহ্নিত। **বন্দে আলী মিয়া** (১৯০৬-১৯৭৯) লিরিক কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত। *ময়নামতীর চর* (১৯৩২) তাঁর বিখ্যাত কাব্য। এ কাব্যে পল্লি-প্রকৃতির অনুপম অঙ্কনে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এছাড়া *অনুরাগ* (১৯৩২), *পদ্মানদীর চর* (১৯৫৩)সহ বেশ কয়েকটি কাব্য রচনা করেছেন। তবে শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। **আবদুল কাদির** (১৯০৬-১৯৮৪) *দিলরুবা* (১৯৩৩), *উত্তর বসন্ত* (১৯৫৭) দুটো কাব্যগ্রন্থে কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের রক্তিম আবেগ আর প্রকৃতির বিহ্বলতা তাঁর কাব্যের অনুপম বৈশিষ্ট্য। নজরুলীয় আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হলেও কবি মোহিতলালের সংগঠন-শক্তির আভাস মেলে তাঁর রচনায়। *কাব্যমালঞ্চ* কবি আবদুল কাদিরের কাব্যসঙ্কলন। এ পর্বের সবচেয়ে মেধাবী, প্রচণ্ড কমিটেড আবদুল কাদির ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম অনুরাগী—*নজরুল রচনাবলী* সম্পাদনা ও সংরক্ষণের পরিচর্যায়ই সে প্রমাণ মেলে। **সুফিয়া কামাল** (১৯১১-১৯৯৯) প্রকৃতির পটভূমিতে বেদনাবিধূর আত্মগত বেদনার চিত্ররূপ *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮)। এরপর বিভাগোত্তর কাব্যে পূর্ব চেতনারই ক্রম-বিস্তৃতি ঘটেছে। স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা আশাবাদ বিচ্ছুরিত *মায়া কাজল* (১৯৫১) কাব্যে। *মন ও জীবন* (১৯৫৭)এ বিষয়ের বিস্তৃতি—দুঃখকাতর, সংগ্রামী মানুষ, প্রকৃতি বহুব্যাপ্ত। মানুষ-মানবতা; জীবনবাদী বিষয়-আশয় সুফিয়া কামাল নিরাসক্ত ও নিরঙ্কুশ করে তোলেন। মূলধারায় ও ঐতিহ্যানুগ হয়ে লৌকিক জীবনের প্রেরণাদাত্রী সুফিয়া

কামাল। কবিভাষা নির্মল প্রকৃতিশোভিত। কারণ, সামষ্টিক ও সর্বশেষ আরাধ্য ইহজাগতিক জীবনবোধ, পার্থিব মানুষ। পঞ্চাশ পর্যন্ত তাঁর কবিযাত্রা অব্যাহত। *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *দীওয়ান* (১৯৬৬), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০), *মোর যাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। সুফিয়া কামালের *স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন* (১৯৭৬)। পূর্ব-বাংলায় প্রকৃতি-নির্ভর কবিতাচর্চায় **আ. ন. ম. বজলুর রশীদ** (১৯১১-১৯৮৬) প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। *পান্থবীণা* (১৯৪৭), *মরুসূর্য* (১৯৫৬), *শীতে বসন্তে* (১৯৬৩), *মেহের-নিগার* (১৯৬২), *রঙ ও রেখা* (১৯৬৮), *এক ঝাঁক পাখি* (১৯৬৯) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। **চৌধুরী ওসমান** (১৯২০-১৯৮৬) 'নতুন কবিতা' সংকলনের এ কবি। 'চৌধুরী ওসমান গ্রামে থেকেছেন, মফস্বলের বাইরে পদচারণা করেননি। তাঁর কবিতায় সর্বজনীন বিষয় থেকেছে, যেমন আজাদির দিন কিংবা শোষণ এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা দেশপ্রেম।' তাঁর *রচনাসমগ্র* (২০০৭) বেরিয়েছে। 'নতুন কবিতা'র পরিচিতি এরকম, 'সাহিত্য ও রাজনীতিকে যাঁরা অঙ্গাঙ্গী ও মুখোমুখি বলে ঠাওড়িয়েছেন চৌধুরী ওসমান তাঁদের একজন।' তাঁর কাব্য *প্রেম ও পৃথিবী*। *মরুপথ* রচিত হয়েছে ১৯৩৯-১৯৪৬ পর্যন্ত লেখা কবিতা নিয়ে আর *স্বপ্নশেষ*-এ আছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কবিতা। কবির শিশুতোষ কাব্য : *ডনের ঘোড়া*। তাঁর কবিতার মৌল বিষয় বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তান নিয়ে *স্বপ্নশেষের* হতাশা-বিষাদ। কিন্তু সাম্য-স্বাধীনতা, মানবতাবাদী চেতনাই চৌধুরী ওসমানের কাব্যে স্ফটিকায়িত হয়েছে। তাঁর কবিভাষা একদিকে কলকাতার বিপরীতে অন্যদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, প্রগতির পক্ষে—পূর্ব-বাংলার স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার একেবারে গোড়ায় জলসিঞ্চন করেছেন চৌধুরী ওসমান।

মুসলিম চেতনাদর্শের অনুগামী কবি ও কবিতাপর্ব

পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে, ইসলাম অনুসৃত ধারায়, একটি কবিগোষ্ঠী তৈরি হয়। প্রথমত : চল্লিশের মুসলমান হিসেবে এ আনুগত্য বা আদর্শের যৌক্তিকতা ছিল। সাতচল্লিশের আগে ভারতবর্ষের মুসলমান কিংবা বাঙালি মুসলমানও সর্বার্থে 'পাকিস্তান'ই চেয়েছিল। কারণ, এর সঙ্গে মুসলমানের আত্মপরিচয় এবং আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি ছিল। এছাড়া 'হিন্দু-আধিপত্যে'র অবসান কিংবা পারস্পরিক অবিশ্বাসের ক্ষেত্রটিও যে অমূলক ছিল তা নয়। সুতরাং এমন আদর্শের সমর্থনে কবিব্যক্তিত্ব নির্মিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ভাবাদর্শের তুমুল আধিপত্য গ্রাস করে এ কবিগোষ্ঠীকে। দেশভাগের পর বাঙালি মুসলমান যখন 'ভ্রান্ত' রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে আখ্যা দিচ্ছে কিংবা সমস্ত

অধিকারের অপহারী বা আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করছে তখনও একটি কবিগোষ্ঠী 'কায়েদে আযম' বা পাকিস্তানের জন্য কিংবা পূর্ব-বাংলার সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আরব-ইরানে স্থান নিয়েছেন। প্রসঙ্গত ভাষা আন্দোলনের পর যখন অবাঙালি বা পাঞ্জাবি অনাস্থার জায়গাটি পরিস্কার হয়, তখনও কবিরা পাকিস্তানের বৃত্ত ও বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করে কবিতা লেখেন। অবশ্য এ ধারাটি ক্রমশ অবসিত হয়। বিভাগ-পূর্বের এ ধারাটি একটা চেতনাগত বিশ্বাসে কিংবা বিভ্রান্তিগত বা অন্য যে কারণে হোক তাঁদের কবিকর্মে ধর্মবিশ্বাসটাই প্রবল ছিল এবং সেজন্য তাঁরা ইরান-তুর্কী কিংবা এ্যারাবিয়ান ঐতিহ্যের অনেক কিছুকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ পর্যায়ে তাঁদের মৌলবাদী প্রবণতাটি তেমন প্রবল ছিল না বলেই অনুমান হয়।

দুই.

ইসলামী চেতনার সঙ্গে পাকিস্তানি আদর্শ সর্বাত্মক যুক্ত হয় **গোলাম মোস্তফা**র লেখনীতে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর আল্লামা ইকবালে (১৮৭৭-১৯৩৮)র কবিতাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সংস্কার করে 'মুসলমানী' করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব-বাংলার কবিতায় শক্তিশালীরূপে মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক ভাবধারাপুষ্ট কবিতার চর্চা পূর্ণ-উদ্যমে চলতে থাকলেও গোলাম মোস্তফা ধর্মীয় চেতনাদর্শের উর্ধ্বে ওঠেননি। বলা চলে, আমৃত্যু পাকিস্তানের আদর্শেই তাঁর কবিতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। কবির *বনি-আদম* (১৯৫৮) শৈল্পিক মানদণ্ডে প্রশংসনীয়। শয়তানের প্ররোচনা ও আদম-হাওয়ার মর্ত্যে আগমন কাহিনি নিয়ে এটি রচিত। এখানে ধর্মীয় ভাবে আদর্শবাদের চর্চা হলেও কবিকল্পনা লক্ষণীয়। তাঁর পূর্ব-পাকিস্তান-পূর্ব যুগে রচিত কবিতাগ্রন্থ *রক্তরাগ* (১৯২৪), *খোশরোজ* (১৯২৯), *কাব্যকাহিনী* (১৯৩২), *সাহারা* (১৯৩৬), *হাস্নাহেনা* (১৯৩৮)। *তারানা-ই-পাকিস্তান* ১৯৫৬-এ রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৪৯ সালে *বুলবুলিস্তান* নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কবির মৃত্যুর পর *কাব্য-সংকলন* বের হয় ১৯৬৭ সালে। *গীতি-সঞ্চয়ন* ১৯৬৮-তে প্রকাশিত। **শাহাদাৎ হোসেন** (১৮৯৩-১৯৫৩) কবি ও নাট্যকার। বাঙালি মুসলমান কবিচেতনায় প্রকৃতি একটা বিশ্বাস থেকে তাঁর কাব্যে অঙ্কিত। *রূপচ্ছন্দা* (১৩৫৪ ব.), *মৃদঙ্গ*, *কল্পরেখা*, *চিত্রপট*, *মধুছন্দ* প্রভৃতি তাঁর কাব্য। **আজিজুল হাকিম** (১৯০৮-১৯৬২) শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি, স্থির সমাজলক্ষ্যে উদ্‌যোগী কবি। অনেকটা নজরুল প্রভাবিত তিনি। কবিতাকে ব্যবহার করেছেন মানবমুক্তির প্রণোদনায়। তাঁর কবিতা বেশি রাজনীতিক, অতিকথন ও বক্তব্যধর্মী। তবুও *ভোরের সানাই* (১৩৩৯), *মরুসেনা* (১৩৪০), *পথহারা* (১৩৪৩),

ঘরহারা (১৩৪৪), *বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর* (১৯৫৪) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। *আজাজিল-নামা* (১৯৫৬) ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন। এটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। **ছদরুদ্দীন** (জ. ১৯১০) পাকিস্তান স্বপ্নে কাতর কবি। ইসলামী চেতনাধারায় কবিতা লিখলেও এক সময় প্রকৃতিপ্রেম তাঁর কবিতায় সমর্থন অর্জন করে। *মানুষ* (১৩৪৬), *এক ফালি চাঁদ* (১৩৫৭), *পয়গাম* (১৩৫৮), *সংগ্রাম* (১৯৫১), *নয়া আসমান* (১৯৫৪), *১৪ই আগস্ট* (১৯৫৬), *অলস ভাবনা* (১৯৬৮) প্রভৃতি কাব্য লিখেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রেও একটা ভাগ-বিভাজন শুরু হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্যধারা সৃষ্টি; এবং তার রূপায়ণেরও স্ফূর্তি তখন নানাভাবে চলতে থাকে।

তিন.

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

বিভাগ-পূর্বকালেই *সাত-সাগরের মাঝি* (১৯৪৪) লিখে নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন। তারপর পূর্ব-বাংলায় ফিরে আসা; আমৃত্যু কাব্যচর্চা। কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা সচকিত। মন-মনস্বীতায়, কল্পনায় আদর্শবাদের ঊর্ধ্বে তিনি বড় রোম্যান্টিক কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। *সাত-সাগরের মাঝিতে* রয়েছে প্রতীকী অভিযাত্রা; আর সে অভিযাত্রায় বিধৃত মানবীয় সম্ভাব্যতার যাবতীয় অনুষঙ্গ। ফলে পুরাণ-ইতিহাস নিঃসৃত অনেকরকম শব্দে থাকে হতাশা-আকাঙ্ক্ষা-নৈরাশ্য-পুনরুত্থান পরিচর্যার বিষয়টিতে। সেখানে মুসলিম বার্তা কালসাপেক্ষ নিরূপিত হলেও প্রধানত কবিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতটি তুমুল বার্তাবহ। স্বপ্ন ও কল্পনার মাত্রাও বহুগামি। পূর্ব-বাংলার প্রাথমিক কাব্যভূমিতে গড়ে দিয়েছেন বীজাঙ্কুর। ফররুখ কাব্যের অন্তর্লীন বিষয় : (ক) প্রতিরোধের জন্য ঐক্যপ্রচেষ্টা (খ) ব্যক্তির সামূহিক অস্তিত্বকে চিনে নেওয়ার তৎপরতা (গ) নিজস্বতাকে নতুন পরিবৃত্তে বাধার অর্জিত শক্তি (ঘ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিরোধের পুনর্নির্মাণের বাহন করা (ঙ) অর্জিত অস্তিত্বে শিল্পের ভেতরের রেখাগুলোকে বর্ণিল করে তোলা (চ) আমাদের জাতীয় স্বরূপের আরাধ্য প্রত্যয়ে নিহিত যাবতীয় শক্তিকে আধুনিকতার বাতাবরণে মণ্ডিত করা (ছ) অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের পরিপুষ্টির পরিচর্যা ইত্যাদি। চল্লিশের দশকের কবিতাচর্চার ভেতরে যে কবিস্বীকৃতি তার কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা। যা আবর্তিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই।

ইসলামী ঐতিহ্য ও পুনরুত্থান, মানবিক মূল্যবোধ, অভিযাত্রা *সাত-সাগরের মাঝি* ফররুখ আহমদকে বেশি খ্যাতি এনে দেয়; একই সঙ্গে কবি হিসেবেও দেয় প্রতিষ্ঠা। এখানকার প্রেরণা ও সন্নিহিত আবেগ, কবিতাপ্রেমীদের

মুগ্ধ করে। তাঁর পূর্বে এমন উন্মত্ত বেগবান প্রকরণ-প্রতিমা নির্ণয়ে কেবলমাত্র কাজী নজরুল ইসলামকেই সনাক্ত সম্ভব। এমন কবিতা যা প্রাণস্পর্শী; যার প্রতিটি পংক্তিমালা, শব্দবন্ধ, মিলবিন্যাস কিছুই অকেজো নয়—আরবি-ফারসি; কোনো আরোপ নয়, তাগিদ নয়, উদ্দেশ্য নয়—স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, সন্ধানপিয়াসী, রসসমৃদ্ধ এবং ব্যক্তিত্ব-নির্ধারিত। ফররুখ সামগ্রিক করে তুলেছিলেন দ্বান্দ্বিক চেতনার সূত্রকে। প্রথম কাব্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিচেতনাকে উপকরণ করে নিজের কবিভাষায় প্রমত্ত হয়ে ওঠেন। "সিন্দবাদ" নিয়েছেন আরব্য-ঐতিহ্যের পটভূমে—এর প্রবাহে "বা'র দরিয়ায়", "দরিয়ায় শেষ রাত্রি", "শাহ্‌রিয়ার", "বন্দরে সন্ধ্যা", "হে নিশান-বাহী", "নিশান", "নিশান-বরদার","সাত-সাগরের মাঝি" কবিতাগুলো প্রায় একই অভিযাত্রার সম্বন্ধসূত্র। 'ব্যক্তি' তথা জাতির উত্থানকেন্দ্র বজায় রেখে অভিযাত্রার পথটির বর্ণিল বর্ণনা পায়। এ অভিযাত্রার যারা অভিযাত্রিক তাদের জীবনাগ্রহের সুলুকসন্ধান প্রতিবিম্বিত। ফররুখ আহমদের "আকাশ-নাবিক", "বন্দরে সন্ধ্যা", "পাঞ্জেরী", "সাত-সাগরের মাঝি"র পংক্তিমালা কিংবদন্তীতুল্য বললে ভুল বলা হয় না। এ কাব্যের "লাশ" আরও তীক্ষ্ণধী। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংহত শিল্পক্রোধ। নিকট অভিজ্ঞতার এমন ঋজুরেখ প্রকাশ বিরলই বটে। এমনটাতেই প্রমাণ হয়, তাঁর কবিকৃতি শুধু বিশেষ বৃত্তের নয়। সর্বাধিক এবং নিরঙ্কুশ। বলতেই হয়, কবি অর্জনের মাত্রাটি আমাদের এমনিভাবেই চিহ্নিত করা উচিত। *সাত-সাগরের মাঝি* কাব্যে যে কবিতাগুলোতে অভিযাত্রার innovation চলেছে সেগুলো পূর্ণায়ত রোম্যান্টিক বীক্ষণে প্রতিষ্ঠিত। প্রতীকীরূপে তা পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। আর *আলেফ লায়লা*র বীর-নাবিক 'সিন্দবাদ' তো আলোকদীপ্ত কেন্দ্রে হয়েছে অধিষ্ঠিত। এখানে আলোচ্য imagery-র পদক্ষেপসমূহেও তা নির্ণীত। এবং ফররুখের স্বাতন্ত্র্যচেতনার দিকটিও এ কাব্যে এভাবে কিছুমাত্রায় হলেও পরীক্ষণে আনা গেছে। তবে বাংলার হাজার বছরের কাব্যাভিষেকের ধারাটি চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদের কাছে 'distinguish' হয়েছে বৈশ্বিক ও আধুনিক দৃষ্টিচেতনার পরিবৃত্তে। বিশেষ করে অভিযাত্রার প্রেরণার পর্বে 'সিন্দবাদ' ছাড়াও গ্রীক কবি হোমারের *অডিসি*র কথাটিই বা অস্বীকার করি কি করে! এরূপ যাবতীয় প্রস্তাবনায় আমাদের বাংলা ভাষাটি ফররুখ কাব্যে পেয়ে যায় প্রকৃত কাব্যরীতি। এবং এটা অনিবার্যরূপেই বলা চলে, সে সংঘটনটি বস্তুত সম্পন্ন হয়েছে *সাত-সাগরের মাঝি* কাব্যকে ঘিরেই। বিশ শতকের প্রথম দিকের কাব্যান্দোলনের বিবিধ পরিক্রমা ফররুখ কাব্যে এ স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিয়েছে। কারণ, কবি তো অভিজ্ঞতার ভেতর থেকেই তার ধারণাটি পান।

মন্ময় কবির গহনদ্বারের সংযত ও পূর্ণাঙ্গ স্ফূর্তি "ডাহুক"। একাত্মা কবি, রাতজাগা, ডাহুক রূপকরূপে অভিষিক্ত। পরিবেশটি effective। প্রথম পংক্তিতে সমর্থন এবং একীকৃত। চরণ ছাপিয়ে মুক্তক ছন্দের বেগ পরিবেশকে চিত্রায়িত করে। প্রাত্যহিক প্রশান্তিকে মেলান শ্রমী মৌমাছির সম্মানে। এরপর পৌরাণিক স্মৃতি ও নস্ট্যালজিক মিনিয়েচার, যেখানে কবি আত্মলীন। কাহিনির গাত্রে প্রির্যফেলাইট প্রসূন:

অবিশ্রাম ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
শিশির পাখার ঘুম,
গুলে বকৌলির নীল আকাশ মহল
হ'য়ে আসে নিসাড় নিঝুম,
নিভে যায় কামনা চেরাগ

এরপর ডাহুকের যৌক্তিক সান্নিধ্য। ফররুখের উজ্জ্বল কবিতার ভেতরে কাব্যপরিমাপ চলে এভাবেই। অত্যন্ত সংহত ও শানিত পরিচর্যা, স্বাপ্নিক প্রবণতা দূর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী (connotation)। টোটেম হয়ে আসে পাখি, স্নিগ্ধ ডাক শুধু একাকী নয়, গীতল (lyrical) স্বরে, বিপুল প্রণয়-প্রার্থিত করে, অনেককে জানিয়ে। কবি এখানে অক্ষরবৃত্তের মুক্তক রূপটির নিপুণ প্রয়োগ ও ব্যবহার করেন, জানা যায় এ ছন্দের ভেতরের শক্তি ও মাধুর্য। যেখানে জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে রাতজাগা সঙ্গীটি অর্থাৎ অনুভূতির একত্রীকরণে তাকে সাজিয়ে তোলেন প্রেরণার ভিত্তিতে। কাব্যকুশলতায় গড়ে ওঠে প্রেমের প্রতিমা সৌধ, সে কারণে ইলাস্ট্রেশন প্রগাঢ়, যা প্রমাণিত হয় ইমেজের গভীরতায়; আর পংক্তিতে পুনরাবৃত্তির প্রহরাটিও দৃঢ়। আবেগ আনুকূল্য পায় জীবনের মেলবন্ধনে। যেন প্রেমের নতুন অভ্যুদয়। যা ধরা পড়ে ব্যতিক্রমী চিত্রকল্প ও শব্দবুননে। তবে চরণবিভায়, ভাবের প্রবহমানতায়, একটু ক্ষীণমাত্রার বিষাদ যে বিলীন নয় তা সত্য :

বেতস বনের ফাঁকে চাঁদ ক্ষয়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে।
... ...
তুমি শুধু সুরযন্ত্র! তুমি শুধু বও
আকাশ-জমানো ঘন অরণ্যের অন্তর্লীন ব্যথাতুর গভীর সিন্ধুর
অপরূপ সুর ...
অফুরান সুর ...

এ চিত্রকল্প এক ধরনের স্বীকারোক্তি সৃষ্টি করে। অনুপ্রাসে আত্মার আকুতি প্রবিষ্ট হয়। 'ডাহুক' বৃহত্তর হয়ে ওঠে। আয়ত্তাধীন করে 'যৌবনের প্রাচুর্য'। যেখানে তারুণ্য সত্য। কিন্তু এর অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা narrative হয়ে আশাবাদের

আর্তিটি প্রকাশ করে : ‘পুব দিগন্তে জেগেছে আলোর গান’। যদিও ‘সূর্য বন্দী এখান আঁধারের ঝরোকাতে’। এখানে ‘আঁধারের ঝরোকা’ দুর্দান্ত সীবনকর্ম। তবে এক ধরনের অন্তর্লীন প্রযোজনা এখানে বজায় থাকে, যেখানে অনিবার্যভাবেই স্ফটিকায়িত হয়ে ওঠে লোকনন্দনের হৃদয়াবেগ। কবিস্মৃতির অবচেতন সত্তায়, ঐতিহ্যিক প্রস্তাবনা তৈরি হয়, সামষ্টিক শ্রম-আবেগ ও উৎসব প্রেরণা থেকে। কবির ‘ডাহুক’ তেমন অনুপ্রেরণারই সৃষ্টি। আর তা নইলে, বর্ণিত প্রতিমার আবেদন এতো অভিপ্রেত কেন? “ডাহুক” শেষাবধি অন্ধকার পেরিয়ে আলোর যাত্রাপথিক। কিন্তু এর কবিকর্ম ‘makes the words, their sound, rhythm, and imagery, do all the work’—যেখানে স্বাভাবিক জীবন উপকরণ পরিশীলিত মাত্রা পায় এবং প্রসাদগুণের বাঙময় রূপটি স্বপ্নমুখর ব্যক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। তাঁর অপ্রধান রচনা *আজাদ করো পাকিস্তান* (১৯৪৬), *সিরাজাম মুনীরা* (১৯৫২)। *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১) কাব্যনাটকটি সম্ভাবনাময় আর *মুহূর্তের কবিতা* (১৯৬৩) সনেট সংকলনও অনন্য কবিসত্তার মাত্রাবাহী রচনা। *হাতেম তা'য়ী* (১৯৬৬) কবির কাহিনীকাব্য; *পাখির বাসা* (১৯৬৫), *নতুন লেখা* (১৯৬৯) তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ। এছাড়া লিখেছেন *হরফের ছড়া* (১৯৭০), *ছড়ার আসর* (১৯৭০), *হে বন্য স্বপ্নেরা* (১৯৭৬), *হাবেদা মরুর কাহিনী* (১৯৮১)।

চার.

রওশন ইজদানী (১৯১৭-১৯৬৭) কবি ও প্রাবন্ধিক। সদ্য-পাকিস্তানে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পাকিস্তান ও মুসলিম পুনরুত্থান, ইসলামকে ভিত্তি করে সাহিত্য ও ঐতিহ্য নির্মাণ এমন ধারায় রওশন ইজদানী পূর্ব-বাংলার কবি-প্রতিনিধি বললে ভুল হয় না। তাঁর এমন চেতনাগুণ কবিভাষা নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর কাব্য উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতটিও তাতে দূরাহত। *বজ্রবাণী* (১৯৪৭), *রাহগীর* (১৯৪৯), *চিনুবিবি* (১৯৫১), *রঙ্গিলা বন্ধু* (১৯৫১) *খাতামুন নবীঈন* (১৯৬০), *পাকিস্তানের জঙ্গনামা* (১৯৬৫), *মরুর কাফেলা* কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। **মুফাখ্খারুল ইসলাম** (জ. ১৯২১) বাংলাদেশে কবিতায় ইসলামী চেতনা লালিত ধারাটিতে, ‘বুলবুলিস্তান’, ‘জালালী কবুতর’ কাব্যভাষা পায়। ইসলামী পুরাণ, উপমা ভঙ্গিতে প্রবহমান। পাকসেনাদের অশ্রান্তগতি প্রত্যাশা করেন তিনি। একমাত্র কাব্য *হে পাক ফউজ* (১৩৫৪) এর মধ্যে ইসলামের জাগরণ একটা কাহিনিমূলক পরিসর পায়। সেখানে উপমা-রূপক কিংবা শব্দ-বাক্যব্যবহার উদ্দিষ্ট আবহে চিত্রিত হয়। **মতিউল ইসলাম** (১৯১৪-১৯৮৪) ইসলামী ভাবাদর্শে কবিতা লিখেছেন। ধর্মের ভেতরেই মানবতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। *কায়েদে আজম তোমার জন্য* (১৯৫০) কাব্য থেকেই অনুমান সত্য হয়ে ওঠে, কীভাবে পাকিস্তানী

চেতনাকে তিনি গ্রহণ করেন। তবে এ সময়ে অনেক কবিদের মানবতার শর্তটি কিন্তু এমন চেতনার মধ্যেই পূজিত ছিল। মতিউল ইসলাম সে পথেরই অনুগামী। তবে সমাজ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে মানুষের পরিবর্তন কিংবা চীনপন্থি চেতনাও দূরপরাহত মনে হয় না তাঁর লেখায়। *প্রিয়া ও পৃথিবী* (১৯৫৫), *সপ্তকন্যা* (১৯৫৭) তাঁর অন্যান্য কাব্য। এসব কাব্যে ইন্দ্রিয়সচেতন এক কবিরও পরিচয় মেলে। মতিউল ইসলাম পঞ্চাশের প্রশংসনীয় কবি; একটি বিশেষ ধারায় লিখলেও তাঁর চমকিত চিত্রকল্পে পরে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। **আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী** (জ. ১৯২৬) *যেহেতু* (১৯৫৪) পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা। পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা, রাজনীতি কিংবা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হয়েছে। এ কবিতাগুলো অনেকাংশে উন্নত শিল্পরুচির পরিচায়ক বলেই মনে হয়। তাঁর *আমির সওদাগর* (১৩৬৬) পাক-বাংলায় সমাদৃত কাব্য। এর পটভূমিকায় এদেশের মাটি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বয়ান হয়েছে। **তালিম হোসেন** (১৯১৮-১৯৯৯)-এর কবিতা ইসলামী ভাবধারা লালিত। ইসলামের সাম্য, তৌহিদ, ন্যায়বিচার, কোরানের দিশা এসব চেতনা সদ্যগড়া পাকিস্তানে এমন লেখকদের আরও অনুপ্রেরণার বস্তুতে পরিণত হয়। তালিম হোসেন ফেরাউনের ধ্বংস কামনা আর তার বদলে খালেদ, মূসা, উমর, আবুবকরের ন্যায়-সাম্যের স্বপ্ন দেখেন। সেখানে হযরত মুহম্মদ দিশারী এবং পাথেয়। প্রাণবন্ত কবিবিশ্বাসে *দিশারী* (১৯৫৬) রচিত। পূর্ণ আবেগ ও বিশ্বাসের শিল্পরূপ এ কাব্যটি। তবে দ্বিতীয় কাব্য *শাহীন* (১৯৬২) নিম্নগামী। এখানে স্বপ্ননির্মাণ শিথিল তবে প্রকরণ সংহত। তালিম হোসেন ক্রমশ পাকিস্তান-রাষ্ট্রে হতাশ হয়ে পড়েন; এক পর্যায়ে কবিতা রচনায় দেন ইস্তফা। অন্তর্চেতনার উৎসমুখ আর বিশ্বাস একীকৃত না হলে শিল্প বিমুখ হতে বাধ্য। পাকিস্তান বা উদ্দিষ্ট আদর্শ অপসৃত হলে কল্পনার-বৃত্তও অপসৃত; এক পর্যায়ে তালিম হোসেনের সে বোধোদয় ঘটেছিল। *ইসলামী কবিতা* (১৯৮১), *নূহের জাহাজ* (১৯৮৩) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। **সুফী জুলফিকার হায়দার** (১৮৯৯-১৯৮৭) মুসলিম চেতনার ধারায় পাকিস্তানের আদর্শই কবিতার মুখ্য বিষয়। সে রূপেই কবিভাষা নির্মাণ। *ফের বানাও মুসলমান* (১৯৫৯) তাঁর কাব্য। তাঁর কবিতা সংকলন *স্বপ্ন যার আনলো যে গড়লো যারা* (১৯৫৯) তে ইকবাল থেকে জিন্নাহ্-আইয়ুবের প্রশস্তি আছে। পাকিস্তান চেতনায় পরিপূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ এ কবি। কবিকল্পনা অনেক উচ্চমাপের, কিন্তু আদর্শবাহী হওয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ। **বেনজীর আহমদ** (১৯০৩-১৯৮৩) পাকিস্তানের স্বপ্নে উপনিবেশ মুক্তির প্রণোদনায় কবিতা লিখেছেন। *বন্দীর বাঁশী*, *বৈশাখী* (১৩৬৯) তাঁর কাব্য। মুসলিম জাগরণের কবি বেনজীর আহমদ। ভাবপ্রণোদনায় বাংলাদেশের কবিতার গোড়ায় প্রসিদ্ধি ছিল তাঁর। কাব্যভাষা মেধাবী এবং আকর্ষণীয়। **আবদুল হাই মাশরেকী** (১৯১৯-১৯৮৮)

কবি হিসেবে খ্যাতিমান। *দুখু মিয়ার জারী* (১৩৭৭), *মাঠের কবিতা মাঠের গান* (১৯৭০) কবিতায় লোকজ শব্দকে ধরে আঙ্গিকে নতুনত্ব আনবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত।

মূলধারা-অনুবর্তী কবি ও কবিতার ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)

নিরীক্ষায়, বাচনে ও প্রতিজ্ঞায় শুধু কবিতা নয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও এ পরিবর্তন তিরোহিত থাকে না। কিন্তু পুনর্বার বিশ্বযুদ্ধ তাণ্ডব, লাহোর অধিবেশন, দেশভাগের উত্তেজনায় রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা প্রগাঢ় হয়। কবিতাও তখন আকৃতি পায় নানাভাবে, নানাজনের কাছে। বিভাগ-পরবর্তী পূর্ব-বাংলায় ক্রমশ এ ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হতে থাকে; স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। সেখানে আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আবুল হোসেন (১৯২২-১৯১৪) তাঁদের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপে কবিভাষা নির্মাণ করতে থাকেন। সেজন্য বাংলাদেশের কবি এবং কবিদের ভিত্তি সাতচল্লিশোত্তর কালে। যেটা বাংলাদেশের সাহিত্যে নির্ধারিত। কিন্তু এ বাস্তবতাটি নির্ণিত ব্রাত্য বাঙালির আন্তর চেতনায়। এক পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের কর্মক্ষমতা ও ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসে অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানরা। বাঙালিদের পুঁজি করে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের যাবতীয় সুযোগ ও স্বার্থসুবিধা তারা ভোগ করে। দেশভাগ-পরবর্তী শাসন-ত্রাসন ও পাঞ্জাবিশক্তির আধিপত্য এক পর্যায়ে পূর্ব-বাংলা যেন নতুন 'উপনিবেশ তত্ত্বে'র জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বায়ান্নতে ভাষার জন্য চূড়ান্ত আন্দোলন এবং সাফল্যের ভেতর দিয়ে শুরু হয় বাঙালির বিরুদ্ধে অবাঙালি শাসন-ক্ষমতা অপনোদনের প্রাথমিক ভিত্তি। এরপর নানাভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার আন্দোলন দৃঢ়তর হয়। এক পর্যায়ে তা সাংস্কৃতিকভাবেও ভিত্তি অর্জন করে। বিশেষত রবীন্দ্র-বিরোধীতা, নজরুল-সংস্কার প্রচেষ্টা; এসবের বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ক্রমশ পাঞ্জাবি শাসকদের ধর্মের রাজনীতি, ধর্মের নামে শোষণ প্রক্রিয়ার স্বরূপও দ্রুত চিনে ফেলে পূর্ব-বঙ্গের বঙ্গভাষী জনতা। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সাহিত্য শক্ত ভিত্তি অর্জন করে। কারণ, বিপন্ন অস্তিত্বের যাবতীয় স্বপ্নসুখের অবলম্বন সাহিত্য। এর সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর ও ভেতর কাঠামোর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় গঠিত ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব বাংলাদেশের সাহিত্যকে করে তোলে বিচিত্রমুখি। কখনও তা অস্তিত্বের কথা বলে, কখনও স্বাধীন-স্বায়ত্তশাসনের ভেতরে নিজের মুক্তিরমন্ত্রটি পাঠ করে। যতোই মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগুতে থাকে ততোই পূর্ব-বাংলা বাঙালি মধ্যবিত্তের ভেতরে নাগরিক চেতনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাহিত্য বিচিত্র অন্বেষায় প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। ফলত, বিভাগোত্তর সাহিত্যসূত্রটি নির্ণিত হয় অস্তিত্বসংকট ও

আত্মপরিচয়ের নিরীক্ষা-পরিবৃত্তে। বাংলাদেশের কবিতার ভিত্তিটি এ বাস্তবতার ভেতর দিয়েই এগুতে থাকে।
'নতুন কবিতা' (১৩৫৬) সংকলন পরবর্তীতে হাসান হাফিজুর রহমানের উদ্যোগে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সংকলন বের হয়। তরুণতর কবিরা এসব সংকলনে নিজেদের প্রকৃত স্থানটি চিনে নিতে পারেন। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যিক পটটি কী করে তাঁদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল—তা ভাবতেই যেন অবাক লাগে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬)সহ অন্যরা এসব সংকলনে তাঁদের প্রকৃত স্থানটি চিনে ফেললেন। যদিও সে ডামাডোলে অনেকেই অনিশ্চিতের মধ্যে পড়েন। কায়েম করেন দ্বিজাতিত্ব বা মুসলিম ঘরানার সাহিত্য কিংবা প্রেরণায় দাঁড়িয়ে যান 'কায়েদে আযম'। গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯), মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ অনেকটা ঝুঁকিহীন থেকে যান। মধ্যযুগের মুসলমানদের দোভাষী পুঁথির আবর্তেই তাঁদের বিশ্বাস স্থাপিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পর্যাবৃত্ত তাঁদের অবসাদ যেমন দেয় তেমনি প্রেরণার উৎসটি দখল করে। কেউবা সংশয়ে হয়ে যান নাগরিক কবি, গণমানুষের কবি। ষাটের প্রারম্ভে বাংলাদেশের কবিতায় এক রকমের তারল্য, সাংবাদিকসুলভ পরিচর্যা বিধৃত হতে থাকে। তারও কারণ, অস্থিরতা কিংবা কবিবুদ্ধির জগতটি কায়েম না-হওয়া। এখানেই ঐ 'নতুন কবিতা'র গুরুত্ব। যদিও সেখানেও ইসলামী চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনস্ক দুরকমের কবিরাই ছিলেন; কিন্তু 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের পরে আর দ্বিধা থাকেনি। যার উত্তুঙ্গ জাগরণ ষাটের বিচিত্রমুখি অনেক কবিদের। কেউ নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকার নাগরিকতা কেউবা বেছে নেন গ্রামজীবনের শাশ্বত জীবনপথ। তবে ইসলামী বা 'পাক'ভাবাদর্শের লেখকরা শীঘ্রই অবসিত হন। প্রচলিত আন্দোলন-সংগ্রামের ধারায় কিংবা জাতিত্ব চেতনায় তাঁরা আর একাত্ম যেমন হননি তেমনি অনৈক্যে অপসৃত হয়ে পড়েন। বিপরীতের প্রবল উর্বর মৌল ধারায় পাওয়া যায়; সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩), আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬), আতাউর রহমান (১৯২৫-১৯৯৯), আবদুর রশীদ খান (জ. ১৯২৭), মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১৯২৭-২০০৭), জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আজিজুল হক (১৯৩০-২০০১), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫), আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮), মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ (১৯৩৬-২০১৩), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯), বেলাল চৌধুরী (জ. ১৯৩৮), ওমর আলী (জ. ১৯৩৯), শহীদ

কাদরী (জ. ১৯৪২), মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩), রফিক আজাদ (জ. ১৯৪৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩), মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) প্রমুখ। বায়ান্ন থেকে একাত্তর তথা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সাহিত্য কার্যক্রম আমাদের আশান্বিত করে। কবিতায় অর্জিত হয় অনেক বড় ভিত্তি। যুক্ত হয় বাঙালির আন্তর্জাতিক সম্পর্কসূত্র। এক্ষেত্রে বিভাগোত্তর কালপর্বে বাংলাদেশের যে কবিতাচর্চা সেটা পঞ্চাশ-ষাটে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার উজানস্রোতের যাত্রা। কবিরা নিজেদের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, পথ খুঁজে পাচ্ছেন, চিনিয়ে নিচ্ছেন তার জাতিসত্তা, রাষ্ট্রে অধিকার ও আচরণের ক্ষেত্র ইত্যাদি সব বিষয়। কবিতায় শামসুর রাহমান *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০) কিংবা *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭); আল মাহমুদ বা সৈয়দ শামসুল হক শুরু করেন একই মৌল ঐতিহ্যধারায়। বাঙালি মুসলমান চেতনার প্রসারতার ক্ষেত্রটি তৈরি হয়ে যায়, এরপর ষাটের শেষদিকে অনেক কবি আমাদের কবিতার অঙ্গনে বারিবর্ষণ করেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ তীক্ষ্ণ, প্রগাঢ় ও অনুগত; রচিত চিত্রকল্প বাকবিন্যাসে ঝংকৃত, ছন্দের প্রবহমানতা কাঙ্ক্ষিত, পাঠ ও পুনর্পাঠ দৃঢ়।

মূলধারায় বাংলাদেশের কবি ও কবিতা : পরিপ্রেক্ষিত

পাকিস্তানের জন্য 'উন্মাদ' কবিকুল বহাল থাকেন, তদ্রূপ ঐতিহ্যে কবিতা লিখতে থাকেন। অপরদিকে ক্রমশ নিজেদের আত্মপরিচয় আর বাঙালির স্বতন্ত্র চেতনার পথটি অবমুক্ত হতে লাগল। প্রথমত : মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দস্তুর পূর্ব-বাংলার মাটির সমন্বয়ী দৃষ্টি স্ফটিক রূপ পেতে থাকে, দ্বিতীয়ত : এমত সমর্থনটি আসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, তৃতীয়ত : ক্রমশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য যেখানে নতুন উপনিবেশবাদ যেন কায়েম হতে থাকে। ইত্যাকার এর ভেতরে মূল কাব্যধারাটি আরও অঙ্গীকৃত হয়ে পড়ে এবং নিজেদেরও সমন্বয়ী চেতনার স্বাতন্ত্র্যরূপে নতুন ফুল-পাখি-নদী-নারী আর নক্ষত্রের গানে পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করে। এখানে চল্লিশ পেরুনো ফুল-প্রকৃতির কবিদের পঞ্চাশে আরও বেশি বিশ্বমাত্রায় আসর জমাতে চাইলেন। সেখানে ছিল অল্প বয়সের আবেগ, যুক্তিহীনতা, নিরঙ্কুশ দায়বদ্ধতা। 'নতুন কবিতা'র কবিদের পংক্তি আর পরিচিতির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। তবে পাকিস্তান-আবেগ বা নিজ ধর্মের বিশ্বাস এসব অবসিত হতে সময় লেগেছিল। অনেকেই তো ঝুঁকিও নেননি। তবে কবিদের প্রারম্ভিক এ পর্বটির উত্তেজনা দেখার মতোই ব্যাপার ছিল। তবুও থিতু হওয়ার পথটি তৈরি হয় উজানের বিরুদ্ধে উচ্চারণের ভেতর দিয়ে।

এক্ষেত্রে প্রকৃত কবিতার পথ অর্জনে একদিকে কায়েম হয়েছিল ত্রিশোত্তর পঞ্চকবি এবং সমসাময়িক অন্যান্য সাম্যবাদী কবিদের অনুপ্রেরণার আবর্তে। আবু হেনা মোস্তফা কামাল যেমনটা বলেন, 'ক্রম-প্রসারমান মধ্যবিত্তের কর্মজীবনের অন্তরালে যে আবেগ-আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিলো—তারই প্রকাশ ঘটেছিলো ঐসব কবিদের রচনায়। আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, জিয়া হায়দার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দীন—এঁরা সকলেই এই সময়ে কাব্য সাধনা শুরু করেন। এঁদের শৈল্পিক সাফল্য অবশ্যই তুল্যমূল্য নয়; কিন্তু সেই কবিকুলের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো—এঁরা সবাই নতুন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। এবং সেই সূত্রে এঁদের কবিতার ভাষা, ফররুখ আহমদের অনুসরণে, মিশ্র নয়, বিশুদ্ধ বাংলা—রূপক, উপমা, প্রতীকের ব্যবহারে এঁরা বাংলা কাব্যের অবিভাজ্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। প্রায়শ তিরিশের কবিতার সঙ্গে গভীরভাবে লগ্ন। সে কারণে এইসব কবিদের প্রাথমিক রচনায় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব একেবারে আকস্মিক নয়।...' এক্ষেত্রে পঞ্চাশের কবিদের একটি উল্লম্ফন যুগ রচিত হয়। বাংলাদেশের কবিতা এগুতে থাকে প্রধানত মধ্যবিত্ত বাস্তবতাকে অঙ্গীভূত করে। এবং প্রসঙ্গত কবিরাও নিজেদের ভেতরে বদলাতে থাকেন। হয়ে ওঠেন নাগরিক।

পাকিস্তানের জন্ম হলে বাঙালি মুসলমান ঢাকাকে আশ্রয় করে নতুন স্বপ্নে বড় হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের অবসানের ফলে, বাঙালি মধ্যবিত্ত বসতি নেয় ধর্ম-ঐক্যের ভেতরে। পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় কর্মচঞ্চল জীবনপ্রবাহ। দীর্ঘবঞ্চিত জীবনে উপনিবেশবাদ বা হিন্দু আধিপত্যের ভেতরে পথহারা পথিক যেন পথ খুঁজে পেয়েছিল। বাঙালির নগর জীবনও তৈরি হতে থাকে তখন থেকেই। পুঁজির বিকাশ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারটিও তখন ঘটতে থাকে নানাকৌণিক। গ্রাম ছেড়ে শুরু হয় শহরে আসা। কিন্তু রূপসী বাংলার আবেগ থাকে চিত্তে। এ নিয়ে নাগরিক বসতি শুরু করেন ভাগ্যসন্ধানী মানুষ। পুঁজির প্রকোপে তাঁরা ছড়াতে থাকেন নিজেদের মতো করে নিজেকে। অভিবাসনও চলতে থাকে। অধিকন্তু পূর্ব-বাংলার চল্লিশের কবিরা চলে এলেন ঢাকায়। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন 'ত্রয়ী' এ সময়ের আগেই কবি পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষার দাবি যতো দৃঢ়তর হচ্ছিল ততোই ঢাকার গুরুত্ব বাড়ছিল। কবিরাও যেন পাচ্ছিলেন মাটির লালিত্য। প্রসঙ্গত এসব ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ঐ মধ্যবিত্ত। তাদের বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বার্থপরতা পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকরা পূর্ব-বাংলায় তাদের মনোনীত এজেন্ট তৈরি করতে শুরু করেন। তরুণ-কর্মপ্লাবী-সাহসী-পরার্থসেবী তরুণদের সামষ্টিক আন্দোলন ঠেকানোর জন্য রাষ্ট্রশক্তির এ অপতৎপরতায় সদ্য স্বাধীন মুসলমানদের অনেকেই স্বার্থভোগী হয়ে ওঠেন। নতুন আবেগের ভেতরে কিছু শ্রেণি বা স্বার্থপর গোষ্ঠী তৈরি হবে—এ আর

নতুন কি? শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ এ সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁদের কবিতায় থাকে পূর্বসূরিদের মায়া ও কল্পজগতের অবভাস। এ কবিদের হাতে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। কারণ, ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়, মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি, যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ—এসব কবিতার পক্ষে উক্তি ও উপলব্ধিকে তৈরি করে। একটি কবিভাষাও তাঁদের ক্রমশ আয়ত্তে আসছিল। আর মধ্যবিত্তও একটা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করছিল। তবে এর বিপরীতে ইসলামপন্থি অংশটিও যে হয়ে ওঠে না, তা নয়। তাঁদের দ্বিধান্বিত স্বরটি সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি। তবে তফাতটা উপর্যুক্ত অংশের আলোচিত কবিদের কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা সম্ভব। তবে সদ্য সচল একটি সমাজে যে সবকিছুই পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকবে, তা সঠিক নয়। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের কোপানলে যে মধ্যবিত্ত শুধু অনিবার্য বাঁচার অংশ ও অধিকারটুকু চেয়েছিল, সে যখন স্বাধীন হল তখন শঙ্কামুক্ত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল। ঘটল যাবতীয় সীমাবদ্ধতার অবসান। আবেগের যেন মহীরুহ প্রত্যাবর্তন। 'নতুন কবিতা' কিংবা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের লেখকরা শুধু বিষয়বুদ্ধি নয়, বিষয়াতীত বিষয়কেও তারা কবিতায় উপাদানরূপে আনতে চাইলেন। কবিতার মূলধারাটি বজায় রেখে সামষ্টিক প্রবণতায়, সমন্বয়বাদী ভাবনায় শিল্পকে বহুমুখি করে তুলতে চাইলেন। এবং বোধকরি পরের দশকে তার পূর্ণাঙ্গ কূলে ফেরার পালা। অবশ্য সে অভিজ্ঞতা এবং এগিয়ে যাওয়া তো 'কাব্যকে বৃহৎ কাল-চৈতন্যের সমান্তরাল একটি সরল রেখায় বয়ে নিয়ে' আসার প্রত্যয়।

পঞ্চাশের কবিরা একটা দশকে সীমাবদ্ধ নন। কবিত্ব নির্ণয়েও তাঁদের প্রারম্ভ ও প্রতিশ্রুতিটি এখানে বজায় থাকে। এ দশক বাংলাদেশের কবিতার প্রারম্ভিক কাল। বাঙালি মুসলমান পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে কাব্যভূমির মৌল সূত্রটি সন্ধান করছে এ দশকে। যাঁরা পঞ্চাশে পৌঁছেছিলেন সে কবিতায় উঠে আসে লোকজ জীবন, অপরিমেয় সম্ভাবনার স্পর্শগন্ধময় আকুতি, ফুল-প্রকৃতির প্রণয় আর পরিশুদ্ধ মূল্যবোধের চর্চার মত্ততা। চেতন-অবচেতনভাবে মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতে নির্ধারিত সৃষ্টিসত্তা রূপান্তরিত হয় নদী-প্রকৃতির নিস্পৃহ নৈর্বক্তিক সত্তায়। *নদী ও মানুষের কবিতা* লেখেন সানাউল হক। লোকায়ত নন্দনে *সাত-নরী হার* লেখেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। অনেকেই ফেরেন স্নিগ্ধ মহিমান্বিত উজ্জ্বল জীবনে। সেখানে এক রকমের সংস্কার যে থাকে না তা নয়। কিংবা মানবতার জন্য দায় বা নিরঙ্কুশ আকুতি, নারীর শরীরী প্রণয়, আসঙ্গ লিপ্সা, জৈবিক প্রণোদনা এমনসব বিষয়গুলো আড়ষ্ট; কারণ, রোম্যান্টিকতার পূর্ণায়ত রূপটি তখনও তেমন করায়ত্ত হয়নি তাঁদের নিকট। এ পঞ্চাশে আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, সৈয়দ

শামসুল হক ক্রমশ অধিকার করছেন জীবনের যাবতীয় ও সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহ। কবিতার উপাদানগুলোতে তুলে এনেছেন মানবতার সর্বোচ্চ ক্ষেদ। নাগরিকতাও পেয়ে যাচ্ছে কবিতা। দীর্ঘদিনের কবিতাচর্চায় ষাট-সত্তর দশকের বন্ধুর পথ পেরিয়ে নিজস্বতায় থেকেছেন কবিতার সঙ্গে।

বায়ান্ন থেকে আটান্ন বাংলাদেশের কবিতায় স্ফূর্তি আসে। এরপর বাষট্টি পর্যন্ত বিপর্যস্ত। বাষট্টির পর পূর্ণ প্রবাহ। শামসুর রাহমান পঞ্চাশের গোড়ায় শুরু করলেও *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* বেরোয় ষাটে। প্রায় একই ঘটনা সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান এবং এ পর্বের অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও। তবে কবিমেধার পূর্ণতা আসে একটা সময়ে। সে সময়কে চিহ্নিত করা একটু মুশকিল। কারণ, এ বিচার অনেকটা সাবজেক্টিভ এবং আপেক্ষিক। আহসান হাবীব বা শামসুর রাহমানের মতো অনেকেই কয়েক দশক ধরে কাব্যসাধনা করেছেন। কবিরূপে অনেক পরীক্ষার আবর্ত যেমন তাঁরা অতিক্রম করেছেন তেমনি তাঁদের প্রতিমায় সাধিত হয়েছে 'নিকষিত হেম' সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে বিবেচনার জায়গাটিও বিচিত্র। প্রথম কাব্যে শামসুর রাহমান যেভাবে উপস্থিত—*রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) তা পরিবর্তিত। কারণটি নিহিত দেশ-কাল-সমাজ-প্রতিপার্শ্ব চেতনায়। যে দৃশ্যমান জগত থেকে কবিচেতনা দিব্যমূর্তি লাভ করে। অবচেতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জন্ম নেয় যে সত্তাটি—সেখানে অভিজ্ঞতা-অন্বেষিত স্মারকটি প্রস্তুত করেন কবি। স্মর্তব্য, এ সময়টায় সম্পাদিত কবিতা সংকলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন—এসবে যে নতুন মধ্যবিত্ত উঠে আসে তাঁরা অনেকটা পরিশোধিত। অসাম্প্রদায়িকতা বা মানবিক কল্যাণের বিষয়সমূহ তাঁরাই সামনে এনেছে। ধর্মীয় সংস্কার ও জাতপাত-শ্রেণিভেদ তাঁর অস্বীকার করে। শাশ্বত শিল্পচেতনাকে দেয় প্রাধান্য। এ বিশ্বাস আসে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের ভেতর দিয়ে। তবে অবাঙালি শ্রেণিশক্তি বা সামন্তগোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় 'অনুগত চর'রা নানাভাবে নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা চালায়। এতে করে দ্বন্দ্বাত্মক আবহ যে রচিত হয় না তা নয়। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতরেই পূর্ব-বাংলার নব-উত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণিটি সমাজসম্ভূত শিল্পজগতটি নির্মাণ করতে থাকে। প্রসঙ্গত বহির্দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের ভূত যে ঐ সামন্ত শাসক বা আমলাদের শক্তি জোগায়নি তা নয়। বরং বিপুল জোয়ারের স্বপ্নকাতর আবেগের ভেতরে রাষ্ট্রের এদেশীয় এজেন্টরা নিজেদের আখেরের লাভ এবং লোভ চিনে নিতে ভুল করে না। কিন্তু এসব অন্তরায় আদর্শ সচেতন নতুন মধ্যবিত্তকে কিছুতেই পরাস্ত করতে পারেনি। বরং লক্ষ করা যায়, বিপরীতমুখি ধর্মীয় চেতনা ধারার কবিরা ম্লান হওয়াই শুধু নয়—ক্রম-অপসৃত হতে থাকে। এ পটভূমিতে সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯-১৯৭৫) 'সমকাল' (১৯৫৭) পত্রিকাকে ঘিরে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিচর্চা আরও বেগবান হয়। তাঁদের যাত্রা পঞ্চাশের

মধ্যভাগে। কিন্তু প্রকরণগত ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষা করলে ষাটের প্রথমার্ধেই অনেকটা চকিত তাঁরা। হয়ে উঠেছেন স্থির, বাড়ন্ত।

১৯৫৮তে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) পাঞ্জাবি সামরিক সমর্থনে ক্ষমতায় আসেন। এতে এ অঞ্চলের মুসলমানরা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিভ্রান্তি আর স্থিরতা জন্ম নেয় সমাজস্তরে। উল্লিখিত মধ্যবিত্ত দ্বন্দ্বের সুযোগ, অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে, আইয়ুব অনুগত শ্রেণি তৈরি হবে, তাতে আর সন্দেহ কী! চিরকালই ক্ষমতালোভীর দল, চাটুকারের দল, হালুয়া-রুটির সন্ধানী, উচ্ছিষ্টভোজীরা এমন সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকে। উপনিবেশবাদ অবসানে নতুন রাষ্ট্রে এমন শ্রেণিকাঠামো অনুপস্থিত থাকে না। আর পাকিস্তানের মতো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রপুষ্ট রাষ্ট্রে এ সুযোগ আরও বেশি। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতির অনুগত দলবাজ, ফড়িয়া শ্রেণি প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যায়। আসন্ন 'মৌলিক গণতন্ত্রে' (১৯৬২)র নামে দ্বিধাবিভক্তি আর আত্মক্ষয়ের অধ্যায় রচিত হতে থাকে। আওয়ামীলীগ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী অংশে ভাগ হয়ে যায়। একজন পশ্চিমা সমর্থক অন্যজন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এরূপ নানামুখি বিভ্রান্তিতে গণসমাজে ডিক্টেটর আইয়ুব খানই 'হিরো' তে পরিণত হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক উঠতি মধ্যবিত্ত আত্মমগ্ন ও অন্তর্লীন হয়ে পড়ে। একটা বিচ্ছিন্নতা, বৃত্তায়ন আর বিড়ম্বনা গ্রাস করে। কবিরা তেমন এগুলেন না। কবিতা 'গ্রহণ-ধরা ছায়ার মতো'; অনালোকিত। তবুও চণ্ড আইয়ুবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপন সম্পন্ন হয়। বোধকরি কবিরা এরপর আর অক্রিয় থাকেননি। এ পর্বে একদিকে লোকায়ত এবং নাগরিক চেতনা দুটোই এগুতে থাকে—আর বলতেই হয় কবিভাষার অবলম্বন-বিভাবে জাগরিত ঐ ত্রিশের উত্তরাধিকার।

ষাটের প্রারম্ভ থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়ার বোধটির সঙ্গত প্রকাশ ঘটাতে থাকে। এ দশকের প্রথমার্ধের কবিরা মুখোমুখি হন মৌলিক গণতন্ত্র বা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি হতাশ, বঞ্চিত—যতোটা স্পন্দিত ছিলেন ঠিক ততোটাই হলেন মলিন। কবিতায় তখন বাহুল্য হয়ে ওঠে যৌনতা, বিচ্ছেদ, উগ্রতা; কিংবা পরাবাস্তব (surrealist) চিত্র। শামসুর রাহমান পরিবর্তিত; আল মাহমুদ আধুনিকতার সমস্ত শর্ত বজায় রেখে গ্রামীণ লৌকিক জীবনে ফিরলেন। তবে এসবের ভেতরে কবিতায় প্রচ্ছন্নভাবে কায়েম হতে লাগল স্বাজাত্য, স্বদেশপ্রেম। সেটা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পংক্তিতে, কখনও উপমাপ্রতীকে। এগুলো ষাটের প্রথমার্ধে শুরু হলেও স্পষ্টতর দ্বিতীয়ার্ধে। এখানে অধিকারের জানালা খুলে দিল 'ছয়দফা'র স্বায়ত্তশাসনে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যচিন্তা বেগবান হতে থাকে। একটু পরিচিতি কবিরা এগুলেন, পৌঁছালেন *নিজ বাসভূমে*, লিখলেন

পয়ারে *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা*। অদ্যাবধি বাংলাদেশের কবিতার সবচেয়ে প্রজননোচ্ছল সুদিন এ সময়টি। প্রসঙ্গত, কিছুকাল আগে মৃত্যু হয়েছে জীবনানন্দ দাশের (মৃত্যু ১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (মৃত্যু ১৯৬০); বুদ্ধদেব বসু জীবিত—তিনি করে ফেলেছেন ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ। বিষ্ণু দে (টি. এস. এলিয়টের অনুবাদক) কিংবা অমিয় চক্রবর্তী দুর্দাম লিখে চলেছেন। ষাটের প্রান্তিক এ কবিরা এসব থেকে প্রবল বৈশ্বিক হয়ে পড়লেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক সুররিয়ালিস্ট, পাশ্চাত্য অনুগত; নির্মলেন্দু গুণ প্রত্যক্ষ, নিরাবরণ, গণমানুষের পক্ষের পদাতিক। আর মহাদেব সাহা রুগ্ন রোম্যান্টিক। রফিক আজাদ চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মর্মদাহনে নির্ণীত। এঁরা এগিয়েছেন একাত্তরের ভেতর দিয়ে, এ পর্যন্ত।

দুই.

আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৬) 'ছন্দ, তাল, লয় ও মিলের ভিতর দিয়ে যে অদ্ভুত বিকাশ শুধু মুসলমান কেনো, সমবয়সী কোন হিন্দু কবির জীবনেও সাড়া পেয়েছে কিনা সন্দেহ। যখনকার বা তখন এবং ঠিক তেমনি আমাদের ভাবকে পাই কবির বিভিন্ন কবিতায়। আশ্চর্য্য রোমান্টিক তাঁর মন।'—এভাবে 'নতুন কবিতা'য় তাঁর পরিচয়টি বিদ্যমান। আবহমান ঐতিহ্যে বিশ্বাস, শ্রেণিচেতনা, রোম্যান্টিক সন্দর্শন তথা মানবতাবাদী জীবনাদর্শে রচিত কাব্য *তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৫০), *বিষকন্যা* (১৯৫৫), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৫৫), *উত্তর আকাশে তারা* (১৯৫৮)। কবির ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ প্রেমের কবিতার সংকলন *কুঁচবরণের কন্যা* (১৯৭৬)। আশরাফ সিদ্দিকীর কিশোর কবিতা *কাগজের নৌকা* (১৯৬২)। হাডসন ও মেমের ব্রাইডেল ক্রীপারের বীজ ক্রমশ দখল করে সবুজ-শ্যামল দেওদারুকে। বর্ণিত প্রকৃতি, হিমেল আবহে পুনর্বার বসন্তের আগমনের আশাবাদ ব্যক্ত করে *বিষকন্যা* কাব্যে। *তিরিশ বসন্তের ফুল* (১৯৭৫), *বৃক্ষ দাও : ছায়া দাও* (১৯৮৪), *ঝড় তুফানে* (প্রথম খণ্ড ১৯৮১ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৯০), *দাঁড়াও পথিকবর* (১৯৯০) তাঁর অন্যান্য কাব্য। **আবদুর রশীদ খান** (জ. ১৯২৭) পঞ্চাশের কবি, বিভাগোত্তর প্রথম কাব্যসঙ্কলন 'নতুন কবিতা'র অন্যতম সম্পাদক। বাংলা কবিতার মূলধারায় কাব্যচর্চা করেছেন; রবীন্দ্রোত্তর কাব্যভঙ্গির ছাপ থাকলেও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাথমিক কবিতাচর্চার পর্বে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার মর্মমূলে জলসিঞ্চন করেছেন আবদুর রশীদ খান। 'তাঁর রচনা প্রাণকে ছেয়ে ছায়া ফেলে পৃথিবীর বুকে—সে পৃথিবী নিশ্চুপ, গভীর। অন্ধের মতো খুঁজে পাওয়া নয়, ভারসাম্য দোদুল্যমান তাঁর গতি একদিন খুঁজে পেয়েছে জীবনকে—জীবনের ব্যাপ্তি-সাধনায় তাঁর অমর সত্তাকে—যা তাঁর দর্শন।' কবিতাচর্চায় নিজের সংস্কৃতি ও শেকড়কে চিনতে

পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রেম-প্রকৃতি-আত্মচেতনা স্বতঃস্ফূর্ত বাঙময় হয়ে উঠেছে। *নক্ষত্র : মানুষ : মন* (১৩৫৮), *বন্দী মুহূর্ত* (১৯৫৯), *মহুয়া* (১৯৬৬), *বিস্মিত প্রহর* (১৯৬৮), *নিরন্তর স্বর* (১৩৭৬), *অন্বিষ্ট স্বদেশ* (১৯৭০) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। **মাহবুব উল আলম চৌধুরী** (১৯২৭-২০০৭) একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'র লেখক। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম মাসিক সাহিত্যপত্রিকা "সীমান্ত"র সম্পাদকও ছিলেন তিনি। *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি* (সুবর্ণ সং. ঢাকা ১৯৮৮) চার দশকের কালপর্বের চল্লি-শটি কবিতার সংকলন। স্বদেশ উত্তাপে জর্জরিত স্বকালবিদ্ধ এ কবি নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি তুমুল রকমের সচেতন। তাঁর কবিতার বই *আবেগধারা*, *ইস্পাত*, *অঙ্গীকার*, *বিপ্লব*, *গরাদ ভাঙ্গার সংগ্রামীরা জাগো* ও *সূর্যের ভোর*, *সূর্যাস্তের রক্তরাগ*। **দিলওয়ার** (১৯৩৭-২০১৩) ভিন্ন প্রকরণের কবি। অনেকের কাছেই তিনি গণমানুষের কবি। তাঁর বিষয়বার্তা অন্যান্য কবিদের থেকে তেমন স্বাতন্ত্র্য নয়। তবে প্রেম—অন্তর্লোকের বাসনা, জীবনের উত্থান-পতনের ধারণা প্রকরণে নির্বিকার দর্শন আরোপ করে। সেখানে বিচ্ছুরিত সময়সংকটের তাৎপর্য রক্ষিত হলেও কাব্যগুণের জন্য নির্ধারিত শর্ত থাকে অমলিন। দিলওয়ারের কাব্যচর্চায় একাধারে সময়ের পরিবর্তিত রূপ এবং অলৌকিক আনন্দপ্রসূত কাব্যবৃত্তের নন্দমাত্রাও অক্ষুণ্ন। *জিজ্ঞাসা* (১৯৫৩), *পূবাল হাওয়া* (১৯৫৩), *ঐকতান* (১৯৬৪), *উদ্ভিন্ন উল্লাস* (১৯৬৯), *স্বনিষ্ঠ সনেট* (১৯৭৭), *রক্তে আমার অনাদি অস্থি* (১৯৮১), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৭), *দিলওয়ারের একুশের কবিতা* (১৯৯৩), *দিলওয়ারের স্বাধীনতার কবিতা* (১৯৯৩), *দিলওয়ারের রচনাসমগ্র* প্রথম খণ্ড (১৯৯৯) ও দ্বিতীয় খণ্ড (২০০০)। তাঁর ছড়ার বই *দিলওয়ারের শত ছড়া* (১৯৮৯) এবং *ছড়ায় অ আ ক খ* (১৯৯৪)। দিলওয়ারের ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ *ফেসিং দ্যা মিউজিক* (১৯৭৫)। তিনি গীতিকবিও বটে। তাঁর গানের বই *পুবাল হাওয়া* (১৯৬৫) এবং *বাংলা তোমার আমার* (১৯৭২)। **বেলাল মোহাম্মদ** (১৯৩৬-২০১৩) পঞ্চাশের রাগী কবির কবিতার ধারায় উজ্জ্বল। তাঁর কাব্য *কবিতা নয়* (১৯৫৪), *পর্যায়ক্রম নেই* (১৯৬৯), *অকাল অপাত্র* (১৯৭৭), শুধু *মিত্রাক্ষর* (১৯৮১), *সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৩)। **মযহারুল ইসলাম** (১৯২৮-২০০৩) '... ছন্দবদ্ধ প্রাণের গতিতে দোল-খাওয়া আর টোল খাওয়া এই জীবন বয়ে নিতে চায় দূর—অনেক দূর, যেখানে তার মনের প্রতীতি। প্রিয়াকে তিনি দেখতে চেয়েছেন সারল্যের সহজ সুর দিয়ে—বুঝাতে চেয়েছেন এখানে, ওখানে ও সেখানে এটা কি ওটা, নয় সেটা...'—'নতুন কবিতা'র এ কবি মাটি মানুষের ভাষ্য, মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় কবিতা লিখেছেন। *মাটির ফসল* (১৯৫৫), *বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি* (১৯৭০), *আর্তনাদে বিবর্ণ* (১৯৭০), *যেখানে বাঘের থাবা* (১৯৭৯),

অপরাহ্ণে বিবস্ত্র প্রাতরাশ (১৯৭৯), *দুঃসময়ের ছড়া* (১৯৮৮), *উজানে ফেরার প্রতিধ্বনি* (১৯৯৮), *রাজ বারান্দার তুমি* (১৯৯৮) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কবিতাগ্রন্থে রাজনীতি কিংবা আর্থনীতিক মুক্তি তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে। 'নতুন কবিতা'র সংকলন থেকে তাঁর পরিচিতি, 'পৃথিবী, মানুষ, প্রকৃতি নিয়ে যাঁদের লেখা হাবীবুর রহমান তাঁদেরই বিশিষ্ট একজন। চম্‌কে চাওয়া, আর থম্‌কে যাওয়ার মতো চলন, বলন ও দ্যুতি তাঁর কবিতায় পরিপূর্ণ। এদের কিছু উপেক্ষা করার মতো নয়, বরং লক্ষণীয়।' বিভাগ-পরবর্তী কাব্যান্দোলনের সূত্রে **হাবীবুর রহমান** (১৯২১-১৯৭৬) বিখ্যাত। মূলত শিশু সাহিত্যিক। *উপাত্ত* (১৯৬২)র রচনাশৈলি পরিচ্ছন্ন। শ্রেণিচেতনা প্রকটরূপে বিরাজমান তাঁর কবিতায়। কিন্তু পুরো চেতনাই ভর করে পূর্ব-বাংলার অনুপম প্রকৃতিকে ঘিরে। **আতাউর রহমান** (১৯২৫-১৯৯৯) 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সংকলনের অন্যতম কবি। আতাউর রহমান বিভাগোত্তর সময়ের অন্যতম কবি হলেও চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্যাঙ্গনে অভিষেক। চেতনায় সাম্যদর্শন, বিপ্লবী প্রেরণাজাত সত্য প্রধানত তাঁর কাব্যকে অধিকার করে রাখে। এছাড়া ব্যক্তিহতাশা, গ্লানি, দ্বন্দ্বাত্মক সত্তা কবির প্রতীকপ্রতিমাকে নিরন্তর একাত্ম করে। আতাউর রহমান সৎ বিশ্বাসকে ধারণ করেছেন কবিতায়; আর কবিতার মতো শিল্প সম্পর্কে নিজেও আদর্শিক টানে থেকেছেন অনিবার্যরূপে নিমগ্ন। জীবনের সত্য উপলব্ধিতে কখনও ভ্রান্তি নয়; পুরোভাগে থেকে চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মনোনিবদ্ধ থেকেছেন। কবির দার্শনিকতা পরিণতিতে দানা বাঁধে—ঋজুতায়, দ্রোহে, নিঃশব্দতায়। এমন কবির বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত ধাঁচে নিরূপিত—তবে প্রজ্ঞা, পরিশুদ্ধ আবেগ, যাবতীয় বৈরিবিনাশী রক্তাম্বর উচ্চারণের কেন্দ্রে থাকে অলৌকিক আনন্দের ভার। কবির কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : *দুই ঋতু* (১৯৫৬), *একদিন প্রতিদিন* (১৯৬৫), *নিষাদনগরে আছি* (১৯৭৭), *ভালোবাসা চিরশত্রু* (১৯৮১), *ইদানীং রঙ্গমঞ্চ* (১৯৯২), *ভালোবাসা এবং তারপর* (১৯৯৩), *সারাটা জীবন ধ'রে* (১৯৯৪)। *দুই ঋতু* কাব্যে শ্রেণিচেতনার বিষয়টি থাকলেও এক ধরনের আত্মচেতনা, মগ্নতা ও আত্মবিশ্লেষণ আছে। পাঁচের দশকের এ কবিতায় কমিউনিষ্ট চেতানাই প্রধানত প্রগাঢ়। কিন্তু বিদ্রূপ-ব্যঙ্গও কম নেই। সমসাময়িক সমাজে হীনতা, বিকৃতি এসব বিষয়কে অগ্রাহ্য করেছেন কবি। প্রকরণ অনেকটা প্রত্যক্ষ, নজরুল বা সুকান্ত ভাবচেতনা বিদ্যমান তবে প্রকাশে নির্বিরোধী ও অনৈরাজ্য কার্যকর। আতাউর রহমান মননে ও বুদ্ধিতে পরিশুদ্ধ, রাজনৈতিক ভাবনাটা এসেছে তারই বার্তাবাহি হয়ে, সেজন্য পূর্ণাঙ্গরূপে তিনি মানবতাবাদী। প্রথম কাব্যেই তাঁর স্বতন্ত্র কবিভাষাটি প্রশংসার যোগ্য। পরের কাব্যেও তিনি এরূপ চেতনাকেই সম্মুখগামী করেছেন। **মোহাম্মদ মামুন** (জ. ১৯২৭) 'নতুন কবিতা'র কবি। 'মন নিয়েই তাঁর খেলা এবং মনকে জয়

করেই সৃষ্টির সম্ভাবনা : এই তাঁর বিশ্বাস।' তাঁর কাব্য *প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়া* (১৯৬৩)। **জাহানারা আরজু** (জ. ১৯৩২) বিভাগোত্তর সময়ে কাব্যচর্চা। তাঁর কবিতা আত্ম-অনুভূতি, নির্বিরোধী; প্রকৃতি-নির্ভর। সুখস্বপ্ন আর সুন্দরের আশাবাদ রোম্যান্টিক শর্তে মর্মপ্লাবী। 'কখনো জ্বলন্ত সূর্যটাকে নিয়ে আসি/ হাতের মুঠোয়/ কখনো জীবনের চোরাবালিতে পা রেখেও/ নিয়ত কাঁচের স্বর্গ গড়ি'—এমন পংক্তিমালায় তাঁর কবিতাগ্রন্থ : *নীলস্বপ্ন* (১৯৬২), *রৌদ্রঝরা গান* (১৯৬৪), *শোণিতাক্ত আখর* (১৯৭১), *আমার শব্দে আজন্ম আমি* (১৯৮৩), *ক্রন্দসী আত্মজা* (১৯৮৪), *স্বনির্বাচিত শত কবিতা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রেমের কবিতা* (১৯৮৮), *বিমুক্ত পংক্তিমালা* (১৯৮৮), *তৃষ্ণার্ত মাটির চুম্বন* (১৯৯০), *আকাশের মাঠটায় মায়াবী ছায়া* (১৯৯৬), *পায়ের তলায় কম্পিত কর্দমাক্ত মাটি* (১৯৯৭)। **সুফী মোতাহার হোসেন** (১৯০৭-১৯৭৫)র *সনেট সংকলন* বের হয় ১৯৬৫ তে। এ সনেটে নির্ধারিত রীতিপদ্ধতিতে কবিবিষয় ঊষা, প্রভাত, সন্ধ্যা, রজনী, ঋতুর বৈচিত্র্য ও রঙ—এমন সব বিষয়। এক রকমের সুনিশ্চয় জীবনের নিরঙ্কুশ আশাবাদ সনেটে ধ্বনিত। নির্ভার, মুক্তপ্রাণের উচ্ছ্বাস, কবিবিনুনি পাঠককে মূলত আনন্দময়ীর আবাহন-সংকেতই শোনায়। এছাড়া *সনেট সঞ্চয়ন* (১৯৬৬), *সনেট শতক* (১৯৭০), *সনেটমালা* (১৯৭০)সহ তাঁর অসংখ্য সনেট অপ্রকাশিত রয়েছে।

তিন.

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

তীক্ষ্ণ সমাজমনস্ক এবং গভীর সংবেদনশীলতা কবির কবিভাষা নির্মাণ করেছে। বিভাগ-পূর্বকালে বেরিয়েছিল প্রথম কাব্য *রাত্রি শেষ* (১৯৪৭)। অসাম্প্রদায়িক মননে, আদর্শবাদের ঊর্ধ্বে নিরন্তর কাব্যচর্চা। চল্লিশের সমাজমনস্কতা, আত্মরতি থেকে অবমুক্তি তাঁর কবিমনস্কতার প্রধান ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার বিষয়: শাশ্বত ও গ্রামীণ মূল্যবোধ, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতাকে অস্বীকার, নগর মধ্যবিত্তের অস্তিত্বচেতনা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৫ কয়েক দশকের কাব্যচর্চায় তাঁর প্রথম কাব্যে কবি বলেছেন, '১৯৩৮-১৯৪৬ পর্যন্ত পরিধিতে *রাত্রি শেষ* লিখিত। ... বাংলা কবিতা যখন সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে।' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, বাংলাদেশের কবিতায় প্রারম্ভিক পর্বের জন্য। চারটি পর্যায়ে ভাগ থাকলেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য। তবে পর্ব বিভাজনের ভেতর দিয়ে শিল্প-উত্তীর্ণ পথটিই এখানে রচিত হয়েছে। তবে তখন আবেগ বেশি বলে, ক্ষেদ-অহং-শক্তি-আহ্বান খুব প্রবল। তীক্ষ্ণধী। প্রধানত এ পর্যায়ে সমাজ-অন্বিষ্ট ভাষা পাওয়া যার পর নাই দুরূহ। কবিতার তো যাত্রারথটি আমরা খুঁজে পেলাম, সেখানে আহসান হাবীব সম্পূর্ণভাবে এবং একেবারে নতুন, তবে

সিদ্ধান্তহীন নন। পরিবেশনার বলিষ্ঠতা তাঁকে এ পরিমণ্ডলে নিয়ে আসে। প্রবলরূপে তখন জীবনানন্দীয়। 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়/ তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়', বাংলা কবিতায় মূলধারায় অবিচল, স্বভাবগত চিত্রটি তাঁর ছিল, 'পাকিস্তান' বা অন্য কিছু কবিতায় আসেনি, নিরন্তর বজায় রেখেছেন—মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ। কবিচিন্তনে আহসান হাবীব 'প্রহর' অংশটিতে তরুণ্যদীপ্ত, 'প্রান্তিক' পর্যায়টির মন্তব্য : 'ইতিহাসবিমুখ শ্রান্তি থেকে তাই 'প্রান্তিক' পর্যায়ের দ্বিধান্বিত স্বাক্ষর। কিন্তু সমাজ মানসে ইতিহাস চেতনার ব্যাপ্তি ব্যক্তিমানসে নতুন ইতিহাস যোজনায় অক্ষম নয়। আর ঐতিহাসিক অভিঘাত শিল্প-জীবনের অভিজ্ঞতায়ও নতুন আলোকসম্পাতে সক্ষম।' কতোটা সমাজচেতন দৃষ্টি, আর ঐ বয়সে, কবিতার ভেতরের সমাজপ্রস্তুতিটি কীভাবে গ্রথিত ছিল, অনুমান মেলে। তাঁর আর্তিটি সেজন্যই মান্য লেখকদের নিবেদিত। আছেন কবিগুরুসহ অনেকেই। বোধকরি চেতনাটার ভিত্তি, সমাজমনস্কতার শিল্প নির্মাণ, আর ইতিহাসচিহ্নকে গুরুত্বারোপ—পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা ঐ নন্দনকাঠামোটির অকৃত্রিম সত্যকে ঘিরেই।

ছায়া হরিণ (১৯৬২) কাব্যটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। ফুল-পাখি-মাটি-পুতুল-ছাঁদ ভালোবাসেন কবি। প্রমাণ আছে এ কাব্যটিতে। কিন্তু স্বভাবে ওই অক্রিয়তা। রক্তবীজের বৃত্তান্তে পৌঁছান "তোমাতে অমর আমি" কবিতায়। মা-দেশ অভিন্ন, প্রত্নপ্রেম অবিভাজ্য আবহ রচনা করে, গল্পের ভাঁজ বর্ণনায়, সেখানে সমস্ত আনুগত্য 'ব্রহ্মাণ্ড'-উপমায় পরিলক্ষিত। মাকে তথা স্বদেশকে চেনা যায় তাঁর কবিতায়, আমিত্বও প্রকাশিত। কৃতজ্ঞতা আছে 'আমাতে দিয়েছো তুমি শিল্পীর মহিমা' বলার মধ্যে। *ছায়াহরিণ* কাব্যটির নিঃশ্বাসে ষাটের পূর্ব-বাংলার রূপটি সৃষ্টি—যেখানে সামনে অবমুক্তির শর্তটি থাকে, নিজেদের আত্মপরিচয়ে ব্রত হওয়ার ব্যাপারটি থাকে, থাকে মননমুক্তি ও আধুনিক হওয়ার পথটির প্রত্যাশার আকুতি। পাকরাষ্ট্রে সামরিক শাসনের কবলে পূর্ব-বাংলার প্রত্যয়টি স্পষ্টতর হতে থাকে। আহসান হাবীবের স্বদেশব্রত রূপটি, বাংলা কাব্যধারার দিকস্পর্শী রূপটি অনিবার্যরূপে যুক্ত হয় তাঁর পংক্তিমালায়। *ছায়াহরিণ* আসলে স্বপ্নের ছায়া, অনুষঙ্গি-অনুগামী মনন আর পরিশুদ্ধ চেতনার ছায়া; 'হরিণ' এখানে প্রতীকী শুধু নয়, প্রাচীনতার-শুভ্রতার-সুন্দরের ইমেজিক ফর্ম, যেটা লালন ও আকর্ষণের বিন্দু—পূর্ব-বাংলার রূপটিও এর মধ্যে দৃশ্যমান, আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘরও এ হরিণ। কিন্তু তা কি ছায়াসম? কিংবা ছায়া তো মানুষেরই অনুগামী। এটাকে, এমন ভাবব্যঞ্জনাকে মূর্ত করে তোলেন কবি। প্রসঙ্গত, এমনটির দেশ-কাল-সমাজ প্রয়োজনীয়তাটি ঐ সময়ে তো দরকারই নয়, প্রত্যয়রূপে দৃঢ় হয়েছিল। সেটা ধর্ম বা বিশেষ আদর্শ থেকে নয়, পূর্ণায়ত নিজস্বতায়, ঐতিহ্যে,

ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে ফেরা। এখানে থাকে না কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা লোলুপ-স্বার্থভোগীর দণ্ড। এগুলোর ধিক্কার আছে; কিন্তু আহসান হাবীব পূর্ণাঙ্গ কবি—সেকারণে কিছুই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না। কবির শর্তটি ছাড়েন না কবি। সেখানে সর্বজ্ঞপ্রসূত হয়েও তিনি স্থিতধি, মেধার সূচ্যগ্রে বিম্বিত। এ কাব্যে "প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা", "সম্রাট", "যৌবনে জীবনে তুমি", "এক মহৎ কবিতার খসড়া", "ফুটবে ফুল"—এরূপ প্রত্যাবর্তনার কবিতা। এখানকার কবিভাষ্যটি এ পর্বে কেমন করে রচিত কিংবা তার গুরুত্বের বিষয়টি কীরূপে নির্ধারিত তা আমরা খুঁজে দেখতে পারি। *সারা দুপুর* (১৯৬৪)-এ কবির উত্তরণের অনন্য প্রয়াস। "পুতুল" দিয়ে শুরু। ওই লোকজ প্রতিমা। নদী উত্তরিত হয় নারীতে, অবচেতনে এ অভিন্ন রূপটি সংকেতায়িত হয়, তখন উচ্চারণ চিত্রকল্পে পর্যবসিত। *সারা দুপুর* কাব্যে যেটি সংকেতরূপে আসে তা হলো এ জীবনের 'অভ্যাগত' নাগরিক উপকরণসমূহ। কবিতার নাম "অভ্যাগত"। সেখানে চাতুরি, ব্যস্ততা, কৃত্রিমতা যেমন আছে তেমনি বিরূপতার দৃশ্যপট তো নির্ধারিতই। এখানে কবিনন্দনের গল্পটি উত্থাপিত 'বেড', 'ফ্রিজ', 'অলিম্পিয়ার বাক্স', 'ডাইনিং', 'আশরাফ সাহেব'—এমন উক্তি ও অনুভবে। *দু'হাতে দুই আদিম পাথরে* 'বিনয়' প্রসঙ্গে যা উচ্চারণ করেন, তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, আর উদ্ধারের জন্য এমনটাই বলেন এ কাব্যে 'দুয়ারে অভ্যাগত'। কবির শব্দ যে অর্থে রূপান্তরিত, কিংবা কবিতায় 'শব্দ'ই যে সমস্ত ভার বহন করে সেখানে এমন উদাহরণে আহসান হাবীব কতোটা সিদ্ধি ও পরিশুদ্ধতা অর্জন করেন তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

আহসান হাবীব সাংবাদিক হওয়ার সূত্রে অনেক রকম সংবাদের মুখোমুখি ছিলেন, প্রতিনিয়ত। সেজন্য ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় মধ্যবিত্তের অনিকেত মনোবৃত্তি, স্ববিরোধীতা, যশের লোভ, কৃত্রিমতা জানা ছিল। 'ডাবল কলাম', 'সে আসে', 'জাল' মধ্যবিত্ত কৃত্রিমতা আর প্রেম-প্রণয়ের আবেগ-নির্ভর রূপটি রচিত। রাধা-হেলেন, বোখ্‌রা-সমরখনদ্‌ এসব অফুরন্তরূপে অর্থায়িত। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে অভিনবত্ব তাঁর কথনপ্রয়াস। গল্পবলার ভেতরে হিউমার, শ্লেষ স্থির হয়ে থাকে, গদ্যছন্দ যেন একটা নিশ্চয়তা অর্জন করে এক্ষেত্রে। তবে এ কাব্যে সবচেয়ে তুমুল মনে হয় "সূর্যসঙ্গ" কবিতাটি। মন্ময় আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু আহ্বান-কাঠামোটি অপূর্ব। এখানে প্রেম যেন একটা পর্যায় পেয়ে যায়—রাতের আঁধারে। একাত্ম হন প্রেয়সী-'পাখি'রূপে; এ সংকেতটি অচেনা থেকে চেনার অভিমুখে, কার্যকর। তারপর সমস্ত জীবনের আরতি যেন সম্পন্ন করে। বাংলাদেশের কবিতার এ ভাষা খুব কোমলগন্ধী, আরাধ্য :

> পাখির অলস দেহে ধীরে ধীরে খসে যাবে রাত
> এবং রাত্রির শেষে যে ভোর আসন্ন তাকে চেনো তুমি।

তাকে তুমি সহজ আপন
জীবনের দীপ্তি বলে মেখে নিতে পারো
নিজের সমস্ত দেহে সারা মনে,

... ...

চিত্রলতার এ প্রয়াসটি কোথায় এমন অবিকল কি? 'অলস দেহ' আর 'খসে যাওয়া রাত' আর প্রত্যাশা সমস্ত জীবনের। তাঁর পুরো কাব্যেই যেন এমন 'সমস্ত জীবনে'র আরাধনাটি পরিব্যাপ্ত। *আশায় বসতি* (১৩৮১) 'দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।' এ বক্তব্যের পর *আশায় বসতি*র পরিবৃত্তটি মোটামুটি স্পষ্ট। কিন্তু কথা হলো, আহসান হাবীব কখনওই এভাবে কবিতায় অবরুদ্ধতাকে তুলে আনেননি। "নৈঃশব্দে নিহিত আমি", "বাস নেই", "বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আমরা", "মিছিলে অনেক মুখ"—এসব কীরূপে কবিতা হলো; আবার "সেই নদী", "সামনে ধু ধু নদী", "পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি"—এমন কিছু এক রকমের কবিতা; আর "কাহিনী নিরন্তর", "মায়ের ডাকের ছড়া", "ক্ষমাই প্রার্থনা", "অসুখ", "ডাক", "শিল্প-মানবিক", "কাব্য-সভায়", "শোকার্ত একজন"—এসব এক ধরনের। উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকমের কবিতা আমরা এখানে পূর্বোক্ত আলোচনায় পেয়েছি। কিন্তু প্রথম রকমটি আমরা যেটাকে বলেছি কেমন করে কবিতা সেটাই এখানে পরীক্ষণীয়। যদিও এটার উত্তর এখানে প্রারম্ভিক উদ্ধৃতির মধ্যেই বিরাজমান। কিন্তু আহসান হাবীবের কবিতা হিসেবে এ অংশটি পরীক্ষণীয় তো হতেই পারে। বিশেষত যখন স্বভাবে সেটা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে?

দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০) কাব্যচর্চায় আহসান হাবীব নগর জীবনের মানুষ। মধ্যবিত্ত জীবন প্রবণতায় ফেলে আসা অতীত, নস্ট্যালজিয়া, কৃতার্থতার আহ্বান—এসব আছে এ কাব্যে। দীর্ঘ সময়ে কবিঅভিজ্ঞতা, এ দেশের সত্তরের বাস্তবতা, অনিশ্চিতি, অনিরাপত্তার প্রকরণ তৈরি হয়। আত্ম-অস্তিত্ব নিয়ে প্রেরণার প্রত্যাদেশ পান কবি। লেখেন "আমি কোনো আগন্তুক নই"। এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, প্রসিদ্ধি পায়, কারণটি চিত্ররূপময় গ্রামীণ ক্যানভাসের ঘনবুননিতে নির্মাণ। মধ্যবিত্ত শুধু চীৎকারে নয়, চেতনার অন্তঃস্তলের প্রতিকৃতিটিতে আর অনিবার্য আবেগের সূত্রানুসন্ধানে—যেটি কবিচেতনায় হয়ে উঠেছে প্রখর ও প্রদীপ্ত :

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী

সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পূবের পুকুর। তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যে, এ শ্রেষ্ঠ কবিতাটি ছাড়া "আমি আছি", "আবহমান", "যতবার ভোর হলো","সারস","কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে","যাবার আগে", "তুমি যখন বলো" সুন্দর কবিতা। এসব কবিতায়, প্রকৃতির অভিব্যক্তি ব্যক্তি-সত্তাকে ঘিরে। সে ব্যক্তির স্বরূপটি বাংলাদেশের আধা-পুঁজি ও আধা-সামন্ত সমাজ-আশ্রিত। মধ্যবিত্ত এখানে অচরিতার্থ, স্বার্থবুদ্ধিচালিত, কৃত্রিম, কৃতঘ্ন, প্রতারিতও বলা চলে। সমাজ-সম্ভূত ইত্যাকার বিষয়সমূহ এ কবিতাগুলোতে অনির্বচনীয় ইঙ্গিত সৃষ্টি করেছে। গদ্যপংক্তিটি আহসান হাবীবের পক্ষে 'ভোরের রোদ পোহাতে পোহাতে যারে/ যতদূর ইচ্ছে চলে যা' কিংবা 'শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা' এসব কী মাত্রার আধুনিক সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না

"পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ" থেকে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখে* (১৯৮৫) অবতীর্ণ হলে মধ্যবিত্তের যাবতীয় প্রবণতার স্বরূপটি আমাদের চোখে পড়ে। এখানে কবি-অভিজ্ঞতা আরও কঠোর-কঠিন। বিশুদ্ধতার স্মারক স্তম্ভটি উন্নত মাত্রার, রুচি-আরাধ্য। তবে কবি ফিরে আসেন প্রাচীনে, অতীতে, বড় হওয়া স্বপ্নের ভেতরে। পূর্ণাঙ্গরূপে নিজের প্রবণতায় হাজির, তবে সেখানে অবগাহন হয় রাজনীতি, স্বার্থবুদ্ধি। কবির রূপকল্প সে পথেই তৈরি। চিলকে ওঠা প্রকৃতি, আর তার ডানায় কবির স্বপ্নমাখা রাজহংস যেন ছুটে চলে। এমনটা তো মধ্যবিত্তই। নিজেরই দর্পণ। কিন্তু বিদীর্ণ, তা কেন? হতাশার ক্লান্তির সৃষ্টি, সমসাময়িকতার ভেতরে। নিজের সময়কে পারেন না মেলাতে। এক রকমের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আছে, একাকী লেখার ধ্বনিটুকু যেন আত্মার আরতি। ঐ তপ্তধ্বনির ভেতরে জীবনীশক্তি নিয়ে তুমুল আশাবাদ। "বালক ও পাখি" চমৎকার আঙ্গিকের কবিতা

অস্থিমজ্জায় আপাদমস্তক নিরঙ্কুশ মানবতাশুদ্ধ কবি ক্রমশ উত্তরণ ঘটিয়েছেন নিজেকে দেশি-বিদেশী পুরাণে, উপমা-চিত্রকল্পে, বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ গদ্যচালে, গল্পকথনের ঢংয়ে বা কখনো রাষ্ট্র-রাজনীতির দিকে মুখব্যাদান ভঙ্গিতে। কবির প্রেমের কবিতা বেরোয় ১৯৮১তে। আহসান হাবীবের কবিতা কখনও প্রত্যক্ষ নয়, অন্তরের আর্তির প্রচার নয়—ব্যক্তির পূর্ণায়ত ভাবাবেগ যেন একেবারে অপাপবিদ্ধ মনের। কবি কবিতাকে এবং তার মনোলোকের বাসিন্দাকে সেইদিকেই চলিত করেন। সমস্ত বাস্তবতাকে আশ্রয় করে এবং কবিভাবকে সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশের জন্য প্রখর সংযমকে তিনি কাজে লাগান। এটাই আহসান হাবীবের কবিসত্তার সবচেয়ে বড় সিদ্ধি। যেখানে কবিতা বা কবিস্বরের অন্তর্দাহই তার অনিবার্যতা।

চার.

আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪)

চল্লিশের মেধাবী—প্রাচুর্যময় কবি আবুল হোসেন। রবীন্দ্র-নজরুল সান্নিধ্যধন্য, বাংলাদেশের কবিতার প্রত্যুষ-লগ্নের কবি তিনি। দীর্ঘকবিতা পরিক্রমায় তিনি নিজস্ব ভাষারীতিতে সমকালকে নবায়ন করেছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পুরোদস্তুর নাগরিক। 'ফুসফুসে সীলমোহর', 'থ্যাতলানো থাম', 'ট্রাম-মোটর', 'পোড়া চামড়া', 'বেয়নেট' এমন চলতিশব্দ দিয়ে প্রথম বিপ্লব ঘটান কবি। ফ্রি-ভার্সের সার্থক প্রয়োগ করেছেন তিনি। কবিতাকে নামিয়ে এনেছেন দৈনন্দিন ব্যবহার্যের মুখে। পূর্ব-পাকিস্তানি কবিতার প্রস্তুতি-ভিতে, নতুন সৃষ্টিতে; তারুণ্যের প্রেরণা নিয়ে তাঁর বীজবপন—অতঃপর অগ্রসর ও উত্তরণ। অনুভূতির স্তরে একালের রাজনীতি, বাস্তবতা স্বীকারে আসে : 'যায় যায়, সব যায়/ ধর্ম, সত্য, নীতির কঙ্কাল আজ ধুলোয় লুটোয়।/ মানুষের বেশে ঘুরে বেড়ায় হায়েনা সারাদেশে'—এরূপ ভাষ্যে তিনি সাবলীল এবং মার্জিত। রবীন্দ্র প্রশংসাধন্য *নব-বসন্ত* (১৯৪০) কলকাতায় ছাপা হয়, এন্টিক কাগজে। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসুসহ অনেকের সাহচর্য তাঁর আধুনিক রুচি গঠনে সাহায়তা করেছে। কবিতাচর্চায় তিনি গতানুগতিক নন, নিজেই বলেছেন : 'আবেগ হচ্ছে কবিতার প্রথম উপকরণ। হৃদয়ে আবেগের তোড় না থাকলে কখনো কবিতা হয় না। কিন্তু সেই আবেগ যাতে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সে সম্পর্কে কবিকে সবসময় সাবধান থাকতে হয়। সেখানেই তার শিল্পকর্ম। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা লিখি না... আমি সেন্টিমেন্টের বিরোধী নই, সেন্টিমেন্টালিটির বিরোধী। তাকে সত্যিই ভীষণ ভয় পাই।' উত্তীর্ণ এবং স্বকাল অবলম্বি আবুল হোসেন সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির বলেছেন :

> আবুল হোসেনের কবিতায় যে স্বকীয়তা সেটা বেশি প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিরস সংলাপে'। আপনারা এই বই-এর অনেক কবিতা, যেমন 'বাংলার বাঘ', ফজলুল হককে নিয়ে লেখা, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শাহাদত হোসেন মারা যাওয়ার পর লেখা 'জনৈক কবি নাট্যকারের মৃত্যুতে' কিংবা নজরুল ইসলামের ছবি দেখে' এ সব কবিতা অনেকেই পড়েছেন। কী চমৎকার এসব কবিতা! এই বইতে অনেকগুলো গদ্যকবিতাও আছে। এগুলোতে তিনি এমন একটা ভঙ্গি দিয়েছেন, এমন একটা ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় না, আমাদের কবিতায় দেখা যায় না এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় না।

কবি ছুঁয়েছেন আধুনিক কাব্য আঙ্গিকের ব্যতিক্রমী কিছু। বলতে গেলে, বাঙালি মুসলমানের বাংলা কাব্যচর্চার আধুনিকতার ঊষালগ্নটি দুর্দান্তরূপে স্পর্শ করেছেন

তিনি। প্রকৃতি বিচ্ছুরিত রোম্যান্টিক রং কবির বিশ্বাস ও শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে যেন এক রথে মিলেছে। তাঁর শব্দ ও চরণ ঋজুরেখ :

সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড
জেরুজালেম
ঘুম ঘুম ঘুম
তবুতো আজও স্বপ্ন দেখি
তবুতো হৃদয় করে আহও টন টন
তবুতো শোণিতে জাগে অনিরুদ্ধ দুর্বার প্লাবন
তবুও তবুও।

মূলধারা-অনুবর্তী কবিতার মতো আবুল হোসেন ছন্দ বা আঙ্গিকের প্রথানুগ পরিচর্যা করেননি, ফলে তাঁর কবিতার পাঠক বেশি নয়—মুক্তছন্দ ব্যবহার করেন, অন্ত্যমিল-মধ্যমিল রাখেন, অনুপ্রাস ব্যবহার করেন। আমরা জানি, সফল গদ্যকবি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। কিন্তু তাঁর মতো বেপরোয়া ছন্দ ভাঙ্গেননি আবুল হোসেন, প্রথাবদ্ধ ছন্দের ভেতরেই নিজস্ব কারুকাজ সম্পন্ন করেছেন। *বিরস সংলাপ* (১৯৬৯) (১৯৪০ থেকে ১৯৬৯ সময়ে লেখা), *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস* (১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (১৯৮৫), *Selected Poems of Abul Hussain* (১৯৮৬), *এখনও সময় আছে* (১৯৮৬), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৭), *রাজ রাজড়া* (১৯৯৭), *আর কিসের অপেক্ষা* (২০০০), *রাজকাহিনী* (২০০৪), *যাবার আগে* (২০১০) আবুল হোসেনের কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অনুবাদ কবিতা : *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৮), *অন্য ক্ষেতের ফসল* (১৯৯০)। আবুল হোসানের *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে ২০১০ সালে।

২.

'Abul Hussain, like Ali Ahsan, is well-read in both Yeats and Frost. The former has translated some Yeats in to Bengali, but has not sought to capture the grandure and enchantment of Yeats imagery- an effect which the great Irish poet achieves so effortlessly...—সে অর্থে বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে আবুল হোসেন প্রথম আধুনিক ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীবের কবিতাগ্রন্থের আগেই *নব-বসন্ত* বের হয়, রবীন্দ্রনাথকে তা উৎসর্গীত, 'প্রিয় কবির তালিকায় রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু রবীন্দ্র প্রভাব তাঁর লেখায়' বিশেষ করে *নব-বসন্তে*। ত্রিশোত্তর কবিগণই প্রিয় ও প্রভাবিত তাঁর লেখায়, পাশ্চাত্যের ইয়েটস্-ফ্রস্টও। স্মর্তব্য, পূর্ব-বাংলার এ মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম কবি কবিতাকে উৎসে ফেরালেন,

পূর্ণতর আধুনিক করে। 'আধুনিক কাল নিঃসন্দেহে রোমান্টিসিজমের পরিপন্থী'—স্বপ্নে ডোবার কাজ একালের কবিদের নয়, কারণ :

আমরা কি বেঁচে আছি? এই কি জীবন।
বন্ধ ঘরে কানামাছি এ জীবন নিরূপায় খেলা
নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর। ("শেষ যুক্তি", *বিরস সংলাপ*)

তাঁর কবিতায় ঘিরে থাকে স্বকাল, সমাজ। ব্যক্তিমনন প্রগাঢ়, ব্যক্তিতেই বিশ্লেষণভাবাপন্ন আবুল হোসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তর, ব্যক্তিত্বে স্থির, সিদ্ধান্ত স্বকালবিদ্ধ—প্রেম-প্রণয় নির্দ্বন্দ্ব। অভিজ্ঞতা সীমিত মনে হয়, বীক্ষণও সে মতেই প্রতিষ্ঠিত। ক্রমবিকশিত, স্থিতধী আয়ত্ত পরিসর, নিঃসন্দেহে আহসান হাবীবের মতো অক্রিয় বা শাশ্বত-প্রকৃতিকাতর মৃদুমগ্ন নন। ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, মূল্যবোধের দ্যুতিতে ভাস্বর, আহসান হাবীবের মধ্যবিত্ত বয়ান থেকে তুমুল পার্থক্য প্রকাশিত। অপরদিকে সৈয়দ আলী আহসান থেকে পূর্ণায়ত পৃথক। আবুল হোসেনের এ ব্যক্তিত্বটি ত্রিশের কবিদের চর্চা বা ইয়েটস-ফ্রস্ট প্রভাবে—নিরন্তর যা তাঁকে মননে ঋদ্ধি দিয়েছে—সুযোগ করে দিয়ে পরীক্ষার ব্যাকরণে নিমজ্জনে:

আজও
দিনের রাতের যত হোঁচট এড়িয়ে
ছুটির মেলার ভিড়ে আঁচল ওড়ানো ছবি দেখে
বুকের বিকেল ভরে সিনেমার গানে
বউ-এর ছেলের কান্না ভুলে মাঝে মাঝে
সিগারেট ধরিয়েনি গলির দোকানে—
এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে?

'সারারাত খেটে চিত্রকল্প ঘেঁটে/ উপমার আলোজ্বলা পথে গেছি হেঁটে'—অলঙ্কার ব্যবহারেও একই রকম সচেতনতায় পংক্তির বিনির্মাণ চলেছে। কার্যত *বিরস সংলাপ*ই কবির প্রকরণ-নির্ভর গ্রন্থ, পরের কাব্যগ্রন্থে বোধ করি তারই অনুবর্তন পরিলক্ষিত :

আমার চারপাশে মরা, আধমরা,
মানুষের কি পাহাড়, ইলেকট্রিক কাঁটা তার,
ওপড়ানো গাছ, ধ্বসে পড়া দেয়াল, পাজর ভাঙা
রাস্তায় ছড়ানো ছিটকানো ঝড়,

কিংবা,

হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস,
সংস্কারের দড়ি ছিঁড়ে
তুই ঝাঁপ দিয়েছিলে

নতুন পথে চাওনি ফিরে

... ...

ধরিয়ে দিলে রক্তের নেশা

তোমার পথই পথ আমারও

প্রতীক, চিত্রকল্প ছাড়াও বাক্যবিন্যাসে, distortion, inversion-এ আবুল হোসেন ব্যতিক্রমী, ত্রিশোত্তর কবিকুলের পরিবাহী। 'পিরামিড', 'মমি', 'মূষিক', 'হাওয়া', 'ঘোড়সওয়ার', 'স্বগত'—প্রভূতমাত্রায় আধুনিক অলঙ্কারে ভূষিত ও ব্যঞ্জিত। পূর্ণাঙ্গ সচেতন অর্থেই তা কাব্যপংক্তিতে বিরাজিত। কবিতার ছন্দের পরীক্ষাতেও একই ভাষ্য প্রযোজ্য। বাঙালি মুসলমানের হাতে এমন কাব্য-পরিচর্যা একদিকে যেমন সাহসী অন্যদিকে তেমনি অভিনব। *নব-বসন্তের* রোমান্টিক রঙে কবি এখনও প্রীতিময় ও স্বতঃধার।

৩.

আবুল হোসেন বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে তার স্বকীয় চিন্তা ছিল। বাংলা একাডেমি থেকে বের হওয়া তার অনুবাদ *অন্য ক্ষেতের ফসল* সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়। অন্যরকম পরিচর্যার চাপ আছে গ্রন্থটিতে। তিনি বলেছেন : 'বিদেশী কবিতা পড়তে গিয়ে যখন কোন কবিতা ভালো লেগেছে এবং মনে হয়েছে ওটা তর্জমা করে দেখা যায়, তখন সে কাজে হাত দিয়েছি। এই বইয়ের কবি ও কবিতাগুলো নির্বাচনের সূত্র এটাই। সেজন্যেই এই বইতে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে উর্দু এবং আভর ভাষার কবিতা ঢুকে গেছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য এসে মিশেছে। ইংরেজ, মার্কিনী, ককেশীয়, পাকিস্তানী, সাদা-কালো ও তামাটে বসেছেন একই টেবিলে। এঁদের দেশ, ভাষা, পরিবেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ব্যবস্থা ভিন্ন।' খুব চমৎকার এই গ্রন্থটিতে রয়েছেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, মুহম্মদ ইকবাল, রবার্ট ফ্রস্ট, এজরা পাউন্ড, টমাস স্টার্নস এলিয়ট, ল্যাংস্টন হিউজ, জন বারিম্যান, রসুল হামজাটফ। একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথার পর কিছু কবিতার নান্দনিক অনুবাদ করেছেন আবুল হোসেন। এ অনুবাদে কবির কবিত্ব চিহ্নিত। কবিভাষা নির্বাচনে নিজস্বরীতিই প্রয়োগ করেছেন, ইয়েটস এতে করে হয়ে উঠেছেন এদেশীয়, প্রাচ্যীয়—আধুনিক। একটু পরীক্ষা করে নিই, ইয়েটস-এর "For Anne Gregory" থেকে :

Never shall a young man,
Thrown into dispair
By those great honey-coloured

Ramparts at your car,
Love you for yourself alone
And not your yellow hair.

এমন পংক্তির দুর্দান্ত অনুবাদ করেছেন আবুল হোসেন। আটপৌরে ভাষায়, নিরাভরণ ছন্দে তার প্রকাশরূপ এ গভীর এবং মহৎ প্রণয়বাঞ্ছিত :

তোমার কানের পাশে ঐ মধু-রঙের বিশাল দেয়ালগুলোয়
হতাশ যুবক কক্ষোনো ভালো-
বাসবে না তোমাকেই,
তোমার হলদে চুল নয়,
কেবল তোমার জন্যেই।

এমনি ইংরেজি কবিতায় এলিয়টের অনুবাদও বেশ আকর্ষণীয়। "জানালার ধারে সকাল"-কবিতার শেষ স্তবক থেকে তুলে ধরছি :

কুয়াশার বাদামি ঢেউগুলো সড়কের তলা থেকে
ভাঙাচোরা মুখগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে
আর ছিঁড়ে আনে কাদাভর্তি স্কার্টপরা এক পথচারীর
অকারণ হাসি, যা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে
ছাদের কাছাকাছি এসে মিলিয়ে যায়।

মূলের ভাব কাছাকাছি কিন্তু পুরোটাই আমাদের ঐতিহ্য ধরে উপভোগ করা যায়। এক স্বতন্ত্র বাকরীতি—যেটি *বিরস সংলাপ* কিংবা *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহসের* মধ্যেও মেলে।

৪.

বাংলাদেশের কবিতায় আবুল হোসেন আদ্যন্ত আধুনিক। সে রীতিটি একপ্রকার নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কবিতাকে ফর্মাল নয়, মানুষের নিকটে, প্রাত্যহিকতার করিডোরে পৌঁছে দিয়েছেন। সেজন্য শব্দ হয়েছে গভীর এবং বাকপ্রতীমায় তৈরি হয়েছে বাড়তি মাত্রা। 'বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক যে রীতিটি *নববসন্ত* দিয়ে শুরু হয়েছিল ত কোনোসময় সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়নি, দ্বিধান্বিতও নয়। হয়তো তিনি প্রভাবের দাপট আনতে পারেননি, পরের কবিদের চিন্তায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থৈর্য নিয়ে নিজের বিশ্বাসেই অটল ছিলেন। দীর্ঘ জীবনের যে জার্নি তাতে তার সম্মুখ প্রতীক্ষা ছিল—এ প্রজন্মের কবিদের নিয়ে। সে অভিজ্ঞতাটুকু অভিনব কিছু নয়, প্রত্যেককের চর্চার ভেতরেই তা আছে—সেটি অনেকেই এগিয়ে নিয়েছেন। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং তার পরবর্তী অনেকেই। কবিতা তো পেছনের জিনিস নয়, মননের ভেতর দিয়ে

চিরনবীনের পথ অবমুক্ত করবে, সম্মুখে এগুবো। সেটি তাঁর লেখায়ই আছে, অনুসরণীয় হবেন তিনি এভাবেই।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সৈয়দ আলী আহসান কবিতাচর্চার প্রথমদিকে ইসলামি আদর্শকে ধারণ করেন কিন্তু পরে রোম্যান্টিক আবেগ ও বুদ্ধির সমন্বয়ে কবিতা লেখেন। *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৪৪) গ্রন্থে প্রথমদিকের আদর্শভিত্তিক কবিতাগুলো আরবি-ফারসি শব্দের প্রচুর্যমণ্ডিত। পরে পাশ্চাত্য কবিদের মনন তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়। শব্দের অনুষঙ্গে যুক্ত করেন আধুনিক মাত্রা। 'তিনিই বাংলা কবিতার আধুনিক শিক্ষক' [আবিদ আনোয়ার]। কবি বলেন 'আমার আধুনিকতা আমার ধর্মচর্চায় কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন করেনি, বরঞ্চ সাহায্য করেছে। বিশ্বাস বিনয়ে এবং অন্তর্গত চৈতন্যের সাহায্যে মানুষ আধুনিকতার উন্মোচন ঘটায়। একটি কথা আমি বিশ্বাস করি যে, আধুনিকতা কখনো বিশ্বাস ও প্রার্থনার বিপরীতে কিছু নয়।'

> প্রাচীন দুর্গের কক্ষের
> শীতল অন্ধকারের মতো,
> আমি সময়ের স্বাদ হারিয়েছি

জাতিগত অবচেতনের (Phylogenic unconscious) সংশ্লেষে কবি এভাবে প্রবৃত্তীয় তাড়নাকে প্রকাশ করেন। রোম্যান্টিক হয়ে কবি সময়কে পুনরুৎপন্ন করেন:

> ক্রমান্বয়ে উত্তোলিত অন্ধকারে
> মুমূর্ষু চেতনায় আমার সময়
> আদিম জন্তু হ'ল।

এক ধরনের এ্যানিমার [পুরুষের নারীসত্তা] ভেতর 'অন্ধকার'কে প্রত্ন-মুদ্রণ করেন কবি। জীবনানন্দ দাশের ধারাটি এ পর্যায়ে অনুরুদ্ধ হলেও সৈয়দ আলী আহসান তাকে বিদ্রূপ ও উপহাসের ভেতর দিয়ে সমকালীন করে তুলেছেন। প্রশ্নবিদ্ধও করেছেন। এ পর্যায়ে তার প্রকরণও যথারীতি হয় না, গৎবাঁধা থাকে না। প্রকাশভঙ্গি চরণে অন্যতররূপে উদ্ভাসিত হয়। তা পর্যবসিত হয় পরা-অনুভূতির ভেতরে :

> সহসা ঘুম ভেঙে সকাল বেলায় যে বৌদ্রকে পাই যা জানালার কপাটেধাক্কা খেয়ে
> টুকরো হয়ে আমার মশারী ছুঁয়ে যায়, তাও যেন তার অস্তিত্বের আলোর কণা।

এভাবে কবি ক্রমশ পাল্টান, আধুনিকতার অবিনাশী রেখায়। চিত্রকল্পভূমে রঙিন করে তোলেন অনুভূতির 'আশ্চর্য উষ্ণতা'সমূহ। কবির প্রজাতিগত স্মৃতি (Phylogenic memory) বা প্রত্ন-অবশেষ (archaic remnants)ই তার মানস-পরিক্রমণ। আমার পূর্ব-বাংলার স্নিগ্ধ অনুভবের ভেতরও পূর্বোক্ত এই কল্পনার বসতি বিদ্যমান। যেটি নারীকে কেন্দ্র করেও হয়ে উঠেছে বহুস্তরীভূত, সৌকর্যমণ্ডিত– 'নতুন নারীর ক্ষেত্রে উরু পুষ্ট লাঞ্ছনা চেয়েছি/ মূর্ছিত নদীর স্রোতে দাবানল করেছি সন্ধান'।

চিত্রকল্পের মধ্যে আলো-অন্ধকার, সমুদ্র-আকাশ, গাছ-পাখি যেমন আবহমানত্ব পায় তেমনি জিজ্ঞাসারও মাত্রাবন্দি হয়। সাধারণত প্রকৃতিই সর্বজ্ঞ হয়ে আসে তাঁর কবিতায়। সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ব-বাংলার কবিতায় রূপ-রীতির আলেখ্য নির্মিতি পায় স্নিগ্ধ ও প্রশান্তিময় ইন্দ্রিয়চেতনার ব্যাপ্তিতে। *অনেক আকাশ* (১৩৬৬), *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৩৬৯), *সহসা সচকিত* (১৩৭৩), *উচ্চারণ* (১৯৬৮), *আমার প্রতিদিনের শব্দ* (১৯৭৪), *কাব্য সমগ্র* (১৯৭৪), *সমুদ্রেই যাব* (১৯৮৭), *রজনীগন্ধা* (১৯৮৮), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৬) সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যগ্রন্থ।

সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)

প্রবাসবিরহদুঃখরঞ্জিত কবি সানাউল হক। স্মৃতির পটে নির্বাচিত শব্দশৈলি। বৈশ্বিক সূত্র তাঁর পটে যুক্ত হলেও আছে দৈশিক দ্যোতনা। 'স্তনা নদী' 'পাটআঁশে জড়ানো যায়', 'উপোসী জনতা' ইমেজ-গ্রথিত শব্দবন্ধ। কবির সনেটে আছে স্বাধীন অনুভবের মগ্ন প্রকাশ। প্রধানত মধ্যবিত্ত সংরাগ রাজনৈতিক ও সামাজিক পটে রচিত *নদী ও মানুষের কবিতা* (১৯৫৬) :

> ঘূর্ণিস্রোতে নদী যেমন
> পাহাড় ভেঙে, ঘুঘুবন
> শহর গ্রাম পেরিয়ে
> বাঁকে মোড়ে কতো কটাক্ষ এড়িয়ে
> এগিয়ে চলে সীমান্ত সুদূর—

মানুষ ও প্রকৃতিভিত্তিক চেতনার প্রাধান্য হলেও ক্রমশ কবি সমাজ দুর্গতি, বঞ্চনার চেতনার দিকেও ক্রমসম্প্রসারিত হন কবিতায়। সানাউল হকের কৈশোরের নদী তিতাস, শ্যামল প্রকৃতি নির্বিরোধী সংহত রূপ লাভ করে কাব্যে। প্রবাস জীবনে রচিত *সম্ভবা অনন্যা* (১৯৬২), প্রকৃতি-প্রেম-পৃথিবীর সৌন্দর্য-সংবাদ *সূর্য অন্যতর* (১৯৬৩) কাব্য। *বিচূর্ণ আর্শিতে* (১৯৬৮)র মধ্যে কবি ধ্যানমগ্ন, মৌন; মধ্যবিত্ত কূটকচালে আবদ্ধ। বাংলাদেশের কবিতার প্রগতিবাদী ধারাতেই তিনি কবিতাচর্চা

করেছেন। *ছড়া ঘরে ঘরে* (১৯৭২) স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর প্রথম গ্রন্থ। *একটি ইচ্ছা সহস্র পালে* (১৯৭৩), প্রবাসে যখন (১৯৮১) কাব্যে মুক্তিযুদ্ধ, মানবাধিকার, দেশাত্ম ভাবনার পরিচয় বিধৃত। এছাড়া স্বাধীন দেশে কবি লিখেছেন *কাল সমকাল* (১৯৭৫), *পদ্মিনী শঙ্খিনী* (১৯৭৬), *প্রবাসে যখন* (১৯৮১), *কত রঙ কত মেঘ* (১৯৮১), *বিরাশির কবিতা* (১৯৮৩), *উত্তীর্ণ পঞ্চাশে* (১৯৮৪), *বিরতিহীন* (১৯৮৭) প্রভৃতি কাব্য।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ (১৯৩৬-২০১৩)

পঞ্চাশের নবীন কবি। একাধারে দোভাষী পুঁথির সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কবিতা লেখায় উদ্যোগী অন্যদিকে বাংলা কাব্যধারায়ও বুদ্ধি-বিবেকী বিশ্বস্ততা অর্জন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ কাব্যআঙ্গিকে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবনানন্দীয়। সনেট, অক্ষরবৃত্ত, গদ্য ছন্দে লিখেছেন। প্রেমকে পরিশুদ্ধ করে এক ধরনের ধ্রুবপদের জন্ম দিয়েছেন তিনি। প্রথম কাব্য *জুলেখার মন* (১৯৫৯) থেকে কবিচেতনা উত্তরিত। *অন্ধকারে একা* (১৯৬০), *রক্তিম হৃদয়* (১৯৬৬), *আপন ভুবন* (১৯৭৪), *মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাব্যসম্ভার* (১৯৮০), *বৈরিতার হাতে বন্দী* (১৯৯৬) প্রভৃতি।

আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬)

বিভাগোত্তরকালে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্রধারা তৈরিতে আবদুল গনি হাজারী অন্যতম। ষাটের দশকেই রচনা করেছেন তিনি তিনটি কাব্যগ্রন্থ। *সামান্য ধন* (তারিখবিহীন, সম্ভবত ১৯৫৯), *সূর্যের সিঁড়ি* (১৯৬৫), *জাগ্রত প্রদীপে* (১৯৭০)। এ কাব্যগ্রন্থগুলো আবদুল গণি হাজারীর কবিসত্তাকে নির্মাণ করেছে। তাঁর কবিচৈতন্য সম্পর্কে বলা চলে : আবদুল গণি হাজারী যে জীবন পটভূমির উন্মোচন ঘটিয়েছেন কবিতায় তা কখনো নৈরাশ্যে আকুল হয় না, পঙ্গু হয়ে যায় না বেদনার গহীন অতলে—পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কতিপয় আত্মভূক, অতীতচারী ও বৃহন্নলারূপী কবিকর্মীর মতো।' গণি হাজারীর ব্যক্তি জীবনাভিজ্ঞতা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের দমন-নিপীড়ন এবং চণ্ডনীতির সমালোচনা করে *কালপেচাঁর ডায়েরী* রম্যরচনা লেখেন। এছাড়া *বন্দী বিবেক* নামে যুক্তিনিষ্ঠ একটি গ্রন্থে সমাজ, দেশ-রাজনীতি, কাব্য সমালোচনা করেন। কবির কাব্য সমালোচনায় এক পরিমার্জিত উন্নত কাব্যবোধের সন্ধান মেলে।

সামান্য ধন আবদুল গণি হাজারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন : '*সামান্য ধন*-এর কবির মনোভঙ্গী আধুনিক কাব্যধারার আওতার বাইরে পড়ে না। কবির একটি বিশ্লেষণপন্থী স্বভাব বইটিতে

ছড়িয়ে আছে। বক্তব্য ও রুচি ও তার আধুনিক মানসিকতারই পরিচয় স্পষ্ট করে।' *সামান্য ধন* কবির মধ্যবিত্ত মননধর্মের স্মারক, নগর জীবনের বসতি, সাংবাদিকতার সূত্রে রাষ্ট্র ও তার প্রশাসন যন্ত্রের বিচিত্র কার্যকলাপ তার অভিজ্ঞতার আকর :

ক্লাব রেস স্টেডিয়াম
মধ্যবিত্ত মনের আশ্রয়
প্রত্যেক মাসেই কোন আন্তর্জাতিক মেলা দেখো

মধ্যবিত্ত মনের আশ্রয় কি? সিনেমার ব্রোসারী, অরেঞ্জ, আইসক্রীম, কফি খাওয়া কিংবা রমনার শালবন, মেহগনী সেগুনের বনে সময় কাটানোর ইচ্ছে। কবির শ্লেষাত্মক উচ্চারণ :

মধ্যবিত্ত জীবনের সুউচ্চ আশার
সংকীর্ণ কারার এই নোনা-ধরা পাণ্ডুর প্রাচীরে
দিনের রাতে মাথা খোঁড়ে নির্বোধ বাসনা।
... ...
এ কঠিন কারা থেকে মুক্তি নেই কোন মুক্তি নেই
... ...
তোমার বিস্তীর্ণ মাঠ, সবুজ সবুজ
তোমার শস্যের ক্ষেতে পলাতক বাছুরের মত
উদার আকাশ আর, ক্ষেতের আত্মীয় ঘন রঙ
আহা, পাগল করে গো।

আবদুল গনি হাজারীর এ কবিতার উক্তি সরল, হৃদয়বেদ্য। কবিতাটির আঙ্গিক শিথিল নয়, ভাবনার শেষ প্রান্তে কবি স্বাভাবিকভাবেই ব্যঞ্জনা এনে তাতে আর্থ-সমাজের যে অর্থারোপ করেছেন তা বৈষম্য ও কৃত্রিম সমাজের ইঙ্গিতবাহি।

সূর্যের সিঁড়ি কাব্যগ্রন্থে আবদুল গনি হাজারী পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত। এ কাব্যে "মিসেস ডিয়োরের মন", "পি-আর-এসের স্টীমার: গোয়ালন্দ", "প্রেস ক্লাবে তোমরা", "ফেরী ঘাটে রাত্রি", "গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন, প্রত্যেক রাত্রি", "সূর্যের সিঁড়ি", "দেয়ালির জন্য", "জননী জন্মভূমিশ্চ", খুব ভালো কবিতা। *সামান্য ধন*-এর কবি এ কাব্যে অত্যন্ত তাৎপর্যমুখর। "কতিপয় আমলার স্ত্রী" থেকে:

আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী
সকাল থেকে সন্ধ্যা
কোন মহৎ চিন্তার কিনারে
এবং ফ্যাশান পত্রিকার বিবর্ণ পাতা

দৈনিক কাগজে সিনেমার ইস্তেহার
স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উলঙ্গ ছবি
এবং একটি প্রাপ্ত-প্রায় মহত্ত্বের শিহরণ

"সূর্যের সিঁড়ি", "পিরামিড" এবং "নির্জন যখন-১" ও "নির্জন যখন-২" পর্বের কিছু কবিতায় গনি হাজারী ফিরে গেছেন ইতিহাসে, পুরাণে। এসবের মধ্য দিয়ে কবির আশাবাদ ও ইতিবাচক ভাবনার পথ কিছুটা উন্মুক্ত হয়েছে। "স্বপ্নের বীজানু"র মধ্যে কবির আশাবাদ, "মানিপ্লান্টের লতায়", "ডালিয়াটায়" কবি কালকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাঁচার জন্য, স্বপ্নের উদ্বোধনে জীবনে জয়গান করার জন্য ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে স্মৃতিচারণায় কবির আশাবাদ :

সূর্যের সিঁড়ি বেয়ে আমরা
বরং পৃথিবীতে নামবো
ঈশ্বর থেকে কেননা
পৃথিবীর পলি
নীল নদীর নিষেক
এবং ফেলাহিনের প্রত্যাশী কণ্ঠে
আমার জীবন
আমার মৃত্যু নিহিত
পিরামিডের শস্যকনার মত
মৃত মানুষের উর্বর ইতিহাসে।

শস্য দেবতা আইসিস, স্ফিংস ইত্যাদি একটা আশাবাদেরই দ্যোতক হয়ে এসেছে। "পিরামিড" কবিতায় কবি উচ্চারণ করেছেন 'আমরা স্বর্গে যাচ্ছিলাম রৌদ্রের সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু পা আমাদের না স্বর্গ না নরক।' পুনর্জীবন প্রাপ্ত ওসিরিস দেবতাকে স্মরণ করে কবি এক ধরনের মৃত্যচিন্তাকেও যেন সঙ্গী করে নেন। কবির '*নির্জন যখন*-এর কিছু কবিতা জার্মানীতে বসে লেখা। সমসাময়িক জীবনের হতাশা যখন কবির রোমান্টিক সত্তাকে দখল করে বসে তখন আশাবাদ, মৃত্যুচিন্তা, পুনর্জীবনের আকাঙ্খা ইত্যাদি আধুনিক কাব্য বৈশিষ্ট্য সহজসিদ্ধ প্রকরণেই অন্য কবিদের মতো গনি হাজারীকেও অধিকার করেছে। গণি হাজারীর কবিসত্তা বৈচিত্র্য অনুসন্ধানী। অভিজ্ঞতার জারণে আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে *সামান্য ধন* থেকে যাত্রা শুরু করলেও, *সূর্যের সিঁড়ি* এবং *জাগ্রত প্রদীপে* কাব্যে তিনি কবিতার আয়ুধ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতা ইতিহাসের মাত্রায় যুক্ত—পঞ্চাশের কবি-ব্যঞ্জনায়, বাক্-বৈদগ্ধ্যে ও ব্যক্তিত্বে। তিনি বরাবরই সহজ ও স্বাভাবিক। গাম্ভীর্য ও প্রচ্ছন্ন গর্বের স্বীকারোক্তি *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* (১৯৮১) লিখে নিজের অস্তিত্বের-ঐতিহ্যের ঘোষণা দেন। অনবদ্য, প্রাণোচ্ছল এক বার্তা ধ্বনিতরঙ্গে দ্রুত মরমে পৌঁছায়; ছড়ায় সর্বস্তরে—মুখে মুখে। তারপর *সাতনরী হার* (১৯৫৫), *কখনো রং কখনো সুর* (১৯৭০), *কমলের চোখ* (১৯৭৪), *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা* (১৯৮২), *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* (১৯৮৩), *আমার সকল কথা* (১৯৯৩), *মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ* (২০০২), *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*। ছড়ার ছন্দে তাঁর বেশি আগ্রহ; গ্রামীণ প্রকৃতি ভেসে বেড়ায়—ফেলে আসা কাতরতায়। আবেগের নিঃশ্বাসে শহুরে চিত্তে ভর করে গ্রাম। প্রকরণে পাওয়া যায় দ্রুত লয়ের, হ্রস্ব পংক্তিমালা। উপনিবেশ-উত্তর কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক বাস্তবতার পরিমণ্ডলে অস্তিত্বের সংস্কৃতিকে তুলে আনেন কবিতায়। 'মা'-কে বিপুল করে তোলেন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। সন্তানের জন্য মায়ের অপেক্ষা কিংবা মায়ের শাশ্বত গৌরব কবিতায় প্রতিফলিত করে তোলাই শুধু নয় এমন অনুষঙ্গি ধারাটি সৃজন করে পৌঁছে দেন তিনি বাংলাদেশের কবিদের কৃতাঞ্জলিপুটে। এক পর্যায়ে তাঁর কবিতাচর্চায় একটা বাঁক বদল হয় "আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" থেকে। এক্ষেত্রে বাংলা কবিতার গীতল ধারাটির বদলে কাহিনিকেন্দ্রিকতা তৈরি হয়। ছড়ার ছন্দের সঙ্গে কাহিনি কবিতার ফর্মটি যুক্ত করেন। আর ক্রমশ হয়ে ওঠেন উপনিবেশ মুক্তির পরে জাতীয় চেতনার সৃজনের স্বপ্নদ্রষ্টা। "বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা" কবিতাটি তার প্রমাণ। এতে ভূমি-মাতৃকার অস্তিত্ব-সংবেদনা এক নিজস্বতায় পর্যবসিত। কবি সেখানে ইউরোপীয় নন কিংবা বহির্দেশীয় কিছু আরোপ করে নয়—পূর্ণাঙ্গ স্বদেশী ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে নিজস্বতায় বর্ণিল করেছেন। এইটিই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ভিন্নতা। 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা'য় যে গার্হস্থ্য মমতা, স্নেহ-আশ্বাস মেলে তা কবির দীর্ঘ অবসরে আশিতে এসে পায় প্রগল্ভতা ও প্রার্থনার প্রতিরূপ। এ সময়ে যুক্ত হয়েছে পুনরুক্তিনির্ভর প্রাত্যহিকতা আর কাব্যকথার দীর্ঘায়ত অবয়ব। স্বদেশ স্বকাল বার্তাকেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর কবিতায় এমন প্রকরণে যুক্ত করেন। বিশেষ করে "বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা" কবিতাটিতে 'বৃষ্টি' ও 'সাহসী পুরুষ' যেন প্রফেটিক ভাষ্যে উদ্‌যাপিত। একটা আলোকবর্তিকা আর প্রত্যাবর্তনকামী পুরুষ—সে যেন ফিরে এসেছে অপাপবিদ্ধ চেতনায় সামূহিক শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য। 'স্থিতধী বৃক্ষের মতো/ ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করেছি/ আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি' টোটেম ব্যঞ্জনায় 'বৃক্ষ' জ্যোতির্ময়রূপে পরিগণিত। মাটিভূমির সংস্কার সত্যে একপ্রকার স্তোত্রগীত মরমে পৌঁছয়।

সেখানে সব ভ্রান্তির অবসান যেমন হয় তেমনি আশাবাদও ব্যক্ত হয়। প্রধানত লোকায়ত নন্দন তাঁর কবিতার অনেকটা অংশ জুড়ে পরিবেশিত। এতে করে শাব্দিক ইমেজ ও অনিবার্য প্রত্ন-কাঠামোটি কবিসত্তার চেতন-অবচেতন স্তরে পরিচর্যা পায়। এক্ষেত্রে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ছন্দ বেশ ধ্বনিময় এবং সোচ্চার-সুললিত। কিছু ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমার কবিতাও আছে। যা তাঁকে আলাদা মাত্রিকতা দেয়।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)
বাংলাদেশের কবিতায় সৈয়দ শামসুল হক একটা বলয়ের অধিকারী, নিজস্ব সে বলয়ে অনুগামী করেছেন প্রজন্মান্তরের কবিদের। উদাহরণে *পরানের গহীন ভিতরে* (১৯৮১)র সনেটগুচ্ছ কিংবা একবারে দিব্য উন্মীলন তাঁর কাব্যনাট্যের ভাষ্য। এসবে বিশ্লেষণমাত্রা হয়ে উঠতে পারে বহুমাত্রিক। যেন ভরা নদীর মতো উপরিপৃষ্ঠে সৌম্য-শান্ত কিন্তু ভেতরে স্রোতস্বিনীর গতি। সৈয়দ শামসুল হক কাব্যপ্রকরণে বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরের বাংলাদেশকে স্বরূপে চিহ্নিত করেন। সেজন্য স্বদীক্ষিত, স্বচিহ্নিত তার কবিপ্রত্যয়। এ পর্যায়ে তাঁর নতুন রূপ পলিমাটির প্রান্তজিজ্ঞাসা। প্রত্যন্ত হয়ে ওঠা। উত্তর-আধুনিক সাহিত্যবীক্ষার প্রান্তস্পর্শী রূপটি উঠে আসতে থাকে। ‘রংগপুর’, কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরীর ওইসব কৈশোর গ্রাম, তার নাগরিক সত্তাটিতে আশ্রয় পায়। নাগরিক হয়েও মধ্যবিত্তের স্মৃতি নস্ট্যালজিয়া কিংবা প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা; ভূমিপুত্রের আহ্বান অস্তিত্ব অনুধ্যান তীক্ষ্ণধী ও মর্মপ্রোথিত। সৈয়দ শামসুল হক পৌঁছান আমাদের ‘পরানের গহীন ভিতরে’ :

> আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম আদিম,
> অরণচারী, সবুজভূক এক গোত্রের সমৃদ্ধা জননীর মতো,
> স্বপ্ন দেখেছি তার অতল অকম্পিত চোখে
> আর বিশাল নিতম্বের তরঙ্গে। কিন্তু
> স্বপ্ন ভবিষ্যতলগ্না, আর সে আমাকে
> চাবুক মেরেছে সার্কাসের মুগ্ধ সিংহকে যেমন করে
> দাঁড় করিয়ে টুলের ওপর হাস্যকর ভঙ্গিতে
> মহিলার হাতের চাবুকে মারা হয় বিদ্যুতের মতো।

কবিতা সিরিজে ‘চাঁদ’, ‘পাখি’, ‘স্বপ্ন’, ‘জ্যোৎস্না’, ‘নিদ্রা’ জীবন্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ছলকে ওঠে মরমিয়া আরতি। বাচনের ভিন্নতায় নিহিত দৃষ্টি প্রাত্যহিকতার ভেতরে সমর্পণকেই মানে। তবে অতীন্দ্রিয় মায়াটি কিছুতেই হয় না দূরীভূত। সেটাই হয়ে ওঠে লোকোত্তর। প্রেমের অপাপবিদ্ধ স্বরূপটি কাব্যে কীভাবে প্রসঙ্গ

হয়ে ওঠে তার উদাহরণ নির্বাণ কিংবা মিলনবিমুখ বিরহকাতরতায়। কিন্তু সৈয়দ হক এর বিপরীত করতে পারেন মানবতার আনন্দকে। যথেষ্ট দীপিত সে উচ্চারণ, বর্ণিল সে মোহময় মুহূর্ত :

ফেরাও ও দু'টি চোখ, ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখো না।
নাস্তির নিপুণ তীরে বিদ্ধ আমি, শোনোনি চিৎকার!—
মধ্যরাতে?

... ...

তোমার উজ্জ্বল দেহে
কশাঘাত নক্ত কামনার, নখরে সুখের হেনা,
পরিচ্ছন্ন হাসো, দাঁত বিভ্রমের মতো মেলে ধরো—
যেন যে আঁধার জাগি, হতে চাও তুমি তার চাঁদ।

এরূপে ব্যক্তিবিশেষ অনুভব লোকান্তরের বাণী অর্জন করলে অপার আলোকরেখায় তার বিপ্রতীপ অনুধ্যান অন্যটিতে বর্তায়। 'স্তব্ধ স্বপ্ন প্রণয়ের, চোখ যেন অরণ্যে আঁধার' কিংবা 'এ সংসার-পূর্ণিমার ক্ষত,/ বাজায় বিনোদ-কালে নিঃসঙ্গ সেতার' এমনটা কী দিনগত পাপক্ষয়? বিতর্ক-বিচারের এমন মুখাপেক্ষী থাকা সৌজন্যরহিত কিছু নয়।

স্বকাল তাঁর কবিধর্ম কিন্তু তিনি স্বকালের নন। কারণ যেসব প্রয়াসে তিনি কবি—দীর্ঘযাত্রার কবি সেখানে প্রাচুর্য আর বর্ণিল উৎসবে তিনি 'পুন্নিমার চান'। অপার শ্রদ্ধার একক আলেখ্য। অপরূপ রূপময়তায় অবিকল উত্তীর্ণ। এ কবিকে অসংখ্য বার্তায় বা প্রচ্ছদপটে নির্মাণের জন্য আমাদের লোকায়ত জীবন, প্রান্তসংস্কৃতি, মধ্যবিত্তের মাত্রিকতা কিংবা তার সাংস্কৃতিক আনুগত্য, প্রতিরোধী চেতনা এবং ইত্যাকার সব বিষয়ের সঙ্গে আমাদের গড়ে ওঠার পথ বা পুনরুত্থানের শক্তিসমূহ বিচ্ছুরিত করেন পংক্তিমালায়। এ কারণে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি ও রুচির বিনির্মাণের পথটি তৈরি করেন কবিতায়। সমসাময়িক সত্য প্রসঙ্গকে, নির্বিরোধী ভাববলয়কে, প্রগতির আদর্শকে, জাতীয় চেতনার অনুষঙ্গকে, মনন শক্তির অনুপ্রেরণায় কবিতায় প্রোথিত করেন কবি। "অনুজার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে", "পহেলা মার্চ ১৯৭১", "একাত্তরের পঁচিশে মার্চের অসমাপ্ত কবিতা", "শামসুর রাহমান, আপনার পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে", "স্বাধীনতা", "পঁচিশে মার্চ", "হাসান হাফিজুর রহমানের জন্যে", "কমরেড ফরহাদ/ একটি লোকগাথা", "টিএসসি সড়কদ্বীপে শয়ান আলমগীর কবিরকে", "আমি জন্মগ্রহণ করিনি", "ফিরে এসো রক্তাক্ত বাংলাদেশ", "মুজিবের রক্তাক্ত বাংলায়" এমন অনেক কবিতা পাঠক চেতনায় শ্রেয়বোধের জন্ম দেয়; পরিশুদ্ধ চিত্তের দায়কে অবমুক্ত করে

সমকাল চিহ্নিত দেশাত্মধারাটি সৈয়দ শামসুল হকের মধ্যে প্রাণবন্ত। এ বিষয়টিতে কবি প্রকট। অনেকাংশে বলা যায় কবির সামূহিক চেতনা আসলে দেশ-ঐতিহ্য অস্তিত্বে নিরঙ্কুশ নিবেদিত। অর্জন কিংবা প্রাপ্তির মূলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব, তার জন্ম-পরবর্তী বেড়ে ওঠা, যত্ন ও শৈশব অতিক্রান্ত কালবৃন্তে বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রেরণা—সবকিছুর মর্মমূলে থাকে বাংলাদেশ হওয়ার পথটিতে প্রতিরোধ শক্তিকে চিনে নেওয়ার পর্যায়টি। কবি এখানে আপোষহীন, আবর্তিত। পৌনঃপুনিক তাঁকে প্রান্ত স্পর্শ করে ঐ একই কারণেই। আর দায়বোধের জায়গাটিতেও তিনি নিরন্তর হয়ে ওঠেন। প্রাসঙ্গিক অর্থে, 'আমি জন্মগ্রহণ করিনি' কবিতাটি উচ্চারণে আনা যেতে পারে :

অসংখ্য কীট—কোটি কোটি কীট—
এবং সেই কীটের ভেতরে, হায় কি ভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য—
একটি এখন দ্রুতগামী বাসে চড়ে ভ্রমণ করছে দুঃখের এই বাংলাদেশে,
এমন ক্রান্তিকালের বাংলাদেশের জন্মকে কবি দেখেন এরূপ ভঙ্গিতে :
আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে ন'মাস ন'দিনের আগেই,
কারণ কাম কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারে না যেখানে চলেছে যুদ্ধ। আরও তীক্ষ্ণধী স্বরে বলেন :
আমি জন্মগ্রহণ করিনি, আমাকে জন্ম দেয়া হয়েছে,

কিন্তু 'একটি জন্মে'র কথা বলেন, যে জন্মের অপেক্ষায় অধীর কবি, গরবিনি দেশ যে জন্মের প্রতীক্ষায় আছে। কবির জন্মগ্রহণ সেই প্রত্যয়ে, যেখানে 'সমস্ত দেয়ালের আলোচালের শাদা আল্পনার ভেতরে,/ স্বপ্নের বর্ণমালার তরংগে ও সন্নিহিতিতে'... 'একটি জন্ম দেবার জন্যে—রবীন্দ্র, কি মুজিব, কি জয়নুল।' সেখানেই কবির অবিচ্ছেদ্য আশাবাদ 'আমি জন্মগ্রহণ করব... ' পৌনঃপুনিক ধ্বনিত। এখানে মূল্যায়ন তাঁর কল্পিত প্রত্যয়টির।

বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৬৯)য় সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের নজরে আসে। *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালায়* খেদোক্তির চেয়ে বেশি আছে নির্মিত জীবনের সংবাদ। পুনরায় উচ্চারিত হয় কবিতা লেখার বয়স। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় রোপিত জীবন। নিরন্তর প্রবাহিত সময়ধ্বনি একের ভেতর দিয়ে যেন প্রবিষ্ট হয় সর্বত্র, হয়ে ওঠে সর্বাধিক। আমরা মিলিত হই আমাদের পরিশুদ্ধ জীবনের সঙ্গে, আবৃত্তিতে ভর করি কালের জিজ্ঞাসু বৃত্তে। কতো নিবিড় আর মায়াবী সে আয়োজন :

বাংলার যুবক ঘুমে,

জননী ও কবি, রামসাগরের জলে
ছলছল ঘুম একা দাঁড় বেয়ে যায়—
পদ্মার ইলিশ ঘুমে, কিশোরীর স্তন
ঘুমে পূর্ণিমার মতো হতে চায়, দূরে
আমনের ধান মাথা নাড়ে।

আবার এর বিপরীতে একটু বিশ্বমেজাজ থাকে, মধ্যবিত্ত পরিবৃত্তে :

বিউটির মোড়ে,
গোবিন্দর বারান্দায়, কাসবার ভেজা
ফুটপাথে, নীলাচলে, অশ্রুর দেয়ালে,
ভিয়েতনামে, মূলারুজে, মিশৌরি জাহাজে—
সর্বত্র তোমার চিত্র শিলীভূত গতি;
পংখহীন উদ্যোগ, প্রতিভা, মৃত্যু, প্রেম
ও বিপ্লবে।

এরূপে প্রবহমান চেতনাসত্তা আরও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে সংলাপের কারণে। এক পর্যায়ে তা হয়ে ওঠে একজন নায়কের স্মৃতিতর্পণ, সর্বসাকুল্যে যা কবির বর্ণবিভাময় আত্মপ্রতিকৃতি। সেখানে শুধু বাচনিক প্রয়াস নয়, নির্মিত অবয়বটি প্রত্যক্ষযোগ্য ও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। পুরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছন্দে অবলীলায় উঠে আসে। গ্রহণ করে আলঙ্কারিক মাত্রা। তখন তা শুধু বিশেষ না হয়ে নির্বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছায়। পরিবেশিত হয় সার্বজনীন হয়ে। সৈয়দ শামসুল হকের রীতিটিতে যৌনতা, মনস্তত্ব, আর্থ-সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শ্রেণিস্তর পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিধৃত। তবে এসবের কোনোটাই আরোপিত নয়। প্রবহমান যাত্রাপথে, জীবনের টানে আটকা পড়ে ছন্দোবন্ধনে। চৈতন্যের মূর্তিটি ভেতর থেকেই সামগ্রিক সংস্কার, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ইতিকথা বা পুরাবৃত্তের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। কবির আলেখ্যটি সেখানে নির্বিকার এবং সংহত। আমাদের অস্তিত্বের স্পর্শটিই হয়ে ওঠে মুখ্য। এমনটি শুধু একজনের ব্যক্তিবীক্ষা নয়, আমাদের সামষ্টিক সম্বন্ধসূত্র, কাল এবং ঐতিহ্যের অংশীদার। *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালার* যে ধারাবিবরণী, আয়োজনের যে বিপুলতা তা এ সময়-বাস্তবতার একজন ব্যক্তির সূক্ষ্ম সুকুমার প্রবণতার অন্তরিন্দ্রিয় উচ্চারণ। বাংলাদেশের গৃহকাতর নাগরিক মধ্যবিত্ত, 'স্মৃতি' বা 'হিমহাওয়ার' আনন্দ অন্বেষী মুখফেরা আবেগ—এ বাংলার 'নদী-মাঠ-ক্ষেত' ভালোবাসার চিরন্তন আহ্বান এক লহমায় সামষ্টিক ও সামূহিক করে তোলেন সৈয়দ শামসুল হক। এর সংহত-পরিশীলিত শিল্পসৌকর্য পরম ও মহান। প্রবহমান জীবনের মতো অতীত-বর্তমান

থেকে ভবিষ্যতের দিকে নিজেকে প্রসারিত করেন। এজন্য পুরনো আঙ্গিকেরই ঘটান নবতর-উত্থান।

বাংলাদেশের কয়েক দশকের ব্যবধানে উদ্ভূত নাগরিকতা এখন অনেকরকমে সমৃদ্ধ। কিন্তু তার লোকায়ত শেকড় অনেক ভেতরে। অনেককালের আলোহাওয়ায় তা মহীরুহ। *পরানের গহীন ভিতর* ইত্যাকার উত্তরে অনন্য, সুদূরপ্রসারী ও বহুব্যাপ্ত। সৈয়দ শামসুল হকের আধুনিকতার বার্তাটি এর ভেতরেই গৃহীত। এ সময়ে তাঁর সত্তার উত্তরণ পর্বটি অন্যতম আগ্রহবিন্দু। *পরানের গহীন ভিতর* থেকে উদ্ধৃতি :

জামার ভিতর থিকা যাদুমন্ত্র বারায় ডাহুক,
চুলের ভিতর থিকা আকবর বাদশার মোহর,
মানুষ বেকুব চুপ, হাটবারে সকলে দেখুক
কেমন মোচড় দিয়া টাকা নিয়া যায় বাজিকর।

... ...

এ বড় দারুণ বাজি, তারে কই বড় বাজিকর
যে তার রুমাল নাড়ে পরানের গহীন ভিতর।

আলোচ্য সনেটগুচ্ছের মধ্যে প্রেম-প্রণয় প্রসঙ্গটি অন্বর্থরূপে বিধৃত। এর সঙ্গে জড়িত আছে স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়ার পরিবেশ। প্রকৃতি সেখানে আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতির সূত্রে সমন্বিত। প্রেমের সম্পূর্ণতায় বিরহ কিংবা রাগ-অনুরাগ-অভিসারের গুরুত্বও কার্যকর থাকে। সৈয়দ শামসুল হক প্রেমের চিরন্তন রূপটি বর্ণনার প্রচ্ছদে অঙ্কিত করনে। এজন্য তাঁর উপস্থাপন স্বরূপটি অধিকতর আধুনিক। কারণ : এক. পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় ব্যক্তির সংগুপ্ত সম্ভাবনাকে অনাবৃত করা, দুই. প্রেমের অচরিতার্থতার আলেখ্য নিরূপণ, তিন. ব্রাত্য পরিচর্যায় প্রণয়ের সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ যাচাই, চার. বাঙালি মুসলমানের গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত নীতির সঙ্গে শিল্পনীতির দ্বন্দ্বটি দেখানো, পাঁচ. রূপান্তরিত মূল্যবোধের ভেতরে কৃত্রিম প্রেমের পরিকাঠামোটির পর্যালোচনার জন্য। এজন্য কবির চরণবিন্যাসে প্রযুক্ত থাকে জিজ্ঞাসাচিহ্ন। এ প্রস্তাবনায় কিছু পংক্তির শরণ আমরা নিতে পারি :

ক) যখন তোমার দ্যাখা জানা নাই পাবো কি পাবো না,
যখন গাছের তলে এই দেহ দিবে কালঘুম,
যখন ফুরায়া যাবে জীবনের নীল শাড়ি বোনা
তখন কি তারা সব কয়া দিবে আগাম-নিগুম?

খ) যে নাই সে নাই সই, তাই সই, যা আছে তা আছে,
এমন পুন্নিমা আইজ, কোন দুঃখ দুয়ার দিয়াছো?

গ) কি কামে দুফর বেলা পাতাগুলা উড়ায় বাতাস?

আবার সে কার স্বর মাঠপাড়ে ফোঁপায় এমন?

পরানের গহীন ভিতর প্রান্ত-অনুসন্ধান বার্তাটি আমাদের প্রদান করে পরিবর্তিত সমাজ বাস্তবতার ভেতর দিয়ে। চরিত্র নির্মাণে, ঘটনার গ্রন্থনে সমস্যার প্রায়ান্ধকার রূপটি কাহিনিতে গভীর রেখাপাত করে। জীবনের ক্ষয়, সংকট, বিপর্যয় এগুলো অব্যর্থ হয়ে ওঠে। তার রেখার ভেতরে আঁকা হয় অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়ের স্বরূপ। তখন 'শিলাবিষ্টি', 'শীতলপাটি', 'আগুনের জ্বীন', 'দুধের ক্ষীর', 'মাজরার ঝাঁক' মানবের 'বিরানভূমি'র আধার হয়ে আসে। জীবনের ইতিবাচক শর্তে প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহকে কবি সম্ভাবনায় পর্যবসিত করেন। অপত্য স্নেহ, মাতৃত্ব, প্রণয় জীবন জঙ্গমের বাতাবরণে চিত্রিত হতে থাকে। সৈয়দ হকের লেখায় জীবনের এসব অনিবার্য বিষয় কিছুতেই ভুঁইফোঁড় নয়। এটা আর্থনীতিক বাস্তবতায় পরিবেশিত হতে থাকে। মানুষের ভেতরের ক্ষয়, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছেদ বা অবসাদ সবকিছু এখানে যে চিত্ররীতি অর্জন করে—সেখানে লেখক আসলে আমূল সমাজ ভিত্তির কাঠামোটিকেই পর্যবেক্ষণে আনেন। আজন্ম সংস্কার-কুসংস্কার দ্বন্দ্ব, প্রথাগত সমাজের বাইরে প্রগতি বা শিল্পের সত্যকে অবিকল করে তোলা—যেখানে মানবের পূর্ণাঙ্গ সত্যের রূপটি অবভাসিত হয়ে ওঠে।

নিনাদ (২০০৯) প্রসঙ্গে কবি বলেন : 'এই বইটি প্রধানত আমার সময় ও দেশকে নিয়ে লেখা কবিতার একটি সংকলন। দেশ বলতে যদিও বাংলাদেশকে বুঝিয়েছি; কিন্তু এর বাইরেও আমার আর একটি দেশ আছে, ইল্যান্ড—যে দেশে আমি মাঝে মাঝে অবস্থান করি। একটি আমার জন্মভূমি, অন্যটি মনোভূমি।' এ কাব্যের 'হে অমার আগুনপাখি' দীর্ঘকবিতা :

> কত কাল কাটিয়েছি কত স্বৈরশাসকের বুটের তলায়,
> চাবুকের প্রহারে প্রহারে আমি কুঁকড়ে গেছি, পউষের শীতেও কি আমি
> রৌদ্রের প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়াইনি জানাজার মতো মাঠ ব্যাপ্ত হাহাকারে?

কবির কাব্যযাত্রায় উত্তরিত পথ পেয়েছে, কয়েক দশকে। তাঁর *বুনোবৃষ্টির গান* (১৯৫৯), *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১), *বিরতিহীন উৎসব* (১৯৬৯), *প্রতিধ্বনিগণ* (১৯৭৩), *অপর পুরুষ* (১৯৭৮), *নিজস্ব বিষয়* (১৯৮২), *পরানের গহীন ভিতর* (১৯৮০), *রজ্জুপথে চলেছি* (১৯৮৭), *এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি* (১৯৮৯), *বেজান শহরের জন্য কোরাস* (১৯৮৯), *অগ্নি ও জলের কবিতা* (১৯৮৯), *কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে* (১৯৯০), *আমি জন্মগ্রহণ করিনি* (১৯৯০), *তোরাপের ভাই* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৯০), *রাজনৈতিক কবিতা* (১৯৯১), *আমার শহর* (১৯৯৫), *নাভিমূলে ভস্মাধার* (১৯৯৬), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৬), *অস্তিত্ব দিনের*

পথিক (১৯৯৮), *অধোগামী দিনের পঞ্জিকা* (১৯৯৮), *কবিতা সংগ্রহ* (১৯৯৮), *তোমার নক্ষত্র এই রক্তের লোহিতে* (২০১০), *ভালোবাসার পদাবলী* (২০১২) কবিতাগ্রন্থ।

পাঁচ.

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল কবিতার চর্চা করেছেন। 'নিজেরই সত্তা দিয়ে বুঝতে হলে তাঁর কবিতা দিয়েই... তিনি শামসুর রাহমান। তাঁর কবিতা পড়লে মনে পড়ে poetry of earth is never dead—তবু পৃথিবীকে আরো ভালবাসতে হয়—আবারও'। অতলস্পর্শী এক গভীর বিশ্বাস, গাঢ় অকৃত্রিম ভালোবাসায় বাঙময় হয়ে ওঠে তাঁর রচনা। শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয় : নাগরিক মধ্যবিত্ত চেতনা, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ, স্বদেশ ভাবনা পাঁচের দশকের কবিতা, বেরিয়েছিল ষাটে; *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যভাবে গ্রন্থভুক্ত সীমানায়। এরপর কবিতার বই বের হয় প্রত্যেক দশকে; আমৃত্যু।

শামসুর রাহমানের কবিতায় নগরজীবন, নাগরিকতা, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর বিচিত্র প্রয়াসে প্রবণতা-নির্ভর হয়ে গভীর ভাবে (idea) দীপিত হয়ে ওঠে। নাগরিক মনোজগতের বিচিত্র বিষয়, সূক্ষ্মতর সুকুমার অনুভূতি, মধ্যবিত্তের প্রেম-নৈরাশ্য-গ্লানি-হতাশা, তার রাজনৈতিক শর্তসমূহ, রাষ্ট্রীয় শাসন-শোষণ ব্যবস্থা সবকিছু 'accumulation of detail' এবং 'by the sharpness of selected detail'-এর শব্দবন্ধে তুল্যমূল্য জ্ঞান করেছেন

শামসুর রাহমান কাব্যনন্দনে ক্রমাগত হয়েছেন পরিবর্তিত। ষাটের অভিঘাত তাঁকে এদিকে চালিত করে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি হয়ে চললেন পরিবর্তিত। এবার স্বদেশ সময় ও সমাজ আছড়ে পড়ল তাঁর কবিতায়। ১৯৬৪ তে প্রকাশিত *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে প্রকটভাবে মিলল সমাজ ও স্বদেশ। তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠল কবিতা। কারণ, তখন আইয়ুবের শাসন পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম হয়েছে। শামসুর রাহমানের আঙ্গিকে ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, কালো অন্ধকার, সেই ঘোড়াটা এসব সংবেদনশীল শব্দবন্ধ জীবনানন্দ দ্বারা আলোকিত। শব্দ বিচারে মাঝে মাঝে সুধীন দত্তীয় প্রভাবও নজরে আসে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, শামসুর রাহমানের আধুনিকতা বা কবিতায় তাঁর যে আধুনিকতার মাত্রা; সেটা বহুদূরগামি। বলা চলে, ত্রিশোত্তরকালের প্রবণতার আধারে দেশজ ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে গ্রীক-রোমক-আরবিয় ইত্যাদি পুরাণ-প্রসঙ্গকে নিরঙ্কুশ

প্রয়োগ করেছেন। কবির এ প্রয়োগে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি তৈরি হয় কিন্তু তার সঙ্গে অনবদ্য যুক্ত করেছেন দেশজ আবহ। শামসুর রাহমানের কিছু পংক্তি নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে; দেশীয় সংস্কৃতির বাইরের অযৌক্তিক পংক্তিমালাকে (হরিৎ প্রান্তরে জেব্রার মতো ধাবমান বাতাস, প্যারিসের আকাশে ভায়োলিন হাতে উড়ন্ত ইহুদী) অনেকেই অর্থহীন প্রতিপন্ন করতে পারেন; কিন্তু কোনো বোধেই আধুনিক মনন চৈতন্য থেকে বিদূরিত হওয়ার অবকাশ যেমন নেই, তেমনি প্রশ্নও ওঠে না। কবির, পশ্চিম ইউরোপীয় প্রভাব নতুন কী! প্রধান বিষয়; চিত্রকল্পের তীব্রতায় প্রকাশমান যুৎসই শব্দ। সেখানে আধুনিক কবি নিজের সমাজ বাস্তবতায় গোটা বিশ্ব ঘেঁটে শব্দকে ছেনে বের করবেন; আর প্রয়োগে হবেন নিরঙ্কুশ স্পন্দনসিদ্ধ—কবিতার বাস্তব-অবাস্তবতা ইমেজের ভেতর; অন্তর্গত ছন্দের ধ্বনি-ঝঙ্কারে। সেটা যদি কবি যথার্থ করতে পারেন তবেই সিদ্ধি। মোট কথা, কবির Ethos কে জানাই জরুরি। শামসুর রাহমান বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের কবি; এ সময়ে তথ্য বিপ্লব, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নানারকমের তৎপরতা তিনি অবলোকন করেছেন—তাই জীবনানন্দ নন; ঘোষিত মার্কসবাদী নন কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রমী স্বাধীনচেতা মুক্তিকামী সাহসী কবি। সেজন্য মুক্ত বিহঙ্গের মতো, সমস্ত মিথ-ঐতিহ্য ঘেঁটে—শব্দ তুলে এনেছেন। একেবারে বাস্তবতাকে প্রকাশের জন্য—হরিৎ প্রান্তর, জেব্রার ধ্বনি যতোই অযৌক্তিক হোক; এসময়ে এমন পংক্তি কেউ কি অস্বীকার করবে! সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার প্রয়োগের সততা; প্রকাশের ক্ষমতা আর জীবনের জন্য বলার চেষ্টা—যেটা শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রকাশিত। শামসুর রাহমানের প্রকরণে এলিয়ট কথিত 'ট্যালেন্ট এন্ড ট্রাডিশনে'র ব্যত্যয় ঘটেনি। আধুনিক শর্তে নগরের বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মকেন্দ্রিকতা, নৈঃসঙ্গ্য এসেছে; শামসুর রাহমানের কবিতায় তা আছে—কিন্তু কিছুই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাঁর রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শন সবই উৎকৃষ্ট কবিতার জন্য। সে কারণে অনেক চিত্রশিল্পীর নামও কাব্যভাষা হয়েছে; অনেক ইজমের সঙ্গে সম্পৃক্তি সৃষ্টি হয়েছে আবার মাঠের-প্রান্তরের আন্দোলনেরও সংযুক্তি ঘটেছে। মোট কথা, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ অঙ্কনে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বকে—কবিতায় প্রাণিত করাই কবির কাজ। আর এ দ্বন্দ্বচিহ্নিত সমাজের শ্রেণিস্তরবিন্যাসও কবিকে প্রসন্ন ইমেজে দাঁড় করাতে হয়। কারণ, উৎপাদনশক্তি ও সম্পর্কই শ্রেণিস্তরকে তৈরি করে। 'ব্যক্তি'র ভেতরের সম্ভাব্য স্বপ্ন-হতাশা-আকাঙ্ক্ষা তথা সুকুমার বৃত্তির সূক্ষ্মতর বিষয়গুলো এ থেকেই উঠে আসে। সমাজ-কাঠামোর যে ভেতর ও উপর-নির্মাণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি—তা এমন বিবেচনায় নির্মিত।

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা,

আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দ কোনো আফিমখোরের মতো,
...   .
আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমিষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠলো, আশ্চর্য এক ফুল হয়ে
জন্ম নিলো তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত হলো সে ফুলের সৌরভ।
চকিতে নোংরা নর্দমা হয়ে উঠলো অপরূপ সরোবর,
খড়-কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, থ্যাঁৎলানো ইঁদুর, ফুলের তোড়া মণিরত্ন হয়ে
ঝলসে ওঠের ওর চোখে, আর সে নিজে উড়ে গেলো
মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্রগুচ্ছে, শূন্যের নীলিমায়।

'বেতো ঘোড়া' কে? কেন সে বাতগ্রস্ত, অসুস্থ? কল্পনার উৎসবে এই রঙীন বোতো ঘোড়া প্রকৃতঅর্থে কীসের প্রতীক! প্রশ্নটিকে নব্য-বাস্তববাদী তাত্ত্বিক আই. এ. রিচার্ডস কথিত সৃষ্টিশীল রহস্য ধারণা। যেখানে কবি সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত, কল্পনা তার সার্বভৌমক্ষম। রোম্যান্টিক বোধের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে কবি 'বেতো ঘোড়া'টিকে ইতিহাসের স্বরূপে চিহ্নিত করেন। বাস্তব ইতিহাস তাকে গ্রহণ করে দূরাশ্রয়ে। এইটি যুগবোধের নিরিখে পরিচর্যায়িত। 'ঘোড়া' একটি সামন্তসজ্জা, ধন-মান-গর্বে সে আভিজাত্যময় কিন্তু সে আভিজাত্য লুপ্ত, রোগগ্রস্ত, বিনাশধৃত। তাই কল্পিত ঘোড়াটি বাতরোগগ্রস্ত—'বেতো ঘোড়া'। এই ইতিহাসের স্বরূপ চিহ্নিত হয়, কবিতার কল্পনায়, কল্পোক্তিতে; লুপ্ত অধ্যায়কে চিহ্নিত করে। সমাজ-ধর্ম-দর্শন মিলিয়ে কবির স্বচ্ছন্দ কল্পনা তুলে আনে পরিত্যক্ত, রুগ্ন, অহম-খচিত বোতো ঘোড়াটিকে অবলম্বন করে। এখানে এই ঘোড়ার প্রাণী-সৌন্দর্য, নান্দনিকতা, বিরাটত্ব, অহম্‌প্রয়াস এক উজ্জ্বল অতীতে টিকে থাকলেও এখন তা রুগ্ন-ভগ্ন-অসুস্থ। সে কারণে তার আস্তাবল ফিকে, অন্ধকারময়, দুর্বিষহ—নিস্তব্ধও (নেশাগ্রস্ত আফিমখোরের ন্যায়)। একপ্রকার ঝিমুনিও তাতে বিদ্যমান। এই ঘোড়াকে এভাবে কল্পোক্তিময় করে একটি তথ্য পাঠকের কাছে অবমুক্ততা পায়। ঘোড়া সুস্থ নয়। কিন্তু অসুস্থ ঘোড়ার ঘোড়া-নামাঙ্কনে কী আরও কোনো কারণ থেকে যায়? আমাদের নির্জ্ঞানস্তরে 'ঘোড়া' কোনো যৌন-জুগুপ্সারূপেও চিহ্নিত কি-না! সে তো একটি ইমেজ—আবেগোদ্দীপক প্রবাহের রঙীন রূপকল্প। প্যারাডাইমও বটে। অতীত থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। অবক্ষয়িত বাস্তবতা থেকে সে পরিগণন পায় অন্য উপলক্ষ্যে। তার ঘোর কেটে যায়। কেশর ফুলে ওঠে। যৌবন-প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বহুস্তরে ধৃত হয় তার অর্থ। বেতো ঘোড়া কল্পনার প্রলুব্ধতায় হয়ে ওঠে

মেঘপুঞ্জ, নক্ষত্রগুচ্ছ। সে উড়তে থাকে জ্যোৎস্নায়, শূন্যের নীলিমায়। আশ্চর্য এ আকাশবিহারী শূন্যতার কল্পনা। কিন্তু এ কি নিছকই রোম্যান্টিকতা? তা নয়। দুটো বিষয় যেমন নৈতিক ও মানবিক ধারণার পরিচর্যায় প্রলুব্ধ এই কবি। সেখানে আবেগ এক অমোঘ শক্তিপিণ্ড। ভাষার ভেতরে যা শৃঙ্খলিত। অনেকরকম প্রয়োজনে যা আয়ুধরূপে সমুপস্থিত। এটি নিও-রিয়ালিস্টদের এক ধরনের ব্যাখ্যা। যেখানে আবেগ বা ইমোটিভনেসই মুখ্য।

বিচারবোধের ভিত্তিতে কবিতা মেদহীন, কঠিন আর পৌরুষদীপ্ত হয়ে ওঠে। পুরাণ তখন নতুন তাৎপর্যবহ :

> পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
> শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশেহারা;
> শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
> মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার।

ডেডেলাস বিরুদ্ধ সময়কে, অন্ধ-তমসাকে, ইন্দ্রিয়জ স্পন্দনে স্তম্ভিত সত্যে প্রকাশ করেন। এ আখ্যান-কথন কাঠিন্যময়, অনেকান্ত-প্রান্তস্পর্শী। ডেডেলাসের সমস্ত কষ্ট যেন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে। একাত্ম হয়ে যায়। এ রীতিতে ভয়াবহতা আবেগময় হয় না, কঠিনতা পায়। আবেগময়তা নিঃশেষিত হয় প্যারাডাইমে। গভীর গভীরতম ভীতির জন্য ভাষা পৌঁছয় নিজ্ঞানস্তরে, যেখানে প্রচুর রহস্য আর আকাঙ্ক্ষার প্রত্নচোখ নির্বাসিত। অতলে শেকড়ের এই যোগাযোগ সম্পন্ন করতেই প্রতীকী ইমেজ এক সূত্র খুঁজে পায়। স্মর্তব্য, আবেগের বিপরীতে বুদ্ধি ও মেধার যুক্ততার পারম্পর্য নির্ণয়ে এ রীতি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে 'ইকারুশের আকাশ' অভিধায় পাঠসূত্র হয়েছে। নিশ্চয়ই এর ভেতরে চলমান সমাজবাস্তবতার সূত্রও আছে। যেভাবে *দ্য ওয়াস্ট ল্যান্ড*-এর পংক্তিমালায় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতার ক্ষরিত রূপ নির্ণীত বা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এ মিথ পুনর্নির্মিত আর তত্ত্বে কিং ফিশার লেখেন *মিথলজি*—যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা পুনর্জন্মের বয়ান সাধারণীকৃত— তা তো শামসুর রাহমানেও পরিতুষ্টতা পায়। রাহমানের মিথ যেমনটা টেলিমেকাস, হ্যামলেট, আফ্রোদিতি, নূহের জাহাজ, এ্যাকিলিস অভিধায় কার্যপ্রাপ্ত। ইকারুশ ও ডেডেলাস এ সময়ে পুনর্নবায়িত। সম-ভাবে 'নিষেধ' বা 'অমান্যতা' এক কূটাভাসে বন্দী। বস্তুত কবি মিথ বা ইমেজ গড়েন তার প্রতিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় নির্মিত সৃষ্টিশীল আবেগের আকরের ভেতরে। একাত্তর-উত্তর সময়ে রাহমানের স্বপ্নভঙ্গ, অবক্ষয়, বিনাশী চিন্তা কিংবা ব্যক্তিগত ক্লেশ-ক্লান্তি অনেকভাবে গড়ে দেয় তার কৃতি : 'হরিৎ প্রান্তরে জেব্রার মতো ধাবমান বাতাস', 'প্যারিসের আকাশে ভায়োলিন হাতে উড়ন্ত ইহুদী' কিংবা নিম্নোক্ত পংক্তিমালা :

> ওরা ঘুমিয়ে আছে, ওদের ঘুমোতে দাও।

ওদের কবরে এখন গজিয়ে উঠেছে ঘাস,
যেমন যুবকের বুকে ঘন রোমরাজি।
ওরা ঘুমিয়ে আছে আমরা জেগে থাকবো ব'লে।

স্বল্পবাক্যে, প্রত্যক্ষত, অবধারিত, স্পষ্ট, দৃঢ়। নিও-ক্রিটিকদের যে ধারা আমাদের কবিতায় তিরিশ থেকে শুরু হয়েছিল, তা-ই রাহমানে আরও প্রকটিত ও অভিব্যক্তময়। চেতনার দ্বন্দ্বময় ধারাটি প্রবহমান ও সময়-ক্ষেপনে উতরোল। নিও-ক্রিটিক ধারার লক্ষণসমূহ এলিয়টিয়, এখানে আছে : স্বগত ভাষণ-একক সংলাপ-মনোলগ ('আমি'), ধ্রুববাক্য ('এ-শহর টুরিস্টের কাছে পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,/ এ-শহর তালিমারা জামা পরে, নগ্ন হাঁটে খোঁড়ায় ভীষণ', উল্লেখপরায়ণ, উল্লম্ফন প্রভৃতি। রাহমানের কবিতা যে নব্য-বাস্তববাদী তত্ত্বের আলোয় চকিত চিনে নেওয়াও সম্ভব। সেখানে আরও অনেক জ্ঞানতত্ত্ব যুক্ত করা সম্ভব। বিশ শতকের উত্তর-উপনিবেশ চিন্তা, নারীবাদী চিন্তা, মার্কসবাদী ধারণা, অস্তিত্ববাদী-প্রতীকবাদী ধারণা প্রভৃতিতে। তবে এসব ধারণা একটির ভেতরেই বহুমুখী রূপ রচনা করেছে। উত্তর-উপনিবেশ চিন্তায় কলোনি বা উপনিবেশ-উত্তর ধারণাটি যখন ব্যাপকভাবে রাহমানের কবিতায় আসে তখন অপরতা বা স্যবলটার্ন চিন্তা, যেখানে শ্রেণিচেতনা, উগ্র-শ্রেণিবিচ্যুতি, ভাষার মুক্ত এলাকা (free play) সৃজন নিয়ে কাজের সুযোগ থাকে। এবং তাতে করে কবিতা পায় ভিন্ন টেক্সট। উপর্যুক্ত দুটি সমালোচনায় ['emotive', 'objective co-relative']-এর বাইরেও শামসুর রাহমান তার কবিতায় যে সামাজিক-রাজনৈতিক সীমানাসমূহ নির্দিষ্ট, তাও যুগোপযোগী জ্ঞানচর্চায় অবহেলিত বা গৌণ নয়। প্রসঙ্গত উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তায় *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যে সংযোগ করেন ভিন্ন মাত্রা। শুধু এই একটি কবিতাগ্রন্থই নয়, *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* কিংবা *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*-এ কর্তৃত্বের বিপরীতে উঠে আসে সাধারণ মানুষের মর্যাদা। আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই শুধু নয় রাষ্ট্রীয় অধিকারের বলয়ে নিয়ে আসেন দৃঢ়প্রত্যয়। বর্ণ-শ্রেণি-বিত্তের অর্থজ্ঞাপক ধারণা ভাষা-চিহ্নে মুক্তএলাকা নির্ধারণপূর্বক উগ্র শ্রেণিচ্যুতি ঘটিয়ে দ্বৈত-বৈপরীত্যে আনে নতুন অর্থে। সেখানে 'নূর হোসেন' হয়ে ওঠে গণ-জনতার প্রতীভূশক্তি। বাংলাদেশ নূর হোসেনের একক চেতনায় সমস্ত মানুষকে এক হয়। যেভাবে আসাদের শার্ট, সফেদ পাঞ্জাবী জনতার সারিতে উঠে আসে : 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সুর্যাস্তের/ জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/ উড়ছে হাওয়ায় নিলীমায়।' কর্তৃত্বের এমন সংঘশক্তি পরিবর্তিত চেতনায় অবহেলিত মানুষের প্রেম, আবেগ হয়ে ওঠে সৃজনশীল। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনাকাঠামো (paradigmic)। শামসুর রাহমানের কবিতার সাহিত্য-সমালোচনা চিন্তার মার্কসবাদ, নারীবাদ তত্ত্বের ধারণাও একই প্রবণতায় চিন্তাসূত্র রচনা করে।

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কিংবা 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার ভেতরেও পুনর্গঠিত হয় মিখাইল বাখতিনকথিত 'কার্নিভাল চেতনা'। শোষণ বা কর্তৃত্বের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় জনতার শ্রেণিভিত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসবে গড়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির ভিত্তি। শ্রমজীবীর শ্রেণিমর্যাদার বিচ্যুতির মতো নারীরও ঘটে স্থানচ্যুতি। সূর্য পুরুষ হলে নারী চাঁদ, আলো যদি হয় পুরুষ অন্ধকার নারী, পুরুষের স্থান উপরে হলে নারীর নীচে—এমন ভাষিক যুগ্মবৈপরীত্যে নারী অবহেলিত। নারী পুরুষের সহজাত হয়ে ওঠে পুরুষ কর্তৃত্ব থেকে। সিমন দ্য বোভেয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) বা কেট মিলেট (জ. ১৯৩৪) তত্ত্বে নারীর মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধটি ব্যাপকভাবে সাহিত্যে আসে। আর সেটি রাহমানের কবিতাতেও যুক্ত করে স্বতন্ত্র স্বর। নারীর বিচ্যুতির, শ্রেণিমর্যাদার প্রশ্নটি তৈরি হয়, বিভিন্ন ইমেজের প্রতীকায়নে।

বাংলাদেশের নাগরিক কবিতাধারায় শামসুর রাহমান কবিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব দিব্যদৃষ্টিসম্ভূত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চেতনাস্পৃষ্ট তাঁর কব্যিরাজি : *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩), *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭), *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮), *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০), *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২), *দুঃসময়ের মুখোমুখি* (১৯৭৩), *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (১৯৭৪), *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪), *এক ধরনের অহংকার* (১৯৭৫), *আমি অনাহারী* (১৯৭০), *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* (১৯৭৭), *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* (১৯৭৭), *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* (১৯৭৮), *ইকারুশের আকাশ* (১৯৮২), *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২), *মাতাল ঋত্বিক* (১৯৮২), *কবিতার সঙ্গে গেরাস্থলি* (১৯৮৩), *নায়কের ছায়া* (১৯৮৩), *আমার কোনো তাড়া নেই* (১৯৮৪), *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে* (১৯৮৪), *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই* (১৯৮৫), *হোমারের স্বপ্নময় হাত* (১৯৮৫), *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই* (১৯৮৫), *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ* (১৯৮৫), *এক ফোঁটা কেমন অনল* (১৯৮৬), *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* (১৯৮৬), *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে* (১৯৮৬), *অবিরল জলভ্রমি* (১৯৮৬), *আমার ক'জন সঙ্গী* (১৯৮৬), *ঝর্ণা আমার আঙ্গুলে* (১৯৮৭), *খুব বেশি ভাল থাকতে নেই* (১৯৮৭), *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার* (১৯৮৭), *মঞ্চের মাঝখানে* (১৯৮৮), *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* (১৯৮৮), *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো* (১৯৮৯), *সে এক পরবাসে* (১৯৯০), *গৃহযুদ্ধের আগে* (১৯৯০), *খণ্ডিত গৌরব* (১৯৯২), *ধ্বংসের কিনারে ব'সে* (১৯৯২), *হরিণের হাড়* (১৯৯৩), *আকাশ আসবে নেমে* (১৯৯৪), *উজাড় বাগান* (১৯৯৫), *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা* (১৯৯৫), *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই* (১৯৯৬), *তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃদস্পন্দন* (১৯৯৬), *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি* (১৯৯৭), *হেমন্ত, সন্ধ্যায় কিছুকাল* (১৯৯৭), *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ* (১৯৯৭), *মেঘলোকে মনোজ্ঞ নিবাস* (১৯৯৮), *সৌন্দর্য আমার ঘরে*

(১৯৯৮), *রূপক প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাত* (১৯৯৯), *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো* (১৯৯৯), *স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি* (২০০০), *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে* (২০০০), *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি* (২০০১), *হৃদপদ্মে জ্যোৎস্না দোলে* (২০০১), *ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি* (২০০২), *ভাঙাচোরা চাঁদমুখ কালো করে ধুকছে* (২০০৩), *গন্তব্য নাইবা থাকুক* (২০০৪), *কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে* (২০০৪), *গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান* (২০০৫), *নির্বাচিত ১০০ কবিতা* (২০০৫), *না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন* (২০০৬), *প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা* (২০০৬), *অন্ধকার থেকে আলোয়* (২০০৬)। কবির রচনা সংকলন নিয়ে *রচনাবলী ১* (২০০৪), *রচনাবলী ২* (২০০৬) প্রকাশিত হয়েছে।

ছয়.

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

বাংলাদেশের কবিতায় তিনি স্বভাবজাত, 'সিদ্ধিদাতা গণেশ'। 'উগ্র আধুনিক না বলে অত্যাধুনিক প্রগতির সংজ্ঞায় যাঁরা নিজেকে আখ্যায়িত করেতে চান আলাউদ্দিন আল আজাদ সেই শ্রেণীভুক্ত দ্বিধা নেই'—এমনটি কবি সম্পর্কে 'নতুন কবিতা'র ভাষ্য। চিনে নেওয়া যায় কবির প্রকরণবিশ্বাসটি :

শিয়রে এলার্ম্
জ্বলে, বারান্দায় কুকুরের চোখে শুকতারা, জাগো জাগো
রাজেন্দ্রাণী সুন্দর প্রাসাদে, নগ্নতার আবরণ দাও
দূরে ফেলে দাও দূরে, বিছানায় পরিশ্রান্ত মিলনান্ত
শাড়ির সাড়ায়

১৯৪৯ সময়ে এ নির্মিত পংক্তিমালা অনেক ইতিহাসঋদ্ধ মূল্যায়ন পেতে পারে। 'জাগো জাগো...'—আদিধ্বনির উপাসক আহ্বান। স্থানিক আবর্তে মূর্তমান। ইতিহাসখ্যাত কবিনন্দিত কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভ" রচিত ২৬/০২/১৯৫২ তে। কবিতায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটচিত্র, অনুভূতির অর্চনা, প্রত্যার্থী পরিচর্যা কীরূপে সমসাময়িক সত্যে অরণিকান্তি পায় তা জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে স্মর্তব্য, শিল্প জীবন সম্ভাব্যতারই অমোঘ প্রতিকৃতি এবং তা নানারূপে নানাবোধে সময় ও জীবনে রুচি ও বুদ্ধিমাফিক অধিকৃত। "স্মৃতিস্তম্ভ"র শেষ স্তবক অংশ :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর।
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়

দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।।

কবির সংগ্রামী মুখে মায়াকোভস্কি কিংবা একালে সুকান্ত, রুদ্রসহ অনেকেই আছেন। বিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান বা তৎ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জন্মের গর্ভাঙ্কুর একুশকেন্দ্রে উপ্ত হলে কবিকুল দার্শনিক বুদ্ধিতে আত্মপরিচয় এবং প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবৎকালের যাবতীয় স্বপ্নকে সাধ্যায়ত্ত করার সচেতনতা অর্জন করেন। 'চার কোটি পরিবার', 'চার কোটি কারিগর'। আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা কবিঅর্জনে স্বতঃস্ফূর্ততা পায়। একাত্তর-পূর্ব কবিতা আর পরবর্তী কবিতার মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। সেটি ঘটেছে তাঁর প্রস্তুতি ও পরিচর্যার কারণে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কাব্যনবায়ন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সরলরৈখিক, নিরীক্ষাপ্রবণ, আন্তর্জাতিক দীক্ষাদর্পিত। বাস্তবতার ভেতর দিয়েই কবিব্যক্তিত্ব নির্মিত। কবিভাষাটিও অর্জিত হয় তেমন প্রতিশ্রুতি থেকেই। বৈদেশিক ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাও তার কাব্যে প্রযুক্ত। কাব্যরস তাতে দৈশিক আদেশ-ধ্বনিত। ছন্দও তাতে নানা রূপে পর্যবসিত। পদবিন্যাস অনেকটা নস্টালজিক, অবসন্ন, স্বপ্নতাড়িত। তবে ঐ মানবীয় প্রতিশ্রুতিটি অমোঘতায় বিশিষ্ট :

হাপরের ফুৎকারে গণগণ সূর্যকুঁড়ি
মিছিলের বাঁকে বাঁকে অজস্র পলাশ
অনেক ঠোকরালো পাখি এইবার জনপথে
রাজপথে প্রমেথিউস শেকল
ছেঁড়ার ঝন্‌ঝনা, উত্তল
আলোড়িত অগ্নিকোণ
কেশরফোলা দূর্বার
মেঘের কুদোনো
কালোঘোড়া
ছুটছে
উড়ছে
পত্
পত্

তাঁর সনেটপ্রযুক্ত কবিতাসমূহ, নির্ভার গদ্য ভার্সন, পরিপ্রেক্ষিত কাহিনীকবিতা নির্ণীত। সনেটে গম্ভীর বা প্রচল-পরিশিষ্ট উপভোগ্য, অনেক দূরবিস্তারী, রসোপভোগের দায়টি সেখানে প্রবলভাবে আকুলিত। সনেটপর্বে আলাউদ্দিন আল আজাদ এরূপেই কাব্যবুদ্ধিকে অতিক্রম করে চলেন—"একগুচ্ছ ফুল", "জলজ বাগান", "সামুদ্রিক", "প্রতীক্ষায়", "সোনালী শরৎ" প্রভৃতির ভেতর দিয়ে। তবে প্রচ্ছন্ন সারাক্ষণ মানবতার 'ভূত'! একরূপ সরস প্রতিজ্ঞায় কাঁধে আসে ষাটদশক ও তৎপরবর্তী কাব্যস্রোত।

আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাদেশের কবিতায় অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের হৃদয়সংবেদী কবি-প্রতিকৃতি। ধ্রুপদী উচ্চারণে অনির্বাণ থাকে তাঁর মানবতা ও মানবকেন্দ্রিক বিশ্বাস। *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ* (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা 'ইউসুফ-জুলায়খা'র প্রণয় কাব্যনাট্য প্রয়াসে বর্ণিত। অন্যান্য কবিতাগুলোও নান্দনিক। বিশেষত তাঁর সনেটের নতুন পরিবেশনা; যেখানে তিনি পুরাতন রীতিকে নিরীক্ষায় এনে দান করেছেন সমকালীনতার স্বাক্ষর। এতে করে বৈচিত্র্যও এসেছে। তাছাড়া আধুনিক ভাবচেতনা যেমন নগরের হতাশা, অবক্ষয়, শরীরী প্রেম, রোম্যান্টিক স্বপ্নকল্পনা, প্রকৃতির বিবর্তিত রূপ—এমন বিবিধ বিষয় তাঁর প্রকরণে নিরন্তর নিরীক্ষায় যুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ কাব্যচর্চায় বাংলাদেশের কবিতায় ভাবের স্বচ্ছতায় প্রকরণের অনিবার্যতায় তিনি দান করেছেন নতুন সংহতি ও সংসক্তি। *মানচিত্র* (১৯৬১), *সূর্যজ্বালার সোপান* (১৯৬৫), *লেলিহান পাণ্ডুলিপি* (১৯৭৫), *নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ* (১৯৮৩), *আমি যখন আসবো* (১৯৮৪), *সাজঘর* (১৯৯০), *চোখ* (১৯৯৬), *অ্যাসেস এণ্ড স্পার্কাস* (১৯৮৪), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৭) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন *দুর্লভ দিন* (১৯৬১), *শঙ্কিত আলোক* (১৯৬৮), *বিপন্ন বিষাদ* (১৯৬৮), *প্রতনু প্রত্যাশা* (১৯৭৩), *ভালবাসার হাতে* (১৯৭৬), *ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছেতার* (১৯৮৪), *তৃতীয় তরঙ্গে* (১৯৮৪), *কোলাহলের পর* (১৯৯০), *ধীর প্রবাহে* (১৯৯৩), *ভাষাময় প্রজাপতি* (১৯৯৭)। প্রেম, দেশাত্মবোধ, যুগযন্ত্রণা, বুর্জোয়া আগ্রাসন এসব বিষয় কবিচিন্তনে সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন তোলে। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিলুপ্তি, স্নায়ু-আঘাত, অন্ধকারের অবসানে মুক্তির আলেখ্য তাঁর কবিতার প্রতিপাদ্য :

> সান্ত্বনার কথা নয় : আমরা সূর্যের আয়ু পেয়েছি ক্রান্তির জলধারে;

প্রসাধিত কারুকলা নগ্ন হবে জনালয়ে; শিল্পিত মনের পারাপারে।
আমরা একাগ্র হবো– তার বাণী একীভূত যুগ্নতার ভিতে
সঞ্চারিত। মিত্রালী গানের মন্ত্র জীবিত প্রেমের পরিধিতে।

দুর্লভ দিন থেকে *প্রতনু প্রত্যাশা* পর্যন্ত কবি প্রবলরকম প্রকৃতিকাতর। দুর্লভ অনুভূতির ভেতরেই প্রত্যাশা খুঁজেছেন। গড়ে নিয়েছেন নিজস্ব ভাষাভঙ্গিমা। 'পিপাসার মাঠে', 'মধ্যাহ্ন', 'বৈশাখী' রোম্যান্টিক কবিতা। গীতসুধারসে পূর্ণ এ পর্বের কবিতাগলি। পরের পর্বে শঙ্কিত সমাজও প্রেম-অপ্রেম মিলে প্রকাশিত। এক ধরনের তরল টেলিং-এ প্রকরণ ভূষণময়। পরের কাব্যসমূহে কবির প্রত্যাবর্তন, পুনরাবৃত্তিময়। অনতিক্রান্ত। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রধানত গীতিকবি। কবিতায় তাই প্রতিফলিত। রোমাঞ্চ ও রোম্যান্টিক প্রবাহ সদা স্ফুরিত ও সাবলীল। গীতল রস মুখরিত। সমাজ বা শঙ্কিত ভবনাগুলো পরোক্ষরূপে প্রকাশিত। তরল ও সারল্যময়। প্রকৃতিভাবনায় তিনি সর্বভৌম ও আস্তিক, পুণ্যবান। এইটিই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বৈশিষ্ট্য। তবে শেষ পর্বের কবিতাসমূহ অনুজ্জ্বল।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শব্দব্যবহারে নির্বিরোধী তবে তিনি তীক্ষ্ণধী সংবেদনশীল; গভীর, কোমল ও গীতিময়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন জিজ্ঞাসায় তরুণ সমাজ—তার উন্মার্গরূপ, উন্মূলতা, বৈপরীত্য বিবিধ বিষয় নান্দনিক-বীক্ষায় ব্যঙ্গাত্মক এবং গাঢ়তর পরিসরে বয়ানের প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়। স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও দেশাত্মদর্শন তাঁর কবিতার পরিচর্যার পথ :

উদ্যত গহ্বরে খাদে
ডুবে তোর হবে কি উদ্ধার
তবে সেখানেই দ্রুত নখে যা রে—

যা ছিঁড়ে সমস্ত উরু আমূল
প্লাবিত শরীরে স্বর্গে
কেশজ ঘ্রাণে ও বর্ণে
আজন্মের তীক্ষ্ণতায় বিদ্ধ লীন
বিলীন সদুগ্ধাধার
জননী, জনক উত্থিত নীত
আসন্ন রোপন

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এমিলি ডিকিনসনের (১৮৩০-১৮৮৬) কবিতার সফল অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'বাংলা কবিতায় আঙ্গিক রূপান্তরের কালে এমিলি

ডিকিনসনের মরমীচিন্তা ও স্নিগ্ধ উচ্চারণ আমি সতর্কভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছি।' ডিকিনসনের ভাবশিষ্য মনিরুজ্জামান, অনুবাদের ক্ষেত্রেও সে প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতাসংগ্রহ* (১৯৭৬-১৯৯৮) বেরিয়েছে ১৯৯৮ সালে।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)
কবি ও কবিতার সংগঠক, কবিতায় আধুনিক রীতির নিরীক্ষক, বৈশ্বিক কাব্যান্দোলনের যাত্রার অগ্রপথিক হাসান হাফিজুর রহমান। কবিতায় আত্মনিবেদিত, সার্থক কবিপ্রাণ। এ কর্মযোগীর কাব্য আরাধনা বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায়। *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩) তাঁর অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। এখানে স্বদেশ-স্বাজাত্যবোধ মাতৃমূর্তির চেতনায় বিচ্ছুরিত। তাছাড়া ব্যক্তি ও সমাজমুক্তির প্রসঙ্গ, উত্তরিত জীবনচেতনা, 'বৃত্তের সংসার' থেকে মানুষের মুক্তি কাব্যটিতে অনুপম শিল্পমাত্রা পেয়েছে :

> আহা মেলাই না বুক সাদা ও সহজ বুকে কতোদিন
> অবাধ স্বভাবে;
> কাজের দাঁতের ভীড়ে আমি যেন সময়ের খাদ্যকণা এক।

'আমি'-সত্তার স্বরূপটি মানস-প্রতীকে পর্যবসিত। সেখানে বহুস্তরীভূত চেতনা পরিস্রুত। কবির বহিরাশ্রয় সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে যুক্ত অভিজ্ঞতা তার আমিকে দ্বিতীয় সত্তায় আমরা করে তোলে। বাইরের অভিজ্ঞতাটুকু মননজাত। *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮), *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮), *যখন উদ্যত সঙ্গীন* (১৯৭২), *বজ্রে চেরা আঁধার আমার* (১৯৭৬), *শোকার্ত তরবারী* (১৯৮২), *আমার ভেতরের বাঘ* (১৯৮৩), *ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী* (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থের এ পরিক্রমায় শব্দের আর্তরূপ, চিত্রলতা, উপমানচিত্ররঞ্জিত। কার্যত, বিষ্ণু দে-উত্তর কর্মপ্রণালী হাসান তার কালের অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত করে ফেলেন। এটি সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান লোকের ঝোঁক, সেটি কায়েম হয়, জ্ঞান ও চিন্তাতাপিত উষ্ণতায়। শামসুর রাহমানের দীর্ঘায়ত ভূমিকা সম্বলিত *হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা* বের হয় ১৯৮৬ তে। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় আত্মদগ্ধের বা যন্ত্রণার বিষয়টি বিশেষ প্রকরণ পায় তা কিছু উদ্ধৃতিতে লক্ষ করি :

> কে যেন কোনোদিন আমার নাম ধরে
> ডেকেছিল এইখানেই, মুহূর্মুহু অটোমোবাইলের হর্ণে
> ডুবে গেছে সেই আহ্বান!

কিংবা,

> অতর্কিত আমার শহর, আগন্তুকের মেলায়

শিশুর মতো মুহূর্তেই ব্যথা ভুলে দৌড়াচ্ছি হাসছি, এই আমার
শহর
ধুলোর আয়না এবং ডাস্টবিন
বুড়ো শয়তানের ঝুলন্ত ঠোঁটে বিকারের উদ্যান।

মূল্যবোধের পরিচর্যায় হাসান মূলত বাঙালি মধ্যবিত্ত মননকে নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতায়। এবং সে বীক্ষণেই শব্দভাষ্যে কিংবা চিত্রকল্প-উপমায় যুক্ত করেছেন আধুনিক মাত্রা। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কবি টি. এস. এলিয়ট অনিবার্যভাবেই তাঁর কবিবুদ্ধির জায়গাটি দখল করে নেন, অনিবার্য আদর্শের তাগিদে।

আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬)

বাংলাদেশের কাব্যাঙ্গনে প্রখর প্রভাবিত, ভাটিবাংলার লোকায়ত প্রাণস্পন্দনের কবি আল মাহমুদ। 'তিতাস-ব্রহ্মপুত্রপারের জনজীবনকে উপলক্ষ করে সম্মোহনী লোকভাষা' স্থিতি পায়। তাঁর কবিতার বিষয় : লোকজ জীবনানুষঙ্গ, গ্রামীণ সংস্কার-মূল্যবোধ, মুসলিম ঐতিহ্য-পুরাণ। *লোক লোকান্তর* (১৩৭০)-এর কবিতাগুলো লেখা হয় ১৩৬১ থেকে ১৩৭০ সালের মধ্যে। *কালের কলস* (১৩৭৩) ১৩৭০ থেকে ১৩৭৩ সালে। এ দুটি কাব্যের জন্য কবি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান ১৯৬৮ সালে। এরপরে মুক্তিযুদ্ধ, এবং বাংলাদেশের জন্ম। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে রচিত *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩), যেটি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। *সোনালী কাবিন* তাঁর সনেটগুচ্ছ। আল মাহমুদের এ তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। সৃষ্টির গোড়া থেকে কবির দিব্যচেতনার শুলুকসন্ধানের প্রচেষ্টায়—তার এগুনোর পথ, অনুকরণের পর্যায়, পাঠকনন্দিত হওয়ার ক্ষেত্র পরীক্ষণীয় ব্যাপার। আল মাহমুদ একটা দিব্যচেতনা নিয়ে 'নদী', 'মেঘ', 'নারী' রচনা করেন। নিয়ে আসেন তাঁর বন্দনার জগতে। একইরূপে 'ঝড়', 'অরণ্য', 'বৃষ্টি', 'রাত্রি', 'নৌকো', 'রক্ত'তে আরোপ করেন যৌনতা; তখন জীবনজয়ী রূপটি হয় চিহ্নিত, পরিবেশনায় আসে ভিন্নতা। কবিতা যাবতীয় বিষয়কে স্পর্শ করে। কবিস্বীকৃতিতে থাকে 'কবিতা লেখা হতে পারে একটি কেবল,/ যেন রমণে কম্পিতা কোনো কুমারীর নিম্ননাভিমূল'। নিত্যদিনের সময়সূত্রকে অর্পণ করেন অনিবার্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্ররোচনায়। এক্ষেত্রে কিছু আত্মমগ্নতা বা আত্মলীন অনুভবও স্মরণীয়তা পেয়ে যায়। "তিতাস" তাঁর নিজের নদী, কিন্তু স্বমতপ্রচারে নয়, রসসৃষ্টির অদ্বিতীয় উপায়ে :

এ আমার শৈশবের নদী এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাকত খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে

গতির প্রবাহ হানে।

নদী আর নারীর ব্যাখ্যায়নে অভিন্ন এ আখ্যান। আর সেখানে 'শবরী তিতাস', 'যৌবনের দেশ' কী তাৎপর্যে মহিমান্বিত। ঐ 'pastoral exploration'। শুধু 'নদী' নয় 'বৃক্ষ', 'পাখি' অর্জন করে মরমী রূপ। বোধকরি অবচেতন স্তরটি ক্রমশ তাঁকে পয়ারবৃত্তে বেধে ফেলে। টোটেমরূপে এরূপটি তৈরি হলেও, প্রাচীনত্বের পটভূমিটির স্পর্শ ও আশ্রয়, লৌকিক মরীচিকামোহ, পাঠ্যরূপে অঙ্কিত হয়। মিথরঞ্জিত তুলনা অনেকান্ত, যেন রূপাতীত সঙ্গতি, তবে বাস্তবপন্থি।

আল মাহমুদ *কালের কলস* কাব্যে 'কলস'কে প্রত্নপ্রতিমায়, পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠা দেন, পুরাবৃত্তটিতে আলো-অন্ধকার, জন্ম-মৃত্যুর পরিচর্যায় বিরাট ভূমিপুত্ররূপে যেন জেগে ওঠে। এখানে কবির ইঙ্গিতটি এতই গভীর এবং নৃ-সংশ্লিষ্ট—সেখানে শুধু জাগরণ নয়, সন্দেহ-বিশ্বাস-সংস্কার এক দীক্ষা লাভ করে। সেখানে ঐতিহ্যিক প্রবাহ, অভিজ্ঞতায় লালিত হলেও সার্বজনীন মুরতির স্বতঃপ্রবৃত্ত আকাঙ্ক্ষাটি কায়েমে আনে। উপমা, প্রতীক, রূপক প্রত্যেকটি সম্ভ্রমের নিখুঁত নিঃশ্বাসকে ধারণ করে :

এই দলকলসের ঝোপে আমার কাফন পরে আমি কতকাল
কাত হয়ে শুয়ে থেকে দেখে যাবো সোনার কলস আর বৃষের বিবাদ?

আল মাহমুদ *সোনালী কাবিনে* অগ্রসর, আবেগ ঘনীভূত, চেতনায় স্বচ্ছ ও নিরঙ্কুশ। সদ্য স্বাধীন দেশে তাঁর কাব্যবিষয় ঐ আবহাওয়া-জলবায়ু পরিক্রমণে। সেখানেও সনেটে ফিরে আসে শৌর্য-বীর্যগাথা, পুরনো ইতিহাস, আবহমান আবেগসংখ্যার হিসেব। মৃত্তিকা-নারী-ভ্রূণাঙ্কুর, আর কুয়াশা-আলো-অন্ধকার, স্নেহ-মায়া-প্রেম-ভালোবাসা এ কাব্যে তীক্ষ্ণতর। তবে 'সোনালী' যৌবন কামার্ত বা জৈবিকতার আধার হয়ে আসে। লোকসংস্কৃতি-লোকসংস্কার, শারীরি-সংসর্গ হয়ে ওঠে অভিন্ন দ্যোতনার সারথি। আল মাহমুদ সুন্দর নামে, চমৎকার কবিভাষ্যে অন্তর্ভৌম ও যৌক্তিক রূপটি সনেটের সীমায় বেধে ফেলেন। যেমন :

হাত বেয়ে উঠেএসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গোটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে;

'পানোখী' সুন্দর শব্দপ্রতিমা। লোকায়ত আমেজে এ অসাম্প্রদায়িক লৌকিক রূপটি, সার্বজনীনরূপে অভিষিক্ত। 'নীল', 'দংশন', 'সাপ' এরূপে জৈবিক প্রেরণার পাশাপাশি আমাদের লৌকিক অস্তিত্বকেও তুলে ধরা হয়েছে। 'কার্পাশের ফল', 'গুঞ্জার মালা', আশৈশবের স্মৃতি, পরিচর্যা কখনও বৈশ্বিক হয়ে ধরা পড়ে। টোটেম-ট্যাবু বিস্তৃত হয় অস্তিত্বকে আকর করে। সামষ্টিক সুরটি বুঝি তিনিই শুনতে পান, আর এ ধারায় চর্যাযুগ, মুকুন্দরামের কাল সবই যেন পরীক্ষিত। কবি

সনেটে এ প্রত্যয়সমূহ কী অমায়িক করে তোলেন—সেটা ফর্ম-পরীক্ষা করলে কিংবা ভাষার বুননিটি বিবেচনায় আনলে ধরা পড়ে। কাব্যের একটি পংক্তি নিলে গোটা সমাজ-নৃতত্ত্বের অতীত বেরিয়ে পড়ে। পুনরায় বর্তমান যেন নবায়ন হয়, বংশপারম্পরিক বিপদ-বরাভয় কিংবা সংগ্রাম আর কৃষি-অর্থনীতিকে নিয়ে তা কাব্যটিকে নতুনত্ববিলাসী করে তোলে। কবির সনেটে এটি তুমুলমাত্রায় উত্তীর্ণ। *সোনালী কাবিনে* এ ছাড়াও পয়ারে বা মুক্তক প্রবর্তনার অনেককিছু কায়েম হয়েছে। কিন্তু অনেক কবিতায় জৈবিকচেতনার পুনরাবৃত্তি আছে, সেটি ডিটেলে গেলে আর ঐ পর্যায়ে থাকে না। শরীর-মন-দেহ সবকিছু মিলে অর্কেষ্ট্রা রচিত হতে থাকে। কিন্তু লাল-সবুজ-নীল এমত বর্ণিল প্রভাটি "চোখ", "উল্টানো চোখ", "চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়", "আমার চোখের তলদেশে" এগুলোতে সুস্পষ্টভাবে 'চোখ' মিথে পৌঁছাতে হবে এবং যথাযথ কার্যকারণটি জানতে হবে। তখনই তা আধুনিক দৃষ্টিচেতনায় 'টোটেম'তুল্য হয়ে উঠতে পারে। আমাদের চলমান জীবনপথের প্রতিবেশটি তখন অজ্ঞাতবাসে থাকে না। কবির সবচেয়ে আকর্ষণীয়, কবিতাধারায় অনুকরণ বা আনুকূল্যে নয় এমন উপাদানে যেমন তিনি পেয়েছেন উপকরণ, তেমনি আঙ্গিকেও নিয়েছেন স্বকীয়তায় মানিয়ে। বিশেষত,অবচেতন স্তরটিতে কবি পৌঁছেছেন আধুনিক প্রকৃত ও বাস্তবানুগ সিদ্ধিতে। আল মাহমুদের কবিতায় এ রীতিটি বেশিদিন বহাল থাকেনি। সেটাও কি তবে এক বাস্তবতার চাপ। এমন বড় কবিরূপে যিনি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান—একটি একক কবিভাষার নির্মাণগুণে; সেখানে তিনি কীভাবে 'রমণীর প্রেম আর লাবণীসৌরভ'কে দ্বিতীয় করে তুললেন? অদ্বিতীয়, অখণ্ডে তো তাঁকে চাই-ই সবাই। তবে 'খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি'র স্বপ্নটিকেও আমরা যেমন অস্বীকার করতে চাই না তেমনি পূর্বেরটিকেও না। আঙ্গিককে ভেঙ্গে ছত্রখান করে কী লাভ! লোকায়ত পথিকৃত, যে স্বপ্নজাগর প্রহরের কবি, তাকে আরও—বানাতে বলতে চাই 'কলসের সোনালী' প্রতিকৃতি। বহুভাবে ও রকমে। এরূপ ধারাবাহিকতায় তাঁর অন্য কাব্য *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে* (১৯৭৬), *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না* (১৯৮০), *বখতিয়ারের ঘোড়া* (১৯৮৫), *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* (১৯৮৭), *প্রহরান্তের পাশফেরা* (১৯৮৮), *এক চক্ষু হরিণ* (১৯৮৯), *মিথ্যাবাদী রাখাল* (১৯৯৩), *আমি, দূরগামী* (১৯৯৪), *হৃদয়পুর* (১৯৯৫), *দোয়েল ও দয়িতা* (১৯৯৭), *দ্বিতীয় ভাঙন* (২০০০), *নদীর ভিতরে নদী* (২০০১), *প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা* (২০০৬), *তোমার রক্তে তোমার গন্ধে* (২০১০), *সনেট সমগ্র* (২০১৩) প্রভৃতি।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮)

জিয়া হায়দার কবিতায় আধুনিক রূপরীতির ইমেজ আনেন। পরাবাস্তবতায় অসংলগ্ন আত্মার ছবি, বিসদৃশ্য-অস্থির-অশান্ত সময় রচিত হয়। জটিল মনোবীক্ষণে, চঞ্চল-বিমূর্ত শ্বাসকে কাব্যে তুলে আনেন। প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্তের জটিল আবর্ত, বিরূপ সময় অবগাহনে দৃশ্যত-অদৃশ্যত-সম্ভব-অসম্ভব বার্তাসমূহ বাঙময় করার প্রচেষ্টা থাকে ছন্দে। ব্যক্তির ভেতরের ক্লেদ-আরক্ত ক্ষেদ-দুর্বিসহ আর্তনাদসমূহ নানা ইঙ্গিতে রচিত হতে থাকে। জিয়া হায়দার কাব্য প্রচেষ্টায় ক্রমশ উত্তরিত; বিবর্ধিত। বিশ্বাসের বার্তা দূরায়ত। তাঁর কবিতা সংকলন *ভালোবাসা ভালোবাসা* (১৯৯০)। কবির কাব্য : *একতারাতে কান্না* (১৯৬৩), *কৌটোর ইচ্ছেগুলো* (১৯৬৭), *দূর থেকে দেখা* (১৯৭৭), *From far away* (1979), *আমার পলাতক ছায়া* (১৯৮২), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৬), *লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা* (১৯৮৮), *অগ্রন্থিত কবিতা*।

বেলাল চৌধুরী (জ. ১৯৩৮)

আবদুল মান্নান সৈয়দ *করতলে মহাদেশ*-এ লিখেছেন : 'প্রায় তিন দশক জুড়ে বিহার করলেও বেলালকে সম্ভবত ষাটের দশকের কবি বলেই চিহ্নিত করতে হয় শেষ পর্যন্ত। কবি হিসেবে এই দশকেই তিনি পূর্ণ রূপে ও তাপে ফুটে উঠেছেন। ... কলকাতায় ষাটের কবিদেরই একান্ত সহবাসী বেলাল, সতীর্থ-পরিবেশক প্রভাব যে জীবনে ও সাহিত্যে কী বিপুল ভূমিকা উদযাপন করে, তা আরও একবার প্রমাণিত হয় বেলালের কবিতায়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শমসের আনোয়ার, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার রায়– এঁদের কবিতার সঙ্গে বেলালের কবিতার একটি সামান্য সাযুজ্য ও সাধর্ম আছে– তা হচ্ছে গদ্যকেই কবিতা করে তোলা, ব্যক্তিগত বহুবর্ণে স্ফুরণ ও বিস্ফোরণ ঘটানো, যে কোনো তুচ্ছ দিনানুদৈনিক জিনিসকে কবিতায় উত্তীর্ণ করা।' তাঁর প্রথম কবিতার বই *নিষাদ প্রদেশে* (১৯৬৪)। নগরজটিলতার এক ক্লান্তপ্রাণ কবি। আত্মমগ্নতায় নিপতিত। প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত কবির কাব্যভাষা। বেলাল চৌধুরীর আবেগের মাত্রায় যুক্ত থাকে রাজনীতি। সমাজের উন্মূল মানুষ, গ্রামগঞ্জ-পথঘাট শাশ্বত বাংলার প্রকৃতি গভীর স্পর্শতায় ছন্দে যুক্ত হয়। কবির স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্গত অনুভূতিতে থাকে স্বস্তি ও গৌরবের সনিষ্ট মিথিক উচ্চারণ :

> একটি নিখাদ দুঃখের নির্মাণে
> কেটে যেতে পারে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ,
> দুঃখ বিষম ভারি বোঝা, সিন্দাবাদের বুড়োর অধিক।

কবির দিব্যচেতনায় সংযুক্তি, প্রধানত পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াবাদী রাজনীতি। ফলে শরণার্থী, শোষিত মানুষ, মৃত্যু বিশেষ প্রত্যয় পায় কবিতায়। স্বচ্ছতোয়া স্বতঃস্ফূর্ত

আঙ্গিকে উদ্‌গত যাবতীয় জীবন্ত সব চিত্রপ্রতীক। কবিতার রাজসিক জয়যাত্রায় তিনি এখনও সজীব প্রাণপুরুষ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ *বেলাল চৌধুরীর কবিতা* (১৯৭৩), *আত্মপ্রতিকৃতি, স্থির জীবন ও নিসর্গ* (১৯৭৫), *স্বপ্নবন্দী* (১৯৭৯), *জল বিষুবের পূর্ণিমা* (১৯৮৫), *প্রতিনায়কের স্বগতোক্তি* (১৯৮৬), *সেলাই করা ছায়া* (১৯৮০), *কবিতার কমলবনে, যাবজ্জীবন সশ্রম উল্লাসে* (১৯৯৭), *বত্রিশ নম্বর* (১৯৯৭), *স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল* (২০০১), *বিদায়ী চুমুক* (২০১০) প্রভৃতি।

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)

বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় সিকান্‌দার আবু জাফর বিরূপ স্বদেশের প্রসন্ন চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন তাঁর কবিতায়। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিকাঠামোতে সর্বগামী ও অকুতোভয়, অদম্য সৈনিক হিসেবে তাঁর শিল্পচেতনা উদ্ভাসিত। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী; বিখ্যাত হয়েছেন 'সমকাল' (১৩৬৪) সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক ও সংগঠক হিসেবে। *বৈরী বৃষ্টিতে* (১৯৬৫), *তিমিরান্তিক* (১৯৬৫), *প্রসন্ন প্রহর* (১৯৬৫), *কবিতা ১৩৭২* (১৯৬৮), *বৃশ্চিক লগ্ন* (১৯৭১), *বাংলা ছাড়ো* (১৯৭১), *কবিতা ১৩৭৪* (১৯৭২) সিকান্‌দার আবু জাফরের কাব্যগ্রন্থ। *মালবকৌশিক* (১৯৬৬) তাঁর গানের সংকলন। স্বভাবে বহির্মুখি, দেশাত্মভাবনায় দায়বদ্ধ, মুহূর্তের স্বাক্ষর লিখনের তৎপরতা তাঁর কবিতাকে সমকালীন কাতারে নেমে এনেছে। সিকান্‌দার আবু জাফরের কাব্যগুণ প্রশংসিত, কালিক বাস্তবতায়—যেখানে জনমানুষের সাফল্য ও গৌরবই প্রধান হয়ে ওঠে :

> এই ভিড় এই কোলাহল
> অবিশ্রান্ত জনতার অচ্ছেদ্য শিকল
> আমার চিন্তার ক্লান্ত অগণ্য নিমিষ
> ঘিরে আছে নির্মম আক্রোশে।
> এছাড়া আরও লেখেন,
> এখনও হয়ত নকল নিভৃত মর্ম
> হয়নি কীটাণুদষ্ট
> সে কথাও তবু বারবার মনে ভাবছি
> নানান জন্তু অবাধে দলছে
> মানুষের অধিকার।

স্বৈরাচারের অপশাসন থেকে মুক্তি, বৈষম্যের অমানিশার অবসান সিকান্‌দার আবু জাফরের শিল্পভাষ্যকে পল এলুয়ার বা কাজী নজরুল ইসলামের সমগোত্রীয় করে তোলে :

> চিত্তহীনের যে অস্থি আজ

হয়েছে দাবার ঘুঁটি
নামবে সে কাল সংহার হয়ে
বজ্র বাঁধন টুটি।

ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৪)
আল মাহমুদ বলেছেন : 'ফজল শাহাবুদ্দীন এক নির্বিরোধ গভীর প্রেমের কবি।... তার কবিতায় আছে অন্য এক গূঢ় রহস্য'। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও অবক্ষয় চিত্র নির্মাণও এ কবির অন্যতম অন্বিষ্ট। অন্ধকার অতিক্রমী আশাবাদ আছে তাঁর কবিতায়। বিংশ শতাব্দীর ষাটের উত্তাল নাগরিক সময়, সুতীব্র বেদনায় অঙ্কিত হয় ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতায়। 'ভিক্ষারত কুষ্ঠরোগী', 'বেশ্যা পল্লী', 'নগ্নতার বৈদেহী চিৎকার' বিকৃত এমন প্রসঙ্গ 'অন্ধকারে'র শব্দবন্ধে ইমেজে রূপান্তরিত হয়। এক পর্যায়ে এ কবি হয়ে পড়েন অন্তর্মুখিন (introvert), চেতনালুপ্ত, বিনয়ী ও পলাতক। বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ফজল শাহাবুদ্দীন 'পুরানো দিনের সন্ধ্যা', 'বাংলা আমার স্বপ্ন আমার'-এর মতো অনেক কালজয়ী কবিতা লিখে বাংলাদেশের কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ কবি হয়ে উঠেছেন। উদ্ধৃতি :

আমিই ঘনিষ্ঠ ক্রন্দনধ্বনি
আসলে আমিই সব আমিই জীবন মৃত্যু আলো অন্ধকার
মহাজীবন প্রকৃতি মহাপ্রকৃতি এবং বিশ্বলোক

আদি অন্ত প্রারম্ভ সূচনা সৃষ্টি বিলয় উত্থান এবং পতন
সকল আলোহীনতা আর অন্ধকারহীনতা
দশদিক ঘেরা চিরকালের গোধূলি আমি

তৃষ্ণার অগ্নিতে একা (১৯৬৫), *আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর* (১৯৬৯), *আততায়ী সূর্যাস্ত* (১৯৭৫), *অন্তরীক্ষে অরণ্য* (১৯৮০), *সান্নিধ্যের আর্তনাদ* (১৯৮৩), *আলোহীন অন্ধকারহীন* (১৯৮৪), *সনেটগুচ্ছ*, *অবিনশ্বর দরোজায়*, *ছিন্নভিন্ন কয়েকজন*, *আমার নির্বাচিত কবিতা*, *হে নীল সমুদ্র হে বৃক্ষ সবুজ*, *লংফেলোর নির্বাচিত কবিতা* (১৯৬৭) ইত্যাদি।

আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪)
আবুবকর সিদ্দিকের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে; *ধবল দুধের স্বরগ্রাম*। অখণ্ড, অবিভক্ত, অবিভাজ্য বাংলা কবিতার ধারাকে বহন করেন আবুবকর সিদ্দিক। শৈশবের বর্ধমান-হুগলী-চুচুঁড়ার স্মৃতি; পূর্ব-পাকিস্তান, মুক্তিযুদ্ধ

ও বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পায়; জীবন ও কবিতাকে তন্বিষ্ঠ পাঠে এক করে ফেলেন। আবুবকর সিদ্দিকের 'দেশজ ভাষাগত আবেগ বা ব্যক্তিগত আলোছায়া সবই সময়ের চেতনায় আন্দোলিত।' তাঁর কবিতা মানবিকতার, প্রেমের, ভালোবাসার। কবিতাচর্চার প্রলম্বিত পথে তাঁর ক্রমশ ঘটেছে উত্তরণ। প্রথমদিকের কবিতায় মেলে একধরনের কুহকী-মরিচীকাময় আচ্ছন্নতা। আত্মমগ্নে লীন তাঁর বার্তা। দুর্বার বা অশান্ত বেগে এ মোহ অবিচল এবং পূর্ণায়ত *মানুষ তোমার বিক্ষত দিনে* কাব্য পর্যন্ত। এরপর লক্ষ্যনির্ভর চেতনজগতের ঊর্ধ্বে কবিতে যুক্ত হয় দার্শনিক ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা। দৃঢ়ভিত্তিতে প্রোথিত সামূহিক আবেগ। মননও যেন পুনর্জীবনপ্রাপ্ত। কবি পূর্ণতায় পরিশুদ্ধ। তা দৃশ্যমান, *হেমন্তের সোনালতা* থেকে *মানবহাড়ের হিম ও বিদ্যুতে* পর্যন্ত। এর মধ্যে কবিতায় আখ্যান এসেছে, যুক্ত হয়েছে নাটকীয়তা ও দুর্বিষহ-যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি। মনপবনে সাম্যবাদ সংযুক্তি বিপুলভাবে; এরপর ঊনসত্তর-একাত্তর—কবির প্রেয়সীসত্তা পরিপূর্ণ অভিন্ন, দ্বিতীয়সত্তায় মা'র অভিষেক এবং তাও ক্রমশ রূপান্তরিত প্রথমসত্তায়। এমন উন্মাদনার আঁচড় *হে লোকসভ্যতা* (১৯৮৪), *কালো কালো মেহনতী পাখি* (১৯৯৫) কিংবা *শ্যামল যাযাবরে* (১৯৯৮)। ঘৃণার, প্রতিবাদের-প্রত্যাঘাতের-প্রতিরোধের কবিভাষা নির্মিত সময়যন্ত্রণা, নৈঃশব্দ্য অন্ধকার ও স্বপ্নভঙ্গজনিত অনিঃশেষ কষ্ট থেকে। মন্ময় ভাবে মৌন আশঙ্কার ধ্বনিসমূহ দুরন্ত মাত্রায় উৎকীর্ণ। চিত্রকল্পে সাজতে থাকে ফাঁপা মানুষ, দুর্বিষহ সময় প্রলয়; এরপর দ্বিতীয় কাব্যে *বিনিদ্র কালের ভেলায়* (১৯৭৬) সময়কে আত্মদহনের সংরাগে ক্লান্ত করে তোলা। কবিতার ভেতরে প্রোথিত সময়। আর সেখানে ঘটে 'ব্যক্তি'র রক্তপাত। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, শ্রেণিভেদ কবির অলৌকিক আনন্দকে দান করে ভিন্ন-বীক্ষা। সেজন্য কাব্যের নামভাষ্যে যুক্ত হয় 'বিনিদ্র', 'বিক্ষত' সকল শব্দ। তাতে উঠে আসে ঘাতক, গণিকা, নপুংশক নিরস্ত্রীকরণ, রুগ্‌ণ গণতন্ত্র ইত্যাদি শব্দবন্ধ। একই সঙ্গে এর বিপরীতে প্রেরণায় ধ্বণিত হয় আশাবাদ। দেশ-ভূমি-মাটি কবির অভিন্ন সত্তার সাত্ত্বিক উচ্চারণ। প্রতিটি শব্দের নিরঙ্কুশ সারাৎসার মানবতার বন্ধন-সূত্রকে করে তোলে সার্বজনীন। এজন্য চারুনির্ভীক 'গণনায়ক' তৈরি হয় তার লেখায়। গণনায়ক নিরন্তর ব্যঞ্জিত, প্রকরণমথিত। কবির স্বপ্নসৌধ নিছক কোনো নির্মিতি নয়; প্রত্যেকটি শব্দবন্ধে তার কার্যকারিতা, কর্মক্ষমতা প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেজন্য 'পোয়েটিক পারফিউম' তাঁর একটুকু বিনষ্ট হয় না। সম্প্রতি প্রকাশিত *বৃষ্টির কথা বলি বীজের কথা বলি* (২০০৬)র উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তির দিকে উচ্চকিত শ্যেণ সংলাপ হলেও কিছুতেই কবিকীর্তি পরাভব মানে না। এটাই আবুবকর সিদ্দিকের কৃতিত্ব। প্রচণ্ডতা কখনওই কবিগুণকে ছাড়িয়ে যায় না। প্রকৃতঅর্থে, যে কবি *ধবল দুধের স্বরগ্রাম* লেখেন তাকেই কেন 'বিক্ষত দিনে'র

কাহিনি শোনাতে হয় সে প্রশ্ন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের মধ্যেই নির্ধারিত। কাজেই কবির বার্তা নিরুত্তর থাকার অবসর কোথায়! এরূপে আলোচ্য কবির ছন্দও ক্রম-পরিবর্তিত পথে পাল্টে যেতে বাধ্য। আবুবকর সিদ্দিক ফ্রি-ভার্সে লিখেছেন, অক্ষরবৃত্তকে নিয়ে খেলেছেন—আর সেখানেই ধরা পড়েছে কবিতার বহমান ধারার অঙ্গীকার আর স্বাতন্ত্র্যের চকিত রূপটি। তবে চিনে নেওয়া যায় তাঁর কবিতা, তুমুল ইচ্ছাপ্লাবিত অনুষঙ্গ—প্রকৃতি-সমাজ-সংসার-সংস্কৃতির রূপালেখ্যের ভেতরে। শব্দই অন্বিষ্ট—সেখানে যুক্ত পরিশুদ্ধ শিল্পের অনির্বাণ আঁচড়। *হে লোকসভ্যতা* (১৯৮৪), *হেমন্তের সোনালতা* (১৩৯৫), *মানুষ তোমার বিক্ষত দিন* (১৯৮৬), *কালো কালো মেহনতী পাখি* (১৯৯৫), *কংকালে অলংকার দিয়ো* (১৯৯৬), *শ্যামল যাযাবর* (১৯৯৮), *মানবহাড়ের হিম ও বিদ্যুৎ* (২০০১), *মনীষাকে ডেকে ডেকে* (২০০২), *আমার যত রক্তফোঁটা* (২০০২), *রাভী* (২০০৮), *হাওরের হাহাকার* (২০১০) প্রভৃতি তাঁর কাব্য। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সহযোগে কবির *নিজস্ব এই মাতৃভাষায়* (১৩৯৭) কাব্যটি দুই বাংলার নিশিজাগর চন্দ্রপ্রলাপ, নষ্টস্বপ্নের বিষাদগাথার বিরচন। স্বদেশ, স্মৃতি, নস্ট্যালজিয়া 'আমি' থেকে 'আমরা'য় পর্যবসিত।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪)
'নতুন কবিতা'র কবি হিসেবে তাঁর পরিচয়, 'Keats-এর মতো প্রেম ও সে-জগতকে ফিরে পাই তাঁর কবিতায়, তবু Keats নয়, Wordsworth-এর মতো ভালবাস্তে গিয়ে নিজের মতোই ভালোবেসেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সমুদ্র, পৃথিবী ও বন মানুষের ভালোবাসার চিরন্তন-ক্ষেত্র—তবু "Great lover" এর মতো "Say that I loved" তেমনি করে বলা। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভালোবেসে ফেলি, সে-প্রেমে এ পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। আর দশজনের মতো নয়, অথচ একটা স্থায়ী আসন রেখে যেতে চায় সে প্রেম পৃথিবীতে। পৃথিবীর ধুলো মাটির গড়া মাটির কন্যাকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর বস্তুনিচয়কে তিনি বাদ দেননি—সে প্রেম ছায়া ফেলে পৃথিবীর বুকে ও মনের গভীরে।' তাছাড়া সমসাময়িক দুর্বহ সময় বা স্মৃতিকাতর দুঃসহ উচ্চারণ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কবিতা। পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিকাতর ও পরিশুদ্ধ কবি। তিনি ইতিবাচক, আশাবাদী প্রণোদনা ছড়াতে চান সনেটে; ইঙ্গিত নিহিত দেশাত্ম পরিক্রমায়। *হৃদয়ে জনপদে* (১৯৭৫), *চাঁদ ডুবে গেলে* (১৯৮৪), *আসন্ন বাস্তিল ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৮) তাঁর কাব্য। সমসাময়িক দুর্বহ সময় বা স্মৃতিকাতর দুঃসহ উচ্চারণ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর কবিতা। পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিকাতর ও পরিশুদ্ধ কবি। তিনি ইতিবাচক, আশাবাদী প্রণোদনা ছড়াতে চান সনেটে; ইঙ্গিত নিহিত দেশাত্ম পরিক্রমায়।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অনূদিত *শেকসপীয়রের সনেট* প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। বাংলা কবিতার পাঠকদের জন্য এ অনুবাদ একটি অনবদ্য গ্রন্থ, সন্দেহ নেই।

ওমর আলী (জ. ১৯৩৯)
মাটিগন্ধি মানুষের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য এ কবির। স্মরণযোগ্য আলেখ্য নির্মাতা। লোকায়ত পরিকাঠামোকে নতুন নন্দনের সৃজনকর্তা। তাঁর *এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি* (১৯৬০) রোম্যান্টিক প্রণয়মাখা আবেগস্পন্দিত কাব্য। কাব্যটি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ কালপরিসরে রচিত। কবির প্রথম কবিতা ১৯৫৭ সালে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাধারণ বিষয়বস্তু তথা গ্রামীণ জীবননির্ভর উপাদানে *এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি* নির্মিত হলেও এটি সর্বোতভাবে আধুনিক। জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬) ও বন্দে আলী মিয়ার (১৯০৬-৭৯) কাব্যধারায় ওমর আলী কবিতার ইমেজে যুক্ত করেছেন গ্রামীণ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ রূপলাবণ্য। এক 'শ্যামাঙ্গী নারী'র প্রতিকৃতি আটপৌরে এবং চরমরূপে উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। এই একটি কাব্যগ্রন্থই তাঁকে দিয়েছে প্রকৃত কবির মর্যাদা। কাব্যটিতে মোট কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশটি। কবিতাগুলোর মৌল কেন্দ্র 'নারী'। একত্রিশটি কবিতায় আছে প্রেম। 'হাসিনা', 'মিমোসা', 'নীলুফার', জুনো (গ্রীক পুরাণে জুপিটারের স্ত্রী), শিরীণ ফরহাদ, সেলিম-আনারকলি—এসব নারী কবিতার রোম্যান্টিক প্রেম উদ্দীপনায় দেশ-কালের সীমা মানেনি। কবিরচিত 'তোমাকে', 'যৌবনের প্রার্থনা এই', 'রমনা', 'একদিন তুমি', 'একদিন একটি লোক', 'পাথর', 'তুমি সুন্দরী', 'বৃষ্টির বিপদে এক চড়ুই', 'পটভূমিকা', 'সুসজ্জিতা' কবিতায় আধুনিক কাব্যরুচির প্রতিফলন রয়েছে। ত্রিশোত্তর আধুনিক বৈশিষ্ট্যটি এতে চমৎকাররূপে উদ্ভাসিত :

> সযত্নে ছায়ার নীচে ঢাকা থাকে মেয়েদের স্তন
> এবং দেহের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রচুর সম্ভার।
> দেখেছো তোমার নাম এইবার পড়ে গেল মনে,
> যখন ঠোঁটের পরে ঠোঁট রেখে বললে চুম্বনে।

কিংবা,

> চোখে দেখি জ্বলে ওঠে নীরব উল্লাসে,—
> দেহে দেখি সুরভিত সৌন্দর্যের লোভনীয় সোনা,

এ নিষ্কাম প্রেম নয়, ইন্দ্রিয়ঘন প্রেম। আদিরসনির্ভর রিরংসাবৃত্তিজাত (erotic tendency)। পঞ্চাশের শেষে এ বিষয়-আরাধ্য সমাজ-অনুশাসন প্ররোচিত নয়, রক্ষণশীলতার বিপরীতে এক ভিন্ন ও আধুনিক কাব্যরুচি, সন্দেহ নেই।

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি কবিতায় মৃত্যুচেতনার বিষয়টিও উপস্থিত। এছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কজাত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বহুমুখী রূপায়ণ, নরনারীর মানসিক লীলা প্রত্যহিক প্রতিকৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রেম পিউরিটান নয়, মৃন্ময়ী বাস্তব ও কামবাসনার লালিত্যে প্রদীপ্তময়।

কবির পরিপক্ব বোধে উত্থাপিত নন্দনভূমি প্রচ্ছন্ন মেজাজে প্রতিফলিত। কবিচেতনায় বিরাজিত ঔদার্য অসীমতার নম্র নেত্রপাতে প্রকাশিত। মাত্রাবৃত্ত কিংবা অক্ষরবৃত্ত মুক্তক ছন্দটি দুলতে থাকে কবির ভাবের সঙ্গে, দুরন্ত দ্যোতনায়। অসহ্য সুন্দরের ভেতর প্রকৃত মাটি-মানুষ-ভূমির ক্ষেত্রটি যেমন রচিত তেমনি উন্মুলিত মানুষের মানচিত্রও প্রতিফলিত। ওমর আলীর ছন্দ খুঁজে পায় আবহমান বাঙালি ও বাংলাদেশের স্নিগ্ধ স্বপ্নকাতর রূপ। তীব্র সংবেদনশীলতায় জীবন-সংস্কৃতির যাবতীয় রূপ বাংলাদেশের কবিতায় দৃঢ়ভিত্তি পায়। *এদেশে শ্যামল রঙ রমনীর সুনাম শুনেছি* (১৯৬৭), *আত্মার দিকে* (১৯৬৮), *নদী* (১৯৬৯), *নিঃশব্দ বাড়ি* (১৯৭৩), *অরণ্যে একটি লোক* (১৯৭৪), *বিলেতে অনিচ্ছুক একজন* (১৯৭৫), *নরকে বা স্বর্গে* (১৯৭৫) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

শহীদ কাদরী (জ. ১৯৪২)

'লেখার সংখ্যা সামান্য হলেও কবিতায় বাঙ্‌ময় জীবনদর্শন অসামান্য এবং সম্পূর্ণ, দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ও নিঃসংশয়, পর্যবেক্ষণ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, প্রকাশ অনবদ্য ও মেদহীন। তাঁর কবিতার অন্তর্গত যাবতীয় বোধ দেশকালের সীমানাকে ডিঙিয়ে আধুনিকতার নির্মাল্য হয়ে উঠেছে।' পঞ্চাশ-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিক মননের ছাপ ও নাগরিক জীবনবোধের সংযোগ ঘটিয়ে কবিতার উৎকর্ষে অর্জিত– শহীদ কাদরী। *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭), *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪), *কোথাও কোন ক্রন্দন নেই* (১৯৭৮) তিনটি কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেছেন ষাট-উত্তর আত্মমুখি জীবনচেতনার গরল ও গ্লানি, যেখান থেকে মুক্তির অভিমুখে নির্ণয় করে সুন্দর-সুশ্রী নব-আধুনিক প্রতিজ্ঞা। কবি—শব্দে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বুদ্ধি ও মস্তিষ্কই সে শব্দের নির্মাল্য, এলিয়টিয় 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ' প্রবণতায় যুক্ত হয় নির্বাচিত শব্দ-সারাৎসার, বিশশতকী ইমেজিস্ট ধারায় সেই শব্দে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-পরিহাস বয়ে আনে নাগরিক সংকোচঘুণ-ম্লান মূল্যবোধ আর 'মুমূর্ষু স্তনে'র অসুস্থ স্পন্দন। এসব শব্দপ্রতিমায় শহীদ কাদরীই বাংলাদেশের কবিতার প্রকৃত নাগরিক আইডল। যা পরবর্তীতে অন্যদের হাতে নবায়িত হয়েছে, ক্রম-বিবর্তন পেয়েছে—কিন্তু উৎসশক্তির কেন্দ্রটিতে তিনিই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। তিনটি কাব্যে এমন বোধের নির্ঝর-নির্মাণ ছুঁয়ে গেছে কবিতার মর্মদাহী অনেক প্রান্তমুখ।

কবির অবক্ষয় ও কৃত্রিম-ক্লান্ত রসশ্লেষ ওই সময়ে আঁতুর র‍্যাবো বা শার্ল বোদলেয়ারের অন্ধকার আধেয় প্রভাবাক্রান্ত হলেও জড়িয়ে নিয়েছিল সদ্য-মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার অনিকেত প্রবৃত্তিতে—ফ্যাকাশে পতিতার দেহরূপ, যেখানে মাতৃজরায়ুর অন্ধকারও হয়ে ওঠে অনিরাপদ—তাই কুঁকড়ে যায় চৈতন্য ও দৃষ্টিপাতের দীপহীনতা :

জন্মেই কুকড়ে গেছি মাতৃজরায়ণ থেকে নেমে—
সোনালী পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিল যেন
দীপহীন ল্যাম্পোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রক্তচক্ষু সেই থাক আউট আঁধারে।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই বেরুনো প্রথম কাব্যের নামকবিতায় এমন ভিন্নকথনের স্বর, চিরসাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়ায়, সামনের জন্য। পরের কাব্যধারায় তা শমিত, পরিপক্ব এবং গতিময় প্রাণবন্ত। কবিতাধারায় চিহ্নিত এই নতুন মুখটি সাহসী; মেধাবী তো নিশ্চয়ই :

যুদ্ধ, হত্যা, মারী, মড়ক, টুথব্রাশ, মাজন—এরা সব
জীবনের জটিল কল্লোল হয়ে ওঠে

শামসুর রাহমান প্রথমদিকে এ স্বরটুকু তৈরি করে নিয়েছিলেন তার 'দুঃখ' কবিতার নৈমিত্তিক ব্যবহার্য বস্তুসামগ্রীতে। সেটি আরও ব্যপকতায় এখানে এই ভিন্ন প্রতিপাদ্যে খচিত। অবচেতনে 'প্রিয়তমা'র স্বর (স্বদেশ অর্থে) গড়ে ওঠে, বৃটিশ কবি আড্রিয়ান হেনরির (১৯৩২-২০০০) প্রভাবও কম মনে হয় না। আছেন ব্রেখটও। পরাচেতনার অনুষঙ্গও দানা বাঁধে। ওই সময়েই আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং পরবর্তীতে সিকদার আমিনুল হককে স্মরণে আনা যায়। শহীদ কাদরী ১৯৭৮-এর পর দেশত্যাগ করেন।

দীর্ঘ বিরতির পরে কবির বের হয় *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* (২০০৯), *প্রেমের কবিতা, তোমার জন্যে* (২০১০) কাব্য। ৩৬টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও*-র প্রথম কবিতা 'স্বতন্ত্র শতকের দিকে' :

শতবর্ষ পরমায়ু নয় যে আমার আমি তা জানি। তবু
আমার নিজস্ব শতকের গোধূলির দিকে তোমার মতন
অগ্রসরমান আমিও, এবং সেই সঙ্গে দেখে যাই
অস্তরাগ মানবিকতার।

আমাদের মধ্যে যারা, স্বপ্নকরোজ্জ্বল চোখে, পৌঁছে যাবে
নবীন শতকে, তারা কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমার?
ভথবা আমি কি সহোদর তাদের? জানি না। কিন্তু অনবরত

বিদ্যুতে বিদ্যুতে স্বপ্নে স্বপ্নে ঝলসে উঠছে ফলপ্রসূহীন
আমার আকাশ।

প্রশ্ন-পরবর্তী সংশয়হীনতায় 'আমি'-ফলপ্রসূহীন। সঙ্গহীনতার ক্ষেদ, একত্বের শূন্যতা এই শতকেও বা মৃত্যুপর্যন্ত যদি বিস্তার পায় তবে আগের সেই মদ আর আফিমসেবীদের যে বিশৃঙ্খলা—তাতে মন্দ কীসে? এ কবিতায় সাম্য, সোভিয়েত বিপর্যয়, বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ কট্টর অভিজ্ঞাতা নিজেকে নিঃশব্দ শূন্যতার ভেতরে ঠেলে দিয়েছে। সে কারণেই তাঁর ফিরিয়ে নেওয়া চুম্বনগুলো এবং প্রজন্মান্তরে তা পৌঁছে দেওয়ার এ কুশলী ডাক।

স্বতন্ত্র ভাষার শহীদ কাদরী পরবর্তী কাব্যধারার অনেককেই প্রভাবের শক্তি যোগান। তাঁর শব্দ যতোটা আবেগের তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধিস্নাত। বৃদ্ধিটুকু অবচেতন-চেতন-অর্ধচেতন থেকে উৎসারিত। 'প্রিয়তমা' ও 'স্বদেশ' স্বপ্নজাত মিথপ্রবণ বলয়ে প্রতিভাসিত। এটি উত্তর-উপনিবেশী (post-colonial) চিন্তাস্রোতে পরিমাপ্য। সমাজসচেতন এ কবি, অপরতার বৃত্তে আঘাত করেছেন আত্মবিনষ্টির কারণ অনুসন্ধানে, সেখানে পুঁজির দম্ভ ও উপনিবেশ-আধিপত্য এক ভেল্কী, তাই তাঁর শব্দ হয়ে উঠেছে কঠোর আক্রান্তপ্রবণ—'মাংসশিকারী একদল হায়নার দাঁতের মতো ধারালো বাতাসে আক্রান্ত আমি'। এই কাব্যভাষ্যে শহীদ কাদরী অতুলনীয়। এবং কবিতাধারার নতুন অভিমুখ, বলাইবাহুল্য।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

ষাটের সুররিয়ালিস্ট কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ। বৈদ্যুতিক দ্যুতিময় প্রতীকে, কিন্নরকণ্ঠী শিল্পী। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে প্রথম পরাবাস্তব ফর্মে; আত্মমগ্ন অবচেতন বৈভবে যতিচিহ্নহীন কাব্যভাষা নির্মাণ; *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* (১৯৬৭) থেকে ও *সংবেদন* ও *জলতরঙ্গ* (১৯৭৪) উত্তরিত ও প্রবর্তিত। *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের* গদ্যকবিতা (prose poem) কবির ষাটের তীব্র সাহসী উচ্চারণ; পরবর্তী আত্মমগ্নতায় তা কয়েকধাপ এগিয়ে *জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা* (১৯৬৯) হয়ে সামনে এগুনো। আবদুল মান্নান সৈয়দ কবিঅভিজ্ঞতায় প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাসকে ভেঙেছেন অভিনব উপমাপ্রতিমায়। ষাটের শেষদিকে কবিতায় নাট্যমৌহূর্তিক ক্ষণকে উপভোগের পর অমিত সাহস আর বাকভঙ্গিকে ভর করে 'ঘুমের ভেতর নিদ্রাহীন' অন্তঃপ্রবাহে 'স্বজ্ঞা ও অবচেতনের, চৈতন্য ও নিহিতের, আকস্মিক ও যুক্তিহীনতার, আবেগের ও আন্তর প্রস্তুতির, কল্পনা ও ঝড়ে-ওড়া শিকলের সমবায়ী ফলাফল'কে মজ্জারসে বিরচন করেন। সেখানে তিনি এক রূপকপ্রতীকের সুনিশ্চয় স্বপ্নদ্রষ্টা :

কটির তলে নতুন-জাগা পাতা

কৃতজ্ঞতার নকশি-আঁকা
পাঠিয়েছিলে কবে,
আজ সে কাঁদে স্মৃতির হাতে
করুণ-উন্নত

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছর এমন প্রকরণের পর ও *সংবেদন ও জলতরঙ্গে* কবি লেখেন :

খুব মধ্যরাতে
বাস্তবের দরোজা খুলে আসি স্বপ্নের বারান্দায়
অনন্ত নক্ষত্রের নিচে চোখ জলে ভরে আসে আমার
খুব মধ্যরাতে
দুই মানবিক তারার মতো জল-ভরা চোখে
যাবতীয় গদ্য-কাজের জন্য
নিজের কাছে মাপ চাই আমি
দূরতম নক্ষত্রের থেকে একটি তরল তীর ছুটে এসে
বিঁধে যায় আমার আত্মায়

অবচেতন পরাবাস্তব কৌশল থেকে এক পর্যায়ে সচেতন বুদ্ধির প্রয়োগে কবিতায় চাক্ষুষ রোম্যান্টিক জগতে ঢুকে পড়েন। তখন তাঁর কাব্যলক্ষী দুর্বীনিত নয়, পরবর্তী স্তরের পূর্ণায়ত সান্নিধ্যের প্রত্যাশী। এ পর্যায়ে কবির পরাবাস্তব কবিতা পূর্ণ মাত্রার উদাহরণ, যেখানে কবির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রটি চিনে ফেলা সম্ভব হয় :

ছন্দ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নয়। তোমাকে দেখার পরে
নিশ্চিত বুঝেছি : গদ্যছন্দে বড়ো-বেশি লেখালেখি হ'লো,
এবার ফিরতে হবে।

এবং আরও পরে,

কবিতার হাত, পা, মাথা, ধড়
শিশ্ন, যোনী, চুল, নখ,
চোখ, মুখ, নাক, কান,
হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল—
সবকিছু মওজুদ আছে আমাদের এখানে।

কবিতার ফর্মে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নমস্য কবিদের শব্দার্থ স্বরূপ, ছন্দ আর নিজের নিরীক্ষার ভেতরে নিজেকে সেঁধিয়ে নেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এ পর্যায়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিষয়গুলো ধারণ করে বাংলা কবিতাকে বিশিষ্ট করে তোলেন। তবে তিরিশি আধুনিকতা নয় বরং আত্মবোধের সচেতনতায় এক ধরনের অনিবার্য-মনস্কতারই মুখোমুখি দাঁড়ান কবি। এক্ষেত্রে কবির মনস্তত্ত্বে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী চিন্তাস্রোত, নবগঠিত নগরচেতনা, নস্ট্যালজিয়ার

কাতরোক্তি ইত্যাদি অন্তর্মুখি বাতাবরণ তৈরি করে। যেখানে মান্নান রীতিমতো শরণ নেন পরাবাস্তববাদী প্রকরণে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার মানুষ মোটেই তাঁর কাব্যে তিরোহিত নয়। উত্তরণের পরিক্রমাতেও কবি সামগ্রিক হওয়ার পথেই এগুতে থাকেন। ফলে তাঁর শৈলিও একরকম থাকেনি। তাঁর *মাতাল মানচিত্র* (১৯৭০) বিভিন্ন ভাষার পনের জন কবির অনুবাদ। *কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড* (১৯৮২), *পরাবাস্তব কবিতা* (১৯৮২), *পার্কস্ট্রিটে এক রাত্রি* (১৯৮৩), *মাছ সিরিজ* (১৯৮৪), *পঞ্চশর* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠকবিতা* (১৯৮৭), *আমার সনেট* (১৯৯০), *সকল প্রশংসা তাঁর* (১৯৯৩), *নীরবতা গভীরতা দুই বোন কথা বলে* (১৯৯৭) আবদুল মান্নান সৈয়দের কাব্যগ্রন্থ। *আমার সনেট* তাঁর ব্যতিক্রমী গদ্য সনেট। বিষয়ের বৈচিত্র্য আছে স্বপ্ন আনন্দের বর্ণিল উচ্চারণে।

আজিজুল হক (১৯৩০-২০০১)

আজিজুল হক ব্যক্তিজীবনের সীমায় মহাকালকে অবলোকন করেন। সেখানে যন্ত্রণা-অন্ধকার-মৃত্যু সামগ্রিক দ্যোতনায় প্রকটিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রূপকে, কটাক্ষতায়; কবি এসব থেকে মুক্তি চান। তিনি চান বিচ্ছিন্নতার অবসান। প্রথম কাব্য *ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে* (১৯৬৯)-র পর *বিনষ্টের চিৎকার* (১৯৭৬)-এ কবি বেশি সংহত। বোধ ও বুদ্ধির সংশেষ আরও প্রগাঢ়। ঝিনুক-স্বভাবকে সময়ের আবর্তে ক্ষিপ্রগতিতে বহির্মুখি, সর্বাত্মক করে তোলেন। এ পর্যায়ে প্রতিবাদ, ইতিহাসচেতনা, আত্মউজ্জীবন স্পষ্ট সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত। বিনষ্টি তাঁকে কাতর করে কিন্তু তা নিরঙ্কুশ প্রখরতায় প্রজন্মের শুভবোধের প্রত্যয়কে সমর্থন জানায়। *ঘুম ও সোনালী ঈগল* (১৯৮৯)-এ কবির আশাবাদ ও যন্ত্রণামুক্তি অনেকটা স্থৈর্য দেয়। বাংলাদেশের বিষাদকে যেন 'সূর্যস্পর্শী' স্বপ্নে ফেরাতে চান। আজিজুল হক পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শাসন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরের স্বাধীন বাংলাদেশকে মন্ময় ম্যুরালে, প্রচ্ছন্ন প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। অপাপবিদ্ধ সব নন্দিত শোক কবির কাছে যেন দিব্যাবিষ্ট। কবি যন্ত্রণামুক্ত হননি অন্তরঙ্গে, কবিভাষায় তা নির্মিত; কিন্তু শুভবিশ্বাস তাঁর স্বদীক্ষিত।

মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩)

মোহাম্মদ রফিক কবিতায় কল্পলোকের বাইরে সত্য ও বাস্তবের বহিঃপ্রকাশ তীব্রতর। প্রচণ্ড সংযত ও ব্যঞ্জনাস্পর্শী এ কবিতায় অবগাহন করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর আধুনিক আকর্ষিত ঋজুরেখ রূপটি। 'বইটির নাম *বৈশাখী পূর্ণিমা*— বেরিয়েছিল ১৯৭০-এ, ১৯৬২ থেকে ৬৮ সালের মধ্যে লেখা। অর্থাৎ প্রায় গোটা ষাটের দশক জুড়ে।' উদ্ধৃতি :

আজ রাতে দেখি আমি তন্দ্রায় বিবশ সবে,
পাখিদের কোলাহল বৃক্ষের মর্মর
কি এক বৈদেহী সুরে
বিভাসিত চাঁদ আর তারার প্রণয়ে

'কেউ হঠাৎ করে শুধু অকারণ উৎসাহেও জিজ্ঞাসা করে বসতে পারেন, কাব্যগ্রন্থটির কেন নাম দিয়েছিলাম 'বৈশাখী পূর্ণিমা'। আমি কৈশোর-যৌবনের সেই টালমাটাল দিনগুলোতে গৌতম বুদ্ধের ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়ি। আমি বিশ্বাসী নই, অবিশ্বাসীও নই। এমনই আমার চৈতন্যের ধারা সেই কাল থেকে।'

এরপর 'সর্ব অর্থে' কবি যা লেখেন স্বাধীন বাংলাদেশে তা তাঁকে স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত করে। তবে এক দূর পরিব্যাপ্ত প্রতীমা নির্মাণ করেন কবিতায় :

আজ রাতে দেখি আমি তন্দ্রার বিবশ সবে,
পাখিদের কোলাহল বৃক্ষের মর্মর
কি এক বৈদেহী সুরে
বিভাসিত চরাচর চাঁদ আর তারার প্রণয়ে;

'পাখি', 'বৃক্ষ' মরমীধ্যান পায়। পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রত্নময় হয়ে ওঠে। কবির *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯)র পরে *গাওদিয়া* (১৯৮৬) জনপ্রিয় এবং বহুপঠিত কাব্যগ্রন্থ। কবির কবিতায় কল্পলোকের বাইরে সত্য ও বাস্তবের বহিঃপ্রকাশ তীব্রতর, নিরাসক্ত। প্রচণ্ড সংযত ও ব্যঞ্জনাস্পর্শী এ কবিতায় অবগাহন করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর আধুনিক আকর্ষিত ঋজুরেখ রূপটি :

শুধুমাত্র বুকে নিয়ে বলেশ্বর-পশুর মোহনা
ভাসতে ভাসতে উঠে আসছে তীর খুঁড়ে একটি রাত;
হাঁটুতে মাটির দাগ, মাছ-শ্যাওলা আঁশটে কররেখা!

কবির কাব্য-নিবেদন বহুদূরব্যাপ্ত চেতনায় কিন্তু অন্তর্গাত্রে বিরাজমান স্বাভাবিক ইচ্ছাকাতর ও দহনদুস্থ প্রেম। এ প্রেম প্রকাশে কবিআশ্রিত প্রকৃতি এক রকমের প্রাণায়িত (anthropomorphic) সমগ্রতায় উপস্থিত। যেখানে প্রকৃতি ও নারী একীকৃত। কবি-নির্ধারিত প্রকৃতি চেতনায় একদিকে বিধৃত তার স্নিগ্ধ রূপবৈচিত্র্য অন্যদিকে বিনাশ-বৈনাশিকতা। আবার একইরূপে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের শোষণ, স্বেচ্ছাচারিতা যেমন আছে তেমনি চিরায়ত স্পন্দ্যমান জীবনও আছে। এমন আদর্শগত উপাদানের সঙ্গে সমান্তরাল সমাজ অভিজ্ঞতা মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। কবির প্রত্যক্ষ ও সামূহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় পঠনের উৎকীর্ণ মননশক্তি। ফলে আঙ্গিকটি পায় আধুনিক অবমুক্ত মাত্রা। কবি বলেন :

পাকে-পাকে অন্ধকার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অজগর

গিলে ফেলে সারাটা আকাশ দু'একটা ভীত তারা
দক্ষিণের পুকুরঘাটায় তীর ঘেঁণে তেজী ভাম
তীক্ষ্ণ হয় খাড়া নখ, নাকে রোহিতে আঁশটে ঘ্রাণ

বা,

লিকলিকে কাল সাপ, সুচতুর, কুটিল সন্ধানী,
ঢুকে পড়ে প্রতিটি অন্দরে, বিবাহিত বিছানায়

'অজগর' প্রতীকে পরিণত। একইভাবে লিকলিকে কালসাপও। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজির, মার্কেন্টাইল বাণিজ্যব্যবস্থার সাম্রাজ্য-কাঠামোটি এরূপে প্রাণবন্ত। 'ভীত তারা'য় প্রান্তিক জনতা প্রতিমূর্ত। এখানে দুটো কাজ লক্ষ্যনির্দিষ্ট : এক. বর্তমান বাস্তবতার কাঠামোটি পর্যবেক্ষণ দুই. এদেশীয় ঐতিহ্যের আলোকে তার প্রত্নরূপ নির্ধারণ। কবির এ সমান্তরাল বয়ান মননশাসিত এবং অন্তঃস্রোতারূপী। শাসন-ত্রাসনের রূপটিকে প্রকরণ-অভিষ্ট করে তোলেন তিনি নিন্দিত প্রাণীকে (অজগর, ইঁদুর, শকুন) চরিত্র বানিয়ে। এক্ষেত্রে জাতিক, আন্তর্জাতিক দুপর্যায়ের শোষণের রূপই তার কবিতায় উৎকীর্ণ:

নিত্যদিন জাতীয় সংবাদে ছুঁচো ইঁদুরের মুখ
লকলকে তীক্ষ্ণ গোঁফ, লাল নাসা, চকচকে চোখ

এবং,

শকুনের নখ থেকে জন্মাল ইঁদুর

অপহারী সামরিক শাসন, তার স্বেচ্ছাচারিতা, সর্বগ্রাসী তৎপরতা 'ডাইনি', 'রাক্ষুসী'র লোকপ্রত্নরূপে পরিবেশিত। এমন সমকাললগ্নতায় মুক্তিযুদ্ধ কবির কাছে নবান্ন উৎসবরূপে গণ্য।

মোহাম্মদ রফিক লৌকিক আমেজে যুক্ত করেন আধুনিক উপাদান—তখন 'অশ্বের ক্ষুরধ্বনি' আর 'মৃত বাঘের পাঁজর' এক স্মৃতিরেখায় পৌঁছে দেয় কিন্তু সময়খণ্ডের তির্যকধারাটি বহাল থাকে। মোহাম্মদ রফিক পাল্টান, বিবর্তিত হন, তাঁর স্বতন্ত্র পথটি খুঁজে নেন। বিভিন্ন রীতিতে তা পরীক্ষণীয় রূপও অর্জন করে। যেমন আন্তরপাঠমূলক রীতিতে (intertexuality) 'কপিলা' বা 'গাওদিয়া' বাঙময় হয়ে ওঠে। এরকমে দুঃখ-দারিদ্র্য, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতায় প্রকৃত প্রয়াসে অন্তর্বয়িত হয়। বাংলাদেশের কবিতায় এমনটি সচরাচর মেলে না—আর বহুচর্চিত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। *কপিলা* (১৯৮৩) পাঠকপ্রিয় কাব্য। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন : 'একটি ঘোরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল কপিলা। ১৯৮৩র ১০ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি এই পনেরো দিন, আমি জানি না কীভাবে কেটেছে আমার। স্বচ্ছন্দে বলা যায় ভূতে পেয়েছিল আমাকে।' আশির স্বৈরশাসনের ভেতরে তৈরি হতে থাকে এর কাঠামো। প্রতিরোধী সময়ে 'কপিলা কাদায় জলে,

ঘামেশ্রমে অন্নদা স্বদেশ।' আরও দীর্ঘ স্পষ্টতা 'মোছো রক্ত, পইঠার ওপরে কালসিটে, এই/ লড়াই চলবেই।' এক্কেবারে অভিনব। কবির *বিষখালী সন্ধ্যা* (২০০৩)ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্য।

কবির কাব্য নিবেদন বহুদূরব্যাপ্ত চেতনায় কিন্তু অন্তর্গাত্রে বিরাজমান স্বাভাবিক ইচ্ছাকাতর ও দহনদুস্থ প্রেম। এ প্রেম প্রকাশে কবিআশ্রিত প্রকৃতি এক রকমের প্রাণায়িত সমগ্রতায় সমুপস্থিত। যেখানে প্রকৃতি ও মানুষ একীকৃত। কবি-নির্ধারিত প্রকৃতি চেতনায় একদিকে বিধৃত তার স্নিগ্ধ রূপবৈচিত্র্য অন্যদিকে বিনাশ-বৈনাশিকতা। আবার একইরূপে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের শোষণ, স্বেচ্ছাচারিতা যেমন আছে তেমনি চিরায়ত স্পন্দ্যমান জীবনও আছে। এমন সমান্তরাল সমাজ অভিজ্ঞতা মোহাম্মদ রফিকের কবিতার বিষয়। এখানে কবির প্রত্যক্ষ সামূহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় পঠনের উৎকীর্ণ মননশক্তি। ফলে আঙ্গিকটি পায় আধুনিক অবমুক্ত মাত্রা। মোহাম্মদ রফিক আবাল্য গ্রামলালিত। সে কারণে লৌকিক সুরটিও বিভিন্ন রীতিতে পরীক্ষণীয় রূপ অর্জন করে। যেমন আন্তরপাঠমূলক রীতিতে (intertexuality) 'কপিলা' বা 'গাওদিয়া' বাঙময় হয়ে ওঠে। এরকমে দুঃখ-দারিদ্র্য, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতায় প্রকৃত প্রয়াসে অন্তর্বয়িত হয়। তাঁর কাব্য *বৈশাখী পূর্ণিমা* (১৯৭০), *ধুলোর সংসারে এই মাটি* (১৯৭৬), *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯), *কপিলা* (১৯৮৩), *খোলা কবিতা* (১৯৮৩), *উপকথা* (১৯৮৫), *গাওদিয়া* (১৯৮৭), *স্বদেশী নিঃশ্বাস-তুমিময়* (১৯৮৮), *মেঘে এবং কাদায়* (১৯৯১), *মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৩), *রূপকথা কিংবদন্তী* (১৯৯৮), *মৎস্যগন্ধা* (১৯৯৯), *মাতি কিসকু* (২০০০), *স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে* (২০০২), *ভালোবাসার জীবনানন্দ* (২০০৩), *বিষখালী সন্ধ্যা* (২০০৩), *কালাপানি* (২০০৬), *নির্বচিত ১০০ কবিতা* (২০০৬), *দো-মাটির মুখ* (২০১০) প্রভৃতি।

নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫)

সাম্প্রতিক সময়ে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় কামই শিল্প। আছে তার বহুতর বন্দনা। প্রত্যক্ষ ও নিরাবরণ হলেও কবিতা তীক্ষ্ণধী উইটে রূপময় মাত্রা পেয়ে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে কবির ক্যারিজমা—পাঠকের রসগ্রাহী সমর্থনকে সাবলীল রেখেই শিল্পকে স্পর্শ করতে পারা। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা *অমীমাংসিত রমণী* (১৯৭৩), *বাৎসায়ন* (২০০০)র কাম স্থূল নয়, প্লেটোনিক ভাবে পর্যবসিত। আটান্নটি প্রেমের কবিতা নিয়ে *অচল পদাবলী* (১৯৮২) রচিত। 'সংসারের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গে মিলনাত্মক প্রেমের বিচিত্ররূপ এখানে বাঙ্ময়।... কবিতাগুলো মিলনাত্মক হলেও কিছু কিছু কবিতা মিলনের তৃপ্তিসুখ-বন্দনায় উজ্জ্বল, আর এক ধরনের কবিতার মিলন সুখ দীর্ঘ না হওয়ার আশঙ্কায় ব্যথিত।' তাঁর অন্য প্রেমের কবিতা *দীর্ঘ*

দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪), *চৈত্রের ভালোবাসা* (১৯৭৫)। গণ-আন্দোলনের পদাতিক কবিও বটে তিনি। রাজনৈতিক ভাষ্যকে অনুপম শিল্পে বন্দি করেন নির্মলেন্দু গুণ। চেতনায় সমাজতন্ত্র ও বিবর্তিত সমাজ বিশ্বাস স্পষ্টতর। তাঁর কাব্যে এর জন্য উগ্র ও প্রত্যক্ষ চিৎকার ধ্বনিত। সাতের মাঝামাঝি নির্মলেন্দু লোকায়ত স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত করেন সংগ্রামকে। সে সংগ্রামে থাকে অলজ্জ, রুক্ষ মেজাজ। সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় আধুনিক চিন্তনে তাঁর কবিভাষা ক্রম-উত্তরিত। কবিতার দীর্ঘায়ত পদযাত্রায় সামূহিক অবচেতন স্তরে রচিত উপমাপ্রতিমায় কবি উদ্‌বোধিত। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত আবেগশুদ্ধ মননে বৈশ্বিক বাস্তবতাটিও বিপুল ব্যঞ্জনায় স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ পায়। প্রেম-কাম কিংবা রাজনীতির মতো চেতনাশুদ্ধ স্পর্শকাতর বিষয়ের প্রতীকী বিবেচনা একমাত্র নির্মলেন্দু গুণেই সম্ভব। নির্মলেন্দু গুণ অবসিত বা বিবরবাসী নন, সেসব থেকে সম্ভাবিত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসে প্রদীপ্ত। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লবের স্ফূর্তি, সমাজতান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় অনেকটা অবক্ষয়-অবসিত কাল চলছে তখন। মুক্তিসংগ্রামের দিকে যে চলমান স্রোত—তাকে মুখোমুখি রেখেই *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* লিখিত। জননন্দিত "হুলিয়া" তারই প্রতিচ্ছবি। "যুদ্ধ", "স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর", "নিক্সনের জাহাজ", "জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ" নিজের আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পাঠ্য। গণ-আন্দোলনের পদাতিক হয়ে ওঠেন, রাজনৈতিক ভাষ্যকে অনুপম শিল্পে বন্দি করেন। 'আমার কবিতা আমার সংগ্রামী আত্মার হৃৎস্পন্দনচিত্র। আমার আত্মার আনন্দের সঙ্গে, উপলব্ধি ও আর্তির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছে বলেই আমি যখন শ্রমিক-কৃষকের কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলি, তখন কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন আমি বুঝি কবিতা বাদ দিয়ে রাজনীতি করছি। প্রকৃতপক্ষে মোটেও তা নয়।' (*নির্বাচিতার* ভূমিকাংশ) চেতনায় সমাজতন্ত্র ও বিবর্তিত সমাজ বিশ্বাস স্পষ্ট। তাঁর কাব্যে সেজন্য উগ্র ও প্রত্যক্ষ চিৎকার ধ্বনিত। সাতের মাঝামাঝি নির্মলেন্দু লোকায়ত স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত করেন সংগ্রামকে। সে সংগ্রামে থাকে অলজ্জ, রুক্ষ মেজাজ :

> তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিনে দিতে পারবো
> একসেট সোনার গহনা, নিদেনপক্ষে নাকের নোলক একখানা।
> তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন আমি কিনে দিতে পারবো
> একটি আশ্চর্য সুন্দর ইজিপ্সিয়ান কার্পেট। মখমলনীল শাড়ি পরে
> তুমি ভেসে বেড়াবে সারা ঘরময় রাজহাঁস।
> কিন্তু তার আগে চাই সমাজতন্ত্র।

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনায় আধুনিক চিন্তনে তাঁর কবিভাষা দুর্বিনীত। এমনটি ষাটের প্রায় সব কবিরই বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ যে কারণে নির্লিপ্ত, রফিক আজাদ বেপরোয়া, আবুল হাসান স্বাপ্নিক সেভাবেই নির্মলেন্দু গুণ অকপট-অলজ্জ-আক্রমণাত্মক। সত্যিই 'শেষ ষাট থেকে তাঁদের উঠে আসা, বিকাশ পূর্ণতা মুক্তিযুদ্ধের পরে।' ষাটদশকীয় পাশ্চাত্য কবিকুলের (আড্রিয়ান হেনরী বা রজার ম্যাকগাফ) প্রভাব অনেকের মতো (শামসুর রাহমান, রফিক আজাদ) নির্মলেন্দু গুণকেও আলোড়িত করে থাকবে। গীতল লিরিক, চটুল প্রেম, স্থূল আবেগ, 'লাজুক লিরিক' বেশ সফল আঙ্গিক পেয়েছে :

এইখানে এলে মনে হয় তুমি
সবচেয়ে বেশি নেই।
তোমাকে ক্ষণিক পাবার জন্যে
এইখানেই তবু আসি,
মুগ্ধ পরাণ যতদূর চায়
ততদূর ভালবাসি।

গুণের কবিতার অগভীরত্ব অনেকের কাছে পৌঁছায় কিন্তু আত্মসর্বস্ব হয়ে একাধারে প্রেম ও বিপ্লবের যে নন্দনকানন তিনি নিরঙ্কুশভাবে রচনা করেন তা বাংলাদেশের কবিতায় সহজলভ্য নয়। সমাজসচেতন আবেগে কবি প্রলুব্ধ। তাঁর অন্যান্য কাব্য : *ও বন্ধু আমার* (১৯৭৫), *আনন্দ কুসুম* (১৯৭৬), *বাংলার মাটি বাংলার জল* (১৯৭৮), *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র* (১৯৭৯), *চাষাভুষার কাব্য* (১৯৮১), *পৃথিবীজোড়া গান* (১৯৮২), *দূর হ দুঃশাসন* (১৯৮৩), *শান্তির ডিক্রি* (১৯৮৪), *ইস্‌ক্রা* (১৯৮৪), *প্রথম দিনের সূর্য* (১৯৮৪), *আবার একবার ফুঁ দিয়ে দাও* (১৯৮৪), *নেই কেন সেই পাখি* (১৯৮৫), *নিরঞ্জনের পৃথিবী* (১৯৮৬), *চিরকালের বাঁশি* (১৯৮৬), *দুঃখ করো না বাঁচো* (১৯৮৭), *১৯৮৭* (১৯৮৮), *যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই* (১৯৮৯), *ধাবমান হরিণের দ্যুতি* (১৯৯২), *অনন্ত বরফবীথি* (১৯৯৩), *আনন্দউদ্যান* (১৯৯৫), *প্রিয় নারী, হারানো কবিতা* (১৯৯৬), *শিয়রে বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *ইয়াহিয়াকাল* (১৯৯৮), *আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি* (২০০০), *মুঠোফোনের কাব্য* (২০০১), *নিশিকাব্য* (২০০২), *চিরঅনাবৃতা হে নগ্নতমা* (২০০৫), *মুঠোফোনের কাব্যসমগ্র* (২০০৫), *কাব্যসমগ্র-১*, *কাব্যসমগ্র-২*, *কাব্যসমগ্র-৩* (২০০৫) প্রভৃতি।

সায্‌যাদ কাদির (জ. ১৯৪৭)

সায্‌যাদ কাদির কমিটেড, রোম্যান্টিক। ষাটের প্রান্তপর্বের কবি। *যথেচ্ছ ধ্রুপদ* বেরোয় ১৯৭০-এ। এরপর প্রকরণে নিরীক্ষার পথ ধরে অগ্রসর। সময়কে আয়ত্তে

আনবার চেষ্টা। সেখানেই জীবনকে পর্যবেক্ষণ। *রৌদ্রে প্রতিধ্বনি* (১৯৭৬), *দূরতমার কাছে* (১৯৮৫), *দরজার কাছে নদী* (১৯৯২), *আমার প্রিয়* (১৯৯৫) এসব কাব্যে সায্‌যাদ কাদির সময়ের পথ ধরেই এগিয়েছেন।

মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪)
মহাদেব সাহা মর্বিড রোম্যান্টিক কবিতা লিখে পাঠকের কাতারে দাঁড়ান। নির্বিরোধী; কিন্তু কবিতায় তাঁর পথ অনিরুদ্ধ। বিচিত্র রকমের কবিতা লিখেছেন; অনেক বিষয় এসেছে তাঁর কবিতায়। উত্তরণ অনেক ভাবে, অনেক রকমে। আর্থ-সমাজ রাজনীতির বিষয়গুলো প্রচ্ছন্ন বিরচিত হলেও মর্মদাহ লক্ষণীয়। একান্ত আত্মশ্লাঘা যেমন আছে তেমনি আছে প্রেম; মূলত শিল্পকৃতি রক্ষায় কবি স্থির, সংযত, দৃঢ়। আকণ্ঠ অনুরাগ বা জীবনের প্রমত্ত জঙ্গমতা কাঙ্ক্ষিত নয় মহাদেব সাহায়; নির্বিকার প্রতিমায় সহজাত ছন্দ মূর্ত; ধ্বনিপ্রবাহও অবিরাম, স্নিগ্ধতামণ্ডিত—যেমনটা মাহাদেব সাহার চারিত্র্য, এমনটাই আত্মমূর্তি। সমাজ-রাজনীতি তাঁর কবিতায় থাকলেও প্রধানত অক্রিয় আত্মকথনেই সামূহিক বিবেচনা নির্ণীত। সেভাবেই নিরবধি তাঁর কাব্যচর্চা। মহাদেব সাহার প্রথম কাব্য *এই গৃহ, এই সন্ন্যাস* (১৯৭২) *এরপর মানব এসেছি কাছে* (১৯৭৩), *চাই বিষ অমরতা* (১৯৭৫), *কী সুন্দর অন্ধ* (১৯৭৮), *তোমার পায়ের শব্দ* (১৯৮২), *ধুলোমাটির মানুষ* (১৯৮২), *ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস* (১৯৮৪), *লাজুক লিরিক* (১৯৮৪), *আমি ছিন্নভিন্ন* (১৯৮৬), *মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না* (১৯৮৯), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৯), *প্রথম পয়ার* (১৯৯০), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯১), *রাজনৈতিক কবিতা* (১৯৯১), *কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ* (১৯৯০), *অস্তমিত কালের গৌরব* (১৯৯২), *আমূল বদলে দাও আমার জীবন* (১৯৯৩), *একা হয়ে যাও* (১৯৯৩), *যদুবংশ ধ্বংসের আগে* (১৯৯৪), *কোথায় যাই, কার কাছে যাই* (১৯৯৪), *সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া* (১৯৯৫), *এসো তুমি পুরাণের পাখি* (১৯৯৫), *বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ* (১৯৯৫), *বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই* (১৯৯৬), *আকাশের আদ্যোপান্ত* (১৯৯৬), *তোমার জন্য অন্ত্যমিল* (১৯৯৬), *ভুলি নাই তোমাকে রুমাল* (১৯৯৬), *তুমিই অনন্ত উৎস* (১৯৯৬), *কেউ ভালোবাসে না* (১৯৯৭), *কাকে এই মনের কথা বলি* (১৯৯৭), *অন্ত্যহীন নৃত্যের মহড়া* (১৯৯৭), *একবার নিজের কাছে যাই* (১৯৯৭), *পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি* (১৯৯৭), *ভালোবাসা কেন এতো আলোঅন্ধকারময়* (২০০৫), *প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা* (২০০৫), *লাজুক লিরিক-১*, *লাজুক লিরিক-২* (২০০৬) প্রভৃতি কাব্য।

ফরহাদ মজহার (জ. ১৯৪৭)
কবির বিশ্বাসে প্রধানত বিরাজমান প্রচ্ছন্ন রাজনীতি। কিন্তু শরীরবৃত্তিয় জগতের সূক্ষ্মতর কণিকা এবং তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিংবা কার্যকারণ প্রক্রিয়া ফরহাদ মজহারের মর্মপ্রোথিত। 'নিউরন' জিজ্ঞাসা *খোকন ও তার প্রতি পুরুষ* (১৯৭২) কাব্যে বিদ্যমান। তবে যেমনটা বলা চলে, রাজনীতি—যেখানে শ্রেণিচেতনা, বৈষম্য-শাসন-ত্রাসন বিরাজমান সেখানে বিপ্লবীর স্বপ্ন ও সাহস; কিংবা আশাবাদ তাঁর কবিভূমে প্রবল এক জায়গা সৃষ্টি করে নেয়। কিন্তু ফরহাদ মজহার বিপ্লবের অপরপীঠে অধ্যাত্ম চেতনাতেও কম যান না। সম্প্রতি তাঁর দর্শনগত দিকটি বিতর্কের মাত্রা পেয়েছে। নিরন্তর কাব্যচর্চায় প্রারম্ভিক পর্বে তিনি লিখেছেন গদ্যভঙ্গিতে এবং স্বরবৃত্তের দ্রুত লয়ে; পরে সেটি আর দাঁড়ায়নি। আশির দ্বিতীয় পাদে কিংবা পরে লক্ষ করা যায় অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের স্বরে তিনি জাগরূক। উদাহরণে ধরা যায়, *মেঘ মেশিনের সঙ্গীত*; পুরোটিই আটকে আছে মাত্রাবৃত্তের চালে। ক্রম-পরিবর্তমান, মেধাবী, বিজ্ঞানচেতনাসম্ভূত আধার ও আধেয় তাঁর কবিতা। প্রকরণে যে কবি জীবিত, স্পন্দ্যমান তিনি ফরহাদ মজহার। 'একটু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফুঁ দাও তা'হলে/ খিড়কি দিয়ে অসংখ্য বুদবুদ দেখবে উড়ে যাবে চড়ুইয়ের মতো', 'আজকে ভোরে বনের মধ্যে/ একটি বুনো ফুলের স্বাদে/ কিশোর ভালুক মাতাল হয়ে/ হড়কে পড়ে অথই খাদে'—এসবে কবির একটা রূপান্তর আছে। উপমান, উপমেয়র প্রথাবদ্ধ চিন্তাকে বাতিল করে দেন, বিশেষণ ব্যবহারে সমকালকে অর্থারোপ করেন অন্যমাত্রায়, কামনাকে তুলে ধরেন সংযত ব্যঞ্জনায়, বৈশ্বিক তথা বস্তুবিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ভাবের তুলনায়। কখনো ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্যমাত্রায় প্রশ্রয় দেন কবি। কাঠবিড়ালিকে 'এহতেকাফে' দেখা কিংবা ভালুকের যৌবন উল্লাস পংক্তিমালায় চমৎকার পরিবেশ ছড়ায়। *এবাদনামায়* আরবি-ফারসি-লোকায়ত শব্দবিন্যাস তৈরি করেন। এভাবে তাঁর কবিতা-নির্মাণটি দৃশ্যমান হয়। তবে বর্তমানে তাঁর অনেক বিষয় অমীমাংসিত মনে হয়। *ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি* (১৯৭৭), *আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে* (১৯৮৩), *বৃক্ষ* (১৯৮৫), *সুভাকুসুম দুই ফর্মা* (১৯৮৫), *অকস্মাৎ রপ্তানীমুখী নারী মেশিন* (১৯৮৫), *খসড়া গদ্য* (১৯৮৭), *মেঘ মেশিনের সঙ্গীত* (১৯৮৮), *এবাদতনামা* (১৯৯০), *অসময়ের নোটবই* (১৯৯৪), *দরদী বকুল* (১৯৯৪), *গুবরে পোকার শ্বশুর* (২০০০), *কবিতার বোনের সঙ্গে আবার* (২০০৩) কাব্যের ভেতরে বাংলাদেশের কবিতাভূমে তিনি উজ্জ্বলরূপে অধিষ্ঠিত।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯)

মুহম্মদ নূরুল হুদার অবস্থান ষাট ও সত্তরের সন্ধিপর্বে। তিনি চিহ্নিত 'জাতিসত্তার কবি'রূপে। শেকড়সন্ধানী ও অস্তিত্বপিপাসু কবির *আমরা তামাটে জাতি* (১৯৮১) দিয়ে কাব্যাঙ্গনে শক্ত ভিত্তি করে নেন। পঠন-অভিজ্ঞতায় কবি পৃথিবী ও মানবসৃষ্টির উৎসজ্ঞানকে বিস্তৃতি বা প্রসারিত করে আবেগের কিনারাকে স্পর্শ করেন। কখনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও তাঁর আবেগমগ্নতাকে ছেয়ে যায়। লৌকিক ধর্মবোধ, লোককথা, ব্রতকথা, সংস্কার-মূল্যবোধ কাব্যিক জিজ্ঞাসায় প্রমূর্ত করে তোলে। অনার্য জাতির আদিপর্বের সূচনা ও সম্ভাবনাকে অখণ্ড সময় সন্নিপাতে তিনি প্রকাশিত করতে চান। এ ভাবস্তরে তাঁর অলংকার চিত্রমালাও রচিত। এমন অন্তর্লীন প্রবণতায় মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতার প্রধান ভাবস্তরটি ধরা পড়ে। বহুমাত্রিকতায় আলিঙ্গনে তাঁর কবিতার উত্তরণের পথটিও রচিত। *শোণিতে সমুদ্রপাত* (১৯৭২), *আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী* (১৯৭৫), *শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি* (১৯৭৫), *অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী* (১৯৮০), *শুক্লা শকুন্তলা* (১৯৮৩), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৫), *যিসাস মুজিব* (১৯৮৪), *হনলুলু ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭), *কুসুমের ফণা* (১৯৮৮), *বারো বছরের গল্প* (১৯৮৮), *এক জনমে লক্ষ জন্ম* (১৯৮৮), *গালিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা* (১৯৮৯), *আমি যদি জলদাস তুমি জলদাসী* (১৯৯০), *হ্যামিলনের রাজা* (১৯৯০), *তেলাপোকা* (১৯৯০), *জাতিসত্তার কবিতা* (১৯৯২), *ভিনদেশী প্রেমের কবিতা* (১৯৯৩), *অরক্ষিত সময়* (১৯৯৩), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৪), *দিগন্তের খোসা ভেঙে* (১৯৯৪), *ভালোবাসার বুক পকেটে* (১৯৯৪), *আমার কপালেও সময়ের ভাইফোঁটা* (১৯৯৫), *প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালা* (১৯৯৫), *মৌলাধুনিক* (১৯৯৫), *মুজিববাড়ি* (১৯৯৬), *দেখা হলে একা হয়ে যাই* (১৯৯৮), *ঝাউদরিয়ার ডানা* (২০১০)—এসবের ভেতর দিয়ে নূরুল হুদার রূপশৈলি একটা ধ্রুপদী মাত্রা অর্জন করেছে।

হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২)

একমাত্র কাব্য *কুসুমিত ইস্পাত* (১৯৭২)। স্পর্ধিত, উদ্যত কবি। স্বল্পায়ু। কবিভাষা নির্মিত হওয়ার আগেই যেন অবসিত। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ধরা পড়ে কবিতায়, রাজনৈতিক শর্তসমূহ থাকলেও নিসর্গ-রোম্যান্টিকতা ছাড়া তিনি উপস্থিত নন। হুমায়ুন কবিরের কাব্যের এমন মেজাজ সমাজ-রাজনীতি পরিস্রুত, ষাটের শেষ এবং সত্তরের স্বাধীনতা-পরবর্তী কিছুকালের ঘটনা-আবর্ত বিদ্যমান তাঁর কবিতায়। জীবনান্দনীয় প্রভাব আছে তবে স্বদীক্ষিত চেতনায় তিনি স্বাতন্ত্র্যও বটে। 'বৃষ্টির শায়কে বিদ্ধ পাখি এই দেহলীন ঘাসের শয়নে/ বুকের ভেতরে তার মুখ রেখে স্নিগ্ধশ্যাম গ্লাস/ পাখির স্বচ্ছ চোখে বৃষ্টির স্ফটিক ভাঙে' কিংবা 'কখনো জোনাক নিয়ে খেলেনি শৈশবে/ বজ্রপাতে ভয় হতো। এপ্রিলের পর/ লুকানো বন্দুক থেকে অতিক্ষিপ্র স্বয়ংক্রিয়তায়/ প্রয়োজনহীন ক'টি প্রাণী হত্যা করে জন্মে

নি বিষাদ'—এভাবে কবিতা-নির্মাণ ও উত্তরণ পরিলক্ষিত। প্রথম উদ্ধৃতি যতোটা প্রকৃতিগন্ধি পরে ততোটাই স্বকাল-আশ্রিত চেতনায় বিধৃত। তবে তাঁর কবিতায় প্রান্তস্পর্শী প্রত্যয় যে নেই তা নয়—লোকায়ত ফ্রেম তো আছেই সর্বোপরি তাঁর গুরুত্ব নির্মাণকলার ভেতরে। গীতল, ছন্দোবদ্ধ, প্রতীকপ্রতিমা, উপমানচিত্র আশ্রিত হুমায়ুন কবির। বোঝা যায়, তাঁর ভেতরে ত্রিশোত্তর চেতনা কাজ করলেও তা কীভাবে সেখান থেকে সরে এসে বাংলাদেশের স্বকালে শরণ নিয়েছে। একটি কাব্যই তার দৃষ্টান্ত।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)
অর্থহীন স্বাধীনতার দেশে অমর পংক্তিমালা রচনা করে হুমায়ুন আজাদ বিদ্রোহের বার্তা ঘোষণা করেন। এ বিদ্রোহ ভালোবাসার, আত্মত্যাগের, বিশ্বাসের। তাঁর কবিতায় এ বিষয়গুলো বিমোহিত, মর্মপ্লাবন সৃষ্টিকারী, ঘোরগ্রস্ত করে তোলে পাঠককে। হুমায়ুন আজাদ কবিতায় শব্দকে নির্মাণ করেন, সমস্ত রূপ-রস-গন্ধকে ইমেজে ভাসিয়ে নির্মেদ অন্তঃসারকে যেন ছেনে তোলেন। প্রেম-প্রকৃতি-নারী নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে—কিন্তু ভেতরে থাকে তীব্র ক্রোধ আর বিনষ্টির সংবাদ। অক্ষরবৃত্ত, তবে তা বিপুলভাবে গদ্যাশ্রিত, গতিময়, কখনো যতিহীন তাঁর কবিতা। কবিতার 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটি হুমায়ুন আজাদের জন্য যথার্থ; অনিবার্যতারও বটে। 'যেদিকে ইচ্ছে পালাও দু'পায়ে, এইটুকু থাক জানা/ চারদিকে আমি কাঁটাতারে ঘিরে/ সান্ত্রী বসিয়ে পেতে আছি জেলখানা' একটু সর্বগ্রাসী মনে হলেও আঙ্গিক-পরিচর্যা দুর্বল নয়। চিত্ররূপময়তায় আবহমান বাংলাদেশের ঋতুর সমস্ত রঙকে; কী নগর কী গ্রাম সবকিছুকে অনুভবের স্পর্শে কাঙ্ক্ষিত করে তোলেন। পরাবাস্তব অনুভূতি কিংবা অ্যাবসার্ড বিমূর্তলোকও অনুভববেদ্য রূপ পায় তাঁর কবিতায়। উপস্থাপনার এরূপ সংকেতে কবি বাঙময় করে তোলেন নিজের প্রিয় স্বদেশকে। বিপরীত প্রান্তে আবার দুঃখদীর্ণ বিনষ্ট স্বদেশের প্রতি ক্রুদ্ধতাও যেন কবিকলমে শিল্পমাত্রা অর্জন করে ফেলে। হুমায়ুনের আবেগ সে কারণে শুধু রোম্যান্টিক নয়; খুব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে বুদ্ধির শাসন। আর সেরূপেই তার শব্দ তৈরি হয়। *অলৌকিক স্টীমার* (১৯৭৩), *জ্বলো চিতাবাঘ* (১৯৮০), *সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* (১৯৮৫), *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল* (১৯৮৭), *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* (১৯৯০), *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৯৩), *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* (১৯৯৮), *কাব্যসংগ্রহ* (১৯৯৮), *পেরোনোর কিছু নেই* (২০০৪) তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

রফিক আজাদ (জ. ১৯৪৩)

ষাটের অবক্ষয়চেতনা মর্মে অবগাহন করে বিষাদ-নৈরাশ্য-ক্ষোভ-ক্রোধ নিয়ে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ সময়ে রফিক আজাদ লিখেছেন *অসম্ভব পায়ে* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ। তাঁর নঞর্থক ভাবটা অনেকটা ফরাসি কবি বোদলেয়ারের আঙ্গিকের। কবিকৃতিতে বিরাজমান এক ধরনের সাহস, দৃঢ়তা, অঙ্গীকার অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যথাবেদনার আকুতি :

চক্ষুষ্মানের পক্ষে চোখ বুজে থাকার মতো
আনন্দময় আর কী-ইবা হতে পারে?
হয়তো এভাবেই আমার বাকি জীবন
চ'লে যেতো—
কিন্তু হঠাৎ ক'রে তোমাকে দেখে ফেলে
আনন্দে বিহ্বল এই আমি কী যে বিপদে পড়লাম,
তুমি তো কোনোদিনই বুঝবে না।

আবার দশ বছর সময় পেরুনো কবির ভিন্ন আঙ্গিকজমা কয়েকটি লাইন :

তো, বালকের উথালপাতাল বুকে নানা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে—কোনো-এক কিশোরীর চঞ্চল চোখের চাউনি, কারু পিঠছেয়ে নেমে আসা ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদাম, কারু হাসির ঝরনাধারা, কারুবা দেহসৌষ্ঠব, গালের তিল, ওষ্ঠপ্রান্ত! একক একাকী নির্দিষ্ট কেউ নয়, বালক সবার কাছে থেকে তিল-তিল সৌন্দর্য আহরণ ক'রে গড়ে তোলে এক মানসিক 'তিলোত্তমা' কিশোরী—সেই কিশোরীই ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে এখনো—মৃত্যুর আগে হয়তো এক পরিপূর্ণ 'নারী' এসে আসন পাতবে তার কবিতায়। সেই প্রতীক্ষায় সুদূরের পিয়াসী এক বিহ্বল বালক এখনো নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও কিছু পরে লেখা কবির কবিতা :

আমরা আগুনমুখো নদীর তলদেশ থেকে
সাঁতরে উঠে এসেছিলাম—
আমাদের এই উত্থান তখন অবশ্য অনিবার্য ছিলো;
দুঃসময়ে উঠে এসে আমাদের ঐ
পায়ের নিচের মাটি খুব ভালোবেসেছিলাম—
... ...
কিন্তু বন্যা, ঝঞ্ঝাবাতে, বিক্ষুব্ধ গর্কিতে, জলোচ্ছ্বাসে,
মারী ও মড়কে, অগ্নিঝড়ে, মঙ্গায় পীড়িতজন
দৃঢ়পায়ে দাঁড়ানোর কোনো ঠাঁই-ই তো পেলাম না!

তা-হলে কি জন্মাবধি প্রাণান্তকর দুঃখজয়ী
ঐ প্রচেষ্টাটি আমাদের প্রিয় স্মৃতিভাণ্ডারেই
জমা থাকলো? [তখন স্বপ্ন ছিলো দু'চোখে অনেক]

রফিক আজাদ এভাবে প্রকরণেই আলাদা। *নির্বাচিত কবিতায়* তাঁর উক্তি 'খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন কিছু পদ্য-প্রবন্ধের একত্রিত সমাবেশ ঘটিয়ে এই সামান্য পুঁথির বিনীত প্রকাশ', আবার বলেন 'পাঠকের জন্য আমার কোনো গদ্য-সংবাদ নেই বলেই অগত্যা, পদ্য-প্রবন্ধকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছি'—নৈরাশ্যবাদ, 'মাছি', মানুষের প্রতীকায়ন কবিউপমায় একেবারে দিব্যদৃষ্টি। সময়, ব্যবস্থা, সামরিক শাসনের মধ্যে কবির মর্মপীড়ন, আত্মীকরণ—অবক্ষিপ্ত ও বিকারতাড়িত। তখন পদ্য-প্রবন্ধই ছন্দের মাত্রা পেয়ে যায়। কবি শ্যেণদৃষ্টি সেখানে শিল্পকৃতি অর্জন করে। রফিক আজাদের উত্তরিত পথটিও বাংলাদেশের কবিতায় এ প্রবহমান সময়েরই নিশানা হয়ে যায়। দীর্ঘ কবিতাচর্চায় শিল্পের কারুকার্যময় দরোজা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্বেষণ করেছেন। এজন্য প্রকরণ কখনো প্রুফকসুলভ, কখনো স্যামসনীয়, কখনো কনফেশনাল।হ্রস্ব কবিতা পেরিয়ে দীর্ঘ কবিতার পরিকীর্ণ পানশালায়। তবে এক সময় উঠে আসে চুনিয়ার নিষ্পাপ ইতিহাস। কবির কাছে ষাটের 'স্যাড' হয়ে ওঠে দর্শন। প্রেম পৌরুষস্পন্দিত, ব্রীড়াহীন, লাম্পট্য লীলালাস্যে ভরপুর। আর সময় অবসেশনপ্রিয়। তবে প্রান্তিকে কবি স্থিত, মৃত্যুচেতনাকাতর, স্নেহধারাজলসিক্ত। *ক্ষমা করো হে বহমান উদার অমেয় বাতাস*-এ প্রকৃতি প্রচণ্ড দায়িত্বশীল। পল্লীর পললভূমে সজ্জিত। পাখি, কীট, পতঙ্গ, লতার শোভামগ্ন আত্মার অবমুক্তি। রফিক আজাদ প্রকৃত কবি কিন্তু 'গভীর আর স্বপ্নে বাস্তবে'র রথে তিনি ত্রুটিমুক্ত নন। শব্দের বাগাড়ম্বর, তাৎক্ষণিক স্থূল আবেগ, রাজনৈতিক দার্ঢ্য, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেক সময় তাঁর কবিতায় যেন জনপ্রিয়তার চাপ সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতা : *সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে* (১৯৭৪), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৭৫), *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* (১৯৭৭), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১), *সশস্ত্র সুন্দর* (১৯৮২), *একজীবনে* (১৯৮৩), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), *অঙ্গীকারের কবিতা* (১৯৮৩), *প্রিয় শাড়িগুলি* (১৯৮৩), *হাতুড়ির নিচে জীবন* (১৯৮৪), *পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ* (১৯৮৫), *রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৭), *গদ্যের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমি এক দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক* (১৯৮৭), *অপর অরণ্যে* (১৯৮৭), *খুব বেশি দূরে নয়* (১৯৮৯), *ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস* (১৯৯২), *করো অশ্রুপাত* (১৯৯৪), *পাগলা গারদ থেকে প্রেমিকার চিঠি* (১৯৯৫), *প্রেম ও বিরহের কবিতা* (১৯৯৪), *কবিতাসমগ্র* (১৯৯৬), *কণ্ঠে তুলে আনতে চাই* (১৯৯৬), *প্রেমের*

কবিতাসমগ্র (১৯৯৭), *হৃদয়ে কী বা দোষ* (১৯৯৭), *বিরিশিরি পর্ব* (১৯৯৭), *বর্ষণ আনন্দে যাও মানুষের কাছে* (২০০৫), *প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতা* (২০১০) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কবির সম্পাদনাগ্রন্থ *দুই বাংলার কবিতায় মা*।

২.

১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ সময়ের [স্যাড জেনারেশনে' 'স্যাড জেনারেশন' বেরিয়েছিল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। যাকে কেন্দ্র করে স্যাড জেনারেশন আবর্তিত হয়েছিল সে রফিক আজাদ। সে-সময়কার নতুন অবক্ষয়ী চেতনার মূল চেতনাটিকে ও-যে কেবল এই বুলেটিনে তুলে ধরেছিল তা নয়, এই বুলেটিনের অধিকাংশ লেখার মূল বিষয়বস্তুও ছিল ও-ই] সবুজপ্রত্নরসিক ['সবুজ শস্যের মাঠ', সবুজের ধারাবহিকতা', 'সবুজ সংসার', 'সীমিত সবুজে', 'সবুজের ভেতর সবুজ', 'পাখিদের মতো সবুজ সাম্রাজ্য', চুনিয়া সবুজ খুব', 'কী ক'রে সবুজ হ'ব বলো', 'দীর্ঘ সবুজ বিকেল', 'সবুজ চারা কেন আমি করিনি রোপণ'] কবিকৃতিতে বিরাজমান এক ধরনের সাহস, দৃঢ়তা ও অঙ্গীকার অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যথাবেদনার উগ্র-আকুতি। উদ্ধত ভঙ্গি এবং প্রবণতায় জীবনবাদী। না-পাওয়ায়, বেদনাহত। চীৎকার তার অনিবার্য ক্ষোভ ও অধিকারে। 'ভাত দে হারামজাদা, তা-না হ'লে মানচিত্র খাবো'—এক দানব-দুঃস্বাপ্নিকের হাহাকার। এ প্রবণতাটি 'স্যাড'-উত্থিত। সেভাবেই কবির নৈর্ব্যক্তিক প্রকল্প-নির্মাণ। কোনো তুলনায় নয়, ষাটের অবক্ষয়-দুর্বিনীত লক্ষ্যভ্রষ্ট-কালধারায় পাশ্চাত্যরীতির প্রভাব বা প্রচ্ছন্নতা অবসিত নয়। সেটি স্বকালবিদ্ধ। লক্ষণীয় উপর্যুক্ত কাব্যটির "নগর ধ্বংসের আগে" কবিতাটি :

> নগর বিধ্বস্ত হলে ভেঙে গেলে শেষতম ঘড়ি
> উলঙ্গ ও মৃতদের সুখে শুধু ঈর্ষা করা চলে।
> 'জাহাজ, জাহাজ'—ব'লে আর্তনাদ সকলেই করি—
> তবুও জাহাজ কোনো ভাসবে না এই পচা জলে।
>
> সমুদ্র অনেক দূর, নগরের ধারে কাছে নেই :
> চারপাশে অগভীর অস্বচ্ছ মলিন জলরাশি।
> রক্ত-পুঁজে মাখামখি আমাদের ভালোবাসাবাসি;
> এখন পাবো না আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই।

দৃষ্টান্তটি দুর্মর। ঐতিহ্যপ্রেরিত। 'পচা জলে' নঞর্থক। নেতিচেতনা বাংলাদেশের কবিতায় ওই কালপটে খুব কঠিন করে তোলেন নি তেমন কেউ। কিন্তু এখানে নিশ্চিন্ততায়-নির্ভয়ে গ্রথিত। 'শেষতম ঘড়ি' ঐতিহ্যিক আর 'রক্ত-পুঁজে মাখামাখি' বর্তমান কিন্তু পংক্তিগুচ্ছে বিদ্যমান কালখণ্ড অধ্যাত্ম-ইঙ্গিতে জারিত। 'ধ্বংসের

আগে সাইরেন কেউ বাজাবে না' চিরন্তনতার-আনুকূল্য পেলে 'প্রোথিত বৃক্ষ'-এ বদ্ধমূল সমস্ত সৎ-সদর্থক চিন্তা আর 'জিরাফের গ্রীবা' বিকৃত প্রতীক-বিদ্রূপে অনিঃশেষ। এরকম "স্মৃতি, চাঁদের মতো ঘড়ি", "চোর", "ক্ষুধা ও শিল্প" একই প্রবণতার। কবিপ্রসিদ্ধিটি ধরা পড়ে, ধারাবাহিক এ চেতনাটি ক্রমশ সম্মুখপানে এগিয়ে গেলে। সমস্তরকম শব্দে (চলতিশব্দ, ধ্বনিব্যঞ্জকশব্দ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য শব্দ) বোধ আক্রান্ত হলে সেখানে পুনর্গঠিত চিত্রকল্প নিজের মতো গড়ে ওঠে। বস্তুত তাতে 'placing his picture of the turning world in the perspective of history and traditional faiths' এতে রফিক আজাদ ওই মাপে প্রতিষ্ঠা না পেলেও তার উপলব্ধিতেই বলা যায় :

আমার ক্ষমতা কম—পঙ্গু আমি—ঊর্ধ্বারোহনের
শক্তি ও সাহস নেই; মৃত্তিকায়, পাথুরে শয্যায়,
শোকের তাঁবুর নিচে শুয়ে আছি,—ত্বকের প্রচ্ছদে।

তবে কবিতার এ কাঠামোটি প্রায়শ বজায় থাকে না। মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় উৎকীর্ণ হয়ে পড়েন কবি। পিছিয়ে যায় তার 'ঊর্ধ্বারোহন'। আবার ঝলসে ওঠে "মধ্যরাতের শোকগাথা"। বিস্তর ভেসে ওঠে দীপাবলি। চরিত্র গড়ে ওঠে। আশাবাদ প্রতিশ্রুত হয়। ভালোবাসার আশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাতেই তার সমর্পণ, প্রতিষ্ঠা। এর ব্যত্যয়ে কারণ খোঁজেন, বিদ্রূপ আওড়ান, নস্টালজিক হয়ে ওঠেন, সভ্যতার গ্লানি নিয়ে বোঝাপড়ায় লিপ্ত হন। তাতে তার কবিতা 'chief interest'-এ আটকে যায়। উপর্যুক্ত 'framework of myth' দূরপরাহত থাকে।

প্রধানত আক্রমণাত্মক, আত্মবিশ্লেষণ, অবক্ষয়ী, বিবরবাসী; নিও-রোমান্টিসিজম লক্ষণাক্রান্ত, বলা চলে, 'ষাটের গোড়ার দিকে, একনায়কতান্ত্রিক শাসন-নিগড়ে রুষ্ট-ক্ষুব্ধ-হতাশ তরুণ কবিবৃন্দ প্রচণ্ডভাবে মানসিক নিম্নচাপে ভুগেছিলেন, তা ফলিতরূপে অর্জন করে বাস্তব ও ঘটমান জীবন-বিমুখতায়। স্বস্তিহীন অবরুদ্ধ দেশকালের প্রতিক্রিয়ায় তরুণ কবিকুল বিচিত্রধারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। প্রত্যাশিত সুন্দরের অর্চনায় আবদুল মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তব পরিমণ্ডলের সদস্যে পরিণত হন; স্বপ্নের নির্মোকে ঘটমান বাস্তবের সমালোচনা করার অন্যবিধ কোনো উপায় ছিলো না।' *অসম্ভব পায়ে* এবং পরে *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* পর্যন্ত রফিক আজাদ রিরংসা-মগ্ন, নৈরাজ্যিক, স্খলিত :

খণ্ডিত ব্রিজের মতো নতমুখে তোমার প্রতিই
নীরবে দাঁড়িয়ে আছি : আমার অন্ধতা ছাড়া আর
কিছুই পারিনি দিতে ভীষণ তোমার প্রয়োজনে;
উপেক্ষা কোরো না তবু নারী

এবং,

> উভয়ের দেহ জাগে দেহের অতীত কোনো এক
> ঐশ্বর্যের লোভে,
> আমাদের উভয়ের
> শরীর মনের ঐক্যে, অশ্রু আর ঘামে
> মধ্যরাতে তৈরী হয় সুন্দরের সম্পন্ন প্রতিমা॥

পরে তা আলাদা হয়েছে, সমাজ-ইতিহাসের রূপান্তরে। এসেছে মিত-সংযম, স্মিতবাক, পরিমিতি। রাজনৈতিক কবিতাও লিখেছেন। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গড়ন, তবে ক্রমশ বেরিয়ে আসেন অনেক অবলম্বনে, মুক্তিযুদ্ধের পরে, মৃত্তিকাকে পায়ে দলে। 'রফিক আজাদ যতোই থাকুন ষাটের দশকের উন্মাদনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে, তিনি যে শেষ পর্যন্ত মাটিতে পা রাখেন, তিনি যে কৃষক হয়ে যান, তার ঘন ঘন সর্দির ধাত কেটে যায় খালি-মাথায় রোদবৃষ্টিসাঁতলা বাতাসে বাংলার বুকের ভিতরে ঢুকে পড়ার আকুতিতে।' রফিক আজাদের আধুনিক বৈশিষ্ট্যটি মনোলগের ব্যবহারে, স্বীকারোক্তি-রীতি বা 'আনুভূমিক প্রাত্যহিকতা'য় নির্ধারিত। পুরুষপ্রবণতায় তিনি বেপরোয়া আক্রমণাত্মক, দুর্দমনীয় আবেগী, নিটোল আর স্পন্দ্যমান। নৈরাশ্য ও বেদনাকাতর 'বাষ্পাতুর নেত্র সম্মুখে তাকিয়ে দেখি' কিংবা 'ভুলে ভর্তি লগবুক যেন কোন ক্লান্ত কেরাণীর'—এমন পংক্তিতে। আর সেরূপেই তিনি সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয়, সেক্ষেত্রে কবির মনোলগের ব্যবহার বিস্তৃতি ঘটে, আটের দশকের কিছু কবিতায় ('পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ', 'নারী', 'পয়ারেই করো ধারাস্নান')। টিপিক্যাল মধ্যবিত্তের দৈনন্দিনতার ভেতর দিয়ে রফিক আজাদ নিজেকে প্রকাশ করেন, অতিক্রম করেন। 'উত্তর তিরিশ' কথন, অতীত-শৈশব, সময়গ্রাহী বাস্তবতা, আত্মবিশ্লেষণ, ক্ষয়িষ্ণু-নারীর শরীরগম্য যৌনতা, প্রেম, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, ক্ষুধার প্রাকার ইত্যাকার স্বতন্ত্র স্ফূর্তি নিয়ে তার কবিতা। কোনো শব্দে রফিক আজাদ অগভীর হতে চাননি, পূর্ণতরো ক্যাজুয়ালে সংহত পরিস্ফুট-প্রকাশ ('যেন গর্ভগৃহ থেকে নেমে ডিনামাইটের মতো/ অসম্ভব তোলপাড় জুড়ে দিলো একটি শৈশব', 'ঠোঁটে- ঠোঁটে, বুকে-বুকে/ কামে-ঘামে উষ্ণ শরীর চাই') তার অভিষ্ট।

শুভপ্রদ, শ্রেয়োচেতনায় রফিক আজাদ হঠকারী নন, পরিপূর্ণ 'ধার্মিক', স্বদেশ-স্মৃতি-ঐতিহ্য-পুরাণের রসায়নে তা তপ্তময়। সমাজের যাবতীয় বিষয় বিশেষ করে মধ্যবিত্তের-স্বরূপ নির্ণয় করলেও তার কবিতার মুখ্য প্রতিপাদ্য শুভপ্রদ চেতনা। যেটি নব্বুইয়ের পরে এক উচ্চরেখ আস্থায় পৌঁছেছে। দক্ষতাও যুক্ত হয় তাতে। 'নারী'-কৈশোর-জননী-গ্রাম-নিসর্গ এক ভিন্ন প্রকরণে স্থিরতা পায়। বিষয়-সংকেতে ধরা দেয়। এতে হয়তো মধ্যবিত্তিয় সমাজস্তর বা কর্পোরাল পুঁজির

কাঠামোয় বন্দী-ব্যক্তির নাভিশ্বাস, উত্তেজনা ও ক্ষেদ আছে—'নানারকম হাতুড়ির নিচে এই জীবন।' 'বিরিশিরি পর্বে'র পরে কবির মৃত্তিকাগন্ধী, লোকপ্রত্নপুরাণ সত্তাসান্নিধ্য স্পষ্টতায় বিকিরিত। ধর্মীয়-ঐতিহ্যও পুনর্গঠিত। আকর্ষণীয় কোলাজধর্ম কখনো আশায় প্রতীক্ষায় স্বীকারোক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিস্তৃতিময় ও সৃজনশীল নিরীক্ষায় ব্যঞ্জিত বিষয়সমূহ। কবির অদৃষ্টময়তা, আত্মশ্লাঘা, জীবননিষ্ঠা এতে প্রকাশিত। এ পর্বের পরে কবির কবিতার রঙ ও বিভা পাল্টেছে।

২.

'পয়ারেই করো ধারাস্নান'-এ কবি লিখেছেন : 'পঞ্চাশ বছর ধ'রে নির্দ্বিধায় এই অর্বাচীন/ যে-ছন্দে করেছে চাষ নিদারুণ মানবজমিন—/ সন্দেহের চোখে তাকে তাকিয়েছে বাজার-জহুরী!' বাস্তবে ঘটেছে যা, তা-ই হয়েছে। কে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে তা ছেড়ে দিলে—'মানবজমিন চাষের' আলেখ্যটুকু কী? কবির চোখে তা কেমন—বিশেষ করে এই এতোকাল পরে এসে? খুব শক্ত ছন্দে তুলে নেন তিনি কলমের বাট। পয়ারকে নিয়ে খেলেন। তাতেই দেন বিবরণ। ভরে দেন অবক্ষয়ের রাগ-ক্রোধসমূহ। গভীর যন্ত্রণাও। উপনিবেশ নয়, পরাধীনতা নয়, কর্তৃত্ব নয়, বাণিজ্য লালসা নয়, প্রচার নয়, স্বার্থপরতার সম্মুখে বিলানো নয়—বলেন পংক্তিতে, বলাটাই বা কেন? কবি তো প্রথমেই তার মীমাংসা করে নিয়েছেন। শুরুতেই তার দায় নেন 'গাঙ্গেয় বদ্বীপে, রাঢ়ে, সমতটে, বরেন্দ্রভূমি'র। সেটিই তার জমিন। কার্যত কবি, এই প্রাচ্যের নামাঙ্কন ও লোকায়ত প্রকৃতির প্রতিনিধি—বিশ্বায়নের প্রকোপে তাই তার উন্নত শিরে বৈঠা চালানোর দাম্ভিক উক্তি : 'দ্যাখো গিয়ে দারিদ্র্যের নিচে/ কী ক'রে রয়েছে বেঁচে তোমার স্বজন' বলে নিতে নিরাপত্তি নাই। এই একালের আরও ইতিহাস 'গাভীর ওলানে দাও ঠোনা, রোদচশমা খুলে ফেল'—এই অভিজ্ঞান শুধু 'সবুজ' জীবনের জন্য।

এ 'সবুজ' আসলে দ্রোহ ও দ্বিধা কাটানোর স্বর। সেটি অনেক ভাবে এবং বহুরকমে তাঁর কবিতায় পরিবেশিত। চিরচলমান তাঁর এ সংজ্ঞার্থ। জীবনানন্দটুকু পাওয়ার জন্যে, পেরুনোর পথ নির্ণয়ে সবুজ-প্রতিশ্রুতিটুকু তো তার এই! তা নিয়েই তিনি চলমান। সবুজেই থাকবে সমাসীন। কবিতাজুড়ে তাই-ই চিরচিহ্নিত।

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)

বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিক রীতির আঙ্গিক রচয়িতাদের মধ্যে হৃদয়সংবেদী-নার্সিসিস্টিক কবি আবুল হাসান। তাঁর কবিতায় আত্মপ্রেম, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিচ্ছিন্নতা কিংবা স্মৃতিকাতর বেদনার্ত আত্মা দিব্যত্ব লাভ করে। কবিতাশরীরে

তিনি অন্তহীন স্বপ্নচারিতাকে দুঃসময়ে ধারণ করেন। একাধারে বাউলচেতনা ও স্বপ্নকাতরতার কবি তিনি। কবিতার অন্তর্গত রূপবৈচিত্র্যে সমসাময়িক অন্যদের থেকে তিনি পৃথক :

> যাই, এখন তোদের শরীরে শস্যের আভা ঝরে পড়ছে যাই...
> মৃত্যু আর মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধারে যাই,
> বিবর্ণ ঘাসের ঘরে ফিরে যাই, যাই
> সেখানে বোনের লাশ, আমার ভাইয়ের লাশ খুঁজে নিতে হবে,
> আমি যাই
> দেখি কারা দিকে দিকে দীর্ঘ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে
> দেখি, কোথায় সে জলাভূমি, কোথায় সে ট্রেঞ্চ, নালা,
> ইটের নদীর তলদেশ আর
> কোথায় সে নীলিমার নক্ষত্রবীথির শান্তি, সবুজ রং-এর শীত, দেখি
> কোথায় কাহারা আজ এত উষ্ণ মৃত্যুতে স্থির, নির্যাতিত আলোয় স্থির

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-সম্বলিত এ কবিতায় কবি মৃত্যু-পংক্তির রূপময় পরিবেশ রচনা করেন। বিষণ্ণতায় হন দগ্ধ। মৃত্যুচেতনা বিদ্যমান প্রকৃতিরাজিতে স্থির কম্পমান। *পৃথক পালঙ্ক* সে ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ। ত্রিশোত্তর কবিদের প্রভাব হলেও তা হাসানের হাতে অন্য। একটি আলোকিত কবিভাষা এক্ষেত্রে নির্মিত হতে দেখা যায়। কবিকণ্ঠটি পরিষ্কার। আগেই এ কাব্যের প্রথম কবিতা "নচিকেতা"র উদাহরণ এসেছে। তাতে ঘোষিত কবিস্বর। বিনষ্ট বা গলিত জীবনের আরোপিত ক্রন্দনে কাতর নন কিংবা পাশ্চাত্য স্বভাবে জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো (Jean Arthur Rimbaud) বা ফ্রেদেরিক গার্সিয়া লোরকা (Federico Garcia Lorca) লোরকার অনুভাবের প্রত্যক্ষ প্রেরণাবন্দি নন। যদিও বলতে শোনা যায় 'লোরকার বিষণ্ণ জন্ম'র কথা। কিন্তু তা ব্যক্তি—পরে দেশের পটচিত্রে, পরিস্রুত বাঙালির ভঙ্গুর পীড়িত সমাজ-কাঠামোয়। আগের কাব্যে যেটি স্পষ্ট নামে প্রকাশিত "গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর", "কবির ভাসমান মৃতদেহ", "আমি অনেক কষ্টে আছি"। বিষণ্ণতা ব্যাপক চিত্রে প্রতিফলিত। উপর্যুক্ত উদাহরণটির মতো অনেক পংক্তিতে তা আইকনে পরিণত। সার্বভৌম এ আনুষ্ঠানিকতাটি পূর্বজ অনেক কবি লালন করলেও গভীর অনুভবের চর্চায় বা বিচিত্র বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে [মৃত্যু, রোগ, নারীর জৈববস্তু (স্তন, যোনী, জরায়ু), মহামারী, মন্বন্তর] তাকে আধারবন্দী করা অত্যন্ত নতুন। এটি প্রকৃতির বিচিত্র রঙে (বৃষ্টি, বৃক্ষ, নদী, পক্ষী) ব্যাপক। কবির টোটেমব্রতও যেন এ ধর্মটিকে অনেক প্রসারিত করে, যাতে মনুষ্যত্ব-মানবিক সারাৎসার রীতিমাফিক তার আদর্শে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে নারীর সত্তাগত সম্ভাবনা ও অধিকার চেতনাও অপরিস্ফুট নয়। তাবৎ মহিমার

প্রকৃতি কাব্য-প্রকরণ ধারণ করলে আবুল হাসান নিজের ভেতরে নির্মাণ-পুলকে বা নবায়িত সৃষ্টিতে পৌঁছুলে তার প্রতাপটুকু বিস্ময়কর বলে স্বীকার করার কিছু থাকে না। কারণ, এ পথের বাঁকে এবার তার নব-প্রতিভার স্তর কায়েম হয়েছে, তার প্রকাশ উদিষ্ট *পৃথক পালঙ্ক*। এ কাব্যের প্রবণতা আত্ম-উৎসারণ। রোগশয্যা, স্মৃতিচিহ্ন, অসুখ, নরকের আগুন, রুগ্নতা, হাসপাতাল, মৃত্যু, এপিটাফ-এর ভেতর থেকে পুরাণের পাখির মতো জেগে ওঠা। আত্মার এ জাগর-আখ্যান চিরজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী, জয়শ্রী। 'আমার অনলে আজ জাগো তবে হে জীবন, জয়শ্রী জীবন!', 'মধ্যরাতে ঝাউকান্না কেঁদে বলে, শান্তি হোক, ওরে শান্তি হোক!', 'সমস্ত শান্তি ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে মানুষের মনীষার শেষ বৈনাশিকে!'—এভাবে আত্মাকে অনলে পুড়িয়ে, 'শান্তি'-র চিরজীবিত শিল্পকাঠামো রচনা করেন। এতে প্রকরণবৈশিষ্ট্যও নিরূপিত হয়। পুনরুদ্ধার বা রিভাইভ অনেকটা যীশু-পুরাণে-উপনিষদে প্রজ্বলিত। এ প্রজ্বলনের পথ জাগতিক সকল প্রাণীর শুভপ্রেরণায়। কিন্তু সেটি উজ্জীবিত হওয়ার সরণী সমাজ-বিধৃত অভাব, দুঃখ, বেদনা, গ্লানির ভেতর দিয়ে। কবি দুঃখ-বেদনারও কাব্যময় প্রসিদ্ধি নির্মাণ করেন। স্মৃতিসৌধে বা উদ্ধত-ভীতিকর প্রাণীবাচক বিশেষায়ণে তার শিল্পিত রূপ-কাঠামো রচনা করেন। বাংলার প্রকৃতিতে কিংবা বিধৃত বিবর্তিত সমাজ ও জীবনচেতনায় তার পুনর্বয়ন লাভ ঘটে। সমাজের উপরকাঠামোয় প্রকাশিত যে স্তর তার কারণ হিসেবে ভেতরের কাঠামো ও কার্যকারণ সম্পর্ক, কর্পোরেট বা মার্কেন্টাইল বাণিজ্যের শাসনে নিপতিত ব্যক্তি, যে জন্মেই কুঁকড়ে গেছে, ব্যথাদীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু মন ও মনন, প্রেমবিনাশী ও দুর্বিনীত দ্বন্দ্বে সৃষ্ট ক্ষত আর দুঃখচিহ্নিত প্রহরের গরল নিয়ে তবুও জয়ী জীবিতের শান্ত-সন্ধান প্রচেষ্টায় রত কবির উপলব্ধ প্রকরণ। ছন্দও সে লক্ষ্যেই সচেষ্ট। এ শান্তির ইমেজ রূঢ়-বিদ্রূপাত্মক-বিকৃত-কঠোর কিন্তু শেষাবধি উপনীত শান্তি পারাবারে। তৃতীয় এ কাব্যটিতে পূর্বের কাব্যচিন্তনের সরণী বেয়ে কবি পৌঁছেছেন দুর্লভ শান্তি পারাবারে। যেখানে নিজস্ব রূপ-ধারণাটি পূর্ণ ও জীবনজয়ী মানুষের সারাৎসাররূপে চিহ্নিত। বিভাগোত্তর কাব্যভাবনায় এর স্বরূপ পার্থিবতার ভেতর দিয়ে লোকোত্তর বিশেষত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। 'মৃত' মানুষের পুনরুত্থানে যে নবজন্ম তা বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, রৌদ্র কিংবা গোলাপ, কোমল হরিণ রূপকে প্রকাশিত। এ রূপকার্থ কবি-উক্তিতে লোকোত্তররূপে পরিগণিত নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে :

(ক) আমাকে শোনাতে হবে সেই কবেকার এক সত্যমাথুর :
প্রবাহ নদীর প্রাণ, —নাবিকের দল ফিরে এসো,
আমার দু'পাশে আজ মরা ঢেউ, অভিভূত অন্য বন্দর!

(খ) এ বৃষ্টি কি নবজন্ম?

কিছুই জানিনা শুধু অক্সিজেনের নল নাকে নিয়ে বসে থাকি জাগাতুর!
আর শব্দে টের পাই : একলক্ষ জিরাফ, হলুদ সাপ, সিংহের সবুজ দল
সমস্ত জীবন ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে আমার ভিতরে!

(গ) দেরী হয়ে গেছে বৃক্ষ : পায়ে ধরি :—বলো
আমার ক্ষয়িষ্ণু জমি, কোন মহাদেশে গেলে
ফিরে পাবে সুরেলা সবুজ?

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে পুনরুজ্জীবন ঘোষিত হয় কোন্ মূল্যবোধে? সত্যমাথুর আবুল হাসান পাপ ও পবিত্রতাকে জৈবিক সত্যসন্ধে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে পুরা-ইতিহাস-পুরাণ মিথক্রিয়ায় সামগ্রিক বিষয়কে রূপময় সৌন্দর্যে ভূষিত করেন। সেখানে সৌন্দর্য কামগন্ধভারাতুর, ললিতলোভনকান্তি :

সৃষ্টি এত সৌন্দর্যপ্রধান! সৌন্দর্য এমন ভীরু এমন কুৎসিত!
সাপ, খেলনা, নর্তকী, নদী ও নারী

অপাপবিদ্ধতায় স্বর্গ-নরকের পৌরাণিক বিশ্বাস কিংবা সমাজসাপেক্ষ বেশ্যালয়, ঘোলামদ, অশ্লীলতা ক্ষ্যাপা দূর্বাশার ক্ষেদে পুড়িয়ে ফেলেন। নৈর্ব্যক্তিক চিন্তনে জগতের বৈভবকে এক ধরনের পার্থিবতা দেন, তার ভেতরেই তুমুল হয়ে ওঠে অপার্থিব আকুলতা। যেটি সময় ও সমাজ-নিরপেক্ষ হয়েই চিরন্তনতা লাভ করে। মরমী বা আধ্যাত্মিক অবিনাশী রূপে যাবতীয় কুৎসিত-কণ্টককে হরণ করে। রচনা করে সেই মর্মজ্ঞান—যা একমাত্র ও অনিঃশেষরূপে মানুষেই সর্বশেষরূপে পরিগণিত।

রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭২), *যে তুমি হরণ করো* (১৯৭৪), *আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি* (১৯৭৪), *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫) তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। আবুল হাসানের কবিতায় রাজনীতি নেই; কিন্তু থাকে দুর্মর ঘৃণার আশ্লেষ জড়ানো নির্বিকার ক্ষোভ। আর ক্ষোভের বিকল্প হিসেবে নিজের অন্তর্গত চেতনালোকে নির্বাসিত হন তিনি। সেখানে কীর্তিত হন 'ভেজা মাটির বৃষ্টিতে' কিংবা 'পারদমাখা শয্যা'য়। এসবের ভেতরেই জীবন-মৃত্যুর বিপরীতাত্মক প্রান্তকে মিলিয়েছেন কবি। প্রত্যেকটি কাব্যে বিবিধ বিষয় বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। *কাব্যসমগ্র*র মধ্যে পূর্ণাঙ্গ এক জীবনের মর্মভেদী উচ্চারণ বিমর্ষ করুণার্দ্রতায় মুদ্রিত। পরিশ্রমী কবি আবুল হাসান স্বল্পায়ু ছিলেন। উপর্যুক্ত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর প্রকাশিত হয় *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৫)। অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে আবুল হাসানের শব্দানুসন্ধানী, ছন্দবৈচিত্র্যপিয়াসী এক সামগ্রিক কবিসত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া আবুল হাসানের *ওরা কয়েকজন*

(১৯৭৫) নামে একটি কাব্যনাট্যও মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)
কবি-আত্মায় অনেকটা সুধীন দত্তীয় (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)। সংহত, মেদবিরল ও মিতকথন প্রয়াসে গদ্যগুণের অবলম্বন আছে কবিতায়। পঞ্চাশ থেকে কবিতাচর্চায়; প্রেম ও নারীই তাঁর প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রে অভিমান ও আত্মস্বভাব একটা পরিবৃত্ত রচনা করে তাঁর কবিতায়। এমন অবস্থায়ই রোম্যান্টিক মেজাজ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আবু হেনার রোম্যান্টিকতা উত্তরিত, মর্মপ্লাবী নয়। নিভৃত বুদ্ধির শাসনে ঋজু, দৃঢ়। তাঁর তিনটি কাব্য—*আপন যৌবন বৈরী* (১৯৭৪), *যেহেতু জন্মান্ধ* (১৯৮৪) ও *আক্রান্ত গজল* (১৯৮৮)। হাজার বছরের লিরিক প্রবণতার ধারাটিতে তিনি আধুনিকতার জলসিঞ্চন করেন। কাব্যময় শব্দপ্রয়োগে, দ্যুতিময় অলঙ্কার গ্রন্থনে; ছন্দে আনেন বিপুল বৈচিত্র্য। সমকাল-মনস্কতা থাকলেও কিছুতেই আরোপিত নন তিনি সেখানে। নির্ভার নিষ্পত্তিহীন পেলব প্রেমের ভাষ্য কালাতীত হয়ে ওঠে, তাছাড়া দার্শনিকসুলভ সন্দেহেও তিনি কবিতাকে অস্বীকার করে তোলেন। রোম্যান্টিক আবর্তে আবু হেনা মোস্তফা কামাল জীবনবাদী কবি, তাঁর কাব্যে প্রেম-নারী-যৌবন সোচ্চার ঘোষণা পায় দুর্মর একাত্মতায়।

সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৫)
ষাটের দশকের 'স্বাক্ষর' পত্রিকা থেকে আমৃত্যু কবিতায় নিবেদিত, নিরীক্ষাধর্মী ও অন্তর্মুখীতায় সিকদার আমিনুল হক বাংলাদেশের অন্যতম কবি। কবিতায় বিষয় ও প্রকরণ বিশিষ্টতায় তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দে ব্যবহৃত আধুনিকবাদী চেতনার আকর্ষি। তাঁর কাব্যভূমি ষাটের অবক্ষয়ী নাগরিক চেতনায় নির্মিত; নিরীক্ষাধর্মী প্রকরণে উত্তরিত, সর্বদৈশিক কালানুগত্যে বিধৃত। তাঁর কাব্যভূমে বিচ্ছুরিত নাগরিক চেতনায় বিরাজমান প্রুস্ত, কামু, কাফকা, বোদলেয়ার। কবিমর্মে বিধৃত ফরাসী প্রতীকবাদের ছায়া :

> তোমাকে পাই রোদ্দুরে। সিঁড়ি ছুঁয়ে ফ্লাটের নিবিড়
> চলন্ত প্রবাসী মূর্তি; যেন দোকানের কাঁচ ঢাকা
> শান্ত মাছ, তোমাকে প্রত্যহ পাই ঘ্রাণে আকস্মিক,
> হঠাৎ দরোজা খুলে, অবিন্যস্ত বিপুল শরীর।

এর এক দশক পরে লেখা :

> রাত্রি মানে বিড়ালের মতো চাঁদ, অতিশয় শাদা
> জ্যোৎস্না নিশ্চয় চায় এক পাশে কোলস্টোরেল ছাড়া

স্যালাদের নির্জনতা।

সিকদার আমিনুল হকের দুটো কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা যায়—*দূরের কার্নিশ* ও *সতত ডানার মানুষ*। প্রথমটিতে একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ—যা ষাটের অভিব্যক্ত রূপ। অপরটি প্রধানত মৃত্যুচেতনার চিত্রার্পন। *দূরের কার্নিশ*-এর "একা" প্রথম কবিতা :

আহত হৃদয় একা, করপুট ধ'রে থাকে একা
লোকার্ত গৃহের কাছে নিরাশ্রয় জটিল লণ্ঠন।
শিকড় নেমেছে একা, জল যায়, সেও বুঝি একা
আহত হৃদয় ঢাকা, জরায়ুর কবোষ্ণ জীবন।

প্রবণতাটি ভারতবর্ষীয় ভাবনাদর্শের নয়। ঋষিপ্রতিম, শুভপ্রদ আকাঙ্ক্ষা এতে নেই। কিংবা বিভাগোত্তর কবিদের নিসর্গ-প্রকৃতিময়তার শাশ্বত আবাহনও নেই। অপরিপক্ব নগিরিকের (ষাটের ঢাকার বাস্তবতায়) ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতার রূপ এখানে প্রকাশিত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য ধারাবাহি হলেও প্রথম কাব্যের উদ্ধৃত এ কবিতায় উচ্চারণটুকু আলোকময়। 'আহত হৃদয়' আর 'একা'র জীবনবাদী সংজ্ঞার্থ একটি জিজ্ঞাসাই যেন বয়ে আনে। উন্মেষ-পর্বের কবিতায় কবির আছে আলাদা রীতি :

সকলের উৎসব ছিলো। সকলেই যে-যার মতো সম্মানিত হ'লে আমি উপরের জানালার
মানুষের মতো সেই শোভাযাত্রা তো দেখেছি; তোমাদের জয়যাত্রার দুঃখিত সাক্ষী। একমাত্র
আমি-ই দূর থেকে দূরন্ত জ্যৈষ্ঠের মধ্যে শীতল উচ্ছ্বাসে বাঁচি। বুঝি এরকমই হয়।

হতাশাকাতর হলেও আশাবাদী 'যদিও উজ্জ্বল মুখ দেখতেই আমি প্রতিশ্রুত'। আধুনিক প্রবর্তনাটি কায়েমে যে উত্তরণ-পরিক্রমা প্রয়োজন সেখানে কবি ব্যবহার করেন 'জলপাই বন', 'পাইন', 'ওক' কিংবা 'থুথু, কোমরের ঘাম, অন্ধকার চুল, চামড়ার গন্ধ' এমন শব্দচিত্র। এখানে বস্তুর ভেতরের নির্যাসকে ছেনে তোলায় তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাবুকতা পরিলক্ষিত। এ তৎপরতায় তাঁর পটভূমি তীক্ষ্ণ এবং নীলিমামগ্ন। কবিতায় বিধৃত লিরিক প্রচ্ছন্ন। কিন্তু নির্লিপ্তি ও সংযম তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তোলে—তখন যথার্থ হয়ে ওঠে ভ্রামণিক শর্তগুলো। 'গদ্যকার কবিতা'র ভঙ্গিটিতে বাংলাদেশের কবিতায় বলা চলে তিনিই পথিকৃৎ। *দূরের কার্নিশ* (১৯৭৫), *তিন পাপড়ির ফুল* (১৯৭৯), *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা* (১৯৮২), *আমি সেই ইলেকট্রা* (১৯৮৫), *বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে* (১৯৮৭), *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল* (১৯৮৭), *এক রাত্রি এক ঋতু* (১৯৯১), *সতত*

ডানার মানুষ থেকে (১৯৯১), *সুপ্রভাত হে বারান্দা* (১৯৯৩), *কাফকার জামা* (১৯৯৪), *সুলতা আমার এলসা* (১৯৯৪), *রুমালের আলো ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৫), *লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো* (১৯৯৭) এমন কবির চিত্রকল্প ইউরোপীয় এবং স্বদেশী ঐতিহ্যে শীলিত।

শামসুল ইসলাম (১৯৪২-২০০৭)

ষাটের অন্যতম কবি। রোম্যান্টিক প্রবণতায় লোকজীবনের উপাদানকে আত্মস্থ করে সমকালকে পুনর্গঠনে প্রয়াসী হন। ষড়ঋতুর সোনার বাংলার প্রকৃতি অপরূপরূপে ব্যঞ্জিত তাঁর কাব্যে। প্রত্নদৃষ্টির মহিমাও আকর্ষণীয়। দেশীয় ঐতিহ্য বিপুলতা পায় ছন্দে; উপমানচিত্রও পারম্পরিক। *জলৌকা হে নীলযমুনার* (১৯৭৫) *চিরবিরিঞ্চির তরু* (১৯৮২), *লোহল নুলিয়া* (১৯৮৫), *কালনেমিকাল* (১৯৮৭), *নষ্টচন্দ্রার চাঁদ* (১৯৮৯), *কনেসুন্দরী আলো* (১৯৯২), *হিচহাইকার ও অন্যান্য পদ্য* (১৯৯৬), *শামসুল ইসলামের কবিতা সংগ্রহ* (১৯৯৬), *একপ্রেমিতে আলকেমিতে* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর কাব্য।

আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩)

কবিতায় নাগরিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় লোকজ বিত্ত-বেসাত। নিরহংকারী আসাদ চৌধুরীর কবিতায় পদ্যের লালিত্য আছে। ছড়ার বুলিতে, গজলের গীতলতায় আর চারণ বৈশিষ্ট্যে সমকালের ক্লেদ-হতাশাকে পরাভূত করেন তিনি। অনাড়ম্বর তাঁর আয়োজন। খুব নির্মল প্রস্তাবনা; সাধারণ শব্দে কিংবা আটপৌরে উপমায় দ্যুতিময় ভাষ্য রচনা করেন। প্রথম কাব্য *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫)-এ কবির বিনম্র উপস্থিতি সপ্রতিভ। *বিত্ত নাই বেসাত নাই* (১৯৭৬), *প্রশ্ন নেই, উত্তরে পাহাড়* (১৯৭৯), *জলের মধ্যে লেখাজোখা* (১৯৮২), *যে পারে পারুক* (১৯৮৩), *মধ্যমাঠ থেকে* (১৯৮৪), *মেঘের জুলুম পাখির জুলুম* (১৯৮৫), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৫), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮৫), *দুঃখীরাও গল্প করে* (১৯৮৭), *নদীও বিবস্ত্র হয়* (১৯৯২), *বাতাস যেমন পরিচিত* (১৯৯৮), *বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই* (১৯৯৮), *যেতে যেতে মধ্যযুগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে* (২০১২) কবিব্যক্তিত্বের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যে আসাদ চৌধুরীর অভিজ্ঞতালব্ধ ও মননজাত সত্তাটি লোকসংস্কৃতির উপাদানে পরিপুষ্টি অর্জন করে। ফলে প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া-ধাধা এসব ছন্দোযুক্ত হয় স্থানান্তর (inversion) বা বিপর্যাস (distortion) প্রক্রিয়ায়—পুনর্নির্মাণের ভেতর দিয়ে। তাঁর কাব্য পরিচর্যায় আধুনিকতার শর্তসমূহ আরোপিত নয় বরং লোকজীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্বাত্মক প্রয়াসটি অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বৈচিত্র্যময় উদ্ভাসিত হয়। বাংলাদেশের কাব্যাঙ্গনের তাঁর এটি নিরীক্ষিত ও ব্যতিক্রমী অনুষঙ্গ। আসাদ

চৌধুরী বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবনাশ্রিত শুদ্ধতার ধারাটির প্রতি নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠেন। যেখানে চর্চিত অভিজ্ঞতায় ক্রমাগত অতিক্রম করেছেন বিপুল পথ-পরিক্রমা। সে কারণে তাঁর নির্মিত কবিভাষা অনেক মমতাস্পর্শী, ঋজুতারঞ্জিত। সেখানে বাংলা কাব্যধারার শাশ্বত আবহটি যেমন বজায় থাকে তেমনি বিবর্তনের প্রবাহে যুক্ত হয় কালের মাত্রা। কৃষি উৎপাদন অর্থনীতিতে বাংলাদেশের কবিতায় কবির উচ্চারণ পূর্বপাঠের রীতিকে ধারণ করে আত্মবীক্ষায় কৃত্য। আর তার মধ্যেই আত্মমুক্তির প্রসঙ্গটি কার্যকর হয়ে ওঠে। আসাদ চৌধুরীর ভালোবাসার সূত্র মাটিপুরাণে প্রোথিত। সেখানেই তাঁর শিল্পসত্তার অভিন্ন রূপটি নিমজ্জিত। *আমার কবিতা* (১৯৮৫) আসাদ চৌধুরীর ছয়টি কবিতা গ্রন্থ নেয়া কিছু কবিতার সংকলন।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮)

অসঙ্গতির প্রতিবাদ, 'টেকসই সূর্যোদয়ের' প্রত্যাশা আর প্রতিপক্ষের প্রতিরোধে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ অবলীলায় উদ্ভাবিত করেন অন্যতর জীবন্ত সব চিত্রপ্রতীক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আমাকে ছাড়া অনেক কিছু* (১৯৭৭)। এরপর *আঁধির যতো শত্রুমিত্র* (১৯৮০), *অদম্য পথিকের গান* (১৯৮২), *এই যে তুমুল বৃষ্টি* (১৯৮৪), *সরল চালের খেলা* (১৯৮৫)। তারপর অপহারী সামরিক শাসনের মধ্যে পাঁচটি কাব্য—*যদি কিছু পাই* (১৯৮৭), *শাসন নেই, ধমক নেই* (১৯৮৭), *রোজ তোমাকে বেরুতে হয়* (১৯৮৭), *একই টেবিলে দশজন* (১৯৮৭), *এই যে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি, দ্যাখো, দ্যাখো* (১৯৮৯) এবং সর্বশেষ কাব্য *চেয়ে দেখি কতো কিছু* (১৯৯৪)। এ প্রক্রিয়া পর্বে সাইয়িদ আতীকুল্লাহর কবিভাষার নির্মাণ। প্রাত্যহিক শব্দবন্ধকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। আমরা চল্লিশের কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪)-এর কবিতায় এমন শব্দরীতির ব্যবহার লক্ষ করি। কবিতায় চলিত বা কথ্য শব্দকে ছন্দচালে তুলে আনা, দুর্বহ ব্যাপার। এমন কবিতামুক্তির দায় কেউ নেননি। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ সততার সঙ্গে এটি করেছেন। নিজস্ব এ শব্দরীতিতে তিনি আধুনিক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উদ্‌ভ্রান্তিসুলভ অনিয়ন্ত্রিত উৎসন্নের কালকে দুর্বার ভাষ্যে তুলে আনেন। যুক্ত করেন বৈশ্বিক অভীপ্সা; স্বদীক্ষিত চেতনা। সাইয়িদ আতীকুল্লাহর প্রকরণ পরাধীনতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ। 'আয়নায় চোখ পড়লেই নিজেকে মনে হয় ভীষণ/ রকমের এক হতচ্ছাড়া'—এরূপে মুক্তির অন্বেষার পথটি হাতড়াতে থাকেন। বিনয় ও বিষাদ তৈরি করে প্রতিক্রিয়া; প্রধানত তাঁর আবহের অন্বিষ্ট সমাজতান্ত্রিক শর্তের, কবিবিশ্বাসটি তাঁর সে আবহেরই—ফলে অবমুক্তির ভাষ্য প্রবহমান ও সুস্পষ্ট। কিন্তু ভঙ্গীমাটি ক্ল্যাসিক, সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের কবিতা তাঁর স্বাতন্ত্র্য হওয়ার ক্ষেত্রটিও সে পরিসরেই।

ছয়.

খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৯-২০০৮) ষাটের কবি। দীর্ঘ কয়েক দশকের কাব্যচর্চায় কবির ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-নস্ট্যালজিয়া, রাজনৈতিক সত্যতা প্রভৃত বিষয় বিরাজমান। খালেদা এদিব চৌধুরী কবিতায় নিজেকে যুক্ত করেন স্বদেশ ও সমাজের বিস্তারিত—বিবিধ সমস্যার সঙ্গে। চলমান জীবনের যাবতীয় বাস্তবতা কবি-মনস্তত্ত্বে বেদনা-বিষণ্নতা কিংবা আনন্দের প্রতিবেশ রচনা করে। প্রচ্ছন্ন শ্রেণিচেতনা বিধৃত থাকলেও মূলত বৃক্ষ-পাখি-নদীর প্রতীকায়নে পরিশুদ্ধ জীবনের প্রত্যাবর্তনের কথাই তিনি বলেন। গদ্যকারের উত্থাপনে, শেষ-ব্যঙ্গ বিরাজমান তাঁর সময়কে ঘিরে। কবির আত্মতায় এক রকমের বেদনাবিলাসও পরিলক্ষিত। তবে আধুনিক রীতিতে নাগরিক সমাজ ও স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বিষাদ ব্যক্তিস্পর্শী হলেও কবি তা সামগ্রিক সূত্রে গ্রথিত করে তোলেন। খালেদা এদিব চৌধুরীর কবিতার নান্দনিক-বীক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংহত। তাঁর কাব্য *আমার দাহ আমার হাত* (১৯৭৮), *পান্থ তোমার ভালোবাসা* (১৯৮৩), *পাথুরে আগুন* (১৯৮৫), *তোমার অনঙ্গ* (১৯৮৬), *দুহাতে আঁধার কেটে* (১৯৯৩), *হে বাঁধন লতার কাঁদন* (১৯৯৫), *দু ফোঁটা চোখের জল* (১৯৯৭), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৮) প্রভৃতি। **আহমদ ছফা** (১৯৪৩-২০০১) লিখেছেন *জল্লাদ সময়* (১৯৭৪), *দুঃখের দিনে দোহা* (১৯৭৫), *একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা* (১৯৭৭), *লেনিন ঘুমাবে এবার* (১৯৯৯), *আহমদ ছফার কবিতা (কবিতা সংগ্রহ)* (২০০০) কাব্য। এসব কাব্যের শিল্পভূমি উন্নত, উত্তরিত। প্রচণ্ড মর্মদাহন তাঁর রচনায়। পংক্তিমালায় আত্মনুখ, পীড়ন, ক্ষয়িষ্ণু বার্তা প্রবাহিত। আধুনিক সময়ে নাগরিক প্রতিবন্ধকতা, নিঃস্ব নৈরাশ্য, নিরাপত্তাহীনতা কায়েম হয় কবিতায়। তাঁর ছন্দও তেমন ভাষ্য অনুবর্তী। প্রখর প্রদীপ্ত আহমদ ছফা সর্বোপরি জীবনবাদী ভাষ্যকার। **রবিউল হুসাইন** (জ. ১৯৪৩) স্বকাল উপজীব্য। নিরন্তর কিন্নরকণ্ঠের অনুরক্ত, বুনে চলেন নান্দনিক সব সীবনকর্ম। প্রগতিচেতনায় ঋদ্ধ মর্জিত, রুচিজ্ঞানসম্পন্ন কবি রবিউল হাসান। ছন্দে বিচিত্রপিয়াসী। গদ্যছন্দ নিয়ে অনেক সফল নিরীক্ষা চালিয়েছেন। প্রধানত রাজনৈতিক ভাবধারার ইঙ্গিত সব লেখায় পরিলক্ষিত। তাঁর কাব্য : *সুন্দরী ফণা* (১৯৮৪), *কোথায় আমার নভোযান*, কেন্দ্রধ্বনিতে বেজে ওঠে (১৯৯৬) প্রভৃতি। **ইউসুফ পাশা** (১৯৪৪-২০০৬) ষাটের কবি। স্যাড জেনারেশান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রণয় বিলাসী, উত্তরিত। *প্রণয়ের প্রজাপতি* রচনায় কবি বেশি প্রাজ্ঞ। বাণীভঙ্গির কৌশলেও এটা নজরে আসে। প্রকরণ কোনো কবিতায় দুর্বল হলেও আনুগত্যপূর্ণ বিশ্বাস চূড়ান্ত। *অপ্রতুল পুতুল নাচে* (১৯৮৪), *প্রণয়ের প্রজাপতি* (১৯৮৫), *রুদ্ধ তোমার দরোজায়*, *একা একা যাই* প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'বাজারে

তুই নিপুণ করে একতারাটি বাজা/ সময় কোথায় এই জীবনে হৃদয় দিয়ে শুনি/ মানব জীবন রইলো পতিত হয়নি ফসল বুনা/ দেহের ভিতর ফসল ফলে কি করে তরতাজা’—এমন ছন্দবদ্ধ পদে ইউসুফ পাশা প্রযোজ্য হয়ে ওঠেন। **আবু কায়সার** (১৯৪৫-২০০৫)র কবিতায় নাগরিক বৈদগ্ধতার রূপটিই প্রবল। আবেগে মধ্যবিত্ত স্বপ্ন-কাতরতা, নৈরাশ্য আছে। একই সঙ্গে ইচ্ছা-প্রণোদনা-আকাঙ্ক্ষা কবিতায় এক ধরনের প্রফেটিক মাত্রা পায়। তাঁর কবিতায় বিষাদও বাঞ্ছিত মনে হয়। আধুনিক প্রতীকের ব্যবহারে এক ধরনের চমক আছে। *আমি খুব লাল একটি গাড়িকে* (১৯৭২), *জাদুঘরে প্রজাপতি* (১৯৮৫), *জোছনায় মাতাল জেব্রাগুলো* (১৯৮৫), *লজ্জার দেরাজ* (১৯৯৭), *নিরুদ্দেশ অক্ষৌহিণী* (২০০০), *মৃগমেধের হরিণীরা* (২০০৫), *নভো নৌকার মাঝি* (২০০৫) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। **রুবী রহমান** (জ. ১৯৪৬) দীর্ঘদিনের কবিতাচর্চায়, কম লিখেছেন। রোম্যান্টিক। *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), *যে জীবন ফড়িঙের* (১৯৯১), *কান পেতে আছি মৌমাছি* (২০০৬) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। খুব খ্যাতিমান হয়েছেন কবিতার আঙ্গিক-প্রকরণের গুণে। তিন ধরনের ছন্দেই তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এক ধরনের নারীচেতনার বিচ্ছুরণ আছে, তবে সেটি মাত্রা অতিক্রম করে যায় না। পুরাণ-প্রত্ন-আলঙ্কারিক ভাবনা আধুনিক, ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষার অধীত জ্ঞান কায়েম হয় কবিভূমে। তাঁর কবিতা “সারারাত শীতরাত”, “সোনার কলম তুমি”, “সিসিফাস”, “হাওয়ার তামাশা”, “কেন তুমি দাঁড়িয়েছ” প্রভৃতি। ‘জানালার শার্সি ধরে জ্যোৎস্নার সাদা ভূত হাত নেড়ে ডাকে/ জীবনানন্দের উট স্মিত হেসে দরোজায় কড়া নেড়ে যায়’ পরাবাস্তব রং ছড়ায়। পূর্বোক্ত আবদুল মান্নান সৈয়দ এরূপে প্রাঞ্জল। তবে রুবী রহমান এখানে নিজের মতো করে ঋদ্ধ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ একটা বাস্তব দৃষ্টিচেতনা তৈরি করে। কবিতার ছন্দে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক তৈরি হলে, সেখানে বিধৃত চেতন-অবচেতন সত্তা নিশ্চয়ই একটা সত্যকাঠামোকে আহ্বান করে। রুবী রহমান নৈপুণ্যের সঙ্গে তা কবিতায় কায়েম করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত “তাপ্পি-মারা কবিতা” থেকে একটি দরকারী উদ্ধৃতি : ‘পৃথিবীর অতল থেকে তখন ফুটন্ত লাভা গলগল করে বেরিয়ে/ ছ্যাঁকা দিল আমার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে,/ পুড়ে বাষ্প হয়ে গেল আমার অশ্রু আর রক্ত।... তারপর সব হাওয়া। সব সুনসান!/ মাঠে ময়দানে আপিসে ছুটে বেড়াচ্ছে পরিশ্রমী মানুষ/ শব্দের চেয়ে, আলোর চেয়ে দ্রুত ছুটছে পরমায়ু।’ স্বভাবসুলভ ধ্বনিময় কায়েমী এসব পংক্তিতে তিনি দুরূহরূপে আধুনিক। **জুলফিকার মতিন** (জ. ১৯৪৬) ষাটে শুরু, *স্বৈরিনি স্বদেশ তুই* (১৯৭২) কাব্যটি দুর্দান্তবার্তায় বেরিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অনতি পরে। এরপর তিনি কোনো সময়ই কবিতা-বিচ্যুত নন। নিরন্তর নিভৃতের এ কবিতে রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ বিপুল সঞ্চয়ে শিল্পিত মাত্রায় অভিব্যঞ্জিত। বিশ্বাসের মর্মমূলে

থাকে সমাজ-সম্ভূত চেতনা। প্রগতিভাবনা কবির আত্মার আস্বাদে লালিত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে, খেদোক্তিও আছে—কিন্তু নস্ট্যালজিয়া ও আবাল্যলালিত গ্রাম থেকে যায় আজন্ম-আমরণের পটভূমিতে। জুলফিকার মতিন কবিতায় রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের বিকৃত, স্বার্থান্বেষী ও কদর্য রূপটি তুলে ধরেন। তুলে আনেন উৎপাদন-সম্পর্কসূত্রের পরিকাঠামোটি। এক্ষেত্রে কবিভাষায় নির্মিত হয় বিবর্তিত সমাজ ও দর্পিত স্বদেশ। তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্যও থাকে যাবতীয় সত্যদর্শী চিন্তনে। কবির ছন্দ পরিশুদ্ধ, চিত্রকল্প স্বপ্নমেদুর, রাজনৈতিক রক্তাম্বর কুশলতা অলৌকিক আনন্দের মাত্রায় আপ্লুত। কবিতাচর্চার সম্ভাব্য দিকদিগন্তের উদ্ভাবনায় তিনি সাহসী প্রবক্তাও বটে। সময়ের প্রতিটি বলিরেখা প্রকরণচিহ্নিত হয় শ্রেয়বোধের প্রেরণায়। জুলফিকার মতিনের কবিপ্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অংশটি অদ্যাবধি সম্মুখগামি। তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ *কোন লক্ষ্যে হে নিষাদ* (১৯৮৯), *নীলিমাকে চাঁদ দেবো বলে* (২০০০), *তাইতো সংবাদ নেই* (১৯৯৯), *ঘামের ওজন কত ভারী* (২০০১), *দুঃখ ভোলার দীর্ঘশ্বাস* (২০০৫), *এই সংবাদ এই একুশে* (২০০৭)। বৈশাখ উৎসব উত্তীর্ণ কাব্য : *বৈশাখে ঝড় জল রোদের কবিতা* (২০০০)। **মাহবুব সাদিক** (জ. ১৯৪৭) সমরশাসক প্রেত ও আর্থ-রাজনীতির চাপে উন্মূল সত্তা; জীবনের অনেক সূক্ষ্মবোধ কবিতায় উচ্চমাত্রা পায়। অলঙ্কার নির্বাচনে অভিনবত্বের ফলে তার বিষয় উপস্থাপনায় আসে আধুনিক ও সর্বজ্ঞ দৃষ্টি। মাহবুব সাদিক ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কাব্য উত্তরণের প্রয়াসটি সমকালীন অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব ও ইঙ্গিত আত্মস্থ তাঁর কবিতায়। অনেক সময় ক্যাজুয়াল শব্দগুলোও বেশ স্বপ্নকাতর করে তোলে পাঠককে। প্রথম দিকে মাহবুব সাদিক লিখেছেন, 'যেন দেখা যায় চাঁদজ্বলা বনভূমি/ সেখানে আমিই চিতল হরিণ খুঁজি'; পরে লেখেন 'মলিন কাঁথায় শুয়ে খোলাচোখে চেয়ে আছে/ অবিমৃশ্য নারী, ফুটপাত জুড়ে তার/ বেদনার নেশা-করা উলঙ্গ সংসার' পরিবর্তনটি এভাবে পাল্টায়। কীরূপে স্বদীক্ষিত হয়ে উঠলেন। তাঁর কবিতার শিল্পপ্রয়াস আধুনিক, কবিতার শিল্পকে যথোচিত রেখে জীবনে রাজনৈতিক সত্যকে গুরুত্ব দেন তিনি। এমনটা এ বাংলাদেশে নিশ্চয়ই দূরায়ত নয়। প্রথম কাব্য *সন্ধ্যার স্বভাব* (১৯৭৬) থেকে ক্রমশ কবি উত্তরণ পরিলক্ষিত। *স্বপ্নচৈতন্যের ডালপালা* (১৯৮৩), *সুন্দর তোমার নির্জনে* (১৯৮৫), *যায় কল্পান্তের কাল* (১৯৮৬), *আদিগন্ত রোদের তিমিরে* (১৯৯৫), *অনন্ত নক্ষত্র চোখ* (১৯৯৯), *অতৃপ্ত ঈশ্বর* (২০০০), *নিরালোকে জলঝর্ণার ধ্বনি* (২০০৬) প্রভৃতি তাঁর স্বাভাবিক ছন্দের কাব্যপ্রয়াস।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার ভূমিকাপর্ব
একাত্তর-পরবর্তী কবিতার পটভূমি

কবিতার অপরূপত্ব অনেক রকমের। কবির হাতে অনুভবের অপরিহার্য উচ্চারণটুকু শামিল হয় ভাষার প্রতীকে। এই প্রতীকে বহু-বিস্তর স্বপ্ন প্রতিপাদ্য থাকে। পুরাণ-প্রত্ন অবিনাশী হয়ে ওঠে। ফরাসি মনোবিদ জ্যাক লাঁকা ভাষার সঙ্গে স্বপ্নমাখা জীবনকে মিলিয়ে মনের অন্দর-সদরের, গোপন-উন্মুক্ততার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মনের কোণের আয়নাকে কোনো ধ্বনি-প্রতীকে বাইরের প্রতিবেশের সঙ্গে সংযোগ করেছেন। আর তাতে আছে সামগ্রিক চেতনার প্রয়াস। যিনি কবি–তার এ চেতনা কারো কারো কাছে 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ', কারো কাছে বিপরীতে 'ইমোটিভ' বা আবেগোদ্দীপক ভূমিকায় প্রদর্শিত। টি. এস. এলিয়টের মতে : 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the exprision of personality, but an escape from personality. But, ofcourse only those who have personality and emotions know what it means want to escape from these things. আবেগের বিপরীতে নিরাবেগ প্রস্তাবনায় কবি সৃষ্টির প্রত্যয়কে নির্ধারণ করেছেন। কবিতা মন্ময় আবেগের বিপরীতে তন্ময় ও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব প্রেরণাটি গ্রহণ করে, সেজন্য সে শরীরে বহন করে অনেক রহস্যময় প্রতীক, পুরাণ ও মৌহূর্তিক ইমেজ। ইমেজিস্টরাও এই প্রেরণাটি গ্রহণ করেছেন, 'কঠিন বাস্তব আনার' প্রত্যয়ে। এক ধরনের প্রত্যক্ষতাও তাতে আছে—যেখানে শব্দ নির্ধারিত, নির্বাচিত এবং ঘনত্বে ব্যঞ্জিত। রক্তিম এবং তাণ্ডবময় দ্বন্দ্বাত্মক জীবনের চিহ্নিত প্রদাহ। এরূপ পংক্তিমালায় প্রকরণ সম্পর্কে বলা যায় : 'নিরঙ্কুশ অনিবার্য শব্দ প্রয়োগ করতে হবে; প্রয়োজনবোধে চলতি বাগধারা পরম্পরায় রচনা করতে হবে, ছন্দস্পন্দনের পরম্পরা অনুযায়ী নয়; চিত্রকল্পের বিষয়ে নিবিড় রূপদান...'। বিপরীতে আবেগোদ্দীপক ভাষার পক্ষে আই এ রিচার্ডস তার প্রতিবেশ নিরূপণের ক্ষেত্রে বিষয়-প্রবণতায় ভাষার আবেগী সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কল্পসৌন্দর্যই সেখানে মুখ্য। অবচেতন বা নির্জ্ঞানসত্তায় স্বপ্ন তথা যৌনবিহার অহং-রূপটি এক কল্পপ্রতিমার ধারণার জন্ম দেয়। কল্পনা বা আবেগই সেখানে মুখ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব তাদের স্বার্থরক্ষায় অনুগত মুৎসুদ্দি শ্রেণি তৈরি করে। আত্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব শিল্পী লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না। অজাচার—'অনাহার' চললেও পরিশুদ্ধি তো চলেই। এখনও অনেক কবি নির্মোহ, নির্লোভ। সত্তর দশক এ বিধ্বস্ত, হতাশার মুখে; রচিত ইমেজ—স্রোতের

বিপরীতে। ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অপশাসন, অবক্ষিণ্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতা লেখেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। নানা রকমে এ সময়ের কবিরা প্রস্ফুটিত। কেউবা আত্মমগ্ন, অন্তর্লীন; কেউবা অনুকরণপ্রিয় রোম্যান্টিক। একটা স্ববিরোধীতা, দ্বন্দ্ব-দোলাচলতা দেশ-কালসাপেক্ষে চলতে থাকে। এ সময়ের কবিরা একদিকে যেমন উত্তরণের চেষ্টা করেন তেমনি রাজনৈতিক প্রতিবাদে হয়ে ওঠেন স্পষ্টভাষী। নির্মলেন্দু গুণ কিংবা মোহন রায়হান সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুক্তমানবতার বিজয়বার্তা ঘোষণা করেন। কবিরা আশাবাদের বাণীই প্রত্যয়দীপ্ত করেন। এ সময় স্বাধীন দেশে অনেকেই মূল্যবোধের ভিত্তিটি তৈরি করেন। প্রধানত মুক্ত স্বদেশে, স্বাধীন এ দশকে, বাঙালির আবেগ হয়ে ওঠে অনিরুদ্ধ। নারী বা শ্যামলী নিসর্গ যোজনা করে নতুন মাত্রার। স্বপ্ন-সম্ভাবনার মূর্তিমান বিন্দুতে থাকে যাবতীয় অস্থিরতার অবসানের আর্তি। কবিরা একটা স্থির ও স্থায়ী প্রকরণ-নির্মাণে পরিশ্রমী হয়ে ওঠেন। ব্যক্তির আনুগত্য, ব্যক্তিবলয় ছাড়িয়ে পৌঁছায় শুভ ইঙ্গিত। সেখানে চিহ্নিত থাকে সময়ের বলিরেখা। এ দশক অনেক প্রলম্বিত, এঁদেরই অনুবর্তী পরবর্তী দশকের কবিরা। প্রসঙ্গত, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে এ শতকের কবিরা নতুন কবিভাষায় যেমন উঠে আসেন তেমনি পূর্বের কবিকুলও অর্জন করেন অপরিহার্য প্রত্যাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের পরে থিতু হওয়া, অভিজ্ঞতা আবেগরহিত, সত্তরের প্রবাহ পৌঁছায় আশিতে। একই ধারায় ও আচরণে, তবে চেতনার শুদ্ধতা পরিপক্ব, বুদ্ধিতে আন্তর্জাতিক অন্তর্ভুক্তি, আরও অধিক নিরীক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা জারি, বেশি ঢুকে পড়ে স্থূল পারিপার্শ্বিকতা। শুদ্ধশব্দ নির্মিতির চেষ্টায় কৃত্রিমতা নেই তা বলা যাবে না, তবে কৃত্রিমতা একটা পর্যায়ই বলতে হবে এ সময়ে; তবুও আসলেন অনেকেই স্বৈরাচারী শাসনের বিপরীতে, লিট্‌লম্যাগে ভর করে, সমস্ত আগ্রাসী শক্তিকে অভয়ে এড়িয়ে—যদিও তা জটিল কিন্তু কবিতার জন্য সবই রপ্ত হতে থাকে। 'পরাভব-প্রাণ' কিছুতেই নয়, ততোধিক আবেগঘন প্রাণে বাজল জীবনের বাঁশী। স্বদেশমুখরিত, স্বাধীনতার অনতি পরের আবেগের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র—কিন্তু এগুনোটা, বোধের ব্যাপারটায় আশি পূর্ণাঙ্গ, আর ধারায় তো অবশ্যই অখণ্ড। কবিতা যে সমকাল ও সমাজকেই রাখবে তার ভেতরে—তা তো নয়, সেটা হতেও পারে না। নন্দনকর্ম অবশ্যই পরিবেশ চায়, সেজন্য তার অপেক্ষা ও গুরুত্ব আছে, কিন্তু অনির্বচনীয় বলে যে কথাটা কবিতায় অনিবার্য তা কীভাবে এলো? আশিতে কবিরা পূর্ব-পাঠ, পাঠ-অভিজ্ঞতায় সমাজধর্ম, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নদৃষ্টি অর্জন করেন। ঢাকার নাগরিক হিসেবেও অভিজ্ঞ। অশনির বিরুদ্ধে উজানে যেমন চলছেন তেমনি শেকড়েও ফিরে শানিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে। এখানে সবচেয়ে বেশি নাগরিক অভিজ্ঞতা। চেতন-অবচেতন বিন্দুটি শ্লোগানতাড়িত, সাম্রাজ্যবাদ ফুঁসছে;

কবিতা ব্যঙ্গে হাসছে, জীবন নিয়ে যেমন পরীক্ষা, উক্তিতেও পরীক্ষা—নন্দন পরিমণ্ডলটির ভিত্তি এরূপেই নির্ণীত হতে থাকে। প্রজ্ঞাঋদ্ধ প্রতীকপ্রতিমা, উপমা-ভাষা, শুদ্ধশব্দ; খিস্তিখেউড়, আঞ্চলিকতা নিয়ে আশির ভিন্ন বাতাবরণ। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন সামরিক শাসন-কাঠামোর ভেতর-বাহির পটচিত্র অংকন করেন, রূপকথা বা উপকথার অর্থারোপটি তাঁর অনেক কবিতার প্রাণভোমরা। শোয়েব শাদাব কিংবা সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ এখনও এরকম সোনা-রূপার কাঠি বা 'সমুদ্দুর' পুরাণে আছেন। তবে তাঁরা জীবিত, এ পর্যায়ে হয়তো এমনটা এখন নিশ্চিত, তাঁরা কবি হিসেবে চলমান। তাদের ভবিষ্যৎ জানা মুশকিল। তবে প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা এজন্যই স্বার্থ-অভাব-সংসার-কর্মব্যাপদেশ-ভোগবিলাস সবমিলে 'অনেক আলোর ঝলকানি'র তো অনেকেই ধরাশায়ী। তবুও যাঁরা কবিজীবী তাঁদের প্রণাম।

নব্বুইয়ে কিছু কবিপ্রতিভা এলেও ঐ একইরূপে অখণ্ডরই খণ্ড বলতে হবে তাঁদেরও। তবে পরীক্ষিত কি-না সেটা বলা জটিল। নতুনদের জন্য পরিচর্যার পরিসীমা, কবিদৃষ্টির সামর্থ্য এখনও অপেক্ষমান। উত্তর-আধুনিকতা এসেছে অনেকভাবে, কার্যকর যুক্তিটি কিছুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আকর টেক্সট নেই। কবিতায় অনেক আশা-সম্ভাবনা-অনিবার্যতা আসবেই, উপাদান-উপকরণও থাকবে—সেটা তো বাজারী, বহ্বাস্ফোট, মিডিয়া কারবারি হলে চলে না। আর কবিতার মতো শিল্পে তো অসম্ভব। কবিতায় প্রত্যয় ও পরিচর্যা কিংবা মেধা-যুক্তি-আবেগ বললে জীবনানন্দ-সুধীন-বিষ্ণু-বুদ্ধদেব আর একালে আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, আবুবকর সিদ্দিক উদাহরণ তো বটেই। এঁদের অনুগামী ধারাতেই নতুনরূপে আসেন কবিপ্রজন্ম। তাঁরও অর্জন করে স্বদেশের মাটি-মানুষ-প্রকৃতির গন্ধ। অবশ্যই তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।

দুই.

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় প্রকাশিত মৌলচেতনা—দ্রোহ। 'আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই', 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন'—এসব পংক্তিমালায় সমাজ ও মানুষের মুক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় শ্রেণিশক্তির অনাচার বিতাড়ন করে; প্রেমের পরাগ ফোটাতে চেয়েছেন তিনি। রুদ্রের প্রকাশভঙ্গি সরল, নিজের বিশ্বাসকে সরাসরি পংক্তিতে প্রবিষ্ট করাতে চান, প্রত্যাশাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে চান। কবি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, দশক বিবেচনায় সময় তা সত্তুর, হিমেল বরকত সম্পাদিত *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে ২০১৪ র

বইমেলায়, যদিও এর আগেও তাঁর রচনা পাঠক সম্মুখে বেশ প্রতাপের সঙ্গেই সমাদৃত হয়েছে। রাগী, সাহসী, দুর্মর রুদ্র অকালপ্রয়াত হলেও যে কবিতা-বিস্ময় আমাদের কবিতাঅঙ্গনে প্রদর্শিত হয়েছে—তা চিরসমুজ্জ্বল। *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯) নামকরণের ভেতরেই রুদ্র কবিতার ভরকেন্দ্রে জুড়ে দেন 'নির্বাসিত' সময়ের আখ্যান। কবিতা 'উপদ্রুত' নয় কিন্তু কবির দৃষ্টিকোণটি গড়ে ওঠে উপদ্রুতকে প্রতিঘাত করে। পক্ষে থাকেন উপদ্রুত মানুষেরা। প্রান্তিক, বঞ্চিত, অপহৃত, বৈষম্য শব্দগুলো—উপদ্রুতের ব্যানারে খচিত। নামটি লক্ষ্যহীন নয়। কখনো চিন্তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। বুদ্ধির শাসনে তার কবিতা জমে ওঠে, ইমেজ স্ফটিকস্বচ্ছ হয়। 'বাতাসে লাশের গন্ধ' অপরিচিত নয়। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। পরে সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) হয়ে রুদ্র নিঃশঙ্ক এ প্রকরণটি হাতে নেন। সত্তরের প্রারম্ভ থেকেই একটি নতুন স্বরে চিহ্নিত হন। আমৃত্যু সেভাবেই সচকিত। রুদ্র যেভাবে তার চেতনার পুনর্গঠন করেন, অর্জন করেন কাঙ্ক্ষিত শক্তি—সে ধারাটি বিদেশে মায়াকোভস্কি, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদার। তাঁর কাছে সামাজিক ইতিহাস, আর্থ ইতিহাস, সমাজের স্তরবিন্যাসতত্ত্ব অধ্যয়নের বিষয় নয়, কিন্তু দৃশ্যমান সমাজের ভেতরেই সে অধ্যয়নটি পেয়ে যান তিনি। কবিতার শক্তি হয়ে ওঠে প্রকাশের শক্তি। পংক্তিগুচ্ছের উত্তাপ মানুষের পক্ষে, 'অপর' (otherness)-এর পক্ষে। কারণ নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে—পংক্তির শক্তি দৃঢ়তর হয়। সভ্যতা ও মানুষ অদ্বিতীয় সত্তা, চেতনার প্রথম স্তরে বিবেচ্য সমাজ, উত্তরিত স্তরে (দ্বিতীয় সত্তায়) প্রশ্নশীল বৈষম্য; প্রচল ভিত্তি কাঠামো সরাসরি অস্বীকার, এর পরের স্তরে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের কেন্দ্র অস্বীকার। ক্রমশ কবিতা হয়ে ওঠে মুক্তি-পতাকার উল্লাস। *উপদ্রুত উপকূল* থেকে *ছোবল* শত কবিতার পংক্তিতে ভর করে তপ্ত নিঃশ্বাস আর উদার উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা :

> এ চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না—
> তন্দ্রার ভেতরে শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার,
> নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ,
> মুণ্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর
> ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে—আমি ঘুমুতে পারি না, আমি
> ঘুমুতে পারি না...

এখানে চোখ>ধর্ষিতা>মানুষের পচা লাশ>মুণ্ডুহীন বালিকা অভিন্ন হয়ে উঠেছে। কার পক্ষে? নিশ্চয়ই অভিজাত বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যাদের নিয়ন্ত্রণে তারা নন। কবির কথায় 'যার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে উপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজের তৈরি শিক্ষাপদ্ধতি। গোলাম বানানোর যন্ত্র। যার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে এক হৃদয়হীন আচারের ধর্ম। ধর্ম নয়, ধর্মের পোশাক' [*মানুষের মানচিত্রের*

স্বীকারোক্তি]। ইত্যাকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ভেতরে কবিসত্তাটি গড়ে উঠলে, নিষ্ঠুরতার স্তূপে ক্রন্দন থাকে, অনাচার-উপদ্রব থাকে—তারও প্রকাশ কবিতায় ঘটতে পারে, উপলভ্য সৌন্দর্যের হাতছানি সেখানে অন্য মাত্রার। কষ্ট-ক্লেদ-কান্নার স্বর যতোই পরিচিত হোক, বিশ্বকে ক্রন্দনরত করুক—কবিরা তাকে প্রকাশ করেন তীব্রতার অঙ্কে– সেখানে জমে সৌন্দর্যের বিভাব!

রুদ্রর লাইনগুলো প্রত্যক্ষ। রুদ্র ধারালো হন বলেই, ধার ছুঁয়ে চলে প্রতিটি প্রান্ত, এতে পিছুটান নেই, চেতনাতে সবটুকু নির্দ্বন্দ্ব, সজ্ঞানস্তর থেকে নির্জ্ঞানস্তরেও এই সাড়া সমুপস্থিত হয়ে এক অনুভবের কথা বলে। আবেগের নির্যাসটুকু সমর্পিত, মানুষের পক্ষে। রুদ্র থেকে আরেকটি কবিতার উদ্ধৃতি :

বদলে যাচ্ছে এই গ্রামখানি, নদীটির তীর
কপালের নিচে সরল চক্ষু বদলে যাচ্ছে।

কিশোরীর ঝাঁক দল বেঁধে আর খেলতে আসে না।
হাতের ভেতরে মমতার হাত, স্বাতির পৃথিবী
বদলে যাচ্ছে—বদলে যাচ্ছে—বদলে যাচ্ছে।

... ...

বদলে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে—
রূপশালী ধান গ্রামটিরে আমি বাঁচাতে পারি না,
আঙুলের ফাঁক গ'লে নেমে যায় বাসনার জল
রাখতে পারি না করপুটে প্রিয় স্বপ্ন আমার।

'কাঁচের গেলাশে উপচানো মদ' থেকে কিয়দংশ পড়ে নিলে দেখা যায় চিরপরিচিত নিবিড় গ্রাম। 'গ্রাম'ময় কবিতার ভেতরে চোখের সুখ-স্বপ্নউপাচার নির্মিত পৌরাণিক স্বস্তি, বিন্যস্ত সুখের সীমানায় অমোঘ উৎসবের উল্লাস। মানব থেকে যায় তাতে। কিন্তু 'সরল চক্ষু' আর নেই। নেই স্বস্তিটুকুও। গ্রাস করেছে সুখ, গমন করেছে স্বপ্ন। *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রামে* আছে ভূমিসন্তানের অনিঃশেষ কলরোল। 'হারাই হরিনপুর', 'একজোড়া অন্ধ পাখি', 'নিখিলের অনন্ত অঙ্গন', 'গহিন গাঙের জল' প্রভৃতি একরকম ভাবনা-স্পেলের বিন্যাস। 'আমি' মিশে গেছে উত্তাপ উঁচানো সময়ের স্মরণীয় ময়দানে—সেখানে আনখাগ্র ছুঁয়ে-ছেনে ভরে উঠেছে নিজস্ব আঙ্গিনা, 'লহ এ নগর, ফিরে দাও স্বর্নগ্রাম'—আখ্যান। এ কাব্যটির ভাষাপুটে লোকজ তৃষ্ণার অগ্নি যেন একাকীত্বের ঘরে বাসা বেঁধেছে।

রুদ্রর কবিতার উত্তুঙ্গ অবস্থান *মানুষের মানচিত্র* কাব্যটিতে। কমিটেড এবং তুমুল 'বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত'। সমব্যথি কবি। ঠিক বিপরীত অর্থে অনুমান করি 'অন্তরে রুদ্ধ শক্তির পীড়া'। কবির শক্তি বিদীর্ণ। অর্থ তাৎপর্যময়

একটানা বত্রিশটি নামহীন কবিতা, একসুতোয় আটকানো—মানুষের মানচিত্ররূপে। স্বীকারোক্তিসমেত গড়ে ওঠে স্তবকগুচ্ছ। তাতে দানা বাঁধে তুফান দিন :

পাখির নাহান ডাকো। মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়।
আমি কি বুঝি না ভাবো? কাতলা মাছের মতো ঘাই মারে বুকে,
ওই ডাক ঘাই মারে রক্তে-মাংশে। ভাবো ঘরে আছি খুব সুখে।
আহারে পোড়া সুখ– তুফানের গাঙ দেখে মাঝি সে পালায়।

নিরহঙ্কার দৃষ্টিপাতে উত্তর-উপনিবেশ চেতনাটি এখানে ভিন্ন প্রবণতায় অহঙ্কারী। এখানে শস্য-শ্যামল প্রকৃতি অস্তিত্বে ও জাতীয়তায় গাথা। কবি বরমাল্য তাতে। নিকটতম হন ডায়ালেক্টের ভেতর। এ চেতনা সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে ক্রমশ অধিকৃত, এ ভূখণ্ডে। সমাজ নিঃশ্বাসটুকু চিনে ফেলেন, গোড়ায়। তাই ভুঁইফোড় নগরে নয়, স্থবির ফ্যাশন দুরন্ত চাকচিক্যে নয়, আরোপিত পণ্য-সংস্কৃতিতে নয়; ফিরতে চান স্বর্নগ্রামে—যেখানে 'পাখির নাহান ডাকো', যেখানে 'মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়'। এ ডাক মধুগন্ধে ভরা।

মানুষের মানচিত্র রচনার প্রাক্কালে রুদ্র বলেছেন : 'একটার পর একটা খাঁচা নির্মাণ করেছি আমরা। আবার সে-খাঁচা ভেঙে নোতুন খাঁচা বানিয়েছি। আবার খাঁচা ভেঙেছি—আবার খাঁচা বানিয়েছি। খাঁচার পর খাঁচায় আটকা পড়তে পড়তে, খাঁচার আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে, টুকরো টুকরো হয়ে আজ আমরা একা হয়ে গেছি। প্রত্যেকে একা হয়ে গেছি। কী ভংকর এক একাকিত্ব! কী নির্মম এই বাস্তবহীনতা!! কী বেদনাময় এই বিশ্বাসহীনতা!!!' তিনি আরও বলেন : 'আমাদের কৃষকেরা শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়। আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত। হাড্ডিসার। লাবণ্যহীন। আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন। আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস করুন। আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে। পৃথিবীর যুদ্ধবাজ লোকদের জটিল পরিচালনায়, ষড়যন্ত্রে আর নির্মমতায় আমরা এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা আর চরম অসহায়ত্বের আবর্তে আটকা পড়েছি। কী বেদনাময় এ অনিশ্চয়তা! কী বীভৎস এই ভালোবাসাহীনতা!! কী নির্মম এই স্বপ্নহীনতা!!!' কমিটমেন্টের এই স্বর আরেক মাত্রায় নির্মিতি পায় :

সোনার খাঁচায় বেঁধে রেখেছে পাখিটি, পায়ে সোনার শিকল।
আহারে রঙিলা খাঁচা! দেখতে কি অপরূপ পাখির ঘর,
পাখির আকাশ আজ বাঁধা প'ড়ে আছে ওই খাঁচার ভিতর।
বুনো গান ভুলে গেছে, শিখেছে নোতুন বুলি, নয় কোলাহল।

এভাবে রুদ্র যে নন্দনলোকের সৃজন প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি শুধু তত্ত্বে নয়, ফিরে যাওয়া নয়, প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ফিরে পাওয়া সহজাত প্রকৃতির জন্য। সেজন্য

পংক্তিমালায় তার ব্যবহার্য রূপ-নিশানা : স্মৃতি, তর্পন, অলৌকিক প্রকৃতি, নস্ট্যালজিয়া, অবসেশান প্রভৃতি। ইত্যাকার উপাদানে তিনি বাংলাদেশের কবিতাধারায় এক স্বতন্ত্র ভূ-ভাগ রচনা করেন। এটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে শেষদিকের *দিয়েছিলে সকল আকাশ* ও *মৌলিক মুখোশ* কাব্যে। রুদ্রর বদল ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিত এতে আছে কিন্তু তার বিচিত্রপ্রবণতার স্বরূপ নির্ণয় হয় অগ্রন্থিত বিপুল রচনায়।

ছোবলের পর বেপরোয়াভাবে চলা রুদ্রর জীবন নানাভাবে কাব্যময়। তাঁর রঙ ও রূপের খেলায় স্বতঃশ্চল। এই স্বতশ্চাঞ্চল্য ধরা পড়ে নানাসময়ে লেখা প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতায়, গল্পসিরিজে, গানে, কাব্যনাট্যে। সত্তুরেই তার কবিতা উৎকৃষ্ট মাত্রা পেয়ে গেলে আশিতে তা স্বতঃধার, বৈভবের উৎসবে গুরুত্বও পান তিনি; মিঠেখালি-মংলা-বাগেরহাট-ঢাকার আবাস, *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম* কবির আমৃত্যু উপলভ্য হয়ে ওঠে। নিয়তই তা তাকে দেয় অনেক কবিতা, ক্রমশ তারই প্রতিক্রিয়া– এই সমাজ ও রাষ্ট্রে হয় গৃহীত, জীবনে পায় অন্তর্লীন উপভোগ। কবির কাব্য : *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯), *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম* (১৯৮১), *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৪), *ছোবল* (১৯৮৬), *দিয়েছিলে সকল আকাশ* (১৯৮৮), *মৌলিক মুখোশ* (১৯৯০), *একগ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় কাব্যনাট্য : *বিষ বিরিক্ষের বীজ* (১৯৯২)।

আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫)

আবিদ আজাদ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে '৭৬ থেকে কাব্যাঙ্গনে সক্রিয়। তাঁর কবিতার জগৎ তৈরি হয়েছে মধ্যষাট থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা-পরবর্তী কালপরিধিতে। তাঁর চেতনাজগতের ভাষ্য : এই স্বাচ্ছন্দ্য যেমন আমি উপভোগ করেছি জীবনের গভীর মজার মতো—'ঠিক তেমনিভাবে, মাঝে মাঝে, মনে হয়েছে, কোথায় স্বাধীনতা-এ যে আত্মনির্মিত আর এক কারাগার। মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্তদের মতোই কয়েদ খাটে কবি। এখানে কবিতা পায় না প্রাকৃতিক রৌদ্র ও বৃষ্টির পুষ্টি। আমি তখনই ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছি জীবন ও কবিতার শর্তযুক্ত শৃঙ্খলা এবং যান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাও। আর আশ্চর্য হয়ে দেখেছি—কবিতা আর ছাড়ছে না আমাকে।' আবিদ আজাদকে আমরা ভেতরে গ্রহণ করতে চাই এমন দ্রষ্টব্য থেকে। উদ্ধৃতি :

> স্বপ্নের ভিতরে আমার জন্ম হয়েছিল
> সেই প্রথম আমি যখন আসি
> পথের পাশে জিগা-গাছের ডালে তখন চড়চড় করে উঠছিল রোদ
> কচুর পাতার কোষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড রুপালি আগুন

ঘাসে-ঘাসে নিঃশব্দ চাকচিক্য ঝরানো গুচ্ছ গুচ্ছ পিচ্ছিল আলজিভ
এইভাবে আমার রক্তপ্রহর শুরু হয়েছিল
("জন্মস্মর", *ঘাসের ঘটনা*)

ঘাসের ঘটনা কবির এ ভঙ্গি আলাদা এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। কেননা শহীদ কাদরী বা আবুল হাসান কিংবা সে সময়ের উলম্ফিত কবিরা যেভাবে লিখেছেন আবিদ সেভাবে লেখেননি কারণ, অন্তত তাঁর সামনে নতুন স্বপ্নাপ্লুত আবেগের একটি দেশ ছিল। এবং সে দেশে কবিরা রাজধানী ঢাকাকে শহর ভেবে তাদের বাস্তু—বসতি মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এক করে মোটামুটি নাগরিক বা সিভিল গণতান্ত্রিক ভেবে ফেলেছিলেন। তখন তাঁদের চোখে উপর্যুক্ত ভাবনা বিশেষ মর্যাদা পাওয়াই শুধু নয় মর্মর চৈতন্যে সৃষ্টি করেছিল কূলপ্লাবী ভালোলাগা আর ভালোবাসার প্রেরণা। এখানে আবিদ আজাদ লিখতেই পারেন : রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে/ মরিচ গাছের পাতায়/ দু'টি লাল ডেয়োপিঁপড়ের ভাস্কর্য/... চোখের ছিলায় দিন ছলকায় বেলা যায় বেলা যায়..., কিংবা জ্বরতপ্ত সারা বাড়ি, মনমরা ঘুমের জঙ্গল–/ উঠানে কি বৃষ্টি এলো..., খালাম্মা, তোমার গন্ধে ঘুম আসে না যে!/ এখন ওপাশে ফেরো, অন্যদিকে মুখ করে শোও। তোমার ভিতরে কী যে হাওয়া কী যে জ্যোৎস্না কী যে নোনা বাদাড়ের ঘ্রাণ!... ইত্যাদি।

আমার মন কেমন করে (১৯৮০) কিংবা *বনতরুদের মর্ম* (১৯৮২) কাব্যে কবির চিত্ত উত্তরিত। ক্রমাগত কবি স্বপ্নমুগ্ধতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ কাব্য দুটিতে কবি তাঁর সমসাময়িক সময়কেই বন্দি করেছেন। *ঘাসের ঘটনা* থেকে *বনতরুদের মর্ম* পঠনেই অনুমান হয় কবির শব্দ ও ভাব বদলের ক্ষেত্রগুলো। ক্রমশ *ঘাসের ঘটনা*র বিষয় থেকে সরে আসেন কবি :

আজ মনে পড়ে সেইসব মুঠোবন্দি জোনাক পোকার দুঃখ
হাওয়ার হাওরে ছইনৌকার মতো একরত্তি পাখি
গলার নিচের দিকে অদ্ভুত নরম নীল রোঁয়া
উঠোনমণির মুখ, ভোরবেলাকার হিমভেজা কার চোখ
আগডুম বাগডুম চারিদিক, বাক দিচ্ছে সুন্দর মোরগ।

আবিদ আজাদের কবিতার দীর্ঘায়ত পরিক্রমায় *বনতরুদের মর্ম*-এর মধ্যে "ক্রাইম রিপোর্ট", "পত্রিকায় বালকের করুণ মৃত্যুসংবাদ পড়ার পর", "দেখা হবে", "আমি বলছি কিচ্ছু হবে না", "যে শহরে আমি নেই আমি থাকব না" কবিতাগুলো অনেকটা নগর–মধ্যবিত্তের চিন্তাজাত—যার মধ্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যেমন শ্রেণিহীন মানুষের ছবি, নিরন্ন-নিপীড়িত মানুষ, গণতন্ত্র, রাজপথ, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট, অতিথিভবন ইত্যাদি উৎকীর্ণ। তবে এমন বোধে কবি কিছুটা দুর্বল। '৭৬ থেকে '৮২ আবিদ অভ্যস্ত ঢাকায় মধ্যবিত্ত অনুভবকে ব্যক্ত করেন : 'এই সাদা

ফুল আমার রাজধানী/ এই সাদা ফুল আমাদের স্বাধীনতা/ ...এই সাদা ফুল আমাদের ভোর' কিংবা 'দেখা হয়ে যাবে ধর্মঘটের আন্দোলনের এই শহরেই আবার/ দেখা হয়ে যাবে তোমার আমার', কী ছিল পরনে তার? নীল হাফপ্যান্ট? লাল বুশশার্ট? সাদা গেঞ্জী? না জিনসের/ নিঃসঙ্গ পোশাক পরে একা একা ছিল? ডুবুরির পোশাকে বিষণ্ন হয়েছিল সারা ক্ষণ?... আবিদ আজাদ এ ক্ষেত্রে লাভবান হন বিচিত্র রকমের শব্দকে কাব্যবন্ধে আনতে পেরে। শব্দের ব্যাপারে তাঁর আড়ষ্টতা এ পর্যায়ে কমেছে। কার্যত, তৃতীয় কাব্য থেকেই আবিদ আজাদ একপ্রকার অনাবিল।

তেরটি কাব্যে অনেক রকম প্রবণতায় অভিষিক্ত আবিদ আজাদ। 'স্মৃতির শিল্প'কে তিনি কবিতা করেছেন। *আমার মন কেমন করে* (১৯৮০) কিংবা *বনতরুদের মর্ম* (১৯৮২) কাব্যে কবির চিত্ত উত্তরিত। ক্রমাগত কবি স্বপ্নমুগ্ধতার ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে এসেছেন। রচনা করেন, *আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি* (১৯৮৭), *ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭), *তোমার উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?* (১৯৮৮), *আমার কবিতা* (১৯৮৯), *খুচরো কবিতা* (১৯৯০), *আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে* (১৯৯৩), *আমার অক্ষমতার গল্প* (১৯৯৮) এবং তাঁর অন্যান্য কাব্য। আবিদ আজাদ স্বপ্ন-প্রণোদনা ও আশাবাদের কবি।

দাউদ হায়দার (জ. ১৯৫২)
প্রথমে ভারত পরে ইউরোপ প্রবাসী কবি, ১৯৭৪ থেকে নির্বাসিত; সত্তর বা যুদ্ধ-প্রজন্ম দশকের কবি। যুদ্ধোত্তর বা স্বদেশজন্মউষালগ্নেই প্রবাদবাক্যতুল্য খেদোক্তি 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' :

> পুরুষত্ব বিলিয়ে ভাবি কুড়ি টাকার একসের চাল ও একদিনের অন্যান্য
> সামান্য দ্রব্যাদি মিলবে তো?
> আমার চৌদিকে উৎসুক নয়ন আহ্লাদী হাসি ঘৃণা, আমি পাপী

কবির নিকট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে স্বপ্নভঙ্গের স্বদেশ; হতাশা-নৈরাশ্য প্রপীড়িত স্বদেশ। ধর্মান্ধ, মৌলবাদের উত্থান ক্রমশ ছেয়ে ফেলে বাংলাকে—সেখানে নির্বাসিত দাউদ হায়দার। খুব ক্রান্তিকালের পথিক, বিবর্ণ প্রকৃতি, বৈশ্বিক বাস্তবতা, সমস্তর সুসমন্বয়ে সুনিশ্চিত সুপ্রভাতের প্রতিশ্রুতি; আশাবাদ তাঁর কাব্যে। দাউদ হায়দার কবিতায় ছন্দে স্বাচ্ছন্দ্যময়, পরীক্ষণীয়—অনেক রকমে ছন্দ নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। পৌরাণিক, ক্যাজুয়াল, দেশি-বিদেশি নানাবিধ দৈনন্দিন কেজো শব্দ স্বাভাবিকভাবে কবিতায় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তুচ্ছ বিষয়ে কাব্যকে ইমেজ-নির্ভর, কখনো ব্যাঙ্গাত্মক করে তোলা; পটভূমিতে প্রচণ্ড কিন্তু প্রচ্ছন্ন রাজনীতি, মৌলবাদী

অপশক্তির প্রতিবাদ, অচলায়তন ও প্রথার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধী অভিব্যক্তি—দাউদ হায়দারের এমন অন্তর্শক্তিই বলা চলে। এসবের বিপরীতে আবার কখনো দৃঢ় ব্যক্তিত্বে নন্দনময় রঙ্গীন প্রকৃতির বৈষ্ণবীয় রূপে দাউদ হায়দার যেন অপ্রতুল। ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকবি সামূহিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সমষ্টিকবিতে উত্তরিত :

এখন আমি একলা আছি যেমন ছিলাম এরও আগে কিন্তু আমার যাবার ছিল
পাবার ছিল উষ্ণতাকে দেখার ছিল চাঁদের হাসি বলার ছিল ভালোবাসি।

অথবা,

যুদ্ধ ও বর্ণে
বাঁশি ও অগ্নিতে
যখন
পুড়তে থাকে জনপদ
ধারণ করেছি আমাকে
নিজের মতন, অবিকল
কী-র্তি-না-শা।

কবির শুরু *জন্মই আমার আজন্ম পাপ* (১৯৭৩)। তারপর লেখেন ক্রমশ *সম্পন্ন মানুষ নই* (১৯৭৫), *আমি ভালো আছি, তুমি* (১৯৭৬), *জেলে লেখা পদ্য* (১৯৭৬), *এই শাওনে পরবাসে* (১৯৭৬), *আপনমুগ্ধ দেশে, একা* (১৩৮৬), *আমি পুড়ছি জল ও আগুনে* (১৯৮২), *পাথরের পুঁথি* (১৯৮৩), *যে দেশে সবাই অন্ধ* (১৯৮৪), *প্রিয়তমাসু* (১৯৮৪), *ধূসর গোধূলিধুলিময়* (১৯৮৮), *নদীর উৎস ছিল যেখানে* (১৯৯১), *পাষাণদুয়ার* (১৯৯২), *নাম দিয়েছে কুসুমমঞ্জুরী* (১৯৯৮), *প্রেমের কবিতা সমগ্র* (১৯৯৯), *দাউদ হায়দারের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০০), *পাথরের পুঁথি* (২০১০) প্রভৃতি।

আবিদ আনোয়ার (জ. ১৯৫০) পরাবাস্তব, প্রতীকী, চিত্রকল্পের কবি। আবেগ ও মননের পরিচর্যায় তিনি সমকালীন সমাজ ও শাশ্বত জীবনকে তুলে আনেন। এমন কবিকে সন্দেহাতীত-ভাবে বলা চলে ‘শুদ্ধচারী’। প্রকরণে আবিদ আনোয়ার অভিনব। ভাব-ভাষা-ছন্দ নির্মাণপর্বটিতে একদিকে যেমন যত্নবান তেমনি অভিনিবেশী ও উৎসাহী। ‘সরসর গো-সাপের মতো স্বপ্নের কার্নিশ বেয়ে/ নেমে আসে হরর ফিল্মের কাটা হাত’ এমন পংক্তিতে রূঢ় সময়-সংকেত এবং তার পরাবাস্তব রং দর্পিত হয় চৈতন্যে। পরের কাব্যগুলোতে আবিদ ক্যাজুয়াল, কথকতার মেজাজ আছে; শৈথিল্যও বিরাজমান :

‘আপদে ভরসা প্রাপ্তি’ এমন অভয়বাণী লেখেনি ঠিকুজি

অতল পাতালে তবু ডুবে যেতে যেতে প্রায়শ কী যেন খুঁজি;
পরাস্বপ্নে কেঁদে ওঠে আজও কিছু প্রত্যাশার ক্ষীয়মান রেশ,
ঘুঙুর বাজাবো বলে হাতড়ে ফিরি কোমরের বিভিন্ন প্রদেশ

কিংবা,

সে ফসল নেই আজো শূন্য ঘরদোর
কবেই ডাকাতি করে নিয়ে গেছে সময়ের চোখ
নিজেই জনক হয়ে যখন সে চুমু খায় আপন শিশুকে
ভাববেনা এ উষ্ণতায় সেও ছিল অন্য কারো বুকে।

উদ্ধৃত এসব পংক্তিমালায় পরাবাস্তব প্রেরণায় দুর্মর হয়ে ওঠে প্রেম ও বিরহ-সম্পর্কের সন্দিগ্ধ উপাচারসমূহ। আবিদ আনোয়ার মেধাবী; প্রজ্ঞায় যুক্ত হয় আবেগের লাবণ্য, সচেতন দৃষ্টিচেতনায় ফুঁড়ে ওঠে সময়খণ্ডের অনপেক্ষ অনুভূতি। তাতে পাড়ভাঙা আওয়াজ উপচে পড়ে, অনুভূতিমালার ডাক ওঠে দূর সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে। আবিদের লেখা যুদ্ধ-পরবর্তী দশকে আলাদা ও আধুনিক হয়ে ওঠে, দ্বিধান্বিতসত্ত্বাও দুলে ওঠে পরা-অনুভূতির ভেতরে। সম্পন্ন তাঁর কবিতা, সুপাঠ্য ও উপভোগ্য। রীতিনির্বাচন ও ছন্দের বাঁধনে শব্দ জড়তাহীন। প্রবণতা শুদ্ধ কখনো বিদ্রূপাত্মক। তাঁর প্রথম কাব্য *প্রতিবিম্বের মমি* (১৯৮৫)। পরে বেরোয় *মরাজোছনায় মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯২), *স্বৈরিণীর ঘরসংসার* (১৯৯৭), *খড়বিচালির বৃক্ষজীবন* (২০০১)।

শিহাব সরকার (জ. ১৯৫২)

শিহাব সরকারের শুরু হয়েছিল ১৯৭২-এ "সাবিত্রি বোসের রুমাল" কবিতা দিয়ে। এ উচ্চারিত কবিকণ্ঠ তৈরি করেছিল তাঁর সম্ভাবনার সূত্র। গভীরাশ্রয় পান কবিভূমে। প্রাত্যহিকতা উঠে আসে অনুভবের অক্ষরে। স্বাতন্ত্র্য স্বরে প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত বিশ্বাসসমূহ। সদ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে মা আর মাতৃভূমির সর্বংসহা রূপকে কবিতার পুনর্বিবেচনায় শিল্পিত হয়ে ওঠে। স্বদেশকে নিয়ে হতাশা ও নস্ট্যালজিয়াকাতর কবি। স্বেচ্ছাচার, সম্প্রীতিহীন পরাধীন স্বৈরসময়ের দীর্ঘশ্বাসে নারীই প্রেরণাদাত্রী কিংবা অবলম্বী তাঁর কবিতায় :

স্বপ্নেরা ধুলোর স্তরে চাপা পড়ে থাকে
দমকা বাতাসে হলুদ পাতারা উড়ে গেল
ধূসর বনানী নিঝুম পার্ক- সব জেগে ওঠে।
কাল রাতভর শুনেছি হারানো গানের কলি

অথবা,

এক রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী অচেনা

শ্বাসকষ্টে চোখ মুদেছি, জেগে উঠে
তাজা হাওয়ায় ফুসফুস ভরে গেছে
জানালার ওপারে বদ্ধ ডোবা
দ্যাখো কাকচক্ষু জল, পদ্মফুল ফুটেছে
ভ্রমর দেখলাম কতদিন পর!

আলোর রেখা, নক্ষত্রের উত্তাপ কাব্যকে অতিশয় রোম্যান্টিক করে তোলে। নাগরিক জীবনের কূটকৌশল, বিনষ্ট স্বপ্নের কাতরোক্তি কাব্যবোধে সমীকৃত হয়। কবির স্বাধীনতার পরের স্বদেশ—সেখানে অবক্ষয়, লাঞ্ছনা আর হতাশা পরিবর্তিত কবিভাষাকে নির্মিতি দেয়:

আমার খুব মনে পড়ে, একদিন রিক্সায়
যেতে যেতে আমাকে দেখে কী অদ্ভুত গলায়
দু'হাত তুলে ও চীৎকার করে উঠেছিল,
'জয় বাংলা জয় বাংলা'

সমুদয় অভিজ্ঞতায় কবি-আত্মা শব্দের ভেতরে সৃষ্ট ধ্বনিবিন্যাসে তৈরি করে শিহরণ। তাঁর কাব্য : *লাল যৌবন দিন* (১৯৮২), *তোমার ক্ষত্রিয়* (১৯৮৩), *জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে* (১৯৮৫), *কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৮), *করো গান বনজ্যোৎস্নার* (১৯৯৩), *ব্যাবিলন এক্সপ্রেস* (১৯৯৭), *ভূত তাড়াবার শ্লোক* (১৯৯৯), *মেরিলিন, ঐ যে গুহা* (২০০০), *উড়িছে অন্ধ শঙ্খচিল* (২০০৬)।

ময়ুখ চৌধুরী (জ. ১৯৫০)
ময়ুখ চৌধুরী চিত্রকল্প-উপমায় ও শব্দ-নির্বাচনে আধুনিক কাব্যপ্রয়াসী। তাঁর কবিতা লেখা শুরু সত্তরে। প্রথম প্রকাশিত কাব্য *কালো বরফের প্রতিবেশী* (১৯৮৯)-র কবিতা (১৯৭০-১৯৮৮) কালখণ্ডে রচিত। কাব্যের কবিতাসমূহ তিন পর্বে বিন্যস্ত। 'অভিমানী মেঘের রুমাল', 'প্লাবনের পটভূমি' ও 'অনিদ্র জলাশয়'। মধ্যবিত্তপ্রবণ সংকেত ও বুদ্ধিদীপ্ত অনুভূতির অপূর্ব সমন্বয় ময়ুখ চৌধুরীর কবিতা। বুদ্ধির বিদ্যুৎপ্রভায় ঝলসিত কবির প্রতিমা। প্রথম কাব্য থেকেই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নির্বাচিত। উদ্ধৃতি :

তোমার শাড়ির সঙ্গে উড়ে যাবো হাওয়ায় এখনই।
বাতাসে নুনের গন্ধ, সমুদ্র শরীর একাকার,
রেশমী চুলের মধ্যে উঁকি মারে রাতের ঠিকানা—
সেখানে বিশ্রাম আর মৃত্যু আছে মুগ্ধ প্রতিভার।

এরকম কবিতা পূর্ণপাঠে মেসেজটি পাওয়া যায় কিন্তু চকিত চরণে তুমুল তরঙ্গে প্রবাহিত হয় তার বিদ্রূপ ও উইটের হীরোন্মায় আবেশ। নেতির ভেতরে ইতি,

বিদ্রূপের ভেতরে মনুষ্যত্ব, কৃত্রিমতা বা বিজ্ঞাপন-বিলাসীতার বাইরে বিশুদ্ধ প্রেমের আহ্বান– সত্যিকার অর্থে মানবপ্রবণ কবির ফিরে আসার আকুতি—এই ডাঙায় তার বাস ও বসতি নির্মাণের স্বপ্ন। ময়ুখ চৌধুরী কঠোর ও প্রবলরূপে ব্যক্তিত্ববান, কবিতার শব্দে সেটি নিরূপিত। প্রকরণেও তা প্রকাশ্য :

অ্যালিফ্যান্ট রোড থেকে মতিঝিল যেতে যেতে
বিজ্ঞাপনে চোখ ঢেকে যায়, হঠাৎ সূক্ষ্ম আক্রমণ
টের পাই সঙ্গে সঙ্গে বলবান পিঁপড়েও আছে।

প্রথম কাব্য *কালো বরফের প্রতিবেশী*তেই কবির সদম্ভ উচ্চারণ, যেটি অনেকটা পথ অতিক্রমী এবং অনেক কাব্যেই তা হয়ে ওঠে প্রতিশ্রুত। বস্তুত, এ কবি সাতের দশকেই গড়ে নেন স্বতন্ত্র কবিস্বর। যেটি বাঁক বদলেছে কম। রেখার ভেতরে লয়ের স্পন্দনে উচ্চ-নীচ আঘাতে কবি তরঙ্গায়িত হয়েছেন, বর্ণের আবীলতায় বিভার বরণ পাল্টিয়েছেন কিন্তু অন্য কোনো নবায়নকৃত বলয় চোখে পড়ে না– যেটি হতে পারতো উত্তরণ-পর্বের সাক্ষ্যে অভিষিক্ত। উপর্যুক্ত উদাহরণ ছাড়াও বক্ষ্যমান কাব্যের 'আগুন আগুন' কবিতার শেষ স্তবকটি দেখে নেওয়া যাক :

একমাত্র তুমিই দেখতে পেলে
তোমার শিক্ষিত চোখে
আমার বুকের পাড়ায় কী-জবর আগুন লেগেছে

'শিক্ষিত চোখ' ছাড়া ময়ুখ চৌধুরীর প্রেমিকা প্রেমিক হয় না, সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক উপাদানে পুনর্গঠিত, বুদ্ধির খেলায় তার প্রেম ব্যক্তিত্বময়। 'নষ্ট জ্যোৎস্না'য় কবি বলেন :

আঁধারের চোখ মুখ, আঁধারের বাহু আর বুক
পরিচিত অর্থ নিয়ে জড়ায় আমাকে; আমি দেখি
শর্তহীন আত্মসমর্পণ।
আলো নয়, আলো নয়, জ্যোৎস্নার ছিনাল আলো নয়,
ঘর্ষণে ঘর্ষণে চাই বিদ্যুৎ আক্রোশ।

'আঁধার' এর বিপরীত 'আলো' উল্লিখিত পাত্রীকে বুদ্ধির বিদ্যুৎপ্রভায় স্বকালস্পর্ধী ও আধুনিক মুদ্রণে অবয়বিত করা হলে সে 'ছিনাল' আলো আর 'জবর' আগুনে কী এক অনিবার্য ইমেজের উৎসবের উচ্চতায় অংশ নেয়। সে অংশগ্রহণ ব্যতিক্রম এবং স্বীয়ভাষার স্বচ্ছ কৃতী। এ কাব্যেই শুধু নয়, ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৯ কালপরিসরে লেখা *প্যারিসের নীলরুটি* (২০০১)র অধিকাংশ কবিতাও একই কাব্যভাষার প্রাপ্তিতে ক্রমবর্ধিত :

নাও, তোমার খোঁপা খুলে দাও,

রাত্রি নামুক;
তিনটি বিষম কাঁটা বুকের মধ্যে গেঁথে নিয়ে অন্ধকার মাপতে থাকুক
ঘড়ি।

'খোঁপা', 'রাত্রি' আর 'অন্ধকার' সমার্থদ্যোতক হলেও এতে জুড়ে যায় অসীম কালখণ্ড। কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধির যোগে প্রেম তিনটি বিষম কাঁটার ঘড়িতে অন্ধকারের সঙ্গে যুক্ত হলে তা অশেষ রূপে অসীমান্ত খুঁজে নেয়। পুনর্ব্যক্ত করে বলি, কথনে এমনটা নতুন উপভোগ কিন্তু তা নববলয়ের নয়। কবির অন্য কাব্যগ্রন্থ *অর্ধেক রয়েছি জলে, অর্ধেক জালে* (১৯৯৯), *তোমার জানালায় আমি জেগে আছি চন্দ্রমল্লিকা* (২০০০), *আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে* (২০০২)। পাঁচটি কাব্যে ময়ুখ চৌধুরী একটি ভাষিক প্রান্ত স্পর্শ করেন—যেখানে তিনি স্বতন্ত্র। সময়ক্রমে তাঁর পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কবিতায় উদ্‌যাপিত। সেখানে শুধু সমুদ্রউপকূলের ঝড় শুধু নয়, বুদ্ধির 'প্রণয়প্রণাম' আরও নতুন ইশারা পেয়েছে।

তিন.

উচ্চারণের সততা, উপস্থাপনে ভিন্নতা, চেতনায় দৃঢ়তা—**সমুদ্র গুপ্ত** (১৯৪৬-২০০৮)র কবিতা। আধুনিক প্রকরণে, সহজ উচ্চারণে যাবতীয় বঞ্চনা, আশা ভঙ্গ, নৈরাশ্য উঠে আসে—এক সময় তা ছড়ায় দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরে। আন্তর্জাতিক পরিসরের বাস্তবতাকেও স্পর্শ করে। কবির নন্দনযাত্রা মানবতার ঐক্যসূত্র স্থাপন করে, প্রতিষ্ঠিত করে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার চেতনাদর্শকে। এক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ ঋজু। একাধারে সংযম ও সূচ্যগ্র মেধায় দেশাভ্যন্তরের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেন কবি। সেখানে কবি ইমেজ কাঙ্ক্ষিত। কবির মধ্যে কখনও নিজের বিবেক কখনও স্বস্তি বা সান্ত্বনা মনস্তত্ত্বকাতর হয়ে পড়ে। সমুদ্র গুপ্তর যেন প্রতীকের চেয়ে প্রচ্ছদ গড়তেই বেশি আগ্রহ। বিন্যস্ত প্রকরণে বাস্তবতার চেয়ে চালচিত্রই মুখ্য। কবির কাব্য : *রোদ ঝলসানো মুখ* (১৯৭৭), *স্বপ্নমঙ্গল কাব্য* (১৯৮৭), *এখনো উত্থান আছে* (১৯৯০), *চোখে চোখ রেখে* (১৯৯১), *একাকি রৌদ্রের দিকে* (১৯৯২), *শেকড়ের শোকে* (১৯৯৩), *ঘাসপাতার ছুরি* (১৯৯৮), *নদীও বাড়িতে ফেরে* (২০০০), *ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই পথ* (২০০৩), *হাতে তুলে নিলে এই বাংলার মাটি রক্তে ভিজে যায়* (২০০৬), *মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে* (২০০৮), *তাহলে উঠে দাঁড়াবো না কেন* (২০০৮), *ডিসেম্বরের রচনা* (২০০৮)। তাঁর কাব্যসঞ্চয় *সাতসমুদ্র* (১৯৯৯)। **হাবীবুল্লাহ সিরাজী** (জ. ১৯৪৮) জীবনের পুরোভাগে কবিতা, তার ভেতরেই প্রকৃত জীবন;

আশাবাদ ব্যক্ত হয়। ভীষণ স্বপ্নপ্রিয় কবি। সমাজ-রাজনীতির উদ্দেশ্যবাদ আনেন না কবিতায়। ইমেজাশ্রিত প্রকরণে কবি রচনা করেন *দাও বৃক্ষ দাও দিন* (১৯৭৫), *মোমশিল্পের ক্ষয়ক্ষতি* (১৯৭৭), *মধ্যরাতে দুলে ওঠে গ্লাস* (১৯৮১), *হাওয়া কলে জোড়া গাড়ি* (১৯৮২), *নোনা জলে বুনো সংসার* (১৯৮৩), *স্বপ্নহীনতার পক্ষে* (১৯৮৪), *আমার একজনই বন্ধু* (১৯৮৭), *পোশাকের বদলে পালা* (১৯৮৮), *কৃষ্ণ কৃপাণ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯০), *সিংহদরজা* (১৯৯০), *বেদনার চল্লিশ আঙুল* (১৯৯১), *ম্লানম্রিয়মান নয়* (১৯৯২) প্রভৃতি। **অরুণাভ সরকার** (জ. ১৯৪১) *নগরে বাউল* (১৯৭৬), *কেউ কিছু জানে না* (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থে খুব শক্তিশালী। জীবনবাদী চেতনাদর্শ নিরঙ্কুশ আরোপিত হয় শব্দধ্বনিতে। প্রেমকে অনাবৃত করেন—সমস্ত বাসনার অনুবর্তী করে; ফলে শব্দ কুলপ্লাবী অর্থে ছেয়ে যায় অন্তর্প্রদেশে। গদ্যছন্দ *নগরে বাউল* কাব্যে অন্তরস্পর্শী হয় সচল ধ্বনিমাধুর্যে, ব্যতিক্রমী প্রলেপে। কামুক দৃষ্টি ও শরীরী প্রেম নন্দন আবহ পায়—ছন্দবৃত্তে তা যখন ধ্বনিসূত্র অর্জন করে; ঐশ্বর্যময়তায় 'অলৌকিক আনন্দ'ও ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বস্তুত এ কবি পূর্ণময় রোম্যান্টিক। দীর্ঘ বিরতির পর তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থ *নারীরা ফেরে না* (২০০৬)।

চার.

মোহন রায়হান (জ. ১৯৫৬)-এর কবিতায় বাংলা কবিতার দুর্লক্ষণ বা নমনীয়তাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আপামর জনতার হয়ে যেন জীবনের গ্লানি, অবক্ষয়, বিনষ্টি, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তোলেন দুর্বার বিপ্লবী সব সৌকর্যময় শব্দমালা। তবে সবকিছুই তাঁর কবিতায় অভিজ্ঞতার বার্তাবাহি নয়। কিন্তু কবিতায় তাঁর শত্রু-মিত্র স্পষ্ট। এমনটা অনিবার্য, রাজনৈতিক চেতনারই অনির্বাণ প্রতিমূর্তি মোহন রায়হানের কবিতা। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানোয় তাঁর আপস নেই। ছড়িয়ে দিতে চান এ মন্ত্র। প্রজন্মান্তরে। বিরামহীন তাঁর এ পথ। কবিতাকে সংগ্রামের ও প্রতিরোধের হাতিয়ার করে তোলেন তিনি। তবে মোহন রায়হান একাধারে প্রেমের কবিও বটে। তাঁর প্রকরণ নির্মিত হয় সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে কিংবা মৌলবাদের মুণ্ডুপাতে। সেখানে তিনি ক্রোধ-ক্ষেদ-গ্লানিতে জ্বলতে থাকেন, প্রতিশ্রুত ধ্বনিতে ঝলসে ওঠেন। এমন প্রবর্তনায় তাঁর কবিতারও নামাঙ্কন। রচিত কবিতাগ্রন্থ *জ্বলে উঠি সাহসী মানুষ* (১৯৭৯), *আমাদের ঐক্য আমাদের জয়* (১৯৮০), *সামরিক আদালতে অভিভাষণ* (১৯৮৪), *আর হলো না বাড়ি ফেরা* (১৯৮৫), *ফিরে দাও সেই স্টেনগান* (১৯৮৬), *শকুন সময়* (১৯৮৭), *গোলাপজানের পকেট পঞ্জিকা* (১৯৮৭), *মোহন রায়হানের সংগ্রামী কবিতা* (১৯৮৯), *মোহন রায়হানের প্রেমের কবিতা* (১৯৮৯), *ঘাতক না প্রেমিক* (১৯৯৫),

সবুজ চাঁদরে ঢাকা রক্তাক্ত ছুরি (১৯৯৮) প্রভৃতি। মধ্যবিত্ত প্রেম, নারী **সানাউল হক খান** (জ. ১৯৪৭)-এর কবিতার অন্বিষ্ট। তাঁর আধুনিকতার মাত্রা বৈচিত্র্যময়, প্রখর জীবনস্পর্শী। আত্মকাতর, প্রেমদীর্ণ, স্বপ্নচ্যুত বসতির প্রচ্ছন্ন কবি বলা যায় তাঁকে। তাঁর প্রকৃতির রূপ প্রতীকে পর্যবসিত। সে প্রতীকে বিধৃত ব্যক্তি বিপন্নতা, অসার আনন্দ, তৃষাতুর আবেগ আঙ্গিকে মূর্ত হয়। এতে গোলাপতুল্য প্রেমিকাও যেন কলুষিত রক্তের প্রতীতি পায়। অভিজ্ঞ এ কবির প্রেম 'তবু' লাবণ্যে মায়ামন্ত্রে উজ্জীবিত। তাঁর কাব্য *অন্ধ করতালি* (১৯৮০), *জন্মগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ* (১৯৮৪), *দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিণাম* (১৯৮৫), *লুব্ধ প্রার্থনা* (১৯৮৬), *দুঃখী বাংলার বেথেলহেমে* (১৯৮৯), *তোমার নিয়ম আমার নিয়তি* (১৯৯৭) প্রভৃতি। **কামাল চৌধুরী** (জ. ১৯৫৭)র *মিছিলের সমান বয়সী* (১৯৮১) কাব্য দিয়ে যাত্রা শুরু। অভিজ্ঞতাপুঞ্জ আবেগে তাঁর কবিতায় রাজনীতি চেতনা, সমকাল মনস্কতা ও প্রেম বিষয় হয়েছে। কবিতায় কূটকৌশলী। প্রত্ন-ইতিহাস জিজ্ঞাসা নিরূপিত কবিতায়। ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রতীক আবেগের স্ফুরণে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে। ক্রমশ কবিতার ভেতরে তিনি চর্চিত, রূপান্তরিত। কাব্যভূমেও এক ধরনের উত্তরণ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। *টানাপোড়নের দিন* (১৯৯০), *এই পথ এই কোলাহল* (১৯৯৩), *এসেছি নিজের ভোরে* (১৯৯৫), *এই মেঘ বিদ্যুতে ভরা* (১৯৯৭), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৮), *ধূলি ও সাগর দৃশ্য* (২০০০), *রোদ বৃষ্টি অন্ত্যমিল* (২০০৩), *হে মাটি পৃথিবীপুত্র* (২০০৬) এমনসব কবিতার ভেতর দিয়ে কামাল চৌধুরী এক ধরনের সমাজসত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। কিন্তু বিষয় ও প্রকরণের সন্ধিতে সম্ভাব্য জীবনীশক্তি অর্জনে তিনি পরিপক্ব নন। বেশ কটি কাব্যের পরিবেশনা থাকলেও লোকোত্তরের প্রয়োজনটি শ্লথপর্যায়েই নির্মিত বলা যায়। **সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের** (জ. ১৯৫৮) চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে *কবিতাসমগ্র* বের হয় ২০০৬ সালে। চিরায়ত সংস্কৃতি, প্রবহমান সমাজ-বার্তা রোম্যান্টিক রক্তাম্বর ধারণ করে তাঁর কবিতায় :

> জনতার গর্ভে জনতার ফলন-ফসল উৎপাদন
> বাড়ছে, বেড়েই চলেছে বিজ্ঞাপন, মানুষ
> ধারাপাত থেকে সমস্ত শতকিয়া স্থির
> স্থবির মানচিত্র

সেক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত উত্তাপে স্বরবৃত্তের দ্রুততা থাকে, কবিতা কখনো হয়ে পড়ে ত্রিপদী; কখনো তা বহমান থাকে শানিত গদ্যভঙ্গিতে। দেশভাগ ট্র্যাজেডি, বিষাদময় পূর্বস্মৃতি, আত্মশ্লাঘার অনুবর্তন ইত্যাকার ঘনীভূত অবলীল প্রসঙ্গ কবিবান্ধবে পরিণত। পরোক্ষ রাজনৈতিক চেতনাধারায় উচ্চকিত সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের কবিতা :

> এলিফ্যান্ট রোড থেকে শীত চলে যাচ্ছে

তবু তুমি ইস্টার্ন প্লাজা থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে
কিছু রোদ, কিছু বৃষ্টি।

এ কবির *তৃষ্ণার্ত জলপরী* (১৯৮২), *তবু কেউ কারো নই* (১৯৮৫), *অপেক্ষায় আছি প্রতীক্ষায় থেকো* (১৯৮৭), *ঘাতকের হাতে সংবিধান* (১৯৯০), *শহরের শেষ বাড়ি* (১৯৯১), *একি কাণ্ড পাতা নেই* (১৯৯৫), *দ্রবীভূত গদ্যপদ্য* (১৯৯৯), *ঐক্যের বিপক্ষে একা* (২০০০), *এলোমেলো মেঘের মন* (২০০১), *নির্জনে কেন এতো কোলাহল* (২০০৩), *পরের জায়গা পরের জমিন* (২০০৪), *নিদ্রার ভেতর জেগে থাকা* (২০০৪), *ঘৃণিত গৌরব* (২০০৫), *নীড়ে নিরুদ্দেশ* (২০০৭)। **হাসান হাফিজের** (জ. ১৯৫৫) কবিতার মূল সুর ফেরারী বসন্ত বাতাসে সন্দিহান, শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত বাস্তবতা—'আস্তে আস্তে হয়ে উঠছি বিপজ্জনক/ অশান্ত ও উন্মাতাল অর্জুন'। ক্রমশ গ্রাস করা নষ্ট-ভ্রষ্ট সময় যেভাবে তৈরি করে 'অনিশ্চিত বিপন্ন বসতি'; সেখানে কবিপ্রতীক্ষা স্বপ্নে ফোঁটা দিনের। সংহত ও সরল উচ্চারণ। ছন্দবুননি বৈচিত্র্যময়। পুরাণপ্রসঙ্গ ব্যঙ্গকাতর। *এখন যৌবন যার* (১৯৮২), *ভালোবাস, তার ভাষা* (১৯৮৬), *অবাধ্য অর্জুন* (১৯৮৬), *তুমি বধূ অবিবাহের* (১৯৮৭), *হয়তো কিছু হবে* (১৯৮৭), *হাসান হাফিজের প্রেমের কবিতা* (১৯৯৪), *দূরে পাহাড়ের ঘুম* (১৯৯৫), *সকল ডুবুরি নয় সমান সন্ধিৎসু* (১৯৯৫), *তৃষ্ণার তানপুরা* (১৯৯৬), *ভালোবাসার অগ্নিচুমুক* (১৯৯৭), *হৃদয় বড়ো কাঁদছে* (১৯৯৭), *না ওড়ে না পোড়ে প্রেম* (১৯৯৭), *যে মধুমদ তোমার ফুলে* (১৯৯৮) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। **হায়াৎ সাইফ** (জ. ১৯৪২) প্রেমের কবি। নারীর শরীর শৃঙ্গার রসের ইঙ্গিতে সিক্ত। নান্দনিক পরিক্রমায় নারীর অনুভবে প্রেমচিত্ত গভীর মর্মে স্থিত হলেও অবক্ষয় তিরোহিত নয়। তাঁর প্রেমের কবিতা বের হয় ১৯৯৬ সালে। কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে *সন্ত্রাসে সহবাস* (১৯৮৩), *সব ফেলে দিয়ে* (১৯৮৪), *প্রধানত মাটি ও মানুষ* (১৯৮৯), *এপিঠ ওপিঠ* (১৯৮৯), *হায়াৎ সাইফের কবিতা* (১৯৯৩)। সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে প্রেমে নিরঙ্কুশ হওয়ায় হায়াৎ সাইফ বেশ পরিমার্জিত ও আনন্দদায়ী। তবে নগর জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গগুলোও তাঁর কবিতায় তিরোহিত নয়। সত্তরের অনেকের মধ্যে অগ্রজ **সৈয়দ হায়দার** (১৯৫০-২০১০)। তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি ও কামনার ভেতরে আনন্দ-বিষণ্ণতার প্রবাহ রচিত। সৈয়দ হায়দার অলৌকিক আনন্দকে প্রকরণবন্দি করেন নিছক প্রেমপ্রতিমার আচ্ছন্নতায়। সংহত ভাবনায় কবি জীবনবাদকে প্রতিষ্ঠা দেন—সেখানে বাপ্পাল করেন যাবতীয় প্রথা-বিশ্বাস ও সংস্কারকে। রেখাঙ্কিত প্রকৃতি যাবতীয় দায়ে যেন হয় অভিষিক্ত। নিজের উপলব্ধিতে টোটেম করে তোলেন বৃক্ষচিন্তাকে। চিত্রল বিষয় পরিধিতে সৈয়দ হায়দার প্রকৃতিকে বিপুলায়তন করে তোলেন। কবিআত্মা তৈরি করে, ইঙ্গিতময় রূপক ও উপমা, যেখানে জগতের

যাবতীয় বিষয় পরিশুদ্ধতায় জারিত হয়। এক্ষেত্রে জটিল জীবনগ্রন্থিকে সরলীকরণ করে প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর কাব্য : *কোনো সুখবর নেই* (১৯৮৩), *ভুলগুলো নাড়া দেয়* (১৯৮৫), *ধ্বংসের কাছে আছি* (১৯৮৬), *ভাঙলে মাটির মতো* (১৯৮৬), *পাতা থেকে পাখি* (১৯৯১), *কাছে থেকে প্রবাসিনী* (১৯৯২), *প্রতিপদে সীমান্ত* (১৯৯৪), *উত্তরবঙ্গ* (১৯৯৫), *বয়স যখন দিচ্ছে তাড়া* (১৯৯৫), *অরিস্ট দু'জন দু'জনকে* (১৯৯৬) প্রভৃতি। **নাসিমা সুলতানা** (১৯৫৭-১৯৯৭) চল্লিশ বছরেই মৃত্যু—তারপর প্রকাশিত *রচনাসমগ্র* (২০০০); পাওয়া যায় বৈশিষ্ট্যসূচক, নান্দনিক কিছু কবিতা। শুরু *মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া* (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। পরে কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সহযোগে লিখেছিলেন *করতলে রাজদণ্ড চাই* (১৯৮৫); আর *নীল মাছিটি এখন আমার রক্তে* বেরুনোর আগেই মৃত্যু। কবিতার জগতে নাসিমা সুলতানার এই অবদান। প্রেম-প্রতিবাদ-দ্রোহ অন্য কবিদের মতো তাঁর কবিতায়ও আছে কিন্তু প্রকরণের পার্থক্যে বিশেষ দিকটি হল, স্বসৃষ্ট শব্দকে একাত্ম করে নান্দনিক স্বরে তার বন্দনা করা। নাসিমা সুলতানা প্রকৃতি ও প্রেমকে আপন মেধার সূচ্যগ্রে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন :

> হিংস্র নখরে তারা ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দেবে ব্যর্থতা বিষয়ক শব্দাবলী
> আর এইভাবে তাদের বুকের কাছে ধীরে ধীরে জেগে উঠবে সোনামুখী ধান
> পৌষ-নবান্ন, ইলিশ মাছের ঘ্রাণ, কামরাঙা সুখ
> জেগে উঠবে শীতল পাটিতে বসে জুঁই ফুলের মতো সুগন্ধ অন্নের রুটি।

মর্মপ্রোথিত আলোড়নে প্রণয়প্রবন সত্তাই দীপিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। পূর্ণ রোম্যান্টিক প্রত্ন-দাপটের কবি। দেশজ উপমার ভেতরে বুনে দেন চেতনার অলৌকিক উৎসারণ। নাসিমার কবিতা প্রবলরকম জীবনবাদী উপভোগ ও জঙ্গমী যৌনতার অভিজ্ঞানে মুখরিত। রক্তমাংসের আক্রমণে উল্লসিত। সেখানে তিনি পূর্ণায়ত উচ্ছ্বসিত। অকালে মৃত্যুই তাঁর কবিতাকে দিল 'ক্লান্তি'। **নাসির আহমেদ** (জ. ১৯৫২) বাকসংহতি, পরিমিতিবোধ ও ছন্দজ্ঞানে সমৃদ্ধ—তার কবিতা। অস্তিবাদী, বলিষ্ঠ হার্দিক প্রণোদনায় কবি মূলত প্রকৃতি ও নারীকেই তাঁর কবিতায় প্রতীকী করে তোলেন। কবির ভেতরে আছে তীব্র অন্তর্দাহ ও বেদনাবোধ। প্রকৃতঅর্থে, আধুনিক কবিরা অভিজ্ঞতার আবেগে লালন করেন বাস্তব সত্যকে—সেখানে ক্লেদাক্ততার রূপ, বেদনা, হতাশা, অবক্ষয় চেতনা সবই মর্মপ্রোথিত। আর এমন চেতনাই কবির কবিতায় প্রতিফলিত। *বৃক্ষমঙ্গল* (১৯৯১)

কাব্যে বিক্ষত নগরমানুষের সংবাদ আছে। গীতল চেতনায় তাঁর মধ্যে নারীপ্রেম ও স্বদেশভাবনা সমন্বিত শুদ্ধতার স্বর তোলে :

জানতাম সুন্দর সেতো স্নিগ্ধতার নাম
ফুলের উপমা কিংবা শান্ত শরতের
উদার নীলিমা–মগ্ন নির্মেঘ আকাশ।

নাসির আহমেদ বর্ণিল ক্যানভাসে আধুনিক সময়ের নাগরিক মর্মদাহনকে প্রকাশ করেন। এমন অনুষঙ্গি রূপকল্প, অলঙ্কারপ্রতিমা তার আয়ত্তে। কবির আবেগের রেখাঙ্কনে নির্মিত কাহিনি অনেকটা জীবনের সমগ্রতায় প্রকাশিত, সেখানে সত্তার অবসাদ, ক্ষয়, স্বকাল সারাৎসারে পরিবেশিত :

মনে কি পড়ে না একবারও
দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথের ওপার থেকে তুমি ডাক দিলে
কী সহজে হাসিমুখে পৌঁছে গেছি মৃত্যুর সান্নিধ্য একদিন।

তবে তাঁর কবিতায় আবেগের তারল্যদোষ অবসিত নয়। অনেকক্ষেত্রে উত্তরণের মাত্রা অবারিত নয়, আবদ্ধ। নাগরিক জটিল সময়ের ভেতরে কাব্যশুদ্ধির পথটিও দুর্বল মনে হয়। তাঁর কবিতাগ্রন্থ *আকুলতা শুভ্রতার জন্যে* (১৯৮৫), *পাথরগুলো দুঃখগুলো* (১৯৮৬), *তোমাকেই আশালতা* (১৯৮৭), *আমার স্বপ্ন তুমি রাত্রি* (১৯৯৭), *ভালোবাসার এই পথে* (১৯৯৭), *তোমার জন্যে অনিন্দিতা* (১৯৯৮), *বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে যেতে যেতে* (১৯৯৯) প্রভৃতি। ‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়’; “নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়” কবিতার এমন আইকনতুল্য পংক্তি দিয়ে **হেলাল হাফিজ** (জ. ১৯৪৮)র প্রতিষ্ঠা। তাঁর কালজয়ী কাব্য *যে জলে আগুন জ্বলে* (১৯৮৬)। প্রচণ্ড এক উল্লাসে যেন হেলাল হাফিজ আমাদের পায়ের তলায় মাটি ও গন্তব্যের দিশা দেন। বাংলাদেশের কবিতার সঠিক চারিত্র্যটি ধরিয়ে দেন। প্রখর উত্তেজনায়, প্রতিবাদের প্রগল্‌ভতায়; রক্তাম্বর ধারণ করে তাঁর কবিতা। আর হেলাল হাফিজ পরিণত হন সাহসী যৌবশক্তির প্রতিনিধিতে। তবে অস্তিত্বের গভীর উন্মোচন তাঁর কবিতায় তিরোহিত। যৌবন সংরক্ত উগ্রতা, আবরণহীন উন্মাদনা আর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া তাঁকে দীপ্র কণ্ঠ দেয় কিন্তু রহস্যময় গোপন একান্ত ইঙ্গিত তাতে কিছু নেই। সেজন্য উত্তরণও বৃত্তে পর্যবসিত। আদ্যোপান্ত আধুনিক, ‘কালের ক্যানভাসে কালান্তরের ভাষ্যে’র সাহসী প্রবক্তা **আবু হাসান শাহরিয়ার** (জ. ১৯৫৯)। ভিন্নস্বরে, মেধায় ক্যাজুয়াল ও জীবনবাদী। প্রেমকে নিরঙ্কুশ করে তোলেন; দেশ-মানুষ-সময়কে একাত্ম করে। স্বকীয় হয়ে ওঠেন বুদ্ধির সূচ্যগ্রে। তিনি আপামর সবকিছু চরণবন্দি করেন। গরল ও কূটৈষা, চন্দ্রপ্রলাপ, নষ্টস্বপ্নের বিষাদগাথা, নস্ট্যালজিয়া, অব্যবস্থিত অন্তর্যন্ত্রণা এমন বিষয় ও বিষয়ান্তর তাঁর আরাধ্য। তখন তার কবিপ্রকরণ আলাদা হয়ে যায়; প্রচ্ছন্ন গদ্যে পয়ারের

ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, আবার অন্যরীতিতে—লুপ্ত পয়ার পেয়ে যায় গদ্যের কথ্যরূপ। *অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ* (১৯৮৬), *অব্যর্থ আঙুল* (১৯৯০), *তোমার কাছে যাই না তবে যাবো* (১৯৯৬), *একলব্যের পুনরুত্থান*, *নিরন্তরের ষষ্ঠপদী*, *এ বছর পাখিবন্যা হবে*, *ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ* (২০০১), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০৩), *হাটে গেছে জড়বস্তুবাদ* (২০০৩), *বালিকাআশ্রম* (২০০৫) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। এ সময়ে তিনিই সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্য ও সম্মুখবর্তী। **তসলিমা নাসরিন** (জ. ১৯৬২) নারীবাদী কবি। কিন্তু গোড়ার দিকের কবিতায় কোনো ইজম বা তত্ত্ব ছিল না। নিছক কবিতা, উন্নত মাত্রার, ভালো মানের কবিতা। তসলিমা নাসরিনের কবিতার শব্দ ও উপমা এক প্রবলতর কামুক, সুন্দর অনুপ্রেরণা তৈরি করে। কিন্তু ক্রমশ এগিয়েছেন তিনি তাঁর আদর্শ বা বৃত্তের দিকে। যেটা তাঁর কবিতার জন্য ক্ষতিই মনে হয়। কলাম বা কথাসাহিত্য লিখে 'বিতর্কিত' হলেও, প্রধানত কবি—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্য : *শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা* (১৯৮৬), *নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে* (১৯৮৯), *আমার কিছু যায় আসে না* (১৯৯০), *অতলে অন্তরীণ* (১৯৯১), *বালিকার গোল্লাছুট* (১৯৯২), *নির্বাচিত নারী* (১৯৯২), *বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা* (১৯৯৩), *নির্বাচিত কবিতা*। **মাহবুব বারী** (জ. ১৯৫২) *হ্যাঙ্গার* (১৯৮৬) কাব্যে ধরা পড়ে ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা, ক্লান্তিকর তৃতীয় পৃথিবী। কিছু উজ্জ্বল কবিতা থাকলেও ভাবনাবিহারে পুনরাবৃত্তি আছে তার। কোনো ক্ষেত্রে তা দীর্ঘায়তও। আমার 'হ্যাঙ্গার থেকে উঠে এসে/ আমার পোষাকগুলো। ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু ঘুরে/ বেড়াচ্ছে'—এমন চরণবিন্যাস অন্তঃসারশূন্য, বীতশ্রদ্ধ সময়কেই তুলে ধরে। প্রতীকপ্রতিমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটির ভেতর দিয়ে মাহবুব বারী স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠেন। অন্য কাব্য : *ঈশ্বরের ছবির ওপর* (১৯৯১), *অধরা* (১৯৯৭)। **রবীন্দ্র গোপ** (জ. ১৯৫১) অঙ্গীকারে ঋদ্ধ; কারণে বলা যায়, স্বকালের যাবতীয় অনাসৃষ্টি ও বিনষ্টি থেকে জীবনকে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা। রবীন্দ্র গোপের মানবপ্রত্যয় দৃঢ়—নন্দনভূমে প্রতিকূল সময়েরই ক্ষুব্ধ বার্তা রচিত। আধুনিকতার বার্তাবাহি এ কবিতে প্রেম-অবসাদ ও অনাস্থার যাত্রায় মানবমুক্তির স্পন্দন থাকে জাগরূক। কখনো সনেটে, কখনো দ্রুত বা বিলম্বিত লয়ে অদম্যতার প্রকাশ। তবে সেখানে থাকে স্বদেশ ঐতিহ্য ও তার পরিশুদ্ধ বিজয় গান সমীকৃত উত্থাপন। সাধারণ নগর মধ্যবিত্তের স্বর ও শুদ্ধতাই রবীন্দ্র গোপের কবিতার উপজীব্য। *পতাকায় রক্তের দাগ* (১৯৮৭), *পালালো কুমারী সাপ* (১৯৮৯), *অরক্ষিত সভ্যতা* (১৯৮১), *দাঁড়াও আসছি* (১৯৮৩), *মানুষ এবং মানুষ* (১৯৮৪), *জলের বাড়ি মাঝ উঠানে* (১৯৯০), *কালরাত্রি* (১৯৯৭) তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

পাঁচ.

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩)
বয়সের দিক থেকে একটু আগের হলেও কবিতায় প্রকাশিত হন আশির কবি। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার মৌল চেতনাকে ষাটের দশক এবং পরবর্তীতে আশির দশকে সুচিহ্নিত অনুবর্তী ভেবে নবরূপরীতিতে আরও উজ্জ্বল করেছেন যে কবিরা তাদের অন্যতম খোন্দকার আশরাফ হোসেন। সমকালীনতার সঙ্গে মিশে হয়ে ওঠেন বৈশ্বিক। অপরূপ ধ্বনিময়তায়, অনুসন্ধানী ও আত্মসচেতন বোধে তুলে আনেন চিরায়ত সব শব্দপ্রতিমা—যার নির্মিতিতে দেশাত্মবোধ, সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তি-সংবাদ, গীতিকা-গাথার লোকায়ত অনুষঙ্গ, প্রেম-বৈরাগ্য-সমাজ-সংগ্রাম সামূহিক সংবেদন সূত্রগুলি সুপিনদ্ধ ও শীলিত হয়ে ওঠে :

আমাকে পাবে না দুঃখে, একটি হতাশ শুধু দেহে
ছুরির ফলায় জমা এক ফোঁটা প্রাকৃতিক স্বেদের মতোন
তীক্ষ্ম করো, মূর্ত করো পাবে।

কবিতার স্নিগ্ধতা, প্রতীকময়তা স্বকীয়মাত্রায় উৎকীর্ণ। তাঁর *তিন রমনীর ক্বাসিদা* (১৯৮৪) রূপময় কাব্য :

শৈশবের হাটের কোণে দাঁড় করিয়ে যেতেন বাবা
আনাজের দরদাম, আমিষের, অম্লতার খোঁজে। মনে হতো
কতোকাল এখানে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা আসছেন না, আসছেন না
মনে হতো কি অচেনা প্রতিটি লোকের মুখ, কি অজানা স্নেহহীন
প্রতিটি মানুষ

নস্টালজিক এবং অবচেতন স্মৃতির অমলিন চিরায়ত আখ্যান। নৈমিত্তিক জীবনের আচ্ছন্নতার ভেতরে বাবার প্রেম, ক্ষণিক বিচ্ছিন্নতার ভয়, আর লোকালয়ের ত্রাস প্রতীকী হয়ে ওঠে। নাগরিক কোলাহলে সে মোহ আর ভয় এখন দূর পরাস্ত। পরের কবিতায় আরও পরিপক্ক। স্মৃতির বাইরে ব্যক্তির প্রকোপ, আচ্ছন্নতা, লোভাতুর মন গূঢ়তায় আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় কাব্য *পার্থ তোমার তীব্র তীর* (১৯৮৬)-এ আমিত্ব ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম অবারিতরূপে স্ফটিকায়িত : 'মানুষকে কেউ ধারণ করতে পারে না/ না নিসর্গ না ঈশ্বর না প্রেম না ঘৃণা'—এমন ধারণা-অভিজ্ঞতা বহুবিস্তারী মাত্রা পায় খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায়। *জীবনের সমান চুমুক* (১৯৮৯), *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর* (১৯৯২), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৫), *যমুনাপর্ব* (১৯৯৮), *জন্মবাউল* (২০০১), *কবিতা সংগ্রহ* (২০০৫), *তোমার নামে বৃষ্টি নামে* (২০০৮), *আয় (না) দেখে অন্ধ মানুষ* (২০১০), *কুয়াশার মুশায়েরা* (২০১৩) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে আশরাফ হোসেন ক্রমশ পাশ ফিরেছেন। পরাবাস্তব ধারণা বিচিত্রভাবে তাঁর ভাবসত্তাকে দখল করেছে :

আমি দৌড়ে পালাতে যাব, এমন সময় হঠাৎ

ভোজবাজির মতো দৃশ্যপট পাল্টে গেল,
যেন স্ট্রীন্ডবার্গের নাটক।

বুদ্ধিতে পরাচেতনার সংশ্লেষ স্পষ্ট। 'স্ট্রীন্ডবার্গের নাটক' উৎপ্রেক্ষায় জমাট বাঁধলে, স্তবকগুচ্ছ ভিন্ন অর্থদ্যোতক হয়ে ওঠে। একইভাবে তাঁর কবিতায় স্বদেশ-স্বাজাত্য বোধ পেরিয়ে জীবন-মৃত্যুর অধ্যাত্ম প্রেক্ষাপট কিংবা সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত করায়ত্ত হয়ে ওঠে কবিতায়। এজন্য ইমেজ-পরিকল্পনার রূপান্তরও ঘটেছে। তবে কোনো উদ্দিষ্ট বিষয়ক বার্তা নয়; কাব্যনন্দনের প্রকৃত পটচিত্রে তিনি উত্তরিত। সেজন্য প্রবহমান কবিতাচর্চায় অদ্যাবধি তিনি শুদ্ধশিল্পীর চিন্তায় স্থিত।

ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪)

স্বল্পায়ু; মাত্র ছয়টি কাব্যগ্রন্থ—চিরকাল ছিন্নমূল, শেকড়হীন কর্মক্লান্ত মানুষের পক্ষে লিখেছেন। ঘৃণার মন্ত্র উচ্চারণ শোষিত সমাজকে ঘিরে। একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ জাগরুক। কবিতায় আরও আছে মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, ফ্যাকাশে প্রেম, পোশাকী প্রেমহীন মানুষ ইত্যাদি সব বিষয় :

একটি ডিমের ওপর তা দিচ্ছে সন্ত্রাস
অভ্যন্তরেও ডানার কম্পন
পৃথিবীর কাছে, জীবনের কাছে
যেন পশুত্বের বিরামহীন অভিসম্পাত।

পরিশুদ্ধ বাস্তবতাকে ফর্মাল প্রকরণের 'অপরিচিতত্বে' স্পষ্টতার আভাসে আনেন; ভঙ্গিতে পুরাণ আছে, আছে অ-রোম্যান্টিক শব্দসমূহ যা দ্রোহ সৃষ্টি করে। কবিবাণীরূপে মনুষ্যসমাজের বা স্বভাবের অনাসৃষ্ট সবকিছু দুর্বার স্বর তোলে, স্পন্দিত সামষ্টিক শুভসমূহ প্রচার করে। ত্রিদিব অমান্য করতে চান; ঘৃণিত অনাসৃষ্টির সবকিছুকে :

থুথু ক্ষুধা, থুথু ক্ষুধা
থুথু বাতাসা, থুথু বাতাসা
মাটিতে হরির লুট বাতাসার থুথু
হওয়াতে থুথুর লুট, থুথু বাতাসা, থুথু বাতাসা

এভাবেই তাঁর ছন্দ তৈরি হয়; অলঙ্কারেও আসে যাবতীয় ঐতিহ্যিক-প্রীতিদায়ক-মধুময় প্রতীতিসমূহ। ত্রিদিবের কবিতায় সমকালীন প্রসঙ্গও আসে, দেশচিন্তাও প্রতিপাদ্য হয় : 'খোঁজে দেহ-মানচিত্র শেখ মুজিব বলে', 'যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কবিতাকে আমি/ শত্রুর বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করেছিলাম'। তাঁর কাব্য : *গৃহপালিত পদ্যেরা* (১৯৯৬), *অঙ্গে আমার বহুবর্ণের দাগ* (১৯৯৮), *ভালো বাসতে বাসতে*

ফতুর করে দেব (১৯৯৯), *আদি অন্তে তোমাকে চাই* (২০০০) *ভালোবাসার শাদা ছড়ি* (২০০১), *পোড়াবো তাজমহল* (২০০৩)।

মুজিবুল হক কবীর (জ. ১৯৫২)
আন্তর আকুতিতে কবিতারচর্চা। সত্তরের চেতনায় অগ্রসরমান। পরিশ্রমী এবং নির্বাচিত ভাবনার অনুসারী :

> পিঙ্গল পাথর, শৈলজ-হৃদয়, গিরিশৃঙ্গ
> তুষার-আবৃত বন্যবৃক্ষ, ভয়ঙ্কর শ্বাপদেরা ঞিরে আছে।
> যেখানে পড়েনি গুহা-মানবের পদচ্ছাপ
> সেখানেই পদ-অভিযান, অনন্ত পথের শুরু
> ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবের যাত্রা অরণ্য-শাসন ভেঙে

কিংবা,

> বিদর্ভ রাজার মেয়ে লোপামুদ্রা যেন
> প্রেম জাগানিয়া পাখি, মসৃণ মেঝেয়
> নাচে সে ধ্রুপদী নাচ, চিতল কোমর বাঁকে নেশার ঝিলিক

এভাবে আদিজৈববুদ্ধির ভেতরে অবচেনার পুনর্গঠন চলে। ঐতিহ্যেরও প্রত্নপ্রাপ্তি ঘটে। মনঃসমীক্ষায় ধরা পড়ে অবচেতন সত্তার জন্ম ও বিকশিত অনুশাসন। সামূহিক অবচেতন সত্তায়, সর্বজ্ঞ আনুকূল্যে রচিত পংক্তিগুচ্ছ। নৈসর্গিক উপাদান, লোকজীবনানুষঙ্গ, জলমাটিহাওয়ার মানুষ কাণ্ডজ্ঞানচেতনায় দীপিত হয় কাব্যে। সেখানে তাঁর নির্মাণের প্রয়াসটি কখনো পাঠচিন্তা-আহৃত কখনো চেতনসত্তাজাত, তবে পূর্ণমাত্রায় তা হয়ে উঠেছে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র। পেয়েছে আলাদা অভিমুখ। তবে স্বপ্নভঙ্গের বাংলাদেশে কবি মুজিবুল হক হয়তো ইচ্ছাকৃত এমন প্রকরণ বেছে নেন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতাটি নির্জ্ঞান-সত্তায়ও নিশ্চয়ই অনুপস্থিত নয়। সেখানে অবক্ষয়ক্লিষ্ট আধারে মুদ্রিত : 'রিলকের গোলাপে দেখি সভ্যতার কীট/ আবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে'। কিন্তু তাঁর আশাবাদও তিরোহিত নয়। *পা যে আমার অনড় পাথর* (১৯৮৭), *লোপামুদ্রা ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯১), *আমি ও আমার প্রতিবিম্ব* (২০০০), *রাতের শিয়রে আগুন* (২০০১) তাঁর কাব্য। *কাচপোকার ঘূর্ণিদৃশ্য* (১৯৮৫), *প্রিয়তমার নৌকাঘাট* (১৯৯৯) তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

মাসুদ খান (জ. ১৯৫৯)
শুধু নান্দনিক কাব্যভাষা নয়, মন্ময়চিত্ত ছড়িয়ে দেন অনেকান্ত আবহে। বাঙালি-বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত ধারা কিংবা ঐতিহ্য কোনোটাই তার কাব্যে নিছক নয়; চেতন-অবচেতনের সঙ্গমে পরিশীলিত এবং প্রত্নরূপে দৃপ্ত পরিবেশনায়

উত্তপ্ত। অমলিন অমরতায় পথ চলতে থাকে। এর প্রধান কারণটি নিহিত; কোনো নিয়ম, বৃত্ত বা আরোপ করা কোনো শর্ত একেবারেই তাঁর রূপজগতকে স্পর্শ করতে পারে না। এক ধরনের প্রচণ্ডতায় (স্যাটায়ার, হিউমার, উইট কিংবা নাটকীয় প্রবাহ) আধুনিক-তাকে তিনি গেঁথে ফেলেন ঐতিহ্যিক ধ্বনিচিহ্নের মূলবিন্দুতে :

যে টান টান আবেগে, আকর্ষণে
সমুদ্রের কোটি-কোটি টন পানি
আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলো তুমি মেঘের বাহনে,
কিছুটা শিথিল ক'রে তার, ওই মহাজলভার
যাবার পথেই যাও ঝরিয়ে খানিক

অবচেতন প্রেম-স্মৃতিবিদ্ধ মেঘ কালিদাস্য হয়ে উঠলে একালের প্রেমিক বলে ওঠে 'নেমে এসো মেদিনীমণ্ডলে, অধীনার ভাঙা টিনের কুটিরে'। পরের পংক্তি আরও দুর্মর : ' কালো সত্য ক্রমে বদলে দিয়ে এক সফেদ মিথ্যায়'। এ বিপর্যাস তীব্র সংযমে আরও শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হয়। শেষ কাব্যটিতে মাসুদ খান বুদ্ধিদীপিত ও শাণিত। প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো গড়ে ওঠে ততোধিক অর্থায়ন হয়ে, তবে তা সাদাসিদে নয় দার্শনিক দৃষ্টিতে। 'বেদম নাকাল চারপাশ, নাজেহাল লোকালয়/ আরোহন যতটা সহজ, অবরোহন ততটা নয়' শব্দকে ঘর্ষণের দর্পণে তীক্ষ্ণ করে অন্য অর্থ রচনা করেন। কিন্তু সর্বত্র তাঁর সাফল্য স্বচ্ছন্দ হবে এমনটা নয়। অধিক কিছু আরোপের ঘটনাও চোখে পড়ে *এই ধীর কমলাপ্রবণ সন্ধ্যায়* কাব্যের 'ডালিম' কবিতার শেষ চরণে। মুখ্যত *পাখিতীর্থদিনে*র কুড়িগ্রাম আকর্ষণীয়। তাঁর 'সাবস্টেশনে একা একজন লোক' ও 'ইতিহাস' চিরস্মরণীয় কবিতা। এ কবিতা দুটো আলাদা অর্থ বহন করে। সাবস্টেশন আর প্রফেট-এর অনবদ্য সিমিট্রি ['নতুন সাবস্টেশনের আলো/ প্রফেটের মতো জ্বলে'] তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোয় উচ্চকিত। ইতিহাসের প্রকৃত ইতিহাসে স্যবলটার্ন চিন্তায় আন্তেনিয় গ্রামসি থেকে রণজিৎ দাশ, গৌতম ভদ্রর চিন্তাসৃজিত কাঠামো– মাসুদ খান কবিতায় ভিন্ন উৎসার ঘটাতে সক্ষম হয়। এটি তাঁর শব্দদক্ষতায় আলাদা কাজ। উদ্ধৃতি :

কী করে সম্ভব পৃথিবীর সঠিক ইতিহাস? কারণ, যিনি লিখেছেন, তিনি
কে এবং কোথায়? কোন সময়ে, কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে কী উদ্দেশ্যে
লিখছেন, সে-সবের উপর নির্ভর তার ইতিহাস। আর তা ছাড়া
বিষয়টি বিষয়ীগত, সাবজেকটিভ।

তবে কি সত্যিই অসম্ভব সঠিক ইতিহাস?

উত্তর-উপনিবেশী মন মূলের আনুগত্যে বলে ওঠে 'তাহলে কি কালো তামাটে মানুষদের ইতিহাস নিরন্তর ঝাপসাই থেকে যায়!? পৃথিবীতে!? এবং প্রকৃতিতে!?' স্যবলটার্ন টেক্সট। এখানে বাইনারি-অপোজিটতত্ত্বে সাদা/কালো, নারী/পুরুষ, ধনী/দরিদ্র বিপরীত ভাবনাটির শ্রেণিচ্যুতি ঘটিয়ে তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান করে তোলার প্রয়াস। সেক্ষেত্রে কবিভাষাও চিরপ্রচলিত অর্থটি পাল্টে তৈরি করে জ্যাক দেরিদাকথিত ভাষিক 'মুক্ত এলাকা'। কবি বলতে সক্ষম হন :

> তবে সেও তো সঠিক ইতিহাস? কেননা সেইসব অধ্যায়, যেগুলো
> কালো ও অন্ধকার? সব আলো শুষে নিয়ে নিয়ে যেগুলো কালো
> ও কলঙ্কিত হয়ে পড়ে আছে? যেগুলো থেকে কোনোকালেই আর
> বের হয়নি এবং হচ্ছে না কোনো আলো? সেই সব?

এখানে 'সেই সব' উচ্চারণে কবিতার ভরকেন্দ্র সুঠাম হতে সক্ষম হয়। সম্বন্ধযুক্ত অন্য পংক্তির উজ্জ্বল-উদ্ধার যেন 'সেই সব' প্রশ্নটি। এভাবে সত্তর-উত্তর সময়গ্রন্থি নির্মিত হয়, নিছক আবেগের আধারে নয়, বহিরাশ্রয়ী বিবিধ উপাদানের সংশ্লেষে, প্রশ্নও সেখানে অনেক কথার উত্তর—যেমন 'কালো সত্য' আর 'সফেদ মিথ্যা'র চকিত ইমেজবাহিত শব্দটি। বিপরীতে তৈরি করে ব্যঙ্গ-প্রলাপ। উইটে গুরুত্ব বাড়ায়। মাসুদ খানের সম্মুখগামী স্বতন্ত্র দীপাবলীর স্বর এমনই স্বয়ম্ভূ। এসব ব্যাখ্যায়নে কবিকে অনেকের থেকে স্বাতন্ত্র্য বলে পরিগণ্য করা সম্ভব হয়। কবির কাব্যগ্রন্থ : *পাখিতীর্থদিনে* (১৯৯৩), *নদীকূলে করি বাস* (২০০১), *সরাইখানা ও হারানো মানুষ* (২০০৬), *আঁধারতমা আলোকরূপে তোমায় আমি জানি* (২০১১), *এই ধীর কমলাপ্রবণ সন্ধ্যায়* (২০১৪)।

ছয়.

মাহবুব হাসান (জ. ১৯৫৪) কাব্যঅভিজ্ঞতা প্রেমের, সেরূপেই প্রতীক-প্রত্যাশী; কিন্তু মনন সেখানে দীপ্তি ছড়ায়। শুভচিন্তকরূপেই সুকবি হয়ে ওঠেন। বড় কবির প্রত্যয়টিতে মাহবুব হাসানের আরও সংহত ও নিত্যপ্রয়াসী হওয়ার প্রয়োজন শেষ হয়নি। *তন্দ্রার কোলে হরিণ* (১৯৮৪), *তোমার প্রতীক* (১৯৮৬), *নিসর্গের নুন* (১৯৯০), *তাজা গ্রেনেড কিংবা দিবাস্বপ্ন* (১৯৯৩), *আমার আকাশ* (১৯৯৮) প্রভৃতি। **ফরিদ কবির** (জ. ১৯৫৯) স্থির মেজাজের পরিপক্ব কাব্যরথী। পরিশ্রমী ও বিশুদ্ধ কথক। জীবনের সূক্ষ্মতর অভীপ্সার রং ও রেখাকে সময় নিয়ে আত্মস্থ করেন। পরিবর্তন ও বিবর্তনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন। অমিত সম্ভাবনার জীবনকে অনন্ত করে তুলতে চান বৃক্ষ-পাহাড়-পাখি-ফল-ফুল এসবের ভেতর দিয়ে। যন্ত্রসভ্যতা অনেক কিছুকে কৃত্রিম বানালেও মানুষ তো তার মূল্যবোধ নিয়ে মূলেই ফিরতে চায়। ছন্দকে নিরীক্ষায় এনে জীবনকে এরূপে গ্রহণ কিংবা তার সম্ভাব্য সূত্রটির

পর্যবেক্ষণই করেন কবি। ফরিদ কবির সৌন্দর্যকে বোনেন; ছন্দ সেজন্য নানারকম, ইমেজও চাঁদ-জ্যোৎস্নার পরিচর্যায় পরিবেশিত। তাঁর কাব্য : *হৃৎপিণ্ডে রক্তপাত* (১৯৮৫), *ওড়ে ঘুম, ওড়ে গাঙচিল* (১৯৯৮), *অনন্ত দরোজাগুচ্ছ* (১৯৯১), *মন্ত্র* (১৯৯৯)। সম্পাদনা করেছেন : *পঞ্চাশ বছরের প্রেমের কবিতা* (১৯৮৬), *কবিদের লেখা প্রেমের গল্প* (১৯৮৭), *দুই বাংলার কবিতা* (১৯৮৭), *একুশের গল্প* (১৯৯১), *একুশের কবিতা* (১৯৯১), *দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪), *স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি* (১৯৯৪), *হৃদয়ে আমার বাংলাদেশ* (১৯৯৪) প্রভৃতি। **সরকার মাসুদ** (জ. ১৯৬১)র কাব্যগ্রন্থ। গতানুগতিক বিরহ বিষাদ নয়, খুব নিবিষ্টতায় ও নিরীক্ষায় তাঁর কবিতা বহুগামি। বলতে হয় নাগরিক মধ্যবিত্তের যাবতীয় ক্লান্তি-ক্লিন্নতা কিংবা দীর্ঘ যন্ত্রণা সামূহিক বিবেচনায় বর্ণনার উপাদান তৈরি করে কবিতা শরীরে, আশির বৈশিষ্ট্য ও ছাপ স্পষ্ট:

> কার শাপে যে শানাই এখন শুকিয়ে গেছে,
> নদীর বাতাস পালিয়ে গেছে!
> কার শাপে-যে গল্প হলো পাখির ওলান
> দুধের বাথান, কেউ কি জানে? কেউ জানে না!

পরের কাব্যে পেছন ফেরা স্মৃতি অভিপ্রেত ও মনোমুগ্ধকর :

> বেদনায়, অম্লমধুর সব স্মৃতিভাবনায়
> ঘন সবুজ আরো নুয়ে পড়েছে ঘন অন্ধকারের উপর।

অথবা,

> অদূরে নীল আলো ফোটে বেড়ার উপর
> এখানে রাস্তার পাশে সাদা দেয়াল কালো
> ধূসর প্রান্তর জুড়ে মোটা এক পোচ আলকাতরার ব্রাশ
> এ মুহূর্তে চুনের রং কালো

এক্ষেত্রে আঙ্গিকের দুর্বলতাটুকু পাওয়া যায় উপরিকাঠামোতে দৃশ্যমান জীবনাচারের অপরিপক্ব পর্যবেক্ষণে। কবিচেতনায় সমাজের চালচিত্রটি বাস্তব অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয় না। ফলে পরিচর্যায় তেমন আকর্ষণও জন্মে না। তবুও সরকার মাসুদ কবিতায় উজ্জ্বল বার্তাটিই ছড়ান। *আবহমান উলুধ্বনি* (১৯৮৭), *নিভৃতিচর্চা* (১৯৯১), *কাচপোকার ঘূর্ণিদৃশ্য* (১৯৯৬), *প্রিয়তমার নৌকাঘাট* (১৯৯৯) সরকার মাসুদের কাব্যগ্রন্থ। **কাজল শাহনেওয়াজ** (জ. ১৯৬১) নতুনরূপে আসেন। রূপক ও প্রতীকে তিনি আশির প্রবণতা ধারণ করে লেখেন : 'শহরের ভেতর অনেকগুলো গ্রাম আছে/ গ্রামের ভিতর রয়েছে অনেকগুলো শহর/ যে একইসাথে এই দুটো দেখতে পারে/ তাকেই আমরা বলি আধুনিক।' বৈজ্ঞানিক চেতনাঋদ্ধ অভিজ্ঞানে 'কালো ওয়েল্ডিং গ্লাস', বুটের শব্দ', 'করাত কল' নাগরিক স্থিতধী কিন্তু

সম্মুখগমি। তাঁর কবিতা *জলমগ্ন পাঠশালা* (১৯৮৯), *রহস্য খোলার রেঞ্চ* (১৯৯২)। **মোহাম্মদ কামাল** (জ. ১৯৫৬) *এখানে অরণ্যভয় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৯) কাব্যটিতে কবি বলেন 'কে দেবে, আরোগ্য দেবে/ অভয় পৃথিবী দেবে, কে দেবে, দেবে না'—পরিশুদ্ধ প্রণোদনাকাতর উচ্চারণ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণচিত্তে তাঁর সাহসিক অঙ্গীকার। শ্রেয়বোধটুকু অনিবার্য হয়ে ওঠে কবিতায়। সমস্ত অসঙ্গতির বিরোধীতায় সামূহিক জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ তথা জীবন সম্ভাব্যতার সূত্র রচিত হয় কবিতায়। প্রতীক-চিত্রকল্পের মধ্যে কামাল নৈরাশ্যকে গ্রহণ করেন না। বরং নৈরাশ্যের ওপারে ব্যাপ্তির সুষমার আকর্ষণকে দেন তুঙ্গে তুলে। এ যেন অন্তর-বাইরের যাবতীয় শোধনস্বরূপ পূর্ণতর পরিণতির নিশ্ছিদ্র পরমবিন্দু। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রভাব এক্ষেত্রে তাঁকে যেন আরও নিজস্বতা দান করেছে। আমাদের কবিতাঙ্গনে তাঁর আত্মনিবেদনের সুরটি নিঃসন্দেহে অমরতায় উৎকীর্ণ। **বিষ্ণু বিশ্বাস** (জ. ১৯৬২) আটের দশকের অসুস্থ কবি বিষ্ণু বিশ্বাসের কাব্য *ভোরের মন্দির*। জীবনানন্দর পরে আবুল হাসান চেতনায় তিনি প্লাবিত। বোহিমেয়, বিষণ্নতার কবি। কাঠামোবন্দি মৃত্যুচিন্তার দ্বারা; কখনো হতাশা নিদ্রাচ্যুতি। স্বদীক্ষিত কবিচেতনায় নিরঙ্কুশ নিমজ্জিত। বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলেন; আর ডিসকোর্সে থাকে অপাপবিদ্ধ রূপচেতনা। রহস্যের বেড়াজালে আদেশ থাকে তীক্ষ্ণধী স্বপ্নে বাঁচবার আকুলতা। এজন্য কবিকুশলতায় মিথরূপে বিস্তৃতি পায় 'ঘোড়া', 'শব', 'অন্ধকার', 'সমুদ্র' ইত্যাকার সব প্রসঙ্গ। অক্ষরবৃত্তের নিরীক্ষায় তিনি কখনো প্রতিষ্ঠিত কখনো বেসামাল—তবুও স্বাতন্ত্র্যে হয়ে ওঠা সব পংক্তিমালা 'তারার আঁধারে আপাতত থাকো, রাখো অবগুণ্ঠন/ লাল কমল নীল কমল ঝলমল' কিংবা মাটির গভীর থেকে সমলয় নৃত্যে, আসে/ বালির আড়ালে ধ্বনি/ মুক্তি, সাধনা, শক্তি'। রূপকথার অলৌকিক আনন্দটি যেন লৌকিকতায় পর্যবসিত। দুর্দান্ত এ কবি কিছু কবিতায় সত্যের দিশারী। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বিলীন। **শোয়েব শাদাব** (জ. ১৯৬৪) প্রথায় আটকান না। নতুন পথ খুঁজে নেন 'নষ্ট দ্রাঘিমা' বচনে। শব্দ-নিরীক্ষায় প্রত্নকারুময়তা রচনা করে সামূহিক অবচেতনের দ্যেতনায়। দ্যোতিত শব্দ 'প্রগৈতিহাসিক ঋষি'প্রতিম :

> রক্তের গভীরে যেন ঘাই মারে বিষধর শিং!
> উরুর আগুনে চেপে যৌবন বল্লম
> কেঁপে উঠি মধ্যরাতে—
> স্বপ্নের ডানার মতো নেমে আসে সংখ্যাহীন সিল্কের বালিশ।

তাৎপর্যময় পংক্তি। পরাচেতনায় অবচেতন মন অ্যানিমাপ্রবণ, শিথিল মন স্মৃতিবীজ তৈরি করে, রোপন করে এক অশরীরী সামষ্টিক ইতিহাস। করি মৌলিক প্রবৃত্তি রচনা করে আর্কিটাইপ বা আদিকল্প রূপ।

যেখানে তোমার পা
সেখানে মৃত্তিকা নেই
আদ্যান্ত জল বৈতালি মরুভূমি।
আগ্নেয় পাথর
কর্তিত মাথার মতো বিছানা।

'আগ্নেয় পাথর', 'বৈতালি মরুভূমি' প্রজাতিচিন্তন, ফেরার প্রত্যাশা চেতনার গোপন স্তর থেকে বিন্যস্ত। ইচ্ছার এ প্রতীকী অভিপ্রায় ফয়েডজাত। *অশেষ প্রস্তরযুগ* (১৯৯৮) কবির সৃজনীকাব্য। **সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ** (জ. ১৯৬৫) আশির দশকের কবিতা-কাঠামোতে ঋজু, পরিশ্রমী, যত্নবান : 'এ শুধু রোদের লোভে বানিয়েছি ঘর/ এ শুধু জানালা কিনতে কতো বেচে দিয়েছি নগর।' মানবিকতার অহংকারটি শুধু সুকবি বা সম্ভাব্য কবি হিসেবে নয়, বড় কবি হিসেবে। কাব্যভরা এ কবির যাত্রা অনেকান্ত, অনেকদিকে। আমাদের প্রত্যাশায় তিনি অনেক দূরের যাত্রী—বিশেষত উদ্বেগের প্রাবল্যের চিহ্নিত মাত্রাটি যাচাইসাপেক্ষে। এ সতর্কটিতে তাঁর কবিতাগ্রন্থ : *তনুমধ্যা* (১৯৯০), *পুলিপোলাও, কবিতাসংগ্রহ* (২০০৬), *মনিং গ্লোরি* (২০১০)। **কামরুল হাসান** (জ. ১৯৬১) *সহস্র কোকিলের গ্রীবা* (১৯৯১), *প্রান্তসীমা অনন্তদূর* (১৯৯২), *ছুলে বিদ্যুল্লতা, না ছুলে পাথর* (১৯৯৩), *পাখি নই আশ্চর্য মানুষ* (১৯৯৪), *দশদিকে উৎসব* (১৯৯৭), *বৃক্ষদের শোভা দেখে যাব* (২০০০), *রূপচৈত্রের অরণ্যটিলায়* (২০০৪)—কাব্যে কল্পনার বিশ্বাস তৈরি হয় 'আকাশগঙ্গা', 'তাম্রলিপ্ত রাজার প্রাসাদ', 'স্বপ্নঠাসা দেবযানী দেহ' কিংবা 'বসন্তদুহিতা'র ভাষাচিহ্নে। যদিও কবিতায় তা আর শুধু ভাষাচিহ্নে বর্তায় না—হয়ে ওঠে বিশ্ববীক্ষার জ্যোতির্ময় পুনর্মুদ্রণ। নক্ষত্রজ্বলজ্বল পটচিত্রে এসব জীবনছোঁয়া এক শুদ্ধতার অনুধ্যান। অনুপম আরাধ্য জ্ঞানে ভাবনার সুষমাকে করে প্রসারিত। তবে কবির শিল্পসত্তার উন্মোচনে ধরা পড়ে অন্তরঙ্গতার নানা দিক্চিহ্ন। যা পাঠকের অন্তর্লোকে সৃষ্টি করে বিশেষ আকুতি। **সাজ্জাদ শরীফ** (জ. ১৯৬২) খুব কম লিখে কাব্যনন্দনে প্রবাহিত, বুদ্ধিকে আবেগে আরোপ করে বৈশ্বিক বাস্তবতার সুলুকসন্ধান করেন সাজ্জাদ শরীফ। বাংলাদেশের কবিতার অঙ্গনে যে শ্রদ্ধাটিতে তিনি আসীন, তার প্রধান কারণ, ট্রান্সমিউটেশান তথা রূপান্তরের মাত্রাটি চিহ্নিত করা। যেখানে শুধু স্বদেশ বা সময় নয়, বিশ্বচেতনার সংযুক্তি পরিলক্ষিত। তুলে আনা ছন্দ, আর পংক্তিদ্যোতনায় *ছুরিচিকিৎসা* (১৯৮৫) শুদ্ধ কবিতার সমাহার। **মহীবুল আজিজ** (জ. ১৯৬২) পাঠ-অভিজ্ঞতায় মহীবুল আজিজের কবিতা *সান্তিয়াগো'র মাছ* (১৯৮৮), *রৌদ্রছায়ার প্রবাস* (১৯৯৭), *হরপ্পার চাকা* (১৯৯৮), *পৃথিবীর সমস্ত সকাল* (২০০১), *নিরান্দপুর* (২০০২), *বৈশ্য বিশ্বে এক শূদ্র* (২০০৩), *অসুস্থতা থেকে এই মাত্র* (২০০৩), *এই নাও দিলাম সনদ*

(২০০৪), *আমার যে রকম প্রস্তুতি* (২০০৪), *আমরা যারা স্যানাটরিয়ামে* (২০০৫), *পালাবার কবিতা* (২০০৫), *দৃশ্য ছেড়ে যাই* (২০০৬)। নন্দনমাত্রায় উত্তর-আধুনিক স্পর্শটি বিরাজমান। তাঁর সহজাত স্বপ্ন-অবচেতন প্রতীকগুচ্ছ চিত্রকল্পময় অভিব্যঞ্জিত। তবে পুনর্পাঠ বিরাজমান; আছে মৃত্তিকা-অনুষঙ্গি স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়ার প্রতিশ্রুতি। চিরমুদ্রিত প্রেম-প্রত্যাশা-অনুরাগও তীক্ষ্ণধী। এক্ষেত্রে অলঙ্কার-অন্বেষা, অতিসংবেদন কূটাভাসচিত্র তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। কবিছন্দ বৈচিত্র্যময়, ফলে চেতনা বহুগামী। কবির বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধও সমুন্নত ও সমীকৃত। বলা যায়, মহীবুল আজিজের প্রভূত বিষয় যেমন কবিভূমে সমর্পিত তেমনি ছন্দসৌন্দর্যেও তিনি অন্তর-বাহির আকরণে স্ফূর্তিপ্রদ। ফলে প্রায় সব কবিতাই সুপাঠ্য। তবে কবিতাচর্চায় আরাধ্য এ কবির বিষয়-দৃশ্যপট কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোলাজধর্মী ও নিস্পৃহতাজ্ঞাপক। কিন্তু এমনটা তো সবসময় কবিতাকে নির্গুণ করে না। **খালেদ হোসাইন** (জ. ১৯৬৪) ছড়ার ছন্দে থাকলেও কবিতার ছন্দে উঠে আসেন সমকাল সমাজ-রাষ্ট্র ও অভিজ্ঞতার নিগড়ে। আধুনিক ভাবচেতনায় বঙ্গভূমির রাষ্ট্রীয় শোষণ, শ্রেণিবৈষম্য তীক্ষ্ণতর হয় কবিতায়। বিশেষত ব্যক্তির ক্ষয়, অন্তর্জগতের শূন্যতা, আত্মবৈকল্য, স্খলন তৈরি করে বিষণ্নতার প্রতিবেদন। দৃষ্টিগ্রাহ্য দ্যোতনায় বিচ্ছুরিত রোম্যান্টিক পরিবেষ্টনটি প্রকৃতঅর্থে দ্বান্দ্বিক দুঃসহতার কারণ ব্যক্ত করে। এক পর্যায়ে খালেদ হোসাইন দাহ-দৈন্যের ভেতর থেকেই প্রত্যাবর্তন বা আশাবাদের তর্জমাটিও বুঝিয়ে দেন। সংগ্রামের ইতিহাস, নিঃশর্ত নৃ-প্রত্ন অনিবার্যতায় ব্যক্তিনিরূপিত জীবানাচারের যাবতীয় উপাদানও লুক্কায়িত থাকে এমন ইঙ্গিতের মধ্যেই। সে অর্থেই ইলা মিত্রের অংশীদারিত্ব তাঁর প্রকরণে :

> ইলা মিত্র কথা বললেন
> বুঝলাম মানুষের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা
> মহাকালের চেয়ে কিছু কম দীর্ঘজীবী নয়।

এরপর পর্বান্তর লক্ষণীয় 'অজস্র পাতা ঝরে অরণ্যের নির্জনতায়'। 'পাতাদের সংসারে' নিস্পন্দ দুপুরের সংবাদ। কবি ক্রমশ বুদ্ধির তপ্ত দুলুনিতে বাঙালির ইতিহাসের গতিপথ, মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, বিপ্লব, বিক্ষোভ সামূহিক অবলম্বি করে তোলেন উপমাপ্রতিমায়। এক দুপুরের ঢেউয়ের পরে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় প্রেম ও নস্ট্যালজিয়া অতঃপর চলে যাওয়ার ইঙ্গিতে স্মৃতি-বেদনার উত্তুঙ্গ স্বতঃধার এবং পরের কাব্যে ঊর্বশীর পিউরিটান শ্রম এক বৃহৎ অনুভবের গভীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শরীর-নিরপেক্ষ কিন্তু তীব্রভাবে বহিরাশ্রয়ী সংশ্লেষী উপাদানকে অবচেতনা দিয়েই যেন শৃঙ্খলিত করা—উদ্ধৃতি :

> একসময় রাত আসত

নিঃসাড় গুহার মতো—
বৃষ্টির তোলপাড়
একটি মেয়ে
লজ্জায় চুরমার হতো—

কিংবা,

এ জীবন নিয়ে আমার আর কোথাও যাওয়া হয় না,
আমি বুকে অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর
পৃথিবীর সমস্ত পথ এসে ঢুকে যায় আমার বুকের মধ্যে।

কবিভাষাটির বুননিও অনেক পরিশ্রান্ত ও সংযমসিদ্ধতায়। তবে কোনো তত্ত্বকে আরোপ করা যেমন নয় তেমনি নিরীক্ষার পথেও তার সজাগ বিচরণ অনুপস্থিত। সহজ ও সাবলীলতাই যেন আদ্যন্ত কবির অনিঃশেষ উষ্ণতা। তবে তাতে ঘনানো আস্বাদ তিরোহিত। অপ্রতুল হয়ে ওঠে উপলব্ধিসমূহ। প্রকাশে কখনোবা তারল্য-স্থূলতা অলক্ষ্যণীয় থাকে না। পুনরাবৃত্তিও পরিলক্ষিত। *ইলা মিত্র ও অন্যান্য কবিতা* (২০০০), *শিকার-যাত্রার আয়োজন* (২০০৫), *জলছবির ক্যানভাস* (২০০৬), *পাতাদের সংসার* (২০০৭), *এক দুপুরের ঢেউ* (২০০৮), *পায়ের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে পথ* (২০১০), *পথ ঢুকে যায় বুকে* (২০১১), *চলে যেতে পারি* (২০১২), *কবির ব্রত আছে তাকে বিব্রত করো না* (২০১৩), *এলোকেশী* (২০১৪) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে। **খালেদ হামিদী** (জ. ১৯৬৩) কবিতাচর্চায় প্রাত্যহিকতার আমেজ প্রবল। রূপাতীত জগত সৃষ্টিতে পরিপক্ব জহুরি হয়ে ওঠেননি। তবুও অভিজ্ঞ কাব্যবিন্যাস পাঠককে আশাবাদী করে। প্রকৃত কবিভাষাটির জন্য দিব্যচেতনা চাই। তাঁর কাব্য *আমি অন্তঃসত্ত্বা হবো* (১৯৯৯)। **আমিনুর রহমান সুলতান** (জ. ১৯৬৪) লোকজ ঐতিহ্য, ইতিহাস প্রত্ন চোখে পুনর্নবায়ণ করেন। সমকালকে স্বীকার করেই জীবনের বিচিত্র অভিমুখ রচনা করেন– কবিতাগ্রন্থের নামকরণেই তাঁর চেতনাবীজ অনুরুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর কাব্য *জলের সিঁড়িতে পা* (১৯৮৭), *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না* (১৯৯০), *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী* (২০০০), *মৃন্ময় মুখোশ* (২০০৩), *পানসি যাবে না সাঁতার যাবে* (২০০৮), *সাধুর কর* (২০১০), *একুশের আলো* (২০১০)। কবির *নির্বাচিত কবিতা* ও *কবিতাসমগ্র*ও বেরিয়েছে।

সাত.

ওয়ালী কিরণ (জ. ১৯৫৮) কবিতাভুবনে যুক্ত হন নব্বুইয়ে। পুরাণাশ্রিত কবিতা *মগ্ন প্রতীক* দিয়ে তাঁর শুরু। স্বল্পতম সময়ে বেরিয়েছিল তার বারোটি কাব্যগ্রন্থ। অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দার্শনিক বোধ যুক্ত হলেও ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত

রচিত কাব্যে সমকাল স্বরই তার প্রধান প্রতিপাদ্য। বস্তুত এ সময়ই তাঁর কবিতা পরিপুষ্ট ও উচ্চনাদী হয়ে ওঠে। সমজের পুরুষতন্ত্র বিষয়ে লেখা *শিশ্নতন্ত্র*। শ্রেণিসাম্যে বিশ্বাসী হলেও কবি হিসেবে ওয়ালী আরোপিত নন, বোধের তীক্ষ্ণতায় আনখাগ্র শামিল হন অনপেক্ষ চেতনায় :

ধাতব ধানের নৃত্যে, ভাতঘুমে, সমমৈথুনে,
শিশ্নের সূর্যোদয়ে বীর্যশক্তি হয়ে নারী সংকটে
কাটিয়েছ তুমিও তো বিকল্প জীবন।

এরূপ মনঃসমীক্ষণে স্বপ্নের ভেতরে অবচেতনের স্তরীভূত গুস্তাভ ইয়ুংকথিত 'এ্যানিমিক' প্রবণতা পরিলক্ষিত। জেন্ডার নিরপেক্ষতা থাকলেও প্রজাতিচেতনায় গড়ে ওঠে প্রত্নস্মৃতির স্বরূপ। মনোবিদ ল্যাঁকাকথিত 'নীডনেস' ধারণা তার কবিতার উৎসারণ ঘটায়। ওয়ালী অনেকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত, প্রচুর লেখালেখির ভেতর দিয়ে তার উত্তরণও ঘটেছে, আলাদা ভূমিও তিনি তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একজন কবির সবকবিতা সফল হয় না, কবিতায় ওয়ালীর আরও যত্ন ও সংযত পরিশীলনের প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না। *মগ্নপ্রতীক* (১৯৯৫), *উৎসভূমি* (১৯৯৭), *রূপান্তরের পাখি* (১৯৯৮), *মিশ্রমানব* (১৯৯৮), *ওই নদী জলমঞ্চ* (২০০১), *শূন্যতার ডানা* (২০০৫), *অনিঃশেষ ধারাপাত* (২০০৫), *জলপাখিদের প্রত্নগভীরতা* (২০০৯), *অদৃশ্য পুরোহিত* (২০০৯), *হাওয়াদের রাজারাণী* (২০১১), *শিশ্নতন্ত্র* (২০১১), *বসন্তের কুশীলবগণ* (২০১২) তাঁর কাব্য। *কবিতাসংগ্রহ* প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ তে। **আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৬৩)** কবিতাচর্চায় আনন্দকেই গ্রহণ করেছেন। সেখানে ভাবপ্রকাশে তিনি আড়ষ্ট নন, কোনো দমকেও আবদ্ধ নন। উপলব্ধির দ্যোতনায় কবির অভিষেক ও উত্তরণ। তবে 'নদী' তার সত্তাজাত। রোম্যান্টিক অনুধ্যানে বিচিত্র ভাবনা তার অভিপ্রেত হলেও বাঙালিয়ানাই মুখ্য। পঠিত জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় কবির বিশ্ববোধ দুর্লক্ষ্য নয় :

পশ্চিমের ঝড়—অগ্নিগোরা ও বজ্রশেলে
গুড়িয়ে দিয়েছে
সর্দার-বালিয়াড়ির চূড়া
ধুলোয় লুটায় শিরস্ত্রাণ
... ...
তবে ঝড়ের মোজেজায় এখনও ওড়ে—
বোদলেয়ারের কবিতার মতো

পরিপক্বতার ভেতরেই শব্দগুচ্ছ জমাটবদ্ধ হয়। অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রস্তুতকৃত প্রণোদনা সমকালের স্বরে প্রতিলিপিত। তবে প্রকৃতির ভেতরেই কবির মৌলিকত্ব দানা বাঁধে। চর্চার ভেতরে শ্রম নিবিষ্টতার লক্ষণ থাকলেও এ কবি এখনও স্বতন্ত্র

স্বর তৈরি করতে সক্ষম হননি। প্রথম কাব্য *তন্ত্র থেকে দূরে* বের হয় ২০০২ সালে। পরে লিখেছেন : *মহানন্দা এক সোনালী নদীর নাম* (২০০৪), *শেষ হেমন্তের জোছনা* (২০০৮), *কুয়াশার বর্ণমালা* (২০০৯), *পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি* (২০১০), *স্বপ্নের হালখাতা* (২০১১), *প্রেমসমগ্র* (২০১১), *জলচিঠি নীল স্বপ্নের দুয়ার* (২০১২)। তাঁর *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে ২০১৩ সালে। **কামরুল ইসলাম (জ. ১৯৬৪)** *দ্বিধান্বিত সুখে আছি যমজ পিরিতে* (১৯৯৯), *ঘাসবেলাকার কথা* (২০০১), *যৌথ খামারের গালগল্প* (২০০৬), *সেইসব ঝড়ের মন্দিরা* (২০০৮), *চারদিকে শব্দের লীলা* (২০১০), *অবগাহনের নতুন কৌশল* (২০১১), *মন্ত্রপড়া সুতোর দিকে হাওয়া* (২০১৪) কাব্যসমেত সক্রিয়। প্রত্নধর্মী নামে কামরুল গড়ে তোলেন আধুনিক জীবনবীক্ষা। যত্নপ্রবণ কবি, অবলীলায় গেঁথে নেন ইংরেজি উপমানচিত্র, তাতে বাক্যবন্ধ মিয়্রমান না হয়ে অন্যতর সুবাস ছড়ায়। উদ্ধৃতি :

> চারিদিকে শব্দের লীলা
> চপল বৃষ্টির সুনসান; ঘুমের কুরুঙ্গি থেকে জেগে ওঠে দ্বৈরথ :
> শব্দেরা ওড়ায় কিছু মেদাবী মিথ উদ্বায়ু জলজ আড়ালে

'নীলিমার সার্জিকাল চোখ', 'মিস্টি মটিফে তুমি জেগে আছ', 'সাঁতার না-শেখা হাতগুরো নিভে নিভে নকটার্ন', 'একজন বালক, আমি ও বেনসন অ্যান্ড হেজেজ', 'কিছুটা মেরিনেট মাংসের ঘুম' প্রভৃতি কবিতায় কামরুল নিঃশব্দ বিশ্ব আবিষ্কারে রত। 'কবিতার সাথে আমার রিলেশন' তেকে জেনে নেওয়া যায় কবির আখ্যা :

> স্তনময় রোদের আখ্যানে এই হাতে গোলাপের হাড়
> বলো, এই ন্যারেটিভ কারো কান্নার কাছে পরাজিত কিনা
> চুল্লিতে প্রাণের সখ্য ক্রমাগত নেগেশন
> বোধ আমার বাউল-চরণে আঁধার ও ব্রিকোলাজ—

ব্যক্তিত্বময় প্রবণতায় পরাবাস্তব স্বর একালের অভিধা অর্জন করে। এ পরা-চেতনা প্রথানুগ নয়, প্রশ্নবিদ্ধ ও শিথিল সম্পর্কের টোনে বাঁধা। আধুনিক উপসর্গসমূহ গ্রহণ-অগ্রহণ প্রশ্নে সমকালের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন কবি। প্রশ্নটি নিঃশব্দ, লুক্কায়িত, ইংরেজি শব্দের টোনে অনুরণিত, বোধে অনাঞ্চলিক-নাগরিক এবং অবশ্যই দৈশিক। এমনটা 'মেকানিজম' মনে হলেও সতর্ক ও স্থির ধৈর্যে কবি প্রতিসরিত ভাবনায় ক্রমশ ঋজু ও সামর্থ্যবান হয়ে উঠেছেন। *মন্ত্রপড়া সুতোর দিকে হাওয়া*র বেশ কিছু কবিতা নতুন এবং নব্বুইয়ের ধারায় অভিনব। কামরুলের কবিতার প্রকরণ পাল্টাচ্ছে, দীর্ঘ কবিতার দিকে ঝুঁকেছেন মাঝেমধ্যে, যুক্ত করছেন কখনো ট্রিলজির ফর্ম। এ পরিবর্তন অবশ্যই চেতনার পরিবর্তন-অনুসারি। **কুমার চক্রবর্তী** (জ. ১৯৬৪) নব্বুইয়ের তীক্ষ্ণধী, অলৌকিক আনন্দপিয়াসী কবি কুমার চক্রবর্তী। পরিচর্যা সুন্দর। জীবনমায়ার দুর্দান্ত

আবিষ্কর্তা। নিষ্পাপ আত্মা সৃষ্টি করে মিথ-ইতিহাস-প্রত্নপ্রতিমায়। কোনো ভৌগোলিক পরিবেষ্টন নয়; সজাগ তৎপরতার শর্তটি কায়েম হয় প্রোফেটিক ভাষ্যে। ফলে দৃশ্যমান প্রকৃতি, সময়গাত্র, আলো-অন্ধকারের স্বরূপটি উদ্যত মাত্রা লাভ করে। *উজানে জীবন জাগে*, *জন্ম বীক্ষণ*, *লগপুস্তকের পাতা* (১৯৯৮), *আয়না ও প্রতিবিম্ব* (২০০৩), *পাখিদের নির্মিত সাঁকো* (২০১০), *হারানো ফোনোগ্রাফের গান* (২০১২) কাব্যগ্রন্থে জন্ম-মৃত্যু-স্মৃতি-বিষাদ অর্থারোপিত হয় আনন্দ-যন্ত্রণার পাঠ-অভিজ্ঞতায়। 'মনে পড়ে সেই লোকটির ছায়া যে বস্তুত জ্যোতির্বিদ্যা জনত। সারারাত চড়াই/ উৎরাই পেরিয়ে ঘুরত আর পাহাড় ও সমভূমির গুপ্ত জায়গাগুলোতে খুঁজে বেড়াত/ ফেলে যাওয়া নক্ষত্রের চিহ্নগুলো।' এক্ষেত্রে কবি কোনো তত্ত্বকে বা বিশেষ কোনো আদর্শকে আরোপে নয় মেধার সূচ্যগ্রে চিহ্নিত করেন প্রকরণ। ফলে আলোচ্য সব কাব্যপাঠে সামগ্রিকতার ভেতর দিয়ে সম্ভাব্য মননমাত্রার মুখটি খুলে যায়। এ কবিভাষা যেন আমাদের আমন্ত্রণ জানায় অভিযাত্রার অমিতলোকে। **ব্রাত্য রাইসু** (জ. ১৯৬৭) *আকাশে কালিদাসের লগে মেঘ দেখতেছি* (২০০১) এক যুগ সময় নিয়ে রচিত কাব্য। প্রকৃতঅর্থে, কবির চেতনসত্তায় থাকে একদিকে শোচনীয় মধ্যবিত্তের হৃতোচ্ছ্বাস অন্যদিকে বৃষ্টির পানিতে স্বস্তির এসথেটিক্স। এমন এক প্রকারের কূটাভাসের ভেতর থেকেই উঠে আসে উষ্মা, বিদ্রূপ, শ্লেষ—আর সে-মতে প্রস্তাবিত প্রকরণ। ব্রাত্য ছোট্ট শব্দপুঞ্জে লিরিক সৃষ্টি করেন। কাব্যবাণীতে তা তীব্র, উজ্জ্বল। তবে সমাজের শ্রেণিস্তর, বিভিন্ন পেশার মানুষ, জ্ঞানী-শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে পরিহাসের পিঠে আশ্রয় 'দেখে নিচ্ছে গ্রামবাংলা আজিও বর্ষার'। নন্দনমাত্রাটি কিছুতেই বিচ্যুত নয়। উপমানচিত্র কাঙ্ক্ষিত। কবির আবেদন অনেক দূরবিস্তারী। প্যারাডক্সিক্যাল কৌশলেও যেন অফুরন্ত ব্রাত্য রাইসু। **তুষার গায়েন** (জ. ১৯৬৭) চিত্ররূপময় বর্ণবিভাকে ধারণ করেন কবিতায়। মাটিমথিত চিরায়তিক ভাষ্যকে ছন্দে তুলে আনেন। অস্তিত্বপ্রবণ অন্বীক্ষার আঁচড়ে বন্দি হয় শুভ্রসমুজ্জ্বল স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়া। প্রকৃতির নিরঙ্কুশ তৎপরতার আখরে যুক্ত হয় সামূহিক অভিজ্ঞতা। বর্ণিল বার্তার ঐশ্বর্য জীবনের আরোপিত সত্যে চিহ্নিত থাকলেও মূলঅস্থিপটে নির্ধারিত শিশিরসম্পাত তুষার গায়েনের কবিতার প্রতিপাদ্য। উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তনে প্রকাশরীতিও বাস্তবতার স্বরগ্রামে উচ্চনাদী। তবে কবির স্নিগ্ধ অবয়বটি থাকে নিঃশঙ্ক। তাঁর কাব্য : *নীলভবহ্রদ* (১৯৯৭), *বৃষ্টির অন্তর ত্রাস* (২০০৩)। **শিমুল মাহমুদ** (জ. ১৯৬৭) অবচেতন মনের ভেতরে প্রচুর শৃঙ্খলাহীন প্রতীক তৈরি করেন। কবিতায় সমাজমনস্কতা প্রত্যক্ষ নয়, তীব্রভাবে ঘটেছে তার প্রজাতিভাবনা আর ফ্রয়েডকথিত আয়নামহলের অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংদমনের চূর্ণীকৃত বহিঃপ্রকাশ। সেখানে চাঁদ, প্রকৃতি, জ্যোৎস্না-বৃষ্টির রোম্যান্টিকতা দ্যোতক ও দ্যোতিতের ভেতর

আগমন-প্রত্যাগমন করে। ফার্দিনান্দ স্যোসুরকথিত ভাষার প্রতীকশূন্যতায় কবির ‘ডিজায়্যার’ অনিয়ন্ত্রণে পুনর্গঠিত হয় এমন কথনে :

> মুগ্ধতার অতল দরজা খুলে যায় চোখের ওপর,
> সোবহানাল্লাহ্, খুব সুরৎ,
> সুরৎকথা। পঙ্খীনৃত্য সাগর হাওয়া; হাওয়াবন্ধু লাগি হৃদে জমে প্রেমকথা,
> হৃদকথা, পক্ষীবিকেলকথা।

ভাষা চিহ্নায়িত বিশৃঙ্খলা কাল্পনিক জগত পেরিয়ে অবদমিত মিরর জগতে বিচ্যুতি এবং প্রশ্রয়ের খোঁজে শূন্যমান হলে অসলগ্ন অবচেতনে কবিভাষা এ প্রতীকী শৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। শিমুল নব্বুইয়ের প্রথমদিকের কবি, পরিবর্তন হয়েছেন অভিজ্ঞতার ভেতরে কিন্তু ‘স্টান্ট’ দুর্বল। মেকানিজমের ভেতরে অনেক কবিতা তার বিনষ্ট হলেও কিছু ভালো কবিতা প্রণয়নে তার সক্ষমতা, অন্যদের চেয়ে আলাদা। কবির কাব্য : *মস্তিষ্কে দিনরাত্রি* (১৯৯০), *সাদা ঘোড়ার স্রোত* (১৯৯৮), *প্রাকৃত ঈশ্বর* (২০০০), *জীবাতবে না মৃত্যবে* (২০০১), *কন্যাকমলসংহিতা* (২০০৭), *অধিবিদ্যাকে না বলুন* (২০০৯), *আবহাওয়াবিদগণ জানেন* (২০১২)। *সপ্তহস্ত সমুদ্রসংলাপ* নামের কবিতাসংগ্রহ বেরিয়েছে ২০১৪ সালে। **বায়তুল্লাহ্ কাদেরী** (জ. ১৯৬৮) কবিতার প্রণোদনা থাকলেও, প্রচ্ছন্ন থাকেন সংগুপ্ত শব্দপ্রতিমার প্রক্ষেপণে। জ্যাঁক ল্যাকাকথিত শিশুর প্রতিবিম্বিত আয়নায় ‘অপর’ চেতনার যে বিভক্ত ও বিচূর্ণিত রূপ মেলে বায়তুল্লাহ্ সেই চূর্ণীকৃত বিভক্তিত রূপ বহুবর্ণিল আভায় দীপিত করে তুলেছেন। প্রকৃতি-প্রেম-জৈবিকতা দুর্মর তার কবি-বিবরণী। দিব্যবাণী থাকে ‘রমণী’, ‘লালন’, ‘বনমোরগ’, ‘জ্যোৎস্না’, ‘হরিণভীতি’র অন্তর্লীন ইমেজে। আধুনিক প্রবর্তনাটি আসে তার মধ্যে শহর-সন্দিগ্ধ জীবনাচারের নানাবিধ উপাদানগুচ্ছে। জীবনযুক্ত যন্ত্রণা আত্মবিশ্বাসের রঙে লাভ করে নব্যনন্দনমাত্রা। সেজন্য ব্যস্ত-পরিক্রমায় তাঁর ছন্দটি হয়ে ওঠে গতিসৌন্দর্যের দ্যোতক হয়ে। প্রজ্ঞার-পরিকাঠামোতে বায়তুল্লাহ্‌র সামূহিক কবিসত্তাটি বিধৃত—*শীতের সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* থেকে :

> শীত-ই আমার সব, আমার অমোঘ গুরু, বস,
> আমি তার অধস্তন কর্মচারী, শীত এলে ঠিক
> কর্মখালি বিজ্ঞাপনে আমার চেহারা ভাসে, ধস
> নামা বন্ধ হয় হৃদয়ের, ঠেকে সত্যের শালিক

শীত পাশাপাশি বর্ষা পরে ক্রমশ স্থিত মানুষ। ভাবের ভেতরে সনেটও যেন অবমুক্ত, বসিয়ে দেন মাত্রাবৃত্তের তীক্ষ্ণ চাল। সনেট আকর্ষণ বহুস্তরীভূত আরও—পরের কাব্যটিতে, তবে বাঁক পরিবর্তন ঘটে যায় *কিম্ভূত হবার কথা ছিল* থেকে।

'একগুচ্ছ সাদা বক' ধরে কবি পথ মাড়ান। 'ঘোড়া'র আর্কিটাইপ তৈরি, বৈশ্বিক অভিসার যুক্ত, তাতে সংরক্ষিত মানুষ। এ বিষয়গুলো পরের কাব্যে আরও সংহত। সহজ চটুল শব্দে হয়ে ওঠেন কৌতুকপ্রবণ, সংখ্যাবাচকতায় খণ্ড হলেও অখণ্ডসূত্র তৈরি। কবির *ত্রিণাচিকেতার নাচ* আলাদা বিভঙ্গের। নৃত্যরতা রমণীর বিবরণধর্মী বলয়, উপলব্ধিতে মেলে এক আলাদা অমোঘ আরাধ্য :

নাড়িয়ে রসের মন সন্ধ্যা নামে অতি অবেলায়
কমলাসুন্দরী বড়ো থেকে যায় বুদ্ধির গুহায়
রসগ্রাহী মন রোজ সূক্ষ্ম জৈব আত্মিক সুধায়
নৃত্য করে করে মেষে কমলায় অদ্বৈত জাগায়

এখানে নাচ নয়, নৃত্যই কবিকে প্রতিমাবন্দী করে, মানুষের জীবনবীজ সংগুপ্ত থাকে তাতে। প্রজাতিচেতনা অনুরুদ্ধ হয় 'প্রিজমের চোখে' কবিতায়। অবচেতন সত্তার বিস্ফারিত পাণ্ডুলিপির স্রোতে কবির অন্তর্বয়ন প্রগাঢ় রূপবৈভবে অন্তর্লীন। 'সম্ভবত তিনিই নব্বইয়ের একমাত্র কবি যিনি বেশ কিছু সফল দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন, সেই সঙ্গে চতুর্দশপদী' (মাসুদুজ্জামান)। স্বপ্ন-রচনার ফাঁদে উদ্ভাসিত হয় বাখতিনের বহুস্বরিত কার্নিভাল মোটিভ :

কিছুই দেখে না ঐ বায়োস্কোপঅলা, আজ শুধু
আমার চোখেই দেখা যায় তার যত বায়োস্কোপ

চতুর্দশপদীর আঙ্গিকে পরিবর্তনময় তাঁর ইমেজগুচ্ছ ['ঘোড়া' পরে 'বাঘ'] :

এ-কেমন বাঘ দেখা হলো! নেই হালুম-হালুম,
দাবড়ানি নেই, 'বাঘ আসে বাঘ আসে' নেই ভীতি,
'যেখানে বাঘের ভয়' সেখানেও নেই সন্ধ্যা-স্থিতি

বায়তুল্লাহ যেহেতু নান্দনিক শর্ত মেনে লেখেন, সেখানে অবচেতন-অর্ধচেতন-চেতন ভাবনায় তাঁর অধিগত জগত নির্মিত হয়। কবিতা পরিচর্চার পথটিতে তিনি এখনও সম্মুখগামী। তাঁর কাব্য *দুঃখের আঙুল নড়ে চড়ে* (১৯৮৮), *বাতাস তোমার রক্ত পান কর* (১৯৯১), *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* (১৯৯৬), *ত্রিণাচিকেতের নাচ* (২০০২), *কিম্ভূত হবার কথা ছিল* (২০০৫) , *প্রজন্ম লোহিত* (২০০৭), *বিতিকিচ্ছিরি লাইফ যাচ্ছে* (২০০৮), *আড়ম্বর* (২০০৮), *প্রিয় মধ্যবিত্ত আমি কিন্তু ডাকছি আসুন* (২০১০)। কবির *কাব্যসমগ্র* বের হয় ২০০৯ সালে। **চঞ্চল আশরাফ** (জ. ১৯৬৯) সৃষ্টিশীল অবচেতন সত্তায় স্বপ্ন-উত্থিত প্রতীকী বার্তার রূপায়ণ চলে। কবি গড়ে তোলেন প্রেমপ্রতিমা। থাকে গল্পকথন। এক্ষেত্রে আবহে যুক্ত হয় কামের ঐন্দ্রজালিক আস্বাদ। কবির রূপান্তরিত আবেগসত্তায় প্রেমবোধের চূড়ান্ত মাত্রা স্পর্শ করলে যথারীতি তা নৈর্ব্যক্তিক-নিস্পৃহতা লাভ করে। চঞ্চল

আশরাফ কাব্যে প্রেমকে স্বীকার করেন এমন আকরণে। এছাড়া তাঁর মৃত্তিকা-বৃক্ষ-পাতায় প্রত্ন-অস্তিত্বের শেকড়বিন্দুর পর্যবেক্ষণও উৎসারিত আন্তর চেতনা থেকে :

আর তোমার শাড়ির প্যাঁচ খুলতে-খুলতে মেঘ
আরও ঘন হয়ে আসে, বেড়ে যায় বাতাসের গতি। টের পাই
স্মৃতির শেকল পেঁচিয়ে ধরেছে এই দেহ, শৃঙ্গারের গন্ধে জড়িয়ে...

এসবে কবি প্রাণায়িত ও পরিশীলিত পথটি আবিষ্কার করেন কথকতার রীতিতে। বস্তুভাবনা বা মননমাত্রাটি তীক্ষ্ণতর; কিন্তু সৃষ্টির সংগুপ্ত ব্যঞ্জনা কিছুতেই তিরোহিত হয় না। ফলে কাব্য আকর্ষণ থাকে অটুট। চঞ্চল আশরাফ সে কারণেই সম্মুখগামী। তাঁর কাব্য : *চোখ নেই দৃশ্য নেই* (১৯৯৩), *অসমাপ্ত শিরদাঁড়া* (১৯৯৬), *ও-মুদ্রা রহস্যে মেশে* (২০০২), *গোপনতাকামী আগুনের প্রকাশ্য রেখাগুলো* (২০০৮)। **টোকন ঠাকুর** (জ. ১৯৬৯) কয়েকটি কাব্যে টোকন ঠাকুর নিজেকে যুক্ত করেছেন; 'ঘোড়া', 'পথ'—এমনসব বোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ফলশ্রুতিতে তাঁর সত্তাটি পরিণত হয়েছে শৈল্পিক নিস্পৃহতায়। এমন প্রকৃত সত্তার ভেতরে স্ফুরিত সংগুপ্ত ব্যঞ্জনায় প্রাণ পায় অন্তর আকরণের যাবতীয় উপাদানগুচ্ছ। 'রৌদ্র', 'বেলেহাঁস', 'ধান', 'আকাশ', 'বৃক্ষ' প্রাণায়ন অর্জন করে। ধ্বনি উৎস থেকে বিস্তৃতি পায়—এমন সব আবহে। টোকনের ছন্দ উঠে আসে ক্যাজুয়ালি, নানা পর্বে আর ঐতিহ্যিক স্বরটি অবচেতনায় স্বপ্ন-উত্থিত; আদিম প্রকৃতির উপলব্ধিতে বাঙময়। নব্বুইয়ের অন্যতম এ কবি তার নন্দনভূমে ইতিমধ্যেই বিশ্বস্ত এবং উপযুক্ত শর্তে পেয়েছেন স্থিরতা। তবে প্রকৃত ছন্দে তাঁর মরমী ধ্যান হয়ে ওঠে মায়াবী; দূরসঞ্চারী। কবির কাব্য *অন্তরনগর ট্রেন ও অন্যান্য যাত্রী* (১৯৯৭), *দূরসম্পর্কের মেঘ* (১৯৯৯), *আয়ুর সিংহাসন* (২০০০), *কবিতা কুটিরশিল্প* (২০০১), *ঝাঁ ঝাঁ ঝিঁ ঝিঁ* (২০০৩) প্রভৃতি। **রহমান হেনরী** (জ. ১৯৭০) পরিশ্রমী কবি। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর লিখেছেন। ভূমি-মাটি-মানুষের শেকড় সংবাদ শিল্পিত প্রকাশিত তাঁর কবিতায়। গতিসৌন্দর্য রক্ষিত হয় ছন্দে। শামসুর রাহমানের 'বোতো ঘোড়া'র মতো তাঁর আরও অধিক কল্পাভিসারী, অধিক ইতিহাসগ্রাহ্য 'দুধশাদা ঘোড়া' সমকালচিহ্নিত হয়ে ওঠে। ঘোড়ার কল্পপ্রতিমায় গড়ে ওঠে তীব্র অনুভূতির পেখম মেলা উৎসব। সেখানে সামন্ত (feudal) চিন্তাসকল অবক্ষয়িত হয়ে কল্পনায় পাড়ি দেয় অবদমিত যৌনরতির চূর্ণীকৃত পথে। তাতে কাঙ্ক্ষিত প্রেম নুয়ে পড়ে 'শ্রীচণ্ডীর মাঠে'। তাতে কবিপ্রস্তুতিও অনেককালের পদচিহ্নিত মানবেতিহাসের ভেতর দিয়ে :

সকাল, দুপুর, রাত্রিকাল—ভেঙে যাচ্ছে পাখিদের
নিভৃত সংসার... ঘুঘুদের, বুলবুলির, ডাহুকের গ্রামে

লেপ্টেযাচ্ছে খাঁ খাঁ শূন্যতার মোম—ঘোড়ার খুরের শব্দে স্বপ্নবনে
আজন্মার গ্রাস;

কিংবা,

আর আজ—জুয়ার বাজিতে হেরে, পানপাত্র ভেঙে, টলতে টলতে
হেঁটে যাচ্ছি সংকীর্ণ গলির সেই কাফন-মোড়ানো অন্ধকার—
অথচ আশ্চর্য যে, তেমন ঘোড়ার জিন আমি কিন্তু বহুবার
স্বপ্নে নয়—বাস্তবে ছুঁয়েছি।

যাবতীয় ঐশ্বর্য নিয়ে প্রেম-নারী-পৌরুষ আত্মা কাম্য জগৎ পেয়ে যায়। মনসা, বেহুলা, গাভী, উর্বর ভূমি সুখজাগানিয়া-স্বপ্নজাগানিয়া অনুভূতি সৃষ্টি করে, অবচেতনে তা পৌঁছায় রতিদহনে। প্রত্ন-চিন্তায় বাসনার স্বরে অবদমনের উপলক্ষ্য—মন্দির, কুমকুম ঠোঁট, আঁচল, মাঠভরা বর্ষা, ফর্সা উরু– প্রত্যাবর্তনের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রজাতিচেতনায় (phylogenic) ফেরার আকুতি প্রকাশিত। রহমান হেনরীর উপর্যুক্ত 'ঘোড়া'ও যৌনতার আবেশে মুগ্ধকাতর।

সমকালীন প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর লেখায়। 'চা-খানার গণতন্ত্র', প্রেসনোট', 'ইউনিয়ন সরকার সমীপেষু' প্রভৃতি। বিদ্রূপবিভায় এসব কবিতা দ্যুতিময়। তবে স্বভাবে হেনরী ঐতিহ্যপ্রবণ এবং প্রত্ন-অনুসারী। পাঠঋদ্ধ অভিজ্ঞতায় কবির কাব্য সমকাল ছুঁয়ে পাড়ি দেয় বহুদূরপ্রান্ত। দূরপথে কবি দ্রুত গড়ে নেন ইচ্ছে-অনুবর্তী প্রেমঅভিজ্ঞান। জীবনানন্দ দাশের আনুকূল্য নিয়েও তিনি সমকালগুণে স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠেন। একই সঙ্গে শক্তিশালীও। কবির কাব্যগ্রন্থ : *বিষাদের চন্দ্রবন* (১৯৯৮), *বনভোজনের মতো অন্ধকার* (১৯৯৯), *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা* (১৯৯৯), *প্রকৃত সারস উড়ে যায়* (২০০০), *সার্কাসমুখরিত গ্রাম* (২০০১), *গীতঅনার্য* (২০০২), *অন্ধকারবেলা* (২০০০), *খুনঝরা নদী* (২০০৫), *তোমাকে বাসনা করি* (২০০৫), *গোত্রভূমিকাহীন* (২০০৮), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০৮)।
মজনু শাহ (জ. ১৯৭০) মজনু শাহর প্রকরণের পর্যবেক্ষণে দ্যুতিময়তা পরিলক্ষিত। সনেটের পুনর্নির্মাণে কবিতাগন্ধের স্বাদ থাকে অটুট। বাংলাদেশের কবিতায় এ প্রবণতাটিতে মজনু শাহ বেশ স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে উঠেছেন। তবে প্রবণতা যেমনটিই হোক পুঁজির প্রকোপে দুর্বিষহ ও অলজ্ঘনীয় বন্দি জীবন তাঁর উচ্চারণে স্থিতি পায়। তুমুলভাবে গদ্যছন্দের ব্যবহারও সেখানে পরিলক্ষিত। বস্তুত জীবনের প্রণোদনাকে বুদ্ধির তীক্ষ্মতায় তিনি দিয়েছেন দীপ্তি। 'আমাদের যাবতীয় শিক্ষা— ঘোড়ার লিঙ্গের মতো কালচে লাল, দীর্ঘ ও অনুশোচনাহীন। এই আস্তাবলের যিনি প্রভু, তার সমাধিচিহ্ন আজ মুছে গেছে বহুস্তর পাতার আড়ালে।' প্রত্নদৃষ্টিটি একদিকে যেমন

সাময়িক সমগ্রতার সান্নিধ্য পায় অন্যদিকে তেমনি হয়ে ওঠে রূঢ় ও কর্কশসত্য। প্যাসেজে ‘সময় নেই, সময় নেই পা চালাও হাঁদা কোথাকার’ তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বপ্রবাহে বিকৃত ব্যক্তিসর্বস্ব মানুষটির চিৎকারে হয়ে ওঠে যাবতীয়। এখানে প্রকরণ নাট্যকথন ও চরিত্রনির্ভর। নব্বুইয়ে অনেকের মধ্যে এমনটি থাকলেও মজনু শাহ পরিশুদ্ধ এবং উদ্যোগের পথিক। তাঁর কবিতাগ্রন্থ : *আনকা মেঘের জীবনী* (১৯৯৯), *লীলাচূর্ণ* (২০০৫), *মধু ও মসলার বনে*। **খলিল মজিদ** (জ. ১৯৭০) *পালকাপ্য* (২০০০) খলিল মজিদের কাব্যগ্রন্থ। পুরাণকে গ্রথিত করেন প্রশিক্ষিত জ্ঞানে। এ কাব্যে কিছু দীর্ঘকবিতা আছে; যেন মহাকাব্যের প্রকরণটির প্রয়োজন মনে হয়েছে, তাঁর নিকট। তবে কবির প্রত্নচোখের প্রশংসা না করে পারা যায় না। সভ্যতা বিকাশে, বাণিজ্য বহরে হস্তির প্রয়োজন তো এককালে ছিলোই। সুতরাং ‘পালকাপ্য বাঙলার সেই মুনি যিনি হস্তিকে প্রথম বশ মানিয়েছিলেন’ তার পুনর্নির্মাণ কবিদৃষ্টিতে বাঙময় তো হতেই পারে। কিন্তু একটু বাড়তি এ কাব্যে যে বোধটুকু ‘গজদন্ত মিনার’ তৈরি করেনি। হয়েছে একটি ইমেজ; যা কাব্যে প্রভূতরূপে প্রকাশিত। এক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই প্রভাবিত; তবে তা যেন নিজস্বতা না হারায়, সে সতর্কতাটুকু থাকা চাই। **আলফ্রেড খোকন** (জ. ১৯৭১) আলফ্রেড খোকন দার্শনিক কবির প্রত্যয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পরিবেশনার ভঙ্গিটিও স্বতন্ত্র। তাঁর কবিবাণী ‘প্যাসেজ’ হয়ে ওঠে। প্রধানত বৈশ্বিক বাস্তবতার অনেকরকম তাণ্ডবে বিচ্ছুরিত ধ্বনিস্রোতে তৈরি হয় বেদনা-বিরহ-অচরিতার্থতা। তাঁর শিরোনামহীন স্থাপনা তৈরি করে নিরবচ্ছিন্নতা। প্রেমের অচরিতার্থতার গানে নতুন জীবনের আভাসের ইঙ্গিত মেলে :

> এই যে এখানে বসি—আলোড়ন থেকে রোজ একা,
> কেবল তোমাকে ছাড়া পৌরজ্যোৎস্নায় অভিমান লেখা।

এক পর্যায়ে আধুনিক ধারণাসমূহ নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতা দিয়েই চলমান জীবনের উপসর্গ তৈরি করে। বিশ শতকী আত্মমগ্নতার সমাজ-নিরপেক্ষ শিল্পে এ প্রবণতায় র‍্যাবো কিংবা ক্যামু-কাফকা তিরোহিত নন। এখানেও প্রণয়কাতরতা কিংবা অভিমানের রূপটি আলফ্রেড খোকন কালের মাত্রায় দ্যুতিময় করে তুলেছেন :

> বরং দূরত্বকে ভালোবেসে আরও আধঘণ্টা থাকি
> নিকট আত্মীয় বলে কেউ নেই, সন্ধ্যারা প্রতীকী

এর মধ্যেই কবির নৈর্বক্তিক সুরটি তন্ময় কৃতার্থতায় উচ্চারণ করেন। তবে কবিচৈতন্যের এমন প্রবাহে এগুচ্ছে। আলফ্রেড খোকন এ পর্যায়টি চর্চার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর কাব্য : *বেঁধে যাই পরস্পর গেঁথে যাই পরস্পর* (১৯৯৭), *উড়ে যাচ্ছ মেঘ* (১৯৯৯), *সম্ভাব্য রোদ্দুরে* (২০০২), *ফাল্গুনের ঘটনাবলী* (২০০৬), *মধু বৃক্ষ প্রতারণা বিষ* (২০০৭), *সে কোথাও নেই* (২০০৮)। **শামীম**

রেজা (জ. ১৯৭১) নব্বইয়ের অন্যদের চেয়ে আলাদা চরণে বিন্যস্ত। ভাষায় তিনি পৃথক। অপিনিহিতির ধ্বনিতে কবিতার প্রাচুর্যতা কাব্যবিভায় পুলকিত। দুর্মরভাবে ভাষাকে অর্থদ্যোতক করে তুলতে সামর্থ্য তিনি। তবে ভাষাটি যে ভাবনায় পুনর্গঠিত তা অসম্ভব স্মৃতিগন্ধা। মনোচেতনায় প্রেম বেশ সারবত্তাসম্পন্ন। জীবনের বহু প্রান্ত তা স্পর্শ করে। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা ও কাব্যনাট্যে যে প্রত্নমিথটি শিল্পিতভাবে ধরা পড়ে সে ধারাটি তিনি ভিন্ন ও নবমাত্রায় সজ্জিত করেন কবিতায় :

> আহারে! দোয়েলা, রাত্তির আমার, একলা পরাণ! কার
> ভিডায় কান্দো নরমকণ্ঠী পাখি, কার প্রশ্রয়ে ভিজাও মন,
> কার ঠোঁটে কাঁপে অনুভূতির প্রথম চুম্বন, কোথায় তোর
> বাউড়িয়া গাঁ, খাডালের ছিট ছিট জ্যোৎস্না-রৌদ্রে কীরহম
> তোর চলাফেরা মনে পড়ে, মনে পড়ে না?

এমন রীতি আরও প্রগাঢ় এবং ক্রমপরিমার্জিত হয়ে নির্মিত হতে দেখা যায় *হৃদয়লিপিতে*। পথের বাঁকে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চয়, চেতনার স্বঅভিমুখী সঞ্চরণ এ পর্যায়ের কবিতার পথ খুলে দিয়ে উপর্যুক্ত উপস্থাপনায় করে তোলেন ললিতশোভন :

> বেহেশত দোজখের মাঝ সীমান্তে যে ধূ-ধূ পথ
> কল্প এই পথে তুমি দেবযানী, খুঁজে ফের ছড়ি
> ছায়াপথে রাতদিন, ঢেউ তুলে হৃদয়ের হ্রদ
> হ্রদে, নীলভোর নামে, পাশে তুমি একাকিনী নারী।

পরিবর্তনটি চোখে পড়ে, ভাষার ক্ষেত্রটি সময়ের অনুবর্তনে বাঁধা, প্রেমও পূর্বোক্ত মিথ-প্রত্ন পরিসীমা থেকে বেরিয়ে হয়ে উঠেছে আধুনিকপ্রবণ, মিথসমূহও রঙ পাল্টিয়েছে, ভাষায় এসেছে বুদ্ধির সংশ্লেষ। শামীম রেজা মুখ্যত প্রেমপ্রবণ। কিন্তু সে প্রেম নাগরিক যতোটা তার চেয়ে অধিক পুরাণ-ঐতিহ্যাভিসারি। লোকঅনুসৃতও প্রভূতমাত্রায়। সেখানে অবচেতন মনঃসমীক্ষায় টোটেম-ট্যাবু বা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপাদান মিথস্ক্রিয়ইক পাঠঅভিজ্ঞতায় সত্তাজাত। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্য : *পাথরচিত্রে নদীকথা* (২০০১), *নালন্দা দূরবিশ্বের মেয়ে* (২০০৪), *যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণ নগরে* (২০০৫), *ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল* (২০০৯), *হৃদয়লিপি* (২০১৪)। **কাজল কানন** (জ. ১৯৭১) স্বাপ্নিক কবি কিন্তু তাতে দিব্যদৃষ্টির তৃপ্তি কম। কারণ, পরিচর্যা ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সম্ভাব্যতার আয়োজনটি হয়ে পড়ে অনাহূত। তবে উপ্ত উপলব্ধির বার্তা অনিন্দ্যসুন্দর। কবি-অভিজ্ঞতায় জীবনের বিপন্নতা বা পরাজয় নিসর্গের পরিবৃত্তে সম্মুখগামী হলে পেয়ে বসে মধ্যবিত্ত কাতরতা। কিছু বিন্যাসগত স্থূলত্ব ব্যতিরেকে ঐতিহ্য বা

ইতিহাসগত স্থিতি কবিতায় বেশ আকর্ষণীয়। ভালো লাগে 'অজস্র পাখি', 'ইচ্ছামৃত্যুর নন্দন' এসবের বিবৃতি। কবিতায় কবি নিজের মতোই নিরঙ্কুশ। সেজন্য তাঁর প্রশ্ন যেমন আছে তেমনি উত্তরও। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *মাটির মড়মড়* (২০০১), *পইখ উড়ে যাও* (২০০৭)। **সৈকত হাবিব** (জ. ১৯৭২) *শহর যৌবন ও রাত্রি* (২০০৪) নিয়ে প্রচুর স্মৃতির মুগ্ধতায় উৎকর্ণ। প্রগল্‌ভ অনুভূতি, কাঁচা কণ্ঠের কচি অনুভব তাঁর। অনেকটা 'ইমোটিভ' প্রবণতায় কল্পোক্তির প্রসার। সেখানেই বহুমুখি প্রাচুর্যের সমাহার। গড়ে তোলে ইমেজসমূহ জীবনের তুচ্ছ উপভোগ আর স্বপ্নপ্রতিমার দরোজায় অবচেতন আলোর ঘুলঘুলি। উদ্ধৃতি : 'প্রগাঢ়তা দেয় এই রাত্রি, দেয়/ প্রগাঢ় পিপাসা/ প্রগাঢ় শূন্যতা/ স্বপ্নের দরোজা'। এই স্বপ্নভুক মনঃসমীক্ষার ভেতরের 'ইগো'তে চাহিদামাফিক বৃহৎ মায়ের প্রত্নমুখ সৃজিত হয়, কল্যাণ আর মঙ্গলের বিস্তৃতিতে। তবে প্রধানত নস্ট্যালজিক পুরাণবৃত্তিই তার পরতকথা। তাঁর অন্য কাব্য : *আমরা কেবলই চায়ের টেবিলে ঝড়* (২০০৭), *যন্ত্রহ্রেষা* (২০১৩)। ক্রমরূপান্তর ও চিরনতুনের হাওয়ার তার অনুভব আরও গভীর কিন্তু তার ঘনানো রূপ এখনও অনতিক্রান্ত। **ওবায়েদ আকাশ** (জ. ১৯৭৩) 'বালিকার প্রাচীন অসুখ' কিংবা 'প্রশ্নোত্তর পর্ব'টিতে নিজেকে সামূহিক সত্তার চেতন-অবচেতনে 'রক্তের রঙধনুকে' সংজ্ঞায়িত করতে পারেন ছন্দের অনুপম শৈলিতে। তাঁর চিত্রকল্প বৈচিত্র্যময়, গভীর—যেখানে শ্রেণিচরিত্রের শোষণ বা তার দ্বান্দ্বিক রূপটি পরোক্ষ প্রতাপে রূপায়িত। 'জাতিসংঘ' ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ছড়ায় শিল্পকর্মে। ওবায়েদ আকাশ যেমন সমাজ-অভিজ্ঞতায় কর্কশ চিত্ররূপ অঙ্কন করেন তেমনি সমাজনিরপেক্ষ অবচেতনের আদর্শকে অন্বিত করেন। কিন্তু কবিতার অলৌকিক আনন্দ দূরায়ত থাকে না :

> পাখির চোখে চোখ রেখে
> বিস্তৃত হাওড়ের কথা ভাবো
> ব্যাপক বর্ষায় কিংবা অভাব্য খরতায় তারা
> কতটা যাযাবর হয়ে যায়।

'শীত' বিভিন্নরূপে কবিতায় এসেছে। নানা তাৎপর্য তার। এখানে 'শীতের পাখি' মুক্ত প্রাণের বার্তা বহন করলেও স্মৃতিমুগ্ধতার বহুস্তরীভূত অবচেতন আরাধ্যে এক অন্তশ্চরিত্র (inner figure) তৈরি করেছে। এরকম কবিতাভাবনার চিত্ররূপে ওবায়েদ আকাশ স্বল্পতম ব্যবধানে রচনা করেন *পতন গুঞ্জনে ভাসে খরস্রোতা চাঁদ* (২০০১), *নাশতার টেবিলে প্রজাপতিগণ* (২০০৩), *দূরারোগ্য বাড়ি* (২০০৪), *কুয়াশা উড়ালো যারা* (২০০৫), *তারপরে, তারকার হাসি* (২০০৭), *শীতের প্রকার* (২০০৮), *যা কিছু সবুজ সংকেতময়* (২০১০), *প্রিয় কবিদের রন্ধনশালায়* (২০১১), *রঙ করা দুঃখের তাঁবু* (২০১২) কাব্যগ্রন্থ। তাঁর নির্বাচিত কবিতা : উদ্ধারকৃত

মুখমণ্ডল। **মোস্তাক আহমাদ দীন** (জ. ১৯৭৪) ছোটকাগজের কবি ও কর্মী। কবিতায় আত্মনিবেদিত। আনন্দময়ীর উপভোগ অস্তিত্বজুড়ে। অভিজ্ঞতায় মূলীভূত তাঁর লোকউপকরণ-গুচ্ছ। সেখানেই প্রত্নচোখ তৈরি। তাতে প্রোথিত পৌরাণিক প্রসঙ্গও। পুরাণের এমন ব্যবহার প্রাচ্যসন্ধানীরূপে। নাগরিক মধ্যবিত্ত চেতনা থাকলেও বাঙালির লোকায়ত ঐতিহ্য আর শাশ্বত সন্দর্শন কিছুতেই মলিন হয় না পটচিত্রে। তাঁর অনুভবের প্রতিপাদ্য 'খোয়াজখিজিরের গলা', 'ঘুঙুরপরা সাতপরী', 'জিনগ্রস্ত অসংখ্য যুবতী'তে। এমনসব শব্দবন্ধ টুকরো স্মৃতি বা চেতন-অবচেতন পরিক্রমায় নির্মিত :

> ভিখিরিও রাজস্থানে যায়!
>
> আমি সেই ভিখিরির মাতা ছুঁয়ে বুঝি
> আমার ভূতের হাত ধীরে পৌঁছে গেছে
> শীতকুয়াশার ঘন-হয়ে-যাওয়া নির্জন রাতের কোনো মাঠে,

আমি এখানে সত্তা-উত্তরিত বোধ, এক বিপুল পরিবেশে সে পরিবর্তিত হয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করে কিন্তু তার পরিবর্তন শ্রেয়োতর হয়ে হয়ে অনেক প্রতিকূল উপাদানের ভেতর দিয়ে। অধিকতর আড়ম্বর নেই মোস্তাকের কবিতায়, পরিমিত মননের মুকুরে ক্রমশ তিনি অধিকার করেন নির্বিবাদী জ্যোতির্ময় ভুবন। এ রকম আরেকটি উদ্ধৃতির মাত্রা :

> পঞ্চাশ বছরে নয়, চল্লিশের আগেই দেখো বাণপ্রস্থে চলে গেছি আমি–
> নির্বান্ধব, অরিন জঙ্গলে। ধূসর হাতির পাল ঘিরে রেখেছে আমাকে।
> চারিদিকে বিষম নির্জন। চল্লিশ বছরও বুঝি এখন সুদূর?

এরকম পরিবর্তনের ভেতরে আলাদা হন কবি, ক্রমশ ছাড়িয়ে নেন মুখোশ ও ফ্যাকাশে জীবনের কৃত্রিম তুচ্ছতা। কিন্তু নির্মিত চেতনাকে ঘিরে যে পরিবেশ সৃজন করেন কবি তা প্রত্নদৃষ্টিতে ঘেরা : 'অরিন জঙ্গল', 'হাতির পাল', কিংবা 'নির্জন রাতের মাঠ' অনবদ্য। হয়তো পূর্বসূরিদের প্রভাব আছে কিন্তু নিজস্ব মন্থনটুকু অকিঞ্চিৎকর নয়। নব্বুইয়ের কবিদের জ্যোতির্ময় সত্তার বহমান রূপটি মোস্তাক আহমাদ দীন নিবিড় অনুভবে ধারণ করেও ক্রমেই হতেছেন আলাদা, সেটি শেষ কাব্যেও স্পষ্ট। ঐতিহ্যের নন্দনগাথায় স্পন্দিত এ কবির কাব্য *কথা ও হাড়ের বেদনা* (২০০১), *জল ও ত্রিকালদর্শী* (২০০৫), *জল ও শ্রীমতী* (২০০৯), *ভিখিরিও রাজস্থানে যায়* (২০১০), *বানপ্রস্থের আগে* (২০১৪) ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাস

সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং তৎসৃষ্ট পূর্ব-বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জনজীবনের সাহিত্য দুর্যোগ ও প্রহেলিকাময়। নতুন অভিপ্রায় নিয়ে 'পরিচিতি'র স্বরে পেখম মেলে, কম্পিত পদপাতে। এবং অবশ্যই তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিরোধের মুখে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাড়াও এ সময়ে অনেকেই উপন্যাস লেখেন। ১৯২৬ এ প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখক ও চিন্তককুল 'কেউই স্বসমাজের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভ করেননি। এর কারণ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ এ-সময়ে শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এমন এক স্তরে অবস্থান করছিল যে, তাদের পক্ষে শিল্প-সাহিত্যের মতো সূক্ষ্ম জিনিস উপভোগ করা সম্ভব ছিল না।' এছাড়া আরও বলা চলে, 'তিরিশের দশকের ক্ষয়, শূন্যতা, ঘৃণ, চল্লিশের দশকের বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন, ও সংগ্রাম, মানুষ জাতির জন্য স্তালিনের রাশিয়ার বিরাট অর্জন এসব নিয়ে তো লেখা হয়ে গেছে। তারপরে 'বিজয় শব্দে নয়, গোঙানির আওয়াজ' করে এসেছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা। ... ম্যাড়মেড়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আলো কুষ্ঠের ক্ষতের উপরে খেলা করেছে।' (হাসান আজিজুল হক) বিশ্ববাস্তবতা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, দ্বিজাতিতত্ত্বের সূত্র, ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশের ভূগোল-কাঠামোয় পরিবর্তন আনে। 'অবাস্তব এ বাস্তবতা'য় বঙ্গীয় অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান মনস্তত্ত্ব জটিল হয়। আবাল্যের আবাসভূমির বদল, অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে এ জনগোষ্ঠী। কলকাতায় যাঁরা চাকরি বা অন্য কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা ঢাকায় চলে এলেন। অসংখ্য হিন্দু চাকরি-ব্যবসা-ভিটে ছেড়ে চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে, প্রধান কারণ তাঁর হিন্দু। শুধু শিক্ষিত বা মধ্যবিত্ত বলে নয়, সর্বস্তরের মানুষেরই ধর্মানুগত্যের ধারায় এমন বাস্তবতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। যেমনটাই হোক, 'বাঙালি মুসলমান' অভিধাটি এতে পরিস্কার হয়। পূর্ব-বাংলার ভৌগোলিক অংশে, নিজের দেশ-পরিবেশ-প্রকৃতি-সংস্কৃতি নিজের মনে করে। মুসলমান হলেও, পীর-মুর্শিদ-বাউল লালন-হাসন, তাঁরা শ্রেণি-জাত-ধর্মের বাইরে, হাজার বছর ধরে খুঁজেছে 'মনের মানুষ', প্রেম ও মানবিকতাকে। একই সঙ্গে মানুষের মর্যাদায়, বৈষম্য-বিভেদ নয়,

ঐক্য; অসাম্প্রদায়িকতা, সমন্বয়ি ভাবধারা—এ ভূখণ্ডে সাধারণ যাচাই ও মীমাংসার মধ্যে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ আলাদা অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ জাতি-সংস্কৃতি পরীক্ষায় প্রজ্বল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। বাংলাভাষা ও বাঙালিত্বের অস্তিত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে শানিয়ে নেয়। এর ভেতরেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাও তৈরি হতে থাকে। অবাঙালি ও উর্দুভাষী মুসলমান আর বাঙালি বাংলাভাষী মুসলমান এক নয়, ঐতিহ্যে-সংস্কৃতিতে আলাদা। শুধু ধর্মের মিল দিয়ে সবকিছুকে এক করা যায় না। যেমনটা যায়নি ইরানে, মিশরে, সিরিয়াসহ নানা মুসলিম রাষ্ট্রে। সে প্রসঙ্গ যেমনই হোক, পরিস্কার হয়ে যাওয়া বাঙালি পরিচয় ধর্মের জিগিরে রাষ্ট্রের একাধিপত্যে পড়ে। ক্রমশ আর্থ-রাজনীতির বিষয়গুলো সামনে আসে, ঐ প্রতিরোধী মনস্তত্ত্বে। এসবের ভেতরে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত তৈরি হয়, ঢাকাকেন্দ্রিক পাঠচক্রে। শহরবাসী অনেকেই, কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে। নগর জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ-আশা-নৈরাশ্য শহর ঢাকাকে ঘিরেই। কলকাতাফেরত লেখকরাও মেলালেন, ঢাকার সাহিত্যে। ভৌগোলিক বৃত্তে ঢাকার বৃদ্ধি চতুর্দিকে, সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সর্বাত্মক। উঠতি মধ্যবিত্ত আন্দোলন-সংগ্রামের শরীক। যেটার শুরু ঐ ভাষা আন্দোলনে। এরপর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫), সামরিক শাসন-বিরোধী তৎপরতাসহ ক্রমান্বয়ে পূর্ণরূপ পাওয়া। এ প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের নেতৃত্বও থাকে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই।

সাতচল্লিশ-পূর্বেই উপন্যাস লেখা শুরু, পূর্ব-বাংলার লেখকদের হাতে। চল্লিশ থেকেই। গোটা ভারতবর্ষে মুসলমানরা সাধারণত নেতৃত্বহীন ছিল। এক সময় 'মুসলীমলীগ' গঠন হলেও সাতচল্লিশ পর্যন্ত কোনো বাঙালি মুসলমান নেতৃত্ব তৈরি হয়নি। সেটা সম্ভবও ছিল না। ক্রমশ মুসলিমলীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান দাবী তৈরি হলে এর প্রতি সমর্থন পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের আগাগোড়াই বজায় ছিল। কিন্তু কল্লোল-উত্তর সাহিত্যধারায় নিজেদের যোগ করতে এ অঞ্চলের লেখকরা তেমন দ্বিধান্বিত ছিলেন না, কারণ পাকিস্তান চাওয়া যতোটা ধর্মীয় তার চেয়ে বেশি ছিল অধিকার আদায় এবং হিন্দু-আধিপত্য থেকে মুক্তি। আর নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও সেখানে ছিল। ১৯৪৭-এর পরে আবার পাঞ্জাবি-আধিপত্য আরোপ হলে, অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে–একইভাবে আন্দোলন বা মুক্তির প্রসঙ্গও ক্রমশ জোরাল হয়। যেটা বায়ান্নর থেকে ঘটেছে। কিন্তু সাহিত্য কল্লোল-উত্তর পথেই মূলধারায় যথারীতি অব্যাহত থাকে। বিভ্রান্তি এসেছে স্বার্থবুদ্ধি বা ধর্মবুদ্ধি স্বার্থে, যার নিয়ন্ত্রণ উর্দুভাষী পাঞ্জাবি শাসকের হাতে; কখনোবা সে রাষ্ট্রের এদেশীয় অনুচরদের হাতে। রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে, পাকিস্তানে ধর্মীয় আদর্শের বশবর্তী হয়ে যাঁরা পূর্ব-বাংলায় সাহিত্য করতে

চেয়েছেন বা করেছেন তাঁরা অচিরেই অবসিত হয়েছেন। কারণ, সাহিত্য মূলস্রোত হারালে বা বিভ্রান্তির জালে আটকালে তা টেকেনা। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনুবর্তী হয়ে, যে কোনো আবেগেই লেখালেখি চলুক তা অপসৃত হতে বাধ্য। বিপরীতে মূলধারায় বাংলাদেশের সাহিত্য তৈরি হয়। পূর্ব-বাংলার সাহিত্য তথা বাংলাদেশের সাহিত্য সেভাবেই চরিত্রানুগ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের উপন্যাসে সেভাবেই বুনিয়াদ গড়ে তোলেন শওকত ওসমান, আবু রুশ্‌দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু জাফর শামসুদ্‌দীন, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম প্রমুখ। এ লেখকরা বিভাগ-পূর্ব সময় থেকে কিংবা পরে উপন্যাস রচনা করেন। বাংলাদেশের উপন্যাসে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হন কয়েক দশকের শিল্পচর্চার আরাধনায়। মুক্তিযুদ্ধের পরেও দীর্ঘসময় তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন। প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের শিল্পচেতনা। তঁদের পথেই নানা সময়ে যুক্ত হয়েছে অনেক গুণী ঔপন্যাসিক, সৃজিত হয়েছে নবতর আঙ্গিক।

বাংলাদেশের উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক (১৯৪৭-১৯৭০)

পূর্ব-বাংলায় বিভাগোত্তর ঔপন্যসিকগণ বিভিন্ন চারিত্র্যের উপন্যাস রচনা করেছেন। নির্মাণ করেছেন শিল্প-নির্ধারিত ভাষাচিত্রও। বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির পরিচর্যায় তা ওই পর্যায়ে ছিল সাহসী ও নতুন দিকসঞ্চারী। একাত্তরের পরে যা বইয়ে দেয় নতুন চিন্তার প্রস্রবন। অবশ্যই বিভাগ-পরবর্তী মূলীভূত অভিজ্ঞতার এ উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের উপন্যাসের শেকড়সত্তা থেকে পরিস্রুত।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

আবুল ফজল *চৌচির* (১৯২৭) উপন্যাস নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তারপর *প্রদীপ ও পতঙ্গ* (১৯৪০), *সাহসিকা* (১৯৪৬)। মুসলিম সমাজ জীবন, প্রেম-রোমান্স-প্রণয় বিধৃত। তবে সংস্কার আড়স্ট, শরীরহীন প্রেম। তবুও 'জোহরা', 'জাফর' আধুনিকতার ঊষালগ্নে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের স্মারক। লেখকের *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮) বক্তব্য-নির্ভর উপন্যাস। ভাষা ব্যক্তিত্বনির্ভর; মধ্যবিত্ত ভাবাবেগ আচ্ছন্ন। সদ্য পূর্ব-পাকিস্তানে হেনা ও মামুনের প্রেম, ব্যক্তিত্ব, অহং বেশ মননঋদ্ধ। বাঙালি মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথা, সংস্কারচেতনার মুক্তির সঙ্গে, চরিত্রের মধ্যে একটা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যও বেশ আকর্ষণীয়। *রাঙা প্রভাত* (১৯৫৭) উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নজরে আসে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত আদর্শবাদের প্রকাশ থাকবে উপন্যাসে তা নতুন মনে হয় না। ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এ বিষয়গুলো আছে। বস্তুত বলতে

হয়, মানবতাবাদী আবুল ফজলের মানবতাবাদী উপন্যাস এটি। *পরাবর্তন* (১৯৮০) তাঁর অন্য উপন্যাস।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

বাংলদেশের উপন্যাসে শওকত ওসমান আঙ্গিকগুণেই আলাদা। বিচিত্রধর্মী উপন্যাস লিখেছেন, আরবি-ফারসি শব্দে, মুসলিম মিথকে গুরুত্ব দিয়ে, রূপক-প্রতীকের ভেতর দিয়ে। তবে চরিত্রের অন্তস্তল স্পর্শ, সামগ্রিক স্বরূপ নির্দেশ তাঁর কাহিনিতে দুর্বল, সমতলও মনে হয়। কিন্তু অনেক উপন্যাসের ভেতর দিয়ে গোড়া থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠার জায়গায় পৌঁছান। শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৬১) উপন্যাসে জননী দরিয়াবিবির সর্বংসহা মাতৃমূর্তির স্বরূপ আছে। সংসার-পলাতক, নিরুদ্দেশ স্বামী আজহার খাঁর স্থানে দারিদ্র্য-দৈন্যতার সুযোগে অনাহূত অধিকার করে ধনাঢ্য ইয়াকুব। ফলে স্খলিত জননী মর্যাদা হারায়, তাকে ছেড়ে চলে যায় সন্তান মোনাদীর আর অনাগত নিষ্পাপ সন্তানকে চরম পরাকাষ্ঠায় জন্ম দিয়ে মা হিসেবে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। উপন্যাসে মাতৃত্বকে মহীয়ান করার পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির আবহমান রূপ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকোপকে গভীর তাৎপর্যে বাঙময় করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। *জননী*র আগে লেখা হয় *বনীআদম* (১৯৪৩)। আদম সন্তানের দুঃখ-দারিদ্র্য, হারেসের স্বীকারোক্তি ও সংগ্রামে বর্ণিত। কাহিনিগ্রন্থি শিথিল; চরিত্রানুগ নয় আবহ। তবুও উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্র প্রশংসনীয়। *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) প্রতীকী উপন্যাস। আইয়ুবের বন্দিদশা থেকে পূর্ব-বাংলার জনতার মুক্তি; প্রতীক খলিফা হারুনর রশীদ এবং তার বিপরীতে তাতারীর মুক্তি। মুক্তির ভেতর দিয়ে তাতারীর প্রেম, মর্যাদা, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ সবকিছুরই প্রকাশ ঘটেছে। পাকিস্তানী শাসনামলে পূর্ব-বাংলার বাঙালি জনতার মুক্তির সঙ্গে এ বিষয়গুলোই জড়িত ছিল। শাসক হারুনর রশীদ প্রথমে অমর্যাদা তাচ্ছিল্য করেছিল তারপর অনেক সুবিধা দিয়ে তার জবানকে কিনতে চেয়েছিল; তার প্রেমিকাকে ভুলে যেতে বলেছিল কিন্তু কোনোকিছুর বিনিময়ে বা অনুরাগ-বিরহে বশবর্তী হয়ে সে কিছুই করেনি। শওকত ওসমানের এ উপন্যাসের মেসেজটিই জরুরি। উপন্যাসের কাহিনি একটা লক্ষ্যের অনুবর্তী; সেজন্য সংলাপ, ভাষা, ঐতিহ্যিক বিষয় আছে কিন্তু শেষাবধি চিত্তমুক্তির প্রবণতাটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি জনপ্রিয়তার কারণও সেখানেই নিহিত। শওকত ওসমানের *চৌরসন্ধি* (১৩৭৫)র গুরুত্ব কাল্লু চরিত্রের জন্য। রিক্সাওয়ালা থেকে চোরসম্রাট হওয়ার সংবাদ থাকলেও গ্রাম ও নগর বাস্তবতার চিত্রনে উপন্যাসের আঙ্গিক তাৎপর্যবহই বটে। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

উপন্যাস চারটি। *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *জলাঙ্গী* (১৯৭৪)। *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসে গাজী রহমান ১৯৭১-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সময়কে বলেন; কাহিনি একাত্তর-এর মধ্যে। প্রত্যক্ষ একাত্তরই কাহিনি হয়েছে। সেখানে মুক্তিযেদ্ধাদের তৎপরতা, রাজাকার নিধন; ভয়-আতঙ্কময় পরিবেশ জ্বলন্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে। *নেকড়ে অরণ্য* পাক হানাদার বাহিনির হাতে নারী-নির্যাতন ও ধর্ষণের চিত্র। ধর্মের নামে কিংবা ধর্মকে ব্যবহার করে নারী নির্যাতনের চিত্র একাত্তরে নির্মম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। উপন্যাসে তনিমা, সখিনা, আমোদিনীর মনঃকষ্ট তৈরি হয়েছে এ প্রসঙ্গে। *দুই সৈনিকের* কাহিনি মখদুম মৃধার পরিবারের। যেখানে দুই পাক-মেজর পরিবারের সমস্ত আতিথ্য নিলেও দুই মেয়ের অপহরণের বা ধর্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। পাকিস্তানে ইসলামের নামে গণহত্যা, অপহরণ, নির্যাতনের দুর্বিষহ ছবি দুই সৈনিক। ছোট্ট পরিসরে লেখক পাকসৈন্যদের প্রবৃত্তি ও লালসার স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। যেখানে ধর্মাচার বা মানবিকতা শুধুই হাস্যকর একটি বিষয় মাত্র। *জলাঙ্গী* বাঁকাজোল গ্রামের জমিরালি; তার মুক্তিযুদ্ধে যাত্রা, শত্রুমুক্তির স্বপ্ন, রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিশোধ প্রচেষ্টা নিয়ে উপন্যাসের প্লট নির্মিত। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জমিরালির পূর্ণাঙ্গ রূপটি এখানে অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন লেখক। *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩) সমাজ সংগ্রামী, প্রতিরোধাত্মক, জীবনভাবনামূলক উপন্যাস। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অদম্য গফুর। সুবিধাবাদ বা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরিশ্রমী কৃষি জীবনকেই উপন্যাসে প্রতীকী করে তোলা হয়েছে। *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০) রূপকের আদলে শোষক ও ক্ষমতালিপ্সু জাহুক আর যোগসাজশ বা দালালের প্রতীক হিসেবে দারিয়ুস, জার্জিসকে উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন। শাহনামাকে মূল কাহিনি ধরে কাল্পনিক ছায়াবৃত্তে রাজা জাহুকের উপাখ্যান রচিত। *সমাগম* (১৯৬৭) শওকত ওসমানের বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস। *আর্তনাদ* (১৯৮৫)-এর পূর্বকথায় শওকত ওসমান বলেছেন, 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত *আর্তনাদ* উপন্যাসে ব্যাকরণ অনেক সময় অবহেলিত।' কারণ, কাহিনির গতানুগতিক বিভক্তি-বিভাজন-উদ্দেশ্য নেই। দেশভাগ, দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলনের কার্যকারণ মূল্যায়ন আছে উপন্যাসে। *রাজসাক্ষী* (১৯৮৫) রাজনৈতিক চেতনাধর্মী উপন্যাস। সবুরনই রাজসাক্ষী। একদিকে সে নিজের সংগ্রামী জীবনের সাক্ষী অন্যদিকে আদালতে কুচরিত্র কাজী আলামিনের মুখোশ উন্মোচনকারী রাজসাক্ষী। উপন্যাটিতে শওকত ওসমানের মুন্সিয়ানা বেশ রসগ্রাহী। *পিতৃপুরুষের পাপ* (১৯৮৬) পিতা জব্বার হাওলাদার মেয়ে লালবানুকে পুঁজি করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিনব কাহিনি। মেয়ের প্রতি পিতার হঠকারিতা, বিশ্বসঘাতকতা

প্রকাশ হলে তা তো পিতৃপুরুষেরই পাপ; সন্দেহ কি! কিশোর উপন্যাস *তারা দুইজন* (১৯৫৮), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *জুজগগা* (১৯৮৮)।

আবু রুশ্‌দ (১৯১৯-২০১০)

এলোমেলো (১৩৫৩)র সাজ্জাদ প্রসঙ্গে বলেন কাহিনিকার 'সাজ্জাদ একদিন বিকেলে একা বেড়াতে বের হয়, গড়ের মাঠের দিকে, হেঁটে', 'সুফিয়া চলে গেলে সাজ্জাদ নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সাজ্জাদ এ-পর্যন্ত কখনও কাঁদেনি'—এরকমভাবে নগর পরিবৃত্তে মধ্যবিত্ত পূর্ণাঙ্গ প্রবণতায়, আধুনিক স্বচ্ছরীতিতে আবু রুশ্‌দ-এর উপন্যাস থেকেই এলো। ঐ গোড়ায়, কেন্দ্রে বিভাগ-পরবর্তীকালে, নিরঙ্কুশরূপে। তাঁর *সামনে নূতন দিন* (১৯৫৬); বিভাগোত্তর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব অর্জন করে—সরলভাবে রচিত কাহিনি ও নির্বাচিত ভাষাশৈলি সৃষ্টির গুণে। হায়দার কৈশোর থেকে (উপন্যাসের শুরু ১৯১৯ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(?) শেষ অবধি) যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বশীল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষণীয়। ১৯১৯ কালপরিসরে উপন্যাস শুরু হলেও নিছক একটি পরিবারের সংশ্লিষ্টতায় সম্পূর্ণ ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে। লেখক কথনভঙ্গিতে শফিকুর রহমান সাহেবের পরিবারের ভেতর দিয়ে নিজেরই স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। কলকাতা, লালমনিরহাট, কাঁথি, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ চাকরিসূত্রে বদলি পরিক্রমায় পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের চালচিত্র রচিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত নগর জীবনের ভাষ্যকার হিসেবেই আবু রুশদ-এর প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সামনে নূতন দিন* এমন বিষয়কে অবলম্বন করেই যাত্রা করেছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাঁর এ উপন্যাসে আসেনি। মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান চরিত্র আলতাফ, আলতাফের বাবা অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার, ছোট ভাই ফরিদ অনার্স পাঠরত, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বোন শফিকা এবং গৃহিনী মা'কে নিয়ে *ডোবা হল দীঘি*—র কাহিনির সূত্রপাত। *ডোবা হল দীঘি* (১৯৬০) উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হিসেবে আলতাফকে তুলে এনে লেখক সাতচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ সময়ে পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সংস্থান, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি জটিলতা এসব বিবৃত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। *অনিশ্চিত রাগিণী* (১৯৬৯) উপন্যাসে কোনো অধ্যায় বিভাজন নেই, একটি একান্নবর্তী পরিবারের নিরন্তর বয়ে চলা এর কাহিনি, কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন কফিল সাহেব। কফিল সাহেবের চিন্তা-চৈতন্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আশাভঙ্গ কাহিনিকে নির্মিতি দিয়েছে। কফিল সাহেবের প্রবৃত্তি-প্রবণতা উপস্থাপন করতে গিয়েই উপন্যাসটিতে অন্যান্য চরিত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মুসলিম মধ্যবিত্ত চরিত্র হিসেবে পূর্ব বাংলায় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া-না-পাওয়া, অস্তিত্বের টানাপড়েন, হৃদয়ের

শূন্যতা উচ্ছ্বাস প্রত্যেকটি ব্যাপারই কফিল সাহেবের অস্তিত্ব প্রবণতা থেকে বর্ণিত। *সামনে নতুন দিন* থেকে আবু রুশদ-এর ক্রম-উত্তরণের পর্বটির পরিচয়ও এক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে না। *নোঙর* (১৯৬৩) বিভাগোত্তর সময়ের পটে লেখা মূল্যবান উপন্যাস। পাকিস্তানের স্বপ্নভঙ্গ, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত অস্তিত্বমুখর; অবক্ষয় গ্রাস করেছে এ মধ্যবিত্তকে—মূলচরিত্র কামালের চেতনায় দৃশ্যমান সবকিছু। 'পুঞ্জীভূত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত লোক মহাক্রোধে জেগে উঠবে' এমন আশাবাদও প্রত্যয় পায় কামালের মনে। আবু রুশদের *নোঙর* মূলত সদ্য-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিম-মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নভঙ্গের বার্তাবাহি রূপ। বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমানের পাকিস্তানের মোহভঙ্গের স্বরূপটি এখানে চিত্রিত। মধ্যবিত্তের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রকরণ-নির্ধারণের প্রয়াসটি প্রধানত তাঁদের হাতেই রচিত হয়। *স্থগিত দ্বীপ* (১৯৭৪) মধ্যবিত্ত সমাজের আস্থা-নির্ভরতার প্রসঙ্গসমূহের প্রতীকী চিত্ররূপ। বিভাগ-উত্তর কালপর্বে আবু রুশদ নগরভিত্তিক অভিজ্ঞতায় জীবনবাদী ধারাটির একেবারে গোড়ায় জলসিঞ্চন করেন। যেটা তাঁর অর্জিত শৈলিতে প্রতিষ্ঠিত। বিভাগোত্তর সময়ে বাঙালি মুসলমান লেখকদের অন্যতমরূপে যে জয়রথ তিনি চালনা করেন তা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের দিকচিহ্নস্বরূপ, সন্দেহ নেই।

আবু জাফর শামসুদ্‌দীন (১৯১১-১৯৮৮)

আবু জাফর শামসুদ্‌দীন *পরিত্যক্ত স্বামী* (১৯৪৭), *মুক্তি* (১৯৪৮), *প্রপঞ্চ* (১৯৮০), *দেয়াল* (১৯৮৬) উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর *ত্রয়ী* (trilogy) উপন্যাস *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩), *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪), *সংকর সংকীর্তন* (১৯৮০)। *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যানে*র কাহিনিতে নূর বখ্‌শ ওয়াহাবী চেতনায় একদিকে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্গঠন অন্যদিকে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতীয় ভূখণ্ডের মুক্তির জন্য জেহাদ প্রজন্মান্তরে ছড়ানোর কথা বলে। এমন ইতিহাস-যুক্ত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যানে*র কাহিনি নির্মিত। রূপান্তরিত সমাজ-কাঠামোর দ্বন্দ্বই সেখানে প্রধান। *পদ্মা মেঘনা যমুনা* বাংলাদেশের উপন্যাসে এ যাবৎ বৃহৎ কলেবরের উপন্যাস। *ত্রয়ী*র দ্বিতীয় অংশ হলেও পূর্বোক্ত চরিত্রসমূহ এখানে অনুপস্থিত। কাহিনির বিস্তৃতি সাতচল্লিশ পর্যন্ত। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তাপ, অধিকার আদায়, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাহিনিতে উঠে এসেছে। নগর পত্তন এবং সেখানে গ্রাম থেকে উঠে আসা চরিত্রসমূহ, শিক্ষ-দীক্ষা, আচার-মূল্যবোধের পুনর্গঠন একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ; অন্যদিকে ভঙ্গুর

গ্রামীণ ব্যবস্থা, জমিদারীর অবসান, কর্মসংস্থান শূন্যতা—এমন পুনর্গঠনের আবর্তে *পদ্মা মেঘনা যমুনা* উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ। *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যানে* যে ধর্মীয় চেতনার ইতিবৃত্ত কাহিনিতে ছিল সেটা এ উপন্যাসে গতিশীল সময় চেতনার কারণেই আরও জটিল এবং ভিন্নতর বাস্তবতায় ধর্মাচারের পুনর্মূল্যায়ন। কাজী নজরুল ইসলাম, সুভাস বসু, মানবেন্দ্র রায় এসব কাহিনিরেখায় উজ্জীবিত; গ্রাম থেকে সনাতন ধর্মীয় মূল্যবোধের মামুন শহরে এসেছে। এ চরিত্র প্রত্যক্ষ করে নগরের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি। তার রুচিবোধ পাল্টাতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঁচ পর্বে বিভক্ত উপন্যাসে উঠে আসে চরকা, স্বদেশী আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লবী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সামগ্রিক পরিসরে উপন্যাসে আলী আহমদ, মমতাজ বেগম, রেবা, মরিয়ম, মনসুর এদের মধ্যবিত্ত প্রবৃত্তিতে প্রেম-দাম্পত্য-স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়ার মনস্তত্ত্ব রচিত হয়। উপন্যাসের আঙ্গিক ঋজু, গদ্য ইতিহাস-অনুবর্তী। শুদ্ধ মননশীলতা ও সমাজ-সন্দিগ্ধ স্বচ্ছ চেতনায় আবু জাফর শামসুদ্দীন বাংলাদেশের উপন্যাসের রুচি ও দিগন্তকে গড়ে দিয়েছেন। সেটা নিছক জনপ্রিয়তার জন্য নয়; স্থায়ী ও দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে।

দুই.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)

বাংলাদেশের উপন্যাসশিল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শক্তিশালী ও প্রভাবদীপ্ত লেখক। বিভাগোত্তর সাহিত্যে বাঙালি মুসলিম লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিল্পের গোড়ায় প্রকৃতঅর্থে জলসিঞ্চন করতে পেরেছিলেন। তাঁর *লালসালু* (১৯৪৮) অনবদ্য উপন্যাস। অন্য দুটি *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)। *লালসালু* ছাড়া অন্য দুটি উপন্যাসে লেখক বঙ্গীয় ঐতিহ্য ও আখ্যানকে ইউরোপীয় রীতি ও দর্শনের প্রভাবে তাৎপর্যময় উপস্থাপন করেছেন। *লালসালু* উপন্যাসের শুরু অভাবতাড়িত প্রকৃতির বর্ণনায়; নৈরশ্যকাতর, জীবনান্বেষী মজিদের মূল (root) খোঁজার তৎপরতায়। মজিদ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ চরিত্রকে ঘিরে উপন্যাসের কাহিনি গঠিত হয়। মহব্বতনগর গ্রামে মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে মজিদ আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়। শক্তিশালী খালেক ব্যাপারী থেকে আরম্ভ করে সবাইকে সে করায়ত্ত করে। অসম্ভব সংযত ও সংহত শক্তিতে মজিদ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আখ্যানের নির্মিতিতে যেভাবে মজিদকে সৃষ্টি করেন, চরিত্রের অন্তর্শক্তির অনিবার্যতা যেভাবে তৈরি হয় তা উপন্যাসে বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরল ঘটনা। মজিদ চরিত্রকে সৃষ্টি করতে গিয়ে লেখক বাঙালির গ্রামীণ সংস্কৃতি, ধমীয় আচার-রীতির প্রয়োগ ও ব্যবহার,

কুসংস্কার, উৎপাদন-সম্পর্ক সবকিছুকে ধ্রুপদী মাপে তুলে এনেছেন। এমন বাস্তবতা উপযোগী ভাষা-নির্মাণেও লেখক সফল। প্রতিরোধ-শোষণ-অনাচার-অবরুদ্ধ জনসংস্কৃতির ভাষা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দৃঢ়শক্তিতে উপন্যাসে এনেছেন। *চাঁদের অমাবস্যা* অন্য প্রকৃতির উপন্যাস। জ্যোৎস্নারাতে শিক্ষক আরেফ আলীর মাঝির বউয়ের মৃতদেহ দর্শনের ভেতর দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিতে সমস্যা শুরু। এখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পচেতনার লক্ষণীয় দিক হলো, আরেফ আলীকে স্নায়ুচাপে ক্রমশ একটা পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া। সেখানে বাড়ির কর্তা দাদা সাহেব, ছেলে আবদুল কাদের নিজের পরিমণ্ডলেই একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখানে অস্তিত্ববাদে (existentialism)র তত্ত্ব কাজ করে থাকতে পারে। কিংবা তার প্রয়োগের বিষয়টিও মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে পাশ্চাত্যের প্রবাসজীবন যে তত্ত্বেই তাকে প্রভাবিত করুক; এখানে প্রধান চরিত্র আরেফ আলীকে বাঙালির সমাজ অবকাঠামোর একটা পরিপ্রেক্ষিতেই মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সেখানে তার অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা বিবেকপ্রসূত দায়বোধ ইত্যাদিসহ মনস্তাত্ত্বিক যে জটিলতা তা উপভোগ্য এবং আস্বাদনযোগ্য। প্রসঙ্গ এমন চরিত্র উপযোগী শৈলিও তৈরি হয়েছে উপন্যাসে। চেতনার প্রবাহরীতির (stream of consciosness) বৈশিষ্ট্য শিক্ষক আরেফ আলীর স্নায়ু-উত্তেজনার প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ববহ মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের উপন্যাসে এমন ভাষারীতি নানাভাবে বিরাজমান থাকলেও প্রকৃত ও বাস্তব সত্যে বিষয়ে ও প্রকরণে এই প্রথম ব্যবহৃত। *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসেও এ রীতির প্রয়োগ আছে। তবে এ উপন্যাসে আরও ব্যাপক আবহ। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের ব্যক্তিসর্বস্ব রূপ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অবিচল। সেখানে শোষণের বেড়াজাল বহুমুখি। ধর্মের মতো সবচেয়ে বিশ্বাস-নির্ভর ও সহানুভূতির জায়গাটিও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোষণের করালমূর্তিরূপ ধারণ করে। *কাঁদো নদী কাঁদো*র মুহম্মদ মোস্তফা, সখিনা, জারুনার মা, উকিল, তবারক ভূঁইয়া অসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনবাদী চরিত্র। কিন্তু নির্বিশেষে ভয়ে-আতঙ্কে-মৃত্যুপুরীর বীভৎস রূপ অবলোকন করে; নদীতে চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে। হাহাকারের ঐক্যসুরে খ্যাতিমান মনোবিদ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুংকথিত (collective consciousness) শোনে সকলেই। সেখানে সখিনা সবার থেকে আলাদা। ভয়ার্ত পরিবেশে বন্দি গ্রামের সকলেই। এমন বিষয়গুলোতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পকোণে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রেম-নার্সিসাস-বিরহ-বৈরাগ্য সবকিছুই মানবচিত্তের সম্ভাব্য মেরুকরণসূত্রে নিরীক্ষিত হয়। ব্যক্তিজীবন ব্যবস্থাপনার দারিদ্র্য-অনাহার নয়, শোষণের স্বরূপটি বৃহত্তর ইঙ্গিত নিয়ে পরোক্ষ পরিব্যাপ্ত হয় উপন্যাসে। এটিই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় শিল্পগুণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মোট তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। *লাল সালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*। *লাল সালু* গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা, সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। একজন শেকড়হীন মানুষ মজিদ। সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, স্বীয় বুদ্ধি ও সাহসের বলে মহব্বতনগর গ্রামে শেকড় স্থাপন করে। উপলক্ষ লাল সালু আচ্ছাদিত মোদাচ্ছের পীরের মাজার। এরপর এটিকে ঘিরে ক্রমশ তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। কীভাবে সে ঘটনাগুলো ঘটে, কেন ঘটে, কোন্ ব্যক্তিত্ববলে মজিদ এমন কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়, সেটি উপন্যাসের ভাষার ভেতরে আছে। খুব শক্তিশালী সে ভাষা, কাহিনি বলার ধরণে যেন সমস্ত উত্তর মিলে যায়। এটি লেখক ও ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাথমিক পরিচয়। এরপর আরও ব্যাপক পরিধির; রহস্যময়, মনোজাগতিক ধ্যানধারণার ইঙ্গিত মেলে *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস দুটিতে। তিনি গল্প ও নাটকও লিখেছেন। সেখানেও সফল শিল্পমাত্রার পরিচয় দিয়েছেন। তবে আলোচিত এ দুটো উপন্যাসে জটিল আঙ্গিক-নির্মাণ ও স্বতন্ত্র বিষয় উপস্থাপনে বাংলাদেশের উপন্যাসে যুক্ত করেছেন নতুন বোধ ও উপলব্ধির সীমানা।

চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসে একটি যুবতী নারীর অপঘাতকে কেন্দ্র করে কাহিনি শুরু। মূলচরিত্র শিক্ষক আরেফ আলী। বহির্জগতে, জ্যোৎস্নার রাত্রিতে, যুবতী, মাঝির বউয়ের অপঘাতে মৃত্যুদৃশ্যটি আরেফ আলীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মনোজগতে শুরু হয় দুর্বার দ্বন্দ্ব। অসংখ্য প্রশ্নে সে দ্বন্দ্ব তাকে 'থাকা, না-থাকা'র পরিবেশে নিয়ে যায়। ক্রমশ কাহিনি যতোই এগোয় ততোই এ দ্বন্দ্ব বিপুল আকার ধারণ করে। সে নিজে সিদ্ধান্তহীন অবস্থার মধ্যে পড়ে। উপন্যাসের অন্যান্য পাত্রপাত্রী আরেফ আলীর আশ্রয়দাতা দাদা সাহেব, দাদা সাহেবের পুত্র আবদুল কাদের। এ ছাড়া ক্রিয়াশীল তেমন কোনো চরিত্র আর নেই। এই দুতিন জনের মধ্যে কাহিনি রচিত হলেও মূল ফোকাস আরেফ আলীর দিকে। কারণ, তার ব্যবচ্ছেদই উপন্যাস। আধুনিক উপন্যাস 'ব্যক্তি'কে চিহ্নিত করতে চায়। বিশ শতকের একমুখী বিশ্ব, সেখানে শোষণ ও শক্তির দাপট অনেকরকম। আমাদের বাংলাদেশের গ্রামগুলোর পরিণতি সেখানে নাভিশ্বাস। একজন মজিদ বা আরেফ আলী কেন-কী-কোথায় এসব প্রশ্নের উত্তর দরকার। আরেফ আলীর অতীত কেমন, সে কেন লজিং থেকে মাস্টারী করে, চাকরি চলে গেলে তার পরিণতি কী, কেন সে খুনীকে সনাক্ত করতে পারে না। কিংবা পারলেও কিছু বলতে পারে না? ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন, 'হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে যায় শিং-দাত কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ বাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে। হঠাৎ আশ্রয় লাভের আশায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।' 'হয়তো' আরেফ আলী কি স্বাভাবিক মানুষ? সে

কেন বকরী দেখে, 'ইল্যুশান' কেন সৃষ্টি হয়, কারণ সে অসহায়, ক্রম-অসুস্থ হবার পথে। অপরাধবোধ আরেফ আলীকে ভোগায়। মৃত নারীর মৃতদেহ যেন সবকিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করে, ক্রমাগত ঠেলে দেয় দায়বোধের দিকে। কিন্তু আশ্রিত দাদা সাহেবের বড় ছেলে কাদেরের বিরুদ্ধে সে কিছু কি বলতে পারবে?

যুবতীর মৃত দেহটিও প্রতীকী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভঙ্গুর সমাজ ও গ্রামের এ মাঝির মৃত্যু কী খুবই জরুরি কিছু? প্রশ্নটি প্রতিক্রিয়ার, কেননা গ্রাম তো 'মৃত্যুরই শবযাত্রা'। বিশ্বব্যবস্থায় যেখানে মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তা নেই অথচ আছে বাণিজ্যলোভী প্রযুক্তি। ভোগ আর আরামের বিপরীতে চলছে নির্মম, করুণ সব প্রত্যন্ত আহাজারি। কতোটা নিষ্পেষিত, তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিদিনের 'হলোকাস্ট'। মিডিয়া দিচ্ছে 'কাট' করে। সেখানে আশ্রয়-প্রশ্রয়, সাহায্য এসব তো ক্ষণিক স্বস্তি, অন্যকে নিজের ঘরে ঢোকার পথ করে দেওয়া, শোষণের জন্য আমন্ত্রণ; দাদা সাহেব তো প্রতীকী প্রভু, আশ্রয়দাতা; আরেফ আলী ক্ষয়িষ্ণু, 'তোস্তরি কিংখাব' যাদু বা মায়া 'বোগাস' আবদুল কাদের। বিশ্বায়নের শোষণ এ প্রক্রিয়ায় কায়েমী রূপ নিয়েছে। পুঁজির প্রতিক্রিয়া, উন্মুক্ত বিশ্ব, আলোঝলোমল পৃথিবী, সেখানে স্বপ্ন সুন্দর না হয়ে হচ্ছে অপ্রীতিকর, বানোয়াট, কৃত্রিম। এ অবস্থায় আরেফ আলী 'সাদা বকরী'ই দেখবে। সে 'দড়ি' এবং 'সাপ' অভিন্ন মনে করবে–এটাই সত্য। এজন্যই আমাদের সাহিত্যে চাঁদের অমাবস্যা এতো কাঙ্ক্ষিত, গুরুত্বপূর্ণ। আরেফ আলী প্রতীকী (না-গ্রাম না শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু), জ্যোৎস্নার মৃতদেহ প্রতীকী (হলোকাস্ট, মিডিয়া-প্রযুক্তির যুগে মিডিয়া-প্রযুক্তি বঞ্চিত), দাদা সাহেব (প্রভু, একবিশ্বের বিশ্বে), দাদা সাহেবের সন্তান আবদুল কাদের (তোস্তরি কিংখাব, 'বোগাস' দরবেশ)। এ মতে *চাঁদের অমাবস্যা* আমাদের গ্রামচিত্র, শোষণচিত্র, উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বকে রচনা করে। সেজন্য 'থমকে যাওয়া' আরেফ আলী।

আরেফ আলী দুটো প্রশ্নে সে মূল চরিত্র। এক. স্বাধীন সিদ্ধান্ত, দুই. দায়বোধ। এ চরিত্রটি ক্রমশ এ দুটির দিকে ধাবিত হতে থাকে। লক্ষ্যও তাই। অর্থাৎ, আমরা বুঝি সে যুবতীর মৃত্যুর কারণ উদ্ধারের ব্যাপারে একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তে আসবে। এবং দায় (commitment) তাকে বাধ্য করবে এটির নিষ্পত্তির জন্য। যেহেতু সৎ, বিবেকি মানুষ সে; সুতরাং সিদ্ধান্তে সে পিছু হটবে না। *চাঁদের অমাবস্যা*কে অনেকেই অস্তিত্ববাদী (Existentialism) উপন্যাস বলেন এ কারণেই। এটি সত্য, সমালোচনায় তা আসতেই পারে। আধুনিক সাহিত্যে এমন বিশেষণের বাইরে আমরা কেউই নই। তবে লেখকের জীবনচরিতে সেটি পাওয়া যাবে কি-না তা অন্য প্রসঙ্গ। সত্যিকার অর্থে, এ দুটি প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য গোটা উপন্যাস জুড়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। আরেফ আলীকে আমরা প্রধানরূপে

চিহ্নিতও করি এ সমাধানের দিকে তাকিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিংবা বিশেষণে এটি স্পষ্ট, আরেফ আলী অনেকদিকে খোঁজে, যুবতীর সঙ্গে তার অর্থাৎ ঐ 'খুনী'র বা 'দরবেশ' কাদেরের কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি-না? এ সম্পর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, উপন্যাসে। অনেক বিষয় ব্যবস্থাপনায়, ভেবেচিন্তে শিক্ষক যখন জানতে পারে তেমন কিছু নয়, তখন স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। যেটি সবকিছুর হুমকি কাঁধে নিয়েও একটা পর্যায়ে সোচ্চার। এটি কার্যকর হলে 'unauthentic being' থেকে 'authentic being'-এ পর্যবসিত হয়। এটিই এ চরিত্রের মৌল কথা। *চাঁদের অমাবস্যায়* সেটি তৈরি হয়েছে। এক ধরনের স্তব্ধতা (stopness) থেকে মুক্তি। এটি পূর্ণাঙ্গরূপে ঘটেছে শিক্ষক আরেফ আলীর ভেতর দিয়ে। স্মর্তব্য, এটি কিন্তু চটজলদি নয়; বাস্ত-অবাস্তব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভেতর দিয়ে। মনোজাগতিক একটি 'প্যাকেজ' থেকে পাঠকেরও যেন মুক্তি ঘটে এ উপন্যাসে। এ প্রক্রিয়াটিতে *চাঁদের অমাবস্যা* নিঃসন্দেহে আধুনিক। এক রাত, দুরাত করে সে খোঁজে নিজেকে; লৌকিক-অলৌকিক, প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত, স্বপ্ন-বাস্তব বিচিত্র সব বিষয়ের ভেতর দিয়ে। সে অনুভূতিগুলোও পীড়া দেয়, আহত করে, বিকৃত করে তাকে। 'মানুষের জীবনের প্রতি মানুষের নির্দয় নিষ্ঠুর উদাসীনতা—সেটাই স্বপ্নের মর্মকথা'-এসব প্রস্তুতি ও প্রস্তাবনায় তার আত্মতদন্ত শেষ হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে সর্বাধুনিক। শিল্পরীতির প্রয়োগে তিনি অনন্য। চেতনার প্রবাহ রীতির প্রয়োগ আছে। কেন এটির প্রয়োগ? কিংবা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিই বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌রই বা দুর্বলতা কেন? বা এ দর্শনটি কীরূপে প্রয়োগযোগ্য হয়ে উঠল? এসব প্রশ্নের উত্তর আছে এ উপন্যাসে। *কাঁদো নদী কাঁদোর* চরিত্রসমূহ নামচিহ্নে অর্থবহ। মুহাম্মদ মুস্তফা, আমিনা, খেদমতুল্লাহ ইত্যাদি নামে আমাদের শাশ্বত গ্রামচিত্র স্পষ্ট। এ গ্রামে ভেঙে গেছে একান্নবর্তী পরিবার, মুস্তফা গ্রাম থেকে শহরে গেছে, হাকিম হয়েছে, উকিল-ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেছে, কারো শহরে বাড়ি, কেউবা বিষয়বুদ্ধিতে গ্রামকেই বেছে নিচ্ছে—এতে প্রকরণটি কেমন হবে? এর ভাষাটি কি? *কাঁদো নদী কাঁদো* তার উদাহরণ। চরিত্রের ব্যক্তিজগত নিয়ে প্রবাহ, ভয়-দ্বিধা-সংকোচ-সিদ্ধান্ত সবকিছু। প্রকরণটি সে শর্তে বাধা। এখানে যে প্রশ্নজিজ্ঞাসা তা ভাষারীতিতে প্রকাশিত : 'মনে হয় কলিজাটি তার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে কাঁপতে শুরু করেছে; কলিজাটি তার হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরেছে। হয়তো অনেক রাত হয়েছে, চতুর্দিকে গভীর নীরবতা। সে নীরবতার মধ্যে কলিজার স্পন্দন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে, যেন এক নাগাড়ে কেউ ঢেঁকি চালিয়ে যাচ্ছে। অদূরে নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে খোদেজা অপেক্ষা করে।' রাতের নীরবতায়, ভয়ের প্রাদুর্ভাব,

স্পন্দন বাড়ে, চেতনাধ্বনি আওয়াজ তোলে—কার? মুহাম্মদ মুস্তফার। কেন? খোদেজার কারণে। অনুভবে, অনুকম্পায়, বিবেকে, সত্যান্বেষণে। সেজন্য বেগবান তার চেতনা, একবার মনে হয় 'সে মুখটি অপিরিচিত মনে হয় কেন?' সেকি খোদেজাকে দেখেনি? না-কি দুঃস্বপ্ন। কিংবা বিদ্রূপাত্মক হাসি বা তিরস্কার এসব কার? সে কি প্রতারক? এরূপ স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের উত্তেজনায় সে 'কলিজা' দেখে, হয়তো অচেতনে, মনোবিদ গুস্তাভ ইয়ুং কথিত 'man also produces symbols unconsciously and spontaneously in the form of dream'। অন্তর্জগতের তথ্য প্রকাশিত হলে, আমরা সেখানে পাই ভেতরের অনেক লুক্কায়িত উপাদান। 'কলিজা'র প্রতীকায়নটি প্রকরণে এভাবেই পরিশ্রুত। খোদেজা তখন অপেক্ষা করে না, সে একটা ইমেজে পরিণত হয়। এবং অনিবার্য অন্বেষায় ক্রমাগত বিমূর্ত চরিত্রটির (খোদেজা) বিপরীতে ভয়ের জগতে বিচরণ করে মূর্ত চরিত্রটি(মুস্তফা)। এরপর আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের দিকে এগুনো। স্মর্তব্য, এমন বিবেকঋদ্ধ আত্মহত্যা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য নয়। কেননা এটি কোনো আবেগপ্রসূত ব্যাপার নয়। অন্তর্দাহ এবং দগ্ধতার, নৈঃসঙ্গ্য বা বিরূপতা থেকে নিঃসৃত। এভাবে চেতন-অর্ধচেতন-অবচেতন জগতে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের দ্বন্দ্বাত্মক পরিবেশে অস্পষ্ট প্রতীকী অবভাসটি উন্মোচিত হলে আমাদের বিবর্তিত সমাজ-বীক্ষণ, প্রত্ন-নৃ-ইতিহাস সবকিছু প্রকরণে কায়েম হয়। *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসটির অভিধা তখনই আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। এভাবে শুধু মুস্তফা নয়, উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্র যেমন সকিনা বা তবারক ভূঞা একই জটিল অন্তর্প্রবাহে প্রকরণবন্দি। পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে ব্যক্তিক্ষয়ের স্বরূপটি আধুনিক প্রকরণে এরূপেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংবেদী ও সচেতন শিল্পীর বিবেচনা বাস্তবপ্রয়োগে তৈরি করেন বিবিধ প্রতীকচিহ্নিত চরিত্র। উপন্যাসের আঙ্গিক বয়ানে একজন সচেতন শিল্পীর যে জীবনাদর্শ ও কর্মমুখর সাংগঠনিক চেতনার প্রয়োজন সেটা পূর্ব-বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে বিরল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেখানে উদাহরণস্বরূপ। আধুনিক শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাস সময়ের প্রবহমান জটিল জীবনজিজ্ঞাসায় ও যুগভাবনার শিল্পভাষা তৈরি করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তা নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। আর সে কাজটিতে তিনি যে জিজ্ঞাসুদৃষ্টি দান করেন তা বৈশ্বিক মাত্রায় উৎকীর্ণ।

তিন.

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

বাংলাদেশের উপন্যাসে ধারায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম উপন্যাস রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন মৌল কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে : এক. উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার মর্মবিন্দুর স্পর্শতায়, দুই. বাঙালি মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য বা উপকথার সঙ্গে ইতিহাসের অমোঘ মেলবন্ধন কাহিনিতে গ্রথিত করায়, তিন. প্রবহমান সমাজজীবনকে নবযুগের ইঙ্গিতে পুণর্মূল্যায়নের প্রয়াসী হওয়ায়—এসবের স্বাতন্ত্র্য দিকগুলি বিভাগোত্তর উপন্যাসের ধারার সুদৃঢ় পথনির্মাণই শুধু তৈরি করে না; শিল্পীর শিল্পবৈশিষ্ট্যকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত করার তাৎপর্যও বহন করে চলে।

কাশবনের কন্যা (১৯৫৪) লিখে তাঁর শুরু, এবং জনপ্রিয় হন। উপন্যাসটির পটভূমি দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী জনজীবন। উপন্যাসের চরিত্র যে সংগ্রামের পটে বিধৃত তা বৃহত্তর জীবন অনুসারী এবং সময় প্রতিবেশসঞ্চারী। অঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে মূল চরিত্র কানু শিকদার; মূলত কানু শিকদারই পাঠকের মনোসংযেগের কেন্দ্রবিন্দু। কবিয়াল কানু শিকদার। সে ভাব-বিচ্ছুরিত চেতনায় জগৎ-জীবনের বিশ্লেষণ চায়; প্রেমিক জোবেদা তাকে বংশীবাদন ছাড়া বৈষয়িক করে তুলতে চায়। জোবেদা পূর্বপ্রেমের সূত্রে স্বামী আসগরউল্লার সংসার ছাড়ে, কবি কানু শিকদারের গানের সুরের মর্মে দাদা করমালির নিরঙ্কুশ প্রভাব থাকলেও ঘরছাড়া জোবেদা তাকে সংসার-অসংসারের দোলাচলতায় নিপতিত করে। এ পর্যায়টি *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের উৎকর্ষ-পর্ব। কাহিনি এ স্তরে জমাটবদ্ধ এবং আকর্ষণ-স্পর্শী। কিন্তু উপন্যাসকার দ্রুত শ্বাশুড়ী নির্যাতিত ও পীড়ন-পিষ্ট জোবেদাকে পুনরায় স্বামীর ঘরে ফিরে আনেন। পীড়ন ও সমাজ লজ্জার চাইতে জোবেদার আকর্ষণের লক্ষ্যবিন্দু যে কবিয়াল তা বোধ করি স্থির না হওয়ায় যথার্থ শিল্পমাত্রা স্পর্শ করতে পারে না উপন্যাস। জোবেদা আসগরউল্লার পরিবারে ফিরে যাবার পর আর প্রসঙ্গ হয়ে আসে না। একইভাবে সমান্তরালে পার্শ্বচরিত্র হোসেনের কাহিনিও শেষদাগে পৌঁছায়।

আলমনগরের উপকথা শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মননঋদ্ধ রচনা। কারণ 'ক্ষীরসায়র বা আলমনগরের উপাখ্যান একই সঙ্গে উপকথা ও ইতিহাস' হলেও 'ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব আলমনগরের সর্বত্র স্বাভাবিক নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদ-এর লোভের অভিযানে দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ঘর পরিবার বুঝি ইহাদেরই মধ্যে দুঃখের অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে'—এ বাস্তবতার উপলব্ধি আছে পরিবর্তনশীল সমাজচিন্তার আধুনিক প্রজন্ম-প্রতীক-প্রতিভূ নবাবপুত্র আলমগীরের মধ্যে। উপন্যাসের শেষে সে কারণেই আলমগীর সামন্তবাদের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে পুনঃনিশ্চিন্ততায় প্রেমিক রোশনবাইকে নতুন 'মহল'-এর সংবাদ দিয়েছে। আর দবিরখাঁর বেহালার রাগে জমিদার পুত্রের

সাধারণ ব্যক্তিমানুষে রূপান্তরের যৌক্তিক উচ্চারণ করতে কোনো যায় : ‘এইবার তাহার বেহুলার সুরে কেবল ঐ আগুনের ধবংশরূপই নহে, ঐ রাঙাভাঙা সূর্যদয়ে তাহার মনের সংকল্প ও উদ্দ্যেশ্যও যেন বাণীলাভ হইয়াছে।’ আর লেখক বলেন ‘অতঃপর ক্ষীরসায়রে নোতুন জীবনান্দোলন দানা বাঁধিয়াছে—উপাখ্যান যুগের শেষে নোতুন কর্মে ও চিন্তায় তাহার চেহারা—চারিত্র্যও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে! অবশ্য মানুষ কেবল খুঁজিতেছে মুক্তি—তাহার জীবন বিকাশের অধিকার—সে সন্ধান অতি তীব্র—অতি কঠোর তাহার পথক্রমণ। তবু ক্ষীরসায়রের জীবন অগ্রসর হইতেছে সেইসব দুঃখ অবসানের স্বর্ণ প্রভাতের পানে। উপন্যাস রচনায় এমন আশাবাদ এবং নির্মেদ উচ্চারণ উপন্যাসকারের দায়বদ্ধতার নিরিখগুলো যেমন চিহ্নিত করে তেমনি উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলোর সত্যতা প্রতিষ্ঠা দেয়।

বিষয়বৈচিত্র্যের বিচিত্ররূপ অনুসন্ধানে শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ্রাম বাংলার যাযাবর সংস্কৃতির প্রাচীন জীবনরূপকে রূপায়িত করেন *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে। এ উপন্যাসে লেখক জীবন-সংগ্রামের ভিন্ন রূপকে দেখেছেন—বেদে সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য। মঙ্গল মাঝি, ময়না বিবি, মদন এরা বংশানুক্রমিক বেদে। এদের বিকাশপর্বে লেখক নান্দনিকরূপে সংস্কার-সংস্কৃতির অবয়বকে তুলে এনেছেন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শিল্পকৌশলে লেখক সৃষ্টি করেছেন উপন্যাসের এক একটি চরিত্র। *মনের মতো ঠাঁই* একটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের দীর্ঘজীবনের বিক্ষিপ্ত মনের প্রকাশ এ উপন্যাসটি। লেখকের ভেনিস স্মৃতির প্রেক্ষাপটে *মনের মতো ঠাঁই* উপন্যাসটি রচিত। লেখকের *যার সাথে যার* (১৯৮৬) গ্রামীণ পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে রচিত। নিমু হাওলাদার নামের এক কৃষকের মা, স্ত্রী জরিনা, মেয়ে আয়েশা, দুই ছেলের একটি শিশু ও মলুয়াকে নিয়ে উপন্যাসের কাহিনির ভিত্তি রচিত। উপন্যাসটির কাহিনি গতানুগতিক। *জায়জঙ্গলের* (১৯৭৮) পটভূমি দক্ষিণের সুন্দরবন। এ উপন্যাসে জয়নাল শেখ নায়করূপে সংগ্রামী। সুন্দরবনের পটে জয়নাল শেখের সংগ্রাম ও অস্তিত্বের কথকতা বিধৃত এ উপন্যাসে। *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬) শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আটের দশকে প্রকাশিত উপন্যাস হলেও এর রচনাকাল চারের দশক। দক্ষিণ বাংলার বরিশাল অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী জীবনচিত্র এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। নদী-সাগর সম্মিলিত এ অঞ্চলের মানুষের শ্রম-সংগ্রাম, বঞ্চনা ও নিগৃহীত হওয়া, প্রতিদিনের আহার যোগাড়ের প্রচেষ্টাসহ লেখক প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামই এখানে বিধৃত। প্রায় চল্লিশটিরও অধিক চরিত্রের সমাবেশ আছে এ উপন্যাসে। সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রবণতা, ইচ্ছাশক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ়তা ও

সক্ষমতা; উপন্যাসটিকে বিকশিত করেছে। এ উপন্যাসের নায়ক সুজাত আলী। তার প্রতিরোধ একদিকে গোষ্ঠীপ্রধান জোতদার মুজফ্ফর অন্যদিকে দুর্দান্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি *সমুদ্র বাসর*। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উন্নত ও শিল্পসফল রচনা *সমুদ্র বাসর*। শুধু দ্বন্দ্বাত্মক প্রকৃতি নির্ণয়ই নয় এখানে প্রেম ও রোমান্সের উপস্থাপনও জীবন অনুষঙ্গি। সোনা, করিমন রতন, রতিকান্ত দেবনাথ, শ্রীহরি নিতাই, চৈতন্য, রামু, নিমাই, গিরিশ অনেক চরিত্র উপন্যাসটির অলঙ্কারই বটে। *নবান্ন* (১৯৮৭) শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। তবে এটাকে পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বলা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের একটা আভা আছে মাত্র। নায়ক মালেকের যুদ্ধে আহত হওয়া, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা, যুদ্ধপরবর্তী স্বার্থান্ধ জীবন বেছে না নেয়ার প্রবণতাই একে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ইংরেজ শাসন, জমিদারি প্রথায় নায়েবের প্রভাব, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির স্মৃতিচারণ বর্ণিত হয় দয়াল চৌকিদারের মাধ্যমে। উপন্যাসে দয়াল ব্যাপৃত প্রথম মহাসমর থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত। *নবান্ন*র বার্তা দয়ালকে ঘিরেই। *নবান্ন* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়েরই চালচিত্র। *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৮) আবহমান গ্রামীণ সমাজ অবকাঠামোর প্রতীক। কিন্তু এ সমাজ ব্যবস্থাপনা, তার নিয়ন্ত্রণ, বিনির্মাণ, বিবর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো দীর্ঘায়ত উপন্যাসে পরিশীলিত ও পরোক্ষ ভাবনা থেকে বিধৃত। জালাল মিঞা, আবদুল মাস্টার, হেদায়েতউল্লাহ, জনার্দন কর্মকার, জয়নাল শেখ, মকবুল খাদেম, কদভানু, ইসহাক, নসু, নুরুদ্দীন, কালুর মা, চম্পা ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক মানুষের পরিচয় মেলে উপন্যাসে। প্রত্যেকটি মানুষ সমাজ অনুষঙ্গি এবং তাদের উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক সংগ্রাম ও সহনশীলতায় পরিচালিত। উপন্যাসে ঘটনার আবর্তন চলে মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে। যুদ্ধের উন্মাদনা-আতঙ্ক এবং উত্তেজনা কাহিনির মূল প্রতিপাদ্য। উত্তেজনামুখর এ সময়-প্রসঙ্গকে ঘিরে সমাজ অন্বিষ্ট মানুষের রূপায়ণ চলতে থাকে স্মৃতি ও শ্রুতির দর্শনে, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং রাজনীতির নিরিখে। জালাল মিঞা প্রবল ব্যক্তিত্বে উজ্জীবিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজে সামন্তবাদের অপরিণত ভাঙনের ফলে সৃষ্ট আধা-সামন্ত ও আধা-পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে পুঁজির সংক্রমণ ও বিকাশ ঘটে সেখানে বাঙালি রূপান্তরিত মনস্তত্ত্ব গ্রামকে প্রচণ্ড ক্ষয়িষ্ণু ও ভুঁইফোঁড় করে তোলে। বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার ধারাবাহিকতার সূত্র বিঘ্নিত হয়, বংশপরম্পরার জীবন-জীবিকা, পাল্টে যায়, গ্রামে সৃষ্টি হয় মধ্যস্বত্ব, উপস্বত্বভোগী নানা মাপের চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে সময়কে উপন্যাসে তুলে আনা হয়েছে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দোসর ও প্রতিভূ হিসেবে শুরু থেকেই জয়নাল শেখ নির্মিতি পায়। জালাল, হেদায়েত,

মাস্টার এদের মাঝে জয়নাল শেখ রুচিহীন, বিকৃত, লোভী, জ্ঞানহীন এক সারবত্তাহীন মানুষ হিসেবে উপন্যাসে চিত্রিত। *কাঞ্চনগ্রাম* বাংলাদেশের সাহিত্যে পটভূমির বিরাটত্বকে কিন্তু ক্ষুদ্র একটি সময়ের মধ্যে ধারনের চেষ্টা আছে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ সময়কাল তার উপন্যাসের মূল উপজীব্য। *কাঞ্চনগ্রাম* ভিন্ন এক আঙ্গিক তৈরি করেছে, যার গতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্লথ এবং মনন চিন্তার আভরণে ব্যঞ্জিত। এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনার মূল প্রবাহ অতীত স্মৃতিচারণার চোরাবালিতে আচ্ছন্ন। তবে সেখানে ঔপন্যাসিকের চেতনার প্রবাহরীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৭-১৯৭৯)

আবুল মনসুর আহমেদ রচিত দীর্ঘায়ত উপন্যাস *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫)। এটি তাঁর মৌলিক রচনা। ক্রান্তিকালের অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসে তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনা পেয়েছে। বস্তুত, এটিই আবুল মনসুর আহমেদের শ্রেষ্ঠ রচনা। কারণ—বিষয়-অনুষঙ্গি আঙ্গিকের যথার্থ পরিচর্যা যেটা বিভাগোত্তর বাংলাদেশে এ উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষণীয় মাত্রা স্পর্শ করে আর দীর্ঘায়ত পরিসরে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতির যে ব্যাপক পরিসর এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের বিকাশ-স্ফূর্তির প্রাণবন্ত রূপ তা-ও এখানেই সুঠাম-নির্মাণে স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায়, কাহিনির সম্প্রসারণশীল প্রয়াসে কৌশলী দৃষ্টি আর বিস্তৃত পটভূমিকায় সমাজ ভাঙ্গনের সূত্র নিরূপণ—যার ভেতরে 'ব্যক্তি'র প্রচেষ্টা পরিচালিত—সংহত শিল্পিরূপে যা উপস্থাপিত। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭। হালিমের স্কুল মাস্টারির সূত্রে মীরপুরের খ্যাতনামা মুসলিম জমিদার মীর আমজাদ আলী চৌধুরীর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর সচেতনভাবে সে কৃষক প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। হালিমের এ সংযুক্তি জীবন-সচেতন বোধ থেকে। পরে কৃষক প্রজা আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফলে সে চাকরি হারায়। অনেক প্রতিরোধের মুখে হালিম দ্বান্দ্বিক, প্রশ্নবিদ্ধ এবং কর্তৃত্ববাদীরূপে তৈরি হয়। শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হালিম নিজের শ্রেণি-অবস্থান পরিবর্তনের ফলে কৃষক প্রজার আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতে থাকে—বুর্জোয়া ব্যবস্থায় তার পরিবর্তনও বোধ করি স্বাভাবিক। সমাজ-দর্পিত চিন্তনে ভঙ্গুর সমাজের ভেতরের এ মনস্তত্ত্ব উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জীবনসত্যের এমন রূপ লেখকের নির্মিত চরিত্রের নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তৈরি হয়েছে। *জীবন-ক্ষুধা* একদিকে যেমন ব্যক্তি মানুষের পরিপ্রেক্ষিতকে উন্মোচন করে অন্যদিকে তেমনি তার সম্ভাব্য সত্যকেও নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর অন্য উপন্যাস *সত্যমিথ্যা* (১৯৫৩), *আবে হায়াত* (১৯৬৮)।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫) উপন্যাস জীবন বাস্তবতা বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের আধারে চিত্রায়িত। গ্রাম জীবনের বহমান প্রচ্ছন্ন সামন্তবাদী সমাজের সার্থক রূপায়ণ এ উপন্যাসটি। উপন্যাসে হয়তো চরিত্রের বহুমুখি বিশ্লেষণ নেই, স্পন্দনশীল জীবনের প্রচণ্ডতা নেই, নেই বহিরঙ্গ ঘটনার গতিশীল চিত্রার্পণ—তবু *সূর্য-দীঘল বাড়ী* তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস নয় *সূর্য-দীঘল বাড়ী*। উপন্যাসের কাহিনি জয়গুনের। জয়গুন বাঁচে লড়াই করে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। জয়গুনের সন্তান মায়মুনা, হাসু, কাসু আর তাদের বেঁচে থাকা জীবনে জড়িয়ে আছে সূর্য-দীঘল বাড়ীর কুসংস্কার; গদু প্রধান আর করিম বকসের মতো রগচটা স্বামী। উপন্যাসের কাহিনির পরিসর পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে দেশভাগ। উপন্যাস জুড়ে মন্বন্তরের প্রচণ্ডতা আছে, সময়ের পরিসরে স্বাধীনতার স্বপ্নে আশার বাতি জ্বালানো জীবনের প্রণোদতা আছে, আছে প্রতিকূলতার সঙ্গে বেঁচে থাকা একটি নারী চরিত্রের জীবনবাস্তবতা। আবু ইসহাকের উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা কাহিনির বহিরাঙ্গনে সঞ্চরণ ঘটায় কম, সংস্কার ও বিশ্বাস যে গ্রামীণ সমাজের মূলে প্রোথিত জয়গুন সেখানে তেমন সচল নয়। উপন্যাসে হাসুর মতো একটি 'কাঁচা হাতে'র রোজগারে সংসার চলছে, মায়মুনার বিয়ে হচ্ছে বয়স হবার আগেই, জয়গুন নিজেকে ঘরের মধ্যে জিম্মি করে কন্যাদায় থেকে রক্ষা পায় ইত্যাদি ঘটনা উত্তাপমুখর। কিন্তু বহিরঙ্গে তার বিস্তৃতি নেই; উপন্যাসের প্লটকে সুদূর করে না। অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে উপন্যাসে, প্রগতির পথ ধরে তা আলো ছড়ায় উপন্যাসের নানা চরিত্রের মাঝে কিন্তু তবুও তা নিছক দৃশ্যপটের ঘটনাকেই চিহ্নিত করে। কোনো গতি দান করে না। উপন্যাসের জয়গুন তবুও সাহসী এবং উত্তেজক চরিত্র।

*সূর্য-দীঘল বাড়ি*র পর দীর্ঘায়ত যত্ন ও পরিচর্যার ফসল লেখকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬) উপন্যাস। এক বৎসরাধিক কাল পরিসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়-আওতায় উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ফজলের অন্তঃস্তলে জীবন-সংগ্রাম যুদ্ধে বাঁচার অনিবার্যতা তৈরি হয়। কারণ, যুদ্ধের মধ্যে নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, কেরোসিন ইত্যাদির দাম আকাশচুম্বীতে পরিণত হয়ে চলেছে। 'দাম অনেক বাইড়্যা গেছে। সোয়া দুই ট্যাহা মনের ধানের দাম চাইর ট্যাহা। এই বছর বাঁচন কষ্ট আছে।' এরফান মাতবরের ছেলে ফজল মাতবরের কোলশরীক কদম শিকারীর সঙ্গে মেহের মুন্সী, ধনু শিকদার, আহাদালী সকলেই 'কাতি মাসের এই কয়দিন' গত করার চিন্তায় শঙ্কিত। বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ জয়ের কৌশল, 'ভারত

ছাড়’ আন্দোলন, হক সাহেবের সঙ্গে ছোটলাটের বিরোধ ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপনে কাহিনিতে সময় অনিবার্যতা তৈরি হয়। যার ফলে ফজল ও তার শরিকরা নিঃশেষে সিদ্ধান্ত নেয় ‘হ, বড় খারাপ দিন আইতে আছে। এখন যদি আমন ধান পাকার আগে চরটা দখল করা যায়, তয় কিছুটা বাঁচার আশা আছে।’ এ সিদ্ধান্তই তাদের বাঁচার প্রত্যয়। ফজল উপন্যাসে পরাজিত নয়—সে সংগ্রামী, কঠোর প্রত্যয়দীপ্ত। অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য-নির্ভর ‘ভাল মানুষ’ মনে হলেও উচ্চারণ-উপলব্ধিতে ফজল নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি। উপন্যাসের শুরুতেই তার ইঙ্গিত পরিলক্ষিত :

> গত তিন বছর ধরেই টানাটনি চলছে সংসারে। ডিঙ্গাখোলা আর লক্ষ্মীচর ভেঙ্গে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে এ দুর্দিন। এ দুই চরে অনেক জমি ছিল তাদের। বছরের খোরাক রেখে অন্তত পাঁচশ টাকার ধান বেচতে পারত তারা। প্রতি বছর পাট আর লটা ঘাসে আসত কম করে হাজার টাকা। পদ্মার অজগর স্রোত গিলে খেয়েছে, উদরে টেনে নিয়েছে সব জমি।

পদ্মার পলিদ্বীপ-এর লেখক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী মানুষকে কাহিনি-কাঠামোতে পরিব্যাপ্ত করাতে চান—উল্লিখিত চরিত্রের ইঙ্গিতকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলে। সে জন্যে অন্তর্গত ভাষাও রচিত হয়। প্রতিপক্ষরূপে জঙ্গুরুল্লার যে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ কিংবা উপন্যাসে তার যে পুঁজি-সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সেটা অনিবার্য উত্থিত বুর্জোয়া সমাজ প্রবাহের নিশানায়। মূলত ৪৭-পরবর্তী বাঙালি মুসলমান সমাজের পুনর্গঠিত শ্রেণিপ্রতিভূরূপে এদের আবির্ভাব বা বিকাশ লক্ষণীয়। *পদ্মার পলিদ্বীপ*-এ একে-অপরের যে প্রতিপক্ষ শিল্পরূপে বিন্যস্ত তা বাংলাদেশের ভূমি-প্রস্তাবনায় তাৎপর্যপূর্ণ—কেননা, এই পাদপীঠেই বিধৃত ব্যবস্থায় শোষক-শোষিতের রূপ চিহ্নিত হয়। আবু ইসহাক শিল্পীর দায়বদ্ধতায় চর-দ্বীপ-নদীর আঞ্চলিক বিষয়কে নির্বাচন করে এক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের আবহে চিহ্নিত সময়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যানে চরিত্রের সম্পর্ক-সংযোগ এবং শ্রেণীস্তরের কাঠামোকে রূপদানে সচেষ্ট থেকেছেন। বাংলা সাহিত্যে এ ধারায় অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২)–এর *চর কাশেম* (১৯৪৯) বা অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)–এর *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পলিদ্বীপের অবস্থানগত বর্ণনা; সেখানকার মানুষের জীবন-যাপন, উত্থান-পতন নদী-চরের ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভাঙ্গা-গড়ার এ জঙ্গমী এবং সংগ্রামনিষ্ঠ জীবন-যাপন সর্পিল গতিতে চলতে থাকে। আর এ চরের মাঝেই তৈরি হয় শ্রেণি-প্রতিভূ; সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্থাপনার সঙ্গে। দ্বন্দ্বজড়িত সংগ্রামমুখর শ্রমীমানুষ প্রতিভূদের ছায়ার অবলম্বি হয়; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নসাধ মরীচিকায় রূপ নেয়। উপন্যাসে তার সমগ্রতা নির্ধারিত হয়,

ভেতরের সংকট-সংস্থান-উত্তেজনা তৎপরতার সঙ্গে প্রকরণ-বন্দি হয়—সেক্ষেত্রে উপন্যাসের সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী বিষয়-আশয়, জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক সূত্র কাহিনির বিনির্মাণ চলে। *পদ্মার পলিদ্বীপ* আঞ্চলিক জীবন পরিক্রমায় রচিত তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। *জাল* (১৯৮৮) তাঁর অন্য উপন্যাস।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বিভাগোত্তর সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। *আদিগন্ত* (১৩৬৫) তার প্রথম উপন্যাস। স্বল্প পরিসরের এ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে। বৈষ্ণবী সারদা ও নরোত্তমের হৃতোচ্ছ্বাস এ উপন্যাসের মর্মবস্তু। 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র নাগরিক হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব-বাংলায় তাদের মনঃকষ্ট নানা বাস্তবতায় এখানে প্রকাশিত হয়েছে। *পান্নামোতি* (১৩৭১) ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের প্রতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লুপ্ত দাই সম্প্রদায়, নর-নারীর প্রেম, ভোগলিপ্সু প্রতিভূ বৃত্তান্ত ঠাসবুননি কাহিনিতে এঁটেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বংশপরম্পরার ইতিবৃত্ত, সমাজ ভাঙ্গনের সঙ্গে শক্তিপদ চৌধুরী, বিশু, পান্নার মতো ব্যক্তিমানুষ *পান্নামোতি*র আখ্যানবিন্দু। *নীল-রঙ-রক্ত* (১৩৭২) সম্পর্কে বলা আছে 'উনিশ শতকের বাঙালির তিন থেকে সাত দশকে বিধৃত সাময়িক পটভূমিই নীল-রঙ-রক্ত উপন্যাসের উৎস।' ভৈরব রায়, কেতু মণ্ডল, পাঞ্জু মোল্লা, মেঘাই, তোতামীর, মাসুম এ উপন্যাসের সর্বস্বান্ত নীল চাষী। চাঁদতারাপুরের জমিদার ও রাজা নীলকর কৃষ্ণদেব রায়ের পাইক-বরকন্দাজের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ হয়। উপন্যাসে ভৈরব স্ত্রী কালীতারা, টুইডি, হরিদাসী বিদ্রোহী শক্তিতে উপস্থাপিত। তোতামীর, মাসুম, ভৈরব ঢালী কৃষকশক্তি, উনিশ শতকের বিপ্লবী কৃষক চরিত্র। গোরাপোতা, শ্যামনগর, বড় চুলুরিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নীলবিদ্রোহের উত্তাপ চলে। *নীল-রঙ-রক্ত* এ বিদ্রোহের বার্তাই প্রচার করে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *অনেক সূর্যের আশা* পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাস। কলকাতার পটে স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আজাদ পাকিস্তানের স্বপ্ন এসব নিয়ে *অনেক সূর্যের আশা* রচিত। রহমত, সাইপ্রিন, হায়াত খাঁ নানার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা-আশাবাদ দৃঢ়শৈলিতে উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়। চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মহাযুদ্ধ ও সম্ভাবিত একটি নতুন দেশের স্বপ্ন। লেখকের *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫), *অনেক সূর্যের আশা* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। '*বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* মূলতঃ আমার উপন্যাস *অনেক সূর্যের আশা*-এর দ্বিতীয় খণ্ড। এখানেও সমাজ উজ্জীবনের মানস প্রায় একই। পূর্বতন কুশলীদের অনেকেই এখানে ক্রিয়াশীল।' উপন্যাসের কাহিনিতে সমাজ, রাজনীতির চিত্র পাওয়া যায়।

বিভাগ-পরবর্তী পূর্ব-বাংলায় ভাষাদ্বন্দ্ব, পাটকলে অসন্তোষ, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারির ঐক্যবদ্ধ বিরোধ ও সচেতনতার স্বরূপ এখানে রচিত হয়েছে। রহমত মূলচরিত্র। উপন্যাসে রহমতের উক্তি ও ধারণায় রাষ্ট্র ও জনসাধারণের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াটি জানা যায়। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তার উত্তেজনা এবং প্রধানত সদ্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলমানের আত্মচেতনার প্রক্রিয়াটিও এখানে ধরা পড়ে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কাহিনিচিন্তার গুরুত্ব, নবরাষ্ট্র পাকিস্তানের আওতায় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের স্বরূপ-সন্ধিক্ষণটি নিরূপণ করায়। *বেগম শেফালী মির্জা* (১৯৬৮), *শ্রীমতী ক ও খ শ্রীমান তালেব আলী* (১৯৭৩) তাঁর অন্যান্য উপন্যাস।

রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১)

বটতলার উপন্যাস (১৯৫৮) লিখে খ্যাতিমান। এ খ্যাতির বাইরে তিনি আরও অধিকতর পরিচিতিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন বা হতে পারেন আরও অনেক কিছু; কিন্তু পারেননি একেবারে—নিজে থেকে প্রচারের বাইরে ছিলেন, 'চটুল রস বিতরণে আমার আগ্রহ কম... মোটা অর্জন আমার লক্ষ্যও নয়। জীবনকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রতিচিত্র অংকনেই আমার বেশি উৎসাহ।' রাজিয়া খানের উপন্যাসের প্রধান কলরোল মনস্তত্ত্ব। মন নিয়ে, মনোভাবনার জগত সৃষ্টি, মনোঅঙ্কিত চেতনা 'দেহ ও মন এদের সম্পর্ক ওতপ্রোত হলেও জীবনের কাঠামোয় এরা দুটি স্বতন্ত্র তল। পারিপার্শ্ব ও ঘটনা-প্রবাহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যবহারিক জীবনে যেসব কাজ আমরা করে থাকি, তা মনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পক্ষান্তরে মনও আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কার্যক্রম—এমনকি পারিপার্শ্বকেও অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে'— যা সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি প্রভাবিত, এবং কিছুতেই তা ভুঁইফোড় নয়। মন-নিরপেক্ষ কিছু নেই, মন দ্বারাই প্রভাবিত, মনোকাঠামোতে গড়ে ওঠে মনুষ্যত্ব-মনন-মেধা।

বটতলার উপন্যাস মঈন-এর আত্মকথা। 'একরাত', 'একদিন', 'আরেক দিন আরেক রাত', 'রাতের পর রাত দিনের পর দিন' এরূপ; অতঃপর বটতলার উপন্যাস—পূর্ণায়ত রূপ পেয়ে যায়। মঈন কেন্দ্রে। তাকে ঘিরে বিস্তার। 'হয়েছে কী সুমিতার? আগে তো নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে শুনিনি কখনো! তার কেবলি ভয় তাকে বুঝি আমি ভালবাসিনে, তার সৌন্দর্যের মোহে ছুটে ছুটে আসি। আর সে কুৎসিত হলে আসতাম কি না, এ প্রশ্নের জবাব দেব এমন কী দায় পড়েছে আমার? সে যে তার দীর্ঘ আয়ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, উষ্মা মিশে তা যে আরও সুন্দর হয়েছে, বর্তমানের এতবড় সত্য

উপেক্ষা করে সে কুৎসিত হলে কী হত, তাই ভাবতে হবে আমাকে!—মঙ্গন এরূপ প্রশ্নে দাঁড়ায়। এর ভেতরে অমোঘ এক আতশবাজি, জীবনের গভীর টান, তীক্ষ্ণ মমত্ববোধ, আর নারীর মন-মনন বিষয়ে তীক্ষ্ণ নিরীক্ষা, আক্ষেপ-ঈর্ষা-দ্বিধা-সংকোচ-প্রেম-পরিণয়—তার ভেতরে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিলাস। *বটতলার উপন্যাসে* তার চ্ছটা, দীপ্তিময় দ্রবীভূত। প্রথম উপন্যাস, উচ্চারণের তাপ প্রকট, কারণে তা অনেকটা শৈথিল্যও। তবে মনস্তত্ত্ব-বীজ এখানে দানা বাধে, সেটি চরিত্রকে টেনে নয়, দার্শনিক-মন রচনা করা, কর্ষিত পটচিত্রে সমাজ-আর্থ-সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। শ্রেণিস্তরে নিশ্চয়ই তা মধ্যবিত্ত, এ সমাজের মধ্যবিত্ত, বিভাগোত্তর বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত, পুঁজির প্রকোপে তৈরি সে মধ্যবিত্ত, ভেতরে লালিত স্বপ্ন-কামনা-ক্লেদ-মনোটোনাস রূপ আছে। কাঠামোটি কঠোর, নির্মম, একই সঙ্গে দুর্মর। নারীর মূর্তিতে, নারীর সংস্কারকে আঘাত।

এ মধ্যবিত্ত বিভাগোত্তর আবহের। মঙ্গন সে সমাজের প্রতিনিধি। সেই কথক। সেই চলিকাশক্তি, তার মন-মনন, আগ্রহ-দ্বিধা, সংশয়, স্ববিরোধীতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চক সমাজরীতিকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে, নিজ মাপে তার মোকাবেলা—হেটি আর ততোধিক সুমিতাকে। কিন্তু ব্যক্তিত্বে মঙ্গন অপ্রতিরোধ্য। শেষ মীমাংসাটি উপন্যাসে হয়তো তেমন আকর্ষণীয় থাকে না, কিন্তু তার ইঙ্গিত—প্রচ্ছদপট তুমুল। খণ্ডে খণ্ডে এক পটচিত্রে দাঁড়ান লেখক, ক্ষুদ্র ঘটনায় নির্বিশেষ তলের আকর্ষণ অতঃপর তার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নিজের মতো তার জিজ্ঞাসা ও উত্তর পেয়ে যাওয়া।

আবেগ ও অনিরুদ্ধতা মেয়েলি বা নারীঘটিত নয় এ উপন্যাসের। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তার এতোটুকু ছাপ নেই : 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে—যেদিন আমি মরব, আমার মরা শরীরটাকে ও আদর করবে। সত্যিকারের আমাকে ও কোনোদিন পাবে না, কোনোদিন না। কেমন করে পাবে? চায়নি কোনোদিন, কেমন করে পাবে।'—এটি কেমন ভাষা? উক্তিটি সুমিতার। কথনে মঙ্গন। আহ্বানে আকর্ষণ ও তীব্রতর আভাময় তার স্বর। মনোগহনে টুকরো টুকরো রঙজ্বলা অনুভূতি। প্রশান্তিময় কিন্তু দুর্বার অপ্রশান্ত। টানাটানি প্রবল। 'দুহাতে মুখখানি তুলে ধরি, অনেক চেষ্টা করি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাকে সজাগ করতে, কিন্তু সে ডুবে থাকে অসীম হতাশায়।' আবার সুমিতা সিয়ে মঙ্গন বিবরণময় করে বলে : 'তার মুখ শান্তিতে কোমল হয়ে উঠেছে'। এরূপে কাছাকাছি কিন্তু অপারগ অস্তিত্বের জানান রূপটি প্রতিষ্ঠা পায়। এ জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি উপন্যাসকারের। সেখানে সে ব্যক্তিত্বে অর্জিত হয়। মানবরুচির, সৌন্দর্যের অপার আকর্ষণটি বর্ণিত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোতে যে পরিখা নির্মিত হয় তা আর সময়ের বা কোনো

ব্যক্তির থাকে না, সার্বিক-সমগ্রতার মনুষ্যত্ব প্রয়াস। উত্তরিত চেতনার দ্যুতিময় পরাকাষ্ঠা-প্রতিরূপ।

অনুকল্প (১৯৫৯)-এ রাজিয়া খান মন নিয়ে আরও নিরীক্ষাময়। বলে নিয়েছেন 'মন রূপ মাঝি'র কথা। অগ্রসর মনে—এ মনের রাজ্য আর তার চিন্তার বিকশিত রূপ অনেককালের। তাঁর কৈফিয়তে আছে : কিছুই বাহ্যিক বা ব্যবহারিক ছাড়া নয়। সবকিছুই তাকে নিয়ে তাঁর সময়ের দৃষ্টি থেকে। সুশীর মনোরাজ্যে বিরাজমান রেণু। অতঃপর ফিরোজের প্রবেশ। এখানে সুশী প্রধান। কথক আলাদা। সে সুশীকে বয়ান করে। এর মাঝে রেণুর চাটগাঁ চলে যাওয়া, ফিরোজ-সুশীর সম্পর্ক, তাদের পরস্পরের আগ্রহ, রেণুর বিষয়ে সুশীর প্রশ্নের জবাবে ফিরোজ, রেণুর যাওয়ায় ফিরোজের দৃষ্টিকোণ আর সুশীর সে বিষয়ে ভালোমন্দ প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, দুই অধ্যায় থেকে সুশীর বয়ানে তা প্রাচুর্যময় হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমশ ভেতরে প্রকাশ। উঠে আসে রেণুর ইচ্ছা-অনুভূতি-আগ্রহ-অপারগতা-ঘৃণা-ক্রোধ-হিংসা-ঈর্ষা, ফিরোজের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বসূত্র, দ্বান্দ্বিক অভীপ্সা, ক্রমশ পারস্পরিক অতীত-বর্তমান পরিবার, ইচ্ছা-বাসনা, গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদি ঘনীভূত হয় উপন্যাসে। এ ঘনীভূত হওয়া ব্যক্তিত্বময়, আকর্ষণ-উদ্দীপক। রেণুর মুখচ্ছবি, সুশীর আত্মসমালোচনা, ব্যক্তি-পরিবার ছড়িয়ে যায় নির্বাচিত মন।

মনোস্তরে রূপান্তরিত ইচ্ছা-প্রণোদনায় যে একান্ততা সেখানে সমাজ-সংসার বা প্রথাগত আচারনিষ্ঠা অমূলক হয়ে পড়ে, রেণু বা ফিরোজ কেউই আর পূর্বের নিয়মে নেই, তাদের ভেতরে যে রূপান্তর ঘটেছে, মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, পারস্পরিক আস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রচিত হয়েছে সেখানে নির্ধারিত সমাজস্তর চিহ্নিত, ব্যক্তি-নির্দেশ যুক্তিনির্দিষ্ট, পরিস্রুত সংস্কৃতি-আচার তাদের দৃষ্টিকোণে নির্ণীত। সেখানে রচিত মূল্যবোধ অগ্রসর অনুবর্তী হোক বা না হোক—তাতে যে মনন-গ্রহণটি চলে বা আকর্ষণীয়। রাজিয়া খান শুধু চরিত্র সৃষ্টি করেন না, চরিত্রের মূল্যবোধ, তার ভেতরের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট মননচেতনা স্ফটিকস্বচ্ছতায় অবমুক্ত করেন। সেখানে তা উচ্চতায় দাঁড়ায়। সুশী-ফিরোজ-রেণু-আশরাফ উপন্যাসকারের নিকট শুধু চরিত্র নয়, চরিত্রের ভেতরে দাঁড়ানো প্রগতি ও মূল্যবোধ—যেটি এগিয়ে দেয় সামগ্রিক চিন্তাকে, দেশানুগত ভাবনাকে আধুনিক করে তোলে, ঐতিহ্যানুগ ভাবনাকে ফিরিয়ে নেয়, ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা দেয়। নিশ্চয়ই সে প্রতিষ্ঠা তাঁর মেজাজে ও পরিস্রুত সমাজ নিরিখে। রাজিয়া খানের উপন্যাসে কাহিনি বিবরণ উপচিয়ে ব্যক্তির মনোগহনের তাপটুকুর বিচ্ছুরণ ঘটে, সে তাপ বা প্রণোদনা শুধুই আরোপিত বা ইচ্ছা-অনুবর্তী কোনো বিষয় নয়, বরং ইচ্ছা-নিরপেক্ষরূপে পাঠকের সমনে আসতে সক্ষম হয়। সেখানে বিবরণ আর বিররণ খাকে না কাহিনিতে পরিণত হয়, ফর্মের এ বৈশিষ্ট্যটি ষাটের দশকে ভিন্ন,

কারণ তখন যারা উপন্যাস রচনা করেছেন তা প্রায় সবটুকুই ছিল বর্হিমুখি, বাইরের ঘটনাপ্রসূত। মনোচিন্তার এ বিবরণটি বিভাগোত্তর পর্যায়ে তেমনটি (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাড়া) মেলে না। রাজিয়া খান নিভৃতে সে কাজটি তুমুল উদ্যমে, দীর্ঘ সময় নিয়ে একের পর এক উপন্যাস রচনা করে সম্পন্ন করেন। যা প্রায় আশির দশক পর্যন্ত প্রবহমান। এক্ষেত্রে রাজিয়া খানের পরিবর্তনটিও লক্ষ্যণীয়। কারণ, বিবরণের যে উচ্চারণ তা তাঁর নিক স্থিরবৃত্ত পায়নি, বদলেছে এবং হয়ে উঠেছে নিরীক্ষাপ্রবণ। বাংলাদেশের উপন্যাসের এ কাজটি ব্যতিক্রম এবং ভবিষ্যতবাহি। এবং পরীক্ষণীয় মাত্রার দৃষ্টান্তে সমুজ্জ্বল বলে মনে হয়।

রাজিয়া খানের উপন্যাসগুলোর মধ্যে *প্রতিচিত্র* (১৯৭৬)-এ রাজনৈতিক চিত্র ও চরিত্র—যেখানে হামিদের উত্থান, এক গ্রামীণ তৃণমূল চরিত্রের শিক্ষিত হয়ে শহরে উঠে আসা এবং এমন পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ (১৯১১) থেকে অসহযোগ, খেলাফত আর ঐসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বোস, মাহাত্মা গান্ধী, জিন্নাহ প্রভৃতি চরিত্রের সাক্ষাৎ অবলোকন চিহ্নিত। এটি একটি সরল কাহিনির সাক্ষাৎ অবলোকন। হামিদ তার পারিবারিক জীবন-বিন্যাস, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সামজিক কাঠামোতে বেড়ে ওঠার প্রতিকূলতা, পড়াশোনা রাজনৈতিক সংশ্রব, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য নিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থিত হয়। মুরাদপুর গ্রাম থেকে সে রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এ উপন্যাসের ঘটনাক্রম বহিরঙ্গনের। বাইরের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়। আমাদের বিভাগোত্তর উপন্যাসের ধারাটি এখানে প্রতিষ্ঠিত। ভিন্নতা বা ব্যতিক্রমী কোনো প্রত্যয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজিয়া খান মুসলিম মধ্যবিত্ত চরিত্রই এঁকেছেন। কিন্তু চরিত্রের মনোস্তর এখানে অপ্রতিষ্ঠিত। বিপরীতে প্রথানুগ স্রোতটিই এখানে বিধৃত। কলকাতা শহরের বিবরণ আছে হামিদের বেড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রতিচিত্র, তার উপনিবেশ-বিরোধীতা, আইন অমান্য আন্দোলন, বিলেতী পণ্য বর্জন—ইত্যাকার সব আন্দোলনের আকর্ষণীয় বিবরণ আছে। খেলাফত ও অসহযোগের মনস্তত্ত্ব লক্ষ করা যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসেবে হামিদের লেখাপড়া, মুসলিম শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার আগ্রহ– তার আধুনিক চিন্তা-চেতনা সরল পাঠে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত।

দ্রৌপদী (১৯৯৩) আকর্ষণীয় ও প্রশংসিত। সেখানে গড়ে ওঠা রাজনীতির-সংস্কৃতি কখনো ভেতরে কখনো বাইরে প্রচ্ছন্নরূপে ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে কাজ করে। ব্যক্তি সেখানে নার্সিসাসে মত্ত, নিজের ভেতরের মজ্জাগত রূপটি স্বস্তি পেতে চায়, দুর্বহ হয়ে ওঠে তার চলতি জীবন। রাজিয়া খান মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব রাজনীতি ওইরূপ সময়—এ পর্বের আখ্যানে যুক্ত। তবে তা নিখুঁত নয়, সূক্ষ্ম-প্রচ্ছন্ন। আন্তর্জাতিক ও আধুনিক মনস্ক আয়োজনে আসরার, পাকিস্তান

আন্দোলনের অগ্রদূত স্যার সলিমুল্লা প্রাসঙ্গিকরূপে বিবৃত। তবে কাহিনির অকুস্থল ঢাকা। বিবরণে চমৎকার বৃটিশ কাউন্সিল, ফুলার রোড, সলিমুল্লাহ হল। ফিরে ফিরে আসে বিশ্ববিদ্যালয়, মনের কোণে, অবসেশনে। তখন পাকিস্তানের লাহোর, করাচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে ঢাকা আর সে সূত্রে ইতিহাসের সূত্র কার্যকর : ফজলে লোহানী, বজলুল করিম, আসকার ইবনে শাইখ আর রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। মঞ্চে রক্তকরবী। এছাড়া অনেক ভ্রামণিক ক্রিয়াকর্মে পঞ্চাশের দশকের ঢাকা বিবৃত। পূর্ব-পাকিস্তানে ঢাকার রূপ-জৌলুস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—স্মৃতিচারণায় পরিবেশিত। তার ভেতরে নয়ন-রচিত ও চিহ্নিত, 'আমি' [সোহরাব] বিবরণে। সে ইংরেজি জানে, তার কেন্দ্রে বিশ্ব-উন্মুক্ত। সাংস্কৃতিক স্মৃতিচারণার ঐতিহ্য প্রকাশিত। চেনা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালি কিন্তু পুর্ণাঙ্গরূপে আন্তর্জাতিক। অনেক সম্পর্কে সে উন্মুক্ত ও প্রথাবিরোধী। বনেদী বা অভিজাত মর্যাদায় লেখকের প্রশ্রয়টি সে পেয়ে যায়। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধটি লেখকের মজ্জাগত। বরাবরই তিনি অগ্রসর, নারী হয়েও নিশ্চিত তার মনুষ্যমন ও মানবিক প্রতিশ্রুতি। উপন্যাসেই তিনি বাঙালি মুসলমানের আবহ বদলে দিয়েছেন। তার কৃষ্টি কালচার মূল্যবোধকে অগ্রবর্তী আদর্শে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তবে নিশ্চয়ই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। লেখকের *হে মহাজীবন* (১৯৮৩), *চিত্রকাব্য* (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৯৮০), *পাদবিক* (১৯৯৮) অন্য উপন্যাস।

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

শেষ বিকেলের মেয়ে (প্র. প্র. ১৩৬৭ ব.) প্রসঙ্গে জহির রায়হান বলেছেন, '*শেষ বিকেলের মেয়ে* উপন্যাস নয়। উপন্যাসিকা বললেও ভুল হবে। আসলে একটা বড় গল্প।' জহির রায়হান জনপ্রিয় শিল্পী। *শেষ বিকেলের মেয়ে*র কাহিনিতে কাসেদের সূত্রে উঠে আসে জাহানারা, সালমা, শিউলি। লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ কাসেদকে কেন্দ্র করে। কাসেদের স্বগত কথন (interior monologue)-এ ফিরে আসে বাবার স্মৃতি, বাবা-মার অতীত, কাসেদের চাকরি হওয়া পূর্বতন পারিবারিক কথকতা এবং প্রেমিকা জাহানারার প্রতি কাঙ্ক্ষিত মুগ্ধতা। এর ভেতরেই এ চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action-reaction) ক্ষেত্র তৈরি হয়। চলচ্চিত্রানুগ প্রক্রিয়ায় ঔপন্যাসিক কাহিনির বিস্তৃতি ঘটান। এতে করে বাংলাদেশের উপন্যাসে এক নব্য-নন্দনরীতির প্রকাশই নজরে আসে। তাঁর *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের আবহটি সরলভাষ্যে পাওয়া যায়। টুনি, মন্তু, মকবুল প্রাণবন্তরূপে চিত্রিত। মকবুল অর্থগৃধ্নু, বাড়ির বউদের অর্থপার্জনের কাজে লাগায়। টুনির ভেতরে সাড়া ফেলে দেবর মন্তু। মন্তুর মাছ ধরা, টুনিকে বাবার বাড়ি থেকে আনা নেওয়ায় গভীর হয় আন্তঃসম্পর্ক। জহির রায়হান চিরন্তন নারীর

প্রতিকৃতি আঁকেন। যে নারী প্রেমে-স্বপ্নে-মোহে কাতর অথচ সমাজ বা শাস্ত্রাচার উপেক্ষা করে না। গ্রামীণ নারীর সংস্কার, অনুশাসন, নির্যাতন আর বিপরীতে পুরুষতন্ত্রের দাপট উপন্যাসে পরিলক্ষিত। কাহিনিপ্রধান উপন্যাসটির ব্যাপকতা বৈচিত্র্য কম; কিন্তু ভাষার স্নিগ্ধতা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। *আরেক ফাল্গুন* (১৩৭৫ ব.) উপন্যাসে প্রত্যক্ষ আছে রাজনীতি। মুনীম উপন্যাসের প্রধান চরিত্র; রাজনীতিতে তার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। বায়ান্নর পরে ভাষা আন্দোলন ক্রমশ পরিণত হয়েছে পূর্ব-বাংলার সর্বশ্রেণির জনতার একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অধিকার আদায়ের প্রেরণাশক্তিতে। বজলু, মাহমুদ, আসাদ, কবি রসূল, সালমা প্রত্যেকেই একুশে উদ্‌যাপনকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে এক প্যাটফর্মে। ছোট কলেবরের উপন্যাসে *আরেক ফাল্গুন* বাঙালির এমন চেতনার প্রতিই দিকনির্দেশ করে। এক শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি *বরফ গলা নদী* (১৩৭৬ ব.)। কেন্দ্রীয় চরিত্র মাহমুদ, তার ভেতর দিয়েই মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণিস্তরের ক্ষেদ-ক্রোধ, অসঙ্গতি উঠে আসে। সেখানে চাওয়া-পাওয়া, হতাশা-নৈরাশ্য, উত্তরণ প্রচেষ্টা আছে। জহির রায়হানের কাহিনি চলচ্চিত্রানুগ। তাঁর অন্য উপন্যাস *তৃষ্ণা* (১৯৬২), *আর কতদিন* (১৯৭০), *কয়েকটি মৃত্যু* (১৯৭০)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদের বিখ্যাত উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০)। এ উপন্যাসের কথক জাহেদ এবং সেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। লেখকের প্রথম দিকের লেখা এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি-প্রসন্নতা, হতাশা-ক্ষোভ, নৈরাশ্য-গ্লানি সবই প্রতিরূপিত। কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে প্রেম ও যৌনতার অঙ্গীভূত জীবন। যার মূলে আছে ব্যক্তিচরিত্রের মনোজগতের চারিত্র্যকে বিশ্লেষণের প্রয়াস। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* 'মাদার আর্থ' বা বসুন্ধরা প্রতীকে যে খ্যাতি ছড়ায় তার দ্রষ্টা জাহেদ—যে তার সব বিখ্যাত অবয়ব বা রেখার টানকে অনুপ্রেরণার স্থল হিসেবে পায় এ ছবিকে; নারীর এ মূর্ত-বিমূর্ত রূপ তাকে প্রাণিত করে, অধিকার করে—'ছবি কখন নিঃশব্দ-পদে আমার স্কেচে, আমার ড্রয়িং-এ অলস মুহূর্তের হিজিবিজি আঁকিবুকির মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেও বহুদিন অজ্ঞাত ছিল।' কিন্তু নতুন এক কাহিনি বলে ছবি, স্বামী-চিত্রকর-তেইশ নম্বর তৈলচিত্রের দ্রষ্টা যখন আবিষ্কার করে এরূপ ভাষ্য : 'সত্যি বলছি, তুমি সন্তানের জননী! আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মাস ছ'য়েক আগে তোমার একটা ছেলে হয়েছিল।' এ কাহিনিস্রোত জাহেদের চৈতন্যে অন্তঃশীল চলতে থাকে। লেখকের কথনভঙ্গির অভিনবত্ব, পরিমিতিবোধ, সংহত বর্ণন যে নির্মাণ-কাঠামো তৈরি করে তা স্বচ্ছ ও পরিপক্ব শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। লেখকের *কর্ণফুলী* (১৯৬২) অপেক্ষাকৃত

দুর্বল রচনা। *কর্ণফুলী*-কেন্দ্রীক স্থানিক জনজীবন, দ্বন্দ্ব তেমন উপস্থিত নয়। চরিত্র হিসেবে ইসমাইল মূলানুগ হলেও তার স্বপ্নবিলাস, স্ববিরোধীতা, আবেগকাতরতা উপন্যাসটির কাহিনিতে তেমন গুরুত্ব তৈরি করতে পারে না। ইসমাইল-সূত্রে চাকমাকন্যা ধলাবিবি ও লালনের বিয়ে এবং গৌণচরিত্র রমযানের কথাপ্রসঙ্গে ধনপতি-রাধামোহন ঘটনাপ্রবাহে চাকমা জনজীবন, বিয়ে, সংস্কার ইত্যাদির অনুষঙ্গ উপন্যাসে বিবৃত হয়। *কর্ণফুলী*র ভাষা সাদামাটা; চরিত্র সরল, অকপট, বৈচিত্র্যহীন। *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) আলাউদ্দীন আল আজাদের দ্বন্দ্বাত্মক চেতনা নির্ভর একটি উপন্যাস। উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছদে লেখক দুর্ভিক্ষপীড়িত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাস্তবতাকে তুলে আনেন। উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব উত্তপ্ত কিন্তু নায়ক জোহা থেকে শুরু করে কোন চরিত্রই বহির্মুখি নয়। *ক্ষুধা ও আশা* ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্পৃষ্ট একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। রাজনীতি আক্রান্ত করেছে একটি পরিবারকে; হানিফ ও ফাতেমার বাঁচার অন্বেষায় রতনপুর গ্রাম ছেড়ে এসেছে; পরিত্যক্ত একটা বস্তির ঘরে দুসন্তান জোহা ও জোহরাকে নিয়ে আশ্রয় নেয়। হানিফ ও ফাতেমার সন্তানের জন্য হাহাকার আছে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু জঙ্গমতায় উজ্জীবিত নয় একেবারেই। যদিও ফাতেমা একটি বাসায় কাজ নেয়, হানিফ লঙ্গরখানায় যায় কিন্তু ক্ষুধা আর দরিদ্র তাদের নিশ্চল করে দিয়েছে। স্থবির ও নিষ্প্রাণ অনেকটা। যদিও জোহা দ্রুত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে; তার অন্তর্জগতে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, নতুন প্রেরণা ও উদ্যম সে বলেছে ‘ভিক্ষা চাই না আমি, কাজ চাই! জোহা খেটে খেতে চায়। জোহার অতীতের সুন্দর বর্ণনা আছে; সহপাঠী মিঠু, দরবেশ চাচা সবার স্মৃতি তাকে নতুন পথ দেখায়। জোহার অতীত বর্তমান নির্মাণ করেন লেখক, গোটা উপন্যাসে তাকে সজাগ ও সচল রাখেন। উন্মুল রাখেন। উন্মুল ও চরিত্রটি মর্ত্তুজা চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ষাটের দশকে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় অত্যন্ত প্রাগ্রসর মন নিয়ে স্পর্শকতার একটি সময়কে শিল্পের ফ্রেমে এঁটেছেন। এক্ষেত্রে লেখক আঙ্গিকে প্রাধান্য পেয়েছে, দুভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের ক্ষুধার হাহাকারে নিরন্ন উন্মুল জোহার পরিবার আর শহরে আশ্রিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের চালচিত্র। মধ্যবিত্ত পরিবার মনস্তত্ত্ব, নষ্টালজিক চেতনা, স্বদেশী রাজনীতির আবেগ দামামামুখর বিশ্বযুদ্ধের পাশাপাশি কংগ্রেস-লীগ তথা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত বিভেদ উপন্যাসের বাস্তবতাকে নির্মাণ করেছে। তবে লেখক রচনায় কোন ঘটনাই সুদৃঢ় এবং যূথবদ্ধ (compactness) নয়; নিছক দৃশ্যান্তরের ছায়াপাত আর অতীতচারী আবেগের প্রাধান্য বেশী। জীবনের জঙ্গমতা আর শ্রেণিদ্বন্দ্বের মধ্যে চরিত্রের জীবনীশক্তির উদ্ভাসন নতুন সময়ের ইঙ্গিতকে

তেমন অর্থবহ করে তোলেনি। এক্ষেত্রে লেখককে বেশী অন্তর্মুখী মনে হয়। তবুও ক্ষুধা দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে বাস্তবতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিতে লেখকের মেসেজ : 'দুনিয়াতে জায়গা কেউ দেয় না, জায়গা করে নিতে হয় এবং সে কাজটা যত চতুরভাবে যে করতে পারে সেই তো বড় এবং শক্তিমান।' তাঁর *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২), *পুরুদ্রুজ* (১৯৮৪), *খসড়া কাগজ* (১৯৮৬), *পাটরাণী* (১৯৮৬), *শ্যামল ছায়ার সংবাদ* (১৯৮৬), *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* (১৯৮৬), *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি* (১৯৮৬), *অপর যোদ্ধারা* (১৯৯১), *স্বাগতম ভালবাসা* (১৯৯১), *ক্যামেলিয়া* (১৯৯১), *অনূদিত অন্ধকার* (১৯৯১), *ধানমণ্ডি উপাখ্যান* (১৯৯১), *মাটির সন্তান* (১৯৯১), *অপর যোদ্ধারা* (১৯৯২), *পুরানা পল্টন* (১৯৯২), *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজী* (১৯৯২), *প্রিয় প্রিন্স* (১৯৯৫), *স্বপ্নশিলা* (১৯৯২), *ক্যাম্পাস* (১৯৯৪), *কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা* (১৯৯৬), *বিশৃঙ্খলা* (১৯৯৭), *ঠিকানা ছিলো না* (১৯৯৮), *তোমাকে যদি না পাই* (১৯৯৮), *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* (১৯৯৯), *কায়াহীন ছায়াহীন* (১৯৯৯), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯৯), *জন্মদাতা ১ম পর্ব* প্রভৃতি।

রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১)

রশীদ করীমের প্রথম উপন্যাস *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) অত্যন্ত যত্নের রচনা। কারণ, উপন্যাসটির প্রকরণ পরিচর্যা মূল্য বাংলাদেশের সময় ও ইতিহাসের পরিবেষ্টনে; অন্যান্য উপন্যাসকারদের থেকে স্বতন্ত্র এবং উচ্চমানের ইঙ্গিতবাহি। *উত্তম পুরুষ*-এর গঠন পরিকল্পিত, আত্মপরিচয়ের পূর্বলেখ অংশে উচ্চারণ 'একজন উত্তম পুরুষ প্রথম বচনে এই কাহিনী লিখেছেন।' একত্রিশ খণ্ডে বিভাজিত উপন্যাসটির মূল চরিত্র শাকেরের আত্মকথন, শাকেরকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের পরিবৃত্ত রচিত। রশীদ করীমের উপন্যাসের পরিকাঠামোতে এ গল্প শুধু কলকাতার সমাজ আবহ বিনির্মাণের গল্প নয় তা শাকের-নাসের সাহেবের পরিবারের গল্পও বটে। যে সময়ের পটভূমিতে শাকের চিত্রায়িত সে 'সময়' উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র। উত্তম পুরুষে 'শাকের' বিবৃত, সে লেখক নিজেই, নিজের স্বপ্ন ও তার অনুসন্ধান। লেখক *উত্তম পুরুষ* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ ও কবি আবুল হোসেনকে।

বালিগঞ্জের ফুটবল ম্যাচ, 'আমি ছিলাম রেইনবো ক্লাবের 'লেফট ইন'-—দলের একমাত্র মুসলমান খেলোয়াড়'। সে খেলার মাঠে দুই গোল করা মুশতাক এবং মুশতাকের পরিচয় ও তার পরিবার, সেখানে শাকেরের যাতায়াত শুরু পরম নির্ভরতায়। পরিবার-পরিজন, দুই পরিবার শাকের-মুশতাক, তার ভেতরে সেলিনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ক্রমশ। খুব কিছু পরম মমতার স্নেহের বিষয়ও দাঁড়ায়, ঐতিহ্যিক বা ঐমতো সমাজ-কাঠামোটি ধরার জন্য। পাওয়া যায়, অনিরুদ্ধ

অনুভব, কাছের-একান্তের-ভেতরের। আমি হলেও তা ম্যাক্রো—সামষ্টিক, সবার—সার্বিক কথকতা। নিজের বলেই এগোয়, দৃষ্টিপাতে জীবনের জয়সূচক বারতা। 'আমিও এমন ভাব করতাম যেন তাঁকে দেখিনি; আনমনে গাছের পাতানড়া দেখছি। মায়ে-পোয়ে এই ভাবে ফাঁকি চলত।' নিজেরই অমোঘ আরতি : 'এইভাবে আমার দিন কাটতে থাকে। এক এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক এক দিনে এক এক বছর করে বয়স বাড়তে থাকে'। ক্রনলজিক্যালি বাড়ন্ত চরিত্রের রূপ, পূর্ণায়ত হয় সেলিনা-সান্নিধ্যে, তার ভেতরের সূক্ষ্মতায়, ব্যক্তিত্বের গঠনে, বিকাশে, প্রতিশ্রুতিতে :

> আমার তখন যে বয়স সেই বয়সে এমন তলিয়ে চিন্তা করবার মত বুদ্ধির পরিণতি থাকবার কথা নয়। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক অভ্যাস, রীতিনীতি আদব-কায়দার পিছনে এমন-ধারা অনুচ্চারিত কতকগুলি কারণই কাজ করতে থাকে। এতো ভালই যে রীতি-নীতিগুলি এই কার্যকারণের সূত্রে অগ্রসর হয়।

গোটা সময়ের প্রবাহে, সময়চিত্রের নিগড়ে, ব্যক্তি-প্রতুল বা অপ্রতুল আবহটি চিনে নেওয়া যায়। প্রকৃত সত্যটি বর্ণনায় তৈরি হয়, নিবেদিত হয়, রোমাঞ্চে-প্রণয়ে, ব্যাকুলতায়, ছড়ানো অবক্ষয়ে, প্রতিকৃতির বিকৃতিপনায়। শাকের তা প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়, সাক্ষ্য দেয় আবার তা উপেক্ষিতও হয়। এসব ছল, পেছনটান, পিছুহটা, উন্মূলতা, পুঁজির ক্রূরতা, বিনাশী বুঁদ। রশীদ করীম অনাদ্যন্ত হয়ে ওঠেন এরূপের বর্ণনায়, তীক্ষ্ণ রসবোধের দ্যোতনায়, জীবন পরিতৃপ্তির বিলাসে। এটি *উত্তম পুরুষে* সন্দেহাতীতভাবে একটি সাহসী পদক্ষেপ, এবং নিশ্চয়ই ষাটের উপন্যাসশিল্পের বাস্তবতায়।

রশীদ করীমের দ্বিতীয় উপন্যাস *প্রসন্ন পাষাণ* (১৯৬৩)। *উত্তম পুরুষ*-এর অব্যবহিত পরে লেখা এ উপন্যাসে খুব একটা বড় বাঁক বদল নেই লেখকের। প্রায় একই আঙ্গিকে লেখক বিভাগ-পূর্ব সময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। বর্ণনা-ভঙ্গিও একই রকমের। তিশনা উপন্যাসের মূল চরিত্র আর তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে আলিম, কামিল, ময়না ইত্যাদি চরিত্র। *প্রসন্ন পাষাণে*র মনস্তত্ত্ব বেশ জটিল, অনিকেত-সংশয়গ্রস্ত-দ্বিধান্বিত ও স্ববিরোধী; তিশনার প্রেম-প্রেরণা-প্রতীক্ষা কামিলকে সঙ্গে নিয়ে কারণ, আশ্রিত ফুপুর প্রতি তিশনার অনুরাগ ও তার নানা সময়ের প্রশান্তি ও দুর্বিপাকের সহযাত্রী—ফুপুর সন্তান কামিলের প্রতি সহজ আবেগ-সহানুভূতি। উপন্যাসটির গুরুত্ব অনেকটা আঙ্গিকের গুণে। খুব সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক চরিত্রের ভেতর-বাহিরের রূপকে, সংস্কার মনস্তত্ত্বের সরল-জটিল কিংবা নিন্দা-প্রশংসার রেখাচিত্রে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩) মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ-পর্বে

মধ্যবিত্ত এরফানকে কাহিনি-কেন্দ্রে রেখে তা পল্লবিত হওয়ার প্রয়াস পায়। চলমান যুদ্ধ, শেখ মুজিব, জয়বাংলা, গণপরিষদ, ইয়াহিয়া, মিছিল-জনতা-গুজব ইত্যাদি এমন পরিপ্রেক্ষিতে নগরমধ্যবিত্ত কী করতে পারে? একদিকে পরিবার-ভয়-আতঙ্ক অন্যদিকে যুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। *আমার যত গ্লানিতে* একাত্তরের মার্চ প্রতিবিম্বিত। *প্রেম একটি লাল গোলাপ* (১৯৭৮), *সাধারণ লোকের কাহিনী* (১৯৮১), *একালের রূপকথা* (১৯৮১), *শ্যামা* (১৯৮৪), *বড়ই নিঃসঙ্গ* (১৯৮৫), *মায়ের কাছে যাচ্ছি* (১৯৮৯), *চিনি না* (১৯৯০), *পদতলে রক্ত* (১৯৯০), *লাঞ্ছবক্স* (১৯৯৩)।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

শহীদুল্লা কায়সার পেশাগত জীবনে সাংবাদিক হলেও উপন্যাস লিখে তিনি কালজয়ী শিল্পশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। *সারেং বৌ* (১৯৬২) ও *সংশপ্তক* (১৯৬৫) তার দুটো বিখ্যাত উপন্যাস। দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র-বিধৌত অঞ্চলকে স্থানিক করে *সারেং বৌ* রচিত। এটি জনপ্রিয় উপন্যাস। জনপ্রিয়তার কারণ, কদম সারেং ও নবিতুনের প্রতিজ্ঞাপ্রসূত প্রেম; উপন্যাসে যা সারাক্ষণই বাধাগ্রস্ত হয়েছে ভোগবাদী শক্তির দ্বারা, এবং একইসঙ্গে নবিতুনও প্রতিরোধে হয়েছে সবংসহা শাশ্বত নারী। এটি উপন্যাসের মূল বিষয়; আর তার আবর্তে বামনছাড়ি গ্রাম, সাগর-মোহনার ভয়ঙ্কর ঊর্মিমালা, জীবন-সংগ্রাম, জীবিকা-মাতৃত্ব-সতীত্ব বিবিধ প্রসঙ্গ চমৎকার সমন্বিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শহীদুল্লা কায়সারের ভাষা চরিত্রানুগ। সে কারণে লুন্দর শেখ, গুজাবুড়িসহ প্রায় সব চরিত্রই পরম্পরাশক্তি অর্জন করে। উপন্যাসটির রোম্যান্টিক ভাষায় রয়েছে মানুষের অন্তর্জগতের শাণিত মূর্তির প্রতিফলন; যা তৃপ্তিদায়ক ও রসাস্বাদিত। *সংশপ্তক* রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন উপন্যাস। *সংশপ্তক* 'চিরায়তিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত গদ্য মহাকাব্য'। বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় *সংশপ্তক* কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায় রাজনৈতিক চিন্তা এবং সুসংবদ্ধ মানবিক বিন্যাসের কারণে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চাষী মুক্তির পাশাপাশি নারী মুক্তির জাগরণ উপন্যাসে উঠে আসে যুগান্তরের প্রেক্ষিত থেকে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে কাহিনির সূত্রপাত এমন বাক্যে : 'মিঞাবাড়ির কাচারির সম্মুখে লম্বালম্বি মাঠ। মাঠের পর মসজিদ। সে মসজিদের সম্মুখে বাদ-জুমা মজলিস'। এই মজলিসে হুরমতির বিচার হচ্ছে 'ফেলু মিঞা শুধু মিঞার বেটা ফেলু মিঞা নয়, গাঁও মজলিসের কর্তা। তার ধমকে কেঁপে ওঠে মজলিস।' কোমলে-কঠোরে হুরমতি, নিঃসহায় হুরমতি—মুসলিম রক্ষাকর্তাদের সাজা মেনে নেয় কিন্তু অন্তরে জ্বলে তুষের আগুন; প্রতিশোধের আগুন। লেকুর স্ত্রী আম্বরী, মিঞাবাড়ীর বউ হালিমা, হুরমতি পাশাপাশি অনেকক্ষণ থাকে উপন্যাসে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে

রাজনীতি চেতনা রাবু, মালু, জাহেদ, সেকান্দর মাষ্টারকে ঘিরে। এদের পাশাপাশি ব্যক্তিসর্বস্ব চরিত্র হুরমতি, লেকু এরাও যুদ্ধ-সংক্ষুদ্ধ অভাব-আহাজারীর দেশে নিজের অবস্থান থেকেই মানবীয় প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনাকে লালন করে; রাজনীতির অংশ হয়ে যায়। হুরমতি, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে; ফেলু মিঞা, রমজান কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোরা সেপাই-র রক্ষিতা হলেও শেষ পর্যন্ত 'বহু ধারার প্রবাহিত মানুষের জীবনের' পথে তা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়। ভূমিহীন লেকুর সঙ্গে তার সংসার শুরু হয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুগতিধারার জীবনে যে দর্শনের আবির্ভাব ঘটে লেখক জীবনবাদী চেতনায় তাকেই লালন করেন 'সংশপ্তক' হুরমতি জীবনে যত পঙ্কিলতার পথেই নিমজ্জিত হোক উপন্যাসের এক পর্যায়ে স্বাভাবিক দাম্পত্য ও চাষী জীবনে সে ফিরে আসতে পেরেছে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে ফিউডাল সমাজের যে চিত্রায়ন দেখান হয়েছে; গ্রামীণ অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতের যে বিবর্তিত ধারা উঠে এসেছে বাকুলিয়ায়-তালতলির মেঠো পথ ধরে সেখানে ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে একটা বাক্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন তা হল—'আমাদের মানসিকতাটা এখানো মধ্যযুগীয়, এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং একে দূর করতেই হবে।'

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)

সব্যসাচী লেখক বলে পরিচিত হলেও প্রধানত কবি সৈয়দ শামসুল হক। কবিভাষা আরোপিত হয় কাহিনিতে। তবে কথাকারের অঙ্কনরেখা কিছুতেই বিচ্যুত হয় না। শিল্পের শর্তটি টিকে থাকে তাণ্ডবমুখর কাহিনিতে। সেখানে প্রয়োজনমাফিক প্রবাহ তৈরি হয়, সৃষ্টির অপেক্ষার জন্য অনিবার্যতাগুলি অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। তখন কবি সৈয়দ হক গদ্যকারের পাঠটি আয়ত্ত করে বসেন। নিজের সংযুক্তি ঘটে নাগরিকতার নানা শ্রেণিস্তরের কাঠামোতে। এতেই এমন গুণের জন্য 'সব্যসাচী'র জয়তিলক থেকে যায়। *অনুপম দিন* (১৯৬২) উপন্যাসের বর্ণনায় আধুনিকতা পরিলক্ষিত। 'পাখা হঠাৎ দুরন্ত গতি পেল। তার বাতাসে যেন ঝড় উঠল বিলকিসের শাড়ীতে, চুলে। পাখার কেন্দ্র থেকে সরে আসতেই আবার শান্ত হয়ে গেল সব। বিলকিসকে হঠাৎ রক্তের মধ্যে আপন করে অনুভব করে আবু। মনে হয় তার মাথার ভেতর থাকে একটা শক্তি ফেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দেবে সবকিছু।' আবুর এ মনস্তত্ত্ব—মধ্যবিত্ত প্রবণতার, এমনটার রূপায়ণে একটা গ্লানি, ক্লেদ ও অবক্ষয়চিন্তায় এক ধরনের অস্তিত্ব উন্মূলতার প্রভাব নজরে আসে। মধ্যবিত্ত পরিবারের আবেগ, উন্নাসিকতা, রোমান্টিকতার বিরূপ বসতি এবং দ্বন্দ্বসঙ্কুলচিত্তের চিত্রনাট্য *অনুপম দিন*-এর কাহিনি। *নীলদংশন* (১৯৮১) এ-লেখকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। '*নীলদংশনে* নীলকণ্ঠ যন্ত্রণার যে হলাহল

ধারণ করতে হলো নজরুলকে, তার কারণ সে বাঙালি'; বাবা কাজী সাইফুল ইসলাম, ছেলে কাজী নজরুল ইসলাম। যুদ্ধ শুরু হলে জাফরগঞ্জে যওয়ার পথে ধৃত হয়। তারপর নজরুল বিতর্ক; 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' প্রেরণা হলে—সে 'জয়বাংলা'র লোক, ভারতের অনুচর। নজরুল 'নজরুল'কে অস্বীকার করে না; দুঃসহ নির্যতনেও চেতনা অবসিত হয় না, মনঃপীড়নে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছায়া ফেললেও চেতনাদর্শ কাজী সাইফুলের ছেলে নজরুলের অমলিন। এখানে দায়বোধের বিষয়টিই তার নীলকণ্ঠ-যন্ত্রণা। ছোট্ট পরিসরে, ছোট একটি বিষয়কে সৈয়দ শামসুল হক খুব শক্তিশালী শৈলিতে বাধেন। ফলে তা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যময় তত্ত্ব। আরেকটি উপন্যাস সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১)। ঢাকা ছেড়ে বিলকিসের গ্রামে ফেরার পথে অনিশ্চয়তা, অবরুদ্ধতা, নিরাপত্তাহীনতার চালচিত্র উপন্যাসটি। মুক্তিযুদ্ধ-বর্ণিত হয় তীব্র শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতে *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* (১৯৮৬) অর্থে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে বিলাসী জীবনে; বাংলাদেশের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে; ঝড় তুলেছে চায়ের কাপে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে লিখিত। ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্তের-অস্তিত্ব আর প্রতারক-প্রবঞ্চক; সুযোগে আবার এই যুদ্ধ নিয়েই ফায়দা লোটে—আবদুল হাদী; লেখক বলেন, 'মুক্তির জন্য কষ্ট করতে ভয় পায়... সে যে আশা করে , অথচ প্রকাশ্যে নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করে না...।' কিন্তু নিশ্চিত জয়ের পর্বে সবাই (যেমন বাহাউদ্দিনের পরিবার, হাইকমিশনের কূটনীতিক, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দ) সমর্থনের জন্য আকুল। সৈয়দ শামসুল হক এভাবেই উপন্যাসকে বাস্তবচিত্রের সঙ্গে কার্যকরি করে তোলেন। সেখানে নির্মিত শৈলিই তার অঙ্গীকার। *সীমানা ছাড়িয়ে* (মাওলা ব্রাদার্স সং. ১৯৭৩) পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। জরিনা পূর্ণাঙ্গ চরিত্র। উপন্যাসে শামসুল হক সাবলীল, সংযমী, চিন্তানিষ্ঠ। *আয়না বিবির পালা* (১৯৮৬)য় গীতিকার কাঠামোতে কাহিনি বয়ান করেন লেখক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে ছোটা, বিদেশ পাড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। তেমনি করে শহরেও বস্তিপলি, পতিতাপলিসহ নানা অপরাধের মোকামে পরিণত। তখন আয়নারা প্রথাবদ্ধ নারীর যাবতীয় সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে শহরে আসে। *মহুয়া* পালার অনুসৃতিতে কাহিনিটি রচনা করেন লেখক। *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* একটি আকর্ষণীয় উপন্যাস। কবিতা কিংবা লোকজ চেতনা বা ইতিহাস এখানে বর্ণিত। মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে জলেশ্বরী জনপদের গেরিলা কাহিনি এতে থাকলেও যুক্ত হয়েছে সামগ্রিক জনচেতনার কথা। উপস্থাপনভঙ্গিতে সৈয়দ হক এখানে স্বতন্ত্র। *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *দেয়ালের দেশ* (১৯৫৯), *অচেনা* (১৯৬২), *অচিন্ত্য পূর্ণিমা* (১৯৬২), *জনক ও কালোকফি* (১৯৬২), *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪), *খেলারাম খেলে যা* (১৯৭৩),

দূরত্ব (১৯৮১), *ত্রাহি* (১৯৮২), *অন্য এক আলিঙ্গন* (১৯৮২), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪), *স্মৃতিমেধ* (১৯৮৬), *স্তব্ধতার অনুবাদ* (১৯৮৬), *এক যুবকের ছায়াপথ* (১৯৮৭), *নির্বাসিতা* (১৯৮৭), *কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন* (১৯৮৯), *স্বপ্ন সংক্রান্ত* (১৯৮৯), *না, যেওনা* (১৯৮৯), *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* (১ম খণ্ড-১৯৮৯, ২য় খণ্ড-১৯৯০), *বারো দিনের শিশু* (১৯৮৯), *বনবালা কিছু টাকা ধার নিয়েছিল* (১৯৮৯), *ত্রাহি* (১৯৮৯), *তুমি সেই তরবারি* (১৯৮৯), *কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন* (১৯৮৯), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯০), *নির্বাসিতা* (১৯৯০), *মেঘ ও মেশিন* (১৯৯১), *ইহা মানুষ* (১৯৯১), *কালধর্ম* (১৯৯২), *আমি বাসি তুমি বাসোতো* (১৯৯৩), *মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার* (১৯৯০), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৯০), *বালিকার চন্দ্রযান* (১৯৯০), *জেসমিন রোড* (১৯৯২), *চোখবাজী* (১৯৯৪), *টানটান* (১৯৯৪), *অন্তর্গত* (১৯৯৫), *আলোর জন্য* (১৯৯৫), *বুকঝিম এক ভালোবাসা* (১৯৯৬), *একমুঠো জন্মভূমি* (১৯৯৭), *বৃষ্টি ও বিদ্রাহীগণ* (১৯৯৭), *যৌবন* (১৯৯৭), *শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ* (১৯৯৮), *নারীরা* (১৯৯৯), *বাস্তবতার দাঁত ও করাত* (১৯৯৯), *উড়ে যায় মালতী পরী* (২০০৫), *প্রান্ত পর্যন্ত* (২০১৩), *কেরাণীও দৌড়ে ছিল* (২০১৩) প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রম-উত্তরণ ও রূপান্তরের পর্বটি অঙ্কন করেন সৈয়দ শামসুল হক। এক্ষেত্রে শহর কিংবা গ্রাম দুই'ই তাঁর বিষয়বন্দি হয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্তের মনোজগত, বিকারগ্রস্ততা, যৌনতা, অচরিতার্থতা, আত্মকুণ্ডলায়ন, স্ববিরোধীতা বিচিত্রভাবে নিরীক্ষিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় শ্রেণিচরিত্রের সংঘাত ও সংগ্রামের রূপরেখা কিংবা বহমান লোকায়ত জীবনাচরণের সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপন্যাসে। তবে প্রধানত চরিত্রের স্বরূপানুসন্ধানের প্রত্যয়টিই শিল্পবন্দি তাঁর লেখায়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত সৈয়দ শামসুল হকের *উপন্যাস সমগ্র*-র সাতটি খণ্ড বেরিয়েছে।

শওকত আলী (জ. ১৯৩৬)

বাংলাদেশের উপন্যাসে শওকত আলী খ্যাতিমান। তাঁর দৃষ্টিচেতনার প্রধান অবলম্বন নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত। অধিকাংশ উপন্যাসেই বর্ণনাকৌশলে আশ্রয় পায় এ মধ্যবিত্ত। তবে মধ্যবিত্তের ব্যবচ্ছেদ একটা পর্যায়ে থেমে যায় তাঁর লেখায়। কারণ, ব্যক্তিচরিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক ঘটনা কিংবা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকলেও অবলম্বী চরিত্র হওয়া চাই যাবতীয় সম্ভাবনার নিরিখে। শওকত আলী চরিত্রে সম্ভাবনাকে আনলেও যাবতীয় কার্যকারণে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে উঠতে গিয়ে আড়ষ্টতা পেয়ে বসে। আর শ্রেণিচেতনা বা শোষণ-নির্যাতন অনেকটা পটচিত্র তৈরি করলেও অকারণে উঁকি দিয়ে ওঠে মানবতাবাদী বা জাতিত্ব বিস্তারী

তৎপর ধারণা। সে কারণে সেটিংটি পর্যাপ্ত রস পায় না। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস এমন বাক্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখাই শুধু নয়, তাঁর কৃতিত্ব; রীতিতে বা আঙ্গিকে তিনি যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) পূর্ব-বাংলার গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। মধ্যবিত্ত চরিত্র রঞ্জুর সম্মান ও আদর্শ নিয়ে বাঁচা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় কখনো মহাজন, কখনো কাসেম খান। নব-উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে অর্থাগমে বিকৃত লালসা, ভোগবাদ, অবক্ষয় মনুষ্যশক্তিকে গ্রাস করে। এমনটার শিকার রঞ্জু। *পিঙ্গল আকাশে* বিভাগোত্তর ষাটের মধ্যবিত্তের বিকৃত যৌনতাকে ঘিরে জীবনের অন্যান্য প্রবৃত্তি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও বর্ণিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনচেতনা-ভিত্তিক গদ্যরীতিরই চর্চা করেছেন শওকত আলী। লেখকের *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫), *কুলায় কালস্রোত* (১৯৮৬), *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৮৬) ত্রয়ী উপন্যাস। ষাটের দশকের রাজনীতিতে উত্তাল পূর্ব-পাকিস্তান, তাতে মধ্যবিত্ত চরিত্রের সম্পৃক্তি, রাজনীতির মতপার্থক্য ইত্যাদি এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। সেজান রাজনীতিতে শিক্ষিত, তৃণমূল পর্যায়ে সে সংগঠিত করে কর্মীদের, পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। উপন্যাসে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনা তৈরি হয়েছে পারিবারিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য থেকে। সেখানে রাশেদ আহমেদ সাক্ষী—যার পুত্র মণি হারিয়ে গেছে রাজপথে। মণির বন্ধু সেজান বামপন্থা রাজনীতিক, তাত্ত্বিক। তার মতে, 'সত্যিকার অর্থে যদি কেউ প্রলেতারিয়েত থেকে থাকে তো সে হলো এদেশের কিষাণ—এদের সংগঠিত যদি কার না হয়, ওরা যদি নেতৃত্বে এগিয়ে না আসে তাহলে কোন বিপ্লবী আন্দোলনই সফল হবে না'—সেজান এরূপেই তার চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়। এ চেতনার স্ফুরণের ভেতরেই উপন্যাসে পরিবার, প্রেম, দাম্পত্যসম্পর্ক নিরবধি যথানিয়মে চলতে থাকে। উপন্যাসের বিষয়-অনুষঙ্গি ভাষা সুন্দর ও শিল্পঋদ্ধ। তবে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার বিন্যাস এ উপন্যাসে কাঙ্ক্ষিত শিল্পমাত্রা অর্জন করেনি। *যাত্রা* (১৯৭৬) শওকত আলীর ছোট্ট পরিসরের উপন্যাস। গ্রামে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ এর প্রধান বিষয়। রায়হান মধ্যবিত্ত, পরিবারকেন্দ্রিক, নির্বিরোধী চরিত্র। উপন্যাসটি একাত্তরের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র পরিসরের যুদ্ধকালীন ইতিবৃত্ত। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ বা আশাভঙ্গের বাস্তবতায় লেখা হয়েছে *অপেক্ষা* (১৯৮৫) উপন্যাস। শওকত আলী প্রধানত মধ্যবিত্তের রূপকার। প্রায় উপন্যাসেই মধ্যবিত্তের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রত্যয়ী তিনি। দীর্ঘায়ত সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে মধ্যবিত্তের অবস্থান ও প্রকৃতি যেমন নির্ধারণ করেন তিনি তেমনি একই সঙ্গে তার অবক্ষয়ী বা মূল্যবোধহীন স্বরূপও প্রকাশ করেন তার লেখায়। *অপেক্ষা* এ প্রবর্তনারই আলেখ্য। শওকত আলীর প্রকরণ নিরীক্ষার সবচেয়ে সফল

প্রয়াস *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪)। উপন্যাসটির কাহিনির ভিত্তি ইতিহাস হলেও; চরিত্র-নির্মাণের সূক্ষ্মতা, বর্ণনার অভিনবত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায় এটি কালজয়ী মাত্রায় উৎকীর্ণ। *প্রদোষে প্রাকৃতজন* শৈলিগুণে আরও বেশি আধুনিক। 'রাজপাদোপজীবী যারা, তারা কিছুই করেন না—সম্ভোগ ও ব্যসনে তাদের আসক্তি সীমাহীন। প্রজারা তাদের কাছে যেন পীড়নের পাত্র–পালনের নয়'—এমন প্রতিবেশে উপন্যাসটির আঙ্গিক রচিত হয়। প্রদোষকালে প্রাকৃতজনের নিপীড়ন—শ্যামাঙ্গের বিল্বগ্রাম থেকে বিতাড়ন, উজবট গ্রামে সামন্ত-মহাসামন্ত অত্যাচার, নিরাপত্তহীনতা, অসহায়ত্ব দৃঢ়শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্যামাঙ্গ-লীলাবতীর প্রেম, সদ্ধর্ম অত্যাচার উপন্যাসে একাধারে রোম্যান্স এবং ভয়াবহ আবহ তৈরি করে। *প্রদোষে প্রাকৃতজনে* যে সময়ের কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে গঠিত; সে উপযোগী নির্ধারিত ভাষাও লেখক রচনা করেন। লীলাবতী বাঙালি নারী হিসেবে অনুপম প্রত্নমহিমা পায় বর্ণনার কারণে। কোমল, লীলাবিলাসী নারী ভয়ার্ত, ক্রুদ্ধ ধর্মান্ধতার কালেও সৌন্দর্যময়ী—গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে দেশান্তরী মানুষ, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারী, অনাচার বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি শওকত আলীর *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) উপন্যাস। *দলিল* (২০০০) কেন্দ্রীয় চরিত্র রায়হানের ভেতর দিয়ে *ওয়ারিশ*কে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। *সম্বল* (১৯৮৬)এ দুটি গল্পকে এক সুতোয় বেধেছেন লেখক। বিন্দুবাসিনীর আশ্রয় ও নিরাপত্তার পটচিত্র বহুবঙ্কিম হয়ে উঠে আসে উপন্যাসে। এছাড়া *গন্তব্য অতঃপর* (১৯৮৭), *ভালবাসা কারে কয়* (১৯৮৮), *যেতে চাই* (১৯৮৮), *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯০), *উত্তরের খেপ* (১৯৯১) তাঁর উল্লেখনীয় উপন্যাস।

রাবেয়া খাতুন (জ. ১৯৩৫)

রাবেয়া খাতুন বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশিষ্ট—তাঁর শৈলিগত প্রকাশগুণ; মধ্যবিত্ত জীবনাগ্রহের চিত্রায়ণ, স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিকোণ নির্ণয় থেকে। 'মধুমতী' নদী হলেও এ তীরবর্তী মানুষের মনস্তত্ত্ব, বাঁচার অবলম্বন, দৈনন্দিন জীবনাগ্রহ—উপন্যাসের উত্থাপিত শিল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে। *মধুমতী* (১৯৬৩) ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাস। শিল্পিত সম্ভাবনার সূত্রে লেখকের এ উপন্যাসটিতে আমরা পাই এক ধরনের মনস্বিতা। ঘটনাপ্রবাহে আঞ্চলিক ভাষাচেতনার (বিক্রমপুর এলাকার) বয়ানের প্রচেষ্টা আছে। যদিও তার যথাযথ প্রতিফলনের সুযোগ উপন্যাসে ঘটেনি। তবে প্রচেষ্টার আন্তর-প্রবাহে জীবনসমগ্রতার সূত্রগুলো এখানে নিরূপিত। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে কথিতের মা, নানা, মামা, মামী, খালা, খালু—বিশেষত বয়ানকারীর নানার বাড়ীর ঘটনা; পেশায় অঞ্চলের অনেকেই তাঁত ব্যবসায়ী, ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ 'মধুমতী'র হাতে। কিন্তু অঞ্চলের মানুষের সম্প্রীতি, বাঁচার বা

মর্যাদার পেছনে তারা খুব ঐতিহ্যানুগ; ইতিহাসকেন্দ্রীক। কালস্রোতে পেশার বিবর্তন পরিবর্তন ঘটে, বাস্তবতাও একরকম থাকে না কিন্তু চিত্তে অতীতকাতর একটা সুখ থাকে সবার মনে। বর্ণনায় যুক্তিনিষ্ঠা, ভেতর পটের অন্তর্দাহ নির্ণয়, আর ভঙ্গুর সামন্তবাদের পদধ্বনি স্পষ্ট *মধুমতী* উপন্যাসে। *রাজারবাগ শালিমারবাগ* (১৯৬৯) দুটি অংশে বিভক্ত উপন্যাস। 'রাজারবাগ সত্যি সহরতলী থেকে শহর হতে চলেছে। কিন্তু তাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক তখন থাকবে কি আশ্চর্য্য পরিহাসের' উঠতি মধ্যবিত্ত ফিরোজ কিংবা রুহির মানসলোক, শালিমারবাগও এ শ্রেণির সম্প্রসারিত রূপ। *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৫), *মেহের আলী* (১৯৮৫), *অনন্ত অন্বেষা* (১৯৬৭), *ই ভরা ভাদর মাহ ভাদর* (২য় সং. ১৯৯৫), *সাহেব বাজার* (১৯৬৯), *মন এক শ্বেত কপোতী* (১৯৬৫), *অনেকজনের একজন* (১৯৭৬), *জীবনের আর এক নাম দিবস রজনী* (১৯৮০), *নীল নিশীথ*, *পাখি সব করে রব*, *বায়ান্ন গলির এক গলি* (১৯৮৪), *নীল পাহাড়ের কাছাকাছি* (১৯৮৫), *বাগানের নাম মালনিছড়া*, *এই বিরহকাল* (১৯৯৫), রাবেয়া খাতুনের *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (১৯৯৫), *প্রিয় গুলশানা* (১৯৯৭), *শঙ্খ সকাল* প্রকৃতি (২০০৫), *উপন্যাস সমগ্র-১* (২০০৫), *স্বপ্নে সংক্রামিত* (২০০৬) প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)
প্রকৃতঅর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়েসে লেখা শুরু। অজস্র লিখেছেন, প্রধানত উপন্যাস। ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি আশ্রয়ী উপন্যাস। কিন্তু লক্ষ্য দেশপ্রেম। সত্যেন সেনের রাজনৈতিক দর্শনে মানবমুক্তির ইঙ্গিত থাকে; তাই কাহিনিকে চালিত করে। *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৭) প্রথার বিরুদ্ধে, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রগতির দ্বন্দ্ব ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াস। যদিও যেরিমিয়া-জিল্লা, গেদালিয়া-সারার প্রেম উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মাত্রা। উপন্যাসে কাহিনি শুরু যেরিমিয়ার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহীর অভিযোগের মাধ্যমে। প্রজাশোষকের নিষ্পত্তির দরকার। প্রজন্ম-পরম্পরায় গেদালিয়ার নেতৃত্ব উঠে আসে। ক্যালিদীয় শাসনের অবসানের প্রস্তাবনা আসে। এসব রাজনৈতিক তত্ত্বের বাইরে যেরিমিয়ার প্রেমিকা 'অভিশপ্ত' জিল্লার প্রেমের পরিশুদ্ধির পথটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমার সান্নিধ্যে অভিশাপ, আমার নিঃশ্বাসে অভিশাপ আমার সংস্পর্শে অভিশাপ। সেই জন্যেই আমি আমার একান্ত প্রিয়জন থেকে বহুদূরে সরে থাকতে চাই।' *অভিশপ্ত নগরী*র মূলকথা, 'য়িহুদী সমাজের ধারাবাহিক ট্র্যাজেডির পিছনে সমাজের কোন কোন শক্তি কিভাবে কাজ করেছে; রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; ধর্মের আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব অন্তঃসারহীনতার বিরুদ্ধে

বিবেকের বিদ্রোহ—এখানে যা নবী যেরিমিয়ার প্রত্যাদেশে উচ্চারিত; সংক্ষেপে রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও নবী—এই ত্রিমুখী সংঘাত য়িহুদী সমাজের বৈশিষ্ট্য তার নিখুঁত বিশ্লেষণে এখানে সমুপস্থিত।' *অভিশপ্ত নগরী*র দ্বিতীয় খণ্ড *পাপের সন্তান* (১৯৬৯)। যিরুশালেম পতনের পঞ্চাশ বছরের পরের কাহিনি এখানে বিধৃত। প্রতিরোধের যুদ্ধ, যিরুশালেম পুনরুদ্ধার-পুনর্গঠনের প্রত্যয়, যিহুদীদের দাসবৃত্তির মুক্তি—এসব কর্মে ফিনিক্সনায়ক নেহেমিয়া; আর বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল সনবল্ল-াট, টোবিমা। এরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝে প্রাণস্বরূপ অনিবার্য প্রেম—মিকা-শদরা কিংবা হানানী-নহিমা এমন জাতপাত ভেদ-বিভেদ অতিক্রান্ত মায়া-ভালোবাসা। সত্যেন সেনের বার্তা, 'য়িহুদী জনগণের প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে নতুন যিরুশালেম গড়ে উঠল বটে, কিন্তু ধর্মোন্মাদয়িহুদী সমাজপতিদের ধর্মের গোড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল সমাজের ও তীব্র পরজাতিবিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মধ্বংসী আবর্তনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। শাস্ত্রীয় বিধান মানবিকতাকে গ্রাস করে চলল—ধর্মীয় অন্ধতার বেদীমূলে নিষ্কলঙ্ক 'পাপের সন্তান'দের বলি হতে লাগল'। সত্যেন সেন হিন্দু-মুসলমান ধর্মভিত্তিক দেশ তৈরিকে কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসে গ্রহণ করেন না। ভুঁইফোঁড় এ তত্ত্বের পরিণতিতে উপমহাদেশের মানুষের কী ফল হয়েছিল তারই ছায়াচিত্র *পদচিহ্ন* (১৩৭৪) উপন্যাস। সুবিনয় ও আনিস দুই ধর্মের চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাসের কাহিনি। শ্রীপুর গ্রামের অতীতকথা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, অনিশ্চয়তার চিত্র উপন্যাসে বর্ণিত। আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতিতে বন্ধু হিসেবে আনিসের সুবিনয়ের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ কেউ স্বাভাবিকভাবে নেয় না। দুই বন্ধুতে হিন্দু-মুসলিম জমিদার, দেশভাগ, সংখ্যালঘু বিতাড়ন, রাজনৈতিক পরিশুদ্ধি, সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা ও নিরাপত্তা বিষয়ে অনেক আলাপচারিতা কাহিনিতে প্রবিষ্ট। সত্যেন সেনের মানবতার শর্ত এখানে বর্ণিত। লেখকের *উত্তরণ* (১৯৭০) তুলনামূলক উন্নতমানের, বিশালব্যাপ্তির উপন্যাস। মালেক চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ এ উপন্যাসে। তার দর্শনদৃষ্টি কাহিনিতে উচ্চারিত। একদিকে মালেকের বেড়ে ওঠা, খালাসী রহমানের মাধ্যমে তার ডকে চাকরি—সেখানে বিচিত্র অভিজ্ঞতা; অন্যদিকে মালেকের আত্মজিজ্ঞাসা, চাকরি বদল, গ্রামের নস্ট্যালজিয়া উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যলঘু হত্যা বিধৃত। ঘটনাক্রমে স্বাধীনরাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান স্থানান্তর, লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব, শ্রমিক আন্দোলন উত্তেজনা ইতিহাসের সাক্ষ্যে পরিণত হয় উপন্যাসের কাহিনি। সত্যেন সেনের এ উপন্যাসের মাত্রা তৈরি হয় ঐতিহাসিক সত্যের পটভূমে; যেখানে চরিত্রকে ছাপিয়ে ওঠে কালপরিসর। *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৩৭৬) কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক; তার শৌর্য-বীর্য, নেতৃত্ব ও পূর্বপর ইতিহাস নিয়ে রচিত। দিব্বোকের গড়ে ওঠা, শোষক-শোষিতের স্তূপে তার

সংগঠন দৃঢ়তা কাহিনিগদ্যে বিধৃত। বরাহস্বামীর বিপরীতে কৈবর্ত-প্রতিরোধ; তাদের আর্থনীতিক নিষ্পত্তি উপন্যাসটিতে গৌড়িয়-সংস্কৃতির পরিকাঠামোয় মাত্রা পেয়েছে। উপন্যাসটিতে শুধু দিব্বোকের প্রতিষ্ঠা-প্রক্রিয়া দেখানো নয়; দিব্বোকের মৃত্যুর পর সে অর্জিত, কাঙ্ক্ষিত রাজ্যের নিশানটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে পরভু ও আকনের নিকট। এভাবে একটা আকাঙ্ক্ষার জয় রচিত হয় ঔপন্যাসিকের রচনায়। *এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে* (১৯৭১) কালী নদীর তীরবর্তী মানুষের ভাঙা গড়ার কাহিনি তবে যুক্ত আছে কৃষিভিত্তিক-গ্রামজীবনের জিজ্ঞাসাও। প্রধান চরিত্র বাচ্চু। বাচ্চুকেন্দ্রিক এ উপন্যাসের সমস্ত ভাঙা-গড়া। জন্ম-মৃত্যু অভিজ্ঞতা, শোষণ-নির্যাতন, হিন্দু-মুসলিম সঙ্কট যাবতীয় অভিজ্ঞতায় উপন্যাসের এ চরিত্র তের পরিচ্ছেদের পরেই পরিপক্ব হয়ে ওঠে। তারপর যথারীতি দাঙ্গা, দখল, মোকদ্দমা দুই তীরের জনগোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বাত্মক হয়ে ওঠে। সত্যেন সেন ভাঙা-গড়ার স্বরূপকে ব্যঞ্জনায়িত কনের সামূহিক ব্যাপকতায়। তাঁর প্রকরণে যে আদর্শায়ন তা এ উপন্যাসে তিরোহিত হয় না। *আলবেরুনী* (১৩৭৬ ব.) রচনায় যথারীতি সত্যেন সেনের কমিটমেন্টই বেশি কাজ করেছে। দেশ-ধর্ম-জাতিত্বের উর্ধ্বে কাম্য মানবমুক্তির প্রসঙ্গটিই এতে বড়। যদিও নিখাদ এক চরিত উপন্যাসই এটি হওয়ার কথা। আরবেরুনীকে শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে বাঁধেননি সত্যেন সেন ত্যাগী-সত্যান্বেষী-প্রগতির পক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ করে শিল্পিত করে তুলতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে গজনী, লওয়াহর, খারিজম ঐতিহাসিক সত্য হয়ে আসে। সেখানে বেড়ে ওঠা বেরুনী, তার প্রতিবন্ধকতা, প্রথাগত মূল্যবোধে অনাস্থা, অনুশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠা, মানবিকতা—এরূপে আলবেরুনী রচিত। *কুমারজীব* (১৯৬৯) ও তাঁর চরিত উপন্যাস। *পুরুষমেধ* (১৯৬৯) সত্যেন সেনের ইতিহাস-নির্ভর হলেও শ্রেণিচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয় পৌরাণিক চরিত্র উলুপীর মধ্য দিয়ে। উদ্দিষ্ট আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সত্যেন সেনের উপন্যাসের বড় ত্রুটি। এজন্য অনেক উপন্যাস লিখলেও বাংলাদেশের উপন্যাসে তার অবস্থান দৃঢ় হয় না। *সেয়ানা* (১৩৭৫), *ভোরের বিহঙ্গী* (১৩৬৬ ব.), *রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ* (১৩৭৩ ব.), *সাত নম্বর ওয়ার্ড* (১৩৭৬ ব.), *মা* (১৩৭৭ ব.), *অপরাজেয়* (১৩৭৭ ব.)।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)

আনোয়ার পাশার প্রথম উপন্যাস *নীড় সন্ধানী* (১৯৬৮)। পাকিস্তান জন্ম-পরবর্তী নয় বছর এ উপন্যাসের ঘটনাক্রম। হাসান মধ্যবিত্ত চরিত্র। আত্মগ্লানি, হতাশা এ চরিত্রের মধ্যে বিরাজমান। সাম্প্রদায়িক-মনস্তত্ত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সমাজ-রাজনীতিতে কিরূপে বিচ্ছুরিত তার প্রতিফলন নীড়হারা হাসানের গ্লানিতে

ধরা পড়ে। আনোয়ার পাশার শিল্পদৃষ্টির প্রতিরূপ হাসান চরিত্রটি। সে সাম্প্রদায়িকতাকে শুধু ঘৃণাই করে না, নিজে এ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং তার উপায় খোঁজে। ছোট্ট পরিসরের উপন্যাস *নিষুতি রাতের গাথা* (১৯৬৮)। *নীড় সন্ধানী*র মতো এখানকার বিষয়ও তৎকালীন ভারতের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প। অনেক চরিত্র আছে উপন্যাসে কিন্তু বিস্তৃতি না থাকায় তেমন রেখাপাত সৃষ্টি করে না। সুতপা-সুদীপ্তর কাহিনিই কবিতার মতো, স্বগতোক্তি যেন রাতের—প্রতীকী বার্তা আসে। কিন্তু ক্রমশ কাহিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার আবর্তে, প্রশ্নবিদ্ধ মানবিকতার ক্ষেদে পর্যবসিত। আনোয়ার পাশার শেষ উপন্যাস *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩)। প্রতীকী অর্থে 'রাইফেল' আগ্নেয়াস্ত্রের দম্ভ, 'রোটি' অর্থনৈতিক ক্ষুধা আর 'আওরাত' ওঁদের রুচিবোধ। অর্থাৎ অস্ত্রের দম্ভে, আর্থনীতিক বঞ্চনায় শুভশক্তিকে বিকৃতরুচিতে পরাস্ত করতে চাওয়া। কিন্তু তা কি সম্ভব! রুচিহীন অপশক্তির দল তো সত্যান্বেষী নয়। বৃথা চোরাবলিতে তাৎক্ষণিক পিশাচ মত্ততায় লিপ্ত হয়। এমন ক্ষেদেই আনোয়ার পাশার উপন্যাস রচিত হয়। একাত্তরের এপ্রিল থেকে জুন উপন্যাসটির রচনাকাল। নায়ক সুদীপ্ত শাহীনের চেতনার প্রবাহে মার্চের পঁচিশ থেকে আটাশের ভোর পর্যন্ত ঘটনাবলি কাহিনিসূত্র তৈরি করে। সুদীপ্ত শাহীন দেখে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে মানবতাকে পর্যুদস্ত করার তৎপরতা। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত প্রবণতায় স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা—সেখানে খালেক-মালেক, আহমেদুল হক এদের কর্মকাণ্ড স্মৃতি-অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়। কাহিনিতে এসব চরিত্রের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি শাসক-গোষ্ঠীর বিপরীতে পূর্ব-বাংলার অধিকার সচেতন জনগোষ্ঠীর ওপর নির্মম ও ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞের শিল্পচিত্র উঠে আসে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনের ইতিবৃত্তও সুদীপ্ত শাহীনের মুখে জানা যায়। সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে মানুষ হত্য, সংখ্যালঘু নির্যাতন, রাজাকারদের বর্ণচোরা রূপ, ধর্মীয় জিগির তুলে বা রাষ্ট্রদ্রোহীর কথা বলে সমস্ত অন্যায়ের স্বীকৃতি নেওয়া, বুদ্ধীজীবী হত্য কিংবা গণহত্যার কারণে রাষ্ট্রের হীন ষড়যন্ত্র এসব ইতিহাসের পরম্পরায় কাহিনিতে নির্মিতি পায়। সেখানে সুদীপ্ত শাহীন চেতন-অচেতন প্রবাহে বিরাজমান। *রাইফেল রোটি আওরাতে*র ভাষা পরিশুদ্ধ, বুদ্ধি ও বিবেকের তাড়নাপ্রসূত। উপন্যাসটির রাজনৈতিক-বীক্ষার মূল্যায়ন গুরুত্ববহই বটে। তবে আনোয়ার পাশার কাহিনিগদ্য সমস্যাপ্রধান ও নিরীক্ষাপ্রবণ; সন্দেহ নেই। শিল্প-নির্মাণের চেয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের সমস্যাই তাঁর সৃজনজগতকে বেশি অধিকার করে রাখে। ফলে তাঁর শিল্প হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যেখানে সমস্যার নিষ্ক্রান্তি ও তার নিজের দায়মুক্তির আকুতি মোটা দাগে উঠে আসে।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

সূর্য তুমি সাথী (বাংলাদেশ সং-১৩৭৫) শ্রেণিচেতনা ও অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের দৃঢ় আঙ্গিক নির্ভর উপন্যাস। একদিকে খলু মাতবর, জাহেদ বকসু, কাদির মিয়া, অধর বাবু অন্যদিকে হাসিম, হিমাংসু, চন্দ্রকান্ত। শ্রেণিচেতনায় হাসিম নিজের পরিচয় থেকে শুরু করে নিজের অস্তিত্ব নিয়েও সঙ্কটে পড়ে। হাসিমের স্ত্রী সুফিয়ার মৃত্যুর পর নবজাতকের লালনের ভার নেয় হরিমোহনের মা। অনেক প্রতিকূলতায় এক সময় আবার সে হয়ে যায় নিঃসন্তান মুনীরের পুত্র। ধর্মীয় প্রসঙ্গটির প্রতি দৃষ্টি আছে লেখকের—পাকিস্তানে যেটা অচল। এদিকে কৃষক সমিতির সদস্য ও কর্মকাণ্ড এক লাইনে শামিল করে শ্রমজীবী সাধারণ জনতাকে—রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে উপন্যাসে। খলু মাতবর, হাসিম স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। শ্রেণিশোষণ ও সম্প্রদায়গত ভেদ-বিভেদকে চরিত্রগাত্রে নিপুণ শিল্পসতর্কতায় প্রয়োগ করেন। আহমদ ছফা ব্যতিক্রমি ও কমিটেড লেখক। পশ্চিমবঙ্গের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থীশিবির, কলকাতা থিয়েটার রোড, হিন্দু-মুসলমান চেতনা, ভারতীয় সেনাবাহিনির অবস্থান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির ভেতর বাইরে তৎপরতা *অলাতচক্র* (১৯৯০) উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসে কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের একটি সময়ের জীবন বাস্তবতা। অত্যন্ত সচকিতভাবে ছফার উপন্যাসের নায়ক দানিয়েল অবলোকন করে কলকাতার থিয়েটার রোডের জীবন চিত্র, প্রিন্সেপ স্ট্রিটের অফিসের অবস্থা। নজরে আসে তার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিতর্ক, শেখসাহেব কিংবা তাজউদ্দীন সম্পর্কে মন্তব্য; কখনো কূটনৈতিক সাফল্য-বৈফল্যের তার্কিক উত্তেজনা। উপন্যাসের পুরো পরিসর কলকাতা শহর; আর চলমান মুক্তিযুদ্ধের তাণ্ডব। অনেক সমস্যা ও সাফল্যের সংবাদ যেমন আছে দানিয়েলের মুখে, তেমনি সমস্যায় আকীর্ণ জীবনযাত্রা যেখানে হতাশা ও নৈরাশ্যের করাল ছায়ায় তার ম্রিয়মান চৈতন্যের অবভাসও সুস্পষ্ট। উপন্যাসে দানিয়েল নিজে ঠাঁই নিয়েছে বৌবাজারে, চাকরি করেছে পত্রিকা অফিসে। কলকাতা এসে পুরনো বন্ধু তায়েবার সান্নিধ্যে আসে; হাসপাতালের কেবিনে যে ডা. মাইতির কাছে চিকিৎসারত। নরেশদা, ডা. মাইতি, মাসুম, আজহার, ডোরা, জাহিদুল, সুমান্ত, রশিদ ইত্যাদি নানাবিধ চরিত্র উপন্যাসে খুব স্বল্প পরিসরে কিছু ঘটনার চালচিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়। যুদ্ধকালীন একটি বাস্তবতাকে শিল্পের ফ্রেমে আঁটানোর জন্যই লেখকের এ প্রয়াস।

আহমদ ছফার উপন্যাসে আছে পশ্চিম বাংলার মুক্তিযুদ্ধের চালচিত্রের অনুপঙ্খ বিবরণ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লেখক মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনাটাই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য করেছেন। একটা অস্থির সময়ের স্পর্শকাতর কিছু রাজনৈতিক চরিত্র ও ঘটনার তাৎপর্য বয়ান করে মেসেজ প্রদান করেন লেখক।

স্বাদু গদ্যে লেখা এ উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ের সেন্টিমেন্ট ক্ষুদ্র কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার গ্রথিত হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক কাহিনী গ্রন্থনে মনোযোগ না দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই অধিকতর বিবেচনায় এনেছেন। শিল্পীর রাজনৈতিক দায় আছে কিন্তু আহমদ ছফা এক্ষেত্রে একেবারেই নন্দনতত্ত্বের দিকটা এড়িয়ে গিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন। উপন্যাসে উত্তেজনা আছে—একজন ইতিহাসকারের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি পাঠককে সে পথে পরিচালিত করে।

মাইতির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মতামত এবং ডোরা, জাহিদুল, আজহার, মাসুমের সাক্ষাৎ উপন্যাসের প্রাথমিক পর্ব। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতি গতিবিধি; প্রকৃত সত্যতায় তুলে আনার প্রয়াস উপন্যাসটি। এমন বাস্তবতাকে ঘিরে শেখ সাহেব, তার আটকাদেশ, তাজউদ্দীন নেতৃত্ব; অন্যান্য নেতাদের সম্পর্ক-সম্পৃক্তি, প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব, শরণার্থী নিয়ে গুজব, কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ কাহিনিতে ইতিহাসের আলোকে বিধৃত। আহমদ ছফা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটা সামগ্রিক প্রয়াসে ধরতে চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাহিনির মৌল প্রতিপাদ্য মুক্তিযুদ্ধের অনালোকিত অংশ; যেখানে কলকাতার-একাত্তর তার প্রধান বিষয় হয়েছে। *একজন আলী কেনানের উত্থান পতন* (১৯৮৯), *মরণবিলাস* (১৯৯০), *ওঙ্কার* (১৯৯৩), *গাভীবৃত্তান্ত* (১৯৯৪), *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ* (১৯৯৬)।

অজয় ভট্টাচার্য (১৯১৪-১৯৯৯)

নানকার বিদ্রোহের ঐতিহাসিক, বামপন্থি সংগঠক অজয় ভট্টাচার্য উপন্যাসের মধ্যে বিশ্বাসের বা আদর্শের ফলশ্রুতি দেখতে চান। কিন্তু উপন্যাসের জন্য যে শিল্পদৃষ্টি তার প্রকাশ *কুলিমেম* (১৯৭০), *অরণ্যানী* (১৯৮৩), *বাতাসীর মা* (১৯৮৫)র মধ্যে আছে। রিংচেরা চা-বাগান শ্রমিকদের কর্মানুষঙ্গ, সংস্কার-রীতি, প্রেমপ্রবৃত্তি *কুলিমেমে*র মূল প্রতিপাদ্য। মূলচরিত্র নটিয়া—তাকে ঘিরেই কাহিনির উত্থান-পতন। বিদেশী বাবু এন্ডার্সন, ডাব্বুদের কর্তৃত্ব অস্বীকার, শ্রমের মূল্য পাওয়া, মর্যাদায় বেঁচে থাকার লড়াই চলে কাহিনিতে। উপন্যাসে শুধু নটিয়াদের শ্রমিক অধিকার হরণ নয়, রুপিয়ার মতো প্রেমিক স্ত্রীকেও কৌশলে অঙ্কশায়িনী করে স্বাভাবিক জীবনকে নষ্ট করে দেয় বিদেশী বাবুরা। কৌম গোষ্ঠীর এমন অসহায়ত্ব থাকলেও কর্মে প্রমাণ করে নটিয়া—তারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ রিংচেরা বাগানের অচল কলকে একমাত্র সে-ই সচল করতে পারে। ঔপন্যাসিকের আশাবাদ; শ্রমীদেরই জয় এবং তাদের অনিবার্যতাই সভ্যতার নির্মিতি। কাহিনি প্রকরণবন্দি হয় এমন প্রত্যাশার ভেতরে। ত্রিপুর নৃ-গোষ্ঠীর নির্যাতন, পীড়ন এবং একই সঙ্গে অমিত সম্ভাবনার শক্তি নিহিত *অরণ্যানী* উপন্যাস। প্রাকৃতজন লক্ষ্মণ ও

সাবিত্রী অরণ্যের ফলমূল ও চাষাবাদে বা শিকার ধরে বেঁচে থাকে। কিন্তু কখনো পাগলা হাতির আক্রমণ, কখনো প্রকৃতি তাদের বাধা হয়ে আসে। আবার তারা নতুন আশ্রয় খোঁজে। কৌম জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে এ সংগ্রাম নতুন নয়। কিন্তু অজয় রায়ের উপন্যাসের মূল বিষয়, বহিরাগত আধিপত্যে কৌম-নিবাসের বিলয়-বিতাড়ন এবং সংগ্রামীশক্তিতে মুক্তির ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণ। এক সময় বাধ্য হয়ে উপন্যাসের নায়ক লক্ষ্মণ সরকারি বনমহালে আশ্রয় নেয়। তারপর ক্রমশ লক্ষ্মণের জীবন-যাপন পাল্টাতে থাকে। সাহেব-মেমের আশ্রয়ে-হুকুমে পূর্বের কোমল অরণ্য-দৃষ্টি আর থাকে না। উপন্যাসে সরল, কোমল কৌম 'হুকুমের দাস' লক্ষ্মণ শহরে গেলে; নিরপরাধ হাজতবাস, অতঃপর পলায়ন। তারপর পুলিশ-বনরক্ষীদের বেগার পল্লীতে হামলা, বিতাড়ন। অজয় রায় ত্রিপুর নৃ-গোষ্ঠীর লক্ষ্মণ এবং সাবিত্রির সঙ্গে পৌরাণিক চরিত্র যেমন রাম, দশরথ প্রমুখকে নিয়ে আসেন। প্রাকৃতজনের কাতারে আর্যচরিত্রের সংযুক্তি; অনার্যকরণ ছাড়া আর কি? শেষাবধি সংঘবদ্ধ ত্রিপুর কৌমের মুক্তিই প্রধান্য পায় লেখকের কাছে। উপন্যাসের ভাষা-বর্ণনে আরণ্যক পরিবেশ আর অন্তেবাসীর প্রতিরোধ-শক্তি খুব দৃঢ়মাত্রা, সন্দেহ নেই। স্থান-কালসীমার বাইরে ত্রিপুর জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে আধিপত্যের বাইরে অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা প্রকৃত মানবমুক্তির জয়গাথাই রচিত হয়।

চার.

উপর্যুক্ত ধারায় অপ্রধান ঔপন্যাসিকগণের নাম অনস্বীকার্য। **হুমায়ুন কবির** (১৯০৬-১৯৬৯)র উপন্যাস *নদী ও নারী* (১৯৪৫)। নজুমিয়া, আসগর, নুরু ও মালেক এই তিনখণ্ড নিয়ে রচিত *নদী ও নারী* উপন্যাসটি। এটিই তাঁকে বিখ্যাত করেছে। চমৎকার বিশুদ্ধ গদ্য হুমায়ুন কবিরের। জীবনের বিচিত্র দিকের অনুসন্ধান আছে প্রান্তিক চরিত্রের ভেতরে। এমন ভাষারীতিও গড়েছেন লেখক উপন্যাটিতে। নদী ও নারী এখানে একাকার—যাবতীয় চিন্তনে জীবনে ও সংগ্রামে, ভাষার জঙ্গমতায় লেখকের এ উপন্যাস হয়ে উঠেছে প্রাণপ্রাচুর্যময়। বাংলা সাহিত্যে অনুকরণীয় এ লেখক গভীর জীবনচেতনায় তাঁর ভাব-ঐশ্বর্যকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত। **আশরাফ উজ জামান** (জ. ১৯১১)র *মন্‌জিল* (১৯৪৮) দেশভাগের ঘটনা নিয়ে রচিত। কলকাতা দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ অঙ্কিত হয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। বাঙালি মুসলমানের পুঁথিপরিবারের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত *শায়েরনামা* (১৯৫৮)। বাংলাদেশের উপন্যাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলেও মুসলিম জীবনাগ্রহের বাস্তবতাটিই মূলত তাঁর উপন্যাসে বিধৃত। **আকবর হোসেন** (১৯১৫-১৯৮১) বিভাগ-পূর্ব কালের শিল্পী হলেও; তাঁর সবকটি উপন্যাসই বেরিয়েছিল বিভাগোত্তর কালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *অবাঞ্ছিত* বেরিয়েছিল ১৯৫০-এ। তাঁর

সর্বশেষ উপন্যাস *দুষ্টক্ষত* (১৯৮৯)। *অবাঞ্ছিত* এক প্রণয়বঞ্চিত নারীর অধিকার নিয়ে রচিত। তাঁর *কি পাইনি* (১৯৫২) আর্থ-সামাজিক পটে রচিত দ্বন্দ্বসঙ্কুল এক জীবনের কাহিনি। এ উপন্যাসে নিছক প্রেম নয় শ্রেণি-শোষণের মাত্রাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতার নিরিখে। *মোহমুক্তি* (১৯৫৩), *ঢেউ জাগে* (১৯৬১), *দু'দিনের খেলাঘরে* (১৯৬৫), *মেঘ-বিজলী বাদল* (১৯৬৮), *নতুন পৃথিবী* (১৯৭৪), *আভা ও তার প্রথম পুরুষ* (১৯৮৮) তার উপন্যাস। এসব উপন্যাসে প্রচলিত পুরুষতন্ত্র, নারীর অবহেলিত জীবনদৃষ্টি, লৈঙ্গিক অসাম্যে নির্ধারিত শোষণ ইত্যাদি প্রকরণবন্দি হয়েছে। লেখকের মননধর্ম সেখানে এক সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞানে চিহ্নিত। **সুবোধ লাহিড়ী** (১৯১৭-২০০১)র একমাত্র উপন্যাস *ভস্তার বিল* (১৩৭৬)। স্বল্পায়তনের উপন্যাস এটি। জাল-জলার ধ্রুপদী স্থাপত্যে গড়ে উঠেছে নিম্নবর্গীয় জনতার মর্যাদার স্থানচ্যুতির সংগ্রামমুখর কাহিনি। বিলকেন্দ্রীক রণবীরবালা, সালফা, সুবলীর জনপদের ইতিবৃত্ত। ঘনলেন্সের শিল্পের নিখুঁত শৈলি—এই ভস্তার বিল। **মিরজা আবদুল হাই** (১৯১৯-১৯৮৪)র *ফিরে চলো* (১৯৮১) উপন্যাস অনেকটা সাংবাদিকসুলভ। কাহিনিতে একাত্তর ও তার পরবর্তী সময়ে বাঙালি সামরিক-বেসমারিক কর্মকর্তাদের বন্দিদশা ও মুক্তির আকুতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশার চিত্র বিশ্বস্তরূপে বর্ণনার প্রয়াস আছে। তবে লেখকের বর্ণনায় একটি পাকিস্তানী ও বাঙালি পরিবারের সহাবস্থান, সহানুভূতির প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। *ফিরে চলো* বিশেষ সময়ের পটে রচিত। *তোমার পতাকা* (১৯৮৪) সামাজিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও এসেছে। কিন্তু যুদ্ধের বাইরেও সামাজিক দায় মনস্তত্ত্বের টানাপড়েন উপন্যাসের ঘটনাকে গতি দেয়। একদিকে লিলি-সেকান্দরের পুরনো অতীত ছেড়ে নিবিড় ঠিকানায় প্রত্যাশী হতে চায় অন্যদিকে সহায়হীনের আর্তি আর বর্বরদের হাতে নিহত সুবল ডাক্তারের সাক্ষ্য আরোগ্যকুটির তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে—কোন্‌টা ছাড়বে বা নেবে তারা? *যমনিস সংবাদ* (১৯৮৪) একটু ভিন্ন প্রকৃতির উপন্যাস। অস্থির জীবনচিত্রের ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ উপন্যাসটি। শিক্ষাজীবনের ব্যর্থতা, ভাববিলাসিতা, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূত্রে বিদেশ গমন, পরিবর্তিত মনে দেশে ফিরে আসায় নায়কের গরমিল, বেমানান জীবনাচারকে শৈলিতে সাক্ষ্য করে তোলেন মিরজা আবদুল হাই। *মহাবাহু সুলতান* (১৯৮০), *বিজয়ীর পরাজয়* তাঁর অন্য উপন্যাস। লেখকের অগ্রন্থিত উপন্যাস *উন্মাদাশ্রম* ও *ঊর্ণনাভ*। **কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ** (১৯২১-১৯৭৫) বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার মাটিমূলস্পর্শী সংগ্রামী মানুষকে এনেছেন। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পলায়নী মনোবৃত্তি কিংবা একধরনের দ্বিধাজড়িত আড়ষ্টতা থাকলেও ত্রয়ী উপন্যাসে *চর-ভাঙা চর* (১৯৫১), *বাতাসী* (১৯৫৮), *নোনা পানির ঢেউ* (১৯৫০)-এ তিনি অনেকটা প্রাণবন্ত। বিশেষত *চর-ভাঙা চর* উপন্যাসে

ধলেশ্বরী ও সপ্তগ্রামের মানুষের কাহিনি, সংগ্রামী-বৃত্তান্তে তাৎপর্যময় রচিত। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। জোতদার শ্রেণীর চর দখল, দাঙ্গা, পারস্পরিক মর্যাদার বিষয়টি উপন্যাসে উপস্থাপিত। নওদার নঈমুদ্দীতাঁতি, নফরপাড়ার মোজাহার মোল্লা, নওলকান্দির বিদ্রোহী চাষীকুল আর এদের বিপরীতে দুর্ধর্ষ, চতুর নিজামতউল্লা, জাহাঙ্গীর সুলতান, ইয়াজং গাজীর দ্বন্দ্ব ও প্রতিরোধ। তবে এখানে প্রকৃতিও যথারীতি দ্রোহ ও অভিমানের মাত্রা পেয়েছে। কাজি আফসার উদ্দিনের উপন্যাসের বর্ণনা কাব্যিক-সুন্দর কিন্তু প্লট দুর্বল। উপন্যাসটির পাঁচ পর্ব একসুতোয় বাঁধা পড়েনি। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস *ইডেনের মেয়ে সায়লা*, *কলাবতী কন্যা* (১৯৫২), *কবীর লস্কর* (১৯৫৪), *অমর যৌবনা*, *সুরের আগুন* (১৯৬০), *নীড় ভাঙা ঝড়* (১৯৬১)। ভারত ভাগের পরে পূর্ব-বাংলার বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের স্বচ্ছচিন্তাই তাঁর কাহিনিগদ্যের ভিত্তিটি তৈরি করে দেয়। **আনিস চৌধুরী** (১৯২৯-১৯৯০) বাংলাদেশের সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ লেখক। কারণ, কয়েক দশকের সাহিত্যচর্চায় বাঙালি মুসলমানের মূল্যবোধ ও চিন্তাচেতনার ধারাকে তিনি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করেছেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত ভাষ্যকার হলেও তিনি সমাজস্থিত ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েছেন উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্রকে ঘিরে। বিচিত্রস্পর্শী করে তুলেছেন মধ্যবিত্ত চরিত্রকে। দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যে মধ্যবিত্তের এমন ব্যবচ্ছেদ বিরলই বটে। এক্ষেত্রে তাঁর আঙ্গিক-সাফল্যও প্রশ্নাতীত। আনিস চৌধুরীর উপন্যাসের বিষয় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচন করা। তাঁর *প্রশ্ন জাগে* (১৯৫১) উপন্যাসটির এক্সপোজিশান : 'নাসিম বানুর হাতে তৈজসপত্র ভাঙেনি একটাও, এটা সাতচল্লিশ বছর চার মাস সতেরো দিনের একটা চক্রবৃদ্ধির অহমিকা।' নাসিম বানু এ উপন্যাসের মূল। তাকে ঘিরেই কাহিনি আবর্তিত, বিবর্ধিত। ইফতিখার ও নাসিম বানুর কাহিনিতে তৃতীয় ব্যক্তি নিজাম। নিজাম আমিন ও লুসির মাধ্যমে চিনে ফেলে ইফতিখারের স্বরূপ। মনওয়ারী বেগমের কাহিনি, লুসি প্রসঙ্গ, নাসিম বানুর বিচ্ছিন্নতা গূঢ় এক আবহ সৃষ্টি করে উপন্যাস জুড়ে। উপন্যাসে পরিবর্তিত নাসিমবানু যখন ভূতপূর্ব তখন বলা হয়, 'সেদিনকার কথা সেদিন শেষ হয়ে গেছে।' *শখের পুতুল* (১৯৬১) সাংবাদিক সুধাকর ভদ্র মধ্যবিত্ত প্রবণতার একটু ভিন্ন গোছের মানুষ; মূল চরিত্র কামাল এখানে প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আনিস চৌধুরীর চরিত্ররা একই শ্রেণিস্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের প্রবণতা ও জীবনবীক্ষা নানামুখি। অনেক জায়গায় চমক যেমন আছে তেমনি জীবনের গূঢ় অর্থ দার্শনিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। *সরোবর* উপন্যাসে শাহানশার কথা বিবৃত করে কথক। শাহানশাহ উপন্যাসে অভিনব ও ব্যতিক্রমী রূপেই পঠিত—কেননা তার অবস্থান পরিশীলিত, দুর্বার। দুটো পরিবারের সংবাদ আছে উপন্যাসে একটি মণি-চম্পাদের পরিবার

অন্যটি সুধাকর ভদ্রের পরিবার। *চোখের রঙ* উপন্যাসের বিষয় অন্য রঙ ছড়ায়। আনিস চৌধুরীর উপন্যাসে মনের পরিবর্তন ও রূপান্তরের দিকচিহ্নগুলো উন্মোচনের প্রয়াস থাকে—জীবন সম্ভাব্যতার সূত্র অনুসন্ধানের তাগিদ থেকে। *চোখের রঙ* উপন্যাসটিতে মাশুকের ভেতর দিয়ে প্রবাসী মাসুদের ঘর-বাহিরের দ্বন্দ্বকে যেমন তুলে ধরেন ঠিক একইরূপে কেরামত সাহেবের মুখোশও উন্মোচন করেন। *স্রোত*-এ আনিস চৌধুরীর শিল্পবীক্ষা ব্যতিক্রমী। কারণ, এক. উপন্যাসের আবহে মধ্যবিত্তকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলায়; দুই. প্রকৃতিতে বা অন্য কোনো মাধ্যমে নায়কের অন্তর্সত্তাকে প্রকাশ করা নয়—কর্মপ্রবাহের সত্যে ব্যক্তিকে স্পষ্ট করায়; তিন. মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপনে শান্ত বা নির্মোহ রূপে নির্ণয় অথচ ব্যক্তির কেন্দ্রাতিগ ও বিকৃত শর্তগুলো ভেতর কাঠামোতে তৎপরতামুখি চিহ্নিতকরণ প্রয়াসে; চার. প্রধান চরিত্রের বৃহৎ বা ব্যাপক আন্তঃউত্তেজনাকে নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশে। তাঁর *সৌরভ* (১৯৬৮) প্রণয়-তাড়িত, প্রেমঘন আখ্যান। *মধুগড়* (১৯৭৪) মূল চরিত্র আমীরকে অবলম্বন করে কাহিনি শুরু; তারপর ক্রমশ তা বৈচিত্র্যময় দল মেলতে থাকে। সেখানে প্রত্নঅভিজ্ঞ নক্শবন্দি; টুরিস্ট তোগালিত্তি, সাবজোয়ারী এদের কথোপকথন রঙ্গ-রসিকতায় কাহিনি তৈরি হতে থাকে। *ঐ রকম একজন* (১৯৮৬)মধ্যবিত্ত নিরীক্ষায় আর-একটি নতুন মাত্রা। **আবদুল গাফফার চৌধুরী** (জ. ১৯৩৪) *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৫২) উপন্যাসে একদিকে সামন্ত-সমাজের অভিঘাত অন্যদিকে পুঁজিবাদ-উত্থানধ্বনি বিপুল প্রসারে চিত্রনের প্রচেষ্টা আছে। উপন্যাসে সামন্ত প্রতিনিধি ইসহাক চৌধুরী এবং পুঁজিবাদের উঠতি প্রতিভূ আলী নেওয়াজ খানের সমাজ দ্বন্দ্বের পটভূমি বিন্যস্ত। চৌদ্দ খণ্ডে বিধৃত কাহিনি-পরিসরে মূলত দীর্ঘায়ত ও অর্বাচীন গ্রামীণ-সামন্ত ব্যবস্থার ভঙ্গুর পরিকাঠামোকে চিত্রনের প্রয়াস লিখিত। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অপর উপন্যাস *নাম না জানা ভোর* (১৯৬২)-এর গুরুত্ব কয়েকটি কারণে, এক. বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠতার প্রয়োগ যেখানে একটা সময়চিহ্ন লক্ষণীয়, দুই. ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও জীবনসত্যের বহিঃপ্রকাশ নির্ণয় প্রচেষ্টা, তিন. প্রেম প্রতিষ্ঠা বা লক্ষ্য নির্ধারণের চিন্তা ঔপন্যাসিকের থাকলেও, পুঁজির প্রকোপে একদিকে ইফতেখার সাহেবদের সমাজ-মর্যাদা অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিচরিত্রের বাঁচার সংগ্রাম ও তার স্বপ্নসূত্র নির্ণয় প্রয়াস—এসবের সরস এবং প্রাঞ্জল বর্ণনা। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মূলত মধ্যবিত্ত আবেগকে বিষয় করলেও আলম বা আশরাফ কিংবা নারী চরিত্র মিলি, নাসিমাবানু আরোপিত বা ভুঁইফোঁড় উপরিতলের চরিত্র নয়—একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের ভেতরে তপ্তমুখর বেড়ে ওঠা মানুষ। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী উপন্যাসে প্রাণ ছড়িয়েছেন; তাঁর কাহিনিতে জীবনের বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনি সমগ্রতার একটা রূপও উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছে। বিভাগোত্তর উপন্যাসের

প্রারম্ভিক পর্বের সুরটি গাফ্ফার চৌধুরীর রোম্যান্টিক মননে প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থ্য জীবনের আখ্যান *শেষ রজনীর চাঁদ* (১৩৬৮)। উপন্যাসের চরিত্রে উঠতি মধ্যবিত্তের শহুরে চাকরি, তাঁদের বেড়ে ওঠা, পুঁজির সংলগ্ন হওয়া, গ্রামের হাতছানি-স্নিগ্ধতা-মমতার পিছুটান, স্মৃতিকাতরতা ইত্যাকার বিষয়ের আখ্যান এ উপন্যাস। তাঁর অন্য উপন্যাস *নীল যমুনা* (১৯৬৪)। **গোলাম কুদ্দুস** (মৃ. ২০০৬) মার্কসবাদী চিন্তাধারার কমিটেড লেখক। বাংলাদেশের সাহিত্যের এ ধারার অগ্রপথিক তিনি। স্বার্থবুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধির বাইরে তাঁর সাহিত্যচর্চা। শ্রমিক অধিকার, শ্রমঘণ্টার স্বীকৃতি এসব বিষয় মানবিক মূল্যবোধ থেকে *মরিয়ম* উপন্যাসে গৃহীত। গোলাম কুদ্দুস সমাজ দায়কে কাঁধে নিয়েছিলেন। মানবমুক্তির ত্যাগের আদর্শটি তাঁর উপন্যাসে কায়েম হয়। কাহিনিভাষা আদর্শিক এবং অর্জিত। প্রচারবিমুখ, ইহবাদী, স্বল্পবাক গোলাম কুদ্দুস বাংলাদেশের সাহিত্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। *মরিয়ম* (১৯৫৪), *বাঁদী* (২য় সং. ১৩৬২) তাঁর উপন্যাস। **ইসহাক চাখারী** (জ. ১৯২২) *পরাজয়* (১৯৫৪), *মায়ের কলঙ্ক* (১৯৬২) বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতি, নগর ও গ্রামীণ পটে ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে উপন্যাসে। ইসহাক চাখারীর *মেঘবরণ কেশ* (১৯৫৫) উপন্যাসে রবিউদ্দীন সদ্য এম. এ. পাশ করে গ্রামে ফিরছে; তাকে স্টীমারঘাটে বিদায় জানায় নগরবাসী প্রেমিকা ইরানী। লেখকের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত; দ্রুত কাহিনিতে অবগাহন সম্ভব। কিন্তু রবি-ইরানীর বিয়ের পর দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণ স্বপ্ন বেশিদিন স্থায়ী হয় না। রবির গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিত্ব, ক্রমশ গ্রামের অনেক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া; অপরদিকে ইরানীর গ্রামীণ পরিবেশের অমান্য মন, অহংচেতনা দুজনের মধ্যে দূরত্ব রচনা করে। উপন্যাসে এমন মূল ঘটনা ছাড়া, গ্রাম্য প্রতিপার্শ্বের চিত্রলিপি অনবদ্য। কাহিনিগদ্যে পাওয়া যায় পাঁচের দশকের স্থবির গ্রাম-অবকাঠামো আর শহর-আকর্ষণ আপ্লুত গ্রামীণ চরিত্র। ঠিক একইভাবে ইরানীর পুলিশ অফিসার বাবার পরিবারের নগরমনস্ক চিন্তাচেতনা। ঔপন্যাসিকের শেষপর্যায়ের ট্রিটমেন্ট প্রথাগত, অর্থহীন মনে হয়। **আ. ন. ম. বজলুর রশীদ** (১৯১১-১৯৮৬) প্রধানত নাট্যকার। এক ধরনের রোম্যান্টিকতা কিংবা কাব্যময় প্রলেপ বিচ্ছুরিত তাঁর কবিতায়। এতে করে গূঢ় রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়, এক ধরনের রোম্যান্স সৃষ্টি হয় কিন্তু সমাজস্পর্শী কিছু হয় না। তবে বিভাগ-পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানের যে উপন্যাসচর্চার ধারা সেখানে *অন্তরাল*, *মনে মনান্তরে*, *পথের ডাক* (১৯৫৬), *নীল দিগন্ত* (১৩৭৪) এমন রচনার অবকাশ ছিল। এবং এইটিই আমাদের পথ তৈরি করেছে। প্রেম-পরিস্রুত প্রয়াসটিই তাঁর উপন্যাসে মুখ্য। **আতাহার আহমেদ** পূর্ব-বাংলায় উপন্যাস লিখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনসূত্র ও আশাবাদ *উন্মোচন* (১৯৫৬), *সূর্যের নীচে* (১৯৫৮), *পিপাসা* (১৯৫৮) উপন্যাসের বিষয়। খুব পরিচিতি না পেলেও ঔপন্যাসিক-ভাষাটি অর্জন করেন

তিনি বিধৃত আর্থ-রাজনীতির ভেতরেই, তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও সেভাবেই তৈরি হয়। মাত্র উঠতি শ্রেণি, রাজনৈতিক ভাবনার সূত্রে অধিকার চেতনায় সজাগ ও উত্থান পঞ্চাশের দশকে লক্ষণীয়। সেভাবেই চরিত্রগুণ অর্জন করে পূর্ব-বাংলার মধ্যবিত্ত। তাদের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষাও সে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই নিরূপিত হয়। এর বাইরে বোধকরি এ ঔপন্যাসিকদের তেমন কোনো প্রচেষ্টাও আপাত ছিল না। *উন্মোচন* বা *পিপাসা* সে রকমের উপন্যাস। **বেদুঈন সামাদ** (জ. ১৯২৬) পরিচিত, পরিশুদ্ধ লেখক। *বেলাশেষে* (১৯৫৬), *নিষ্পত্তি* (১৯৫৭), *দুই নদী এক ঢেউ* (১৯৬০), *পথে যেতে যেতে* (১৯৬৩), *ধুমনগরী* (১৯৬৪), *শুনি সেই পদধ্বনি* (১৯৭০), *নিবিড় ঘন আঁধারে* (১৯৭৫), *যোগাযোগ* (১৯৯৬), *যুগের হাওয়া* (১৯৯৭) এসব উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেন। তবে সেটিই মুখ্য নয়, গল্পভাষার অর্জিত সত্যে মধ্যবিত্তের অন্ধি-সন্ধির দিকগুলো উন্মোচনের চেষ্টা করেন। পূর্ব-বাংলায় নারী হিসেবে গল্পভূমিতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। **শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী** (১৮৯৫-১৯৪৫) বাংলাদেশের উপন্যাসের গোড়ায় উপন্যাস লিখেছেন। গদ্যে কাহিনি উঠে এলেও ধরতে পারেননি জীবনকে। উপরিতলের দৃশ্যচিত্রে, বহির্মুখি জীবনকেই ফ্রেমে বেধেছেন। কাঙ্ক্ষিত রূপরেখা প্রদানে সক্ষম হন না। বাঙালি মুসলিম সংস্কার চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিক কিছু করতে পারিননি। তবুও পথনির্মাণ কাঠামোটি অস্বীকার করা যায় না। এমন প্রস্তাবনায় তাঁর উপন্যাস *শেখ সংসার*, *দরবেশ কাহিনী*, *নূতন বৌ*, *প্রেমের পথে* (১৯৫৭), *আদর্শ গৃহিনী* (১৯৫৭), *বঙ্কিম দুহিতা* (১৩২৪ ব.), *রূপের মোহ* (১৯৫৭)। **কাজী মাসুম** (জ. ১৯২০) *ঢেউ জাগে পদ্মায়* (১৯৫৮) নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রার্পন। চরের পাড়ে গড়ে ওঠা গ্রাম, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্কের বাস্তবতা উপন্যাসে বর্ণিত হয়। সেখানে জীবনের উত্থান-পতনের পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত হয় হাতেম খাঁ, সোনাভান, ফুলজান, মদন, রফিক ইত্যাকার সব চরিত্রের ভেতর দিয়ে। সর্বোপরি স্বপ্নকাতর মানুষের জীবনই জয়ী হয় উপন্যাসে। বাংলাদেশের উপন্যাসে এ কাহিনিচিত্র প্রথাগত মনে হলেও বিভাগোত্তর পর্বের মুসলিম জীবনধর্মের প্রান্তিক স্বরূপটি উঠে আসে। **আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী** (জ. ১৯২৬) র *বান* (১৯৫৮) বিভাগোত্তর পর্বের উপন্যাস। সমকাল চিহ্নিত ভাষশৈলিতে এ উপন্যাস আকর্ষণীয়। সংগ্রামমুখর জীবনের উত্থান-পতন দায়বদ্ধতায় নির্ণীত। বিভাগ-পরবর্তী সময়ে রোম্যান্টিক আবেগ চেতনার বাইরে প্রান্তিক মানুষের জীবন ও সংগ্রাম আবর্তে আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী যে জীবনছবি বান উপন্যাসে অঙ্কন করেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঐতিহ্যিক। এ প্রণোদনা ও শিল্পিত অনুপ্রেরণার জন্যই তিনি গুরুত্ববহ। **হুমায়ুন কাদির** (১৯৩২-১৯৭৭)র *নির্জন মেঘ* (১৯৬৫)

বাংলাদেশের উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। উপন্যাসটির রচনাকাল ডিসেম্বর ১৯৫৮ থেকে মার্চ ১৯৫৯। মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ, পারিবারিক কাঠামোতে তাদের উচ্ছ্বাস-উচ্চাশা, নগর জীবনের বৈচিত্র্যময় তৎপরতা—উপন্যাসটির পটভূমি তৈরি করে। *নির্জন মেঘ* উপন্যাসে কাহিনি ফরিদা-কেন্দ্রিক এবং সে পথে নায়িকার বাধা আছে, প্রতিবন্ধকতা আছে, আছে একটি পরিবারের সমাজ-উত্তরিত চিন্তা-চৈতন্যের প্রভাব ও প্রসারিত মনস্তত্ত্ব। লেখক রচিত আবহে মূলত ফরিদাই সংগ্রামে-শংস্কায়-দ্বন্দ্বে প্রতিরোধী হুমায়ুন কাদির এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে শিল্পের বাতাবরণ তৈরি করে। হুমায়ুন কবিরের উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনাধর্মী (narretive)। *নির্জন মেঘ* উপন্যাস রচনায় হুমায়ুন কবিরের কৃতিত্ব নাগরিক মধ্যবিত্ত-মনস্তত্ত্বের গদ্যরচনায়—যেটা বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় অন্যদের থেকে আলাদা। এছাড়া ‘ব্যক্তি’নারীর উদ্ভাসন, সংগ্রামে-সাহসে ব্যক্তিত্ববানরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেকটা গতানুগতিক মনে হলেও বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে—সময়ের ইঙ্গিতে তা তাৎপর্যবহই বটে। **তাসাদ্দুক হোসেন** (জ. ১৯৩৪) সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনাচার-সংগ্রাম-প্রতিরোধ *মহুয়ার দেশে* (১৯৫৯) উপন্যাসের প্রধান অন্বিষ্ট। উপন্যাস শুরু সাঁওতাল মংরুর পরিচয় এবং তার ‘খ্রীষ্টান মুই হমুই, খ্রীষ্টান মোক হবায় নাগবে’ এমন প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে। আর তার মধ্য দিয়ে আশঙ্কাটাও যেন সাঁওতাল সমাজে নির্ধারিত। সাঁওতাল সমাজের চিরায়ত জীবন-জীবনাগ্রহ ত্যাগ করে মংরুর খ্রিষ্টান হবার প্রত্যয় নিছক তার নিজের ব্যাপার নয়—সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তি জড়িয়ে থাকে সমষ্টির সঙ্গে। উপন্যাসটির কাহিনিতে উৎপাদন-সম্পর্কের রূপকে চিহ্নিত করা হয়নি ফলে জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বার্তা—যা চরিত্রের ভেতরের কাঠামোকে তৈরি করে তার অন্তর্বয়ন সৃজনের পরিবেশ উপন্যাসে কম। তবুও দেওয়ানী গফুর উপন্যাসের স্বল্প পরিসরের মধ্যে চমৎকার সৃষ্টি। *ইস্পাত প্রত্যয়* (১৯৮০), *পৃথিবীর রং* (১৩৬৭), *কৌণিক* (১৯৮৮), *তিমিরাভিসার* তার অন্য উপন্যাস। **নীলিমা ইব্রাহীম** (১৯২১-২০০২) নারীর ভেতরের শক্তিকে ‘বহ্নিশিখা’য় প্রদীপ্ত করে তোলেন। চরিত্র সৃষ্টি করেন আত্ম-অভিজ্ঞতায়। তাঁর উপন্যাসে নারীর শক্তি ও সাহসই প্রমূর্ত হয়ে ওঠে; এবং সেটাই তিনি দেখাতে চান কাহিনি শরীরে। তাঁর উপন্যাস *বিশ শতকের মেয়ে* (১৯৫৯), *এক পথ দুই বাঁক* (১৯৫৮), *কেয়াবন সঞ্চারিণী* (১৯৬২), *বহ্নিবলয়* (১৯৮৫) প্রভৃতি। শুদ্ধ গদ্যে নারীর প্রতিকৃতিই অঙ্কন করেন তিনি। এমনটি মুখ্য প্রশ্রয়ের পর সমাজ-সংস্কৃতি, আর্থ-রাজনীতি পরিসর পায়। বিভাগোত্তর সময় পর্ব থেকেই এমন প্রত্যয় তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। **শামসুল হক** কাহিনি-নির্ভর ঔপন্যাসিক, বাইরের ঘটনার অভিজ্ঞতাই তাঁর চরিত্র নির্মাণ করে। প্রথাগত আঙ্গিক পরিলক্ষিত। মুসলিম লেখক হিসেবে গতিময় গদ্য পরিচর্যায় বেশ সাবলীল। নদীর

বার্তায় চমকপ্রদ উপন্যাস *নদীর নাম তিস্তা* (১৩৭৩)। বর্ণনাভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ, সততার সৌকর্যে বাঁধা। জীবন সংগ্রামের রূপ অনবদ্য হয়ে ওঠে, সমাজবাস্তবতার সূত্রে লেখক এ উপন্যাসে হয়ে যান দ্বিধাহীন। 'তিস্তা নদী তীরবর্তী দরিদ্র গফুর ডাটোয়ার সুখ-দুঃখপূর্ণ মেহনতি জীবনযাত্রা ও তার মেয়ে গোলাপীর সরল প্রেম কাহিনির মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের খণ্ডাংশের গ্রামজীবনধারার বাস্তবধর্মী ও আন্তরিকতাপূর্ণ জীবন-চিত্র অঙ্কিত।' গুরুত্বপূর্ণ এ উপন্যাসটি আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শামসুল হকের *নয়ছয়* (১৩৬৬) উপন্যাসটি কমলঝুরির কাহিনি নিয়ে লেখা। এছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাস *চম্পা চামেলী*। শিশুসাহিত্যিক **হাবীবুর রহমান** (১৯২৩-১৯৭৬) উপন্যাসে সরল কিন্তু গভীর চিন্তার প্রকাশ ঘটান উপন্যাসে। *লেজ দিয়ে যায় চেনা* (১৩৬৬), *বনে বাদাড়ে* (১৯৬৩), *বন মোরগের বাসা* (১৯৭৬) তাঁর উপন্যাস। কৈশোরিক আমেজে বুদ্ধিকে প্রলুব্ধ করেন লেখক। তাঁর গদ্য মেধাবী, প্রাঞ্জল। উইট এবং হিউমারের প্রাবল্যে তাঁর রচনা হয়ে ওঠে মূল্যবান। **জোবেদা খানম** (১৯২০-১৯৮৯) বিভাগ-পরবর্তী উপন্যাস রচনায় উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর উপন্যাস *অভিশপ্ত প্রেম* (১৯৫৯), *দুটি আঁখি দুটি তারা* (১৯৬৩), *অনন্ত পিপাসা* (১৯৬৭)। প্রেম-প্রকৃতি, রোম্যান্স উপন্যাসে বিষয়ী হলেও সংস্কারের উর্ধ্বে মানবতার সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যকে কাহিনিতে প্রবিষ্ট করেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে উপন্যাস রচনায় অগ্রবর্তীদের অন্যতম জোবেদা খানম, স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রথাগত রীতির উপন্যাস হলেও সমকালের ভাবেবৈশিষ্ট্যে তাঁর উপন্যাসের গুরুত্ব অমূলক নয়। **আবদুর রাজ্জাক** (১৯২৬-১৯৮১) *কন্যাকুমারী* (১৯৬০)র লেখক। এই একটি উপন্যাসেই তৎকালীন পূর্ব-বাংলায় কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিতি পান তিনি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সমাজকে দেখলেও শেষাবধি সমর্পিত অধ্যাত্ম-আদর্শে। *কালান্তর*-এর পরিবর্তিত নামে *ছোট মানিকনগরের উপাখ্যান (আদিপর্বের উপকথা)* লেখেন পত্রিকায়, কিন্তু গ্রন্থরূপ পায়নি; একইভাবে *কাঁচপোকা ও তেলাপোকা*র রূপান্তর *অস্থির পঞ্চম* নামে 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এ পুরোপুরি বের হলেও শেষাবধি গ্রন্থাকারে রূপ পায় নি। আবদুর রাজ্জাকের *কন্যাকুমারী*তে আমেনা-বীনুকে কেন্দ্র করে নাসিম পরিশুদ্ধ মননে স্থির। অনেক উত্থান-পতনেও তাদের অবক্ষয়, অনৈতিকতার স্খলন ঘটে না। বিপরীতে ফ্যান্সী-জানুর পরিবারে জৌলুস-ভোগবাদ-মূল্যবোধহীন জীবনযাপনের চর্চা আর্থিক মানদণ্ডে নির্ধারিত। *কন্যাকুমারী*তে এমন দুটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে মুখোমুখি হতে হয় জানুর বিয়ের অনুষ্ঠানে। তারপর পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের মনস্তত্ত্বের উপস্থাপনায় পূর্বাপর ব্যক্তিইতিহাস বর্ণনা। পরিশুদ্ধ মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সমাজচিত্রটি উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির ভাষা প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয়। *বঁধুয়ার লাগি* (১৯৬৮) আবদুর রাজ্জাকের অন্য উপন্যাস। **চৌধুরী শামসুর রহমান** (১৯০২-

১৯৭৭) *শেষ পর্বে শ্রীকান্ত* (১৯৬০), *মস্তানগড়* (১৯৬২), ছবি তার রচিত উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত চরিত্রের সঙ্গে আরও কিছু কাল্পনিক চরিত্র যুক্ত করে *শেষ পর্বে শ্রীকান্ত* উপন্যাসটি লিখিত। চৌধুরী শামসুর রাহমান শক্তিশালী লেখক। জীবনবাদী, বিচিত্রমুখি, অনেক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। উল্লিখিত উপন্যাসের দৃষ্টিচেতনায় তাঁর প্রমাণ পরিলক্ষিত। স্বতন্ত্র গল্পভাষা এবং বাস্তবানুগ এ লেখকের বীক্ষণ। **খালেকদাদ চৌধুরী** ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। লেখকসত্তায় তিনি অনেকমুখি। তাঁর উপন্যাস *রক্তাক্ত অধ্যায়* (১৯৬৬), *চাঁদবেগের গড়* (১৯৬৩), *একটি আত্মার অপমৃত্যু* (১৯৬৭) প্রভৃতি। রসনিষ্পত্তির প্রযোজনায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গৃহীত ও রচিত। বাঙালি মুসলিম সমাজে খালেকদাদ চৌধুরী এ ধারার প্রারম্ভিকসূত্রটির নির্মাতা। উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণে তিনি যত্নবান। কবি **আহসান হাবীব** (১৯১৭-১৯৮৫)র উপন্যাস *অরণ্য নীলিমা* (১৯৬২), কাব্যিক গঠনে রচিত ভিন্নস্বাদের এক অনবদ্য উপন্যাস। স্বল্প পরিসরে উপন্যাসের কাঠামোতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের (শওকত, রাণু, রুমা, মামুন, মণিদের পরিবার) সংকট-উচ্ছ্বাস-আনন্দ-হতাশা-নৈরাশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। একটি পরিবারকে ঘিরেই কাহিনি আবর্তিত। আত্মকথনে বর্ণনার ভঙ্গিতে দৈনন্দিন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গ-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে রাণু—সম্পর্কের সূত্রগুলো উচ্চারণ করে। এর মধ্যে অনুরাগ-অনুকম্পা-অনুযোগ একটা স্বার্থের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। প্রেম ও সমাজ সম্পর্কের জায়গায় শওকত একজন শিল্পী হিসেবে রাণুর বাসনাকে যে কোনো সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে একটা প্রগতি-পরিশুদ্ধ মনেই দেখতে চেয়েছে। বাৎসল্য-স্নেহ-মায়া-মমতায় গড়া নারীকে লেখক পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত বাস্তবতায় তুলে ধরতে চান ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়—একেবারে মনের গহন কোণের প্রবৃত্তি-তাড়িত ব্রীড়া-দ্বিধা-সংকোচের ভেতর দিয়ে। এক্ষেত্রে লেখকের কৌশল হয়েছে ক'খানা চিঠি বা ডায়েরি। বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকে এ রীতি নতুন নয়। একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা অতিরিক্ত পল্লবিত না করে, একটি পরিবারের বারো বছরের ঘটনার প্রাসঙ্গিক তথ্যে নির্মিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের উপন্যাসে অনুপম ও নির্ভার কাব্যময় গদ্য নির্মাণ এবং প্রকৃত পুঁজিবাদী সমাজের রূপ চিত্রণ প্রয়াস থেকে একমাত্র উপন্যাসের রচয়িতা হয়েও আহসান হাবীব নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। **বদরুদ্দীন আহমদ** *অরণ্য মিথুন* (১৯৬২)-এ লিখেছেন মগ সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রামের কথা। অতীত ও বর্তমানের যোগ আছে কাহিনিতে। তেইশ পরিচ্ছেদের উপন্যাস। বালিয়াতুলীস্থিত মগপল্লীর গোড়াপত্তনের কথা বর্ণিত। মোঘল থেকে ইংরেজ রাজত্বকাল মগদের নিষ্পেষণ-নির্যাতন-বিতাড়ন; অনেক ত্যাগে পুনপ্রতিষ্ঠা, কৌমসমাজের প্রজন্মান্তরের প্রতিরোধের ইতিহাস, সরলচিত্তের প্রেম, মাচিংকে নিয়ে মনিআফ্রু-চামেথার বিরোধ ইত্যাকার বিবরণ *অরণ্য মিথুন*

উপন্যাস। ভাষা আবেগতাড়িত, ট্রিটমেন্ট দুর্বল। সম্ভাবনার বীজ থাকলেও ঔপন্যাসিকের মনোযোগের অভাবে প্রকরণ-বিন্যাস শিথিল। অন্ত্যেবাসীদের অস্তিত্ব-নির্ভর উপন্যাস লেখা হয়েছে কম। কিন্তু ইতিহাসে বা সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব অধিক। বদরুদ্দীন আহমদ সে কাজে উদ্যোমী হয়েছেন; একটা সময়ে, ইতিহাসে তার গুরুত্ব কম নয়। **বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ** (জ. ১৯৩৪)র *কাজল দীঘির উপকথা* (১৯৬২), তিন চারশ বছরের কয়েকটি প্রজন্মের ইতিবৃত্ত। মুসলিম পরিবারের স্বপ্না ও গিয়াসের বৃত্তান্ত শেষ হয়েছে রিক্তা ও কামালের হত্যা-আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। এর মাঝে সাক্ষাৎ মেলে কয়েকটি প্রজন্মের। সেখানে বিয়ে-দাম্পত্য-সম্পত্তি সঙ্কটই রক্তধারায় প্রবাহিত। জীবনের যেমন কোনো মাত্রিকতা বা বৈচিত্র্য নেই তেমনি চরিত্রের সম্ভাবনার সূত্রও অনুপস্থিত। কাজল দীঘির গ্রামের এ উপাখ্যান শেষাবধি গল্পকথায় পর্যবসিত। *প্রত্যাবর্তন* (১৯৬০), *বনচন্দ্রিকা* (১৯৬৩), *বর বর্ণিনী* (১৯৬৩), *নূপুর নিক্বন* (১৯৬৯), *আজকের পৃথিবী* (১৯৭০), *সমুদ্রের ঢেউ* (১৯৭৩), *নিরুত্তর* (১৯৭৪), *মাথুরের পারে* (১৯৮৪) প্রভৃতি। বাংলাদেশের উপন্যাসে **দৌলতুন্নেসা খাতুন** (১৯২২-১৯৯৭) তেমন খ্যাতি না পেলেও লিখেছেন *পথের পরশ* (১৩৭৩), *বধূর লাগিয়া* (১৯৬২), *কমরপুরের ছোট বৌ* (১৯৮৮), *বিবস্ত্র ধরণী* (১৯৮৯)। *পথের পরশই* স্মরণীয় করেছে তাঁকে। এ উপন্যাসে পাঁচ খণ্ডের বড় কলেবরের উপন্যাসটিতে হবিব আভিজাত্যে-বিত্তে-ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হলেও তার কর্মবিন্যাস, কার্যকারণ-কর্তৃত্ব কিংবা সংগ্রামী তৎপরতায় সে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। নায়কোচিত গুণ একদিকে যেমন নেই অন্যদিকে তেমনি ভেতরের প্রণোদনা-শক্তিও বেশ দুর্বল। উপন্যাসে আকস্মিক হবিবের সঙ্গে নিনার সাক্ষাৎ অতঃপর পথিমধ্যের একটি খুনের দায়ে হবিব এবং নিনার আত্মগোপন। এরপর নিনার আশ্রয়েই হবিবের দিনাতিপাত, একপর্যায়ে হবিবের জিজ্ঞাসাসূত্রে নিনার অতীত, বেড়ে ওঠা, অস্তিত্বের সংগ্রাম ইত্যাদি বিবৃত। বৃহৎ পরিসরে হবিবের উপস্থিতি উপন্যাসে নতুন কোনো মাত্রা সৃষ্টি করে না। দৌলতুন্নেসা খাতুন শিল্পরীতির কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যের নারী-পুরুষের অহেতুক ভেদকে অস্বীকার করেছেন। কাহিনি-কাঠামো শিথিল। তেমন কোনো দার্শনিক ভাবনা রেখাপাত সৃষ্টি করে না। তবুও বিভাগোত্তর কালপরিসরে বাংলাদেশের উপন্যাসের জীবনদৃষ্টি সৃষ্টিতে উপন্যাসটির গুরুত্ব কম নয়। তাঁর অন্য উপন্যাস *বধূর লাগিয়া* (১৯৬২)। **জসীম উদ্‌দীন** (১৯০৪-১৯৭৪) পল্লিকবির উপন্যাস *বোবা কাহিনী* (১৯৬৪)। জসীম উদ্‌দীন কবি হলেও বড় মাপের গদ্যকার, সন্দেহ নেই। এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও বয়নবিন্যাস চমৎকার। এছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাস *বউটুবানীর ফুল* (১৯৯০)। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক **শহীদ আখন্দ** (জ. ১৯৩৫)। মধ্যবিত্ত প্রবণতায় উপন্যাস লিখলেও তিনি তৈরি করতে পেরেছেন

স্বতন্ত্র রূপশৈলি। জীবনসত্যকে গভীর অন্বেষায়, দৃষ্টিচেতনায় করেছেন প্রলুব্ধ। অনুপম তাঁর প্লটবিন্যাস ও নির্মাণ-কাঠামো। বর্ণনায় ব্যক্তি প্রাধান্য, সংলাপধর্মী প্রতিক্রিয়াটি নির্ধারিত। মধ্যবিত্তের বহির্মুখি (extrovart) কাহিনিতে বিরাজমান। তাঁর উপন্যাস *পান্না হলো সবুজ* (১৯৬৪), *পাখির গান বনের ছায়া* (১৯৭০), *দুদণ্ড শান্তি* (১৯৮৩), *একদা এক বসন্তে* (১৯৮৪), *সেই পাখি* (১৯৮৬), *আপন সৌরভ* (১৯৮৬), *ভালোবাসায় বসবাস* (১৯৮৭), *নরাধম* (১৯৮৪), *এইখানে কখনো* (১৯৮৫), *আবার আসিব* (১৯৮৮), *কখন কে জানে* (১৯৯৫) প্রভৃতি। **মহীউদ্দিন** (১৯০৬-১৯৭৫) প্রধানত কবি। *মহামানবের মহাজাগরণ*, *আলোর পিপাসা*, *নির্যাতিত মানবতার নামে*, *শাদী মোবারক*, *নূতন সূর্য*, *শিল্পীর স্বপ্ন*, *বশির*, *কামিনীকাঞ্চন* মহীউদ্দিনের উপন্যাস। উপন্যাসের ভেতরে মানবতার মুক্তির বিষয়ই প্রতিফলিত। নর-নারী সম্পর্ক ও জীবনাগ্রহ বিশেষ মাত্রায় প্রতিফলিত। ১৯৬৪ তে অশ্লীলতার দায়ে *কামিনী কাঞ্চন* উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়। **দিলারা হাশেম** (জ. ১৯৩৬)র প্রথম উপন্যাস *ঘর মন জানালা* (১৯৬৫)। এটি লিখে তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন। ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব—একজন নারীর চোখে সদ্যগঠিত পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরূপণ প্রয়াস, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের নিত্য জীবনাগ্রহের চালচিত্র বয়ন আর নারীর চরিত্রকে কর্মক্ষমতার পাদপীঠে উপস্থাপন-রীতির বর্ণনার কারণে। *ঘর মন জানালা* উপন্যাসের বিষয়ের বিস্তৃতি খুব নয়-এ কারণেই—মাত্র একটি পরিবারের কাহিনি ঘিরেই এর পরিবৃত্ত। তিন খণ্ডের উপন্যাস—একটি পরিবারকে ঘিরেই সমস্ত আবহ ও প্রতিপার্শ্ব তৈরি হয়েছে। শিল্প হওয়ার জন্য যে প্রকরণ প্রয়োজন—যা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমষ্টির মাত্রা স্পর্শ করে তা তাঁর প্রথম উপন্যাসটিতেই নির্ধারিত। *আমলকীর মৌ* (১৯৭৮) উপন্যাসে নারীর অধিকার, সংগ্রামের আলেখ্য নির্ণীত। মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক প্রাত্যহিকতা, সূক্ষ্মতর টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব নিয়ে এ উপন্যাস। তবে দিলারা হাশেমের অধিকাংশ উপন্যাসেই একই ঘটনার আবর্তন লক্ষণীয়। গদ্যটিও সে ইঙ্গিতেই নির্মিত। তাঁর অন্য উপন্যাস *একদা ও অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৭), *বাদামী বিকেলের গল্প* (১৯৮৩), *কাকতালীয়* (১৯৮৫), *মিউর‍্যাল* (১৯৮৬), *শঙ্খকরাত* (১৯৯৫), *অনুক্ত পদাবলী* (১৯৯৮), *সদর অন্দর* (১৯৯৮), *সেতু* (২০০০) এমন উপন্যাস লিখেও তিনি একই আবর্তে বিদ্যমান। **বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর** (জ. ১৯৩৬) র *সর্বনাশ চতুর্দিকে* (১৩৮১) দুর্দান্ত গল্পভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রকরণ তীক্ষ্ণধী, গুরুত্বপূর্ণ। 'আলী আকবরের মনের মধ্যে কিছু একটা ছিঁড়ে গেছে, হঠাৎ ইচ্ছা করছে চেঁচাতে, কে পাত্তা দেয়, কে। রাগ অসহ্য হয়ে উঠেছে, লোকটি ক্লাসরুম পেয়েছে বুঝি... ঘৃণায় বমি আসে আর আসমাকে দেখলে কান্না

পায়'—এলোমেলো, অস্থির আলী আকবরই আকর্ষণীয় এ উপন্যাসে। গল্পের ভেতরে মধ্যবিত্তের এমন রূপ কাঙ্ক্ষিতই বটে। **মিজানুর রহমান শেলী** (জ. ১৯৪৩)র বিভাগ-পরবর্তী সময়ের রচনা *পাতালে শর্বরী* (১৯৬৫)। কাব্যিক নামে পরিগ্রহ হয় উত্থিত মধ্যবিত্তের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা। সমকালকেই তিনি প্রতিচিত্রিত করেন উপন্যাসে। মুসলিম সমাজের সদ্যশিক্ষিত হওয়া, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেখানেই সৃষ্ট রোম্যান্টিক ভাবচেতনা, মনোজগত তৈরি করে। তাঁর আকর্ষণীয় গদ্যের অন্য রচনা *ফেরারী প্রহর* (১৯৭২)। **রাজিয়া মজিদ** (জ. ১৯৩০) শক্তিশালী গদ্যলেখক। অনেক উপন্যাস লিখেছেন। প্রধানত তাঁর উপন্যাসের বিষয় মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক। গতানুগতিক নন তিনি। কোনো বিশেষ আদর্শ বা উপযোগিতার ভাবনায় নয়, নন্দনচিন্তায় উপন্যাসের অন্তর্জগতের পাঠ চলে তাঁর লেখায়। অনেক উপন্যাস লিখে বাংলাদেশের উপন্যাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তবে মধ্যবিত্ত জীবনবৃত্তে তাঁর পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। রাজিয়া মজিদের উপন্যাস *তমসাবলয়* (১৯৬৬), *দিনান্তের স্বপ্ন* (১৯৬৭), *নক্ষত্রের পতন* (১৯৮২), *সেই তুমি* (১৯৮৪), *অশঙ্কিনী সুদর্শনা* (১৯৮৪), *দিনের আলো রাতের আঁধার* (১৯৮৪), *মেঘে জলতরঙ্গ* (১৯৮৫), *এই মাটি এই প্রেম* (১৯৮৫), *দাঁড়িয়ে আছি একা* (১৯৮৭), *অরণ্যে জনতা* (১৯৮৭), *শতাব্দীর সূর্যশিখা* (১৯৮৭), *সুন্দরম* (১৯৮৮), *জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ* (১৯৮৯), *অন্তরলোকে জ্বলে জোনাকী* (১৯৯৩), *বৃষ্টিভেজা মুখ* (১৯৯৪), *ভালবাসার সেই মুখ* (১৯৯৫), *যুদ্ধ ও ভালবাসা* (১৯৯৬)। **অরূপ তালুকদার** গল্পেই সিদ্ধি, উপন্যাসপ্রতিম কাহিনি বিস্তার নেই। তাঁর নান্দনিক রচনা *সারাদিন সারারাত*, *আশার নাম মৃগতৃষ্ণিকা* (১৩৭৩), *নীলিমায় নীল*, *রংবাজ ফেরে না* (১৩৭৬), *দূরেও না কাছেও না*, *এতটুকু আশা* প্রভৃতি। উপন্যাসের ভাষা ঋজু, সংহত, বাস্তবানুগ। আধুনিক প্রত্যয়টি আছে। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিমানুষের দৈববুদ্ধির পরিহাস, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব প্লট হিসেবে দাঁড়ায়। শুধু বাইরের আবেগ নয়, এ সময়ের নাগরিক চেতনাকে গদ্যে তুলে ধরেন। কাহিনিও সে মাপেই বিস্তার পায়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চেনা সময়কে তুলে এনে অরূপ তালুকদার প্রথাকে ভাঙ্গেন, নির্মমতাকে প্রকাশে গদ্যবীক্ষণটিও পাল্টান, সে কারণে তাঁর উপন্যাস সমসাময়িক, প্রসাদগুণসম্পন্ন। **আনিস সিদ্দিকী** (১৯৩৪-১৯৮৫) ইতিহাস-অবলম্বনে উপন্যাস লিখেছেন। গদ্যেও মেলে এক ধরনের ইতিহাসগত আখ্যান। পরিশ্রমী, কমিটেড আনিস সিদ্দিকী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান। প্রসঙ্গত এ সময়ে অনেকেই ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস লিখলেও আনিস সিদ্দিকী তাঁর আখ্যানে শিল্পরস ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক উপযোগিতা খোঁজেননি। যদিও কাহিনি-নির্মাণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত, তবুও ইতিহাসগত উপন্যাসের ধারায় তাঁর গুরুত্ব অপ্রণিধান নয়। *যমুনার তীরে তীরে* (১৯৬৮)

মোগল সম্রাটদের কীর্তিগাথার কাহিনি। 'মোগল সাম্রাজ্যের হেরেমবাসী বাদশা বেগমদের অসামান্য কীর্তি নিয়ে একে একে রচনা করেন তিনটি উপন্যাস' *হেরেমের নায়িকা*, *হেরেম থেকে দূরে* এবং *মোগল হেরেমের অন্তরালে*। এসব গ্রন্থে মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সম্রাজ্ঞীদের প্রতাপ ও আধিপত্য; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। হেরেমের নায়িকারা প্রাসাদের আড়ালে কীরূপে শাসনযন্ত্রকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন আর আমীর ওমরাহবৃন্দই বা এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখেছেন তা কাহিনিচক্রে নিপুণভাবে বাধতে পেরেছেন আনিস সিদ্দিকী। স্পর্শকাতর এসব ঘটনার কাহিনিবৃত্ত লেখক করে তুলেছেন আকর্ষণীয়। *হেরেমের নায়িকা* থেকে 'রাজা ছত্রশালের যুদ্ধে যাবার পর একে একে সাতটা দিন পার হয়ে গেল। কোনো খবর এলো না সামুগড় থেকে। সম্রাটের অস্থিরতা গেল বেড়ে।' আবার *হেরেম থেকে দূরে* উপন্যাসে আছেন নূরজাহান, 'সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আনন্দিত চিত্তে ঘোড়া ছুটালেন হেরেমের উদ্দেশ্যে'। এভাবে মনোজ্ঞ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। **মকবুলা মনজুর** (জ. ১৯৩৮) *কালের মন্দিরা* (১৯৯৭) দীর্ঘায়ত উপন্যাস। এক শতাব্দীর প্রজন্মান্তরের দ্বন্দ্ব, জীবন ব্যবস্থাপনার স্বরূপ ও ব্যক্তি সম্ভাব্যতার প্রশ্নদীর্ণ বাস্তবতার রূপায়ণ উপন্যাসটি। আত্মজীবনীমূলক প্রবণতায় উপন্যাসটি রচিত হলেও মূলত দীর্ঘায়ত সময়ের সমাজ, রাজনীতি, ব্যক্তিমানস, পারস্পরিক সম্পর্কসহ সমগ্র এক জীবন ব্যবস্থারই চিত্রায়ণ এ রচনাটি। উপন্যাসটি মূলত শায়লা হোসেনের কাহিনি, আর সে কাহিনি বয়ান ও পটভূমি নির্ণয়ে লেখক বেছে নেন তার 'মা মাসুদা খাতুনের কালের কথা, শায়লা হোসেনের আব্বা আমিনুর রহমান শেখের কালের খণ্ড খণ্ড কাহিনী অথবা ঘটনার কথা।' যে সময়কে ঘিরে উপন্যাসের সূত্রপাত সে ভঙ্গুর সামন্তসমাজে বাঙালি মুসলমানদের আধুনিকতা অর্জনের পথে অনেক সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা ছিল; বংশমর্যাদা, আশরাফ-আতরাফ বিভেদে মানুষের সমাজ-মর্যাদা যেমন বাধা থাকত তেমনি তার নিমিত্তেই গড়ে উঠত মূল্যবোধ। একটা দীর্ঘ সময় উপন্যাসে বির্ধত; সেখানে মকবুলা মনজুর অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। *আর এক জীবন* (১৯৬৮), *জলরং ছবি* (১৯৮৪), *অবসন্ন গান* (১৯৮২), *বৈশাখে শীর্ণ নদী* (১৯৮৩), *আত্মজ ও আমরা* (১৯৮৮) *অচেনা নক্ষত্র* (১৯৯০), *পতিতা পৃথিবী* (১৯৮৯), *প্রেম এক সোনালী নদী* (১৯৮৯), *শিয়রে নিয়ত সূর্য* (১৯৮৯), *কনে দেখা আলো* (১৯৯০), *নদীতে অন্ধকার* (১৯৯৬), *লীলা কমল* (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (রুনা প্রকাশনী ১৯৯৩), *বাউল বাতাস*, *এইখানে কখনো*। **কিশোর উপন্যাস** : *ডানপিঠে ছেলে* (১৯৭৮), *কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস* (১৯৮৮), *মহেশখালিতে মুকুট* (১৯৯০), *সাহসী ছেলে* (১৯৯১), *দূরন্ত মুকুট* (১৯৯৬), *আকাশ ভরা গান* প্রভৃতি। **ফজল শাহাবুদ্দীন** (১৯৩৬-২০১৪) কবি হলেও প্রথম পুরুষে

বর্ণিত উপন্যাস *দিকচিহ্নহীন* (১৩৭৫)। মধ্যবিত্ত প্রেম-হতাশা-ভোগ-আকাঙ্ক্ষা প্রবলরূপে প্রকরণবন্দি হয়েছে এ উপন্যাসে। পরিপক্ব মেজাজ, দ্বিধাহীন আনুগত্য, দাম্পত্য, বিচ্ছেদ-হতাশা প্রভৃতি অর্জিত কাহিনিগদ্যে। সীমা এ উপন্যাসের মূলচরিত্র। তাঁকে ঘিরেই বর্ণনা, অন্তর্জগতের আচ্ছন্নতা, প্রেমপ্রবাহ, শরীরী উচ্ছ্বাস; আখ্যানে উপস্থিত। কবিত্ব নয়, ব্যক্তির ভাবে-আবেগে এক ধরনের নিরীক্ষা, রোম্যান্টিক চেতনা, যৌনতা—মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছে। "উন্মথিত ছায়ারা" অংশে অন্য উপন্যাস, সুলতান চৌধুরীর কাহিনি। উপন্যাসের আকর্ষণ এরূপ আখ্যানে 'একটা নির্মম সরিসৃপ হিস হিস করে উঠলো সুলতানের অঙ্গের নিষ্ঠুর খেলায়। যাকে ভয় ছিলো সুলতানের, যাকে আকাঙ্ক্ষা করেছে সুলতান সেই অনাস্বাদিত তৃপ্তিটা এসে সুলতানকে প্লাবিত করে দিল' এর বাইরে *দিকচিহ্নহীন* আর কিছু নয়। **সামস রাশীদ** (জ. ১৯২০) কয়েক দশক ধরে উপন্যাস লিখেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ লেখক। পরিপক্ব চিন্তনে জীবনের বিচিত্র বিষয়কে তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। *উপল উপকূলে* দুইখণ্ডের রচনা। জঙ্গমতাকে আলিঙ্গন করে লেখা এ উপন্যাস প্রাচুর্যময় হয়ে ওঠে দীর্ঘবিন্যাসে চরিত্র তৈরির গুণে। একই সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এখানে গঠিত হয় জীবন সম্ভাবনার সূত্র। সামশ রাশীদের কাহিনিগদ্যে আর্থ-সমাজের অন্তর-বাহিরেও মুখরিত, ব্যাখ্যাত হয় সেখানে সমাজ সত্যের স্বরূপ। *মনপ্রসূন* (১৯৮২), *উপল উপকূলে* (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭০), *নীলাঞ্জনা* (১৯৭১), *প্রাণবসন্ত* (১৯৭৩), *হৃদয় উপবনে* (১৯৭৪), *পঞ্চালিকা* (১৯৭৬), *সিন্ধু বাঁরোয়া* (উপল উপকূলের ৩য় খণ্ড) (১৯৭৭), *মনকোরক* (১৯৮১), *ক্যামেলিয়া মিনেনমিস* (১৯৮৫), *পর্বত বুরঞ্জী* (১৯৯০), *প্রীতমপুর* (১৯৯০) সামস রাশীদের উপন্যাস। **জহিরুল ইসলাম** বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় ঊনসত্তরের পটে রচিত *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯)। মধুরিনা, মুনির, বুলন, দীপক, ফারিয়া চরিত্র একদিকে রাজনৈতিক আবেগ অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্তরের স্বার্থচিন্তা কাহিনিকে তৈরি করে। এদের আবেগ নির্ধারিত 'স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহী ধবংস করো, ধ্বংস করো, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—ধবংস হোক, ধ্বংস হোক' এমন প্রত্যয়ে। উপন্যাসে আদর্শায়িত মুনির; তার সঙ্গে মধুরিনার বাদ-প্রতিবাদ এক পর্যায়ের আবার পারস্পরিক মতভিন্নতা, মতদ্বৈত তৈরি করে ভিন্ন মনস্তত্ত্ব। *অগ্নিসাক্ষী* বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটের কথা যেমন বলে তেমনি ঊনসত্তরের আন্দোলনের প্রাণশক্তি—মধ্যবিত্তের মুক্তির শর্তটিও অনিবার্যরূপে প্রকাশ করে। উপন্যাসে রাজনৈতিক চরিত্র যেমন আসাদ, মতিউর, বুলনদের স্বীকৃতি আছে। এদের স্মৃতিবাহি পথই মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রটি তৈরি করে। জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* সময় পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক

চেতনাকে রূপ দিয়েছে। *ব্রীজের তলায় থাকি* (১৩৭৩), *অন্য নায়ক* (১৯৬৭), *মেয়েরা পর্দানশীন* তাঁর উপন্যাস। **মাহবুব তালুকদার** (জ. ১৯৪১) বাঙালি মধ্যবিত্ত তৈরি হওয়া—একদিকে সুযোগ সন্ধানী অন্যদিকে পরিশীলিত জীবনের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাহবুব তালুকদারের উপন্যাস। তাঁর *ক্রীড়নক* (১৯৬৯), *অবতার* (১৯৭৩), *অপলাপ* (১৯৮৫), *আরেকজন আমি* (১৯৮৭), *পলাশ ও শিমুলের গল্প* (১৯৮৮), *বদ্ধভূমি* (১৯৯৭) প্রভৃতি উপন্যাস। 'ক্রীড়নক' শরীফ সাহেব, তার প্রশ্ন হলো, 'কে তোমার জন্মদাতা, কে তোমার পিতা?... পিতৃ পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষায় নিজের রক্তের প্রবাহে উত্তর প্রার্থনা করেছিলেন?' আত্ম-পরিচয় সূত্রকে বহুদূর বিস্তৃত করেন মাহবুব তালুকদার; সেখানে চেতনার প্রবাহ চলে, গোটা সমাজের বিকৃত, কৃত্রিম অবয়ব উঠে আসে। পাওয়া যায় রেশমার আত্মহত্যার কারণ ও খবর, খোকার জন্মবৃত্তান্ত, নগর সমাজে গড়ে ওঠা অবান্ধব-জীবন, প্রতিনিয়ত ক্ষয় আর অপমৃত্যুর হাহাকার। গভীর অতল অনুসন্ধান আছে কাহিনিগদ্যে, চরিত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের সম্বন্ধসূত্রগুলো জড়িয়ে যায়, সেখানে ব্যক্তি-পরিবার হয়ে পড়ে ক্রীড়নকের অংশ, উপন্যাসকার সে বার্তাটি পূর্ব-বাংলায় গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তের বাস্তবতায় প্রোথিত করেন। এবং সে অনুষঙ্গি গদ্য তৈরি করেন। এটাই আমাদের সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। *অপলাপে* নাহার-আজহারের দাম্পত্য জীবনের হতাশা, সন্তানসমস্যা, টানাপড়েন নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। মধ্যবিত্তের অহং, আত্মগ্লানি এবং পরিণতি নিয়ে উপন্যাস। পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্তানাকাঙ্ক্ষার দুঃস্বপ্ন, ভোগবাদ মধ্যবিত্তের অনিবার্য অবলম্বনগুলো *অপলাপ* উপন্যাসে উঠে আসে। মধ্যবিত্ত ভাবাবেগই মাহবুব তালুকদারের কহিনিস্তম্ভের প্রধান ভূমিকা। উপন্যাসের শৈলিও তরুণ মধ্যবিত্তের ভাবাবেগনির্ভর। **কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস** (১৯০৬-১৯৭৫)র মৌলিক উপন্যাস *অন্তঃশীলা* (১৯৬৭)। উত্তর জনপদের অবহেলিত মানুষের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে *অন্তঃশীলা*। প্রগতিশীল চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। প্রাক্-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্বের নারীর মুক্তিচিন্তা, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের উত্থানচিত্র প্রতিফলিত তাঁর রচনায়। রনেশ দাশগুপ্ত বলেন, 'তাঁর দেখবার চোখও আছে ... যে গুণ সহানুভূতি সত্ত্বেও কৌতুকপ্রিয়তা, সেটিও লেখকের কলমে উৎসারিত।' **আবুল হাসানাত** (জ. ১৯৩৬) কয়েক দশক ধরে উপন্যাস লিখছেন, *বিহঙ্গ মন* (১৯৭০), *দীপিত অরণ্য* (১৯৭৫), *না সুখ না দুঃখ* (১৯৭৬), *একজন বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাস* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধের পাঁচালী* (১৯৯৭)—এমন উপন্যাসে আকর্ষণীয় জীবনবাস্তবতা অধিষ্ঠিত। *দীপিত অরণ্য* ক্ষুদ্র কলেবরের হলেও ভালো রচনা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর আঙ্গিক। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসভূমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেখানে জীবনবাদী চেতনা, দ্বন্দ্বাত্মক উৎসারণ কম নয়। সেখানে কথাকাররা একটি ভাষা অর্জন করে

ফেলেছেন, আবুল হাসানাত সে পরিবৃত্ত থেকে বাইরে নন। মধ্যবিত্ত জীবনের উল্লাস-হতাশা-আনন্দ নিয়ে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো। সমাজভিত্তি ঐ জীবনাগ্রহের ভেতরেই। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী **মোহাম্মদ মোর্তজা** (১৯৩১-১৯৭১)র উপন্যাস *চরিত্রহানির অধিকার* মধ্যবিত্ত চরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক ও মানসিক দ্বন্দ্বধর্মী উপন্যাস। তাঁর এ উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণে মোহাম্মদ মোর্তাজার তেমন গভীর শিল্পদৃষ্টির ছাপ নেই। *আরেক পৃথিবী*, *শতাব্দীর ডাক*, *পূর্বদেশ* **মেসবাহুল হকে**র ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। পূর্ব-বাংলায় তিনিই এ ধারার উপন্যাসের যাত্রা শুরু করেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ থেকে মীরকাসিম আলী—এর মধ্যে অনেকেই তার চরিত্র। তবে সৃজিত চরিত্র হিসেবে শমসের গাজী মুখ্য চরিত্র। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বা মনুষ্য সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শমসের গাজী উপন্যাসে উল্লেখনীয় চরিত্র। তবে ঐতিহাসিক উপন্যসের গুণ মেসবাহুল হকের এ উপন্যাসে অর্জিত হয়নি। এর কারণে বলা যায়, ভাষার দুর্বলতা, আখ্যানভাগের অসামঞ্জস্যতা আর ঐতিহাসিক চরিত্রের জন্য নির্ধারিত জীবনদৃষ্টির অভাব। তবুও গাজী চরিত্রের মধ্যে যে শক্তি সম্ভাবনা তা বিভাগোত্তর প্রাথমিক পর্বের এ উপন্যাসটির মধ্যে কম নয়। কবি **শাহাদাৎ হোসেন** (১৮৯৩-১৯৫৩) উপন্যাস লিখেছেন অনেক, চেতনায় ইসলামী ঐতিহ্যবাহি। আরব-পারস্য উপাদানে উপন্যাস সমৃদ্ধ। তবে জীবনবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত নয়। ঔপন্যাসিক ভাষা-নির্মাণে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। *রিক্তা*, *পথের দেখা*, *মরুর কুসুম*, *খেয়াতরী*, *সোনার কাঁকন*, *যুগের আলো*, *কাঁটা ফুল*, *শিরি ফরহাদ*, *সতী মহিমা*, *হিরণ রেখা*, *পারের পথে*, *স্বামীর ভুল*, *ঘরের লক্ষ্মী*, *ইউসুফ জুলেখা* শাহাদাৎ হোসেনের উপন্যাস। **সুচরিত চৌধুরী**র রোম্যান্টিক প্রেরণাপ্রসূত উপন্যাস *নদী নির্জন নীল*। তবে জীবনের বারতা তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়। শিল্পনন্দনে জীবনকে বিচিত্রমুখি করার কিংবা সমকালের অন্বেষণ তাঁর অনবদ্য কর্ম। মুসলিম বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে গোড়ার দিকের উপন্যাসকার **আবদুর রশীদ সিদ্দিকী** (১৮৭৯-১৯৫১)। একটি পথনির্মাণের পর্যায়েই তাঁর উপন্যাসগুলো গণনীয়। *উপেন্দ্র নন্দিনী*, *মেহেরুন্নেসা*, *নুরুন্নেসা*, *নুরবাহার* প্রভৃতি উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসের ভূমিকাপর্ব

সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে যাঁরা ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে নতুন উদ্দীপনায় তাঁরা উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। এ উদ্দীপনা আসলে নতুন স্বাধীন দেশের জন্য আনুগত্য-আবেগ ও স্বস্তি। এর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা সৌধস্পর্শী। এ ধারাটিতে তাঁরাই রইলেন, যাঁরা পঞ্চাশ-ষাটে নিজস্ব

ভাষায় দাঁড়িয়েছেন। সংগ্রামে-অস্তিত্বে, ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় তাঁরা দৃঢ়তররূপে মূর্তিমান। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ, যাঁরা 'যুদ্ধ-প্রজন্ম' বলে খ্যাত তাঁরা স্বদেশপ্রিয় হয়ে, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রেরণা নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধকে পুনর্নির্মাণ করে উপন্যাস লিখতে চাইলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা, ঐ পূর্বোক্ত ঔপন্যাসিকগণ; যাঁরা সাতচল্লিশ থেকে রচনা করে চলেছেন বাংলাদেশের ভূমি-মাটি-মানুষ-প্রকৃতির সংগ্রামী ও সাবলীল নন্দনচিত্ররূপ এবং মুক্তিযুদ্ধের পরেও জীবিত ও সক্রিয়—তাঁদের প্রেরণায়, কিন্তু নবীনদের দৃষ্টিকোণ (point of view) তবুও পাল্টায়, স্বাতন্ত্র্যরূপে, দায়বোধে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিশ্রণে, পুরাণ-পুনর্গঠনে, আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে। মুক্তিযুদ্ধের পরে আশাভঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গও ঘটে। উর্দিশাসন আসে, ক্ষাত্রশক্তির দাপট গণ-মানুষকে বিরূপ করে তোলে। নবীন-প্রবীণ উভয় লেখকরাই এ অভিজ্ঞতার মুখে পড়েন। তবে নিশ্চয়ই শৈলিগত তফাৎ তৈরি হয়, অনেক বিষয়ে দ্বিমত-ভিন্নতা আসে। জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আহার-নিরাপত্তা বিপত্তির মুখে পড়ে। শ্রেণি তৈরি হয়। বৈষম্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রবলতর হয়। মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যের আদেশ বা আশীর্বাদ ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। এর ফলে স্বদেশপ্রেম, কমিটমেন্ট, স্বপ্নের ঐক্য এক থাকে না। আড়ালে ভোগবাদ, স্বার্থলিপ্সা, ধর্মন্ধতা, শোষণ ইত্যকার নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন সবাই। সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস এ সমাজের প্রকৃতি কীরূপে নির্ধারণ করবে, ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিকোণ তৈরি হবে কোন্ বীক্ষণে, বিশ্ববাস্তবতার সন্ধানসূত্রও এ সময়ে কীভাবে সেখানে প্রবিষ্ট হবে—এসব প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ তৈরি হয়েছেন, জিজ্ঞাসাসূত্রকে প্রকরণবন্দি করেছেন। এ পর্যায়ে তরুণ প্রজন্ম এগিয়েছে পাঠ-অভিজ্ঞতায়, আন্তঃপাঠ (inter-text)-র ভেতর দিয়ে। সত্তর-আশি-নব্বুই পেরিয়েছে, সৃষ্ট মনোপোলার বিশ্বে বিপর্যস্ত স্বাধীনতা, হুমকির মুখে সার্বভৌমত্ব —এসব দেখেছে। নানামুখি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ প্রান্তবর্তী মানুষের নিষ্ফল হৈচৈ দেখে আশাবাদটুকু হয়েছে অবসিত। এরূপে নির্মিত হয়েছে প্রকরণ। আঙ্গিক কর্কশ, দ্বিধাকাতর। প্রবীণ লেখকরাও একইরূপে সময় ও সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উপন্যাস লেখেন। কারণ, প্রকৃত বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। স্বাধীনতা-পরবর্তী আবেগ থিতু হয়ে আসে, প্রকরণ হয়ে ওঠে বাস্তবমুখি, সততা, স্বদেশমুখিতা, মূল্যবোধের পরিচর্যা চলতে থাকে।

দুই.

সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭)

কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক সময় বা আন্দোলন অধিকতর পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করে। নারীর শাশ্বত দৃষ্টি, সনাতন আদর্শ বজায় থাকে তাঁর লেখায়। তবে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণাটি অর্জিত হয় তাঁর লেখায় সমকালীন বুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্রের স্বার্থান্বেষী স্বরূপটি অতিক্রম করবার প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় এবং দায়িত্বশীল। এমন প্রত্যয়ে স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বায়ত্তশাসিত-বৈষম্যহীন সমাজ ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল পর্বগুলো উন্মোচিত হয় কাহিনিগাত্রে। কখনও জাতীয় চরিত্র প্রতীকায়িত হয় আদর্শের আশ্রয় থেকে। এরূপ প্রস্তাবনায় তাঁর উপন্যাস অনেকক্ষেত্রে সরলীকৃত কিংবা পূর্বফলপ্রসূত। এমনটা তাঁর শিল্পশক্তির পথকে করেছে রুদ্ধ। তবুও ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ কিংবা স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসকের প্রতিমূর্তির প্রতীকায়ন তিনি যেভাবে ঘটান সেটা অনবদ্য এবং অভিনব। *যাপিত জীবন* (১৯৮১) উপন্যাসের গঠন-নির্মাণ সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর। সেলিনা হোসেন সময়ের ইতিহাসকে চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। সেখানে 'সময়'ই চরিত্র। সোহরাব হোসেন, মারুফ ও তার স্ত্রী সুমনা, জাফর, আঞ্জুম এসব চরিত্র পারিবারিক জীবনে দৈনন্দিনতার ভেতরে নিজস্ব মূল্যবোধ ও রুচির চর্চা করে। সেখানে রাষ্ট্রের আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তিও বাড়ে। চরিত্রগুলিও সমস্ত ঘটনার অংশ হয়ে যায়। সেলিনা হোসেন এমন পটভূমিতে *যাপিত জীবন* রচনা করেন। প্রসঙ্গত, 'সময়'কে চরিত্র করতে গিয়ে লেখকের শিল্পমান অনেকটা ব্যাহত হয়। সেলিনা হোসেনের *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৭) একই বিষয় ও প্রবণতা নিয়ে রচিত। *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (১৯৯৪-১৯৯৬) ত্রয়ী (trilogy) উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনির বিস্তৃতি সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে পঁচাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশে সিভিল শাসকের পতন পর্যন্ত। প্রজন্মান্তরের চরিত্র সৃষ্টি করেন সেলিনা হোসেন। আলী আহমদ থেকে প্রদীপ্ত-প্রতীক; বাংলাদেশ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রতিরোধে এগিয়ে চলা। উপন্যাসটিতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, সীমাবদ্ধতা এবং একই সঙ্গে আছে স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সুলুকসন্ধান। একটি স্বাধীন দেশের জন্মবৃত্তান্তই *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র মূল প্রতিপাদ্য। তেইশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের নিগড় থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া—তার কার্যকারণসূত্র; অতঃপর স্বাধীন দেশ, রাজনৈতিক নেতা, নেতৃত্ব ইতিহাসসিদ্ধ হয় উপন্যাসে চরিত্রের অন্তঃপ্রবাহে। স্বাধীন দেশের দুরূহ পুনর্গঠন, দুর্ভিক্ষ, অব্যবস্থার সুযোগে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অপশক্তির হাতে দেশনায়কের মৃত্যু; সিভিল শাসনের অপমৃত্যু। উপন্যাস পরিসমাপ্ত। *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। হলদী গাঁয়ের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্তি, সলীমের যুদ্ধে যাওয়া, কলিমের আহত হওয়া, বোবা রইসের প্রতিরোধ তীব্রতায় উঠে আসে উপন্যাসে। উপন্যাসটির সবচেয়ে বড়

শক্তি, প্রধান চরিত্র বুড়ির মাতৃত্ব; যা অতিক্রম করে সে বোবাসন্তান রইসের হাতে যুদ্ধের জন্য এল.এম.জি তুলে দিয়েছে। যেখানে তার অন্য দুই সন্তান (বুড়ি বিমাতা হলেও)ও জীবনের মায়া ছেড়ে যুদ্ধে গেছে। হলদী গাঁয়ের বুড়ির পরিবারের এ ত্যাগ একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য। *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮৩) বাঙালির সংগ্রাম ও চেতনাদীপিত একটি উপন্যাস। কাহিনিতে কাহ্নপা ও শবরীর জীবনচিত্র বর্ণিত। শ্রেণিচেতনার স্বরূপটিও ধরা পড়ে উপন্যাসে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের শ্রেণিদ্বন্দ্ব। ব্রাহ্মণের স্থানচ্যুতির নির্মোহ বিন্যাস— 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী'—ভুসুকুর এ আত্মপরিচয়ের স্বীকারোক্তি সমস্ত সংগ্রাম-আন্দোলন ও অধিকারের ভেতর দিয়ে। ব্রাহ্মণ প্রতিরোধে দেবল ভদ্র, দেশাখ, ডোম্বীর অস্তিত্বের সংগ্রাম বাঙালি জীবনচেতনারই স্বীকৃতি। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে। *চাঁদবেনে* (১৯৮৪)র চাঁদ শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি, সংগ্রামে টিকে থাকার প্রতীক। মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য *মনসামঙ্গলে*র চাঁদসদাগরের চেতনায় রচিত *চাঁদবেনে*র চাঁদ চরিত্রটি। বিপরীতে আজু মৃধা, প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। চম্পাইগঞ্জের মানুষ শোষণ-নিপীড়নের ভেতর প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। সেলিনা হোসেন কহিনি-আবর্তে চাঁদের ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহসী রূপকে প্রত্নদৃষ্টিতে রূপায়ণ করেন। সমুদ্রদ্বীপে বাসকৃত মালেক-সাফিয়ার ঝিনুক সংগ্রহ এবং মুক্তা আহরণ, শক্তিধর তোরাব আলী-গণি মিয়ার উত্থান ও নিয়ামক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া, মালেকের সমুদ্রজয়ী সংগ্রাম, স্বার্থসংশিষ্ট প্রেম-প্রবৃত্তি ইত্যাদির শিল্পআবহ *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) উপন্যাস। মালেক প্রতিজ্ঞায় হাঙর শিকারের সমস্ত উপকরণ নিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী । মালেক ছাড়াও সালেক, বসির আলী, সুজা প্রাণবন্ত চরিত্র। খলচরিত্র তোরাপ ও সহযোগী গণির অর্থআনুকূল্যে অনেকেই তাদের অনুচর হলেও শাহপরি দ্বীপে মূলত সৎ মানুষের সংগ্রাম ও বৃত্তি-অনুষঙ্গই জয়ী হয়। তেভাগানেত্রী ইলা মিত্রকে অবলম্বন করে লেখা সেলিনা হোসেনের *কাঁটাতারে প্রজাপতি* (১৯৮৯)। চরিত্র হয়ে আসে ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)। নাচোলে স্থিতি, শোষণমুক্তির সংগ্রামে একাত্মতা। ওয়াজেদ মোড়লরা বেপর্দার কথা বললেও কৃষক কায়েস মণ্ডলরা বুঝে ফেলে শ্রেণিচেতনার স্বর। তেভাগার সংবাদ এলে কহিনির নেত্রী পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেন। জাতপাতনির্বিশেষে সবাই ইলা মিত্রের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। তাদের 'রানীমা' বন্দি। অকথ্য নির্যাতন। সেলিনা হোসেন পূর্ণাঙ্গ সত্য ও সৎ সহানুভূতিকে চিত্রিত করেন, যেন প্রজাপতির কাঁটাতারে অবস্থান; অর্থদ্যোতক মাত্রা পায়। লেখকের অন্য উপন্যাস *কালকেতু ও ফুল্লরা* (১৯৯২)। স্বৈরাচারী শাসনের রাষ্ট্রে জনতার স্বাধীনতা নির্বাসিত। স্বাধীন নগরের প্রত্যাশা কালকেতুর; স্বপ্ন দেখে শাসকশক্তির সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতার অবসানের। ফুল্লরাও নারী অধিকারে, লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবসানে, জনকল্যণকর

রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের অবমুক্তির প্রত্যাশাই *কালকেতু ও ফুল্লরার* মেসেজ। কিন্তু সেলিনা হোসেন মধ্যযুগের এ দুটি চরিত্রকে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে প্রতিস্থাপিত বা পুনর্মূল্যায়িত করেছেন সেটা প্রশংসার যোগ্য। *পদশব্দ* (১৯৮৩) *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২), *মগ্ন চৈতন্যে শিস* (১৯৭৯), *ক্ষরণ* (১৯৮৮), *খুন ও ভালোবাসা* (১৯৯০), *উত্তর সারথী* (১ম উপন্যাস), *যুদ্ধ* (১৯৯৮), *ভালোবাসা প্রীতিলতা* (১৯৯২), *টানাপড়েন* (১৯৯৪), *দীপান্বিতা* (১৯৯৭), *লারা* (২০০০), *মোহিনীর বিয়ে* (২০০২), *আনবিক আন্ধার* (২০০৩), *ঘুমকাতুরে ঈশ্বর* (২০০৪), *মর্গের নীল পাখি* (২০০৫), *অপেক্ষা* (২০০৭), *পূর্ণ ছবির মগ্নতা* (২০০৮), *ভূমি ও কুসুম* (২০১০), *যমুনা নদীর মুশায়রা* (২০১০), *গাছটির ছায়া নাই* (২০১২), *সোনালী ডুমুর* (২০১২) প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস।

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)
জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। অনেক উপন্যাস লিখেছেন। *নন্দিত নরকে* (১৯৭৩) লিখে ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি পেয়ে যান। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ-সুখ-হাসি-কান্নার পরিমণ্ডলকে সূক্ষ্মতর ও হৃদয়বৃত্তিক করে তোলেন তিনি। উপন্যাসে হুমায়ূন, রাবেয়া, মন্টুর আন্তঃসম্পর্ক, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সম্মান-মর্যাদার বিষয়গুলো শক্তিশালী গদ্যে স্পর্শকাতর করে তোলেন। যেমন রাবেয়ার নির্বিকারত্বের কারণ, মন্টুর ফাঁসি হওয়া, মা-বাবার প্রতিক্রিয়া গভীর ভাবার্থ তৈরি করে। তাঁর *১৯৭১* (১৯৮৬) ছোট্ট পরিসরের উপন্যাস। ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। মেজর এজাজ আসে নীলগঞ্জ গ্রামে। গ্রামের সমস্ত সংবাদ যেমন রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু, ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদির খবর নেন। মিলিটারি ও রাজাকার সম্মিলিতভাবে আক্রমণ নির্যাতন শুরু হয়। উপন্যাসের কবি আজিজ নির্যাতনে নিহত। রফিক উপন্যাসে প্রাণবান চরিত্র। *শঙ্খনীল কারাগার* (১৯৭৩), *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৪), *নির্বাসন* (১৯৭৪), *অন্যদিন* (১৯৭৪), *তোমাদের জন্য ভালবাসা*, *অচিনপুর*, *সৌরভ* (১৯৮২), *সবাই গেছে বনে* (১৯৮৪), *তোমাকে* (১৯৮৪), *একা একা* (১৯৮৫), *অমানুষ* (১৯৮৫), *আমার আছে জল* (১৯৮৫), *সূর্যের দিন* (১৯৮৫), *প্রথম প্রহর* (১৯৮৫), *দেবী* (১৯৮৫), *ফেরা* (১৯৮৬), *আগুনের পরশমনি* (১৯৮৬), *এইসব দিনরাত্রি* (১৯৮৬), *নক্ষত্রের রাত* (১৯৮৭), *অরণ্য* (১৯৮৭), *নক্ষত্রের রাত* (১৯৮৭), *দূরে কোথায়* (১৯৮৭), *আকাশ জোড়া মেঘ* (১৯৮৮), *অপরাহ্ণ* (১৯৮৮), *বাসর* (১৯৮৯), *দ্বৈরথ* (১৯৮৯), *রজনী* (১৯৮৯), *অন্ধকারের গান* (১৯৮৯), *সাজঘর* (১৯৮৯), *সমুদ্র বিলাস* (১৯৯১), *জনম জনম* (১৯৯০), *ময়ূরাক্ষী* (১৯৯০), *গৌরীপুর জংশন* (১৯৯০), *অয়োময়* (১৯৯০),

কোথাও কেউ নেই (১৯৯০), *দারুচিনি দ্বীপ* (১৯৯১), *পাখি আমার একলা পাখি* (১৯৯২), *মিসির আলীর অমীমাংসিত রহস্য* (১৯৯২), *হিমু* (১৯৯৩), *জলজোছনা* (১৯৯৩), *শ্রাবণ মেঘের দিন* (১৯৯৪), *পেন্সিলে আঁকা পরী* (১৯৯৫), *শুভ্র* (২০০০), *জোছনা ও জননীর গল্প* (২০০৪), *লীলাবতী* (২০০৫), *লিলুয়া বাতাস* (২০০৬), *মাতাল হাওয়া* (২০১০), *শুভ্র গেছে বনে* (২০১০), *ডিজিটাল হিমু* (২০১০), *সব সংগীত গেছে ইংগিতে থামিয়া* (২০১০), *মেঘের ওপারে আকাশ* (২০১২), *দেয়াল* (২০১২) প্রভৃতি। *লীলাবতী* বিদুষী লীলাবতীর কাহিনি। সিদ্দিকুর রহমানকে ঘিরেই এ উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত। তবে *লীলাবতী*র কাহিনি অন্য 'সাবধানতা সত্ত্বেও বিবাহের পরেই লীলাবতী বিধবা হন। ভাস্করাচার্য কন্যাকে যত্নসহকারে বিদ্যাশিক্ষা দেন। ভাস্করাচার্য প্রণীত বিখ্যাতগ্রন্থ *সিদ্ধান্ত-শিরোমণি*-এর তৃতীয় খণ্ড লীলাবতী কর্তৃক রচিত হয়। এমন তথ্যভিত্তির বাইরে, কল্পনায় অন্য লীলাবতীকে বানিয়েছেন লেখক। গ্রামীণ পটচিত্রে তা অঙ্কিত। শক্তিশালী উপন্যাসের স্বীকৃতি এটি। লীলাবতীর বাবা সম্পর্কে মূল্যায়ন : 'তিনি শুরুতে আমার কাছে ছিলেন অতি দুষ্টু একজন মানুষ। যে তাঁর স্ত্রী কন্যাকে দূরে ঠেলে দেয়—আরেকটি বিবাহ করে। সুখে যে ঘর-সংসার করে তা না। স্ত্রীকে তালা আটকে বন্দী করে রাখে।... বদরাগ, অহঙ্কার—এইসব বিষয় তাঁর কাছে চরিত্রের অহঙ্কার...'। হুমায়ূন আহমেদের বৃহৎ কলেবরের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস *জোছনা ও জননীর গল্প*। *আগুনের পরশমণি* (১৯৮৬) অন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এটি ঢাকার দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযানের কাহিনি। অনুপম গদ্যশৈলির কারণে এটি সুখপাঠ্য রচনাও বটে। গেরিলা যোদ্ধা আলম মতিন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, এতে তার পরিবারের প্রথমে আপত্তি, পরে সবাই যুদ্ধের পক্ষের যোদ্ধা আলমের অনুপ্রেরণার শক্তিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির কথাও এখানে আছে। হুমায়ূন আহমেদ গল্পকৌশলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রিজিয়া রহমান (জ. ১৯৩৯)
চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজারে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত পরিবার অ্যান্টনি ডিক্রুজের উত্তর পুরুষ বনি ডিক্রুজের দ্বন্দ্ব; প্রসঙ্গত এ দ্বন্দ্ব নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বই বটে। *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭) এমন দ্বন্দ্বাত্মক প্রজন্মবৃত্তান্ত। প্রৌঢ় অ্যান্টনি ভালোবাসে পর্তুগীজ ইতিহাস-সংস্কৃতি এবং তার অতীতস্মৃতি। কিন্তু পুত্র বনি একেবারে বিপরীত। সে বঙ্গদেশের প্রেমে আসক্ত। বনির বাবা ডিক্রুজের উল্টো মানসিকতা এবং অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়ে শ্যামল-সুন্দর প্রকৃতির প্রতি তার অনিমেষ ভালোলাগা। বনি ভালোবাসে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে। উপন্যাসে এসব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় বোন লিসির উদ্ধত চলাফেরা এক পর্যায়ে জেরি ফার্দিনান্দের সঙ্গে

সম্পর্ক এবং বিরূপ পরিণতি। বনির পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিসিদ্ধ মন সবকিছু এড়িয়ে চলে এবং মংপুর জটিল ব্যবসায়িক চাতুরি থেকেও সে বেরিয়ে আসে। এরপর মূলত মিসেস ডিক্রুজের হাতেই পড়ে কাহিনির যাবতীয় মীমাংসার ভার। রিজিয়া রহমান শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বকে দুর্দান্তরূপে স্কন্ধে ধারণ করেন। তবে এ উপন্যাসে কাহিনির উৎস ও পরিণতিতে কিছুটা অসতর্ক ও পরিচর্যার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের জাতিত্ব ও নৃতত্ত্বের অস্থিকে অবলম্বন করে শিল্পকল্পনার মেদমজ্জায় *বং থেকে বাংলা* (১৯৭৮) উপন্যাস লিখেছেন রিজিয়া রহমান। বং এবং এলা নামের চরিত্র সেই অনার্য যুগ থেকে প্রতিরোধে কীরূপে নিজস্বতা পেয়েছে এবং স্বাধীনতা পেলো তার ইতিবৃত্ত উপন্যাসটি। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস, রাজন্য রাজত্বকাল, ভঙ্গুর সামন্তবাদ, উত্থিত পুঁজিবাদ, ইংরেজ শক্তি, স্বদেশীদের আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান, বিভাগোত্তর পাকিস্তানী অপশাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের বৃত্তান্ত উপন্যাসটি। এক্ষেত্রে বং এবং এলার বংশধর, প্রজন্মান্তর তৈরি হয় উপন্যাসে। তারাই মূলত উপন্যাসের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। দশ অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসে বঙ্গালের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, সংস্কার, ধর্মীয় রীতি, কোমল প্রকৃতির বিহ্বলতা কাহিনিবৃত্তকে তৈরি করেছে। অনার্য বা ব্রাত্যকুল আর্য-প্রতিরোধে বাইদ্যা, পাইক্কী, কৈয়ারত নিরন্তর সংগ্রাম করে। ক্রমশ তা গোত্র, সমাজ পেরিয়ে দিনান্তে পরিপক্ব মাত্রা পায়। অনার্য প্রতিনিধিরা উপন্যাসে বিভিন্ন খণ্ডে বিচিত্র নামে আবির্ভূত হয়। তারই ধারায় বাঙালি সত্তার বিকাশ, এবং পূর্ণায়ত স্বাধীনতা। তাঁর ভাষা প্রত্যয়নিষ্ঠ। তবে পটবিন্যাস একটু শিথিল। *একাল চিরকাল* (১৯৭৮) আদিবাসী জীবনচেতনার স্বরূপচিহ্ন। সাওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়-সংস্কার, ঐতিহ্য, সংগ্রাম, মুক্তিচেতনা বিধৃত এ উপন্যাসে। হোপনা সরেন, চুবকা সরেন, সুরকা সোরেনকে নিয়ে চব্বিশ পরিচ্ছেদের উপন্যাসে প্রজন্মান্তরের ধারা বয়ে চলে; তাদের শোষণ-বঞ্চনা-পীড়নও তেমনি বহমান। *একাল চিরকাল* উপন্যাসে এক পর্যায়ে সাঁওতাল অসন্তোষের ভেতর দিয়ে তেভাগার বিষয়টি কাহিনিতে ধৈর্যের সঙ্গে প্রবিষ্ট করেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-কেন্দ্রীক অনালোকিত বিষয়টি কাহিনিবদ্ধ করায় একদিকে যেমন বাংলাদেশের উপন্যাসে নিষ্পেষিত ও বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির শিল্পগত সমর্থন মেলে অন্যদিকে তেমনি শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসেবেও এর মাধ্যমে তাঁর দৃঢ় অবস্থান তৈরি হয়। মংলাছড়ি চা-বাগানের কাহিনি *সূর্য-সবুজ রক্ত* (১৯৮১)। রিজিয়া রহমান ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাস নির্ধারিত সমাজ-সংস্কৃতি ও শ্রেণি-শোষণচিত্র অবলোকন করেন। এ প্রত্যয়েই দায়নির্ভর ভাষা রচিত হয় উপন্যাসে। ভাষার ভেতরেই প্রতিকার-প্রতিরোধের প্রকাশ বর্ণিত হয়। চেনা যায় হরিয়া, অর্জুন, লছমিদের। *ধবল জোৎস্না* (১৯৮১)র

পটভূমি কক্সবাজার, রাবার বাগান, সমুদ্র উপকূল। কেন্দ্রীয় চরিত্র মকবুল। মকবুলকে ঘিরেই কাহিনি তৈরি। একাগ্রতা, সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধতা একদিকে অন্যদিকে প্রেম-রোমান্স-রোম্যান্টিক সত্তায় মকবুল স্থির-চঞ্চল। 'মকবুল যেন ওই সাগরটার মত। তার উদ্দামতার শেষ নেই। আক্রোশের অন্ত নেই।' রিজিয়া রহমান প্রকৃতির প্রতীকায়নে পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন চরিত্র। সেখানে জীবিকা আর পেশার সঙ্গে উপভোগ্য জীবন-আত্মা যেন একাকার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তান বিদ্রোহের পটভূমি এবং কালাত যুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাস *শিলায় শিলায় আগুন* (১৯৮০)। বঙ্গীয় ভূখণ্ডের বাইরের ঘটনা হলেও দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য চেতনা তো কোনো বৃত্তেই আবদ্ধ নয় বৈকি। রিজিয়া রহমান এ উপন্যাসেও যথারীতি সত্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল। *অলিখিত উপাখ্যান* (১৯৮০) উপন্যাসটির চরিত্র মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সময়কাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। পাওয়া যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণতি, সরালীয়ার জমিদার মিসেস মার্গারেট মোরেলের অত্যাচার, ছেলে হেনরী মোরেল, ম্যানেজার হেইলী, নীল ব্যবসায়ী উইলিয়াম হান্ট-এর শোষণ-নিষ্পেষণ চিত্র। বিপরীতে মেলে প্রতিরোধী মানুষ রহিমউল্লা, হোসেন আলী, জোহরা প্রমুখ। ভূমি বিস্তার, দাদন গ্রহণ, নীল চাষ ইত্যাদির সঙ্গে কৃষকদের ভাগ্য জড়িত; সর্বস্বান্ত হয় তারা। নেটিভ ও ইংরেজ দ্বন্দ্ব অধিকারের, আধিপত্যের। নেটিভদের পক্ষে দাঁড়িয়ে মধুসূদন কী করবেন; দীনবন্ধুর *নীলদর্পণে*র অনুবাদেই কি তার দায়িত্ব শেষ? আর বঙ্কিম নেটিভদের পক্ষে আইনী লড়াই করেছেন কিন্তু সাজার বদলে আইনের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে এসে বলেছে 'ভুলে যেও না তুমি একজন নেটিভ। এবং আমি একজন ইংরেজ।' প্রতিবাদী রহিমউল্লা ইংরেজদের গুলিতে নিহত, তবে অত্যাচারী মোরেলদের বিচার কে করবে। *অলিখিত উপাখ্যানে* শেষে অসহায় 'ডেপুটি' বঙ্কিমের আত্মগ্লানি লেখা হয়। তবে তা করতে গিয়ে কোনো চরিত্রই তৈরি হয়না—নিছক সময়ের প্রতিবেদনই লেখা হয়। এমন উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির জন্য যে সজাগ সহানুভূতি ও ধৈর্য দরকার তা এ উপন্যাসকারের ছিল না। *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮) উপন্যাসে গোলাপীপট্টির ছবি অঙ্কিত। যৌনকর্মী জাহানআরার যৌনজীবন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নির্মাণই শুধু নয় সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেতরে আরেকটি তথাকথিত অপরাধ রাষ্ট্রের ছবি তৈরি করেন লেখক। বাংলাদেশের সাহিত্যে এটি একটি অনবদ্য উপন্যাস। লেখকের *ঘর ভাঙা ঘর* (১৯৭৪) ও তমসাবৃত বঞ্চিত মানুষের চিত্রার্পন। অন্য উপন্যাস *প্রেম আমার প্রেম* (১৯৮৫), *অরণ্যের কাছে* (১৯৮০), *ঝড়ের মুখোমুখি* (১৯৮৬), *একটি ফুলের জন্য* (১৯৮৬), *শুধু তোমাদের জন্য* (১৯৮৮), *হে মানব মানবী* (১৯৮৯), *হারুন ফেরেনি* (১৯৯৪)।

মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮)

মাহমুদুল হক আমাদের উপন্যাসে ভিন্নতর ও জিজ্ঞাসু জীবনরসিকরূপে পরিগণিত। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই ষাটের শেষার্ধে রচিত, দুটো গল্পগ্রন্থ (*প্রতিদিন একটি রুমাল* ও *নির্বাচিত গল্প*) বেরোয় ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ এ। *অগ্রন্থিত গল্প* (প্রথম খণ্ড) রেবিয়েছে, মৃত্যুর পরে ২০১০ সালে। তোলপাড় তোলার কাজটি মাহমুদুল হক করেননি, যানওনি সেদিকে, নিভৃতচারি-প্রচারবিমুখ স্বভাবে নির্মল নির্মাতাধারী ও শুদ্ধচারী রূপেই লেখক-অঙ্গণে পরিচিত। *জীবন আমার বোন* মধ্যবিত্তের পাণ্ডুলিপি। মধ্যবিত্ত খোকা কেন্দ্রীয় চরিত্র। খোকাকে ঘিরেই এক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত। এক ধরনের প্রকাশভঙ্গিতে সে ঘটনাপ্রবাহ সচল, সর্বাঙ্গীন। কথক প্রবিষ্ট সংলাপে উস্কে দেয় হিউমার, স্যাটায়ার, পরিহাস। পরিবেশটি সে-উৎসবে হয়ে ওঠে সিরিয়াস। তার মধ্যে সংস্কৃতিজ্ঞান কিংবা পেরুনোর চেষ্টা আরাধ্য, সূক্ষ্মতর, তীক্ষ্মধী। একই বিষয়ব্যাপার বিচিত্র আখ্যায় প্রতিবিম্বিত। প্রতিজনকে স্বাতন্ত্র্য করে প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠে সর্বদিক-সবকিছু, ভেতরের ক্লেদ-মুক্তি, দুর্মর নৈঃসঙ্গ্য, বহিঃপ্রকাশে পেয়ে যাওয়া সম্ভব ব্যক্তির (খোকা-মুরাদ) সততার দিক, সে সততা কীসে আটকানো? 'জয়বাংলা' বিশ্বাসে আবার অনিশ্চিত দ্বিধাতেও। শব্দ-আয়ত্তটি সুবল এবং উজ্জ্বল পরমায়ু রঞ্জিত। বহুদূরে পরিব্যাপ্ত। শাণিত, শ্যেণ ও দণ্ডিত। খোকার নির্মিত আরও বলা যায় মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরূপে নির্ণয়ের নিমিত্ত। সেটির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আর্থ-সমাজের ঔচিত্যে। এ আর্থ-সমাজ সাতচলিশোত্তর নাগরিক-বীক্ষা তথা ভঙ্গুর সামন্তবাদের ভেতরে গড়ে ওঠা পুঁজি ব্যবস্থা। প্রথম শহুরে প্রজন্ম। আর সে প্রজন্মের পেয়ে যাওয়া বিচিত্র স্ববিরোধী-অবিরোধী-আবেগী-অরোমান্টিক-রোমান্টিক-অদ্ভুতদ-ফ্যান্টাসীসমেত সার্বিক 'অন্য'কিছু! তার জন্য এ নির্মিত আখ্যান ও নির্ণীত প্রকরণ। এমনটিই *জীবন আমার বোনের* আখ্যা ও উদ্ভূত সত্য।

জীবন আমার বোন (১৯৭৬) উপন্যাসটি তাঁর শিল্পীসত্তার প্রধান ক্ষেত্র। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ এতে থাকলেও মধ্যবিত্তের প্রবণতা নির্ণয়েই তাঁর বেশী মনোযোগ। খোকা কেন্দ্রীয় চরিত্র। খোকাকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে রেক্সের আড্ডায় ভয়, শঙ্কা, গুজব, উচ্ছ্বাসে ব্যাপৃত খোকা, নুরুদ্দীন, মুরাদ, ইয়াসিন, রাজীব। ঢাকার রাজপথ, মিছিল, বিস্ফোরণ পরোক্ষ অবলোকন করে খোকা। 'ব্যক্তি' খোকা বিচ্ছিন্ন, হয়ে-উঠতে চায়। এমন মূলবিষয়কে ধরে উপন্যাসে শ্রেণিস্বার্থ, শ্রেণিচেতনা, বঞ্চনা, নৈঃসঙ্গ্য, তেইশ বছরের পাক শাসনের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক আবহ, প্রেম, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উঠে আসে। মধ্যবিত্ত অনুষঙ্গি আবেগে মাহমুদুল হকের ভাষাও প্রাণবন্ত এবং সুন্দর। *অনুর পাঠশালা* ১৯৭০-এ বের হয় *যেখানে খঞ্জনা পাখি* নামে, 'সমীপেষু'র ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়। প্রথম

গ্রন্থাকারে মুদ্রণে হয় ১৯৭৩-এ। পরে নামকরণ হয় *অনুর পাঠশালা*। এটির রচনাকাল ১৯৬৭। উপন্যাসটি অনুর অনু হয়ে-ওঠার, প্রতিক্রিয়ার কাহিনি; আত্মকুণ্ডলায়িত অবিকশিত অনু, সে শ্রেণিচ্যুত-দ্বিধান্বিত-দ্বন্দ্ব-দ্বেষে আক্রান্ত। পরিপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার যাবতীয় উপাদান থেকে সে বঞ্চিত। মানবিক গুণ থাকলেও পরিবার থেকে সমাজের সমর্থন না থাকায় সে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। উপন্যাসে ভঙ্গুর, পলায়নপর সমাজকে এমন বিষয় অবলম্বি করে তোলেন ঔপন্যাসিক। *কালো বরফ* উপন্যাসেও আবদুল খালেক নার্সিসিস্টিক। কারণ, তার পরিবার, চাকরি, সমাজ সর্বক্ষেত্রে সে অসংলগ্ন; নানাবিধ সঙ্কটে পরিশুদ্ধ হওয়ার পথ অবরুদ্ধ। কাহিনির কথক ও সঙ্কটাপন্ন চরিত্রের সমান্তরাল ভাষ্য এক হয়ে যায়; কথকের প্রচলিত ভুঁইফোড় সমাজসম্ভূত বাস্তবতা আর চরিত্রের অসংলগ্ন রূপরীতি যেখানে আশ্রয়ই হয় কৈশোরের ফড়িং শালিক। এভাবে ব্যক্তিবিচ্যুত ব্যক্তি তৈরি করেন মাহমুদুল হক। পুর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ আঁকা *নিরাপদ তন্দ্রা* (১৯৭৪) উপন্যাসে ঘরছাড়া মেয়ে হিরণের দুর্দান্ত গল্প। হিরণই মূল চরিত্র হয়ে ওঠে—যে কি-না ভালোবাসায় প্রতারিত, হস্তান্তরিত। বস্তিতে এ মেয়ের গল্প শুনতে গিয়ে 'নিরাপদ তন্দ্রা'র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কথক 'আমি'ও লক্ষ করা যেতে পারে। যদিও মেয়ের গল্পই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসের শেষ অংশটি বিরাট, অতুলনীয়, অসামান্য, বিরতিহীন, হাজার রঙের অমোচনীয় কথা, '—ওগো ভয়, দয়া করো, দয়া করো, মনে হচ্ছিলো হয়তো আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তুমি যেন সোনার ঘড়া আগলে নদীর তলায় বসে আছো, এতো গভীর সেখানে আমি যেতে পারি না, ধরো সত্যিই যদি তাই হতো, এমন তো কতো ঘটেও...' জলেশ্বর মাঝি আর জয়পাড়ার বৃত্তান্ত সার্বজনীন সত্যে-উপলব্ধি। শেষ *খেলাঘর* (১৯৭৮)-এ মুক্তিযুদ্ধের তরঙ্গসংক্ষুব্ধ কালসীমার বর্ণনা থাকলেও খুব অন্তর্ভেদী হয়ে ওঠে আদিনাথের ভিটের ইতিহাস—যার সঙ্গে প্রতিতুলনা চলে একাত্তরে কিডন্যাপ হওয়া পিতৃমাতৃহীন রেহানার ধ্বংসস্তূপধৃত শরীরের। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ থাকলেও প্রকৃত হয়ে ওঠে অন্তর্জীবনের অধ্যায়। মাহমুদুল হক অন্তর্দৃষ্টির আঁচড়ে তেমন শিল্পসতর্ক ভাষাও বানিয়েছেন। *মাটির জাহাজ* (১৯৯৬) স্বাধীনতা-পরবর্তী অবক্ষয়িত বিরূপ ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি। রক্ষীবাহিনীর অপতৎপরতা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। কাহিনিতে মেলে জয়নাল ও মনোহর যথাক্রমে একজন নারী ব্যবসায়ী অন্যজন নারী সরবরাহকারী। অপরাধী বা অবিবেকী পঙ্কিল চরিত্র হলেও ভেতরের অনালোকিত অংশটি নির্ভুল বাঙময় করে তুলতে ভোলেন না লেখক। বিশেষত জয়নাল আর তার সঙ্গি আলমাছিবিবির সম্পর্ক কিংবা কুসুম-মনোহর এক জীবনে গাঁথা। এসব চিত্র অঙ্কনে লেখক সমকালীন আর্থ-রাজনীতিক বাস্তবতার যেমন প্রতিফলন ঘটান তেমনি চরিত্রের অন্তর্কাঠামোর সমগ্রতাকে

আলোকিত করেন। মাহমুদুল হকে প্রধান অন্বিষ্টই চরিত্রের ভেতরপটের উন্মোচন—নিছক সস্তা লেখক তিনি নন। *যেখানে খঞ্জনা পাখী* (১৯৭৩) সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'লেখকের কল্পনা শক্তির বিস্তার রীতিমতো অসাধারণ... যেখানে খঞ্জনা পাখী এই দশকের অন্যতম উপন্যাস।' *কালো বরফ* (১৯৯২), *অশরীরী* (২০০৪) তাঁর অন্য উপন্যাস।

মাহমুদুল হক ষাটের শেষার্ধ্বের লেখক। প্রায় সব উপন্যাসই রচনার কয়েক বছর পরে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে।

হাসনাত আবদুল হাই (জ. ১৯৩৯)

হাসনাত আবদুল হাইয়ের উপন্যাস *তিমি* (১৯৮১)। কাজলপুর ইউনিয়নের নওয়াজেশ চেয়ারম্যান 'তিমি' প্রতীকায়ন পায় উপন্যাসে। প্রকৃতঅর্থে, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্যেণ ইঙ্গিত করে তা প্রতিরোধের প্রত্যয় থেকে লেখক উপন্যাস লেখেন। তেভাগার সূত্র প্রেরণার মন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বিধাবিভক্তি, স্বপ্নভঙ্গ-আশাভঙ্গ তৈরি; সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস সেখানে শাহেদের তৎপরতা, মানুষের মুক্তিচিন্তা, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এসব আছে উপন্যাসে। *আমার আততায়ী* (১৯৮০) উপন্যাসে রফিক নামের মধ্যবিত্ত চরিত্রের চিহ্নিত 'আততায়ী' এবং তার স্বরূপকে মনোজাগতিক আখ্যায় তুলে ধরবার চেষ্টা চলে। এক অর্থে মূলচরিত্র রফিকই নিজের শ্রেণিঅবস্থান, আত্মিক সংকট, দোলাচলতা, একাধিক নারী-পুরুষ সম্পর্ক-সান্নিধ্যে বিকারগ্রস্ত; অস্থির হয়ে পড়ে। 'হয়ত বাবু নয়, হয়ত নাসের চৌধুরী অথবা তার ভাড়া করা আততায়ীই ছিল টেলিফোনের ওপাশে।'—রফিকের এমন ভাবনায় সে হয়ত নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না। জটিল মনঃপীড়ায় সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন চরিত্র হাসনাত আবদুল হাইয়ের উপন্যাসে পরিণতি পায়। তাঁর শিল্পের মনস্তত্ত্বের সুর ও সূত্র মধ্যবিত্তকেন্দ্রীক হলেও সবচেয়ে প্রশংসা পান তিনি জীবনী উপন্যাস *সুলতান* (১৯৯১) রচনার জন্য। বরেণ্য শিল্পী এস. এম. সুলতানের (মৃ. ১৯৯৪) প্রতিকৃতি এ উপন্যাস। বর্ণনার গাত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্ধানসূত্র রচিত হলে লেখকের সুলতান, শিল্পিত সুলতান হয়ে ওঠেন অন্যরকমে। বাংলাদেশের সাহিত্যে একজন শিল্পীর জীবন নিয়ে এমন উপন্যাস বিরলই বটে। তবে লেখক কাহিনিকে শুধু সুলতানের বৈচিত্র্যময় জীবনেই আটকিয়ে রাখেননি সময় এবং সমাজের মানুষের সম্ভাব্য রূপকেও নিবিড় পর্যবেক্ষণে গেঁথে তুলেছেন। উপন্যাসের প্লটবিন্যাস, বর্ণনাত্মক রীতির কাহিনি, প্রান্তিক জীবনচিত্র অসামান্য তাঁর এ রচনায়। *সিকস্তি* (১৯৯৭) উপন্যাসটিতে ভূমির সিকস্তি ও পয়স্তির তুলনায় জীবনের উত্থান-পতন-বিপর্যয়ের রূপকে তুলে ধরা হয়েছে। নগর-গ্রাম উভয় পটচিত্রেই জীবনের বিচিত্র রূপের

অনুসন্ধান করা চলে। হাসনাত আবদুল হাই উপন্যাসের নন্দনকে পরিবেশন করেন শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বাত্মক প্রবণতা থেকে। সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাঁর জীবনই প্রতিষ্ঠা পায় নন্দনভূমির আধুনিক মাত্রিকতায়। *সুপ্রভাত ভালোবাসা* (১৯৭৭), *মহাপুরুষ* (১৯৮২), *মোরেলগঞ্জ সংবাদ* (১৯৯৫), *বাবুই* (১৯৯৭), *যুবরাজ* (১৯৮০), *সাফারি* (১৩৯৯), *সাতজন* (১৯৯৯), *প্রভু* (১৯৮৬), *সময়* (১৯৯১), *একজন আরজ আলী* (১৯৯৫), *নভেরা* (১৯৯৫), *বাইরে একজন* (১৯৯৫), *হাসান ইদানীং* (১৯৯৫), *সোয়ালো* (১৯৯৬), *ইন্টারভিউ* (১৯৯৭), *বাবুই সুনীতি* (১৯৯৭), *পানেছার বানুর নকশীকাঁথা* (২০১০), *লড়াকু পটুয়া* (২০১২)।

ইমদাদুল হক মিলন (জ. ১৯৫৫)

ইমদাদুল হক মিলন সাম্প্রতিক সময়ে বহুপ্রজ ও আলোচিত ঔপন্যাসিক। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তিনি বিচিত্ররকম মানুষকে কাহিনিতে এনেছেন। গ্রাম এবং নগর জীবনাচার গভীর দৃষ্টিচেতনায় প্রোথিত তাঁর রচনায়। উপন্যাসে শোষণ-নিপীড়ন, সংস্কার-কুসংস্কার, সমাজ স্তরান্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণীত। লেখকের গল্পভাষা আকর্ষণীয়। বেশ কিছু উপন্যাসে তিনি শিল্পঋদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তবে নগর মধ্যবিত্ত পৌনঃপুনিক বয়ান তাঁর উপন্যাসে আসে, যেখানে নিছক উপরিতল (surface structure) চিত্রিত, অন্তর্গঠনের স্বরূপ মেলে না। *দুঃখ কষ্ট* (১৯৮২), *ও রাধা ও কৃষ্ণ* (১৯৮২), *এক দেশ* (১৯৮৩), *প্রিয় নারী জাতি* (১৯৮৪), *সুন্দরী কমলা* (১৯৮৫), *ভালোবাসার পাশেই* (১৯৮৯), *কালোঘোড়া* (১৯৮৩), *উপনায়ক* (১৯৯০), *নদী উপাখ্যান* (১৯৮৫), *ভূমিপুত্র* (১৯৮৫), *কালাকাল* (১৯৮৫), *অভিমান পর্ব* (১৯৮৬), *দিনগুলি* (১৯৮৬), *পরবাস* (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (১৯৮৭), *নায়ক* (১৯৮৮), *মেয়ে মানুষ* (১৯৮৮), *প্রতিনায়িকা* (১৯৮৮), *দ্বিতীয় প্রেম* (১৯৮৮), *দুজনে* (১৯৮৮), *ভালোবাসার নির্বাচিত উপন্যাস* (১৯৮৯), *বালকের অভিমান* (১৯৮৯), *সম্পর্ক* (১৯৮৯), *সারাবেলা* (১৯৮৮), *যৌবনকাল* (১৯৮৮), *ভূমিকা* (১৯৮৮), *রূপনগর* (১৯৮৮), *কথাছিলো* (১৯৮৮), *বনমানুষ* (১৯৮৯), *পরকীয়া* (১৯৮৯), *সখা তুমি* (১৯৮৯), *আজকের দেবদাস* (১৯৮৯), *হে বন্ধু হে প্রিয়* (১৯৮৯), *প্রিয় বা প্রিয়তম* (১৯৮৯), *স্বামীস্ত্রী* (১৯৮৯), *ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস* (১৯৮৯), *প্রেমে বিরহে* (১৯৮৯), *মহাযুদ্ধ* (১৯৮৯), *ভালবাসা ভালো নয়* (১৯৮৯), *তুমি কেমন আছো* (১৯৮৯), *দেখা হবে* (১৯৮৯), *স্বপ্ন* (১৯৮৯), *এক বোন পারুল* (১৯৮৯), *রাজনৈতিক উপন্যাস* (১৯৮৯), *দ্বিতীয় পর্বের শুরু* (১৯৮৯), *আমার মেয়ের সংসার* (১৯৮৯), *যতদূরে যাই* (১৯৮৯), *কোন কাননের ফুল* (১৯৯০), *যাবজ্জীবন* (১৯৯০), *সে আমার* (১৯৯০), *প্রিয়জন* (১৯৯০), *অদ্বিতীয়া* (১৯৯১), *ছেলেমানুষি* (১৯৯০), *বলো তারে* (১৯৯০), *বহুদূরে*

(১৯৯০), *রাজাকারতন্ত্র* (১৯৯০), *পিঞ্জর* (১৯৯১), *অপহরণ* (১৯৯১), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯১), *লাইলী* (১৯৯১), *সুদূরতমা* (১৯৯১), *মায়াবিনী* (১৯৯১), *যাও তুমি ফিরে* (১৯৯১), *বিদেশিনী* (১৯৯১), *প্রিয়দর্শিনী* (১৯৯১), *একজন* (১৯৯১), *সজনী* (১৯৯১), *বিরহী* (১৯৯১), *বিচ্ছেদ* (১৯৯১), *রূপ* (১৯৯১) *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস* (১৯৮৯), নূরজাহান (১ম পর্ব : ১৯৯৫), *মাটি ও মানুষের উপাখ্যান*, *তুমিই* (২০০৫), *একা* (২০০৫), *পর* (২০০৬), *শ্রাবণ সন্ধ্যাটুকু* (২০১০), *আয়না কেমন আছে* (২০১০), *লিলিয়ান উপন্যাস* (২০১০), *বন্ধুবান্ধব* (২০১০), *যাবজ্জীবন* (২০১০), *চাই* (২০১০), *তেঁতুল পাতায় নয়জন* (২০১২) প্রভৃতি। নদীভাঙন কবলিত ভূমিনির্ভর মানুষের গ্রামীণ উপকথা *নদী উপাখ্যান*। ইমদাদুল হক মিলনের *ভূমিপুত্র*ও ভূমিনির্ভর মানুষের সংগ্রাম স্বপ্নের রূপায়ণের চালচিত্র। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ভূমি এবং কর্মের সংযুক্তির পর্বটিতে মানুষের অনিবার্যতার স্বরূপটি নির্ণীত। এরূপে লেখকের ভাষ্যে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁচার নিশ্চয়তার 'বক্তি'র স্বপ্নগাথাও চরিত্রের ভেতরে মূলীভূত হয়। *নূরজাহান*ও (১ম পর্ব : ১৯৯৫) তাঁর আলোচিত উপন্যাস । এ উপন্যাসে নারীর রূপান্তরিত বিদ্রোহীসত্তা কাঠামোবন্দি হয়েছে।

মঞ্জু সরকার (জ. ১৯৫৩)

নগ্ন আগন্তুক (১৯৮৪)-এ ধর্মের নামে শ্রেণিশোষণের বিষয়টি থাকলেও সেখানে নয়া আগন্তুক 'ল্যাংটা জীব'কে নিয়ে সমাজসত্যনির্ভর চরিত্র বানানো এক রকমের দায়বোধের এবং জীবন-অন্বিষ্ট শিল্পভাবনার পরিচয়ও বটে। এ আগন্তুকের ফলে রহমতের চরে, সমাজে-সংসারে তৎপরতা বাড়তে থাকে। বিশা মণ্ডল দাঁড়িয়ে যায়। সালমা, হানিফ, মনসুররা শোষকের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। উপন্যাসে অনেক মৃত্যু ঘটে। কারণ ঐ জোতদার বিশা মণ্ডল। আঞ্চলিক ভাষায় গ্রামীণ পটের এক সামগ্রিক পটচিত্র উঠে আসে। *তমস* (১৯৮৪) উপন্যাসে মঞ্জু সরকার গ্রামীণ পটচিত্রকে নির্মাণ করেন ঔপনিবেশিক-উত্তর বাস্তবতার ব্যক্তি-শোষণের পর্যায়কে বিবিধ পরিবৃত্তে চিহ্নিতকরণের প্রত্যয় থেকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিচরিত্র ফজুর চোর সাব্যস্ত হওয়া, অতর্কিত আক্রমণে ডাকাতের হাতে তার মৃত্যু, মঈনের খুনের দায় এবং খালেক চেয়ারম্যানের পরামর্শে গ্রাম ত্যাগ—এসব ঘটনা নিয়ে *তমস* রচিত। প্রকরণ তীক্ষ্ণধী, আঞ্চলিক সংলাপের ভেতর দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের প্রতিরোধ ও শাসন-শোষণ তৎপরতার রেখাচিত্রটি নির্মিত। পরবর্তীতে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস *প্রতিমা উপাখ্যান* (১৯৯০)। এটি প্রতিমার কাহিনি। ভোলারহাট গ্রামের ঘটনা বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করে। রণজিৎ প্রতিরোধে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু চেয়ারম্যানের দাপটে

প্রতিক্রিয়াশীলতায় অগণতান্ত্রিক আচরণে সে নুইয়ে পড়ে। দেখা যায় ভোলারহাট গ্রামে কিরূপে অপসংস্কৃতির দাপটে প্রজন্ম নষ্ট হচ্ছে, সেখানে কালো টাকা, প্রতারণা-আত্মসাৎ চরম অব্যবস্থায় নিপতিত। রণজিৎ বা মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ সেখানে কি করতে পারে! সামরিক শাসনপুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম, তার বিনষ্টি ও অবক্ষয়, সংখ্যালঘু সঙ্কট উপন্যাসে চিত্রিত। মঞ্জু সরকার; প্রচণ্ড শক্তিশালী আঙ্গিক তৈরি করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শুধু নগর নয়, গ্রামের বিনষ্টিও যে সর্বশেষ পর্যায়ে নিপতিত—তার সত্যচিত্র নির্ধারিত *প্রতিমা উপাখ্যানে*। মঞ্জু সরকারের নজর বিনষ্টি সমাজের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করায়, সেজন্য পূর্ণায়ত চরিত্র বিন্যাস তার কাহিনিরেখায় তেমন উঠে আসার অবকাশ পায় না। নিছক কাহিনি নয়; কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের ভেতরের সমস্যা ও সম্ভাবনার রূপটি তিনি তুলে আনেন। এজন্য বাস্তবানুগ ভাষায় যাবতীয় সমাজশর্তের সম্পর্কসমূহকে নিরন্তর বুনতে থাকেন মঞ্জু সরকার। এক্ষেত্রে আবেগ ও ভাষা সংহত, পট ঋজু ও উদ্দেশ্যাভিসারী। উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে আধুনিক শিল্পিত দৃষ্টিতে তুলে আনাই তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা। এজন্য আঞ্চলিক সংস্কৃতির সম্বন্ধটিকে তিনি যুক্ত করেন সার্বজনীন দৈশিক আবহে। এতে করে তাঁর লেখায় আত্ম-অস্তিত্বের পরিচয়ও থাকে না অনালোকিত। *আবাসভূমি* (১৯৯৪) উপন্যাসেও আবাসভূমির স্বপ্ন সফলতার বাস্তবতা বিধৃত। আবাসভূমির অধিকার এবং দখল-পুনর্দখল তৎপরতা—সেখানে প্রতিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বর্ণিত। মঞ্জু সরকার প্রায় একই রীতিতে শোষণ-সমস্যার স্বরূপকে কাহিনি-ভাষায় রূপ দেন। *টান* (১৯৯৬) উপন্যাস মর্জিনার কাহিনি। ভূমিসংলগ্ন মানুষের অবলম্বন আর সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার দাপট, গ্রামের ভুইফোঁড় প্রান্তিক মানুষের বিরূপ প্রতিচ্ছবি নিয়ে এ উপন্যাসের প্রকরণ-নির্মাণ। মঞ্জু সরকার প্রত্যন্ত মানুষের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ধারাকে ভাষায় তুলে আনেন। অত্যন্ত সক্রিয় ও রূঢ় সত্যে তাঁর ভঙ্গিটি নির্মিত। *দাঁড়াবার জায়গা* (১৯৯৪), *ভাঙনের সময় ভালোবাসা* (১৯৯৫), *অমৃতা* (১৯৯৫), *স্বপ্নচোর* (১৯৯৭), *একনায়ক* (২০১৩) তাঁর অন্য উপন্যাস।

আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪)

আবুবকর সিদ্দিক বাংলাদেশের উপন্যাসে গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেন সমাজ-অন্বিষ্ট মানুষের অন্তর্গত শক্তির প্রাণনাকে মাটি-অনুষঙ্গি গদ্যে নির্মাণ সাফল্য থেকে। ন্যাচারালিস্টিক ক্যানভাসে বিত্তহীন শ্রমজীবী তাঁর লেখার কেন্দ্রবিন্দু। উপন্যাসে মানুষের বাঁচার সংগ্রাম; প্রকৃতির বিরুদ্ধে, নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই—টান উত্তেজনায়

শৈলিতে বাধা পড়ে। *জলরাক্ষস* (১৯৮৫)এ একটানা দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা-ক্ষুধার প্রচ্ছদপট রচিত হয় জরিন-গোনজোরালির মধ্য দিয়ে। প্রকৃতঅর্থে, মানুষের সবকিছুই পরাজিত হয় ক্ষুধার কাছে। নিঃসন্তান জরিনার অপত্য স্নেহের আকাঙ্ক্ষা যে সন্তানকে লালন করে ক্ষুধার জ্বালা তাকেও রেহাই দেয় না। আবুবকর সিদ্দিক 'ব্যক্তি' মানুষের সংকট চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবণতাসমূহ রূপক (allegory) আকারে তুলে ধরেন। 'শ্যাওলাজমা স্যাঁতস্যেঁতে পৃথিবীর দেহ' কিংবা রিলিফ প্রত্যাশী 'এক জটলা জ্যান্ত কঙ্কাল' এমন রূপকে উপন্যাস তার উত্তেজনাকর পরিবেশকে রচনা করে। বর্ণনার ভেতরে চলতে থাকে শোষণ যন্ত্রের করালগ্রাসি প্রতাপ আর শোষিত মানুষের বিরূপ মনস্তত্ত্ব। ভাষা প্রয়োগ ও ভাবনার বিন্যাসে *জলরাক্ষস* উপন্যাসে শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও চরিত্রের অংশ হিসেবে তৈরি হয়। *খরাদাহ* (১৯৮৭) উপন্যাসে কৃষক আন্দোলন, তেভাগার প্রতিচ্ছবি অন্তর্বাস্তবতায় রূপায়িত। বাস্তব জীবন প্রতীকায়নে, শাণিত শ্লেষে, ব্যাঙ্গে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে সংকটাদীর্ণ বাস্তবতা। একদিকে সমাজ-সামন্ত প্রতীভূ অন্যদিকে বিনাশী প্রকৃতির রূপ ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় অর্থ পায়; সূক্ষ্ম সুবেদী দৃষ্টিতে উপমা, প্রতীকের আবহে কর্কশ-নিষ্ঠুর-মর্মন্তুদ উচ্চারণ আক্ষেপ ছড়ায়, আর আক্ষেপের বাতাবরণে শিল্পীর চৈতন্যস্তরের সঙ্গে যুক্ত হয় পাঠকের বিবেচনা। চৌদ্দ খণ্ডের উপন্যাসে নির্মিত হতে থাকে কিসমত ও ভল্লার সাংস্কৃতিক জীবন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের শক্তিচিহ্নের অন্তর্গত প্রয়াস। বাংলাদেশের সাহিত্যে আবুবকর সিদ্দিক সমাজ-অন্বিষ্ট মানুষের দায়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ শিল্পী। বিনষ্ট সময়ের বার্তা-বয়ানে আবুবকর সিদ্দিকের স্বাতন্ত্র্য, মূলত আন্দোলন ও দ্বন্দ্বকে অন্তরের বাস্তবতায় প্রতীকায়িত করা, যেখানে তাঁর প্রকাশভঙ্গি অনন্য। আর এ প্রকাশের উপায়রূপে আসে প্রকৃতির বিভৎসরূপ। এটিই তাঁর উপন্যাসে অন্যেতর শিল্পিত মাত্রা। *একাত্তরের হৃদয়ভস্ম* (১৯৯৭), *বারুদপোড়া প্রহর* (১৯৯৬) কবির অন্য উপন্যাসগ্রন্থ।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (জ. ১৯৪২)

অচেনা (১৯৮৫), *সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা* (১৯৯০), *ভয় ভালবাসা ও নির্বাসন* (১৯৮৮), *মুক্তিযোদ্ধারা*, *ভেতরে একজন কাঁদে*, *শ্রমণ গৌতম* (১৯৯৬), *আমি তোমার কাছে সমুদ্রের একটি ঢেউ জমা রেখেছি* (১৯৯৭) বিপ্রদাশ বড়ুয়ার উপন্যাস। *অচেনা* প্রেমধর্মী উপন্যাস। *সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা* উপন্যাসের মূলচরিত্র মোবাশ্বের। সমুদ্রকে ঘিরে কাহিনি গড়ে উঠলেও জীবিকা উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রতিপার্শ্ব সেখানে নির্মিত। সংগ্রামসূত্রটিও

উপন্যাসে উপস্থিত। বিপ্রদাশ বড়ুয়া প্রকৃতিপ্রেমী; প্রকৃতিবিষয়ক পরিবেশটি তাঁর রচনার আকর্ষণীয় দিক। অনেক ক্ষেত্রে কাহিনিকে তা করে প্রভাবিত।

শাহরিয়ার কবীর (জ. ১৯৫০)
নক্সালবাড়ী চেতনার ওপর শাহরিয়ার কবীরের *ওদের জানিয়ে দাও* (১৯৮৫) উপন্যাস। উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্র দীপু, পূরবী, জাফর চারু মজুমদার আদর্শে শ্রেণিশত্রু খতমের প্রত্যয়ে দীপ্ত। তবে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। হালদার হাটের সাহেবালী খতমের দায়িত্ব পড়ে নতুন সদস্য দীপুর ওপর। কিন্তু সে দ্বিধান্বিত। এদিকে দলের কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। শ্রেণিশত্রু সম্পর্কে রাজু গণআদালতে বিচারের কথা তোলে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সমাজমুক্তির প্রসঙ্গটি আওয়ামী ও রক্ষীবাহিনির বিপরীতে বামপন্থিদের মধ্যে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘবদ্ধ হতে থাকে তার একটা রূপ আছে এ উপন্যাসে। একই সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সদস্যদের দ্বিধা, পিছুটান, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সঙ্কটের মনস্তত্ত্বও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর কিশোর উপন্যাস *অন্যরকম আটদিন* (১৯৯৩), *একাত্তরের যীশু* (১৯৮৫), *পূবের সূর্য* (১৯৭২), *নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়* (১৯৭৬), *হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা* (১৯৭৬), *সীমান্তে সংঘাত* (১৯৮৮), *হানাবাড়ির রহস্য* (১৯৮৯), *নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা* (১৯৮৯), *পাথারিয়ার খনি রহস্য* (১৯৮৯), *বার্চ বনে ঝড়* (১৯৯১), *বহুরূপী* (১৯৯১), *রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র* (১৯৯৩), *কার্পিথিয়ানের কালো গোলাপ* (১৯৯৪), *অন্যরকম আট দিন* (১৯৯৩), *অনীকের জন্য ভালোবাসা* (১৯৯৩), *একাত্তরের পথের ধারে* (১৯৯৪), *লুসাই পাহাড়ের শয়তান* (১৯৯৪), *বাভারিয়ার রহস্যময় দূর্গ* (১৯৯৪), *আলোর পাখিরা* (১৯৯৫), *ঘাতকের সন্ধানে* (১৯৯৫), *মরুর শয়তান* (১৯৯৫), *রত্নেশ্বরীর কালো ছায়া* (১৯৯৬), *ভয়ঙ্করের মুখোমুখি* (১৯৯৬) প্রভৃতি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)
বাংলাদেশের উপন্যাসে অনিবার্য ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) এবং *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাস লিখে তিনি উঁচুমাপের শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা তার *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস। এ উপন্যাসে কাহিনির শুরু, গণ-অভ্যুত্থানে নিহত আবু তালেবের লাশ নিয়ে রাজনৈতিক বিতণ্ডার ভেতর দিয়ে। এরপর লক্ষ করা যায়, আত্মপ্রেম-মগ্ন (narsistic) ওসমানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। উপন্যাসে রাজনৈতিক উত্তাপ থাকলেও বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের কাটাছেঁড়া এবং সমাজের শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের স্বরূপটি—মূল শিল্পভিত্তি। নগর

ও গ্রাম দুই-ই পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে এ উপন্যাসে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি-পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ি লেখকের ভাষা-নির্মাণ। ওসমান ছাড়াও আনোয়ার, হাড্ডি খিজির, রহমতউল্লাহ এবং গ্রামীণ পটে জালাল মাস্টার, খয়বার গাজী, নেদু প্রামাণিক, আলিবক্স অন্যতম চরিত্র। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে রাজনৈতিক সত্যতা যেমন আছে তেমনি ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরিখে আবহমান বাঙালি মুসলিম চরিত্রের স্বরূপকে ধরবার প্রচেষ্টাও আছে। ইতিহাস ও রাজনীতির সত্যের বাইরেও ব্যক্তিমানুষের প্রেম, বাৎসল্য, মাতৃত্ব, কামনা-বাসনা উপন্যসে অনুপস্থিত থাকে না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তৃতীয় বিশ্বের আগ্রাসী পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করেন *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে। সেক্ষেত্রে প্রখর বাস্তববাদী ও ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁর উপন্যাসে ফ্রেমবন্দি হয়। উপন্যাসটি সার্বিক সমাজ পরিকাঠামোর বীক্ষায় ধ্রুপদী মাত্রায় উন্নীত। *খোয়াবনামা* আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিস্তৃত পরিসরের ভিন্নশৈলির বিশাল উপন্যাস। এখানে লেখকের শিল্পদৃষ্টি অনেক পরিকল্পিত। উপন্যাসের সময়কাল বিভাগ-পূর্ববর্তী ছেচল্লিশ। যেখানে মুসলমানের পাকিস্তানের স্বপ্ন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা, সংখ্যালঘু সঙ্কট ব্যাপক রূপ পেয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে *খোয়াবনামা*র মাপের উপন্যাস বিরল বলা যায়। কারণ, কাহিনিতে অনেক চরিত্র, অনেক ঘটনায় উত্তপ্ত সময়ের সাক্ষ্যরূপ যেমন নির্ধারিত তেমনি খোয়াবের মাজেজায় হাজার বছরের ঐতিহ্য তার শোষণ-নিষ্পেষণ বা প্রতিরোধের সংস্কৃতি বিরাট ও ব্যাপক আবহে রচিত। উপন্যাসে তীব্রশক্তিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মবিশ্বাস। শাস্ত্রীয় ধর্মাচার, প্রথাবদ্ধ সমাজরীতিও প্রচলিত ও অনিবার্য বাস্তবতার মুখোমুখি পড়ে। যেখানে প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসও শিথিল হয়ে পড়ে। তমিজের বাপ, তমিজ, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ, কেরামত এবং শরাফত, নায়েব, কালাম, আজিজ প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত। তাদের বাঁচার বা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও নিজস্ব মনস্তত্ত্ব থেকে। স্বপ্ন দেখাও নির্ধারিত হয় নিজের শ্রেণিস্তর থেকেই। তমিজের বাপ মুন্সীর স্বপ্ন দেখে, তমিজ দেখে তেভাগার, কেরামত খোয়াবনামা হাতে পাবার আর কাদের নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য তৎপর। প্রত্যেকের স্বপ্নের মধ্যে রচিত হয় সংগ্রামী মনস্তত্ত্ব। *খোয়াবনামা*র কাহিনিগদ্যও তৈরি হয় তেমন চরিত্র অনুযায়ি। এক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভূমি-সংলগ্ন শ্রমী মানুষের ভাষা ও সংলাপ অবিকৃত রূপায়ণ করেন। উপন্যাসটির বিশেষত্ব, লোকভাষার ফ্রেমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও অবিকল চিত্ররূপ নির্মাণ। উপন্যাসে লেখক রাজনীতিকে একদিকে পরিশ্রান্ত কৃষকের জীবন-সংলগ্ন যেমন করেছেন তেমনি শহরের নব্যমধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনাকে নির্মিতি দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম মনস্তত্ত্ব,

দাঙ্গা, ধর্মীয়-আচার সংশ্লিষ্ট রাজনীতি প্রচণ্ড শক্তিতে প্রতিফলিত। উপন্যাসের চরিত্র খুব তপ্তমুখর এবং প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ।

হরিপদ দত্ত (জ. ১৯৪৭)
গ্রামীণ পটে লেখা হরিপদ দত্ত'র উপন্যাস। *ঈশানে অগ্নিদাহ* (১৯৮৬) উপন্যাসে একদিকে আছে জমির মোড়ল, মোহব্বত আলী মেম্বার অন্যদিকে আব্দুল্লা, কুতুবউদ্দীন, জব্বার মাস্টার, মজিদ প্রমুখ। দুপক্ষের প্রতিরোধ, দ্বন্দ্বের চিত্র উপন্যাসে থাকলেও মূলত শোষণ স্বরূপটি নির্ধারিত। শুধু শোষণ নয় ষোলখণ্ডের এ উপন্যাসে সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্মীয় আচারের শক্তি ভাঙনযুক্ত সমাজ পটভূমিতে উপস্থাপিত। *ঈশানে অগ্নিদাহ* উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ পর্যয়ের শোষণচিত্রটি নির্মম প্রকরণে বাধা হয়। উপন্যাসকারের ভাষা শক্তিশালী। তাঁর অপর উপন্যাস *অন্ধকূপে জন্মোৎসব* (১৯৮৭)। এখানেও লেখকের মেসেজ প্রায় একই। নরসিংদীর পলাশ থানার ময়াল গ্রামের মানুষের প্রশ্ন 'সুখের লাইগ্যা ভোট দিলাম জিন্না সাবেরে, দিলাম মজিবররে, জিয়ারেও দিলাম। কৈ সুখ কৈ?।' গ্রামের মাটি-অনুবর্তী কর্মীমানুষ কমরউদ্দীন, দবিরউদ্দীন, হাসান, রবিনা, ফরিদসহ অনেকেই। শক্তিধরদের শোষণকলে কেউ হালের বলদ বিক্রিতে বাধ্য হয়, কেউ গ্রাম ছাড়ে, কেউ হয় নিঃস্ব। উপন্যাসকারের হাতে কাহিনি উৎকর্ষ (climax) মাত্রা পেলে ঐক্যবদ্ধ হয় শোষিত মানুষ। তাঁর উপন্যাসে কাহিনি রচিত হয় অনিবার্য ভাষাশক্তিতে। তখন শুধু শোষণ নয় মানবীয় সত্তার উল্লেখনীয় বিষয় যেমন প্রেম-রোম্যান্স-ভোগ-ঈর্ষা-বাসনা কিছুই বাকি থাকে না। সংগ্রামী মানুষের সমগ্রতা তাঁর শিল্পসত্তার আধার, সন্দেহ নেই। *অজগর* ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সনে। *অজগর* প্রতীকধর্মী উপন্যাস। 'পটভূমি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আশির দশকের জিয়াউর রহমানের শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত'। গ্রামের পরিবর্তনসূত্রটি রচিত। অজগরকে শোষক শ্রেণির প্রতিভূরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর এবং ব্যক্তি মানুষের অবক্ষয়ের প্রতিরূপ অঙ্কন করেছেন। পূর্বোক্ত উপন্যাসের মতো *অজগরেও* প্রান্তিক মানুষের সামাজিক স্বরূপটি অঙ্কনের প্রয়াস পান। এক্ষেত্রে হরিপদ দত্ত প্রতীকী ব্যঙ্গে মানবিকতার শর্তসমূহকে চিহ্নিত করেন। ভাষাটিও হয়ে ওঠে ক্রোধশাসিত। রাজনৈতিক বীক্ষণ, দেশভাগ ট্র্যাজেডি-সাম্প্রদায়িকতার অপ-রাজনীতি লোমহর্ষক কাহিনি *মোহাজের* (২০০৬)। *পিতৃহত্যার রাত ও অগ্নিবিন্দু* (২০০৭) অনেকটা ডকুমেন্টারী, দুঅংশে বিভক্ত। দুঃসময়ের চালচিত্রই বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। *চিম্বুক পাহাড়ের জাতক* (২০০৮) অন্য স্বাদের ইতিহাসানুগ উপন্যাস। হরিশংকর

বৃত্তান্ত নিয়ে *হরিশংকর জলদাস* (২০০৮) পেশাভিত্তিক শ্রমজীবীর আখ্যান। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে দায়বদ্ধ রীতির এমন প্রকরণটিতে হারপিদ দত্ত দৃঢ়ভিত্তিতে চিহ্নিত। *উপন্যাস সমগ্র* বেরিয়েয়েছে ২০০৫ সালে। লেখকের *শীতলক্ষ্যা* বেরোয় ২০১০ সালে।

কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২)

দিনযাপন (১৯৮৬)-এর লেখক সাম্যবাদে বিশ্বাসী। একটি পরিবারকে ভিত্তি করে ক্ষুদ্রায়ত উপন্যাসটির কাহিনি তৈরি। মনোতোষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তার আদর্শবাদী রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে হত্যা-ধর্ষণ-ছিনতাই-লুট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গ্রাম-গঞ্জেও অবক্ষয়। চুরি-ডাকাতি চলছে। এমনকি শ্রেণিসংগ্রামের নামেও চলছে লুঠতরাজ। গড়ে উঠেছে ভুঁইফোঁড় প্রতিপত্তিশীল গোষ্ঠী। উপন্যাসে নিশিকান্ত, সুকুমার, নান্টু, বাসুদেব চরিত্রের স্বার্থ-মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিসর্বস্ব চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরেন লেখক। মনোতোষের পরিবারে স্ত্রী জয়া নির্বিরোধী। ভাড়াবাড়িতে চলে দিনযাপন। সেখানে নেই স্বাচ্ছন্দ বা নিরাপত্তা। কায়েস আহমেদ পরিবার এবং পরিবারের বাইরের ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষুৎকাতর বাস্তবতাকে কর্কশ, নির্মেদ গদ্যে তুলে ধরেন। কাহিনি বানানোর চেয়ে নজর প্রকট বাস্তবতার দিকে। উপন্যাসের কাহিনি পরিব্যাপ্ত হয় না। চরিত্রের চেয়ে যেন চালচিত্রই কাহিনি হয়ে ওঠে। *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৬)-এ উত্তম পুরুষের বর্ণনায়, দেশভাগের নিয়তি বিবৃত হয়।

শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮)

শহীদুল জহির এ সময়ের শক্তিশালী অস্তিত্ববাদী লেখক। বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র পর এ ধারায় তিনি অনবদ্য প্রকাশক। একই সঙ্গে তিনি জাদু বাস্তবতা ও উত্তর-আধুনিক মনোভঙ্গির দৃঢ় উপস্থাপক। শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৫) তে আছে শিক্ষিত ‘বাজাইর্যা ম্যায়া’ নয়নতারা। এখানে বয়ান কৌশলে লেখক সচেতন। তাকে চেনা যায় মফিজুদ্দিনের বাচনে। এক দরিদ্র কৃষক আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিন। পরে নয়নতারাই তার সব। উপন্যাসে নয়নতারা মানবিকবোধে উদ্দীপ্ত। সে মফিজুদ্দিনের জন্য নিজেকেও বিপন্ন করে তোলে। অপরূপ রহস্যময় পরিবেশ, ধর্মের-দেবতার নামের পরিহাস—এমন অনেক বিষয় নিয়ে *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাস। লেখক রচনার নমুনা :

> মাইনষের জীবনের উপর ভর কইর‌্যা থাকে চাইরট্যা জিনিস, এর একটা হইলো সূরযো, তার বাদে চান, মঙ্গল আর শনি; মাইনষের হাতে থাকে এই চাইর জনের রাজত্বের হিসাব, যুদি শনির রাজত্ব বাইড়া যায়,

তাহইলে বাণিজ্যের নাও মাইর খায়, ফসলে পোকা হাঁটে, আন্ধারে পেঁচা ডাইক্যা ওঠে, আসে দুর্দিন; তবে সূরুযের রাজত্ব যুদি বড় থাকে তাহইলে সাহস থাকে কইলজা জোড়া, আর তাহইলে শনি কাবু হয়্যা থাকে; আর মঙ্গল যুদি রাহা হয় তাইলে সব ভালো; কিন্তু চাঁন্দের রাজত্ব যুদি বড় হয় তাইলে কি হয় ওস্তাদ? আমি জিজ্ঞাস করি, আমার ওস্তাদ কয়, এ্যার কোনো ভালো-মন্দ নাই, কিম্বা এইটা ভালো-মন্দ দুই-ই; চান্দের আলো যহন ফেরেশতারা পৃথিবীতে ঢাইল্যা দেয়, তখন বৃক্ষ আর পশুপাখির পরান নিঝঝুম হয়্যা আসে, তখন চান্দের রাজত্বে যে যায় সে বইতে পারে না, সে জাইগ্যা না ঘুমায়া আছে, সে য্যান খালি এক নেশার ভেতর দিয়্যা হাইট্যা যায়...

সুহাসিনীর নিয়তি এমন চাঁদ-আখ্যায় আটকায়, সুহাসিনী নিঝুম হয়্যা যায়, সুহাসিনী স্বপ্ন দেখে, বাঁচে মফিজুদ্দিকে কেন্দ্র করে, যে মফিজুদ্দি এ সুহাসিনীতে করেছে জীবন আর তেজের আবাদ। আর মফিজুদ্দিকে ১১১ বছর বাঁচার নিশ্চয়তা দিয়েছে অন্যজন, চন্দ্রভান। সুহাসিনী এ চন্দ্রভানের কছে যেমন জীবন পেয়েছে, তেমনি মফিজুদ্দি চন্দ্রভানের কাছে পেয়েছে শতায়ুর আশীর্বাদ। মফিজুদ্দির জীবনকে পাল্টে দিয়েছে চন্দ্রভান, মফিজুদ্দির ইতিকথায় চন্দ্রভান নারী-ভূমি-মাটি-মা-প্রেয়সী প্রিয় চন্দ্রহার। পিদিম জ্বালানী বৈষ্ণবী, এক দুর্দান্তরাতে মৃত্যুশিকারী চন্দ্রভান, ছলায়কলায় বাধে মফিজুদ্দিকে আবার একই ছলায়কলায় বাঁচায় মফিজুদ্দিকে ডাকাতদল নেতা রৌহা চষানো দুর্ধর্ষ হালাকুর কূটকৌশল থেকে। হালাকু নৌবিহারে নারীভোগ, অর্থভোগ, চান্দ্রভোগ উপভোগ করে। যমুনায়, ভররাত। লগিতে, তার পাটাতনে আর পানিসঙ্গমে। তড়পায়, পানিতে, ভরাবর্ষায়, মেঘে-আকাশের আতশবাজিতে। খুঁজে পায় নারী, চন্দ্রভান। তারপর গন্ধে-সঙ্গমে-রমনে-উপর্যুপরি কামনার অনলবর্ষনে, তার নারীসত্তা পায় সমস্ত স্বত্ব। তখন নারীরূপের পয়দা হওয়া অধিকারে বাঁচে, উথলে ওঠা অপার্থিব প্রেমে বাঁচে মফিজুদ্দি। তখন তার অধিকারে সুহাসিনী সব পায়, শুধু পাওয়া নয় সব্বাইকে জানিয়ে দেয় কী করেছে সে এই সুহাসিনীর জন্যে। যেখানে পূর্ণিমার চাঁদেই আকালুর কুড়িয়ে পাওয়া বোবা স্ত্রীর ঘরে মফিজুদ্দির জন্ম। শানশওকতের প্রশ্ন নেই। পৃথীবির প্রাণে আর ১০ প্রাণীর মতো সে জন্মে। উপন্যাসের আগ্রহ, জীবনের প্রতি। উপনিবেশ-উত্তর সময়ে তো সে দাবি আরও বেশি কার্যকর। সমাজের ম্যাজিক ক্রিয়াকর্ম যাদু, তামাশা, ভৌতিক কারবারি, ভীতিপ্রদ অযৌক্তিক যন্ত্রণা, আজগুবি পরিবেশনা, অনাহুত আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসের ভিতে সংস্কার-কুসংস্কার-কুৎসিত কূপমণ্ডূকতা সবকিছু মিলে সুহাসিনীর পাশফেরার গল্প। সে

ইতিবৃত্তে জীবনকথার ভেতরে পরিস্রুত দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের প্রান্ত-অনুবর্তী জনজীবনের গল্পকথা। বর্ণনাভঙ্গিতে গল্পরূপটি বিশেষ মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে। *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮), *মুখের দিকে দেখি* (২০০৬), *আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু* (২০০৯) তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। শেষ উপন্যাসের ভেতরে তাঁর একটা নীরব পালাবদল লক্ষণীয়। আলাদারকমের গভীরতায় জীবনের আলো-অন্ধকারের দিকগুলো জাদুবিস্তারী (magical) ভাষায় দিব্যতুল্য হয়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে, তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতায় চরিত্রগুলো হয়ে ওঠে কুহকাচ্ছন্ন এক পরিব্রাজক।

মইনুল আহসান সাবের (জ. ১৯৫৮)
পাথর সময় (১৯৮৯) উপন্যাসে 'সে'-চরিত্রটি মুক্তিযুদ্ধে নারী সরবরাহের কাজ করেছিল, তার সহযোগী ছিল বিডি। স্বাধীনতার পর এরা গা-ঢাকা দিলেও খুব তাড়াতাড়ি এরা রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পুনর্বাসিত হয়। এমন চরিত্র ও আর্থ-বাস্তবতা নিয়ে আরও লেখা *মামুলী ব্যাপার* (১৯৮৪), *আদমের জন্য অপেক্ষা* (১৯৮৬), *পরাজয়* (১৯৯০), *কেউ জানে না* (১৯৯০), *মানুষ যেখানে যায় না* (১৯৯০), *সতের বছর পর* (১৯৯১), *ঋষি ও নারী* (২০০৫) উপন্যাসগুলো। দেখা যায় চাকরি-শিক্ষা-প্রশাসন, অর্থ-প্রতিপত্তি সর্বত্র তাদের আধিপত্য। বিপরীতে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধারা বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, অথর্ব জীবনযাপন করছে। মইনুল আহসান সাবেরের ভাষা স্বচ্ছ, সরল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্ত উন্নাসিকতা, দাম্পত্যকলহ; পরস্পর বিচ্ছেদ কিংবা আবেগ-নির্ভর আনুগত্য উপন্যাসে উঠে এসেছে। প্রধানত অবক্ষয়িত নাগরিক-পরিকাঠামোটির অন্তর্বয়ন রচনা করেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে ভাষার প্রতীকায়নের ভেতর দিয়ে শিক্ষিত-মনস্তত্ত্বের পরিহাসটিই গুরুত্ব পায়। কাটাছেঁড়া প্রাণনায় ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তি-মানুষই তাঁর মূল উদ্দিষ্ট। সে অনুষঙ্গি কাহিনিগদ্যও রচিত হয় তার ভাষ্যে। তবে কাহিনিতে বৈচিত্র্য নেই—অনেকাংশে ফ্ল্যাট। তবুও সম্ভাবনা অনেকাংশে প্রজ্বল। লেখকের *কবেজ লেঠেল* (১৯৯২) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়টি থাকলেও সেখানে অঙ্কিত হয়েছে শ্রেণিচেতনা, শোষণ, বঞ্চনার চিত্ররূপ। কবেজ উপন্যাসে দৃঢ় ও প্রতিরোধীরূপে নির্মিত। লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : *মামুলি ব্যাপার* (১৯৮৪), *আগামী দিনের গল্প* (১৯৮৭), *এসব কিছুই না* (১৯৯১), *এক রাত* (১৯৯১), *কোনো একদিন* (১৯৯১), *অচেনা জায়গা* (১৯৯১), *এ জীবন* (১৯৯১), *সীমাবদ্ধ* (১৯৯১), *অপরাজিতা* (১৯৯১), *ঠাট্টা* (২০১২), *বাসনা* (২০১৩)।

নাসরীন জাহান (জ. ১৯৬৪)
নাসরীন জাহান রচিত প্রথম উপন্যাস *উড়ুক্কু* (১৯৯৩)। এটি পাঠককে আকর্ষণের কারণ : নিরীক্ষাপ্রবণ ফর্মবিন্যাস। প্রচলিত কথনভঙ্গিতে নয়, প্লট-বিন্যাসে অধ্যায় বিভাজনের ব্যাপার নেই—উত্তপ্ত-উষর বাস্তবতাকে গদ্যের গাঁথুনিতে নির্মমতায় বেধেঁছেন; বিকিরিত উত্তাপ নীনা নামের মেয়েটির হয়ে-ওঠা পর্বকে স্তরান্যাস করে। কাহিনি-নির্বাচন প্রচলিত কিংবা প্রথাগত কিন্তু কাহিনিকারের দৃষ্টিভঙ্গি (point of view), উদ্দিষ্ট মেসেজ প্রখর দায়নিষ্ঠা থেকে উচ্চারিত। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র নীনা, সে সংগ্রাম করেছে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে, বিকৃত-বিনষ্ট ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে। পূর্ণায়ত বা স্বাভাবিক জীবনের প্রাপ্তি সে কামনা করে। ইচ্ছাকামি বা স্বচ্ছল জীবনের অনুবর্তী হতে চায় নীনা—এই চাওয়ার মাঝেই কাহিনি-কাঠামোতে চলে আসে শৈশব কৈশোরের-গল্প। নীনার এ গল্প শুধু নিজের গল্প নয়; অনেক প্রশ্নসঙ্কুল, উত্থান-পতনের রাস্তায় বাবা-মা, ভাই-বোন এবং তাদের সবার জীবনের কথা উঠে আসে। গঠিত হয় প্রত্যেকের সম্পৃক্ততা, তার কারণ, সম্পর্ক এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সংকট–নির্মাণ প্রসঙ্গ। নাসরীন জাহান সর্বজ্ঞ দৃষ্টি ব্যবহার করে নারীর মনস্তত্ত্বকে অর্থারোপ করেন। সে কারণে আধুনিক রূপরীতি যেমন—পরাবাস্তববাদী দৃষ্টি, অন্তর্বাস্তবতার চিত্ররূপ তৈরি হয়। *উড়ুক্কু* উপন্যাসটি নির্দিষ্ট সময়-জিজ্ঞাসায় চিত্রিত। সেজন্য দেশীয় অবক্ষয়িত রাজনীতির চিত্রপট, বুশ-সাদ্দাম যুদ্ধ, মার্কিনীদের কুয়েত দখল, ছাত্র হলে সন্ত্রাস, বখে যাওয়া যুবকের প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রবহমান সময়ের অংশ হিসেবে নির্ণীত। এখানে নাসরীন জাহান উড়ুক্কুর মধ্যে একটানা উত্তেজনায় কাহিনিকে কাঠামোতে আবদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। *সোনালী মুখোশ* (১৯৯৬) উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্তের নির্বিচার মিথ্যাচার করার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার সূত্রটি খুঁজেছেন। নিশি-জাহিদ-আফজাল-সাজিদুল-স্বাতীকে নিয়ে বহুমাত্রিক মনস্তত্ত্ব সূত্র উঠে আসে কাহিনিবিন্যাসে। নিশি-আফজালের দাম্পত্যজীবন বাধাগ্রস্ত নিশির অতীতের মধ্যে। যেখানে সাজিদুল অনেক বড় ও বহুব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বের টানাপড়েনে মিথ্যার সোনালী মুখোশে বাধা পড়ে সবাই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গ্রামকেন্দ্রিক একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের ভেতরে যে পিছুটান নস্ট্যালজিয়ার ভেতর দিয়ে শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয় সেখানে বক্তির বিনষ্টি বা ক্ষয়িষ্ণু রূপ নির্মিত হতে বাধ্য। *সোনালী মুখোশ* সে সত্যের প্রচ্ছদপটকে উন্মোচিত করে। এমন গদ্যগঠনে নাসরীন অনবদ্য তাঁর রচনায়। *উড়ে যায় নিশিপক্ষী* (১৯৯৯) তেও বলিষ্ঠ নারীর চিত্রই উঠে আসে। বেদে নারী চন্দ্রাণীর বর্ণনা : 'ফনফনে সাপের মতোন লতানো চন্দ্রাণীর প্রবণতার মূল জায়গাটাই অঘটনে ভরা।'—এরূপে চন্দ্রাণী পুরুষের পুরুষতন্ত্রের তাণ্ডবগুলোর প্রতিরোধ নজরে আসে। প্রান্তিক নারীর

অপরতা (otherness)ও এখানে পরিলক্ষিত। তবে প্রকরণে মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছুরণ, কাহিনিপ্রবাহে গতিময়তা, চিত্রল বর্ণনা দুর্বিনীতই বটে। 'রঞ্জুন যখন তার সামনে এসে বসে দেবযানী এমন ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তার চারপাশ থেকে পৃথিবী ছায়া হয়ে যায়...' পুঁজিবাদী বাজার কাঠামো প্রবাহিত মধ্যবিত্তের ক্ষয়, বিষণ্নতা নিষ্ঠুর সত্যে কর্কশরূপে চিহ্নিত হয়। তবে নাসরীন জাহান পুনরাবর্তন ঘটালেও এখনও তাঁর প্রকরণ পাঠকদের বিরূপ করে না, আগ্রহই সৃষ্টি করে। তাঁর উপন্যাস *চন্দ্রের প্রথম কলা* (১৯৯৪), *যখন চারপাশের রাস্তার বাতিগুলো নিভে আসছে* (১৯৯৫), *লি* (১৯৯৭), *বৈদেহী* (১৯৯৭), *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার*, *অন্যতমা অন্যদিকে যায়*, *আকাশে অনেক রাত* (২০০৪), *দূর পৃথিবীর গন্ধে* (২০০৪), সামান্তা (২০০৫), *মৃত্যুসখীগণ* (২০০৬), *ঈশ্বরের বামহাত* (২০০৭), *সেই সাপ জ্যান্ত* (২০১০) তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস।
কিশোর উপন্যাস : *পাগলাটে এক গাছবুড়ো*, *আজব ডানার মানুষ*, *রহস্যময় বাবা*, *দৈত্য আর সাহসী ছেলের গল্প*। *পাগলাটে এক গাছবুড়ো* নাসরীন জাহানের জনপ্রিয় কিশোর গল্প।

তিন.

আমজাদ হোসেন (জ. ১৯৪২)র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫)। *নিরক্ষর স্বর্গে* (১৯৭৮), *অস্থির পাখিরা* (১৯৮৩), *আগুন লাগা সন্ধ্যা* (১৯৮৮), *শেষ রজনী* (১৯৮৯), *মাধবীর মাধব* (১৯৮৯), *মাধবী সংবাদ* (১৯৯০), *মাধবী ও হিমানী* (১৯৯০), *মাধবী সমগ্র* (১৯৯০), *কেউ কোনদিন* (১৯৯০), *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৯১) প্রভৃতি উপন্যাসে আমজাদ হোসেন বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতাকে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। প্রেম-রোম্যান্স, বিরাগ-সন্তাপ, রাগ-অনুরাগ কাহিনিতে একটি চলচ্ছবি দান করলেও সময়খণ্ডকে স্পষ্ট করবার আদেশ আছে উপন্যাসে। স্বাধীনতা-উত্তর কালখণ্ডে উঠতি মধ্যবিত্ত, ভোগবাদ, বৈষম্য, কায়েমী স্বার্থবাদ পরিস্রুত হতে থাকে সমাজে। লেখকের উপন্যাসসমূহের ভাষাশৈলি সেভাবেই নির্বাচিত হয়। তবে আমজাদ হোসেনের কাহিনি সংহত নয়, প্লট-নির্মাণ একই রকমের, ভিন্নতা আনয়ন বা উত্তরণ প্রচেষ্টা অপসৃত। তবুও স্পর্শাতীত অনুভব মেলে *অবেলায় অসময়* উপন্যাসে। **রশীদ হায়দার** (জ. ১৯৪১)র *খাঁচায়* (১৯৭৫) উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের যুদ্ধের মধ্যে বসতির ফলে তার উৎকণ্ঠা, অপেক্ষা আর স্বস্তি খোঁজার জায়গার অনুসন্ধান চিত্র উপন্যাসটি। 'খাঁচা' থেকে মুক্তি কখন, কবে, কোথায়? অবরুদ্ধ পরিবারের উৎকণ্ঠা যা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশের চেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের মতো ব্যাপক বিষয় এখানে নেই। তবে

‘খাঁচা’র প্রতীকী রূপটি এখানে বোঝা সম্ভব। *অন্ধকথামালা* (১৯৮২)ও তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। বেলটুর মুক্তিযুদ্ধে যাত্রার কাহিনি নিয়ে এ উপন্যাস। তবে মুক্তিযুদ্ধ মূল বিষয় হলেও জনপদ, মানুষ, প্রেম, মৃত্যু, বিয়ে সবকিছু অনবদ্য হয়ে ওঠে উপন্যাসে। দেশমুক্তির আকাঙ্ক্ষাও এতে বর্ণিত হয়েছে। এ উপন্যাসে রশীদ হয়দার বেশ সাবলীল। তাঁর অন্য উপন্যাস : *অসম বৃক্ষ* (১৯৮২), *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* (১৯৮২), *সাধ আহ্লাদ* (১৯৮৫), *অসমবৃক্ষ* (১৯৮৭)। **আবদুল মান্নান সৈয়দ** (১৯৪৩-২০১০) প্রতীকী ভাববিন্যাস পরিলক্ষিত। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া অভিজ্ঞতায় অন্তর্মুখি চরিত্র তৈরি করেন। তাঁর গদ্য ভেতরের ছায়ারেখাকে স্পর্শ করে। সুখ-অসুখ, ব্যথা-বেদনা, হর্ষ-আনন্দ সমকালের বেদনা-ব্যাখ্যানে পরিস্রুত হলেও *পরিপ্রেক্ষিত দাসদাসী* (১৯৭৪), *পোড়ামাটির কাজ* (১৯৮২), *অ-তে অজগর* (১৯৮২), *হে সংসার হে লতা* (১৯৮২), *গভীর গভীরতর অসুখ* (১৯৮৩) এসব উপন্যাসে মানবচরিত্রের যেন একটা প্রতীকী পরিচর্যা চলে। গভীরতর অসুখের সংবাদ প্রকাশ করেন লেখক। অতঃপর জীবনের সমস্যাকে বাইরের সমাজমনে নিক্ষেপ করেন। এজন্য মান্নানের সংলাপ ঋজু, কাহিনি বর্ণনাই প্রধান প্রবণতা। গল্পময়তা কার্যকর কিন্তু সেখানে কায়েম হয় বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব জীবন। বাংলাদেশের উপন্যাসে এ রীতিটি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয়, হতে পারে অনেকের প্রভাবিত, অনুকরণযোগ্য। **বশীর আল হেলাল** (জ. ১৯৩৬) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন তাঁর রচনায়। *শেষ পানপাত্র* (১৯৮৬) উপন্যাসে কাহিনির গতি মাঝে মাঝে শ্লথ মনে হলেও নদীর এপার-ওপার জনপদের যে বার্তা উঠে এসেছে তা শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। বশীর আল হেলাল প্রবহমান সমাজ ও সময়কে চিহ্নিত করেন এক বিশেষ দৃষ্টি থেকে। পুঁজির প্রবাহে গ্রাম বদলে যায়—সঙ্গে সঙ্গে গ্রামজীবন ব্যবস্থায় রূপান্তর আসে; মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব আর একরকম থাকে না। সংখ্যালঘু নারী উমার জীবন, মিঠান্দি গ্রামের পরিবর্তনের কারণ, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতা, ভারত ভাগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং এ অনুষঙ্গি অনেক রকমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। *কালো ইলিশ* (১৯৭৯), *ঘৃতকুমারী* (১৯৮৪), *নূরজাহানদের মধুমাস* (১৯৮৮) প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। তাঁর কিশোর উপন্যাস : *শিশিরের দেশে অভিযান* (১৯৯০)। **রাহাত খান** (জ. ১৯৪০) স্বাধীনতার পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্র তৈরি হওয়া, তাদের উল্লম্ফন, অনৈতিক প্রসার রাহাত খানের উপন্যাসের বিষয় হয়ে আসে। *অমল ধবল চাকরি* (১৯৮২), *এক প্রিয়দর্শিনী* (১৯৮৩), *ছায়াদম্পতি* (১৯৮৪), *হে শূন্যতা* (১৯৮৪), *সংঘর্ষ* (১৯৮৪), *হে অনন্তের পাখি* (১৯৮৯), *মধ্যমাঠের খেলোয়াড়* (১৯৯১), *আকাঙ্ক্ষা*, *কয়েকজন*, *অগ্নিদাহ*, গন্তব্যে (২০০৫) এসব উপন্যাসের বিষয় প্রায় একই। *অমল ধবল চাকরি* উপন্যাসের মূল চরিত্র

রফিক, চাকরিচ্যুত হওয়ার সংবাদ দিয়ে উপন্যাস শুরু। এ তরুণের প্রবণতা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেরই প্রতিচ্ছবি, এরপর ফাওজিয়া, ফরহাদ, কেয়া তাদের উত্থান-পতন, অতীত-বর্তমান নিয়ে কাহিনির সম্প্রসারণ। একটা দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহকে উপন্যাসে তুলে আনেন ঔপন্যাসিক। এতে লেখকের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থাকলেও জঙ্গম জীবনাবেগ অনুপস্থিত। তবে নিস্তরঙ্গ জীবনের পুনরাবৃত্তির দীর্ঘ পরিচর্যায় তাঁর উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র গদ্যভাষা তৈরি করেছে, এটুকু বলা যায়। **হারুন হাবীব** (জ. ১৯৪৮) *প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম* (১৯৮২) লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর অন্য উপন্যাস *অন্তঃশীলা*, *পাঁচপুরুষ*। হারুন হাবীবের উপন্যাসশৈলি সংবেদনশীল। জীবনকে বিবৃত করতে যেয়ে রাজনীতিকে উন্মুক্ত করেন তিনি। মানবকেন্দ্রিক প্রত্যয়টি তাঁর সমকালীন বাস্তবতাকে অনুসরণ করে। **জুবাইদা গুলশান আরা** (জ. ১৯৪২) কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপন্যাস *অশ্রুনদীর ওপারে* (১৯৮৯), *বিষাদ নগরে যাত্রা* (১৯৯২), *ধলপহরের আলো* (১৯৮২), *দেওদানবের মালিকানা* (১৯৮৫), *প্রমিথিউসের আগুন* (১৯৮৭), *ছোঁবুড়ির দৌড়*, *ঘৃণার জঠরে জন্ম* (১৯৮৮), *ঊষারাগ* (১৯৯০), *ঘাসের উপরে মুখ রেখে* (১৯৯১), *অবিনাশী জলধারা* (১৯৯১), *দুঃখের হাত ধর* (১৯৯১)। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিচিত্র বিষয়ে ও প্রবণতায় উপন্যাস লিখেছেন জুবাইদা গুলশান আরা। নিজস্ব ভাষারীতিতে স্বকাল ও সময়খণ্ডের মিথস্ক্রিয়ায় রচনা করেছেন উল্লিখিত উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য প্রগতিবাদে পরিস্রুত। কবি **শামসুর রাহমান** (১৯২৯-২০০৬)র উপন্যাসে অন্তর্জগতের সংবাদ আছে। *অক্টোপাস* (১৯৮৩) বিপন্ন চরিত্রের উদ্ভাসন। নায়ক ইশতিয়াক-এর আত্ম-উন্মোচন। সাংসারিক দুর্দশা, টানাপড়েন, বেকারত্ব তাকে বিপন্ন করে রাখে; স্ত্রী ইয়াসমিনের স্বপ্ন, মাতৃত্ব কিছুই তো সফল হওয়ার নয়। সমস্ত স্বপ্নকেই যেন গ্রাস করে 'অক্টোপাস'। শুধু ইশতিয়াক নয়, স্বপ্নের শহরকেও সে জড়িয়ে ধরেছে। লেখকের নিজের প্রতিকৃতিরই স্বরূপ উপন্যাসটি। কবিচিত্তের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির একক শর্তসমূহ। অপরদিকে *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫) নাদিম-নাম্নী শামসুর রাহমান বহির্মুখি সমূহ-সঙ্কটের অংশীদার। মুক্তিযুদ্ধের পটে পালিয়ে বেড়ানো, শাকিলার কাছে প্রেম প্রত্যাখাত নাদিম, বিবেকের সমর্থনহীন সাংবাদিকতা, বাবার স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ে চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস *অদ্ভুত আঁধার এক*। এটি শামসুর রাহমানের বিশদ আত্মজীবনী। কবিভাষায় লিখিত উপন্যাস। একক চরিত্রের ভেতরের আশ্বাসে বাণীবদ্ধ, বহুমাত্রিকতা পায়নি। এছাড়া তাঁর উপন্যাসগ্রন্থ *নিয়ত মন্তাজ* (১৯৮৫) ও *এলো সে অবেলায়* (১৯৯৪)। **আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন** (জ. ১৯৩৪)র *বাতাসীর প্রেমকথা* (১৯৮৪), *দুঃস্বপ্নের জলপায়রা* (১৯৮৪), *বাগদত্তা* (১৯৮৬), *টাকার গাছ* (১৯৮৬), *রেবার প্রেমকথা* (১৯৮৬), *ঝর্না ঝরেরে* (১৯৮৬),

ফুলবানু (১৯৮৭), *ফেরারী* (১৯৮৭), *যুগলবন্দী* (১৯৮৭), *এখানে নোঙ্গর* (১৯৮৮), *রংমহল* (১৯৮৯), *অসতী* (১৯৯০), *নীলাম্বরী* (১৯৯৩), *কেনিকারও মেন্ডিস* (১৯৯৪), *ঘাসফুল* (১৯৯৫), *কালো কফিন* (১৯৯৫), *মেধাবী মেয়ে* (১৯৯৬)—এমন অনেক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু আবর্তন একই, প্রত্যয়শুন্য, সমাজভিত অস্পষ্ট তাঁর লেখায়। প্রান্তস্পর্শী বার্তা পঠিত না হলে একই আবর্তের পুনর্পাঠে স্বীকৃতি মেলে না। বাজারী, বাস্তবশূন্য, মেকি, কল্পনাপ্রসূত; 'অনেক' উপন্যাসের একটি ভাষা রচিত হয়েছে। এটির যথাযথ ব্যবহার আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিনের উপন্যাসে প্রয়োজন মনে হয়। কথাসাহিত্যিক **অনামিকা হক লিলি** (জ. ১৯৪৮) মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিক দৃষ্টিচেতনায় উপন্যাস লিখেছেন। গল্পের ভেতরে চরিত্র-নির্মাণ প্রবণতায় স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনাকে রূপায়ণ করেন। তাঁর ভাষাভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায়, মধ্যবিত্তের অনাস্থা-হতাশা-স্বপ্নভঙ্গের সূত্রসমূহ পরিচিহ্নিত হয় যা উপন্যাসে আন্তঃসম্পর্কের পরিবেশটি অর্থারোপিত করে। প্রধানত মধ্যবিত্ত আবেগের সত্তাসন্ধান এখানে পরিস্রুত। তাঁর উপন্যাস *অনুখন* (১৯৮৫), *ছায়ার আচ্ছাদনে* (১৯৮৯), *অগ্নি ও জলের ভেতর* (১৯৯০) প্রভৃতি। **সুব্রত বড়ুয়া** (জ. ১৯৪৫)র উপন্যাস *গ্রহণের দিন* (১৯৮৬), *দিনগুলি হায় সোনার খাঁচায়* (১৯৮৭)। পরিশ্রমী, হার্দিক টান থেকেই তিনি উপন্যাস লেখেন। চমৎকার একটা গদ্যশৈলি অর্জন করেন সুব্রত বড়ুয়া। বিচিত্রস্পর্শী জীবনকেই তিনি বেছে নেন উপন্যাসে। এজন্য তাঁর গদ্যও বাস্তবানুগ। উপমিত, উপমায় তিনি প্রতিপার্শ্বমুখর। তবে সুব্রত বড়ুয়া একটু গতানুগতিক, অর্জিত শৈলিটিতে আছে পুনরাবর্তন। **আতা সরকার** (জ. ১৯৫২) লিখেছেন *তিতুর লেঠেল* (১৯৮৭), *আপন লড়াই* (১৯৮৮), *একদা অনঙ্গ বৌ* (১৯৯০), *চারদিক বৃষ্টি* (১৯৯০), *সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান* (২০০৩) এবং *বালিকা বিষয়ক পাপ* উপন্যাস। *সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান*-এ সোনাই খুব তাণ্ডবমুখরবাংলাদেশের সাহিত্যে গত শতাব্দীর আশি এবং নব্বুইয়ের দশকে উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ ঋদ্ধি ঘটেছে। বিশেষত আশি-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা অবক্ষয়-হতাশা-নৈরাশ্য-ক্লেদ-গ্লানি খুব বেড়েছে। ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ ও তৎপরতা-ব্যাকুল। আর এরূপ চরিত্রের জন্য লেখকের শৈলি কার্যকর দাপটে সিক্ত। খুব পরিপক্ব চিন্তনে, বিরূপ সময়দহনজ্বালা বুকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন উপন্যাসের পট। 'এমনি এক গোলযোগপূর্ণ দিনে ঢাকায় প্রথম পা ফেলেছিল সোনাই সরদার। তখনকার সোনাইয়ের সাথে এখনকার সোনাইকে কেউ আর মেলাতে পারবে না। গোলাম কাজীকে মনে পড়ছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠার রাস্তাটা তাকে দেখিয়েছে গোলাম কাজী। ধীরে ধীরে ঢাকাকে জয় করেছে সোনাই সরদার।' সোনাইয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, সমগ্র জীবনরূপ উপন্যাসে আছে।

গ্রামজীবন, বড়ো হওয়া, বাবা কাসু ডাকাত, তার অতর্কিত ও বীভৎস মৃত্যু, কুলসুম, জরিমন, জয়তুন, জালাল মণ্ডল—সব পেরিয়ে সোনাই চলে আসে ঢাকায়। ঢাকা স্বপ্নের শহর, বাঁচার শহর, জীবন ও জীবিকার শহর, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার শহর। কিন্তু কিছুই সরল নয়। এমনসব কাহিনি বিন্যাসে রচিত হয় আতা সরকারের উপন্যাস। আসলে উপন্যাস নয় গল্পেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর উপন্যাসের পরিকাঠামো ছোট কিন্তু বাস্তবতা অনুষঙ্গি আঙ্গিক প্রশংসনীয়। **মোহাম্মদ আবু তাহের** (জ. ১৯৫২)র উপন্যাস লেখায় মধ্যবিত্ত চরিত্র একালের একটি প্রথানুগ বিষয় হলেও আবু তাহের কাহিনির ভেতরের অন্ধিসন্ধিকে বাস্তবপ্রায় করে তোলেন। কারণ, উপন্যাস শুধু বাইরের প্রতিরূপ নয় ভেতরেরও বটে। তাঁর *ত্রিধারা* (২০০২)য় তিনটি উপন্যাস : *মানুষের মাটি* (১৯৯১), *অবগাহন* (১৯৯৩), *চন্দ্রালোকে শঙ্খচূড়* (১৯৯৫) বিরাজমান। *চন্দ্রালোকে শঙ্খচূড়* উপন্যাসে কাটাছেঁড়া চলেছে এখলাসউদ্দীন ঢালীর। এখলাসের বেড়ে ওঠা, তার সংগ্রামী জীবন; এরপর জীবনের হাটেবাটে অনেকের সান্নিধ্য—এমনটার ভেতর দিয়ে চরিত্রটির বেড়ে ওঠার রূপটি পরিলক্ষিত হয়। এরপর কাহিনিতে শোয়েব, তাবাস্সুম যুক্ত হয়। কিন্তু কাহিনি এখলাসউদ্দীনকেন্দ্রিক; একপর্যায়ে মনস্তত্ত্বের পাঠ ও নিরীক্ষাও তাকে ঘিরেই। ঔপন্যাসিকের ভাষা স্বচ্ছ, সংহত। কল্পনা-বাস্তবতা, বিপন্ন-নৈরাশ্যতা—এরূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রজটিলতা এ লেখক সম্পর্কে আমরা আশ্বস্তই হয়ে পড়ি। এছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাস : *মনুমিয়ার বাই ফোকাল* (১৯৯৩)। **তসলিমা নাসরিন** (জ. ১৯৬২) শক্তিশালী গদ্যকার, নারীবাদী লেখক। তাঁর *অপরপক্ষ* (১৯৯২), *শোধ* (১৯৯২), *ভ্রমর কইও গিয়া* (১৯৯৩), *লজ্জা* (১৯৯৩), *আমার মেয়েবেলা* (১৯৯৯), *উতল হাওয়া* (২০০২) উপন্যাসে নারীবাদ (feminism) প্রতিষ্ঠিত। আত্মজৈবনিক শিল্প, নান্দনিকতা নানবিধ মত ও প্রবণতায় বাঁধা। কখনো উদ্দেশ্যনির্ভর ও বিতর্কবাহি। কাহিনি আটকে পড়ে উদ্দেশ্যের চোরাবালিতে। শৈলি শক্তি হারায়। তবে তাঁর প্রগতিমনস্কতা প্রশংসনীয়, জীবনের মূল্যজ্ঞান ও মতকে মেলাতে চান সাহিত্যের সঙ্গে—এটি আপাত সম্ভবপর হলেও; শিল্পরূপে তা প্রতিষ্ঠা পায় না। সেজন্য তাঁর উপন্যাস অনেক সময় ভাষ্যে পরিণত হয়। তাঁর শিল্পসত্তাও হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তবুও বিশ্বাসের বৃত্তে তাঁর চেতনা অনাধুনিক নয়। **আল মাহমুদ** (জ. ১৯৩৬)র *উপমহাদেশ* (১৯৯৩) মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রিত করে লেখা উপন্যাস। সীমা ও নন্দিনীর মে মাসে নারায়ণপুর থেকে আগরতলা পলায়ন প্রচেষ্টা দিয়ে উপন্যাস শুরু। মুক্তিযোদ্ধা আনিসের নেতৃত্বে তা সম্পন্ন। এ প্রক্রিয়ায় হাদী মীর বড় ভূমিকা রাখে। হাদী মীরই উপন্যাসের চালিকাশক্তি। কথকও তিনি। এ নৌকার মুক্তিযোদ্ধা আনিস রাজাকারদের প্রতিরোধ করে। হাদী মীরের আগরতলায় আশ্রয়, নন্দিনী ও হাদীর

সম্পর্কসূত্র অনেক প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। এক পর্যায়ে এদের সঙ্গে চরমপন্থির সংযুক্তি। আন্ডারগ্রাউন্ড নাসরীনের সান্নিধ্য। দুর্বার অপারেশনে হাদী মীর। এ পথে যুক্ত হন কুদ্দুস, মোজাফ্ফর, লতিফ, ছদ্মবেশী রিক্সাওয়ালা আবদুল্লা মিয়া। মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামীলীগের না আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কসবাদীদের— সেখানে ভারত সরকারের ভূমিকা কিংবা আদর্শগত দ্বন্দ্বের রূপ উপন্যাসে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রত্যয়ে উপস্থাপিত। *কবি ও কোলাহল*, *আগুনের মেয়ে* (১৯৯৫), *কাবিলের বোন* (১৯৯৩), *ডাহুকী* (১৯৯২), *নিশিন্দা নারী* (১৯৯৫), *পুরুষ সুন্দর* তাঁর উপন্যাস। কবি **মুহম্মদ নূরুল হুদা** (জ. ১৯৪৯) অনুপম গদ্যকারও বটে। তাঁর উপন্যাস *জন্মজাতি* (১৯৯৪), *মৈনপাহাড়* (১৯৯৫)। দক্ষিণ অঞ্চলের জীবনবৃত্তান্ত, ঐতিহ্যিক প্রবাহ, বিবর্তিত সংগ্রামের সন্ধানসূত্র নূরুল হুদার উপন্যাসের বিষয়। এক ধরনের কাব্যিকতা, পরিহাস আছে লেখায়। প্রান্তিক মানুষের জীবনের সংস্কার-কুসংস্কার-ভয়ের প্রভাব, কর্মজীবিকা, সুখ-স্বচ্ছন্দ্য সবকিছুই নীরবে চলে। 'শীতকালে কাউয়ার ডিয়া ভরে যায় অতিথি পাখিতে। বিশেষত কাঁচিচুরা, ভাদি হাঁস, কাউয়া আর হাড়গিলায়। কোথা থেকে আসে এরা... ফুরিয়ে গেছে তরুলতা। পোকামাকড়। খড়কুটো। এইসময়ে আসে শিকারীরা।' *জন্মজাতি*র এমন সংবাদ গোটা উপন্যাস জুড়ে, কখনো মানুষের, কখনো শীতের পাখিদের। কাহিনি রমণীদাসের, সে কেন্দ্রে; জঙ্গমতা-নান্দনিকতা-বেঁচে থাকা তাকে ঘিরেই, এভাবে এ-সমাজে। *মৈনপাহাড়* প্রায় একই গোত্রের, লেখক বলেন, 'জন্মজাতির পটভূমি অবলম্বন করে এই উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে'। তবে *মৈনপাহাড়ে*র আঙ্গিকে তেমন পরিবর্তন নেই। বাংলাদেশের উপন্যাসে আঙ্গিক ভিন্নতায় নূরুল হুদা একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। পাঠ-অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সততায় তাঁর কাহিনি শিল্পমণ্ডিত ও সার্থক। **হুমায়ুন আজাদ** (১৯৪৭-২০০৪)র *সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে* (১৯৯৫), *মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ* (১৯৯৬), *যাদুকরের মৃত্যু* (১৯৯৬), *শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার* (১৯৯৭), *রাজনীতিবিদগণ* (১৯৯৮), *পাক সার জমিন সাদ বাদ* (২০০৪), *ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল* (১৯৯৪) সামরিক শাসনের কালে ব্যক্তিচরিত্র রাশেদের ক্ষয়, বিনস্টি আর দুঃসহ পীড়নের চিত্র *ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল* উপন্যাস। হুমায়ুন আজাদ উপন্যাসে মধ্যবিত্তকে তুলে আনলেও প্রথাবিরোধী ভাবনা, নারী স্বাধীনতা, যৌনতা, আমলা বা রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণিচরিত্রের কৃত্রিম বিকৃত মানসপট উন্মোচন ইত্যাদি তুলে আনেন। তবে সবকিছুর মূলে মানবতাবাদ; বৈষম্য-শোষণমুক্ত সমাজচিন্তারই প্রতিফলন ঘটান উপন্যাসে। তবে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি অধিকতর শোচ্চার। তেমটি ঘটাতে গিয়ে তাঁর শিল্প হয়ে পড়েছে বাধাপ্রাপ্ত, প্রশ্নবিদ্ধ। কাব্যময়, শুদ্ধ, ঝরঝরে,

হীরকদ্যুতি তাঁর গদ্য। শৈলিগুণ থাকলেও একই বিষয়ের আবর্তন ও পুনরাবৃত্তির কারণে বেশ কিছু উপন্যাস লিখলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন না। তাঁর কিশোর উপন্যাস *আব্বুকে মনে পড়ে* (১৯৮৯)। ইনু খন্দকার ও নওরীনের অসহিষ্ণু দাম্পত্য জীবনের বিকারগ্রস্ততা ও অসুস্থ পরিণতির সংবাদে রচিত হয়েছে **বুলবুল চৌধুরী** (জ. ১৯৪৭)র উপন্যাস *জলটুঙ্গী* (১৯৯৫) তে। পূর্ণাঙ্গ মধ্যবিত্তের রূপাবয়বে নির্মিত উপন্যাসে দাম্পত্য কলহ; প্রীতিহীন প্রণয়, অবিশ্বাস, আসক্তি পরস্পরের 'নিষেধাজ্ঞা'র রেখাচিত্রকে সমান্তরালে পরিচালিত করে। যেখানে ক্রমশ ব্যক্তির যাবতীয় হতাশা, বিরুদ্ধতা, ঈর্ষাকাতরতা জমাটবদ্ধ হয়। ফলে নগরের ক্লান্তি এনে দেয় কৃত্রিমতা, ভোগবাহুল্য। বুলবুল চৌধুরীর উপন্যাসের কাহিনি বৈচিত্র্য পায় না, কিংবা নায়ক ইনুর পাপ-স্খলিত মৃত্যু পাঠকের তেমন কোনো সহানুভূতি অর্জন করে না। নিছক শ্রেণিমর্যাদার অভিলাস-বিত্ত-ভোগবাদ গ্রাস করে ইনু খোন্দকারকে। দাম্পত্য জীবনে অসুখী; বিকৃত লালসায় আত্মসমর্পিত হয়ে নেশাগ্রস্ত, বেপরোয়া মনোভাব কাহিনিতে উৎকর্ষের মাত্রা তৈরি করে। প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তার অবক্ষয়ই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার ছবিটি তথা ব্যক্তির ভেতরের ভাঙ্গনের ক্ষতটি চিহ্নিত করেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কটি শ্রেণিমর্যাদাকেন্দ্রিক আর 'জলটুঙ্গি'র ক্রিয়াকর্ম ও পরিণতিও আমাদের সবারই জানা। কারণ বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক পর্ব-থেকেই নীতি-বিগর্হিত-বিকৃত-লালসানির্ভর নরনারী সম্পর্কের পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া কি আমরা তা জানি। এখানে বুলবুল চৌধুরী তেমন বাস্তবতাকে প্রায়োগিক বিবেচনায় বা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের সমাজচিত্রকে আবহে বর্ণনা করেছেন। সেখানেই এমন উপন্যাসের গুরুত্ব পরিলক্ষিত। আসলে 'জলটুঙ্গি' পুঁজিবাদী সমাজের চিহ্নিত 'ব্যক্তি'র সর্বস্ব রূপ এবং তারই প্রতীকচিত্র; সন্দেহ নেই। *কহ কামিনী* (১৯৯৫), *পাপপুণ্যি* (১৯৯৫), *ঘরবাড়ি* (১৯৯৬), *বল কি অনুভব* (১৯৯৬), *দম্পতি* (১৯৯৭) প্রভৃতি।

চার.

হরিশংকর জলদাস (জ. ১৯৫৫) সমুদ্র ও নদী সংগ্রামী জেলেদের জীবনালেখ্য লিখেছেন, কেন্দ্রে তাঁর জেলেজীবন। *জলপুত্র* (২০০৮) ও *কৈবর্তকথা* (২০০৯)র পর লিখেছেন *দহনকাল* (২০১০)। দহনকালের মুখ্য জেলের মুক্তি, আছে মুক্তিযুদ্ধও। হরিদাস, রাধানাথ, খু-উ বুইজ্যা, রাধেশ্যাম, চন্দ্রকলা, পরিমল, শিবশরণ, রসমোহন জেলেসমাজের এক একটি প্রতিনিধি। এরাই *দহনকালের* চরিত্র। *রামগোলাম* (২০১২) হরিজনদের জীবকাহিনি নিয়ে রচিত। হরিশংকর এখানে পুরাণকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিম্নবর্গের জীবনাচরণের সঙ্গে। লেখকের *আমি*

মৃণালিনী নই (২০১৪) রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনীর আত্মকথনে বর্ণিত উপন্যাসিকা। কসবি (২০১২) তাঁর অন্য উপন্যাস। হরিশংকর উপকূলীয় জীবন তুলে আনতে চাইলেই এখনও তিনি এ বিষয়ক অমর প্রতিনিধিত্বশীল লেখকরূপে কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হননি, অনেকটা 'ওভাররেটেড' লেখক বলেই মনে হয়। **আকিমুন রহমান** (জ. ১৯৫৯) পারভীন চরিত্রের ভেতর দিয়ে পুরুষতন্ত্রকে আঘাত করেছেন *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯) উপন্যাসে। পারভীনের বড় হওয়া, যৌনজীবন, বিবিধ প্রতিবন্ধকতায় একমাত্র এ চরিত্রের ভেতর দিয়েই উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়। নারীবাদী হিসেবে আকিমুন রহমান উপন্যাসে একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে কারণে অক্ষম পুরুষ সুলতান আলী কাহিনির যাবতীয় কার্যকারণে একটু আরোপিতই মনে হয়। *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭), *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিলো কয়েকটি ধূলিকণা* (২০০৪) উপন্যাসে নারীর শামীমা বা রুহীর জীবনের কথাই বিবৃত। তবে প্রথম দুটি উপন্যাসের নারীর শরীরবৃত্তিয় পুনরাবৃত্তি শেষ উপন্যাসে নেই। অনেকটা পরিপক্ব, উদ্যোগী লেখক। 'কাঁদতে কাঁদতে আম্মা রাগে হিসহিসাতে থাকে, নাকি আমিও বিছানায় পইড়া যাই এই তগো মনবাঞ্ছা? সারাদিন অজু নাই গোছল নাই একটু কাইত হওনের উপায় নাই...'—এখানে বিরক্তি-ক্রোধ আছে, তবে সেটা উপন্যাসের কাহিনিতে কন্যার স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। *পাশে শুধু ছায়া ছিলো* (২০০৫) তাঁর প্রকাশিত অন্য উপন্যাস। **শাহীন আখতার** (জ. ১৯৬১) আয়েশার জীবনসংগ্রাম; তার অস্তিত্ব, প্রণোদনা, প্রতিযোগিতা তুলে আনেন *পালাবার পথ নেই* (২০০০) উপন্যাসে। একটু ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে আয়েশা—কাহিনির উপান্তে থাকলেও সর্বত্রই তার দৃশ্যমান উপস্থিতি। *তালাশ* (২০০৪) উপন্যাসের গদ্যভঙ্গি আকর্ষণীয়। এতে মুক্তিযুদ্ধ মোটামুটি একটা অবয়বেই উঠে এসেছে। নতুন এ লেখক তাঁর গদ্যে হয়ে উঠেছেন সম্ভাবনাময়ী। **জাকির তালুকদার** (জ. ১৯৬৫) লিখেছেন *কুরসিনামা* (২০০২), *হাঁটতে থাকা মানুষের গান* (২০০৬), *বহিরাগত* (২০০৮), *মুসলমানমঙ্গল* (২০০৯), *পিতৃগণ* (২০১১), *কবি ও কামিনী* (২০১১), *ছায়াবাস্তব* (২০১৩)। শ্রমলব্ধ কাজ *মুসলমানমঙ্গল*। 'সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজ ও মননকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে প্রক্ষিপ্ত করে লিখিত হয়েছে *মুসলমানমঙ্গল*।' জাকির তালুদারের ভাষা গতিময়, ব্যক্তিত্বপ্রবণ। কাহিনিকথনও কালানুগ। **শাহাদুজ্জামান** (জ. ১৯৬০) *ঃ তে দুঃখ* (২০০৩) ও *ক্রাচের কর্নেল* (২০০৯) লিখেছেন। *ক্রাচের কর্নেল* বাংলাদেশের ইতিহাসের রক্তাক্ত ১৯৭৫র নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক কর্নেল তাহের (১৯৩৮-১৯৭৬) উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। ইতিহাসের তথ্য থাকলেও এটি উপন্যাস। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তাহের দর্শন ও অনুভবকে বিশেষ শৈলিতে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

কথাসাহিত্যিক **ইমতিয়ার শামীম** (জ. ১৯৬৫)র প্রথম উপন্যাস *ডানাকাটা হিমের ভেতর* (১৯৯৬) -এ মুখ থুবড়ে পড়া বাম আন্দোলনের চিত্ররূপ চিত্রিত। *আমরা হেঁটেছি যারা* (২০০০), *চরসংবেগ* (২০০১), *অন্ধ মেয়েচি জ্যোৎস্না দেখার পর* (২০০১), *মোল্লাপ্রজাতন্ত্রী পবনকুটির* (২০০৬), *তা হলে বৃষ্টিদিন তা হলে ১৪ জুলাই* (২০০৮), *আমাদের চিঠিযুগ কুউউ ঝিকঝিক* (২০১০)। ইমতিয়ার শামীম আবেগময় গদ্যে, শ্লেষ ও চাবুকে আশি-উত্তর সমাজ রাজনীতির চিত্র চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেন। কখনো প্রত্যন্ত গ্রামের এনজিও শোষণ, নারী নিগ্রহ কখনো জাতীয় রাজনীতির অবক্ষয় হতোদীর্ণ চেহারা তুলে ধরেন। সমাজকে ঘিরেই তাঁর আবেগ, চৌকস বর্ণনায় শিল্পকে সমাজ-অনুসৃত পাঠ করে তোলেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ছোটগল্প

বাঙালি মুসলমান গল্প লেখক বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় গল্প রচনা শুরু করেন চল্লিশের দশকে। তখনও প্রথাগত সংস্কার-আচার-মূল্যবোধকে তারা অতিক্রম করতে পারেনি। ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের আন্তঃদ্বন্দ্ব ক্রমশ বহুমাত্রিক; বিচিত্র হয়ে উঠেছে। শিল্পিআত্মার সঙ্গে সমাজনীতির দ্বন্দ্ব পরাভূত নয়। কিন্তু শামসুদ্দীন আবুল কালামের *শাহেরবানু*, আবুল ফজলের *মাটির পৃথিবী*, আবুল মনসুর আহমদের *আয়না*, মাহবুব-উল আলমের *মফিজন*, শাহেদ আলীর *জিবরাইলের ডানা*, আবু ইসহাকের *মহাপতঙ্গ* একটা সীমাবদ্ধতার ভেতরেই চল্লিশের গল্পভিত্তি নির্মাণ করতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বৈষম্য, দুর্নীতি গল্পসাহিত্যে উঠে আসতে থাকে। রাষ্ট্র, সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিরোধের মুখেই গল্পকাররা আধুনিক জীবনদৃষ্টি তৈরি করতে সক্ষম হয়। যদিও তা এলোমেলো। অভিজ্ঞতার হয় না বহুমুখি প্রকাশ। প্রায়শ কাহিনিবৃত্তে গঠিত হতে থাকে একই আবর্ত। জীবন ও শিল্প সমন্বিত বা সর্বোত সত্য হতে পারে না। তবুও গল্পবৃত্ত হয়ে ওঠে বিপুলভাবে আশাবাদী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের গল্পের বিষয়-নির্মাণে মনোযোগী করে তোলে। প্রধানত চলমান বাস্তবতার দৃশ্যমান ছবিই উঠে আসে তাঁদের পটচিত্রে। তবে এ গল্পভিত্তিতেই পঞ্চাশের সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, শওকত আলী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু রুশদ, রশীদ করীম প্রমুখ লেখক শুদ্ধ গল্পভাষা নির্মাণ করতে ব্রতী হন। বোধকরি পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষত তখন স্তিমিত আর শিল্পের জন্য কাঙ্ক্ষিত দূরত্বটিও ক্রমাগত রচিত হয়েছে। বায়ান্নর অভিজ্ঞতা আর রূপান্তরিত গ্রাম ও শহর ব্যক্তির মনোভঙ্গিতে যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ফেলেছে তার স্বরূপ অন্বেষণ জরুরি মনে করলেন এ গল্পকাররা। তাঁদের হাতে বিচিত্রভাবে নির্ণিত হতে থাকে বাস্তবতার চালচিত্র। গণজীবনের অধিকার, চাহিদা, নিপীড়ন, নির্যাতনের স্বরূপ ও সূত্রসমূহ পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের ভূমি-সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্গ; তাদের হীনম্মন্যতার সংস্কৃতি ব্যঞ্জিত হতে থাকে। গল্পভাষার ভেতরে নিরঙ্কুশ অধিকারের ব্যক্তিকে

নির্ণয়ের চেষ্টা চলে। কিন্তু শুধু বাস্তবভিত্তিক জীবনই তো গল্প নয়। যখন বাস্তবপ্রসূত কল্পনার রঙ জীবনের সামগ্রিক অর্থকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলে তখনই শিল্পআত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্য মূল্যবোধের বলয়ে নির্মিত দৃষ্টিচেতনা (point of view) চরিত্রের সম্ভাব্য স্বরূপকে জিজ্ঞাস্য করে তোলে। তখন সমকালীনতাকে ছাড়িয়ে যায় সবকিছু। সার্বজনীন রূপটি পরিগ্রহ করে গল্পশরীরে। যা হয়ে ওঠে চিরায়ত দৃষ্টিসম্পন্ন। তবে শুধু নিম্নবর্গই নয়; মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা, শ্রেণি-প্রবৃত্তি, স্ববিরোধীতা, স্বার্থান্বেষী আচরণ, আত্মত্যাগী মনোবৃত্তি, পরিশোধিত জীবনবিশ্বাস এন্তার বিবিধ বিষয়ও বাংলাদেশের ছোটগল্পে অন্তর্ভুক্তি পেয়ে যায়। বিশেষ করে বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, অর্থনৈতিক মুক্তির ভেতরে তৈরি হওয়া মধ্যবিত্ত ব্যক্তির স্বরূপ—তার আবেগ-অনুভূতি-রোম্যান্টিকতা-জাতীয়তাবোধ-ঐক্যচেতনা একটা স্বায়ত্তশাসিত জীবনের পরিবৃত্ত রচনা করে। যেটা অনেক লেখকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যবিত্ত বিস্তৃত নবতর জীবনবীক্ষা থেকে নতুন একটি গল্পভাষাও আয়ত্ত করে ফেলে। এ পর্যায়ে কেউ কেউ ইতিহাসভিত্তিক, কেউ রাজনৈতিক, কেউবা গ্রামভিত্তিক বিষয় অবলম্বি গল্প লেখেন। সদ্য গড়ে ওঠা নগর, সেখানকার সাংস্কৃতিক ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা চরিত্রের কাঠামোতে যুক্ত হতে থাকে। বিভাগোত্তর সময়ে বাঙালি মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ সাহিত্যভূমিতে বিরাজমান থাকলেও মানবতার স্বপক্ষের আবেগ কিংবা চিরায়ত জীবনচেতনা অনিবার্যভাবেই পরিপূরক রূপ লাভ করে। ফলে বিভাগোত্তর সময়ের ইসলামী রাষ্ট্রের অনুসারী বা চেতনালব্ধ লেখককুল অচিরেই পাঠকগণের নিকট অপসৃত ও অবহেলিত হয়ে পড়েন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যাভিসারী পূর্ব-বাংলা গ্রাম ও শহরের অসাম্প্রদায়িক এবং লোকায়ত ঐতিহ্যের ধারাটি যাবতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেয়। এবং সে বিষয়-আশয় নিয়েই রচিত হয় পূর্ব-বাংলার গল্প-ভূমি। পঞ্চাশের গল্পকাররাই অনেকাংশে ষাটের দশকজুড়ে বাংলাদেশের গল্পের বীজ বপন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখনীয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। যাঁর গল্পে যুক্ত হয়েছে নতুন দার্শনিক চেতনাদর্শ। জীবনের মর্মমূলকে আধুনিক ফর্মে উন্মুক্ত করেছেন তিনি। গভীর মমতায় মাটিমূল-অনুবর্তী মানুষের অস্তিত্বের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তাঁর গদ্যভঙ্গিতে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক টেকনিক। তবে কোনোকিছুই সর্বস্ব করে তোলেননি, সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তায় তা হয়ে উঠেছে জীবনঘনিষ্ঠ। আবদুল মান্নান সৈয়দ, জহির রায়হান, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ গল্পকার ষাটের গল্পসাহিত্যে যুক্ত করেছেন নতুন টেকনিক। বায়ান্নর চেতনা, স্বৈরশাসন, সামাজিক রূপান্তর ব্যক্তির জীবনে যা কিছু যুক্ত করে তার ভেতরে যুক্ত হয়

আন্তর্জাতিক ফর্মবিন্যাস। সুররিয়ালিজম, রিয়ালিজম, অস্তিত্ববাদ এসব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টি হয় ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র।

বাংলাদেশের গল্প ও গল্পকার (১৯৪৭-১৯৭০)

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)

সাহিত্যিক, সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও বিদ্রূপাত্মক গল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। এ প্রক্রিয়ায় নির্মিত গল্পভাষায় তাঁর কৃতিত্ব অনবদ্য। *আয়না* (১৯৩৫)র অনেক গল্পে তাঁর সাহিত্যকীর্তি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থের "হুযুর কেবলা", "গো-দেওতা-কা দেশ", "নায়েবে নবী", "লীডারে কওম ", "মুজাহেদিন", "বিদ্রোহী সংঘ", "ধর্মরাজ্য" এসব গল্পে বাঙালি মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ভণ্ডামী, প্রতারণা, কুসংস্কার শেষাত্মক রূপশৈলিতে নির্মিত। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এ প্রবণতার গল্পে আবুল মনসুর আহমদ কালজয়ী। কারণ, আমাদের সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে প্রতীভূ বনে যাওয়া বা রাজনীতি করা; স্বার্থান্বেষী মানুষের ভেতর ও বাইরের আচরণের পার্থক্য বা দ্বৈতরূপ, সমাজের তোষণনীতি, কুৎসা রটনা, ইসলামের নামে আধুনিক শিক্ষার বিরোধীতা আজকালও বিরাজমান। তাঁর গল্পের চরিত্র এবং আবহ যেন সমকালের বাস্তব রূপ। যুগচিহ্নিত এ সমস্যাকে তিনি দেখেছেন একেবারে দিব্যচেতনায়। শিল্পীর দক্ষতায় তাঁর কাহিনিরেখায় সমাজশুদ্ধির বার্তা যেন নিপুণ এবং প্রাণস্পর্শী। এ জায়গায় 'সমাজের জন্য শিল্প'—এমন সত্যটি যেন তার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমাণ পেয়ে যায়। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৪), *আসমানী পর্দা* (১৯৬৪)।

শিশু সাহিত্য : ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), *গালিভারের সফরনামা* (১৯৫৯)।

আবু রুশ্‌দ (১৯১৯-২০১০)

আবু রুশ্‌দ 'রাজধানীতে ঝড়' লিখে সাড়া ফেলে দেন; বাঙালি মুসলিম গল্পকার হিসেবে নগর-মনস্কতার নিবিড় পর্যবেক্ষণ, গভীরে অন্বেষণ, সর্বোচ্চ অনুভবের মাত্রায় শিল্পিত কাঠামো তৈরি—ঐ চল্লিশে, প্রথম আধুনিক-আবর্তটি স্পর্শ করা সেটি অভিনব নয় তো কী? কখনও গ্রামীণ পটচিত্র আঁকেননি আবু রুশ্‌দ। নগরেই স্থিত, আগ্রহ মধ্যবিত্তকে কাঁটাছেঁড়ায়, ভেতরের বিমূঢ় বিস্ময়কে নিরঙ্কুশ প্রকাশে, কারণে-জিজ্ঞাসায় অকৃত্রিমতাকে উন্মোচনে বাংলাদেশের গল্পে প্রথম সমুপস্থিত আবু রুশ্‌দ। একটু ঝুঁকি থাকে নগরের পতিতা থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত প্রবেশে, কিন্তু জীবনের নেশা শিল্পে তো পরাস্ত নয়। সেজন্য মানব মনের অন্ধিসন্ধিতে পৌঁছান গল্পকার। চিহ্নিত হয়ে যায় তাঁর স্বপ্ন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে; একে একে। গল্পের

চরিত্রকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষণ করেন আবু রুশ্‌দ। মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক সত্তা এবং সমাজ-মনস্কতা; কার্যকারণ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে কাহিনিতে বুনতে থাকেন। এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব, অন্তঃসারশূন্যতা, সংশয়, সন্দেহ, গ্লানি, শাঘা সবই বিস্তৃত হয় গল্প-আবহে। তাঁর আঙ্গিক শক্তিশালী, ঋজু, সংহত; ভাষাভঙ্গি তীক্ষ্ণ এবং নাটকীয়তা জড়িত। এমন প্রস্তাবনায় আবু রুশ্‌দের গল্পগ্রন্থ *রাজধানীতে ঝড়* (১৯৩৮), *প্রথম যৌবন* (১৯৪৮), *শাড়ী বাড়ী গাড়ী* (১৯৬১), *মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার* (১৯৮৫), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৯), *দিন অমলিন* (১৯৮৫), *বিয়োগ ব্যথা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯০), *গল্পসমগ্র* (২০০০)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলাদেশের ক্রম-আধুনিক গল্পের গুরুস্থানীয়, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, ঘনিষ্ঠ জীবনবোধ তাঁর গল্পের আঙ্গিককে তৈরি করে। মানবীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি গভীর ব্যঞ্জনা এনে দেয় 'কেরায়া', 'স্তন', 'তুলসী গাছের আত্মকাহিনী'-এমনসব গল্পে। গল্পের পরিণতি দূরায়ত আমেজ আনে, দান করে দার্শনিক-বীক্ষা। তাঁর গল্পের শক্তি ঐতিহ্য-সমাজ-মাটি-মূল অনুষঙ্গি ভাষায়। ঔপনিবেশক শাসন পরবর্তী রাষ্ট্র কাঠামোতে শোষক-শক্তির আধিপত্যের চেতনার ভেতরে ব্যক্তিমানুষের ক্ষয়, বিনাশ, বিচ্ছিন্নতার স্বরূপটি নির্মাণ করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌। এজন্য তাঁর গল্পে নিম্ন-মধ্যবিত্তের অন্তর্মুখী জীবন বৈশিষ্ট্য ও তার মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বিবরণটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটির চরিত্র-মনস্তত্ত্ব নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দক্ষতা লক্ষণীয়। জীবনের সূক্ষ্মতর দিকগুলো শক্তিশালী গদ্যে তাঁর গল্পে বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যরীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। চেতনার প্রবাহরীতি (stream of consciosness) কিংবা অস্তিত্ববাদী (existentialism) দর্শন তাঁর গল্পের পটে ভূমিকা রাখলেও প্রাচ্যরীতির প্রয়োগ ও স্ফূর্তি অনবদ্য। বাইরের কোনো তত্ত্ব বা দর্শন অহেতুক আরোপ করার তৎপরতা তাঁর গল্পে নেই। দর্শনকে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে সূক্ষ্মতর সান্নিধ্য যেমন প্রেম-রোমান্স-রোম্যান্টিকতা ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে উঠে আসে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অনবদ্য। ভাষাই তাঁর চরিত্রকে তৈরি করে; চরিত্রের অন্তর্জগতের নির্মিতি দেয়। গল্পে উপস্থিত থাকে প্রচ্ছন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কটাক্ষ আর ব্যক্তির প্রথাগত সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত। এক্ষেত্রে ভাষা ও প্রকরণ উভয়ের মেলবন্ধনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষাও আধুনিক। তাঁর *নয়নচারা* (১৯৪৫) গল্পগ্রন্থে 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'পরাজয়', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়', 'সেই পৃথিবী' সংকলিত। অপর গল্পগ্রন্থ *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫)-এ আছে 'দুই তীর', 'একটি তুলসী

গাছের কাহিনী’, ‘পাগড়ী’, ‘কেরায়া’, ‘নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা’, ‘গ্রীষ্মের ছুটিতে’, ‘মালেকা’, ‘স্তন’, ‘মতিনউদ্দিনের প্রেম’ গল্প।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)
দেশীয় চেতনায় ত্যাগী ও দায়বদ্ধ কথাকার শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। বিভাগ-পূর্ব সময়ে তাঁর বিখ্যাত গল্প *শাহেরবানু* (১৯৪৫) যেখানে বিত্তহীন মানুষকে তুলে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম লেখকদের প্রারম্ভিক পর্বটি শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আঙ্গিকে বিরাজমান। লেখকের বিষয়ে দরিদ্র জীবনাগ্রহ এবং তাদের সংগ্রামই প্রাধান্য। বর্ণনার চিত্রে মেলে নদীবিধৌত বাংলার চিরায়ত প্রকৃতি। অনুপম প্রকৃতির সঙ্গে যেন মিলে আছে দুর্বহ ও সংগ্রামী মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম। লেখকের *পথ জানা নেই* (১৯৪৮) গ্রন্থের গল্পে দক্ষিণ বাংলার মানুষের সরল জীবনচিত্র অঙ্কিত। একদিকে মানুষ ও প্রকৃতির সমভিব্যহার অন্যদিকে তার বৈরিরূপ বস্তুনিষ্ঠ বিধৃত। তবে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের লেখায় শেষাবধি জীবনই জয়ী হয়। *অনেক দিনের আশা* (১৯৪৯), *ঢেউ* (১৯৫৩), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৫৩) তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)
বিভাগোত্তর বাংলাদেশে, একেবারে গোড়ার লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ। সমাজ সচেতন দৃষ্টি বিরাজমান থাকলেও সন্ধান করেছেন বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় মনোজগৎ। এক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়েছেন—সেখানে ক্রম-উত্তরণ ঘটেছে তাঁর গল্পের প্রকরণের। পাল্টেছে ভাষারীতি; যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক মাত্রা। তবে প্রথম প্রবণতার গল্পেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা বেশি। আলাউদ্দিন আল আজাদেরর প্রথম মুদ্রিত রচনা ‘নিমন্ত্রণ’ ১৯৪৩ সালে, যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সাহিত্যিক রচনা ‘আবেগ’ ১৯৪৬ সালে এবং প্রথম গল্প ‘জানোয়ার’ মাঘ ১৩৫৩ মাসিক সওগাতে প্রকাশিত। গল্পভুবনের প্রদর্শকের ভূমিকা হোক কিংবা শিল্পগুণের অনিবার্যতাই হোক আলাউদ্দিন আল আজাদ যে ভাষারীতি প্রথম কয়েকটি গল্পে যেভাবে কায়েম করেছেন—তা আর মুছে যায়নি। এখনকার অনেক গল্পেও গল্পকার একই কৌশলে পুণ্যাত্মা। “ধানকন্যা”য় নিছক মধ্যবিত্ত আবেগের গল্প হলেও প্রেমাত্মার শিহরণ, দায়বদ্ধতা, বিবেকদহন ধানকন্যার দোঁহে বিরাজমান। প্রথাবদ্ধতা একটা পর্যায়ে থাকলেও শিল্পশক্তিটা চেনা যায় ভাষার কারুকার্যে। গোষ্ঠীগত শব্দ, শ্রেণিগত চেতনা ও আচার, ধর্মানুষঙ্গ, প্রেম প্রভৃতি বিষয় সমাজ ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে চালিত। এর ভেতরেই গল্পশৈলিতে বাধা পড়ে যাবতীয় বাঞ্ছনা। তবে তাঁর এ

শিল্পভাষানির্মাণ আমাদের সমাজ ও সময়কে করে তোলে বিশেষ অনিবার্যতায় আচ্ছন্ন। '—তুই খালি রক্ত বার করছিলে, খুন করতে পারস নাই। একটা মান্‌সেরে খুন করা কি খুবই শক্ত।' ধানকন্যার মতো অন্যান্য গল্পেও এমন প্রণোদনা জড়িত। *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভি* (১৯৫৩), *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৮), *উজান তরঙ্গে* (১৯৬২), *যখন সৈকত* (১৯৬৭), *আমার রক্ত স্বপ্ন আমার* (১৯৭২), *জীবন জমিন* (১৯৮৮), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫), *মনোনীত গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প* (১৯৯৯) এসব গল্পের বিচিত্র শ্রমী মানুষ সমাজ-পরিসরকে বুঝতে যেমন সহায়তা করে তেমনি হয়ে ওঠে রিপুর নিন্দা-প্রশংসার কীর্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তবুও বলতে হয় দীর্ঘ জীবনে আলাউদ্দিন আল আজাদ আদ্যন্ত সাহিত্যে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে খুব বেশি ভালো গল্প লেখেননি। তবে প্রধানত গ্রামীণ পটের অনেক গল্পেই তিনি বিরাজমান। সে অনুষঙ্গি আঞ্চলিক ভাষাও তাঁর গল্পে দ্রুততা পায়।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

সাহিত্যের নানা অঙ্গনে শওকত ওসমানের সরব উপস্থিতি বিরাজমান। গল্পের চরিত্রের নানামুখি নিরীক্ষা আছে; আর্থ-সামাজিক পটে বর্ণিত কাহিনিতে ধর্মীয় ভণ্ডামী, গোঁড়ামী, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা বিদ্রূপাত্মক স্বরে চিহ্নিত। বাঙালি মুসলিম পরিবার জীবনাগ্রহ; সেখানকার টানাপোড়েনের সংস্কৃতি গল্পের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫) এবং *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগত পরিচর্যা এসব গল্পে যেমন আছে তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণও বর্ণিত। মুক্তিযুদ্ধকে জাতির সামগ্রিক মুক্তির পথ বলেই মনে করেন লেখক। এক্ষেত্রে গল্প উপস্থাপনে প্রতীক ও রূপকের কৌশল, সমাজভিত্তিক বর্ণনার মুন্সিয়ানা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে অনেক গল্প লিখে তিনি দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শওকত ওসমানের গল্পগ্রন্থ : *উপলক্ষ্য* (১৯৬৮), *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১), *নেত্রপথ* (১৯৬৮), *পিঁজরাপোল* (১৯৫১), *প্রস্তরফলক* (১৯৬৪), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩), *এবং তিন মির্জা* (১৯৮৬), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৪), *মনিব ও তাহার কুকুর* (১৯৮৬), *বিগত কালের গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৭৪), *পুরাতন খঞ্জর* (১৯৮৭), *হন্তারক* (১৯৯১), *রাজপুরুষ* (১৯৯৪) প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)

বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক দক্ষ ও স্থিতধী গল্পকার। তাঁর রয়েছে কয়েক দশকের গল্পচর্চার প্রবাদপ্রতীম অভিজ্ঞতা। রচনায় তিনি নির্মাণ করেছেন

বিচিত্র বিষয়। পারিবারিক, আঞ্চলিক গল্প; আছে নাগরিক জীবনসম্ভূত গল্প, আছে প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতর গল্প। কবিভাষা তাঁর গল্পে কখনও পরিসর তৈরি করলেও প্রকরণে তা আঘাতপ্রাপ্ত বা আরোপিত হয় না। সৈয়দ হক সেরূপেই সব্যসাচী হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পান। গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান পরিবেষ্টিত মায়ের শাশ্বত মূর্তি চিহ্নিত "তাস" গল্পে। একাধিক ভাষায় অনূদিত এ গল্পগ্রন্থের বৈচিত্র্যময় কাহিনি নানা ঘটনার প্রক্ষেপণে আধুনিক মাত্রা লাভ করে—বিশেষ করে বিধবা মার স্মৃতিকাতরতা, যন্ত্রণা, অন্তর্দাহন এবং সন্তানদের স্নেহ-মমতা প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে তা প্রতীকী বার্তায় পর্যবসিত। যেখানে সবকিছুর সঙ্গে 'তাস' বাড়তি মাত্রা যোগ করে। "আনন্দের মৃত্যু" সৈয়দ হকের আরেকটি অনবদ্য গল্প। চমৎকার দৃশ্যপরিকল্পনে তিনি মূলত উঠতি নাগরিক মধ্যবিত্তের অসার, ভুঁইফোঁড় জীবনকে তুলে ধরেন এ গল্পে। প্রেম ও মনোবিকলনধর্মী গল্পেও সৈয়দ হক বেশ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এছাড়া গ্রামীণ জীবনপট কিংবা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেও গল্প লিখেছেন তিনি। সমাজের শোষণ-কুসংস্কার-সংস্কার-ধর্মীয় বিশ্বাস-কিংবদন্তী নিয়ে গল্পকারের নিরীক্ষাধর্মী গল্প *জলেশ্বরীর গল্পগুলো* (১৯৯০)। এতে প্রধানত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামকেন্দ্রিক শ্রেণিচরিত্রের শোষণ-নির্যাতনের চালচিত্রটিই রচিত। গল্পপরিচর্যার দীর্ঘায়ত পথপরিক্রমায় সৈয়দ শামসুল হক এগিয়েছেন, তাগিদে এসেছে নিরপেক্ষ-নিশ্চয়তা আর একই সঙ্গে আঙ্গিকেও এসেছে প্রভূত পরিবর্তন। প্রতীক নির্মাণ, গদ্যভঙ্গির ঋজুতা, বাস্তবানুগ সময় সন্ধিৎসা, ইমেজে বর্ণিল আবেগের বিচ্ছুরণ—গল্পকে প্রখর জীবনবাদী করে তোলে। অদ্যাবধি তিনি এ পথে দ্যুতিময় এবং দূরগামী। সৈয়দ হকের গল্পগ্রন্থ : *তাস* (১৯৫৪), *শীতবিকেল* (১৯৫৯), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭), *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান* (১৯৮১), এক সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক (গল্প সংকলন) (১৯৮৬), *প্রেমের গল্প* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯০), *গল্প সমগ্র* (২০০১) প্রভৃতি।

শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১)
তাঁর গল্প সংকলন *এক টুকরো মেঘ* (১৯৫৫)। এতে সন্নিবদ্ধ আছে "এক টুকরো মেঘ", "প্রাণের চেয়ে প্রিয়", "জসুভাবীর জন্য", "দেয়াল", "যে গল্প কেউ বলেনি", "যৌবন", "চালচুলো", "ছেলেটা", "শেষ সংবাদ", "বিষকন্যা" গল্প। ছোটদের জন্য লিখিত গল্প সংকলন *ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান* (১৯৫৮)। সাবের প্রগতিশীল ও বুদ্ধিমনস্ক লেখক-সাংবাদিক। তাঁর গল্পে মূলত পঞ্চাশের ছোটগল্পের ধারাটি বহমান। *এক টুকরো মেঘ*-এর মধ্যে পলায়নপর, দুঃখ-অভাবতাড়িত, নৈরাশ্যমুখর চরিত্রের ছবি এঁকেছেন। বস্তুত মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্নভঙ্গ, নির্লিপ্ততা

তাঁর গল্পের বিষয়। সাবেরের চরিত্ররা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংক্ষুব্ধতাকে মোকাবেলা করে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষাভঙ্গিও প্রচণ্ডরূপে বাস্তবানুগ।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

শক্তিশালী গল্পকার। সামন্ত-প্রভুত্ব ও সামজিক-ধর্মীয় কুসংস্কার চিত্রিত আবু ইসহাকের লেখায়। গল্পভাষায় তীক্ষ্ণধী আবহ তৈরি হয়; প্রথাগত ধর্মের ভণ্ডামী, পীরপ্রথা, কষ্টসহিষ্ণু শ্রমী মানুষের শোষণ নিষ্পেষণ দোর্দণ্ড মাত্রা পায়। 'কানাভুলা', 'ঘুপচি গলির সুখ', 'দাদীর 'নদীদর্শন', 'পণ্ডশ্রম', 'পিপাসা', 'প্রতিষেধক', 'বনমানুষ', 'বোম্বাই হাজী', 'শয়তারে ঝাড়ু', 'হারেম' গল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত *হারেম* (১৯৬২) গ্রন্থে। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক বলেন : 'এ সংকলনের জন্য নির্বাচিত লেখাগুলো ১৩৫২ থেকে ১৩৬৯ সালের মধ্যে রচিত।' আবু ইসহাকের শিল্প-নন্দনে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ আলোকিত হয়ে ওঠে জীবনবাদী চেতনাদর্শে। আঙ্গিক নির্মাণে ভিন্ন দৃষ্টির ধারক, ভূ-সংলগ্ন মানুষের অন্তর্চিত্র অনুষঙ্গকে যাবতীয় দ্বন্দ্বে পরিশুদ্ধ সম্ভাবনার দিকে নিতে চান : 'হারেমের ব্যাপার। বাইরে জানাজানি হলে বিপন্ন হবে মান-সম্ভ্রম। তাই আমীর নিজেই তদন্তে বেরিয়েছিলেন।' এভাবে গল্পের ক্ষেত্র উন্মোচন। মুসলিম সামন্ততন্ত্রের ভঙ্গুর চিত্র এবং অন্তঃসারশূন্য দীর্ঘশ্বাস শক্তিশালী ভাষায় পুনর্গঠিত :

> হারেমের সমস্ত হিজড়েগুলোকে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার—সিদ্ধান্ত নেন আমীর। কিন্তু কেমন করে তা দেখা সম্ভব? ডাক্তার বা বাইরের কোন লোককেই এ কাজের ভার দেয়া যায় না। বাইরের জানাজানির ভয় আছে, মান-ইজ্জতের প্রশ্ন আছে। না, মৃত্যুদণ্ডের আসামী সর্দার দিলবাহারকে দিয়ে হাসিল করতে হবে এ কাজ। এটাই হবে উত্তম ব্যবস্থা। হারেমের ঘটনার প্রধান সাক্ষী দিলবাহার। তার জান কবরের সঙ্গে চাপা পড়ে যাবে এ কেলেঙ্কারী।

অনবদ্য সমাজচিহ্নিত গল্প। হরেমের পরিণতির তিলকটুকু খুব স্বল্প পরিসরে কিন্তু বিরাট তোরনে অভিব্যক্ত হয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এ গল্পটি অনন্য সংযোজন। তাঁর আরেকটি গল্পগ্রন্থ *মহাপতঙ্গ* (১৯৬৩)। এটিও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক গল্প। ভাষা ব্যবহারে প্রচুর আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দকে মুসলিম জীবনাচরণ সূত্রে সংগ্রোথিত করেন গল্পকার।

হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯)

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্পকার হাসান আজিজুল হক। তাঁর গল্পে রাঢ়বঙ্গ-প্রকৃতি চমৎকার রেখাচিত্রে পরিবেশিত। প্রথম গ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য*

(১৯৬৪)র ‘গুণীন’, ‘মন তার শঙ্খিনী’, ‘শকুন’, ‘তৃষ্ণা’ এসবে রুক্ষ্ম রাঢ় ও প্রতিরোধী প্রকৃতি প্রতিফলিত। লেখকের প্রকৃতির বর্ণনায় নিহিতার্থ জীবন বড় বঞ্চিত, দুর্বিষহ। গ্রামীণ পটে বিধৃত *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৬৭), *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৮৫)র গল্পগুলো। লেখকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৫), *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯), *রোদে যাবো* (১৯৯৫)। এছাড়া *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮১), *মা মেয়ের সংসারে* (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থের মধ্যেও নির্মম জীবনভাষ্য অঙ্কিত। হাসান আজিজুল হকের গল্প হওয়ার পথটি নির্মিত হয় বিপুল জীবনের মাহাত্ম্যে, কার্যকারণ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে। উঠে আসে যাবতীয় সংস্কার-কুসংস্কার-সংগ্রাম-প্রতিরোধের ছায়াচিত্র। তাঁর উপমা-নির্বাচন কর্কশ, মর্মচিহ্নিত, তীক্ষ্ণধী। বর্ণনায় সামূহিক বাস্তবতা শ্রেণিস্তর অবলম্বী হয়ে ওঠে। তাঁর সংলাপের দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয় শ্রেণিচেতনার মর্মে, রচিত পটরেখায় থাকে জীবনবাদী প্রণোদনা। অনুভূতির ছোঁয়ায় রাঢ় রক্তাম্বর অধ্যুষিত দিগন্তমেখলা সুন্দরের প্রতিমায় অঙ্কিত। মেধার সূচ্যগ্রে বন্দি ব্যক্তিচরিত্র। বঙ্গীয় সংস্কৃতির ভেতরের প্রাণভোমরাকে স্পর্শ করেন লেখক। সেখানে রাষ্ট্রের শোষণ ও শ্রেণিচরিত্রের ভূমিকা, প্রান্তিক মানুষের প্রথাগত বিশ্বাস-সংস্কারে আঘাত হানেন—সে পরিহাসপ্রিয়তায় বঞ্চিত মানুষের অস্তিত্বের উচ্চারণই বড় হয়ে ওঠে। প্রতীকায়ণে ব্যক্তির সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের স্বরূপটি নির্বাচিত হয়। সাহিত্যে দেশ-সমাজ-ব্যক্তির দায়কে এভাবেই তুলে ধরেন তিনি। সেখানে গল্পের আবহটি ঘন রঙয়ের, কথকের কথোপকথন প্রয়াসে চরিত্রানুগ বস্তুনিষ্ঠতায় কার্যকারণ প্রয়াসভিত্তি নির্মিত হয়। গল্পের নন্দনভূমে স্বপ্নাবিষ্ট, ধর্মভীরু আচ্ছন্ন মানুষের জীবনচরিত উন্মোচিত হয়। তখন ভাষার প্রকোপে বিদ্ধ হয় চরিত্র; তার প্রতিরোধ আর প্রতিকূলতায় উঠে আসে প্রবহমান সমাজ, জীবন লাভ করে অবমুক্তি। গল্পকারের গল্প তখন বিস্তৃতি পায় পাঠক পরিসীমায়। সেজন্য নিছক গল্প নয় বা গল্পরসে আপ্লুত করা নয়—গল্প বলার ভেতর দিয়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ও ব্যক্তির সংগ্রাম বা অবমুক্তির প্রক্ষেপণটি তুলে ধরেন। সেখানে হাসান আজিজুল হক আপসহীন। ভঙ্গিতেই গল্পের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিত করেন তিনি। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনবদ্য গল্পকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। তবে দীর্ঘায়ত গল্পচর্চায় তাঁর ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে। গল্পের ভেতর দিয়ে প্রতিরোধের প্রবর্তনাটি রচিত হয়েছে সমকালকে ঘিরে। সামাজিক দায়বোধে আধুনিক প্রবণতায় যাবতীয় গরল ও কূটৈষা ধারণ করে তাঁর গল্প। বাংলাদেশের গল্পধারায় তিনি এখনও সচল ও সক্রিয়। তাঁর *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৭), *রাঢ়বঙ্গের গল্প* (১৯৯১), *হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৫), *স্বনির্বাচিত গল্প* (২০১২) বেরিয়েছে।

জ্যেতিপ্রকাশ দত্ত (জ. ১৯৩৯)

দুর্বিনীত কাল (১৯৬৫), *বহে না সুবাতাস* (১৯৬৭), *সীতাংশু তোর সমস্ত কথা* (১৯৬৯), *পুনরুদ্ধার*, *প্লাবনভূমি*, *উড়িয়ে নিয়ে যা কালো মেঘ* (১৯৯২), *ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়*, *নির্বাচিত গল্প*, *গল্পকল্প ও বাঁচামরার জীবন* (২০০৫), *যে যায় সে যায়* (২০১২) এসব গল্পগ্রন্থে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত স্বতন্ত্র ও মনোমুগ্ধকর। এক ধরনের অন্তর্গত পরিশুদ্ধতা বিনীত সেখানে, কিন্তু নৈঃসঙ্গ্য বা হতাশা বিরল নয়। দীর্ঘ কালবৃত্তে অনেক সময় নিয়ে তাঁর গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে। এটিতে 'এখন দু'জন দিনমজুর এই দিন ফুরানোর ছায়ায় মাথার ঝুড়ি থেকে কালো মাটির রাশি ঐ পথে ফেলে যায়' কিংবা 'সন্ধ্যার পর চরাচর ভাসিয়ে দিয়ে শ্বেত জ্যোৎস্নার চাঁদ উঠেছিল আকাশে'। এভাবে ধ্বনিবন্ধ বানিয়ে এক ধরনের অন্তস্তল-সংবাদ কায়েম করতে চান তিনি। চিত্ররূপতা ঐ ষাটেও ছিল তাঁর রচনায়, আধুনিকতা অর্জনের পথ তাঁর অনেক আগের; সেজন্য এ সময়ে লেখা গল্পগ্রন্থটি প্রশংসনীয়, আকর্ষণীয়। তাঁর ভিন্নতা সংলাপহীনতায় কিংবা নাম না-ব্যবহারের দুর্বলতায়। তবুও স্নিগ্ধতা বা মাধুর্য তো কমে না; সেখানেই তাঁর বিরল সার্থকতা। আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার গভীরে মাটিঘেষা মানুষ আছে, গল্পভাষাতেও তৈরি করেন ঐ দ্বিধাকাতর সংশয়ী মানুষ। বিপন্ন, উন্মূল বাস্তবতায় লেখা "কল্পলোকে", "সুখবাস", "অচেনা" ইত্যাদি গল্প। বাংলাদেশের ছোটগল্পে তিনি শক্তিশালী গল্পকার হিসেবে পরিগণিত। প্রথম দিকের গল্পে আত্মকুণ্ডলায়িত, ক্ষয়িষ্ণু মানুষের চিত্রপট অত্যন্ত শিল্পিতরূপে উপস্থাপন করেছেন লেখক। আমাদের গল্পধারার প্রান্তিক মানুষের প্রতীকী নির্মাণের বিষয়টিকে ঐতিহ্যি মাত্রিকতা দান করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত।

সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭)

উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯), *জলবতী মেঘের বাতাস* (১৯৭৫), *খোল করতাল* (১৯৮২), *পরজন্ম* (১৯৮৬), *মানুষটি* (১৯৯৩), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৩), *মতিজানের মেয়েরা* (১৯৯৫), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০০০), *আকাশপরী* (২০১২) সেলিনা হোসেনের গল্পগ্রন্থ। "উৎস থেকে নিরন্তর" গল্পে ওজুফা অন্যের সন্তানের মা হতে বাধ্য হলেও মাতৃত্ব নষ্ট করে না। নারীর অধিকার মর্যাদার জন্য তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সমশক্তি অর্জন করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলনের "আমিনা ও মদিনার গল্পে" পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীধর্ষণের মর্মন্তুদ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কয়েক দশকের কথাকার হিসেবে সেলিনা হোসেনের গল্পে এরূপ বিষয়ই বিচিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। অনেক গল্প লিখেছেন তিনি কিন্তু গদ্য তাঁর সরলভাষ্য, বাস্তবতা নয় অনেকটা চালচিত্র রকমের। নারী অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ, গ্রাম-কিংবা শহরের মধ্যবিত্ত, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি, আর্থনীতিক ভাবনা চিন্তা তাঁর গল্পের বিষয়।

কিন্তু বাস্তবতা তাঁর গল্পে তেমন খোলে না। 'ইনার ওয়ার্ল্ড' তেমন আকর্ষণীয় ছায়া ফেলে না পাঠকের মনে। তবুও গল্পে স্বতন্ত্র একটা পরিসর পেয়ে যান তিনি। নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে তাঁর ভাষাটিও আয়ত্তে। নারী ইস্যুকে কেন্দ্র করে লেখা *মতিজানের মেয়েরা*। এটি দশটি গল্পের সংকলন। নামগল্পের মূল চরিত্র মতিজান। নারীর জৈবিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়শক্তি অর্জন করে তাঁর চরিত্ররা। "লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর" গল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনচেতা ও প্রকৃত মানুষ হওয়ার সংকল্পের কথা বিবৃত হয়েছে চরিত্রের লিপিকা ভেতর দিয়ে। "আকলির স্টেশনের জীবন", "মেয়েলোকটা", "পারুলের মা হওয়া", "হৃদয় ও শ্রমের সংসার" ইত্যাদি গল্পে নারীর অধিকার, আত্মবোধ ও আত্মচেতনা, লৈঙ্গিক শোষণ মুক্তি ভাষ্য শিল্পিত মাত্রা পেয়েছে। এ গ্রন্থটিতে লেখক নারীকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথাগত ইমেজকে করে তুলেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। সেক্ষেত্রে লেখক একটা মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও দৃষ্টিভঙ্গির নিরঙ্কুশ সততায় কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের মানবিক দিকগুলো উন্মোচন করতে সফল হয়েছেন, সন্দেহ নেই।

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০)

আনিস চৌধুরীর *গল্পসংগ্রহ* বেরিয়েছে ২০০৭ সালে। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রকাশের সাল ষাটের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে শুরু করে নানা সময়ে। মূলত গল্পেই তাঁর দস্তুর। গল্পের নিবিড়পাঠে সত্যাসত্য বিবেচনা; আধুনিকমনস্কতা, নৈর্ব্যক্তিক ও প্রাণস্পর্শী তুখোর প্রাণবত্তাপূর্ণ এক গল্পকারকে পাওয়া যায়। তিনি সাড়া দেন আলোড়নে, চিত্তস্পর্শী স্নিগ্ধ মায়াতে, অনেকটা দূরস্থিত অভিপ্রায়ের আকুলতায়। শুধু বিশ্লেষণেই শেষ হয়ে যান না। আনিস চৌধুরীর গল্পে ছোট্ট মুহূর্তগুলো সমষ্টিক হয়ে ওঠে। কখনো বৃহত্তর পরিবৃত্তও রচনা করে। জীবনের ব্যাপক অংশের সঙ্গে শামিল হয়ে পড়ে। আনিস চৌধুরী মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক রংগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ রূপ দেন সমাজ উপযোগিতার নিরিখে। যেখানে থাকে নিরেট বাস্তবতাও। নানা রকমের গল্প লিখেছেন আনিস চৌধুরী। 'লোক-হাসানি অঞ্চল' উচ্চারণে; "কেন শহর গড়া গেল না" ব্যঙ্গাত্মক কিন্তু উপাদেয় গল্প। গল্প বলিয়ে হিসেবে আনিস চৌধুরী গল্পের রীতিকে নিজের আয়ত্বের মধ্যেই রাখতে চান। তাঁর গল্পের নান্দনিক দিকটি মেলে—ব্যক্তি রুচি, দূরদৃষ্টির অভিব্যক্তিতে ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়াসে। বিভাগোত্তর বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয়টি খুব স্থির ও দৃঢ় আঙ্গিকে ফ্রেমে এঁটেছেন লেখক। এক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই একটু পুনরাবৃত্তি বা বৃত্তায়ন মনে হলেও প্রকৃত জায়গাটি যে স্পর্শ করতে পেরেছেন লেখক তাতে

সন্দেহ নেই। আনিস চৌধুরী বেছে নিয়েছেন একটি বিষয়ের অনেক সঞ্চারী পথ; প্রাচুর্যময় এবং বৈভবে প্রাণশক্তিপূর্ণ মধ্যবিত্তের অন্ধিসন্ধি। আনিস চৌধুরী বাস্তবতাকে কষাঘাতেই কর্কশ করে তোলেন। তবে তা মনস্তাপের সত্য হয়েই মৌল অস্তিত্বকেই সত্য করে তোলে। তাঁর গল্পবৈশিষ্ট্য : গল্পের প্রারম্ভিক পর্বের উপস্থাপন বৈশিষ্ট্য; যেখানে আছে গল্পের চৌম্বক-বিন্দু, নিছক কাহিনি বানানো নয়; ঘটনার উত্থানের উত্তাপ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হলেও মূলত ক্রুদ্ধ বাস্তবতাই তাকে গড়াতে ও পেটাতে থাকে—ফলে চরিত্রটি নির্মাণ হয় প্রাচুর্যের ভেতরেই, গল্পের মেসেজ থাকবে কিন্তু তা জীবন সমগ্রতার বাঁধনে বন্দি, সংলাপের ভেতরে কথকতার দ্যোতনা সৃষ্টি, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বা ইঙ্গিতময়তায় সংহত সৌন্দর্য অবয়বে গল্পের পরিসমাপ্তি, আবহ নির্মাণে আধুনিক রূপসৃষ্টি।

দুই.

বাংলাদেশের ছোটগল্পের একেবারে গোড়ায় যে কজন বাঙালি মুসলমান জলসিঞ্চন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম **মাহ্‌বুব-উল্‌ আলম** (১৮৯৮-১৯৮১)। ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার-গ্রামীণ সমাজ পরিকাঠামোর দৈন্য চকিত উঠে আসে তাঁর গল্পে। বিভাগ-পূর্বকালে *মফিজন* (১৯৪৬) লিখে খ্যাতি পান। তাছাড়া *তাজিয়া* (১৯৪৬), *পঞ্চঅন্ন* (১৯৫৩), *গাঁয়ের মায়া* (১৯৪৯)য় মাহ্‌বুব-উল্‌ আলমের ছোটবড় নানা পরিধির গল্প। সাহিত্যের রুচি ও অনুধ্যান তৈরি হয় তাঁর গল্পে। জৈবিক প্রেম কিংবা আদিমতা সরল বর্ণনায় বিপুল পরিসর পায়। মানুষের সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাস যেন ভেসে যায় অনিবার্য সব বাস্তবতার কাছে। পল্লির মায়াময় জীবন, রূপময় স্নিগ্ধতা চমৎকার আবহ পায় গল্পসমূহে। “তাজিয়া” গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জনা থাকে—বিশেষত প্রধান চরিত্র খলিলের তা নির্মাণে যখন থাকে মুন্সিয়ানা এবং এক পর্যায়ে যখন তা প্রতিযোগিতা বা ধর্মীয় হানাহানিতে পর্যবসিত হয়। *তাজিয়া* গ্রন্থের “কোরবানী”ও উল্লেখনীয় গল্প। গতিময় বর্ণনায় বাঙালি মুসলিম রীতি ও সংস্কৃতির রূপকে অনেকটা পরিহাসপ্রিয়তা ব্যক্ত করেন। কোরবানির পশুর জন্য রমিজের অপত্য স্নেহের মূল্যকে অর্থহীনতায় অর্থারোপ করেন লেখক। মাহবুব-উল-আলমের গল্প “ঈদ”, “আনব্যালেন্সড” একই প্রবণতার; সাম্য, শোষণ, ধর্মীয় লেবাসে অনাচার ইত্যাদির কুশলী নির্মাণপ্রয়াস। তাঁর বন্ধু, ‘বুদ্ধির মুক্তি’র পথিকৃত কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) *তাজিয়া*র মূল্যায়নে বলেন : ‘তাঁর কথা সহজেই ব্যক্ত হয় রেখা ও রঙের বৈচিত্র নিয়ে।... এক ধারায় তিনি মুখ্যত শিল্পী... অন্যধারায় এক বিশেষ যুগের ও বিশেষ সমাজের ভাবনায়—অথবা দুর্ভাবনায় তিনিও যে বিব্রত, তার পরিচয় স্পষ্ট।... দ্বিতীয় ধারায় তাঁর বিশিষ্ট রচনা ‘তাজিয়া’। ‘তাজিয়া’র প্রথম তিনটি গল্পের পটভূমিকা মুসলমান-সমাজের

সুপরিচিত তিনটি পর্ব মোহর্‌রম, ঈদুলফিতর আর কোরবানীর ঈদ। এইসব পর্বে মুসলমানের সমাজ মানসে যে উদ্দীপনা ও আনন্দের সঞ্চার হয় সহজেই তার সুর ও তাল মনে রণিত হয়েছে।' **মবিন উদ্‌দীন আহমদ** (১৯১২-১৯৭৮) গ্রাম আলেখ্যর রূপকার। ভঙ্গুর সামন্ত সমাজ, নর-নারী সম্পর্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস, যৌনতা, নারী অধিকার এবম্বিধ বিষয় তাঁর গল্পপটে স্থান করে নেয়। মবিনউদ্‌দীনের লেখায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপট, কতৃত্ব, স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গটি শিল্পিত রূপ পায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের স্বরূপটিও তাঁর গল্পে বির্ধত। তাঁর গল্পগ্রন্থ *কলঙ্ক* (১৯৪৬), *হোসেন বাড়ীর বৌ* (১৯৫২), *ভাঙাবন্দর* (১৯৫৪) প্রভৃতি। **কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ** (১৯২১-১৯৭৫) দুর্দান্ত ও কমিটেড গল্পকার। জঙ্গমতা, নিষ্ঠুর, সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য রচিত হয় তাঁর গল্পে। বিষয়ের গুরুত্বের চেয়ে তাঁর গল্পালোচনায় প্রধান দিক সমাজ-ঘনিষ্ঠ ভাষারীতি। 'a balance of interest between external action and character'ই তাঁর পটচিত্র। *কোলাহল* (১৯৪৭), *কালনাগিনী* (১৯৫২), *জ্বালাও আলো* (১৯৫৪), *যুদ্ধের ভয়ঙ্কর গল্প* (১৯৫৪), *নূতন প্রেম* (১৯৫৫) মুসলিম জীবনাচারের কাহিনি-নির্ভর গল্পগ্রন্থ। **আবু জাফর শামসুদ্দীন** (১৯১১-১৯৮৮)র *শ্রেষ্ঠ গল্প* বেরিয়েছিল ১৯৬২ তে। বিভাগোত্তর বাস্তবতায় গদ্যেই চলেছে উঠতি মধ্যবিত্তকে তুলে আনার প্রচেষ্টা। ঢাকা-কেন্দ্রীক বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপটি নির্ণয়ে চলে নানারকমের প্রয়াস। আবু জাফর শামসুদ্‌দীনের *জীবন* (১৯৪৮), *শেষ রাত্রির তারা* (১৯৬৬), *এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য* (১৯৬৭), *রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা* (১৯৭৮), *ল্যাংড়ী* (১৯৮৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৮) বেরিয়েছে। কিন্তু ষাটের দশকের গল্পেই তিনি বেশি সফল। গল্পের মেসেজ প্রগতিঋদ্ধ, উদার ও মুক্তদৃষ্টিসঞ্জাত। মধ্যবিত্ত জীবনই তাঁর অন্বিষ্ট। পূর্ব-বাংলার শাশ্বত গ্রাম ঐতিহ্য-সংস্কার ও মূল্যবোধ যেমন আছে তাঁর গল্পে তেমনি নগর জীবনের ক্লেশ ও হতাশাও বর্ণিত। এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের 'গড়ে-ওঠা' সমাজ ও জীবনের চিত্রটি আমাদের নিকট বেশি পরিচিতি অর্জন করে। **আবুল ফজল** (১৯০৩-১৯৮৩)র সওগাতে 'ইসলাম কী জয়' দিয়ে শুরু। আমাদের ছোটগল্পে আবুল ফজল *মাটির পৃথিবী* (১৯৪০)র সমাজ সচেতন গল্প নিয়ে শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত। এরপর *আয়ষা* (১৯৫১), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮)। প্রধানত সমাজ সচেতন গল্পই লিখেছেন আবুল ফজল। *মাটির পৃথিবী*র গল্পগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ভণ্ডামী, মুসলমানদের উত্থান-পতনচিত্র, আস্তিকতা বা নাস্তিকতা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ বিধৃত। এছাড়া বিস্তৃত জীবনপটে সূক্ষ্ম মানবীয় বৃত্তির চালচিত্রও আছে। আবুল ফজলের গল্পের চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক নিরূপিত হয় প্রধানত সমাজ ভাবনাকে ঘিরে। **আশরাফ উজ জামান** (জ. ১৯১১) বাংলাদেশের গল্পধারায় *অরণ্য পর্বত নদী ও সমুদ্র* (১৯৪৯), *খেয়া*

নৌকার মাঝি (১৯৫২) লিখে খ্যাতিমান। বাঙালি মুসলমান হিসেবে গল্পের যে বিষয়টি তিনি আয়ত্ত করেন তার সমগ্ররূপের অপেক্ষা বাংলা গল্পে ছিল। বিষয়টি হলো, জঙ্গমী জীবনের পূর্ণাঙ্গ বার্তা। এমনভাবেই তাঁর গল্পভাষা রচিত হয়। বহুভাষাবিদ, রম্যলেখক-কথাসাহিত্যিক; প্রবন্ধকার **সৈয়দ মুজতবা আলী** (১৯০৪-১৯৭৪)। *চাচা-কাহিনী* (১৩৫৯), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬১), *শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা* (১৯৬২) প্রভৃতি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ। মুজতবা আলীর গল্পের প্রাণধর্ম মজলিসী আড্ডার ভেতরে গল্পের পরিবেশনা। এজন্য তাঁর গল্পে আছে প্রচুর প্রাণশক্তি। প্রধানত দেশ-বিদেশের ব্যাপক ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা—তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি তৈরি করেছে। ফলে তাঁর গল্পগুলো হয়ে উঠেছে দ্যুতিময়। কৌতুকময় রসসৃষ্টিতে যে উদার ও প্রাণবত্তাপূর্ণ মনোভঙ্গি প্রয়োজন তা বাঙালি লেখকের ক্ষেত্রে বিরল হলেও মুজতবা আলীই তাকে গল্পে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আড্ডাপ্রিয় বাঙালির স্বভাব; মনের গভীরের সূক্ষ্মতর মনঃকষ্ট, বিরস দিনের স্নায়ুদ্বন্দ্ব নিপুণ শব্দে হিউমারাচ্ছন্ন করে তোলেন। তবে তাঁর করুণরসাত্মক বা ভয়ঙ্কর রসের গল্পও যে নেই তা নয়। এমনকি তাঁর প্রেমপ্রধান গল্পও চমৎকার, দিব্যদৃষ্টি। তাঁর সেরা গল্প সংকলন *পছন্দসই* (১৩৭৪)। অপার বিদ্যুৎদীপ্তি, উচ্চনাদী হাসির ভেতরে জীবনের দুঃখবোধ যে তিরোহিত নয়, এটিই তার প্রমাণ। প্রিয়বিচ্ছেদ, সহোদরার মৃত্যু, বিরহক্রন্দন এ গল্পে সর্বজনপ্রিয়তার আভাস ছড়ায়। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে জীবনসত্যের বৃত্ত যেন হয়ে ওঠে পূর্ণ। প্রতিভার বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব মুজতবা আলীর গল্পকে আলাদা আসন দিয়েছে। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী **সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)**। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *নয়ান ঢুলী* (১৯৫২)। গ্রামীণ পটে লেখা, সাধারণ-নির্যাতিত-শোষিত খেটে খাওয়া মানুষের নিবিড় ছবি *নয়ান ঢুলী*। গল্পগ্রন্থে অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদের চিত্রও প্রতিফলিত। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের শৈলি-নির্মাণ প্রচেষ্টায় লেখকের এ গ্রন্থটি গুরুত্বের দাবীদার। তাঁর *বীরকণ্ঠির বিয়ে* (১৯৫৫) বিষয় ও রীতিতে প্রায় *নয়ান ঢুলী*রই পুনরাবৃত্তি। *খরস্রোত* (১৯৫৫), *অষ্টপ্রহর* (১৯৭০)-এরপর *বেলা ব্যানার্জীর প্রেম* (১৩৮০) স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত মানবীয় প্রবৃত্তি ও অন্তর্গত আবেগের নিরীক্ষাধর্মীতার সরল উপস্থাপন। খুব গভীরে পৌঁছার প্রাবল্য নেই তাঁর গল্পে। তবে পাঁচের গল্পকারদের জীবন-অন্বেষণার যে প্রবাহটি গল্পে ফুটে উঠেছিল তার বাস্তবতা, আধুনিক দিক-উন্মোচনকারী এ গল্পকার। বাংলা ছোটগল্পের আধুনিকতার ভিতটি এসব গল্পের ভেতর দিয়েই শুরু হয়। ২০০৭-এ বেরিয়েছে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *গল্পসমগ্র*। **মিরজা আবদুল হাই** (১৯১৯-১৯৮৪) পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ। 'মেহেরজানের মা' গল্প লিখে তিনি সুধীমহলে পরিচিতি পান। মিরজা আবদুল হাই প্রায় তিনদশক সাহিত্যচর্চায়

নিয়োজিত থেকে পাঠকের প্রশংসাদৃষ্টি পান। তাঁর গল্পের গভীরে মেলে সমাজ ও ব্যক্তিকে অবলোকনের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। প্রসঙ্গত, ভারত বিভাগের পরের পাকিস্তানের স্বপ্ন-সুখ বা সে অনুবর্তী আবেগ ও চেতনা তাঁকে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অপাঙক্তেয়, অবাঞ্ছিত মানুষ; পতনোন্মুখ জমিদারের অহং, নির্যাতন, রক্তশোষণ কিংবা উদ্ভূত মধ্যবিত্তের বহুবঙ্কিম মনোবৃত্তি তাঁর শিল্পের রীতি-কৌশলটি তৈরি করে দিয়েছিল। *ছায়া-প্রচ্ছায়া* (১৯৭৬), *বিস্ফোরণ* (১৯৭৮), *ফিরে চলো* (১৯৮১) মিরজা আবদুল হাইয়ের গল্পগ্রন্থ। মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর এ সমস্ত গল্পে মনোবিশ্লেষণ ও আত্মকথনরীতির চমৎকার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এছাড়া গল্পের বিষয়-বিস্তৃতিতেও নজরে আসে নানা রকমের চরিত্রের সংশ্লেষ, মনোলোকের রহস্যময় অন্ধি-সন্ধির সংবাদ আর সমাজ স্তরের বিবিধ আচার-রীতির তির্যক প্রশ্নজিজ্ঞাসা। জীবনবোধের নিবিড়তায় রচিত সৎ শিল্পদৃষ্টির চয়ন করেন ডিটেলের ভেতর দিয়ে। যেটা মিরজা আবদুল হাইয়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। **শাহেদ আলী** (১৯২৫-২০০১)র বর্ণনাত্মক সংহত টানের গল্প *জিরাইলের ডানা* (১৯৫৩)। এই একটি গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি সুবিদিত। এ গল্পগ্রন্থে "ওই যে নীল আকাশ", "ফসল তোমার কাহিনী ", "নানীর ইন্‌তেকাল ", "জিবরাইলের ডানা", "এলোমেলো", "পোড়া মাটির গন্ধ অতসী" গল্প বিরাজমান। বিভাগ পর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিবার নিগ্রহ, যাপিত জীবন কিংবা ব্যক্তির পারস্পরিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ শিল্পিত হয়ে উঠে আসে। যাবতীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে ইহবাদী বিশ্বাসে প্রেম-অনুরাগ বা মুসলিম পারিবারিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেন লেখক। এজন্য বাঙালি মুসলিম সমাজ জীবনের ভাষাটি সামূহিক সচেতনতায় যেমন দৃঢ়তা পায় তেমনি সমকাল বিধৃত চিরায়ত সংস্কৃতির ধারাটিও নির্ভরতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শাহেদ আলী নিরঙ্কুশ মানবতাবাদই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর লেখায়। তাঁর অন্য গল্পগ্রন্থ *একই সমতলে* (১৯৬৩), *শা'নযর* (১৯৮৬), *অতীত রাতের কাহিনী* (১৯৮৬), *অমর কাহিনী* (১৯৮৭)। **আবদুল হাই মাশরেকী** (১৯১৯-১৯৮৮) প্রধানত কবি হলেও গল্প লিখেছেন। *কুলসুম* (১৯৫৪), *বাউল মনের নকশা* (১৯৭১) তাঁর গল্পগ্রন্থ। গ্রাম-বাংলার মানুষের দুর্দশা এবং দারিদ্র্য তাঁর গল্পের প্রতিবেশ তৈরি করেছে। এক প্রকার আলংকারিক শব্দবিন্যাসের আবহে গল্প-নির্মিতি পায়। তবে গল্পকার হিসেবে তাঁর গল্পে তেমন স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কিছু মেলে না। **আশরাফ সিদ্দিকী** (জ. ১৯২৬) *গলির ধারের ছেলেটি* লেখেন। প্রধানত সমাজের অবক্ষয়, ম্লান-মূল্যবোধ এবং মধ্যবিত্তকে বিষয় করে গল্প লেখেন আশরাফ সিদ্দিকী। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *রাবেয়া আপা* (১৯৫৫), *প্যারিস সুন্দরী* (১৯৭৫), *শেষ নালিশ* (১৯৯২)। **গজনফর আলী** (জ. ১৯৩২) পূর্ব-পাকিস্তানের গল্পকার। *ভাববিলাস* (১৯৫৭) মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনা

নির্ভর, ঐ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ায় রচিত তাঁর গল্প। জীবনের বিচিত্র কণ্ঠস্বর এতে নেই, তবে উঠতি মধ্যবিত্তের ভোগ, লালসা, মর্যাদা, প্রতিপত্তি এসব বিষয় তাঁর গল্পে বিরাজমান। গল্পভাষা তৈরি না হলেও কথনভঙ্গি আড়ষ্ট নয়। **মঈদ-উর রহমান** পঞ্চাশের গল্পকার। বাংলাদেশের গল্পরচনার পথটি নির্মাণে মঈদ-উর রহমানের গুরুত্ব আছে। *ময়ূরের পা* (১৯৫৮), *প্রিয় সম্ভাষণ* এসব গল্পের ভিত্তি দুর্বল। বাইরের কাঠামোতে বন্দি তাঁর চরিত্র। ভেতর অনুসন্ধানে তৎপর নন মঈদ। তবুও তাঁর গল্প একটা আশ্রয় ও সম্ভাব্য জীবনচেতনার সত্য প্রতিবিম্ব। জীবন বৈচিত্র্যের বীক্ষার প্রবীণ গল্পকার **মতিন উদ্-দীন আহমদ** (১৯০০-১৯৮০)। বিভাগ-পূর্বকালেই প্রতিষ্ঠা। খ্যাতিতে থাকে "এজমালী উপন্যাস" গল্প। *চালাক হওয়ার পয়লা কেতাব* (১৯৫৮), *তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ* (১৯৬৪), *এ-তো বড় রঙ্গ যাদু* (১৯৬৯)। *তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ*-এ 'তিন চেরাগ' অংশে রয়েছে "এজমালী উপন্যাস", "এজমালী নাটক", "এজমালী কবিতা" তিনগল্প; 'তিন শামাদান'-এ "যে বই আমি লিখব", "স্বামীক্লেশ নিবারণী সংঘ", "পরলোক গতেষু" এবং 'ফাউ' অংশে "আত্মজীবনী নয়" গল্পটি রচিত। প্রধানত হাস্যরস উদ্দীপ্ত, আড়ম্বর-বর্জিত, পরিহাসপ্রিয় এ গল্পকার গল্পভাষার কুশলী কারিগর; বিভাগোত্তর গল্পধারার পথটি তিনি করেছেন অবমুক্ত। মতিন উদ্-দীন আহমদ জীবনকে নিয়ে রম্য করেন, মেতে ওঠেন রসিকতায়। ভিন্ন চালের গদ্যের ভেতরে জীবন-স্ফূর্তির দুর্দান্ত প্রকাশক। দীর্ঘ পরিক্রমায় খ্যাতিমান গল্পকার **রাজিয়া মাহবুব** (জ. ১৯২৮)। প্রসিদ্ধি স্বতন্ত্র আঙ্গিকের গুণে। *খাপছাড়া* (১৯৫৮), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৬২), *দূরভাষিণী* (১৯৬৯), *মুখরিত গহনে* (১৯৮৩) গল্পে তিনি উত্তরিত। সমাজ-অর্থনীতির বৃত্ত তাঁর গল্পে তেমন জোরালো নয়। এক ধরনের রোম্যান্টিক আবেগের বাইরে বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন না তিনি। কোনো কোনো গল্পে শিল্পমাত্রা পরিশুদ্ধ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা বিদূরিত। তবুও বাংলাদেশের গল্প-অভিজ্ঞতায় তিনি সন্ধিৎসু পথটির যোগান দিতে অসামর্থ্য নন। **মিন্নাত আলী** (জ. ১৯২৬) পঞ্চাশের শক্তিশালী গল্পকার। *আমার প্রথম প্রেম* (১৯৫৯) লিখে খ্যাতিমান। এছাড়া লিখেছেন *মফস্বল সংবাদ* (১৯৫৮), *যাদুঘর* (১৯৬৯), *চেনা ও অচেনা* (১৯৮০) প্রভৃতি গল্প। সমাজ শ্রেণিস্তরচিহ্নিত মিন্নাত আলীর গল্প। জীবনের বিচিত্র দিকস্পর্শী এ গল্পকার সংযমী আঙ্গিকে অনুপম গদ্যভঙ্গিতে গল্পজগতকে আবিষ্কার করে চলেছেন। সমাজভিত্তিতে ব্যক্তির উদ্ভাবন ও রোম্যান্টিক চেতনাসূত্র তাঁর গল্পবিষয়। এ জন্য তিনি আয়ত্ত করেন স্বতন্ত্র এক ভাষাভঙ্গি। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভিত্তিতে জলসিঞ্চনকারীদের অন্যতম তিনি। **আবদুল গাফফার চৌধুরী** (জ. ১৯৩৪) সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের নির্মাণে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী অনবদ্য হয়ে ওঠেন ভাষার স্বায়ত্তগুণ ও প্রভাবের জন্য। স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর

গল্প বলা। সমাজভাঙ্গনের সুর আছে, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে ব্যক্তি মধ্যবিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু-স্পন্দিত-দুর্বিষহ প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন। গাফ্‌ফার চৌধুরী ভঙ্গুর সামন্ত-সমাজের প্রতিচিত্র অঙ্কন করেন, এজন্য তাঁর ভাষা রোম্যান্টিক তবে অবাস্তব নয়। মাঝে মাঝে তা প্রতীকীও হয়ে ওঠে। তবে গল্পের পাঠ শুধু জীবনের চালচিত্রই নয়, ভেতরের শক্তি ও সম্ভাবনারও উন্মোচন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী প্লট-নির্মাণে সামর্থ কিন্তু ডিটেইলে গতানুগতিক, যথাযথ নন। শিল্পবিশ্বাসকে যথাযথ পরিবেশনে দুর্বলতা লক্ষণীয় মনে হয়। তাঁর *কৃষ্ণপক্ষ* (১৩৩৬), *সম্রাটের ছবি* (১৯৫৯), *সুন্দর হে সুন্দর* (১৯৬০) ষাটের জনপ্রিয় গল্প। **আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী** (জ. ১৯২৬) বিভাগ-পরবর্তী গল্পকার। সদ্য গড়া নগর উপলব্ধি আর নাগরিক প্রত্যয় পরিস্রুত তাঁর লেখায়। প্লট-নির্মাণ পরিকল্পনায় নয় কাহিনিভিত্তিক গল্প *অলিগলি কতপথ* (১৯৫৯)। বেশিদূর এগোননি। সাহিত্য মনস্কতার প্রবাহটি চালু ছিল এসব রচনায়, শিল্পচিহ্নিত পরিমার্জনা এ গল্পকার অতিক্রম করতে পারেননি। **মযহারুল ইসলাম** (১৯২৮-২০০৩) গ্রামীণ পটে লেখা মযহারুল ইসলামের একমাত্র গল্পগ্রন্থ *তাল তমাল* (১৯৫৯)। প্রকৃতির আবহটি কাব্যগতরূপে চিহ্নি তাঁর রচনায়। গ্রামীণ চিত্র আছে। বহির্মুখি বাস্তবতারই একাধিপত্য ও প্রয়োগ। কবির কথাচিত্র পরিবর্ধিত, সমস্যার চেয়ে বর্ণনাই যেন বেশি উপভোগ্য। **ইবরাহীম খাঁ** (১৮৯৪-১৯৭৮)র গল্প *আলু বোখরা* (১৯৬০), *উস্তাদ* (১৯৬৭), *দাদুর আসর* (১৯৭১), *মানুষ* । এসব গ্রন্থে এক ধরনের শৈলি চিহ্নিত আছে। বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার চিত্র এতে প্রতিফলিত। রুচিশীল লেখকের প্রমাণ রয়েছে। সুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অন্যান্য রচনার মতো গল্পেও চেতনাগত একটা স্ফূর্তি নজরে আসে। কল্পনাকে বাস্তবভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য ছিল তাঁর। *আলু বোখরা* ও *উস্তাদ* তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। **চৌধুরী শামসুর রহমান** (জ. ১৯০২) ষাটের খ্যাতিমান গল্পকার। *ফুটপাত* (১৯৬০) তাঁর জনপ্রিয় গল্প। তাঁর গল্প কোনো আদর্শায়িত চেতনার বুদবুদ নয়। বাস্তব জীবনের উল্লম্ফনই তাঁর গল্পে প্রকাশিত। বিভাগ-পরবর্তী জীবনের প্রবাহকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর লেখায়। **বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর** (জ. ১৯৩৬)র গল্পে কথক-শ্রোতার শিল্পভঙ্গিটি আকর্ষণীয়। নানা বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। *অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০), *দূর দূরান্ত* (১৯৬৮), *কণ্ঠস্বর* (১৩৭৪), *বিশাল ক্রোধ* (১৩৭৬), *মুণ্ডহীন মহারাজ* (১৯৭৪), *এক ধরনের যুদ্ধ* (১৯৮৪), *গণতন্ত্রের প্রথম দিন ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯২), *বিপ্লব দীর্ঘজীবী থেকে* (১৯৯৭) এসব গল্পে সমাজ-রাজনীতি-ব্যক্তির দ্বন্দ্বাত্মক দিক প্রতিফলিত। নরনারী সম্পর্ক, প্রেম জীবনবাদী চেতনায় প্রতিবিম্বিত তাঁর রচনায়। আদি-নৃগোষ্ঠীর জীবন নিয়েও তাঁর গল্প আছে। অস্তিত্বচেতনার দিকটি লেখকের গল্পভাষ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। **আবদুশ শাকুর** (১৯৪১-২০১৩) পরিপক্ব মেজাজে

গল্প লিখেছেন। দীর্ঘ পরিসরের গল্পে জীবনের রহস্য-উদ্ঘাটনের ও নিষ্কৃতির পথটি খোঁজেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আবদুশ শাকুর শক্তিশালী গল্পলেখক। পাঠ-অভিজ্ঞতায় অর্জন করেন জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তি, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তই তাঁর গল্পের আঙ্গিক। নানাকৌণিক নিরীক্ষণে শুধু চরিত্রই নয়, সমকালকেও শিল্পরূপে অঙ্কিত করেন তিনি। মেধাবী ও দক্ষমনস্কতায় আবদুশ শাকুরের গল্প সংকলন *ক্ষীয়মান* (১৯৬১), *এপিটাফ* (১৯৭৬), *ধস* (১৯৮২), *বিচলিত প্রার্থনা* (১৯৮৩), *নৈসর্গিক গল্প* (১৯৯৭), *গোলাপধোলাই* (১৯৯৭), *গল্পসমগ্র* (২০০২), *আঘাত* (২০০৬), *টোটকা* (২০০৬)। দীর্ঘ গল্প পরিচর্যায় জীবনবীক্ষণেও এসেছে পরিবর্তন। মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতা, নাগরিক পরিবৃত্ত তাঁর গল্পের বিষয়। ষাটের দশকের অন্যতম কথাকার **দৌলতুন্নেসা খাতুন**। তাঁর *গল্পমঞ্জুরী* (১৯৬২) মধ্যবিত্ত জীবনের আবেগ-অনুভূতির নিরবচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি। তাঁর গল্পবর্ণনায় ভাষা আছে, চরিত্রও সৃষ্টি হয় কিন্তু কাহিনি একই পরিবৃত্তে আসীন, পরিণতি দুর্বল। ঘরোয়া বা পরিবার-কাঠামোভিত্তিক **দিলারা জামান** (জ. ১৯৪৩)র গল্প। *অন্তরাগ* (১৯৬২), *আর্শিতে আমি* (১৯৭৬), *মৃগয়ায় শরবিদ্ধ* (১৯৮৬) প্রভৃতি তাঁর গল্প। গল্পভাষা বর্ণনামুখর, দৈনন্দিনতার তাপে মুগ্ধ। দীর্ঘদিন লিখলেও তেমন পরিচর্যা পরিলক্ষিত হয় না তাঁর গল্পে। এসব গল্প সমাজ ঘনিষ্ঠ নয়, অনেকটা পুনরাবৃত্তির কবলে বনসাই। **তাসাদ্দুক হোসেন** (জ. ১৯৩৪) মুখ্যত উপন্যাসে খ্যাতিমান। *অরণ্য শিশির* (১৯৬৩), *বিকেলের শেষ প্রার্থনা* (১৯৭৯), *উত্তমাশা অন্তরীপে* (১৩৮৪) লেখকের গল্পগ্রন্থ। এসব গল্পে তাঁর লেখকসত্তা প্রতিষ্ঠিত। গল্পভাষা সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। **আ. ন. ম. বজলুর রশীদ** (১৯১১-১৯৮৬) কবি-উপন্যাসকার। তাঁর ছোটগল্প *পথ ও পৃথিবী* (১৯৬৪) রোম্যান্টিক মেজাজের গল্প। বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় একটা গল্পরীতি তৈরি হচ্ছিল আ. ন. ম. বজলুর রশীদ গল্পে তা প্রস্ফুটিত করতে না পারলেও চর্চাটুকু রেখেছিলেন। *পথ ও পৃথিবী* কোনো জীবনবাদী গল্প নয়, হাল্কা মেজাজের কথন মাত্র। **অজিত কুমার নিয়োগী** (জ. ১৯২৩) *ধূসরলিপি* (১৯৬৪)র লেখক। গল্পনামেই প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। **আকবর হোসেন** (১৯১৭-১৯৮১)র *আলোছায়া* (১৯৬৪) একমাত্র গল্পগ্রন্থ। **আতোয়ার রহমান** (জ. ১৯২৭)র গল্পসংকলন *হলদে লতা* (১৯৬৪)। পরিপক্ব, দক্ষ, মেধাবী গল্পকার। *বলয়* (১৯৬৭) তাঁর অন্য গল্পগ্রন্থ। প্রথাগত প্রকরণের বাইরে জীবনকে প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট করে গল্প লিখেছেন আতোয়ার রহমান। বাস্তব জীবনটি বাধা আছে প্রকৃতির মার্জনায়। *হলদে লতা* আমাদের গল্পসাহিত্যে অনন্য সংযোজন। *অনেক রঙের আকাশ* (১৯৬৪) **আহমদ রফিক** (জ. ১৯২৯)র গল্প। ষাটের পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্ত প্রণোদনায় রচিত। বিরূপতার ভেতরে আত্মচেতনার পরিচয় আবেগঋদ্ধ বর্ণিত। আঙ্গিক ঋজু। প্রসাদগুণ উচ্চমাপের। তবে গল্পযাত্রায় তেমন কোনো পথ রচিত

হয়নি তাঁর। **আহমদ মীর** (১৯২৫-১৯৭৯)র প্রকৃত নাম মহিউদ্দিন আহমদ। মার্জিত ও রুচিশীল; ভিন্ন স্বাদের গাল্পিক। বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর গল্পকারদের রুচিতে তৈরি। একমাত্র গল্পগ্রন্থ *লালমোতিয়া* (১৯৬৫)। সহজভাষ্যে, রোম্যান্টিক পেলবতায়, বিদ্যুৎচমকিত উইট সৃষ্টি করা সর্বোপরি মধ্যবিত্তের কর্মপ্রবাহের বিবিধ আবেগ-অনুভব মিলিয়ে তাঁর গল্পশক্তির প্রকাশ। এ্যালান পো'র গল্প অনুবাদ করেও আহমেদ মীর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর গল্পশৈলি বাংলাদেশে কোনো ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। **ফরিদা হোসেন** (জ. ১৯৪৫) অনেক সময় নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন। *অজন্তা* (১৯৬৫), *ঘুম* (১৯৮৫), *শাড়ী* (১৯৮৭), *একটি শীতল মৃত্যু* (১৯৮৭), *হিমালয়ের দেশে* (১৯৯৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৪), *কংজনার কথা* (১৯৯৪)—এমন অনেক গল্পের জন্মদাতা হলেও অনুপস্থিত তিনি গল্পধারায়। নিজস্ব কোনো গল্পভাষা রচনা করতে পারেননি। আঙ্গিক দুর্বল, প্লট নির্মাণে দৃঢ়তা নেই। বাংলাদেশের ভূমি-মাটি ও মানুষের স্বর অনুপস্থিত তাঁর লেখায়। এক ধরনের রোম্যান্টিক আবেগ, কৃত্রিম জীবনের মোহাচ্ছন্নতাকে তুলে ধরা হয়েছে। বিভাগোত্তর কালের গল্পকার **আজিজুর রহমান**। রোম্যান্টিক প্রবণতায় গল্প লিখেছেন। এসব গল্পের তেমন শিল্পগুণ পরিলক্ষিত হয় না। তবুও ষাটের কাহিনি বিনির্মাণে *কালো ফিতা* (১৯৬৫), *দেশী ফুল* (১৯৬৫) দায়িত্বশীল ভূমিকার গল্প। **নাজমুল আলম** (জ. ১৯২৭) তুখোড় গল্পকার, কিন্তু উপন্যাস নাটকও লিখেছেন। মনোমুগ্ধকর গল্পভাষা। এক ধরনের হিতবাদ প্রতিষ্ঠিত তাঁর গল্পে। প্রতারক, বিবেকবর্জিত, কৃতঘ্ন এমন বিচিত্র চরিত্রকে তুলে আনেন। এজন্য বাস্তববুদ্ধির ক্যানভাসে পরাবাস্তব বা এক্সপ্রেশনিস্ট আঙ্গিকের প্রয়োগ ঘটান লেখক। ভূমি-মাটির মানুষের জঙ্গমতা, বাস্তবতা, সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধতাকে দিব্যচেতনায় উঠে আসে। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এমন বাস্তববাদী গল্পকার বিরল বলা যায়। গল্পের পরিবেশ আর চরিত্রের হুংকার যেন কোমলে-কঠোরে ভিন্ন এক জীবনের বীণা শোনায়। "বাজি" গল্পের মিনহাজ তার বৌ আতিয়াকে জুয়োয় বাজি ধরলে হেরে যায়, তখন ক্ষোভ-অভিমান-ব্যর্থতায় গল্পের পরিসমাপ্তি এরকমের : 'মিনহাজ ধরা গলায় বলে, এই ভর সাঁঝবেলায় কই যাস আতু? সোনাকন্দির জঙ্গলে অনেক সাপখোপ, জন্তু-জানোয়ার।' আতিয়া অস্ফুট স্বরে বলে, তারা মানুষের চেয়ে অনেক ভালা, বেইমানি করে না। বলে মাটিতে আবার একদলা থুথু ফেলে পানুর হাত ধরে সোনাকান্দির জঙ্গলের দিকে পা বাড়ায়।' নাজমুল হকের গল্পের ট্রিটমেন্ট এরকমই। গল্পভাষার বুননি পৃথক মেজাজের, যেখানে জীবন আর বাস্তবের সবটাই নির্মমতা দিয়ে ঘেরা। তাঁর গ্রন্থ : *একটি অচল আনি* (১৯৬৬), *উপস্থিত সুধীমণ্ডলী* (১৯৭৮), *পাণ্ডুলিপি ও গয়নার বাক্স* (১৯৭০), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *বুনোবৃষ্টি* (১৯৮৪), *নিজের বাড়ি* (১৯৮৮) প্রভৃতি। **নীলিমা ইব্রাহীম**

(১৯২১-২০০২) দক্ষ কথক। শৈলি ঋজু, দৃঢ়। *রমনা পার্কে* (১৯৬৪) তাঁর গল্পগ্রন্থ। নিছক মধ্যবিত্ত ভাবনাপ্রসূত এর আঙ্গিক পরিশ্রুত। এটিতে তাঁর দক্ষ মেধার কোনো প্রমাণ মেলে না। **হুমায়ুন কাদির** (১৯৩২-১৯৭৭) *একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প* (১৯৬৬), *আদিম অরণ্যে এক রাত্রি* (১৯৭০), *শীলার জন্য সাধ* (১৯৭৯) এসব গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। কথাশিল্পী হিসেবে নিজস্ব ভাষাশৈলি তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছেন হুমায়ুন কাদির। শহুরে মধ্যবিত্তের জীবন-উপাদানকেই আঙ্গিকে বেঁধেছেন। লিখেছেন পারিবারিক পরিমণ্ডল নিয়েই। চলচ্চিত্রের মতো তাঁর গল্পদৃশ্য নির্মিত, চরিত্রের ভেতরের প্রতিচিত্রের চেয়ে বহির্মুখি ঘটনাপ্রবাহই বেশি কাজে লাগে গল্পে। এজন্য একটু প্রথাপন্থিই মনে হয় তাঁকে। ‘সামাদ আশ্চর্য হলো। জীবনে প্রথম এই একটি ব্যতিক্রম যেন নিমিষের মধ্যে তোলপাড় করে দিল তার বুক। সাবেরা তো কখনো একা একা সিনেমা দেখতে যায়নি। গত দশ বছরের বিবাহিত জীবনে।’ এরপর মনোজগতের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে রিজিয়া প্রসঙ্গ আসে, প্রসঙ্গান্তরে টেনশান উত্তেজনা সেটি বাইরের প্রতিক্রিয়া। এভাবেই তাঁর গল্প তৈরি হয়। **আশীষকুমার লোহ** (১৯৩৭-১৯৯৪) একমাত্র গল্পগ্রন্থ *অনেক তারার আকাশ* (১৯৬৬)। তাঁর বেশ কিছু অপ্রকাশিত গল্পও রয়েছে। ভূমিসংলগ্ন দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। প্রধানত মানবিক দৃষ্টিকোণই তাঁর গল্পে প্রকাশিত। ষাটের অন্যান্য গল্পকারদের চেয়ে তাঁর গল্পের স্বাতন্ত্র্য দিক চিত্রল বর্ণনায় বৈষম্যময় সমাজের রক্তপাতকে পরিবেশন প্রয়াস। শেষ পর্যন্ত আশাবাদও কার্যকর থাকে। ‘একি ভাবছে বিন্দিয়া! এর ভীরুতা এ অমানুষিকতা মনেও স্থান দেবে না সে। তাঁকে বাঁচতে হবে। বানের জলে ভেসে আসা সাপের বাচ্চার মতো নয়। অনড় ঝাউকন্যার মতো সংগ্রাম করে শেষ শক্তিটুকু খুঁইয়ে দিতে হবে। জলের ঢেউ তো ঝাউকন্যাদের ডুবিয়ে ফেলেছে’—এমন মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আমাদের জীবনের সম্ভাবনাকেই যেন বাড়িয়ে দেয়। **মফিজ উদ্দীন আহমদ** ষাটের গল্পকার। উঠতি মধ্যবিত্তের রূপটি ব্যঙ্গাত্মক অঙ্কিত। চিরায়ত ঐতিহ্য ও আবহটি গল্পে প্রতিফলিত। তাঁর গল্প *এক অঙ্গে কত রূপ* (১৯৬৬), *স্টার সার্কাস* (১৯৭৭) প্রভৃতি। গল্পভূমে আমাদের জীবনের আলোকিত প্রত্যয়টি তিনি নির্ধারণ করেন। **লায়লা সামাদ** (১৯২৮-১৯৮৯) স্পষ্ট জীবনবোধে লায়লা সামাদের গল্প তৈরি হয়। *দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে* (১৩৭৩), *কুয়াশার নদী* (১৩৭৬), *অরণ্যে নক্ষত্রের আলো* (১৯৭৫), *অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা* (১৯৭৮), *বেগম সাহেবা* (১৯৭৯) এ পাঁচটি গ্রন্থে ব্যক্তিসমস্যা, ভেতরের দ্বন্দ্ব, উত্থান-পতন, হতাশা-ব্যর্থতা এক ধরনের আধুনিক রূপমাত্রা তৈরি করে। একান্ত অনুভূতি, যৎসামান্য ইচ্ছা-বাসনা বাঙময় হয়ে ওঠে গল্পে। চমকসৃষ্টিতে থাকে দূরের ব্যঞ্জনা, ব্যক্তি পৌঁছায় সমষ্টিতে। লায়লা সামাদের

পরিব্যাপ্ত চেতনায় নিঃসঙ্গতাও একটি বড় বিষয়। এমন মনোজগত তৈরির জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজের কুৎসিত তৎপরতার দায়কে ব্যক্তির ওপর সুনির্দিষ্ট আরোপ করেন লায়লা সামাদ। ফলে তাঁর গল্পের 'সুরমা', 'সায়মা' 'চুন্নু' অতি পরিচিত ও চিরায়ত ভাষাতে বন্দি হয়। **শামসুল ইসলাম** (১৯৪২-২০০৭) মূলত কবি; কবির জন্যই খ্যাতি। তাঁর গল্পগ্রন্থ *কুসুমের ঋতু* (১৯৬৬), *সিগারেট ও অন্যান্য গল্প* (১৯৭৬)। এসব গল্পে কবিমাত্রা উপস্থিত। কবি-আবেগের অনুসৃত ধারাটিই বহমান। গল্পভাষাটি আকর্ষণীয় ও ঋজু। **ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ** (জ. ১৯৪৫) নাগরিক জীবনবৃত্তের জনপ্রিয় গল্পকার। এক ধরনের রোম্যান্টিক আবহে তিনি চরিত্র নির্মাণ করেন। যেটি পাঠকপ্রিয়তা দেয়। তাঁর গল্প : *মুক্তিযুদ্ধের অশ্রুত বাঁশি*, *গোধূলি রং খেলা* (১৯৬৬), *অলকাপুরী* (১৯৮৬), *মখমলে আলপিন* (১৯৮৯), *নূর হোসেনের পদধ্বনি* (১৯৯৪), *নাইট কুইন* প্রভৃতি। তবে তাঁর গল্প চালচিত্র, বাস্তবানুগ নয়, উপরিতলের আর্তি মাত্র। **জোবেদা খানম** (১৯২০-১৯৮৯) ষাটের শেষপাদের গল্পকার। সে সময়ের গল্পের আঙ্গিনায় উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের বৈচিত্র্য ও তার স্বরূপ সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে দেখা যায়। সে প্রস্তাবনায় গল্পকার লিখেছেন *খুকুর এ্যাডভেঞ্চার* (১৯৬৭), *একটি সুরের মৃত্যু* (১৯৭৪), *জীবন একটি দুর্ঘটনা* (১৯৮১) এসব গল্প। তাঁর গল্পভুবন রোম্যান্টিক, অ্যাডভেঞ্চারসুলভ। জীবনের অবয়ব তাঁর বীক্ষণে নির্ধারিত ছকে বাধা নয়, সত্য আর সুন্দর বিশ্বাসে অপার, সমাসীন। এরূপ দার্শনিক প্রত্যয়টি আছে তাঁর গল্পভাষ্যে। জোবেদা খাতুনের গল্পের ভেতর দিয়ে একটা সময়ের ছবিই মূর্ত হতে দেখা যায়। যেটি নব্বুই-পরবর্তী সময়ে বিপুলভাবে পরিবর্তিত। **ইসহাক চাখারী** (জ. ১৯২২) বিভাগ-পরবর্তী সময়কালের খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে উঠতি মধ্যবিত্তের রূপকাররূপে প্রতিষ্ঠিত তিনি। *জানালা* (১৯৬৭) তাঁর অন্যতম গল্পগ্রন্থ। গল্পভাষা নিজস্ব, জীবনবোধ কালিক তাৎপর্যে বিধৃত। তবে সরল-বীক্ষণ তাঁর লেখায় কার্যকর। সমাজ বাস্তবতা এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন ও তাৎক্ষণিক। চালচিত্রই বয়ান করেন তিনি গল্পে। তবুও একটা গল্পশৈলি সে সময়ে অপ্রচলিত নয়। *স্বপ্নের কুশীলব* (১৯৬৭), *প্রথম কৃষ্ণচূড়া* (১৯৭২), *বিপরীত মানুষ* (১৯৭৭) **বশীর আল হেলাল** (জ. ১৯৩৬)র গল্প। তাঁর কিশোর গল্প *আনারসের হাসি* (১৯৭৪)। *প্রথম কৃষ্ণচূড়া* বশীর আল হেলালের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থটির ভেতর দিয়ে লেখক কথাকার হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তেমনি শিল্পীর পূর্ণতার পর্যায়টিও স্পর্শ করেছেন। এ গল্পে এসেছে আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ। জীবন ও জনগোষ্ঠীর বিচিত্র ও বহুবঙ্কিম ক্ষেত্রটি দিব্যত্ব পেয়ে যায় তাঁর ভাষাভঙ্গিতে। **বুলবন ওসমান** (জ. ১৯৪০) বিশ্বাসের সত্যে অমলিন, সত্যাদর্শে মুখরিত। *প্রত্যালীঢ়* (১৯৬৭), *মুকুরে মুখ* (১৯৬৯) ষাটের লেখা হলেও এখন সচল তাঁর গল্প।

চিত্রল মেসেজে, অন্তর্চেতনার আলো-অন্ধকারের সম্ভাব্য রূপ নির্মাণ করতে চান তিনি। তবে খুব বেশি অবগাহন নয়, পৌঁছয় না সে অতলে, তবুও বর্ণনার আয়োজন কিছুতেই দুর্বল নয়। এ সময়ে খুব কম লিখলেও তাঁর ষাটের দৃষ্টিচেতনা অবহেলিত থাকে না পাঠকের নিকট। প্রধানত জটিল জীবনরহস্যে তাঁর মধ্যবিত্ত প্রস্তুত। শিল্পকে ব্যক্তিত্বে অনুকরণীয় করে তোলেন বুলবন ওসমান। **রশীদ হায়দার** (জ. ১৯৪১) সমাজ-সংসার-প্রেম-অনিশ্চিত জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গদ্য নির্মেদ, সাবলীল। কাহিনি সুখপাঠ্য। প্রত্যেক মানুষের দুটি রূপ আছে একটি ভেতরের অন্যটি বাইরের। রশীদ হায়দারের দর্শনে ভেতরের রূপটি বাইরের রূপকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যবিত্ত জীবনপ্রবাহের স্বরূপকে তিনি এভাবেই পরীক্ষায় আনেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *নানকুর বোধি* (১৯৬৭), *অন্তরে ভিন্ন পুরুষ* (১৯৭৩), *মেঘেদের ঘরবাড়ি* (১৯৮২), *উত্তরকাল* (১৯৮৭), *তখন* (১৯৮৭), *আমার প্রেমের গল্প* (১৯৮৮), *পূর্বাপর* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প* (২০০৫)। গল্পকার হিসেবেই তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপন্যাসগুলো আসলে এক একটি বড়গল্পই বলা চলে। **রিজিয়া রহমান** (জ. ১৯৩৯) পরিশ্রমী লেখক। একই রূপে তাঁর গল্পও পরিশ্রমী, জীবনচেতনা-আশ্রিত। সূক্ষ্ম, সুবেদী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পে ইতিহাস বা সংগ্রাম, পুরাণ এসব না এলেও খণ্ড পরিসরে জীবনের অবহেলিত দিকের খণ্ডাংশকে স্পর্শ করতে চান গল্পকার। *অগ্নিস্বাক্ষরা* (১৯৬৭) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গল্পগ্রন্থ। 'লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস-সমর্থিত আবহে কল্পিত বাস্তবতা, ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেম ও বিদ্রোহ, আদিম আধিপত্যবাদ ও ঈর্ষা, প্রকৃতি প্রীতি, তীব্র রোম্যান্টিকতা, বিপন্ন মানবতা, দারিদ্র্য-দীনতা, মানুষের মূল্যবোধের ভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা' এমন বিষয় নিয়ে তাঁর *অগ্নিস্বাক্ষরার* দশটি গল্প। এছাড়া বেরিয়েছে তাঁর *নির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *হারকিউলিসের আগুন* (২০১০)। তবে গল্পের চেয়ে উপন্যাসেই তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয়। **হেলেনা খান** (জ. ১৯২৯) রোম্যান্টিক আবেগে গল্প লিখেছেন হেলেনা খান। স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়া, মধ্যবিত্ত পরিবৃত্ত চেতনায় আবর্তিত হেলেনা খানের গল্প। গল্পের ট্রিটমেন্ট দুর্বল, তবে কিছু সম্ভাবনার সূত্র আছে। তাঁর গল্প : *ফসলের মাঠ* (১৯৬৭), *বৃষ্টি যখন নামলো* (১৯৭৮), *কালের পুতুল* (১৯৭৮), *একাত্তরের কাহিনী* (১৯৯০), *পাপড়ির রং বদালায়* (১৯৯১), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৩), *ছায়া কালো কালো* (১৯৯৭), *কারাগারের ভেতরে ও বাইরে* (১৯৯৭) প্রভৃতি। **আবদুল মান্নান সৈয়দ** (১৯৪৩-২০১০) পরাবাস্তববাদী গল্পকার, কবিচরিত্র আর পরিবেশনের চিত্রকল্প তাঁর গল্পে ভর করে বসে। তাঁর ভাষ্য, গল্পেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য। *সত্যের মতো বদমাশ* গল্পে তৈরি হয় দুর্বার শিল্প-কাঠামোর চরিত্র। নিপুণ গদ্যের বিস্ময়কর স্ফূর্তি লক্ষণীয়। বাংলা গল্পে তিনিই একটা পথ অর্জন করে ফেলেন, পথিকৃতের ভূমিতে

জীবনের সমস্ত শক্তিকে পরীক্ষিত করে গভীর প্রত্যয়ে রঞ্জিত করেন। ফলে ঘোর লাগা এক আবহ তৈরি হয় তাঁর লেখায়। বিষয়বুদ্ধির বাইরে অলৌকিক আনন্দ ভর করে বসে, কিন্তু তা কিছুতেই বাস্তবানুগ নয়। আমাদের ছোটগল্পে অবিস্মরণীয় আবদুল মান্নান সৈয়দ। *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮), *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা* (১৯৭৭), *চলো যাই পরোক্ষে* (১৯৭৩), *গল্প ১৯৬৪* (১৯৭০), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৭), *মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা*, *সময় পুরুষ*, *উৎসব ও অন্যান্য গল্প*, *এক অমানুষের গল্প* প্রভৃতি তাঁর গল্প। **আহমদ ছফা** (১৯৪৩-২০০১)র প্রথম বই *দোলা আমার কনকচাঁপা* (১৯৬৮)। এছাড়া *নিহত নক্ষত্র* (১৯৬৯) আত্মকথনে বর্ণিত প্রশ্নঋদ্ধ গল্পগ্রন্থ। জীবনের বিচিত্ররূপ সাধারণত গল্পে থাকলেও প্রেম-জৈবিকতা, মধ্যবিত্ত আবেগ, আহমদ ছফার গল্পে দুর্নিরীক্ষ নয়। খুব আকর্ষণীয় চরিত্র নির্মাণ করেন ছফা। কমিটমেন্ট আছে; ব্যক্তিক্ষয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নির্ণীত চরিত্রকে ঘিরে। এ ভাষায় উপন্যাস লিখলেও প্রধানত তিনি গল্পকারই বটে। জীবনের মেসেজ ঐ পরিশুদ্ধতায়—তবে তা প্রচ্ছন্ন, পরিবর্তিত সমাজ-কাঠামোর আওতায় : 'তোষামদের জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত বাঁধন কেটে গেলো। সে সময়ই দেখলুম মুনতাসীরের শিমুল বরণ মুখখানি। অমনি আমার সামনে জেগে উঠলো ঘর্মসিক্ত হাজার হাজার কালো মানুষের সার। ওদের জীবনের কালো রোমাঞ্চ আমাকে টানতে লাগলো। টানতে লাগরো চুম্বকের মতো। কল্পনায় আমিও একজন শ্রমিক হয়ে গেছি।' আহমদ ছফাই কথক ও দার্শনিক। "গন্তব্য", "পদাঘাতের পটভূমি", "আস্বাদ" প্রভৃতি তাঁর অসামান্য গল্প। **বুলবুল চৌধুরী** (জ. ১৯৪৭) অকালপ্রয়াত গল্পকার কায়েস আহমেদের অনুপ্রেরণায় বুলবুল চৌধুরীর গল্পভুবনে আগমন। সত্তর দশকের গোড়ায় তাঁর আবির্ভাব। শুরু করেছিলেন "টুকা কাহিনী" দিয়ে। 'টুকা' জীবন-মুগ্ধতা আর বেঁচে থাকার কাহিনি। বাস্তববাদী এ লেখকের লেখায় পারিবারিক ও সামাজিক নিষ্ঠুরতার রেখাঙ্কন দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্পে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রেম-বিচ্ছেদ-ভালোবাসাসহ জীবনের যাবতীয় প্রত্যয় একেবারে ভেতর থেকে তুলে আনেন লেখক। এক্ষেত্রে স্নিগ্ধ প্রকৃতি সমস্তকিছুর গভীর অনুষঙ্গরূপে—নদী কিংবা আঁধারের প্রতীকে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। সজীব ও প্রাণপূর্ণ জীবনকেই তিনি গল্পের বিষয় করেন। এক্ষেত্রে সৃজিত গল্পভাষা পূর্ণাঙ্গ ও অনবদ্য। 'গহন দরদ আর অ-চীৎকৃত প্রতিবাদ গল্পকার বুলবুল চৌধুরীকে 'লেখক' থেকে 'আর্টিস্ট' বানিয়েছে।'—এমনটা সতত সত্য, সন্দেহ নেই। *টুকা কাহিনী* (১৯৬৮), *পরমানুষ* (১৯৯৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৭) তাঁর গল্পগ্রন্থ। মধ্যবিত্ত আবেগ, অন্তর্জগতের সন্দেহ, সতর্ক আশাবাদ, সরল প্রস্তাবনায় উঠে আসে **হাজেরা নজরুল** (জ. ১৯৪২)র গল্পে। পরিপক্ব মেজাজে, দৃঢ় ব্যক্তিত্বে গল্পবয়ন চলে। গল্পের আঙ্গিক ঋজু, দৃঢ়প্রযত্ন। হাজেরা নজরুল *জোনাকীর আলো*

(১৯৬৮), *ফসিলে সূর্যগ্রহণ* (১৯৮৬), *সুবর্ণসখী* (১৯৮৩), *সময়ের ফুল* (১৯৮৩), *ঘাসের পাখনায় আমার পালক* (১৯৯০) এসব গল্পগ্রন্থ লিখে নাগরিক মধ্যবিত্তের চেতনা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্রও চিহ্নিত হয়েছে বলা চলে। কবি, নাট্যকার **সিকান্‌দার আবু জাফর** (১৯১৯-১৯৭৫) *যাদুর কলস* (১৯৬৮) লিখেছেন। তাঁর শিল্পচেতনা প্রখর দায়বোধে উদ্দীপ্ত। সেভাবেই তাঁর *যাদুর কলস*। প্রধানত তত্ত্ব আরোপ হলেও শিল্প অস্বীকার হয় না **অজয় ভট্টাচার্য** (১৯১৪-১৯৯৯)র লেখায়। কাহিনি-চরিত্র নির্মিত হয় উদ্দেশ্য আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে। শিল্পকে উপযোগিতার আওতায় সঞ্চারিত করেন তিনি। গল্পকথন, পটনির্মাণ, চরিত্রবিন্যাস ঐ মুক্তির প্রত্যয়ে। *নীড়* (১৯৬৯)-এর গল্পতাণ্ডব তেমন প্রচেষ্টা থেকে। দর্শনটিই গল্পে মুখ্য। **নেয়ামাল বাসির** (১৯৩৫) ষাটের গল্পকার। বিভিন্ন গল্পের অনুবাদও করেছেন। কিন্তু পূর্ণায়ত বিকশিত হননি। তাঁর গল্পগ্রন্থ *ধূপছায়া* (১৯৬৯)। এছাড়া কুদরতুল্লাহ শাহাবের ষোলটি উর্দু গল্পের অনুবাদ করেছেন। প্রবল বাস্তবানুগ গল্প লিখেছেন। সন্দেহাতীতরূপে তিনি মেধাবী গল্পকার। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের অন্যতম এ গল্পকার জীবনের সঙ্গে বিচিত্র রূপ-রস-প্রকৃতির আলিঙ্গনে অনবদ্য করে তোলেন সবকিছু। সর্বোপরি তাঁর লেখায় জীবনই বড় হয়ে ওঠে। বলা চলে 'নিষ্ঠুর নতুন' তাঁর গল্প। ষাটের উল্লম্ফিত এ গল্পকার আমাদের গল্পভিত্তির প্রতিষ্ঠা পর্বের একজন বলা চলে। **অরূপ তালুকদার** বাস্তবানুগ গল্প লেখেন। পরিহাস, ব্যঙ্গ অবসিত নয় তাঁর লেখায়। প্রতীকী ভিত্তি পায় গল্পাঙ্গিক। *রংবাজ ফেরে না* (১৯৬৯) তাঁর অনুপম গল্প। আছে সেখানে শৈলির নিরবধি বিনির্মাণ। শুধু বিষয়ে নয়, শিল্পিত শুদ্ধতার আবরণ যেন কাঙ্ক্ষিত জগতসত্যকে সামনে আনে। পাঠকের আগ্রহবিন্দুটি সেভাবেই তিনি ধারণ করেন। **মোহাম্মদ ফজলুল করীম** (জ. ১৯২৮) বিভাগ-পরবর্তী গল্পকার। মধ্যবিত্ত রোমান্স ও রোম্যান্টিক চেতনায় গল্প লিখেছেন। *কাজল দীঘির পদ্ম* (১৯৬৯), *রূপের মোহে* (১৯৬৯) প্রভৃতি গল্পে মোহাম্মদ ফজলুল করীম নিজের ভাষ্যে প্রকাশিত। তাঁর এসব গল্প শিল্পমানে দুর্বল। প্লট-গঠন কিংবা কাহিনির তেমন বৈচিত্র্য নেই। *নিরুপায় হরিণী* (১৯৭০) **আনোয়ার পাশা** (১৯২৮-১৯৭১)র একমাত্র গল্প-সংকলন। দশটি গল্প নিয়ে এ সংকলন। সৃজনভূমে আনোয়ার পাশা ভুঁইফোঁড় সমাজকে না এনে সমাজের সমস্যাকে চিহ্নিত করেন। ফলে মানুষ, আত্মা, মানবতা, অবক্ষয়, ক্ষেদ, দুরত্ব এসব বিষয় কখনো বিদ্রূপাত্মক; কখনো বেদনাবহ হয়ে ধরা দেয়। আলোচ্য গল্পগুলোও তাই। নগর ও গ্রামের দুধরনের মানুষেরই চিত্র আছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব, সহাবস্থানের আন্তরিকতা সেখানে বেজায় দুরূহ। সবকিছুই যেন কৃত্রিম। এসবের উত্তর খুঁজতে চান আনোয়ার পাশা তার গদ্যশৈলিতে। **সুচরিত চৌধুরী**র ছোটগল্পের সংকলন *আকাশে অনেক ঘুড়ি* (১৯৬১)। সাতটি গল্প এতে সংকলিত।

স্বপ্ন-বাস্তবতার মিশেলে তৈরি হয়েছে তাঁর গল্পভূমি। জীবনের বিচিত্র রূপ এতে অঙ্কিত হয়েছে। **দিলারা হাশেম** (জ. ১৯৩৬) মধ্যবিত্ত জীবনের বৃত্তায়ন অস্বীকার হয় না দিলারা হাশেমের গল্পে। চরিত্রানুগ তাঁর গল্প। এক ধরনের ভ্রামণিক ব্যাপার আছে। প্রবাসে থাকার কারণে বাইরের সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র গল্পরূপে অর্জিত হয়। "জর্জ টাউনের যাত্রী", "লন্ডন ঢাকা সংলাপ", "শপিং লেডি আইরিন" এমন গল্পে জীবনের সূক্ষ্মতর অনুভূতির প্রকাশ আছে, প্রয়োগ আছে সংস্কৃতির নানা দিগন্তকে স্পর্শ করবার কিন্তু গল্পস্বাদ তেমন মেটে না। তাঁর প্রত্যাবর্তন দেশে হলে ভালো হতো। উন্মুল মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির আক্ষেপ বা উপেক্ষা, অসঙ্গতি, দোলাচলতা বিভিন্ন গল্পে বিরাজমান। 'ভদ্রমহিলা তাঁর সেই সুন্দর, তন্বী, পেলব হাতে বুড়োর হাত আঁকড়ে ধরে আধো ঘুম আধো জাগরণে কি এক আরাম ও আবেশে বুড়োর আঙুল নিয়ে খেলা করছে, কখনও তার শিরা-ওঠা হাতের পাতায় হাত বুলোচ্ছে, কখনও-বা আঙুল জড়িয়ে নিয়ে পড়ে আছে নিষ্পন্দ।' এমন গল্পভাষার ভেতরে জীবনের ভুঁইফোঁড় ও বায়বীয় রূপটি প্রত্যক্ষগোচর। দিলারা হাশেমের অন্যান্য গল্প *হলুদপাখির কান্না* (১৯৭০), *সিন্ধুপারের উপাখ্যান* (১৯৮৮), *নায়ক* (১৯৮৯) প্রভৃতি। **সুব্রত বড়ুয়া** (জ. ১৯৪৬) কয়েক দশকের গল্পচর্চায় নিজস্ব গল্পভাষা পেয়ে গেছেন। রোম্যান্টিক জীবন বিলাস নয়, মধ্যবিত্তকে ঘিরে যে চেতনাজগত তার আবর্তেই প্রকৃত সত্যকে যাচাই করতে প্রয়াসী হন তিনি। নৈঃসঙ্গ্য, একাকীত্ব, বেদনাবোধ, হতাশা নিয়ে সুব্রত বড়ুয়ার গল্প। এ প্রকৃতির গল্পের আঙ্গিক অন্তর্মুখি, মনোচিন্তাজাত, বিলাসীকাতর হওয়াই স্বাভাবিক। সুব্রত বড়ুয়ার গল্পের পাত্র-পাত্রী অতসী, নন্দিতা তেমন ভাবেই প্রকাশিত। গল্পকথন চমৎকার, পটবিন্যাস একটা লয়ে স্থিত, প্রবহমানতা প্রশংসনীয়। সমাজভূমির বিবরণ একটা কাঙ্ক্ষিত রূপ পায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ এবং তার বিকশিত সত্তার আধুনিক রূপ সুব্রত বড়ুয়ার গল্পে নির্মিত। এক্ষেত্রে তাঁর আর্থ-সমাজ ও রাজনৈতিক পাঠও অনুপস্থিত থাকে না। তবে *অনধিকার* থেকে *আত্মচরিত* ও *অন্যান্য গল্প* পর্যন্ত সুব্রত বড়ুয়ার গল্পচরিত্র তেমন পাল্টায়নি। অন্তর্গত বেদনা আর আশাভঙ্গেই ঘুরপাক খেয়েছে তাঁর কাহিনি। তবু সাবলীল গদ্যপ্রয়াসে তিনি সফল গল্পকার। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *জোনাকী শহর* (১৯৭০), *কাচপোকা* (১৯৭৫), *অনধিকার* (১৯৭৭), *আত্মচরিত ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৯), *ভালোবাসা ভালোবাসা* (১৯৮৯), *তৃণা* (১৯৯৩) প্রভৃতি। *আরো দুটি মৃত্যু* (১৯৭০) **হাসান হাফিজুর রহমান** (১৯৩২-১৯৮৩)র একমাত্র ও বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। পল্লীর সাধারণ ঘটনা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশেষণ, ব্যক্তি মানুষের পরিশীলিত মননধর্ম, পরিচ্ছন্ন জীবনচিত্র উঠে আসে গল্পে। "আরো দুটি মৃত্যু" দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প। আধুনিক গদ্যে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় গল্পের শরীর নির্মিত। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা

প্রাঞ্জল ও সুগভীর মর্মস্পর্শী। অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী জীবনাদর্শ তার কাহিনিতে সুগ্রথিত। বাংলাদেশের গল্পধারায় এই একটিমাত্র গল্পগ্রন্থ লিখেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। **আফলাতুন** (জ. ১৯৩৪) পঞ্চাশ-ষাটের দশকে গল্প লিখেছেন। ভাষাভঙ্গি অনবদ্য। লেখকের একমাত্র গল্পের বই *অলৌকিক পাখি* (১৯৮৮)। এগারটি গল্পের সংকলন। নামগল্পটি ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের প্রেক্ষাপটে রচিত দুই নরনারীর জীবনের গল্প। গল্পভাষা মার্জিত, সরল শব্দ ও ছোট ছোট বাক্যবন্ধে পরিবেশিত। কিংবদন্তীর বিশ্বাসে অর্জিত হয়, অলৌকিক এক পাখিই তাদের জীবন বাঁচিয়ে দিল। নানা রকমের বৈচিত্র্যময় লেখকের অন্যান্য গল্পগুলো। সমকালস্পর্শী রচনা তাঁর। গল্পনির্মাণে স্বাতন্ত্র্য, অভিজ্ঞতা পর্যায়-অতিক্রমী। প্রধানত শিশুদের জন্য লিখেছেন। তিনি জীবনবাদের সত্যাসন্ধ পথিক। গল্পচরিত্র স্বকলাশ্রয়ী। পরিচর্যা তাঁর বহির্মুখি জীবনের, কাহিনি প্রত্যয়টিও সেখানেই। 'ধূসর বরণ পাখি' শিশুতোষ গল্পটির জন্য তিনি খ্যাতিমান। **আকবর উদ্দীন** (১৮৯৫-১৯৭৮) নাট্যকার হলেও তাঁর গল্পগ্রন্থ *অসমাপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য গল্প* । এগুলো তেমন জীবন উপজীব্য বা ফলদায়ক কোনো গল্প নয়। তবুও পথনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এসব গল্পের ভেতর দিয়ে বাঙালি মুসলমান গল্পজমিনটি স্পর্শ করতে পেরেছিল। নিছক একটি পরিকাঠামো রচনা বা বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ছাড়া এ গ্রন্থসমূহ কোনো তাৎপর্য বহন করে না। *তাসের ঘর* **বন্দে আলী মিয়া** (১৯০৬-১৯৭৯)র গল্প। জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার স্বরূপটি তুলে ধরার প্রয়াস আছে। তবে গল্পকথন উচ্চমানের হলেও পট দুর্বল, কাহিনিও গতানুগতিক। কাব্যময়তা বন্দে আলী মিয়ার গল্পে দুর্বলতা। **মুনীর চৌধুরী** (১৯২৫-১৯৭১) মূলত নাট্যকার হলেও গল্পও লিখেছেন। তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থ নেই। *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*তে 'নগ্ন পা', 'ফেডিং বটল', 'বাবা ফেকু', 'ন্যাংটার দেশে', 'খড়ম', 'একটি তালাকের কাহিনী', 'মানুষের জন্য' গল্পগুলো সংকলিত। মূলত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কার, সংস্কৃতি, জীবনবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের পরিধি। চেতনাগত দিক থেকে শ্রেণিচেতনাও তাঁর গল্পে তীব্রমাত্রা পায়। মেধাবী সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি তা গল্পের পটভূমিতেও স্পষ্ট। প্রকরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও তেজোদীপ্ত—বিশেষত ভাষাভঙ্গিতে। গল্পের বাকপটুত্ব মুগ্ধকর। **রাবেয়া খাতুন** (জ. ১৯৩৫) বাংলাদেশের গল্পকাঠামোর নিপুণ বুননি তাঁর পরীক্ষায় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গতানুগতিকতা থাকেই তাঁর গল্পে। আয়োজন ইনফর্মাল নয়। তেমন আকর্ষণও সৃষ্টি করে না। কারণ পুনরাবৃত্তি, অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের মাত্রাকে সুষ্ঠুরূপে চরিত্রে কায়েম না করা। বিষয়-নির্ধারণে তাঁর প্রাচুর্য আছে কিন্তু গল্প তৈরি হওয়া কিংবা প্রকাশশৈলির আড়ষ্টতা সেখানে অকার্যকর নয়।

রাবেয়া খাতুন তবুও অনেক বৈচিত্র্যময় গল্পের দ্রষ্টা। তাঁর গল্প: *মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী*, *আমার এগারোটি গল্প*, *নির্বাচিত ছোটগল্প* প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভূমিকাপর্ব

১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও এ প্রবহমান ধারায় অনেকেই গল্প লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ভেতরের ক্রোধ-দমন-পীড়ন-শোষণ-জ্বালাতন এসব বহির্দেশীয় বিষয় হলেও অন্তর্প্রদেশের ক্রন্দনধ্বনি, নিরাপত্তাহীনতা, দুশ্চিন্তার বিষয়গুলো ভয়াবহতায় ভাষাবন্দি হয়েছে। এজন্য কাহিনিকারদের চরম দুঃসময়ের মধ্যে থেকেও সংযত ও নির্লিপ্ততায় বাস্তবযুদ্ধের পটচিত্র অঙ্কন করতে হয়েছে। এজন্য নতুন ফর্মবিন্যাস আয়ত্ত করতে হয়েছে গল্পলেখকদের। তাঁদের এসব গল্পে প্রকৃতিও হয়ে উঠেছে রুক্ষ-ক্রূর-হিংস্র। তবে এমন বিষয় অবলম্বি গল্প লেখা শেষ হয়নি। যে মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনাদর্শে এবং তার ভেতর দিয়ে যে অর্জিত স্বদেশ—সেখানে মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখা শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লেখা চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম গল্প লেখে। পাঠ-অভিজ্ঞতায় প্রজন্মান্তরে এ বিষয়ক গল্প লেখা চলছে এবং চলতে থাকবে সন্দেহ নেই। এবং এ বিষয়টিও নিশ্চিত প্রজন্মান্তরের গল্পে যে মুক্তিযুদ্ধ আসবে তা আরও শিল্পিতরূপে ভয়ার্ত ও জটিল প্রকরণের। কারণ, প্রজন্মের প্রতিক্রিয়া সমকালকে ঘিরেই। সেখানে বিষয়টি যেমনই হোক না কেন!

বাংলাদেশের ছোটগল্প বিবর্ধিত হয়েছে স্বাধীন দেশ অর্জনের পর। অপার স্বাধীনতা-স্বেচ্ছাচারিতা-অনুকূল পরিবেশ গল্পকারদের নতুন জীবনের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকলেও ফলপ্রসূ কিছু হয়নি। বাস্তবতার সত্যটি যে কল্পফানুসে বন্দি হয় তা আকর্ষণীয় বা প্রাচুর্যপূর্ণ নয়। সত্তরের দশকে স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। সে কারণে বাংলা গল্পের মূলধারার অনুসারী গল্পকাররা স্বতন্ত্র ভিত্তিভূমি পেয়ে নিজেদের জন্মপরিচয়ে নতুন চাল ও রীতির অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে সক্ষম হন। সে চেতনাকে অধিকতর করে তোলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তির বিরূপ ও হীনস্বার্থ তৎপরতা। তারা ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে জাতিত্বের চেতনাকে মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য প্রাণবন্ত হয় সে অপতৎপরতাকে রুখে দাঁড়াবার ক্রিয়াকলাপে। কারণ, তার ভেতরেই নিহিত ছিল নিজের আত্মপরিচয় এবং প্রকৃত সাংস্কৃতিক চেতনার শক্তি। ফলে বাংলাদেশের ছোটগল্পের গোড়ার পর্বটিতে একদিকে যেমন আত্মস্থ হয় উদার অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক জীবনচেতনার স্বরূপটি অন্যদিকে তেমনি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সম্পৃক্ততার সূত্রটি। পূর্ব-বাংলার পূর্বোক্তদের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো লেখক সম্পৃক্ত হয়ে

পড়েন। সেখানে ক্রমাগত বাঙালি মুসলিম চেতনার স্বরূপ বা নিরঙ্কুশ মানব-বীক্ষার স্বরূপটি চিহ্নিত হতে থাকে। এরপর কয়েক দশকের বাংলাদেশের ছোটগল্পের যাত্রাপথ আরও বিপুল, বিশালায়তন। কারণ পাকিস্তানি শাসন থেকে গণমুক্তির প্রেক্ষাপট এবং মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছোটগল্পে যুক্ত হয়েছে অনেক বিষয়-আশয়, গল্পকারের দৃষ্টিচেতনায় এসেছে বিচিত্র বর্ণের পেশার ব্যক্তিমানুষ। বিবরণে, কথনে, নির্মাণে কুলপ্লাবী নিরীক্ষা যুক্ত হয়। অস্থিরতার বিশ্ব, 'একগ্রামে' বিশ্ব, একমুখি বিশ্ব এবং তার যুগযন্ত্রণা যুক্ত হয়েছে গল্পকারদের বীক্ষণে। রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ হয়েছে আরও দুঃখকাতর। জীবনযাত্রা, অবক্ষয়, হতাশা, নৈরাশ্য যেমন যুক্ত হয়েছে তেমনি আশা-স্বপ্নের পারাবতও রচিত হয়েছে। কর্পোরেট, পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বে বৈষম্য বেড়েছে, ভোগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যপরিবর্তন হয়নি। ক্রমাগত বর্ধিত জনপদে একদিকে প্রভুত্বের মাত্রা হয়ে উঠেছে নানামুখি, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র দাঁড়িয়েছে গণমানুষের বিপক্ষে তেমনি সচেতনতা ও বিবেকের পরিচর্যারও বিচিত্র উত্থান ঘটেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বতাণ্ডবকেও তৃতীয় বিশ্ব কম গ্রহণ করেনি। কারণ, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, মিডিয়া বিপব, মুঠোফোন ব্যক্তিমানুষের স্বরূপকে দ্রুততর পাল্টিয়ে দিয়েছে। ভেতরের ক্ষত, ক্রোধ, পাপ বেড়েছে। বৈষম্য, ভোগবাদ, পর্ণগ্রাফির তৎপরতা বাংলাদেশের সদ্য স্বাধীনতার সুফলের পথে হয়ে উঠেছে বিরাট বাধা। বিজ্ঞানমনস্ক না হয়ে বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যবহারে ব্যক্তি যেন যান্ত্রিক। ফলত তার উত্তাপেই ব্যক্তি আকণ্ঠ নিপতিত। এ অবস্থায় সত্তর-আশি-নব্বুইয়ের গল্পকাররা কী করবেন! তাঁদের দৃষ্টিচেতনা কীভাবে নির্মিত হবে? গল্পের প্রকরণই বা হবে কেমন? বাংলাদেশের ছোটগল্পের এ প্রকৃতিতে ইতিহাসের নির্মাতাই বা হবেন কারা? ইত্যাকার সব ব্যাখ্যায়নের বার্তায় আমাদের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর বাংলাদেশের গল্পের রূপরেখা নির্ণিত।

দুই.

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

গদ্যকথক হুমায়ূন আহমেদ। শক্তিশালী গল্পকার। *নন্দিত নরকে* (১৯৭৩) উপন্যাস হলেও স্বাধীন দেশে তিনি ধ্বনিময়, তরঙ্গময়, আবেগ-বিহ্বলতাকে তীক্ষ্ণধী করে প্রকাশ করেন এবং জননন্দিত হন। চমৎকার একটি গল্পভাষা আমরা পেয়ে যাই তাঁর শৈলিতে। বাংলাদেশের ছোটগল্পধারায় নিশ্চিতরূপে তিনি প্রভাবিত গল্পকার। অনেক গল্প লিখেছেন, প্রধানত মধ্যবিত্তই নির্মাণ করেছেন, বিচিত্রভাবে। তবে সমাজ-ভিত্তি তেমন জোরাল করেননি তাঁর গল্পে। দীর্ঘদিন লিখলেও গল্পবৃত্ত তাঁর

পাল্টায়নি, বৃত্তটি পৌনঃপুনিক। তবে অনেক গল্পের মধ্যে চকিত স্বর আছে কিন্তু বৈচিত্র্যও পর্যাপ্ত। হুমায়ুন আহমদের গল্পধারায় প্রভাব সৃষ্টিকারী গল্প থাকলেও উপন্যাসের আদলেই তা লক্ষণীয় পরিণতি পেয়েছে। তাঁর অনেক গল্পই নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। "খাদক", "চোখ" লেখকের অনেক শক্তিশালী গল্প। সংলাপময়তায় পরিবেশ সৃজন তাঁর গল্পের সম্মুখগামী গতি রচনা করে। হুমায়ুন আহমদের *গল্পসমগ্র* বের হয় ১৯৯১ সালে। *একটি নীল বোতাম*, *জীবনযাপন*, *খেলা*, *অসুখ*, *ফেরা* প্রভৃতি তাঁর গল্প।

আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬)

আল মাহমুদের প্রথম ছোটগল্প সংকলন *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫)। ব্যক্তির ভেতরে প্রতীকী গল্পবয়ান, অসম্ভব মায়াবী এ গল্প। এরপর *সৌরভের কাছে পরাজিত* (১৯৮৩), *গন্ধবণিক* (১৯৮৬), *প্রেমের গল্প* (১৯৯১), *ময়ূরীর মুখ* (১৯৯৪), *আল মাহমুদের গল্প* (১৯৯১), *গল্পসমগ্র* (১৯৯৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ যেমন অবলোকন করা যায় তাঁর গল্পে তেমনি অন্তঃস্রোতের বাস্তবতাও চিহ্নিত হয় সম্ভাব্য প্ররোচনায়। আল মাহমুদ পার্বত্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকেও গল্পে বুনেছেন। "উত্তর পাহাড়ের ঝরনা" এরকম একটি গল্প। 'আজ আমাদের বীজ বোনার রাত্রি। আজ থেকে পাহাড় পুড়িয়ে জুম বুনবো আমরা। তুমি বুনবে আমার শরীরে সন্তানের বীজ' আমাদের গল্পসাহিত্যে আল মাহমুদ এভাবেই জীবনের বীজ বুনে চলেন। তাঁর ভাষা কাব্যিক, যৌনতাআশ্রিত, প্রেমপ্লাবিত। কবির ধারাভাষ্য যেন এক ধরনের সংকট ও শৃঙ্খলার পুনর্নির্মিতি দেয় তাঁর এ সময়ের গল্পে।

রাহাত খান (জ. ১৯৩৯)

অন্তহীন যাত্রা (১৯৭৫)য় রাহাত খানের সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের "উদ্বেল পিপাসা" গল্পে অসুস্থ স্বামীকে রেখে স্ত্রী অন্যের নিকট সমর্পিত হয়েছে। নিজের যৌবন ও সময়কে সে অস্বীকার করেতে পারেনি। আর নামগল্পে কথকের বয়ানে জীবনের বিচিত্র বিষয় বর্ণিত হয়। সে যেন অন্তহীন যাত্রারই প্রবাহ। সাধারণ মানুষের বিচিত্র বিষয় নিয়ে রাহাত খানের গল্প। তাঁর অন্য গল্প : *অনিশ্চিত লোকালয়* (১৩৮০), *ভালো মন্দের টাকা* (১৯৮১), *আপেল সংবাদ* (১৯৮৩) প্রভৃতি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের যাত্রাপথে মোক্ষম সায়কক্ষেপণে লক্ষ্যভেদী গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তপ্ত শব্দগুচ্ছে উইট হিউমারের ঝাঁঝালো বাণ তুলে দেন তিনি। নিজের উদ্ভাবিত, স্বদীক্ষিত চিত্রপ্রতীকে শ্রেণিচেতনায় সোচ্চার তাঁর উদ্গত আঙ্গিক। এছাড়া তাঁর গল্পবিষয়ে ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্তের নষ্টস্বপ্ন কিংবা নিশিজাগর জ্যোৎস্নাপ্রলাপও উৎসবমুখরিত। ষাটের দিকে ইলিয়াস অন্তর্বৃত, সত্তরের পরে একেবারে বহির্মুখি; কারণ সমাজের পরিবর্তিত বাস্তবতা। রূপান্তরিত রাজনীতির তাণ্ডব। গদ্যটি এরূপেই পরিবর্তিত : 'বাঁধের পুবদিকে চাষের জমি, মাঝে মাঝে কলাগাছ ও ভেরেণ্ডাগাছ ঘেরা ছোটো ছোটো বাড়ি। এখানে ওখানে খাবলা খাবলা করে ফসলকাটা পাটখেত।... ওপারে মথুরাপাড়া ঘেঁষে নদীর গা একেবারেই এলিয়ে দেওয়া, কিন্তু এদিকে আসতে আসতে যমুনা তার কোঁকড়া কোঁকড়া ঢেউ ঝাঁকিয়ে নিজের সীমানাকে অস্বীকার করে।' তাঁর গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ, সামরিক শাসন, শ্রেণিশোষণ, ব্যক্তিমানুষ সংকটে উঠে আসে। ভূমি-মাটি অনুবর্তী প্রান্তিক মানুষ চিত্রিত হয় শক্তিশালী প্রকরণে। এক্ষেত্রে তাঁর শব্দবন্ধ, বাক্যবিন্যাস, আবহ নির্মাণ পরিকল্পিত, নিবিড় অভিজ্ঞতার সত্যসূত্রে গ্রথিত। ক্ষাত্র শাসন, ধর্মতন্ত্র, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা জীবনচরিতের ভেতরে গেঁথে তুলে যুক্তিতে তা অস্বীকার, অযৌক্তিক করে তোলেন। এজন্য কখনো আঞ্চলিক সংলাপ-ভাষা বা পেশা-অনুবর্তী শব্দভাষ্য নির্মাণ করে প্রকৃত বিশ্বাসী রূপটি কায়েম করেন গল্পের প্লটে। মুক্তিযুদ্ধও তাঁর গল্পে ব্যাপক মাত্রা পায়। বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীল রূপ তাঁর মধ্যবিত্ত বা বিত্তবান চরিত্রের মাঝে তটস্থ বা বিস্রস্ত থাকে। অপবিকশিত মধ্যবিত্তের অন্তর্যন্ত্রণা রাষ্ট্র-কাঠামোর অপহারী পরিবৃত্তে বন্দি। গল্পচরিত্ররা সে কাঠামোতেই ভাষা পায়। সেখানেই জীবনেই যাবতীয় সংক্ষুব্ধতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মঞ্জু, আতমন্নেসা, সমরজিৎ প্রভৃতি অনেক তটস্থ চরিত্র। গল্পপরিসর বিস্তৃত। অনেক সমস্যায় জর্জরিত। আঞ্চলিক ভাষার ভেতরে রচিত তাঁর চরিত্র প্রভূত মাত্রায় বিশালতা পায়; সেখানে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রেণিচেতনায় স্পর্শকাতর। তাঁর গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬), *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫), *খোঁয়ারি* (১৯৮৯), *দোযখের ওম্* (১৯৮৯), *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭)।

কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২)

প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্ধতীরন্দাজ* (১৯৭৮)। এরপর আটটি গল্প নিয়ে *লাশ কাটা ঘর* (১৯৮৭)। প্রতিরোধী দিন ও শঙ্কুল জীবনের চিত্রাঙ্কন তাঁর গল্প। স্মৃতিকাতরতা বা নস্ট্যালজিয়ার ম্যাটমেটে জিনিস তাঁর অপছন্দ। 'সমাজের জোড় না লাগা বিসদৃশ্য দিকগুলোকে জাজ্বল্যমান চোখের সামনে আনা' তাঁর গল্পের কাজ। নিশ্চিতই তাঁর

মেজাজ রাগী, অন্যাদের থেকে পৃথক-দৃপ্ত-ধারালো এবং প্রখর সংবেদনশীল। *অন্ধ তীরন্দাজ* গল্পগ্রন্থে মোট আটটি গল্প রয়েছে। এ গল্পগুলো ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে রচিত। এ দীর্ঘ সময়ের পালাবদল, বিপর্যস্ত জীবন, খুন, হত্যা, কালোবাজারি ইত্যাদি অন্ধকার জীবনের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেন তিনি। বাংলাদেশের ছোটগল্পের প্রকৃত পথটি তিনি চিনে নিতে পারেন—একটা সমাজমনকে আয়ত্তে এনে। উপন্যাস লিখলেও কায়েস আহমেদ গল্পেই স্বাবলম্বী এবং প্রখর জীবনদৃষ্টির প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

মঈনুল আহসান সাবের (জ. ১৯৫৮)
প্রথম গল্পগ্রন্থ *পরাস্ত সহিস* (১৯৮২)। *এরকমই* (১৯৯০), *ভিড়ের মানুষ* (১৩৯৬), *অরক্ষিত জনপদ* (১৯৮৩), *আগমন সংবাদ* (১৯৮৪), *চারদিক খোলা* (১৯৮৫), *স্বপ্নযাত্রা* (১৯৮৪) প্রভৃতি। "হন্তারক", "গ্রাস", "মুখোশ", "দুই বোন", "প্রাকৃতিক", "বৃত্ত", "জীবন যাপন" এসব গল্প নিয়ে *পরাস্ত সহিস* রচিত। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ ও সময় প্রতীকীরূপে গল্পে গ্রথিত থাকে। কিন্তু টানাপড়েন, নৈতিকতা, মানবীয় প্রবৃত্তি এমন এন্তার বিষয় চরিত্রকে ঘিরে জটিলতর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেখানে গল্পের নির্মাণও থাকে অত্যুচ্চ মাত্রার। নাগরিক জীবনের জটিল আবর্তের মুখসমূহ যেন গল্পে কুণ্ঠাহীন পরিকীর্ণ হয়ে ওঠে। তবে একরকমের চেনাজানা জগতই অন্যমাত্রা অর্জন করে কিন্তু সেখানে থাকে গভীর মূল্যবোধ। *নির্বাচিত গল্প* বের হয় ১৯৯৯ সালে।

মঞ্জু সরকার (জ. ১৯৫৩)
প্রান্তিক মানুষই তাঁর গল্পে উপজীব্য। এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার। সমাজ দায়ে তাঁর গল্প পরিচালিত। ভাষা বাস্তবানুগ, সমাজঘনিষ্ঠ। গ্রামের মানুষের সংস্কৃতি, শোষণ-নির্যাতন, দাপট, অহংকার সবকিছু দুর্বার গতিতে শিল্পভাষ্য দান করেন মঞ্জু সরকার। *অবিনাশী আয়োজন* (১৯৮২), *মৃত্যুবাণ* (১৯৮৫), *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৬), *উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা* (১৯৯০), *আনন্দ যাত্রা* (১৯৯৫), *অপারেশন জয় বাংলা* (১৯৯৭), *মঙ্গাকালের মানুষ* গল্পগুলো একেবারে মাটিবর্তী। উপর-কাঠামো নয়, ভেতরের স্বস্তি-হাহাকারকে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় উঠে আসে। গল্পের প্রকরণ শক্তিশালী। অভিজ্ঞতা বয়ান শুধু নয়, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের মর্যাদা ও বাঁচার প্রত্যয়টি অনিবার্য করে তোলেন। এজন্য এক ধরনের সমগ্রতা পরিব্যাপ্ত তাঁর লেখায়।

সুশান্ত মজুমদার (জ. ১৯৫৪)

সত্তরের দশকের গল্প সম্পাদনা করে সুশান্ত মজুমদার দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নিজের গল্পের জমিন পরিপক্ব, দূরবিস্তারী। 'দুই বছরের শুকনো বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এই প্রথম হাড্ডিসার সকিনা ঢাকায় অক্ষম বুড়ো শ্বশুর ইউসুফ আলী আকনের পিছন ধরে হাজির। স্বামী আনছার আলী আচমকা মরার আগে শহরের কত উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাই করল, বাড্ডার ওদিকে এক সস্তা মেসে মাথা গুঁজে দিন কাটাল একবারও সকিনাকে ঢাকায় আনেনি ... ঢাকায় থাকার চোয়াল চাপা কষ্ট, গোঁজামিল সকিনা বোঝে কেমনে!' গল্পের এমন এক্সপ্রেশানের পর "ফাটল" গল্পের সংবাদ কী হতে পারে—অনুমান করা যায়। কিন্তু সকিনার আশ্রয়-ভরসা-ভালোবাসা-সন্তান-নিরাপত্তা-অন্নসংস্থান তাঁরই বর্ণনা-উপমায় 'আকাশে ঘোলা নজর ভাসিয়ে বিড়বিড় করে', 'অভিমান গলিয়ে বিস্ময় ঢলে পড়ে' এসবে বাংলার প্রান্তিক, কঠোর মানুষের জীবনপ্রাণই ধরা পড়ে। আর বিপরীতে পরিহাস তৈরি হয় অট্টালিকাময়, বিভেদ-বৈষম্যের ভোগবাদের সিঁড়ি বেয়ে। এমন আঙ্গিক ও বিপুল নির্মাণ সুশান্ত মজুমদারের গল্পে। অসম্ভব সমাজ-ঘনিষ্ঠ এ গল্পকারের গল্প *রাজা আসেনি বাদ্য বাজাও* (১৯৮৪), *ছেঁড়াখোঁড়া জমি* (১৯৮৫), *শরীরে শীত ও টেবিলে গুণ্ডাপাণ্ডা* (১৯৮৮), *জন্ম-সাঁতার* (১৯৯৮)। এসব গল্প গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তনের অঙ্কিত রূপ। সুশান্ত মজুমদার নিখুঁত পরিদর্শনে নামেন চরিত্রের; যেখানে সমাজ রুগ্ন, জীবন-জীবিকা জরাজীর্ণ, আশঙ্কা-অনিশ্চয়তার পুনরাবৃত্তি দৃঢ়তর। এরূপ বিষয়সমূহ অঙ্কনে নিজস্ব ভাষাশৈলি তাঁর অর্জিত। যেখানে সমাজকে ঘিরে এক রকমের শিল্পিত সংশোধন থাকে, আর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দাপটে অস্থির-অচঞ্চল আবহে নিপতিত থাকে গোটা প্রতিপার্শ্ব। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার সুশান্ত মজুমদার। কারণ গল্পধারার চেতনাগত স্বরূপে তিনি সমাজ-আরাধ্য আর ঐ বাস্তবতার কেন্দ্রে তাঁর জীবনবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত।

আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪)

কবিস্বভাবে প্রান্তবর্তী মানুষের গল্প বলেছেন আবুবকর সিদ্দিক। কিন্তু কাহিনি গতানুগতিক নয়, প্রান্তস্পর্শী, অন্তর্বাস্তবতায় ঋজু, দৃঢ়প্রস্তাবনায় প্রদীপ্ত, রেপিকা ঝলমলে। দুর্বিনীত তাঁর ভাষ্য। গল্পগ্রন্থের নামেও সে প্রকাশটি নিহিত। 'কাহিনীর সূচনাপট বাদার গাঘেঁষা চর এলাকা। এই সব দুর্গম চর যেমন দুর্ভেদ্য বনে আকীর্ণ, তেমনি দুস্তর নদীখালে বিদীর্ণ। বনের স্তরে স্তরে আদিম রহস্যের জাল'—এভাবে শুরু হলে পটচিত্র যেমন অনুমেয় হয়ে ওঠে তেমনি প্রাপ্ত চরিত্র, তার উত্তরণ, কোমলে-কঠোরে আরূঢ় রূপ অস্পষ্ট থাকে না। অন্তর্মুখি প্রবণতায় ব্যক্তি—কিন্তু সে ব্যক্তি ভুঁইফোঁড় নয়, রাজনীতি পরিস্রুত, শ্রেণিচরিত্র

সংজ্ঞার্থপ্রসূত। কিন্তু প্রবলরূপে জীবনবাদী, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষায় জঙ্গমী। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়ান না আবুবকর সিদ্দিক, 'ভূমিহীন দেশ' বলার পর *ছায়াপ্রধান আঘ্রান* দুর্দান্তরূপে অতিক্রমী। একেবারে মেজাজে, প্রতীক্ষায়-পরিবর্তনে আলাদা। গল্প ইতিহাসে এর পর তাঁর স্পর্শ 'হংসভাসীর তীর' এবং 'কালোকুম্ভীর'-এ। পরিষ্কার তাঁর এনিকডৌট সেটিই ভাষাকে ক্ষেপে তোলে। টেলিংও থাকে প্রস্তুত। গল্পকারের কবিকামনায় মানুষ নিছক দৃশ্যপটের বাতাবরণে থাকা নয়; তা একেবারে ভেতরের দুর্দান্ত, অনিরুদ্ধ-অনিমেষ বাস্তবতায় ইঙ্গিতবহ মাত্রা অর্জন করে। ফলে তার তাপানল নির্ধারিত থাকে—তির্যক ব্যঙ্গ, শ্লেষ, রঙ্গ কিংবা পরিহাসপ্রিয়তায়। আবুবকর সিদ্দিকের এ শুদ্ধ ও শালীন প্রবণতা সমাজ উপযোগিতা, পেশা ও উৎপাদন-সম্পর্কের নিরিখে। তাঁর মনস্তত্ত্ব রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিত সামগ্রিকতায়; উচ্চারণে দূরসঞ্চারী। সর্বোপরি লেখকের গল্প 'হয়ে-ওঠা'র পর্বটি জীবনদৃষ্টিতে; তবে অনেক গল্পের পরে তাঁর অভিজ্ঞতা কি দুর্বল হয়ে পড়ে! কারণ, জানি; সব অভিজ্ঞতা তো গল্প নেয় না, ধারণ করতে চায় না সবরকমের বর্ণিত স্মৃতিভাষ্য; আবার নিবিড় অভিজ্ঞতা ছাড়া গল্প হয় না। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের ক্ষুৎকাতর, ক্ষুণ্নিবৃত্তির ব্যক্তি যেমন ধরা পড়ে তেমনি ভুঁইফোঁড় কুৎসিত, নীতিভ্রষ্ট, স্বার্থসার চরিত্রও লক্ষণীয়। শিল্পিজগতে রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্ররা যাবতীয় অনাচার ও তোষণ শক্তিকে লালন করে, বিভেদের দিকে উস্কাতে থাকে। এতে করে সমাজে চিরস্থায়ী বৈষম্য ও বিচার-আইনের নির্বিচার রাজত্ব চলতে থাকে। সেজন্য সর্বস্তরের বা সর্বদৈশিক কাঠামোতে বাস্তবতা বন্দি হয়। ইউনিভার্সিটির হল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁবেদারি আর দাসত্বের পর্যাবৃত্ত রচিত হয়। তাঁর *ভূমিহীন দেশ* (১৯৮৫), *মরে বাঁচার স্বাধীনতা* (১৯৮৭), *চরবিনাশকাল* (১৯৮৭), *কুয়ো থেকে বেরিয়ে* (১৯৯৪), *ছায়াপ্রধান আঘ্রান* (২০০০), *কান্নাদাসী* (২০০৬), *বামাবর্ত* (২০০৭), *মুক্তিলাল অভ্যুদয়* (মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প) (২০০৮), *কালোকুম্ভীর* (২০০৮), *হংসভাসীর তীরে* (২০০৮), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (২০০৭), *গল্পসমগ্র* ১ম খণ্ড (২০০৮)।

সম্পাদনা করেছেন : *বাংলাদেশের সমকালীন গল্প* (২০০৬)

শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮)

অতীত-বর্তমান কিংবা বিবর্তন-আবর্তনের টানাপড়েনে ক্রমশ বিস্তৃত হয় ঘটনাপ্রবাহ; আর গল্পে যুক্ত হয় নানামুখি জটিলতা। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ তথা রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র ব্যক্তিসর্বস্ব করে তোলে 'আকালু-টেপি'র জীবনকে। তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয় সংস্কার-কুসংস্কার-বিশ্বাস-অবিশ্বাসসহ যাবতীয় আচ্ছন্নতা। তীক্ষ্ণ শেষে-বিদ্রূপে পরিহাসময় হয়ে ওঠে ভূমিহীন, পরবাসী চরিত্রেরা। শহীদুল

জহির চরিত্র-মনস্তত্ত্বের জটিলতার বাইরে প্রতিরোধী সমাজ-সংসার, আচার-অনিবার্যতায় এক রকমের যাদু-বাস্তবতাধর্মী প্রকরণ তৈরি করেন। গল্পশরীরে বহিরাশ্রয়ী কাহিনিতে রাষ্ট্র-কাঠামোর বিবিধ বিষয় যেমন আইন-আদালত-থানা কিংবা সমাজের প্রতিভূ-প্রতাপশালীরা শেকড়হীন-বাস্তুহীন মানুষদের যেন অদ্ভুদ নিয়তির নির্মম বৃত্তে আবদ্ধ করে—যেখানে 'দাঁড়কাক' বা 'ডুমুর', 'ডলু নদী' সাবলীল প্রতীক পেয়ে যায়। জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বপ্ন-বাসনার সঙ্গে জড়িয়ে যায় অবাস্তব, অসাড় এসব প্রতীক। কিন্তু তারাই জীবনের জন্য হয়ে ওঠে অনিবার্য কখনও বিপুল মাপের ভয়ঙ্করেরও। দৃশ্যমান অবয়বে সেগুলো কখনো বিকৃত বা অসুন্দরের প্রতীকায়ন পেলেও হয়ে ওঠে সময় বাস্তবতার অনির্বাণ এক অনুপম শিল্প। সেখানে শহীদুল জহিরের ভাষা দ্যুতিময়; নির্মিত বিরাট কাহিনিভূমে বিশেষ কোনো কিছু তা ছাপিয়ে ওঠে না। হয়ে ওঠে সমাজ ও সময়ের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচিত্র :

> ভূতের গলির লোকদের কাছে তখন আব্দুল করিম এবং তার ময়মনসিং যাওয়ার প্রসঙ্গের চাইতে শেফালি প্রসঙ্গ বড় হয়ে ওঠে, দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ও ভূতের গলির এই মহল্লায় লোকদের দিন উত্তেজনায় ভরে যায়, হালায় প্রেম করে নিহি, তারা বলে। রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা বিছানায় জেগে থাকে, জীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় বোধ তাদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তারা কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে, তাদের মনে হয় যে, বেকার থাকাই তো ভালো আব্দুল করিমের মতো।

কুহকী শব্দের মায়ার ভেতরে আব্দুল করিম কোন গন্তব্যের তা ঠিক হয় না। তবে অনেক দূরসঞ্চারী তাঁর সে গল্প; ক্যানভাসে স্বচ্ছরীতির তুলির আঁচড়ে প্রান্তিক, নিম্নবর্গের মানুষ বজ্রগর্ভ ব্যঞ্জনা পায়। কোনোকিছুই যেন শূন্যগর্ভে মিলায় না। তাঁর চরিত্ররা একই সঙ্গে বাস্তব-পরাবাস্তবের মধ্যিখানে এক অনিশ্চিত জগতে চলাফেরা করে। চরিত্ররা যেমন অনিশ্চিত তেমনি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। শহীদুল জহিরের ভাষার বুননিতে বিমূর্ত স্তরটি সৃষ্টি করেন—যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির বিমূর্ত সম্পর্ক গভীর দ্যোতনায় এক নিহিতার্থে পর্যবসিত। মানব চরিত্রের অন্তর্জগতের পরিবেশনায় ক্রমশ পূর্ণতর অধিষ্ঠিত তিনি তাঁর রচনায়। *পারাপার* (১৯৮৫), *ডুমুর খেকো মানুষ অন্যান্য গল্প* (২০০০), *ডলু নদী হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪) তাঁর গল্পগ্রন্থ।

হরিপদ দত্ত (জ. ১৯৪৭)

সাহিত্যের সমাজ-অন্বেষী ধারায় হরিপদ দত্ত কৃতী লেখক। উপন্যাসের মতো গল্পেও শোষক প্রতীকরূপে ‘অজগর’, ‘বাজপাখি’র আবেশ পরিলক্ষিত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র এবং তার ক্রিয়াশীল দাপট নিষ্পেষণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছায়। গ্রামের বুকভরা স্বপ্ন-সংসারের গল্প শুরু হলেও ক্রমশ হরিপদ দত্তের চরিত্ররা বিপন্নতার দিকে এগুতে থাকে। এরূপে অর্থ-সংকোচ ঘটতে ঘটতে একসময় অর্থহীন-বিত্তহীন-ভূমিহীনে পরিণত হয়। সেখানে কুচক্রী হিসেবে কর্মমুখর চেয়ারম্যান মেম্বার কিংবা ভুঁইফোঁড় পুঁজিপতি। তীব্র উপমায় গল্পভাষায় ব্যঞ্জিত হয় উভয়প্রকার শোষক ও শোষিত চরিত্র। গল্প-নির্মাণে হরিপদ ব্যক্তিচরিত্রের অতীত-বর্তমানকে ভবিষ্যতের মুখোমুখি করান। ভূমিলগ্ন মানুষের ভূমিছাড়ার ইতিহাস, বিত্তহীনের প্রতিভূ হবার কাহিনি তাঁর গল্প। কিন্তু লক্ষণীয় হরিপদ গল্প ছাড়েন না। গল্পে ঘ্রাণ থাকে বহমান তাঁর ভাষায়। নামকরণেও মেলে। তবে গল্পের পুনরাবৃত্তির প্রবণতা আছে। সেটি একেবারে ভেতর কাঠামোতে—যেটা উৎরে যেতে সক্ষম হন লেখক দারুণ স্ফূর্তিময়, আবেগরঞ্জিত কার্যকর ভাষার গুণে। হরিপদ দত্তের আবেগ গল্পভূমিকে উর্বর করে তোলে—সেখানে বিজ্ঞানচেতনার উদ্দীপনাময় তৎপরতার বিপরীতে যাবতীয় কুসংস্কার-ভীতিকে জলাঞ্জলি দিতে চান লেখক। কূটাভাষ কিংবা ব্যঙ্গ দ্রুত পৌঁছায় বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষগুলোর বিশ্বাস ও করুণার নির্মমতার সাক্ষী হিসেবে। তাঁর গল্পগ্রন্থ *সূর্যের ঘ্রাণে ফেরা* (১৯৮৫), *একটি পুরাতন উর্দি* (১৯৮৮), *কালবেলার গল্প* (২০০৫), *গল্প সমগ্র* (২০০৫) প্রভৃতি।

নাসরিন জাহান (জ. ১৯৬৪)

নাসরিন জাহান আশির গল্পকার। তাঁর গদ্য বর্ণনার, আবেগের, প্রতীকী প্রাচুর্যের। অ্যাবসার্ড চেতনা কাহিনিতে বুনে দেন। কখনও তৈরি করেন উদ্ভট কুহকী পরিবেশ। আলো আর রঙের বিচিত্রতায় জীবনের অভিমুখকে চিহ্নিত করতে চান। বয়নে আসে ভিন্ন প্রতিজ্ঞা। বিমূর্ততায় ব্যক্তিচিহ্নিত স্বরূপ—উত্তর-উপনিবেশি শোষণের অভিব্যক্তরূপে। তবে নারীর স্বর বা লৈঙ্গিক প্রসঙ্গ আরোপিত নয়—পূর্ণায়ত নিরপেক্ষ ভঙ্গির এক নৈর্ব্যক্তিক গল্পকার। গল্পকৌশলে মুন্সীয়ানা আছে, বর্ণনার ভেতরে ঝাপটায় প্রকৃতির ডানা, ঘটনার ভেতর দিয়ে নির্মাণ চলে জীবনের—কখনও ব্যক্তিমানুষের। নাসরিন গল্পগুলোতে নিজেকে প্রসারিত করেন; সেখানে সমাজ-রাষ্ট্র কিংবা কোনো সংঘাতের চেয়ে বেশি থাকে মধ্যবিত্তের মাখানো সেন্টিমেন্ট বা আবেগ। গদ্যবর্ণনায়ও বরাবরই এক্ষেত্রটিই পরীক্ষা-অবতীর্ণ তাঁর নিকট। জীবনের অন্ধি-সন্ধির নানাবিধ পর্যায়ের সম্ভাবনার চিত্রটি ধরার চেষ্টা আছে তবে একেবারে গভীর কিংবা অপাপবিদ্ধ হয়ে ওঠেন না তিনি। শক্তিশালী ভাষ্য হলেও সন্দিগ্ধতায় অনভিজ্ঞতা বা গভীরতা দুর্নিরীক্ষ নয়। সেজন্য

বর্ণনার পুনরাবৃত্তি আসে কখনও মনে হয় কাঠামোটি পুনর্বার পরিচালিত। তবুও অনবদ্য এ লেখক অনেক সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক। বিশেষত প্রতীক-নির্বাচনে কিংবা পরা-বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের কথাসাহিত্যে তিনি প্রোজ্বল বলা চলে। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *স্থবির যৌবন* (১৯৮৫), *বিচূর্ণ ছায়া* (১৯৮৮), *সূর্য তামসী* (১৯৮৯), *পথ, হে পথ* (১৯৮৯), *সারারাত বিড়ালের শব্দ* (১৯৯১), *আশ্চর্য দেবশিশু* (১৯৯৫), *পুরুষ রাজকুমারী* (১৯৯৬), *সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে* (১৯৯৭), *এলেন পোর বিড়াল* (২০০৬), *নারীবাদী গল্প* (২০১০), *ছেলেটি যে মেয়ে মেয়েটি তা জানে না* (২০১০) প্রভৃতি।

শাহরিয়ার কবির (জ. ১৯৫০)

শাহরিয়ার কবির প্রধানত রাজনৈতিক গল্পকার। রাজনৈতিক সংগঠন এবং তত্ত্বকে তিনি আরোপ করেন। বামপন্থা রাজনীতির মত এবং পথ, সেখানকার ভেতরের দ্বন্দ্ব-দ্বিধা, লক্ষ্য অর্জনের জটিল বিষয়সমূহ তার গল্পের প্রতিপাদ্য। তবে গল্পের চরিত্ররা এখানে আকর্ষণীয়। প্রবণতায়, দৃঢ়তায়, শোষণমুক্তির প্রচেষ্টায় এক ধরনের বার্তা থাকে তাঁর লেখায়। শাহরিয়ার কবির সমাজ-উৎপাদন সম্পর্কের সূত্রটিও দেখান। প্রধানত মধ্যবিত্ত চরিত্রচেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর গল্পের প্লট গড়ে ওঠে। *একাত্তরের যীশু* (১৯৮৫), *মহাবিপদ সংকেত* (১৯৯০), *জনৈক প্রতারকের কাহিনী* (১৯৯৬) প্রভৃতি তাঁর গল্প। কিশোর গল্প : *আবুদের এ্যাডভেঞ্চার* (১৯৮২), *মিছিলের একজন* (১৯৮৮), *নিশির ডাক* (১৯৯০), *চীনা ভূতের গল্প* (১৯৯২) প্রভৃতি।

হারুন হাবীব (জ. ১৯৪৮)

হারুন হাবীব কমিটেড গল্পকার। মুক্তিসংগ্রামের চালচিত্র রচনা করেছেন তাঁর গল্পে। স্বদীক্ষিত চেতনায় গল্পআবহে যুক্ত করেন বিবিধ জীবন সংগ্রামের তরঙ্গসঙ্কুল বার্তা। প্রধানত তাঁর গল্পে রক্তলাল অভিজ্ঞতাই বেশি কায়েম হয়। তবে হারুন হাবীব জীবনের বিচিত্র বিষয়কে আরাধ্য করেন। সমাজের নানা অসঙ্গতিকে তিনি তুলে ধরেন। এছাড়া যেমন প্রতিরোধী চিন্তা, প্রেম, ঐতিহ্যিক সংস্কার-মূল্যবোধের বিষয়গুলোও তাঁর লেখায় বিদ্যমান। কথাকার হারুন হাবীব এখন প্রতিষ্ঠিত, এমনটা বলা যায়। মধ্যবিত্ত প্রেম-প্রকৃতির বিন্যাসে, ব্যক্তির আচরণগত সংকট ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণে তাঁর চিন্তা একটা দার্শনিক ভিত্তি পায় গল্পে। হারুন হাবীবের গল্প *বিদ্রোহী ও আপন পদাবলী* (১৯৮৫), *লালশার্ট ও পিতৃপুরুষ* (১৯৮৫), *অন্ধ লাঠিয়াল* (১৯৯৯), *স্বর্ণপক্ষ ঈগল*, *গল্পসপ্তক* প্রভৃতি।

তিন.

মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮)র মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) ও *নির্বাচিত গল্প*। ১৯৯৯-এ বেরোয় *নির্বাচিত গল্প*। পরে ২০১০-এ আবু হেনা মোস্তফা এনামের সম্পাদনায় বের হয় *অগ্রন্থিত গল্প।* বাংলাদেশের গল্পে সবচেয়ে শক্তিশালী ও আধুনিক গল্পকার মাহমুদুল হক। মধ্যবিত্তের জীবন তাঁর গল্পে আরাধ্য। ভিন্ন বাকপ্রতিমায় তিনি সবশুদ্ধ শিল্পঋদ্ধ। ব্যক্তিচরিত্রের বিচিত্রমুখি কাঁটাছেঁড়া আর তা সম্ভাব্যতার সমগ্রে নিয়ে যাওয়াই তাঁর শিল্পরথ। তুচ্ছ জিনিসকে বিরাটে পৌঁছান, অনিকেত স্বভাব, পারস্পরিক স্বার্থান্ধ রূপ, দ্বিধা-দোলাচলতা অপূর্ব ভাষ্য পায়। এটি আমাদের সাহিত্যে বিরল বিষয়। তবে গল্পের চেয়ে উপন্যাসের ফর্মে তিনি বেশি আগ্রহ-উদ্দীপক। নির্বাচিত গল্পের প্রতিটিই বর্ণনাভাষ্যে উজ্জ্বল। মধ্যবিত্তের আত্মমুখি, আত্মলীন চরিত্র পরিচর্যার জন্য মাহমুদুল হকের যে আয়োজন তা প্রশংসনীয় এবং স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল। কয়েক দশকের গল্পচর্চায় **জুলফিকার মতিন** (জ. ১৯৪৬) সমাজ দায়বোধের অঙ্গীকারে গল্পশরীরে যুক্ত করেন সমকালকে; সমকালের রাজনীতিকে। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পে আছে বিদ্রূপের কষাঘাত; পরিহাসপ্রিয় জীবনের বিস্ময় ব্যাকুলতা আর জীবনরসিকের মগ্ন মূল্যায়ন। তবে তাঁর কথনে জীবনের দুর্মর আকুতি থেমে থাকে না কোথাও। মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়া, প্রেম চিরকালীন সম্পর্কসূত্রের মতো গেঁথে যায় গল্পের ছত্রে ছত্রে। দুরন্ত গতিময় কাহিনিভাষ্যে জীবনের যাবতীয় বাকবিতণ্ডায় এক রকমের উত্তেজনাতেই গল্পপাঠ শেষ হয়। সুনিপুণ এ ভাষ্যকারের লেখায় প্রান্তিক মানুষের পর্বটিও অনুচ্চ নয়। জানতে হয় প্রবৃত্তির খেলায়ও তিনি অকুণ্ঠ। সমাজজীবনের অন্ধকার দিকগুলোয় আলো পড়ে তাঁর গল্পে। অনেককিছু হয়ে ওঠে রহস্যময়, প্রশ্নবিদ্ধ। তবে শেষ পর্যন্ত জীবন একটা শ্রেয়োবোধেই উচ্চকিত তাঁর ভাষ্যে। জুলফিকার মতিনের গল্পগ্রন্থ : *রাখ তোমার উদ্যত বাহু* (১৯৯৯), *পাগল হবার রূপকথা* (১৯৯৯), *আকাশ বাসর* (১৯৯৯), *অন্যরকম* (২০০০), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০০১), *অন্ধকারের জন্তুরা* (২০০৭)। **আবদার রশীদ** (জ. ১৯২৮) প্রথম পুরুষে ব্যঙ্গ ও রঙ্গরসের আয়ত্তে তাঁর গল্প *নানান রঙ্গ* (১৯৭৩) ও *রঙ্গ ষোড়শী* (১৯৭৫)। গল্পে ভিন্ন রীতির প্রবর্তক। মেধাবী, দৃঢ়প্রযত্ন গল্পকার। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্র তাঁর গল্পগাত্রে নিহিত। ব্যক্তিত্বস্পর্শী গল্পগুলোতে সমাজ-দ্বন্দ্ব, সঙ্গ-অসঙ্গতি, হিউমার সমানভাবে উপস্থিত। তবে খুব কম লিখেছেন তিনি। এ ধারাটি এখন রুগ্ন, অবসিতপ্রায়। **সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্** (১৯৩৩-১৯৯৮) প্রধানত কবি। কিন্তু গল্প দিয়ে শুরু। একমাত্র গল্পগ্রন্থ *বুধবার রাতে* (১৯৭৩)র মধ্যে দশটি গল্প রয়েছে। গল্পগুলো ষাটের প্রেক্ষাপটে রচিত। যদিও গ্রন্থ প্রকাশ স্বাধীনতা-উত্তর কালে। গল্পগুলো সামগ্রিক বিচারে এক ধরনের অবরুদ্ধ, অপশাসন,

অপবিকশিত মধ্যবিত্তের কৃশ চেতনা, অসহায়ত্ব, অস্বাভাবিক, শৃঙ্খলাহীন পরস্পরাবিস্রস্ত কালের ছবি উঠে আসে। 'রিক্সার পেছন ধরে লোকটা যেভাবে টান দিয়েছিলো তাতে ছিটকে পড়বার কথা। রিক্সাওয়ালাও বেকুব আমিও বেকুব'—এভাবে "বুধবারের রাতে" শুরু। এরপর আত্মকথনে গল্পের অগ্রযাত্রা। ভঙ্গিটি আধুনিক। নগর মধ্যবিত্তের মনোজগতের কোণগুলো স্পর্শ করে। তাঁর প্রায় গল্পেই যে অন্ধকার রাত্রির পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায়—সেখানে অবক্ষয়িত, অপ্রকৃতিস্থ , বিকৃত চরিত্রগুলো যেন সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতির প্রকৃত চিত্রকেই তুলে ধরে। গল্পে বিদ্যমান শেষ, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ ও নির্মম-দুরূহ মন্তব্য পরিলক্ষিত। প্রচণ্ড উত্তেজনাময় এসব গল্প মূলত অব্যবস্থিত অন্তর্যন্ত্রণাকেই তুলে ধরে। **বেগম মুশতারী শফী** (জ. ১৯৩৮) বৈচিত্র্য ও সামর্থকে প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখায়। গল্পভাষা ঋজু, জঙ্গমী। বিষয়-অভিজ্ঞতা কম হলেও গল্পভাষ্য দুর্বল নয়। *দুটি নারী একটি যুদ্ধ* (১৯৭৩), *শঙ্খচিলের কান্না* (১৯৮৩), *জীবনের রূপকথা* (১৯৮৪), *এমনও হয়* (১৯৮৫) এসব গল্পে জীবনপ্রবাহের একটা স্বরূপকে তিনি চিহ্নিত করেন। **শহীদ আখন্দ** (জ. ১৯৩৫) জীবনরসিক গল্পকার। বাংলাদেশের গল্পে যুক্ত করেছেন নবতর আঙ্গিক ও ধারার। *জনতায় নির্জন* (১৩৮০ বাং), *অনিবার্য বান্ধব* (১৯৭৯), *যখন পারি না* (১৯৮২), *হাল্কা হাসির গল্প* (১৯৯৬) গল্পগ্রন্থে জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে প্রকাশ করেছেন। আত্মচিন্তার স্বরূপই তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে বেশি। তবুও গৃহীত পাত্র-পাত্রী আকর্ষণীয়। এছাড়া *শহীদ আখন্দের সরস গল্প* (১৯৮৬) বেরিয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এ গল্পকারের নিজস্ব শৈলিও তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিনের গল্প-পরিচর্যায় **খালেদা এদিব চৌধুরী** (১৯৩৯-২০০৮)র গল্পের মেসেজ জীবনের বৈচিত্র্য থেকেই রচিত। তবে কিশোর গল্পেই তাঁর প্রাচুর্য ও সাফল্য বেশি। *অন্য এক নির্বাসন* (১৯৭৬), *জন মনিষ্যির গল্প* (১৯৮২), *পোড়ামাটির গন্ধ* (১৯৮৫) প্রভৃতি তাঁর গল্প। বোধ ও বিবেচনার একটা রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর গল্পে। তাঁর কিশোর গল্প : *অন্তর বন্ধু* (১৯৮১), *বুবুর জন্য সারা দুপুর* (১৯৮৩), *শীতের দিনরাত্রি* (১৯৮৭) প্রভৃতি। **মাফরুহা চৌধুরী** (জ. ১৯৩৪) অনেক অনুরাগী গল্পকার, দীর্ঘদিন গল্প লিখে চলেছেন কিন্তু অনেক গল্প লিখলেও বৃত্ত ভাঙতে পারেননি। পুনরাবৃত্তি আছে, গল্পভাষা দৃঢ় নয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *অরণ্যগাথা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৭৬), *কোথাও ঝড়* (১৯৮০), *স্খলিত নক্ষত্র* (১৯৮১), *বিমূর্ত বৃত্তে* (১৯৮৪), *বিদীর্ণ প্রহর* (১৯৮৩), *নিঃশর্ত করতালি* (১৯৮৪), *মাফরুহা চৌধুরীর প্রেমের গল্প* (১৯৮৬), *শব নিয়ে বসবাস* (১৯৮৭), *ছায়া পথের মানচিত্র* (১৯৮৮), *মাফরুহা চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প* (১৯৯০) প্রভৃতি। **ইমদাদুল হক মিলন** (জ. ১৯৫৫) উপন্যাস লিখেই সফল হয়েছেন। তাঁর গল্পে উপন্যাসের জীবনেরই পুনরাবৃত্তি। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের রোম্যান্টিক প্রেম ও রোম্যান্স তাঁর লেখায়

প্রতিফলিত। তাঁর ভাষায় আছে গল্পবলার ক্ষমতা। গল্পকাঠামোতে অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য কম, সে কারণে জীবন বৈচিত্র্যময়রূপে পরিবেশিত হয় না। ইমদাদুল হক মিলনের গল্পগ্রন্থ : *ভালোবাসার গল্প* (১৯৭৭), *নিরন্নের কাল* (১৯৭৯), *প্রেমের গল্প* (১৯৮৩), *হে প্রেম* (১৯৮৩), *ফুলের বাগানে সাপ* (১৯৮৩), *বালিকারা* (১৯৮৩), *আহারী* (১৯৮৪), *তোমাকে ভালোবাসি* (১৯৮৫), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৮৫), *বাছাই গল্প* (১৯৮৬), *তাহারা* (১৯৮৬), *মর্মবেদনা* (১৯৮৮), *প্রেম নদী* (১৯৮৮), *প্রেমিক প্রেমিকা* (১৯৮৮), *বারো রকম মানুষ* (১৯৮৮), *ভালোবাসার নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৯), *যদি জানতে* (১৯৯০), *প্রেম ভালোবাসা* (১৯৯০), *ভালোবাসা* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯০), *গোপন দুয়ার* প্রভৃতি। **হাসনাত আবদুল হাই** (জ. ১৯৩৯) কথনভঙ্গি দৃঢ় ও ঋজু। হাসনাত আবদুল হাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাজ সম্পর্কসূত্র বয়ান করেন। ব্যক্তিচরিত্রের আবেগ, অনুভূতি, ক্ষেদ, সংশয় বিচিত্ররূপে সম্ভাব্য করে তোলেন তাঁর রচনায়। আধুনিক জীবনভাষ্যে হাসনাত আবদুল হাই বাংলাদেশের গল্পশৈলিতে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *একা এবং একসঙ্গে* (১৯৭৭), *যখন বসন্ত* (১৯৭৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৯), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪)। অনেক দীর্ঘ সময় গল্প লিখে চলেছেন **জুবাইদা গুলশান আরা** (জ. ১৯৪২)। তাঁর গল্প *কায়াহীন কারাগার* (১৯৭৭), *বাতাসে বারুদ রক্তে নিরুদ্ধ উল্লাস* (১৯৮৬), *হৃদয়ে বসতি* (১৯৮৯)। বাস্তব প্রতিকৃতি দুর্বল তাঁর গল্পে। বর্তমানে প্রায় অন্তর্হিত। তবু স্বাধীনতা-উত্তর গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন, তাঁর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার স্বরূপটি তিনি তুলে ধরেন। তাঁর গল্প আশান্বিত সময়ের স্বরূপকেই চিহ্নিত করে। **মকবুলা মনজুর** (জ. ১৯৩৮) শক্তিশালী গল্পকার। গল্পকথনে তিনি নিরঙ্কুশ। প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র উপাদান তাঁর গল্পে থাকলেও কাহিনিপ্রবাহে এক রকমের আবেগকে তিনি ধারণ করেন যা সততা এবং সংযমের ভেতর দিয়ে পরিস্রুত হয়। স্মার্ট তাঁর কথনভঙ্গি। দীর্ঘ পরিচর্যায় তিনি বাংলাদেশের গল্পে একটি শৈলি অর্জন করে ফেলেছেন। যেখানে কোনো কৃত্রিমতার বিষয় নেই, হয়ে উঠেছেন স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। মকবুলা মনজুরের কিশোর গল্পগুলোও আকর্ষণীয়। *সায়াহ্ন যূথিকা* (১৯৭৮), *শকুনেরা সবখানে* (১৯৮৯), *নক্ষত্রের তলে* (১৯৮৯), *মকবুলা মনজুরের প্রেমের গল্প* (১৯৮৯), *একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯১), *দিনরজনী* (১৯৯৩) প্রভৃতি তাঁর গল্প। *মকবুলা মনজুরের বাছাই গল্প* বের হয় ১৯৯৯ সালে। তাঁর **ছোটদের কিশোর গল্প :** *রঙিন মাছ* (১৯৮২), *অপূর্ব উপহার* (১৯৮২), *নদীর ওপারে মেলা* (১৯৮৬), *কিশোর মহাভারত* (১৯৮৭), *সূর্য কিশোর* (১৯৮৮), *নির্বাচিত কিশোর গল্প* (১৯৮৯), *ছোট ছোট রূপকথা* (১৯৮৯) প্রভৃতি। **সাদেকা শফিউল্লাহ** (জ. ১৯৩৬) দীর্ঘ কয়েক দশকের গল্পচর্চায় তিনি স্বগুণে মহিমান্বিত। প্রধানত মধ্যবিত্ত ও নাগরিক ভাষ্যকার সাদেকা শফিউল্লাহ।

অভিজ্ঞতার আছে পৌনঃপুনিক আবর্তন। সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাঁর গল্পের আকর্ষণীয় দিক হালকাচালে বিবরণ তৈরি করা। সেখানে জীবনের উপাদান অনুপস্থিত নয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *নিষিদ্ধ সুখের যন্ত্রণা* (১৯৭৮), *যুদ্ধ অবশেষে* (১৯৮০), *শর্তহীন নিঃশব্দে* (১৯৮১), *অনুভূতির রং* (১৯৮২), *কলঙ্কের সুগন্ধ* (১৯৮৪), *অক্ষম বৈঠায়* (১৯৮৫), *চয়ন* (১৯৮৭), *যন্ত্রণার সঞ্চয়* (১৯৯০), *তার তরে* (১৯৯১) প্রভৃতি। **জহির রায়হান** (১৯৩৫-১৯৭২) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জহির রায়হানের গল্প প্রকাশিত হলেও *জহির রায়হানের গল্পসমগ্র* প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এতে উনিশটি গল্প রয়েছে। তাঁর গল্পের প্রধান দিক রাজনৈতিক আন্দোলন; পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক শোষণের প্রতিক্রিয়া। "অপরাধ", "ইচ্ছা অনিচ্ছা", "একুশে ফেব্রুয়ারী", "একুশের গল্প", "পোস্টার", "নয়াপত্তন" ইত্যাদি গল্পনামেই এর প্রকৃতি চেনা যায়। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থাকলেও মধ্যবিত্ত আবেগ ও সূক্ষ্মতর অনুভূতি আকর্ষণীয়। লেখকের বর্ণনা সরল, গদ্যভঙ্গি ঋজু। সেটিই তাঁর গল্পের চমক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জহির রায়হান সিনেমাটিক। দ্রুত চলচ্ছবি তৈরি করে তাঁর গল্প। যেটি কাহিনিকে অনেকাংশে করে তোলে দুর্বল ও হাল্‌কা। **রবীন্দ্র গোপ** (জ. ১৯৫১) কবির গল্প বজায় থাকে কাব্যিক গদ্যে। রবীন্দ্র গোপ এর বাইরে নন। অন্তর্জগতের আশ্রয়টি তাঁর গল্পে প্রবল। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কমিটেড, স্বাজাত্যপ্রেম উজ্জ্বল, জীবনকে জয়ী দেখতে চান। সংগ্রাম ও বৈরীতাকে অতিক্রম করে পৌঁছাতে চান কল্যাণের প্রতিশ্রুতিতে। জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত তাঁর গল্পে। গল্প হয়ে ওঠার জন্য পট-ভাষাবুনন-চিত্রিত পরিবেশ সবকিছু এক ধরনের স্ফূর্তিতে প্রকাশমান। তাঁর গল্পগ্রন্থ : *রোদহীন বসতি* (১৯৮০), *পরাণের স্বাধীনতা* (১৯৮৬), *স্বপ্ন ও চাঁদের কঙ্কাল* (১৯৯০), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৭), *যুদ্ধজয়ের গল্প* (১৯৯৭) প্রভৃতি। **আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন** (জ. ১৯৩৪) বিচিত্র রকমের গল্প লিখেছেন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন। মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক নানা বিষয়কে তিনি স্পর্শ করেছেন। *চিরকুট* (১৯৮১), *নেপথ্য নাটক* (১৯৮২), *ওম শান্তি* (১৯৮৩), *শালবনের রাজা* (১৯৮৩), *নলখাগড়ার সাপ* (১৯৮৩), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৬), *আনন্দ ভুবন* (১৯৯৭), *মনোনীত গল্প* (১৯৯৩), *সোনার শরীর* (১৯৯০), *কলেজ গার্ল* (১৯৯১), *নীল ছবির নায়িকা* (১৯৯০), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৮৮) প্রভৃতি তাঁর গল্প। বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবনাবিন্যাস, স্বপ্নআখ্যান একটি পরিবৃত্ত রচনা করেছে আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিনের গল্পে। প্রেম-রোম্যান্টিকতা, দ্বিধা-দোলাচলতা, ব্যক্তি-সমাজ দ্বন্দ্ব ইত্যাকার বিষয়বস্তু তাঁর গল্পের প্রতিপাদ্য। আলোচ্য গল্পে একটা গল্পভাষা লেখকের অর্জিত, তবে সেখানে চর্চিত সমাজের ছবি দুর্বল। শিল্প কাঙ্ক্ষিত পরিবৃত্ত অর্জন করেনি। মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনের একটা নির্বিবাদী চালচিত্র অঙ্কন করেছেন

লেখক। **অনামিকা হক লিলি** (জ. ১৯৪৮) *নিলম্বন* (১৯৮৩), *ব্যঞ্জনা* (১৯৮৪), *যাতনা* (১৯৮৮), *অষ্টপ্রহর* (১৯৯০), *কুরে কুরে* (১৯৯১), *আমি তোমাদেরই লোক* (২০০২), *কলম তুমিই বলো* (২০০৩)—এসব গল্পে এক ধরনের মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতা বিরাজমান। তাঁর ভাষাভঙ্গি নিজস্ব, নিজের পরিপার্শ্বই তাঁর গল্পকে ঘিরে থাকে। নাগরিক ও পারিবারিক বিষয়বিন্যাসই ধরা পড়ে এ গল্পকারের গল্পে। **আন্‌ওয়ার আহমদ** (১৯৪১-২০০৩) সংযত ও ধীরলয়ের জীবনানুরাগী গল্পকার। পরিশ্রমী ভাবনায় গল্পে তুলে আনেন সমকাল, বিধৃত সমাজ-প্রেক্ষাপট, ক্রুদ্ধ জীবন চেতনা। তাঁর গল্পভাষা দৃঢ় হলেও, প্লটবিন্যাস দুর্বল। *সতর্ক প্রহরা* (১৯৮৩) তাঁর গল্পগ্রন্থ। **হুমায়ুন আজাদ** (১৯৪৭-২০০৪) প্রথাবিরোধী সাহসী লেখক হুমায়ুন আজাদের গল্পগ্রন্থ *যাদুকরের মৃত্যু* (১৯৯৬)। প্রতীকী এ গল্পে সমাজ-রাষ্ট্রের রূপটি তুলে ধরেন লেখক। হুমায়ুন আজাদ গল্পে খুব বেশি তাঁর শিল্পমেধাকে কাজে লাগাতে পারেননি। তবে শিল্পনন্দনের চেয়ে রাষ্ট্র-সমাজ বেশি কিংবা জরুরি হয়ে পড়ে তাঁর কথনে। ফলে চিত্রল বর্ণনাগুলো হয়ে পড়ে দুর্বল, অভিসন্ধিযুক্ত। তিনি মেধাবী, সৃজনশীল কিন্তু উপযোগিতার দ্বারা হয়ে পড়েন অসংযমী, যা তাঁর শিল্পকে করে বাধাগ্রস্ত। **বিপ্রদাশ বড়ুয়া** (জ. ১৯৪২)র শুরু হয়েছিল আটটি গল্পের সমন্বয়ে রচিত *সাদা কফিন* (১৯৮৪) নামক গল্পগ্রন্থ দিয়ে। এছাড়া *যুদ্ধজয়ের গল্প* (১৯৮৫), *গাঙচিল* (১৯৮৭), *নদীর নাম গণতন্ত্র* (১৯৮৭), *বীরাঙ্গনার প্রেম* (১৯৮৭), *উল্কি একটি প্রেমের গল্প* (১৯৮৮), *স্বপ্নমিছিল* (১৯৮৯), *আকাশে প্রেমের বাদল* (১৯৮৯), *স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে* (১৯৯০), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৯০), *আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি* (১৯৯১), *স্বপ্নসুন্দরী* (১৯৯৪), *অলৌকিক চুম্বন* (১৯৯৫), *আমি একটি স্বপ্ন কিনেছিলাম* (১৯৯৬), *ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে দেশ-মাটি-মানুষ আর নিসর্গ চিরায়ত ব্যঞ্জনায় চিত্রিত। পাহাড়-পর্বত আশ্রিত মানুষের জীবন এক ধরনের মুগ্ধতায় প্রতিফলিত তাঁর গল্পে। স্বপ্ন-সংগ্রামের প্রতিরূপ আছে অরণ্যানীর আড়ালে। আমাদের ছোটগল্পে তিনি অন্যধরনের লেখক। সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনসংগ্রাম, বিবেক ও মূল্যবোধের রূপান্তর, পরাজিত ও জয়ী মানুষ বৈচিত্র্যময় অভিধা লাভ করে তাঁর গল্পে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোতে আছে ভিন্নমাত্রা ও উপলব্ধি। গ্রামের পটে লেখা গল্পের প্রেক্ষাপটও নতুন মেজাজের। বিপ্রদাশ বড়ুয়ার বর্ণনাভঙ্গি নিটোল, কল্পনারঞ্জিত এবং বহুভঙ্গিম। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের গল্পধারায় তিনি যুক্ত করেছেন নতুন ভাবরীতির—যেখানে মানুষকে প্রকৃতিপ্রবাহে অধিষ্ঠান করে তার বস্তুনিষ্ঠ বা রূপময় জগতকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলা হয়েছে। অনবদ্য গল্পকার **ভাস্কর চৌধুরী** (জ. ১৯৫২)। তাঁর *রক্তপাতের ব্যাকরণ* (১৯৮৪), *বাষট্টি বিঘা নদী* (১৯৮৬), *কোথায় নিবাস* (১৯৮৬), *পতনের সময়* (১৯৮৭) এসব গল্পে এক ধরনের

কাব্যিকতা পরিস্রুত হলেও জীবনের আরাধ্য লুক্কায়িত। ভাস্কর চৌধুরীর পরিচর্যা দুর্বল, দৃঢ় প্রযত্ন নন তিনি। সে কারণে তাঁর ভাবনা প্রতিষ্ঠার জন্য যে দার্শনিক বুদ্ধির দরকার তা গল্পে প্রতিষ্ঠা পায় না। **মঞ্জুশ্রী চৌধুরী** (জ. ১৯২৩) দৃঢ়প্রযত্ন গল্পকার। তবে এসব গল্পের আঙ্গিক তেমন সফল নয়। *জাগ্রত যে ভালো* (১৯৮৪), *বিষকন্যা* (১৯৮৯), *সোনার খাঁচা* (১৯৮৯) গল্পগ্রন্থের সমকাল সন্ধিৎসু রূপটি বিচ্ছুরিত। নিছক জীবনের বিচিত্র রূপচিত্র এসব গল্প। সম্ভাব্যতার সমগ্রতা আছে। মঞ্জুশ্রী চৌধুরী স্বাধীনতা-উত্তরকালের মধ্যবিত্ত ভাবচিন্তাকেই গল্পে প্রকাশ করেছেন। **মুনিরা চৌধুরী** (জ. ১৯৫৪) *মেঘ ও অতলান্তে* (১৯৮৪), *বুনোঘ্রাণ* (১৯৮৪), *সূর্য মৃত্তিকা* (১৯৮৫), *নির্জন* (১৯৮৬) এসব গল্প অনেকটা রোম্যান্টিক, মধবিত্ত চেতনাশ্রিত। সমাজবাস্তবতার চিত্র দুর্বল, নির্মাণ পরিকাঠামো সবল নয়। **মুস্তাফা পান্না** স্বাধীনতা-পরবর্তী গল্পকার। তাঁর গল্পগ্রন্থ *লোকসকল* (১৯৮৪), *কৃষ্ণপক্ষের প্রতিবাদ* (১৯৮৯)। প্রথাবদ্ধ ধারাতে গল্প লিখলেও ভাষাশৈলি স্বতন্ত্র। তাঁর বাস্তবানুগ গল্পে আছে নির্মোহ জীবনের স্বীকৃতি। উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি হয় না তাঁর গল্পে। কারণ, গল্পশক্তি তাঁর অর্জিত হয় বক্তব্যকে আশ্রয় করে। **নাসরীন নঈম** (জ. ১৯৫২) *এখানে পিঞ্জর* (১৯৮৪), *আর যে পারি না মিলাপু* (১৯৯০), *সহসা দুপুরে দহন* (১৯৯১), অপত্য স্নেহের ডালপালা (১৯৯৯) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মশ্লাঘা বা ক্লান্তি-নৈরাশ্যকে চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর গল্পভাষা আকর্ষণীয়। একটা রোম্যান্টিক আমেজে পর্যবসিত হলেও নিপুণ বাস্তবতাকেই তিনি মুখ্য উপজীব্য করে তোলেন গল্পে। **নির্মলেন্দু গুণ** (জ. ১৯৪৫) সংখ্যালঘু ও দেশভাগ ট্র্যাজেডি নিয়ে *আপন দলের মানুষ* (১৯৮৫)। কবিভাষ্য, কিন্তু সুপাঠ্য এ গ্রন্থ। ইদানীং গল্পগদ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়। নাগরিক জীবনের ক্রন্দন অঙ্কনের জন্য, জীবনের নিষ্ঠুরতার প্রকাশের জন্য, গল্পেই স্বাচ্ছন্দ অনেকেরই। এবং এমনটাই গল্পের বাস্তবতাও। নির্মলেন্দু গুণ সময়কে অস্বীকার করেন না। তারই প্রমাণ এসব রচনা। **নাজমা জেসমিন চৌধুরী** (১৯৪০-১৯৮৯)র গল্প মধ্যবিত্ত প্রবণতা প্রসূত। গল্পভঙ্গি আছে। যত্নও পরিলক্ষিত। *অন্য নায়ক* (১৯৮৫), *মেঘ কেটে গেল* (১৯৮৮) এমন গল্পের ভেতর দিয়ে জীবনের সম্ভাব্যতার সূত্রকে তিনি পরীক্ষায় এনেছেন। শিল্পকাঠামোটি দুর্বল নয় এ গল্পকারের। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিকশিত হওয়ার আগেই তিরোহিত। **হোসনে আরা শাহেদ** অনেক গল্প লিখেছেন, কিন্তু গল্পভাষা অর্জনে তেমন সক্ষম হননি। গল্পশিল্প পরিপ্রেক্ষিত অর্জনে অনেকটাই দুর্বল তাঁর গল্প। কেননা প্রায় একই উচ্চারণ তাঁর গল্পে ঘুরে ফিরে আসে। জনপ্রিয়তা থাকলেও সমাজভিত্তির প্রকৃত স্বরটি অনুপস্থিত তাঁর লেখায়। গল্প-আঙ্গিকও ছোট ছোট, উপভোগের মাত্রা কম। তাঁর গল্পগ্রন্থ *গিন্নীর ডায়েরী* (১৯৮৬), *জীবন থেকে* (১৯৮৬), *তির্যক* (১৯৯২), *জীবনানন্দনের জামিন* (১৯৯০),

উষ্ণ চা শীতল হৃদয় (২০০১), *কেন এ দুয়ারটুকু* (১৯৮৩) প্রভৃতি। **এহসান চৌধুরী** *একাত্তরের গল্প* (১৯৮৬) লিখেছেন। তিনি যুদ্ধের প্রতিকৃতি আঁকেন। কমিটেড লেখক। জীবনদৃষ্টি অঙ্কনে সক্রিয় তাঁর প্রস্তাবনা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এমন গল্প অনেকেই লিখলেও এহসান চৌধুরী স্বাতন্ত্র্য ফর্মবিন্যাসে শিল্পউচ্চতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। গল্পের 'এনিকডৌট' চিন্তাপ্রসূত হয়ে এক ধরনের সামগ্রিকতায় অংশ নেয়। **রেজাউর রহমান** (জ. ১৯৪৪)র গল্পগ্রন্থ *অভয়ারণ্য* (১৯৮৬), *বাক্সবন্দী সব* (১৯৮৭), *বিস্মৃত এক ভুবন* (১৯৮৮), *ওরা কোথায় যে যায়* (১৯৮৯), *সেই কলস পেয়ে যাবেই* (১৯৯৪), *স্মৃতির মানচিত্রে তারার ফাঁদ* (১৯৯৫)। গল্পের পরিচর্যায় কমিটেড। গল্প-নির্মাণ ক্ষেত্রে সমগ্রতার ইঙ্গিত বহাল রাখেন। বিচিত্র রকমের গল্প তাঁর। প্রচলিত সমাজের ভেতরের প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব, সংস্কারচেতনা এমন বিষয়ে আলোকপাত শুধু নয় দার্শনিক মেসেজ প্রদান করতে চান। পরিমণ্ডল তাঁর মধ্যবিত্তের। তবে তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠেন না। বয়ানে মুন্সিয়ানা আছে, রীতিতেও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। গল্পের স্যাটায়ার তৈরি হয়, কিন্তু তাঁর আবহ যেন ঠিক সেভাবে তা অনুমোদন দেয় না। 'নানা স্তরের শাসনযন্ত্র, নিরাপত্তাকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দলগতভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাপারটা অবরোধ বা রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ারই কথা...'—এভাবে গল্প শুরু হলে ক্রমশ তা শামীম চৌধুরী হয়ে বিলকিস, রাবেয়া চলে আসলে তার পরিণতি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ায়। ভঙ্গিটিও পাল্টে যায়। বিষয়ান্তরও ঘটে। লেখক এখানে এমন উত্তেজনার আহ্বান বা ধ্বনির ঐক্য বজায়ে দুর্বলই মনে হয়। **সৈয়দ ইকবাল** (জ. ১৯৫৩) গল্প লিখেছেন। গল্পকথন আছে কিন্তু তাঁর ভাষার উত্তরণ-প্রয়াসটি দুর্বল। সৈয়দ ইকবালের হাতে গল্প আছে কিন্তু প্রেজেন্টেশান এক আবর্তের, অন্যেতর হন না তিনি। আমরা যাঁর কথক তাঁদের আঙ্গিকের অপচয় চাই না। *একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৬), *ভালোবাসার পাঁচ পা* (১৯৮৭) তাঁর গল্পগ্রন্থ। **কাজী ফজলুর রহমান** (জ. ১৯৩২) মধ্যবিত্ত নাগরিক প্রবর্তনায় গল্প লেখেন, অভিজ্ঞতায় থাকে প্রবাস জীবন, পর্যটন প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। *দর্পণে প্রতিবিম্ব* (১৯৮৭) তাঁর এরূপেরই গল্প। কাজী ফজলুর রহমানের ভাষা অলঙ্কারময় নয়, তবে দৃঢ়তা আছে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতাই তাঁর গল্পের বিষয়। সেখানে 'ইমেজারি' কিছু রচিত হয় না। এক ধরনের ফ্ল্যাট ধারাভাষ্য, যা কালবৃত্তে নিপতিত। এছাড়া লিখেছেন *যাত্রী* (১৯৮৭), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৮৮), *বিশ্বাসঘাতক* (১৯৯১)। **মালিহা খাতুন** (জ. ১৯২৮) দীর্ঘদিন গল্প লিখে চলেছেন। *মনের রং লাল* (১৯৮৭), *মন ভালো নেই* (১৯৯০), *স্মৃতি তুমি বেদনা* (১৯৯৩) এসব গল্পে একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। গল্পভাষা অর্জিত। কিন্তু কাহিনি অভিজ্ঞতাপূর্ণ নয়। উপস্থাপনার রীতি এবং দ্বিধাহীন বাচনশৈলি **মহীবুল আজিজ**

(জ. ১৯৬২)র কথনগুণ। তাঁর গল্প বিস্তৃত হয় আভ্যন্তরীণ অন্তরীণ সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তি সম্ভাবনার সূত্রানুসন্ধানের প্রয়াস থেকে। প্রবহমান সময় বিন্যস্ত তাঁর গল্পে। আছে উইট এবং প্রতীকী পরিচর্যা। *গ্রাম উন্নয়ন কমপেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ* (১৯৮৮), *দুগ্ধগঞ্জ* (১৯৯৭), *মৎস্যপুরাণ* (২০০০), *আয়নাপড়া* (২০০৬) এসব গল্পের ভেতর দিয়ে স্বকালের ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতির সূত্রকে নির্দেশ করেন। **ইফফাত আরা** (জ. ১৯৩৯) নারীর রোম্যান্টিক ভাব বিধৃত ইফফাত আরার গল্প *রোদনভরা বসন্ত* (১৯৮৯), *নোনাস্বাদের জীবন* (১৯৯০), *একাকী অন্ধকারে* (১৯৯৪) প্রভৃতি। উত্তরিত নয় তাঁর অভিজ্ঞতা। জীবনের বিচিত্রবার্তাই তাঁর গল্পে আছে কিন্তু শৈলি কামিয়াব নয়। আবহ জমাটবদ্ধ নয়, এক ধরনের সরলীকরণ আছে। চরিত্রও পানসে। **মাহবুব তালুকদার** (জ. ১৯৪১) অন্তর্মুখি মধ্যবিত্ত চরিত্রের ভাষ্যকার। তাঁর গল্প *সুবর্ণ জয়ন্তী*। জীবনের প্রতীকীরূপ অবলম্বিত হয় তাঁর গল্পে। উপন্যাসের দক্ষতায় তিনি শিল্পসাধিত। সে প্রকরণই স্বল্প সময়খণ্ডে নির্ণীত হয় তাঁর গল্পে। বিস্মৃত চেতনা, স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, দ্বেষ-দ্বিধা নিয়ে যে মধ্যবিত্ত আধুনিক সমাজে বিবর্ধিত তারই বিদ্যুৎচ্ছটা উদ্ভাসন তাঁর গল্প। গল্পশৈলি শক্তিশালী এবং সামর্থ্যবান। **আতা সরকার** (জ. ১৯৫২) প্রধানত গল্পকার। তাঁর অনেক উপন্যাসকে বড়গল্প বলা যায়। লেখকের গল্পগ্রন্থ : *বিপজ্জনক খেলা সম্পর্কে রিপোর্ট*, *নিষিদ্ধ রাজনীতির গল্প*, *সুন্দর তুমি পবিত্রতম*, *ব্রেকহীন বাস চলছে চলছে* (১৯৯৭), *সাহসী মানুষের গল্প*, *নির্বাচিত গল্প*, *রে স্বপ্ন রে দুবৃত্ত*। "ল্যাম্পপোস্টের শেয়াল" গল্প থেকে নিলে দেখা যায় 'নিঝুম নিশীথ রাতে ছোট বউ চাপা গলায় গোঙিয়ে গোঙিয়ে কাঁদে। মাঝ-রাতের হিমেল বাতাস বুড়ি ছমিরনের চোখ লেগে এসেছিল। এক লহমায় ঘুমঘোর কেটে যায়। চোখ খুলতেই দপ করে লাফিয়ে ওঠে আসমান-ভরা চান-তারা। পাশ ফিরে শোয়'—এরপর ঘটনার সীমানা ধরে চলে আসে অন্য ঘটনা। যে চরিত্ররা এসে গেছে তাদের ফ্লাশব্যাক, বাঁচার সংগ্রাম, কাতরতা-প্রেম-স্বপ্ন-আশা। খুব ঋজু এক্সপ্রেশান, প্রান্তিক মানুষের ভেতরেই জীবনকে, তার সত্যকে, বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা; গল্পপট যেন সেখানেই নির্মিত হয়। সরল ভাষাভঙ্গি, প্রচ্ছন্ন মেজাজ, উক্তিকে পৌঁছিয়ে দেন কাঙ্ক্ষিত প্রবাহে। আতা সরকার দীর্ঘদিনে গল্পচর্চায় এগিয়েছেন, কিন্তু প্রকরণ সমকাল-স্পর্শী হয়নি। স্থিরতা বা আলস্য ইদানিংকার গল্পে পরিলক্ষিত। উত্তরণের পথটির জন্য তাঁর নিরীক্ষা দরকার। **জাফর তালুকদার** (জ. ১৯৫২) 'চারদিকে এত যে মানুষের শোরগোল, কোলাহলের ঢেউ—সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই মোটেও। মেলা দেখার মতো ভিড়টা ধীরে ধীরে জনারণ্যে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তার ধ্যান যেন ছিন্ন হলো হঠাৎ। প্রচণ্ড নগ্ন কালীর মতো উঠে দাঁড়াল দীপ্র ভঙ্গিতে। তারপর হঠাৎ কাঠশক্ত

শিশুটিকে বুকে টেনে তুলে দিশাহারার মতো ছুটে চলল সরদারবাড়ির দিকে।' জাফর তালুকদার এমন দৃষ্টিকোণে লেখেন *অন্নদাস* (১৯৯০), *মানুষের গন্ধ* (১৯৯০), *প্রেমের গল্প* (১৯৯১), *নির্বাচিত গল্প* (২০০৪)। বাস্তবানুগ প্রকৃতিটি তাঁর ধরা পড়ে কথনপ্রয়াসে। প্রকৃতি আর বাস্তবতা পরম্পরা সৃষ্টির পর, জীবনের বাস্তবতা সেখানে নির্মম দুঃসহতায় প্রকরণে পর্যবসিত হয়। গল্পকারের কণ্ঠ প্রয়োজনমতো ধ্বনিতে আটকায়, কখনো ধীর আবার অস্থির কিংবা দ্রুত; আঞ্চলিক সংলাপে অবিকৃত প্রলাপ, দ্বান্দ্বিকতা কঠোর—সেকারণেই তা উচ্চকিত নয়, প্রচ্ছন্ন—এরকম সবমিলিয়ে জাফর তালুকদারের গল্প। সমাজবাস্তবতাই তাঁর আঙ্গিক, সেটি এ সময়ে আরও প্রখর, উত্তরণ আছে, বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক; তবে শেষাবধি জীবনই জয়ী তাঁর গল্পে। **পূরবী বসুর** (জ. ১৯৪৯) নারীবাদী চেতনা আরোপিত না হলেও নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন অনুপস্থিত নয় গল্পে। বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয় নানা যৌক্তিকতায় এবং বাস্তবতায়। পূরবী বসুর ভাষা শক্তিশালী, চেতনার স্বচ্ছতা আছে। জীবনের বিশ্বাসকে তিনি বৈচিত্র্যময় করে তোলেন, স্বদীক্ষিত চেতনায়। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, চিন্তনে বুদ্ধির দীপ্তিও পরিলক্ষিত তাঁর লেখায়। *পূরবী বসুর গল্প*, *আজন্ম পরবাসী*, *সে নহি নহি*, *নিরুদ্ধ সমীরণ* প্রভৃতি তাঁর গল্পের বই। **সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম** (জ. ১৯৫১) প্রবল ব্যক্তিত্বে শৈলির বুননি চালান। পাঠ-অভিজ্ঞতা তাঁর অনেকমুখি, বিচিত্র জীবন তাঁর আয়ত্তে। সাধারণত সমাজের স্তরান্যাস তাঁর দৃষ্টিবিন্দু রচনা করে। 'উবাইদুল মাবুদের আসল পেশা তাবিজ বিক্রি নয়, তার আসল পেশা হার্ডওয়ার ব্যবসা।... তাবিজ বিক্রিটা তার একটা শখ, অথবা বলা যায় স্বপ্নাদিষ্ট বাধ্যবাধকতা' তাবিজওয়ালার কাহিনি এরপর নানাদিকে ছড়ায়, পরিব্যাপ্ত হয় সমাজে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ভেতরে। সমাজের শ্রেণিস্তরকে চিহ্নিত করেন লেখক। সংস্কার-কুসংস্কার, স্বস্তি-সাধ্যের প্রশ্নগুলোর কার্যকরণ রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন শৈলি গ্রহণ করেন গল্পকার। তাঁর গ্রন্থ : *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪), *থাকা না থাকার গল্প* (১৯৯৫), *প্রেম ও প্রার্থনার গল্প* (২০০৫) প্রভৃতি। **পারভেজ হোসেন** (জ. ১৯৬৪) সাম্প্রতিক লেখায় ব্যক্তিবাস্তবতার স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত। অনেকটা উচ্ছ্বাস আছে, আছে পরিবেশ বয়ানের সহিষ্ণুতা। *ক্ষয়িত রক্তপুতুল* (১৯৯০), *বৃশ্চিকের জাল ও অন্যান্য* (১৯৯৩) এসব গল্পে উপনিবেশ-উত্তর অস্তিত্ব, সংকট, মনস্তত্ত্বের একটা স্বরূপ পরিলক্ষিত। তাঁর গল্প প্রবল বাস্তবানুগ। এক ধরনের গতিও আছে। সমকালের প্রতিক্রিয়াশীল বাস্তবতায় শ্রেণিচরিত্রের রূপ অঙ্কন এবং তার বিপরীতে ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র সৃষ্টিতে পারভেজ হোসেনের প্রকরণ সঠিক পথেই প্রবাহিত। এখন তাঁর বিকশিত রূপটির জন্য পাঠকের আকাঙ্ক্ষা।

চার.

হুমায়ূন মালিক (জ. ১৯৫৭) ভিন্ন প্রকরণরূপে গল্পভূমিতে আবির্ভূত। জীবনের হলাহল আকণ্ঠ পানকারি এ গল্পকার *মায়াবাস্তবের আত্মকথন*, *মৃত্যুঞ্জয়ের সপ্তম জন্ম*, *ক্ষয়িষ্ণু মানবের পোর্টফোলিও*, *গ্রীমযজ্ঞ* (২০০৫), *গোলাপসংহিতা* (২০০৬) লিখেছেন। খুব স্বল্প সময়ে নিজের শৈলিটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। 'শব', 'রক্ত', 'লাশকাটাঘর', জাদুবাস্তব, সহিংসতা যে প্রতীকেই পরিব্যাপ্ত হোক; গল্প-ট্রিটমেন্টে তা দুর্দামরূপে প্রতিষ্ঠিত। নিষ্ঠুর বাস্তববাদী গল্পকার। দীর্ঘায়ত হয়ে পড়ে তাঁর গল্প, সেখানে জাতিগত, ধর্মগত, সংখ্যালঘুগত বহুবিষয় উঠে আসে। দরিদ্র, অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষের সংকটও অনুপস্থিত থাকে না। উদাহরণ 'জুমাঞ্জি কোবরাকে ডেকে বলে, দেশে কি বিদেশে আমার যুক্তিপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এখন বড় অন্তরায় মাত্র একটি। ওরা প্রাসাদ থেকে কেবল একটি দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বেরোয়। সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেসনোট দেয়, ফুকো পালাতে গিয়ে কোবরার গুলিতে মারা পড়েছে। যারা শোনে তারা ধন্দে যেমন মরেছিল গোয়েবা।' এভাবে অপ-তৎপর ক্রিয়াকাণ্ডের স্বরূপে মানুষের ট্রিটমেন্ট কী, তা বোঝাতে চান। **মনিরা কায়েস** (জ. ১৯৬১)র গল্পজমিনে ক্রমশ আলো-অন্ধকারের উস্কানী ও আওয়াজ নির্মিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে মধ্যবিত্ত অসঙ্গতি ও মানুষের স্বর জমাটবদ্ধ হয়, প্রতিরোধটি কার্যকরণ সম্বন্ধ নিয়ে সামনে চলতে থাকে। সেজন্য প্লট দৃঢ়শক্তিতে দাঁড়ানোর শক্তিও অর্জন করে। দিব্যকান্তি মেলে একেবারে কিছুদূর পৌঁছার পর—কিন্তু স্মর্তব্য, সেটি সরল ছাঁচে নয়, সহজ আয়োজনে নয়; প্রচণ্ড বিদ্রূপে, কষাঘাতে; অনেকদূর পর্যন্ত সে বর্ণনা, "ঠাকুমার ঝুলি অথবা কথামনুষ্যপুরাণ"-এর আবেদ : 'রাতে শোবার সময় হঠাৎ মাকে মনে পড়ে। অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। বাড়ি থেকে একরকম পালিয়েই আছে সে। ... সে বিড় বিড় করতে করতে কোল বালিশটা আঁকড়ে ধরে, কোনও কৈফিয়ৎ নাই, কোনও জবাবদিহিতা নাই...' এরপর 'ফ্যানটাসির জগত' ছেড়ে স্পট বদল, ক্রমশ প্রবাহ বাগমারা, গোদাগাড়ী, নাচোল; সঙ্গে ঘটনার ভেতরের ঘটনা, রাজনৈতিক সামাজিক কিংবা উত্তর-উপনিবেশ আধুনিক সময়ের কতো কিছু। মনিরা স্বকাল-পরিশ্রুত, বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ উইট পর্যন্ত পৌঁছায় না, পরিহাস আত্মস্থ নয় তাঁর গল্পে। পরিহাস কায়েমের জন্য মুন্সিয়ানার বৃত্ত তৈরি হওয়ার আগেই তা শূন্যে মিলায়। প্রচুর সমাজ উপাদান সেখানে, চলে আবালবৃদ্ধবণিতার বসত, কিন্তু নিজস্ব দর্শন ক্রমাগত উক্তির ধ্বনিতে আটকায়, ছড়ায় না, গল্প-বাস্তবের সঙ্গে সহযোগ ঘটাবার সময়ও যেন পায় না। চালচিত্রময় কাহিনিতে পটটি তখন দুর্বল হয়ে পড়ে, স্থুল মেসেজ প্রকাশিত হয়, জেনে যাওয়া যায় গল্প-দর্শন। কিন্তু এর বিপরীতেই তো দাঁড়াতে হয় গল্পকারকে! এ গল্পকারেরও নিশ্চয়ই সে প্রস্তুতিটি ছিল; বিশেষ করে আলোচ্য

গল্পের প্রথম দিকটায় তা স্পষ্ট। পরে প্রবহমান অনেকান্ত উপাদানে অন্যেতর ঘটনা পর্যাপ্ত ও সুষ্ঠুরূপে পর্যবসিত হয় না। বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎচ্ছটা হয়ে পড়ে অনিয়ন্ত্রিত। এ জন্য আরও সংযত সিদ্ধির তপস্যা দরকার হয়। তবুও এ সময়ের সবচেয়ে সমাজ সচেতন ও আধুনিকমনস্ক গল্পকার তিনি। কারণ, এনিকডৌটে কিছুই তাঁর বিচ্ছিন্ন নয়। পরিস্থিতির যৌক্তিকতা তাঁর গল্পে সঠিক। সম্ভাবনার সূত্র কিছুই অমূলক নয়। তাঁর এরূপ পরিস্থিতির ফসল : *মাটিপুরাণ পালা* (১৯৯৯), *জলডাঙ্গার বায়োস্কোপ* (২০০১), *ধুলোমাটির জন্মসূত্র* (২০০৪), *কথামনুষ্যপুরাণ* (২০০৭)। **সাদ কামালী** (জ. ১৯৬২) কালের মাত্রাকে ধরতে চান গল্পে। সমাজের হাড্ডিসার মানুষকে তুলে আনেন আধুনিক প্রকরণে। সংস্কার-কুসংস্কার, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আর্তি-ভয়, দ্বিধা-দোটানা ইত্যাকার সব বিষয় কীভাবে জীবনে গ্রাস করে; অন্তেবাসী মানুষকে পরিহাসপ্রিয় করে তোলে—তারই সংবাদ আছে তাঁর গল্পে। "আগুনের গ্রহণ" উদ্ধৃত করলে তার স্বরূপটি চেনা যায় : 'আবুল ফজল নিশ্চিত হয় আগুনই তার স্ত্রী। আগুনের মমতাময় স্পর্শে তার দৃষ্টি ঠাণ্ডা এবং হৃদয় হয় উষ্ণ। শরীর বোধ করে বিলাস বৈভব। আগুনের ছোঁয়ায় কর্ণিয়া আরও বড় হলে চতুর্পার্শ্বে রঙ টলটল করে, দৃষ্টি হয় প্রখর। সকলের ইন্দ্রিয় সে সময় দৃষ্টির স্নায়ুতে অতিরিক্ত শক্তি ও ক্ষমতার যোগান দেয়।...' এ শৈলিতে অন্তর্জগতের সংবাদ এক রকমের নিবিড়তায় যেমন আচ্ছন্ন হয় তেমনি তৈরি করে পরিস্রুত বাস্তবতার পটচিত্র। রচনায় 'ম্যাজিক রিয়ালিটি'র প্রকরণ, এক বাস্তবিক শর্তে পাঠ করা যায়। সমসাময়িক রাজনীতি আর গ্রাম থাকে গল্পের কেন্দ্রে। বর্ণনার প্রতীকী প্রয়াস—যেখানে স্ববিরোধ, মনোপৃষ্ঠের জটিলতা, ইন্দ্রিয় আচ্ছন্নতা চালচিত্রের গদ্যে নির্মিতি পায়। তবে প্রথম দিকের গল্পে আছে লোকজীবন ও পুরাণ প্রসঙ্গ। আরজ ফকির, আলফু গায়েন কিংবা চান্দু ও বসির বয়াতি ধারণ করে এক সহজিয়া লোকায়ত জীবন। সাধারণত নিম্নবর্গের মানুষ প্রেম-প্রকৃতি দৈন্যতা নিয়ে হাজির হয় তাঁর গল্পে। সাদ কামালীর দর্শন আত্মবীক্ষার, জগৎ জীবনকে বৈজ্ঞানিক তথা বিশ্ববীক্ষায় পর্যবেক্ষণ। আর তা করতে গিয়েই নানা নিরীক্ষায় জীবনের তলদেশ পর্যন্ত যাত্রা। আত্মসমীক্ষার ভেতরে একরকমের জীবনবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি গল্পে। *অবশেষে নিঃশব্দ অন্তিমে* (১৯৯২), *অভিব্যক্তিবাদী গল্প* (১৯৯৬), *উপকথার আপেল* (১৯৯৬), *আগুনের গ্রহণ* (২০০০) এসব গল্পে লেখকের পরিশ্রম বিসর্জিত আত্ম-অনুভূতির তাপে কিংবা মনস্তত্ত্বের বিবরণ-দক্ষতায়। সাদ কামালী প্রথম গ্রন্থে নিজেকে প্রসারিত করার পর *অভিব্যক্তিবাদী গল্পে* চরিত্রের আত্ম-অনুভূতির প্রকাশ এরপর *আগুনের গ্রহণে* সামূহিক অভিজ্ঞতা চেতনার অন্তর্মুখি সংবেদী প্রবাহে কাব্যবয়ন। তবে তাঁর কাব্যময় বর্ণনা আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পে তিনি একপ্রকারের সামর্থ্য অর্জন করে

চলেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সমাজের অস্তিত্ববাদ-রীতিটি আয়ত্তে তাঁর, পাঠ-অভিজ্ঞতায় বা দায়বোধের অঙ্গীকারে-তৈরি হয়েছে তাঁর প্রকরণ। নব্বুই-পরবর্তী সময়ে বাস্তববাদী এ গল্পকারের গল্পভাষা আমাদের একটু আশ্বস্তই করে। **সেলিম মোরশেদ** (জ. ১৯৬১) 'প্রতিশিল্প' গোষ্ঠীর লেখক। *কাটা সাপের* মুণ্ডু (১৯৯৩) গল্পের নামগল্প রচিত ভিক্ষুক হেমাঙ্গিনীর যৌনজীবন নিয়ে। *পাল্টা কথার সূত্রমুখ অথবা বুনো শুয়োরের গোঁ* তাঁর অন্য গল্পগ্রন্থ। জীবনকে স্পষ্ট করে দেখাকেই এ সময়ের গল্পকাররা গল্প মনে করেন। গল্প হয়ে ওঠা, প্রশ্নের ভেতর দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করা, সবকিছুর ঊর্ধ্বে জীবনকে বড় করে দেখা—এমনটা না হলে গল্পকারদের চলবে কী করে! সেলিম মোরশেদ সে প্রশ্নে গল্পের নামে বাজিমাত করে দেন সবকিছু। কিন্তু একটু আঙ্গিক-অসচেতনতা আছে। জীবনবীক্ষা শুধু ভাষা নয়, সেখানে ভাষার-নির্মাণটি দরকার। যেটা কাহিনিভাষা— নইলে গল্প পাঠককে কাছে নেবে না। *কাটা সাপের* মুণ্ডুর সম্ভাবনা আছে, যেটি বোঝা যায়। কিন্তু নিরীক্ষাধর্মী প্রচেষ্টা গল্প-শিল্পের ক্ষেত্রে বড় বাধা। *বাঘের ঘরে ঘোগ* (২০০৮) জীবন বাস্তবতার স্বরূপে নির্মিত গল্প। **সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ** অন্তর্জগতের সৃষ্টিপ্রয়াসে থাকেন *আগুনের বিপদ আপদ* (১৯৯৪), *শাদা কাহিনী* (১৯৯৬) এসব গল্পগ্রন্থ নিয়ে। উত্তেজনা আছে, দুর্বার তার গতি, অচঞ্চলের ভেতরেই প্রকৃত সংবাদটি ধরা পড়ে। সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ সম্মুখগামি। আরও বিচিত্রজীবন তাঁর গল্পে আসবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। গল্পভাষা আশান্বিত। **তাপস মজুমদার** (জ. ১৯৫২)র গল্প *মঙ্গল সংহিতা* (১৯৯৫), *একটি দশ টাকার নোট* (১৯৯৬), *কেউ কাউকে চেনে না* (১৯৯৭)। আধুনিক দৃষ্টিচেতনায় তাঁর গল্পে সমাজ-বীক্ষণ প্রবল হলেও ব্যক্তিমুখিতা, দ্বন্দ্ব, হতাশা কায়েম হয় গল্পে। গল্পভাষায় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। নাগরিক শর্তটি গল্পে দৃঢ়, সে প্রকৃতির ভেতরেই চরিত্র রচিত হতে থাকে। আত্মমুখিনতার ভেতরে ব্যক্তির সম্ভাবনার সূত্রগুলো রচিত হয়। তবে তাপস মজুমদারের গল্পচিত্রের কার্যকরণ প্রয়াসটি পূর্ণতার পরিশুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল হয়ে পড়ে। কাহিনির পারস্পরিক ঐক্যও পরিণতি পায় না। **শাহাদুজ্জামান** (জ. ১৯৬২) ছোট ছোট বাক্যের, অভিনব কাব্যকথায়, অন্তস্তলের সমীক্ষায় গল্প বলতে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। আধুনিক সময়ে গল্পভূমির বদলকে নিছক ডকুমেন্টারী বা ফিচারধর্মীতায় না নিয়ে শাহাদুজ্জামান পলায়নপর মনোবৃত্তি কিংবা জটিল পরিপার্শ্বের সংকটকে অতলস্পর্শী করে তোলেন। মনোজগতের বিচিত্র রহস্যকে সন্ধিৎসু পাঠে গড়ে তোলেন তিনি। "ইব্রাহীম বক্সের সার্কাস" গল্পটি এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থূলতাও ধরা পড়ে। *কয়েকটি বিহ্বলগল্প* (১৯৯৬), *পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ* (১৯৯৯), *কেশের আড়ে পাহাড়* (২০১২), *অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প* (২০১৪) তাঁর গল্পগ্রন্থ। মামুন

হুসাইন (জ. ১৯৬২)র গল্প *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি* (১৯৯৫)। এরপর লেখেন *মানুষের মৃত্যু হলে* (২০০০), *আমার জানা ছিল কিছু* (২০০০), *বালক বেলার কৌশল* (২০০২), *নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা* (২০০২), *কয়েকজন সামান্য মানুষ* (২০০৩), *একটি স্মারকগ্রন্থের জীবনপ্রণালী*, *রাষ্ট্রযন্ত্রের খেলাধুলা*, *যুদ্ধাপরাধ ও ভূমিব্যবস্থার অস্পষ্ট বিবরণ* (২০১১), *অন্ধজনের জাতককথা* (২০১৪)। মামুন হুসাইনের গল্প দীর্ঘায়ত। মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতার জারণে সমাজ-রাজনীতির পাঠ তীক্ষ্ণ স্যাটায়ারে আবেগময় প্রকল্প রচনা করে। উইটের আশ্রয় চরিত্রের আবিষ্কারে, যা পরিকল্পনায় ছিল তাকেই জ্ঞান নিমিত্তে বুনিয়ে তোলেন। চরিত্র আবিষ্কারে তার প্রতিপাদ্য পাঠ-অভিজ্ঞতা, কখনো ব্যক্তি অভিজ্ঞতা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুরুদ্ধ না হলেও, কিছু কণ্ঠধ্বনির আবেগে তা অস্পষ্ট থাকে না। সম্মুখের দৃশ্যমান বস্তুকে প্রখর করে তোলেন তাঁর সুজিত অমোঘ পর্যবেক্ষণে– 'আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।' চোখের পাতা মাঝে মাঝেই খুব কাঁপে। আমার চোখের ডাক্তার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হয়ে এতো দূরে পৌঁছে গেছে যে, দূরের পাওয়ারটাও আর কাজ করে না। কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি মাকে। সারাদিন-রাত ঘরে বসে বসে বোর হয়ে যাচ্ছি।' এভাবে বিবরণের বিস্তৃতিতে ব্যপকতা, গভীরতা, সজীবতা ও মনীষার প্রবৃত্তি প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। মামুন উইটঋদ্ধ, প্রচলকে আঘাত করেন বর্ণনার চলৎশক্তিতে। গজদন্তমিনার নয়, কালস্পৃষ্ট হয়েই তিনি আবিষ্কারের পরিক্রমা পুনর্গঠন করেন। **ইমতিয়ার শামীম** (জ. ১৯৬৫) রাজনীতিসচেতন, প্রখর উত্তাপতাড়িত। প্রলম্বিত তাঁর গল্প। ডিটেলের ভেতরে থাকে জীবন ও সমাজের আন্তঃপাঠ। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ, ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিসর্বস্ব চরিত্র তৈরি হয় তাঁর গল্পে। অতঃপর ক্রমশ যাবতীয় শোষণ ও প্রতিরোধের শক্তিতে পরিণত হয় তার চরিত্ররা। প্রাণ-উদ্দীপক ভাষায়, গল্পের টানে, বিদ্রূপ কিংবা রঙ্গরস বাদ যায় না। নিরাভরণ; তাই ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনাকে অন্বেষণের কর্মে লিপ্ত হন শামীম। এক্ষেত্রে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত তিনি সচেতন। উদাহরণে আনা যায় "অচরিতার্থ পূর্বজন্ম" এবং শেষদিকের রচনা "জলাভূমি"। ক্লেদাক্ত চরিত্র নির্মিতি পায় শহর বা গ্রাম উভয় পটভূমিতে। তাঁর প্রথম গল্পের বই *শীতঘুমে একজীবন* (১৯৯৬) এরপর *গ্রামায়নের ইতিকথা* (২০০০), *কয়েকটি মৃত মুনিয়া* (২০০২), *মাৎসন্যায়ের বাকপ্রতিমা* (২০০৫) ইত্যাদি। **আহমাদ মোস্তফা কামাল** (জ. ১৯৬৯) প্রত্যেক গল্পেই যেমন মেসেজ থাকে তেমনি এক প্রকার *দ্বিতীয় মানুষ* (১৯৯৮), *আমরা একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছি* (২০০০), *অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে* (২০০৪), *ঘরভর্তি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ্য* (২০০৭)—এসব গল্পগ্রন্থেও মেসেজ আছে। তবে শুধু মেসেজ নয় দার্শনিকতা অনেক যুক্তি পায় আহমাদ

মোস্তফা কামালের গল্পে। চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর মনোজগতের প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এক মনোটোনাস জগত কিংবা আবেগকাতরায় আত্মরতি পেয়ে বসে। কিন্তু কৌশলে দার্শনিক-বীক্ষায় শরীর মনের যাবতীয় সন্তাপ রচিত হতে থাকে। প্রবণতায় এ লেখক একটু আলাদা, গতানুগতিক নয়। কারণ, শেষ পেরেকে পাইয়ে দিতে চান ধ্রুপদী আস্থার স্বপ্নটি। লেখকের রাজনীতি, আর্থ-সমাজ তথৈবচ নয়—সর্বোপরি জীবনবাদই জয়ী সমস্ত ডিটেলের ভেতর দিয়ে। 'এঁকেবেঁকে সে এ পথ থেকে ও পথে ঘুরে বেড়ায়, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই আর বাড়ি যাওয়ার পথটি খুঁজে পায় না ... এক জটিল গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছে...।' গল্পের সামগ্রিক আবহটি এ পথেই বিস্তৃতি—সেখানে স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-ভোগ-বাসনা-চাতুরি সবই থাকে। এরূপে ঘনীভূত সংকট তৈরি করে দিনান্তের দৃষ্টি। গল্পকারের ভাষা সুন্দর, সংহত, বিনয়ী। কিন্তু গভীরতা থাকলেও মাঝে মাঝে অগভীর মনে হয়। দার্শনিক মনটুকু যেন গল্পশরীরের কর্মপ্রবাহে অনাস্থা আনে। গল্পের জমাটবদ্ধ রূপে সেটা একটু বাধাই বটে। **পাপড়ি রহমান** (জ. ১৯৬৫) গল্পের মধ্যে যুক্ত করেন জীবনের সমুদয় বিষয়। নির্বিকার, নির্মোহ এ গল্পকারের গল্পশরীরে ফুল্লরা, লখিন্দর, বেহুলা পুনর্নির্মিত হয়ে প্রকাশিত। পুরাণকে একালের করে তোলায় একদিকে যেমন মেলে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য তেমনি সমকালীন স্বরূপকেও সূক্ষ্মতর করা সম্ভব। পাপড়ি রহমানের গল্প *লখিন্দরের অদৃষ্ট যাত্রা* (২০০০), *হলুদ মেয়ের সীমান্ত* (২০০১), *মহুয়া পাখির পালক* (২০০৪), *অষ্টরম্ভা* (২০০৭), *ধূলিচিত্রিত দৃশ্যাবলি* (২০১০)। *লখিন্দরের অন্ধকার যাত্রা* গল্পের "ঘুম ও স্বপ্নের মাছরাঙা পাখি", "ফুল্লরামঙ্গল কথা" সুন্দর গল্প। এসব গল্পে স্বভাবসুলভ মেয়েলিপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভূমি-মাটির পুত্রের সংস্কার, পুথি-প্রবচনের বিশ্বাস, ক্ষুৎকাতরতার স্বরূপকে তুলে আনেন। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পদ্যাংশও যুক্ত হয়ে সময়ের প্রতীকায়নকে যেন তীব্রতর করে তোলে। **প্রশান্ত মৃধা** (জ. ১৯৭১) প্রথম গল্পগ্রন্থ *কুহকবিভ্রম* (২০০০), *১৩ ও অবশিষ্ট ছয়* (২০০১), *আরও দূর জন্ম-জন্মান্তর* (২০০৪), *শারদোৎসব* (২০০৬), *বইঠার টান* (২০০৬), *গল্পের খোঁজে* (২০১১)। গল্পভাষার নির্মাণকৌশলে তিনি রেখেছেন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। এক ধরনের মাইক্রোস্কোপিক প্রয়াসে তাঁর গল্প; গল্পের নির্মাণপথে চরিত্রের অন্তরদেশ-সম্পর্ক-প্রবাহ ধারাবাহিক বর্ণিত হতে থাকে। যেখানে অসহায়ত্ব, বিকারগ্রস্ততা, অবদমন, ক্লান্তি উঠে আসে। কখনও তিনি প্রান্তমুখি। সে অনুষঙ্গি ভাষাটিও আনেন। তবে যেন জীবনের সবরকম পর্যায়ই গুরুত্ববহ তাঁর রচনায়। সর্বোপরি গল্পকে 'গল্প'করা এবং বলায় তাঁর মুন্সিয়ানার প্রশংসা করতে হয়। **জাকির তালুকদারের** (জ. ১৯৬৫) *স্বপ্নপুরাণ কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* (১৯৯৭) দিয়ে যাত্রা শুরু, তা সম্ভাবনা ও আশান্বিত হওয়ার

সম্ভাবনায় দাঁড়ায়। অবহেলিত জনপদের বিপুল অভিজ্ঞতাকে নিয়ে তাঁর হাতে এখনও পৌরাণিক পুনর্নির্মাণের গল্প জেগে আছে। *বিশ্বাসের আগুন* (২০০০), *কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩), *কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬) তাঁর গল্পগ্রন্থ। রাজনৈতিক গল্প লিখেছেন *হা-ভাতভূমি* (২০০৬) ও *মাতৃহন্তা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭)। তাঁর কিশোর রচনা *চলনবিলের রূপকথা* (২০০৪) ও *মায়ের জন্য ভালোবাসা* (২০১২)। লেখকের ২০১০ এ বেরিয়েছে গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড, *বাছাই গল্প* বেরোয় ২০১৩ তে। জটিল সময় আবর্তের গল্পকার **কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর** (জ. ১৯৬৩)। এ সময়ের বাংলাদেশে ধর্ম-সন্ত্রাস, পুঁজির দাপট, অচল স্বাধীনতা সবকিছুতে আমাদের গ্রাম-শহর যেন নাভিশ্বাস। গল্পকার এ বাস্তবতাকে মূলস্পর্শী করে তোলেন, পরিশোধনের পথ নেই কিন্তু বাসনাগুলো তো প্রচ্ছন্ন তা ব্যবচ্ছেদ করে দেখান। *মৃতের কিংবা রক্তের জগতে আপনাকে স্বাগতম* (২০০৫), *স্বপ্নবাজি* (২০০৭) এমন দুটো গল্পগ্রন্থেই গল্প-উপভোগের সীমানাকে তিনি দিয়েছেন বাড়িয়ে। আচ্ছন্নতা আর কুসংস্কার তাড়া করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যক্তিসর্বস্ব মানুষকে। জীবনকে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। এ কারণে গল্পভাষা যায় বদলে, চাঞ্চল্যময় পরিকাঠামোর জন্য নির্মাণও হয় আলাদা, ফলত পাঠযোগ্যতা অর্জন করে গল্প, পায় উত্তাপমুখরিত শিল্পকাঠামো : 'এসবও ঘটে স্বপ্নেই, তাতে গল্পকার আর তার বউ যেমন থাকে, তেমনি থাকে তাদের বাসা, পুরনো বিমান অফিস। এতে সোহনপুরও থাকে। সেখানে থাকে শ্যামলা বর্ণের মেয়েটিও।' গল্পের কাঠামো প্রস্তুতকরণে স্পেকট্রামের প্রয়াসটুকু ক্রমশ ঘনীভূত হয়, বর্ণনা তাঁর দীর্ঘ, সংলাপ তাৎক্ষণিক। কখনো গল্পকার নিজেই যেন ঘোরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। চরিত্রের সঙ্গে নিজেও মেতে ওঠেন সব তেলেসমাতির কাণ্ডকারকানায়। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর সংক্ষুব্ধ, ধারাবাহিকতায় অসংবদ্ধ, বোধকরি শৈলিসৃজনের পথটি ম্যাজিক্যাল। প্রভাব আছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বা শহীদুল জহিরের, কিন্তু একাট্টা নন। নিজের মতো। ফলে বাচনে কোনোটা দ্রুতলয় আবার কোথাও ধীর–তাতে শিল্পমাত্রা ক্ষণে আড়ষ্ট। তবে এমনটা হয়তো কাল-পরিপ্রেক্ষিত গুণেই সংঘটিত। **ওয়াসি আহমেদ** (জ. ১৯৫৫) *বীজমন্ত্র, তেপান্তরের সাঁকো, শিঙা বাজাবে ইসরাফিল* (২০০৬)র লেখক স্বগতোক্তির ভেতর দিয়ে পৌঁছান অনেক পথ। 'লেকসার্কাসের মাঝারি উঁচু ঘরবাড়ি, আম-নারকেল-নিমগাছের উপর দিয়ে চিলের মতো উড়ে উড়ে ঝুপ করে ধানমণ্ডির লেকে গিয়ে নামল'—এ রূপের পরিবেশ বাড়তে থাকে, গল্পের আয়োজনে আসে মগ্ন-আত্মলীন পরিবেশ, এরপর বের হয় চরিত্র সুখী যুবতী আর মোটা বেড়াল। খুব মজার তাঁর গল্প-উচ্চারণ। মধ্যবিত্ত আবেগের সঙ্গে কর্কশ বাস্তবতা। মাঝে আসে মিথ, প্রত্ন-বুদ্ধি, 'ইসরাফিলের শিঙা' এসব। কিন্তু প্রধানত নাগরিক বা প্রান্তিক মানুষের মানচিত্রই

উঠে আসে তাঁর গল্পে। **আকমল হোসেন নিপু** (জ. ১৯৬২) ডট চিহ্ন ব্যবহার করে পাঠকের সঙ্গে চেতনাগত সম্পর্ক রচনা করে দায়বোধের ক্ষেত্রটিকে স্পষ্ট করেন। বর্তমান সময়টায় রাজনীতিক প্রবণতা সবার গল্পে থাকলেও প্রকৃতির আবহে বা ডিটেইলের মধ্যে বৈষম্য-নৈরাজ্যের প্রকাশ এবং সেখানে বিদ্রূপের বার্তা প্রদান বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে তাঁর লেখায়। 'নেজাম আলী এখন আর গোলাপজানের পাশে নেই। রোদভরা সকালের ঘাসে ঘাসে সে হেঁটে বেড়ায় সারা গ্রাম, আল ধরে এগ্রাম, ওগ্রাম! জয়নাল আরেফিন তার হাত ধরে আছে সেই নির্বাচনের আগের মতোই। নেজাম আলীর মাথার উপর নিরাপদ চাল থাক আর না থাক, ভিটে জুড়ে মাটি খুড়ুক কেঁচো, পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি—তাতে কী! জননেতার হাত ধরে পথ চলতে গিয়ে তার বুকে যেন এখন সারা দুনিয়ার সকল যন্ত্রণা, আনন্দ আগলে নেবার অসীম ক্ষমতা পেয়েছে। নেজাম আলীর ক্ষুধা জাগে না, তৃষ্ণা জাগে না।' বিবরণ নয়, আর্থ-রাজনীতিক বাস্তবতার উত্তাপে ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র গঠিত হয়। তবে বর্ণনার কোনো পর্যায়ে তাৎক্ষণিক দুর্বলতা আছে, যেখানে কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে চরিত্র সরলসূত্রে বাধা পড়ে। এটুকু সংযতস্বরে রক্ষা পেলে গল্প আরও আস্বাদনযোগ্য হতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ কিংবা সীমানা নির্ধারণের পর্বে; বিশেষ জনগোষ্ঠীর সংগ্রামে-দ্বন্দ্বের কাহিনিতে মাঝে মাঝে তাঁকে অসচেতন মনে হয়। তাঁর গল্প : *জলদাসের মৎস্যঘ্রাণ* (১৯৯৮), *বুড়ি চাঁদ ডুবে যাবার পরে* (২০০৩), *আমরা খুব খারাপ সময়ে বেঁচে আছি* (২০০৬)। **মশিউল আলম** (জ. ১৯৬৬) ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা কিংবা পাঠ-অভিজ্ঞতায় *আবেদালির মৃত্যুর পর* (২০০৭) গল্পটি রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গল্প *রূপালি রুই ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৪), *আমি শুধু মেয়েটিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম* (১৯৯৯), *মাংশের কারবার* (২০০৪)। এ সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী বাস্তবতার ত্রস্ত-ভয়শঙ্কুল পরিবেশটি তিনি গল্পে কায়েম করেন। মশিউল আলমের গল্প– সাজেশান নয় উত্তরও নয়, তিনি জীবনের নিষ্ঠুর ও মর্মন্তুদ রূপটির প্রকাশক। অদিতি ফাল্গুনী লিখেছেন *ইমানুয়েলের গৃহে প্রবেশ* (১৯৯৯), *তিতা মিঞার জঙ্গনামা* (২০০৯), *চিহ্নিত বারুদ বিনিময়* (২০০৭), *বানিয়ালুকা ও অন্যান্য গল্প* (২০১৩), *ধৃত-রাষ্ট্রের বালিকারা* (২০১৪)।

চতুর্থ অধ্যায়

নাটক

সাতচল্লিশ সময়-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের উৎস ও উৎপত্তি নির্ধারণে রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বটি গুরত্বপূর্ণ। কবি শাহাদাৎ হোসেন লেখেন *মস্‌নদের মোহ*। প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল লেখেন *কায়েদে আজম*। নাটককে শিল্প বিবেচনায় না রেখে সময়ের প্রয়োজনে এ ধরনের নাট্যকার তৈরি হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তবতা তাই ছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের নাটক রচনা কিংবা মঞ্চে আসা তখনও দূরপরাহত ব্যাপার। আগে এর চর্চা তেমন ছিল না। বিভাগ-পূর্ব নাটকের ধারা দেশভাগের গ্রাসে পড়ে। এবার নতুন চেতনায় বিভাগোত্তর বাঙালি মুসলমান ঐক্যে পৌঁছতে চায়। ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তা অর্জিত হয়। আমরা দেখি পঞ্চাশের কালে গ্রাম-গঞ্জে নাটক লেখা হয় মঞ্চস্থও শুরু হয়। সেখানে নারীদের অংশগ্রহণ তেমন থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা হয়। কল্যাণ মিত্র, এম. গোলাম রহমানের অধিকাংশ নাটকই বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকাকেন্দ্রিক যাঁরা নাটক লেখেন ইব্রাহিম খাঁ, ফররুখ খলিল পাকিস্তানকে অবলম্বন করে নাটক লেখেন। ঠিক একইরূপে মুনীর চৌধুরী জেলে বসে *কবর* রচনা করেন। তবে মধ্যবিত্ত-অনুবর্তী চিন্তা-ভাবনাই নাটকে লক্ষণাক্রান্ত হয়। বস্তুত সমাজ বিধৃত রূপটি তখন মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকট, সংশয়, দ্বিধা, ভয়, ঐতিহ্যপ্রীতি প্রকরণবন্দি হয়। এভাবে ক্রমশ এগিয়ে চলে নাটক, বিভিন্ন কালনিরিখে। বাঙালি চেতনা, অস্তিত্বের পরীক্ষাটিও এর ভেতরেই চলে। প্রসঙ্গত, নাটক অনুবাদও হয়। মুনীর চৌধুরী পাশ্চাত্য নাটক অনুবাদ করেন, সাঈদ আহমদ পাশ্চাত্য ফর্মকে নাটকে আনেন।

পূর্ব-বাংলায় বৃটিশ শাসনামলে থিয়েটারের চর্চা হয়েছে। নানা অঞ্চলে নাটক রচনা ও তার মঞ্চায়নও হয়েছে। কিন্তু বিভাগোত্তরকালে একদিকে আত্মপরিচয়ের সংকট অন্যদিকে অধিকারের প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়ে উঠলে নাটকের ধারা একটু অন্য প্রকৃতি অর্জন করে। এ পর্যায়ে কেউ লিখেছেন ঐতিহাসিক নাটক কেউবা উত্থিত মধ্যবিত্তের প্রবণতা নিয়ে নাটক লিখেছেন। ইসলামিক চেতনা ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে অনেকটা রক্ষণশীল (congervative) ভাবধারায়ও নাটক

রচনার চেষ্টা চলে। এমন নাটক প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছায় আবার অনেকটা শহরকেন্দ্রিক হয়, ইতিহাসগত-বীক্ষণে। তবে রক্ষণশীল-অনুবর্তী যাঁরা তুরস্ক-ইরান-পারস্য-আরব চেতনায় দৃশ্যায়িত হন—ঐ ইতিহাসের আদলেই। এসব পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। যেখানে যুক্তির চেয়ে আবেগের স্ফূর্তি বেশি। এ ধারায় আকবরউদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহীম খলিল প্রমুখ নাট্যকার। ঠিক এর বিপরীতে প্রগতিপন্থি ধারার (মুনীর চৌধুরী একটু পরে সাইদ আহমদ) কথা আগেই বলা হয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ও তাদের সমাজ শ্রেণিস্তরের ভাঙা-গড়ার প্রতিরূপে প্রগতিশীল ও মানবতার আদর্শগত চেতনায় নাটক প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। ১৯৫৮র সামরিক শাসনের পর থেকে তা প্রগাঢ়রূপ পায়। বিপরীতে ক্রমশ অবসিত হতে থাকে রক্ষণশীল অংশটি। এ পর্যায়টি যে মাপেই তৈরি হোক, পূর্ব-বাংলার নাটক, নাট্য-পরিচর্যায় তা গুরুত্ববহ। এ প্রবণতায় লেখেন শওকত ওসমান, নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, আবুল ফজল, ওবায়দুল হক প্রমুখ। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী এ ধারা প্রতিবাদের শক্তিতে কার্যকর হতে ০০০থাকে। এবং এ পর্যায়ে তা আন্তর্জাতিকতায়ও যুক্ত হয়। তবে 'রাসিন, কর্ণিল কি শেক্‌সপীয়রের আদর্শ আমাদের নাট্যকারদের জন্য কোনোদিনই যথেষ্টরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আমরা কেবল বড় বড় চিন্তার আবশ্যকীয় সার সরলতম আঙ্গিককে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দি—এখনও দিচ্ছি। এই ঐতিহ্যের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের অসন্তোষের অভাবই নব-নাটক সৃজনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায়।' তবুও প্রচেষ্টাটুকু চলেছে। বিশেষ করে এ সময়ের নাট্যজগতের নক্ষত্র 'ড্রামা সার্কেল' (১৯৫৬)র মাধ্যমে। সামরিক-আধাসামরিক রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ভেতরেই দক্ষ হাতে এর কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে একদিকে রবীন্দ্র নাটকের পুনরাভিনয় যেমন চলতে থাকে তেমনি বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতার তাণ্ডব উপচে পড়ে সর্বত্র। এ পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সিকান্‌দার আবু জাফর, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ নাট্যকার উঠে আসেন। এদের নাটকে জীবনকে বিচিত্র করে দেখার প্রয়াস মিলেছে। বিশেষ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সাঈদ আহমদ-এর নাটকে এসেছে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রয়োগ। দারিদ্র্যের কষাঘাত, ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতা, অবচেতন-অন্তর্দৃষ্টি উঠে আসে নাটকে। কিছু ব্যঙ্গ বা প্রতীকী ঢংয়ের নাটকও লেখা হয়। কিন্তু জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ও বিস্ফোরণ গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী একাত্তরে।

বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকার (১৯৪৭-১৯৭০)

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাট্যকার

এক.

ধর্মীয় মনোভাব ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের দৃষ্টিপাত

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) লিখেছেন ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের অবলম্বন তার নাটকে থাকলেও; প্রধানত পটভূমি হিসেবেই কাহিনিতে তার গুরুত্ব পেয়েছে। নাটকের নির্মিত চরিত্রের ভেতরে ইতিহাসের অনালোকিত দিক যেমন অঙ্কিত আছে তেমনি কল্পনার পরিসরে তা সাহিত্যও হয়ে উঠেছে। যেমন *সরফরাজ খাঁ* (১৩২৬), *আনারকলি* (১৯৪৫), *নবাব আলীবর্দ্দী* (১৯৪৬) প্রভৃতি নাটক। এর ধারাবাহিকতায় লেখা *মস্‌নদের মোহ* (১৯৪৬)। দুটি নাটিকা *শা-জাহান-আলমগীর সংবাদ* (১৯৪১), *জাহাঙ্গীরের আত্মসমর্পণ* (১৯৪২)। *শা-জাহান-আলমগীর সংবাদ* একটি কাব্য নাটক এটি বের হয় মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৪৮-এর কার্তিক সংখ্যায়। *সরফরাজ খাঁ* নাট্যকারের প্রথম নাটক। নাট্যকার ভূমিকায় লিখেছেন 'যে মূল ঘটনা লইয়া 'সরফরাজ খাঁ' লিখিত হইয়াছে, তাহা খাঁটি ঐতিহাসিক তবে নাটকীয় সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।' বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে নিয়ে লেখা *মস্‌নদের মোহ*। স্টুয়ার্ড ও মুতাক্ষরীণ অবলম্বনে লেখকের এ নাটকটি রচিত। তাঁর *সোনার কাঁকন* উপন্যাস অবলম্বনে লেখা *মসনদের মোহ*। 'রাজনৈতিক স্বার্থলোলুপতা এবং দ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও সমাজগত মানবীয়বোধ, উভয়ের মধ্যে ক্ষণিক দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের নিশ্চিত অবসানে প্রশান্তির প্রশ্রয়' *মসনদের মোহ* নাটক। কবির স্ফূর্তি বিরাজিত শাহাদাৎ হোসেনের নাটকে। মরুর কুসুম উপন্যাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার লেখেন *আনারকলি* নাটকটি। 'ইতিহাসের জটিলতা বর্জিত প্রণয়মূলক নাটক' এটি। অধিকাংশ নাটক বিভাগ-পূর্বকালের হলেও বাঙালি মুসলিম পরিপ্রেক্ষিত কিংবা বাংলাদেশের নাটকের ধারাটি অবলোকন করা যায় শাহাদাৎ হোসেনের নাটকে।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), 'প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ' হিসেবে পরিচিত। জাতীয়তাবাদের উত্থান কামনায় ইব্রাহীম খাঁ রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক *কামালপাশা* (১৩৩৪ ব.)। *কামাল পাশা* আধুনিক তুরস্কের উদ্‌গাতা ও মুসলিম পুনরুত্থানের প্রেরণা। বাংলাদেশের নাটকের প্রথম পর্যায়ে এমন উত্থিত চেতনা অনেক মাত্রিক উচ্চারিত। এ ধারায় তাঁর অন্য নাটক *আনোয়ারপাশা* (১৩৩৭ ব.), *ঋণ পরিশোধ* (১৯৫৫), *ভিস্তি বাদশা* (১৩৫৭ ব.), *মর্ম্মর স্বপ্ন* (১৩৩৩), *কাফেলা*। তবে ইব্রাহীম খাঁ যতোটা কহিনিকার ততোটা নট্যকার নন। 'ঐতিহাসিক

নাটকগুলোর ঘটনা এতোদ্দেশীয় নয় আধুনিক তুরস্কের নবজন্মের কথা এবং কল্যাণব্রত কামাল পাশার জয়োচ্চারণ এ নাটকগুলোতে নতুনত্ব এনেছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজ উত্থিত জাতীয় অনুপ্রেরণা আবেগাশ্রয়ী সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত মুসলিম পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষার প্রচারই ইব্রাহীম খাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।' নাট্যকার এর ভেতর দিয়ে মূলত পাকিস্তানী তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। উদ্ধৃতি :

> আছীয়া ॥ ... সাবধান, কামাল আল্লার বাণী তোমার বুকে, পবিত্র তলোয়ার তোমার হাতে শুধু অসত্যের বিরুদ্ধেই যেন তোমার এ তলোয়ার চালিত হয়, নারী, শিশু, শান্তিপ্রিয় নাগরিক ও আশ্রয়প্রার্থীদের উপর জুলুম ক'রে পিতার তলোয়ারের অবমাননা করো না, ইসলামের আদর্শ ক্ষুণ্ন করো না, আমি পরলোকে ব'সে খাঁটি মুসলিম সৈনিক দেখতে চাই।
>
> নাট্যকারের আবেগাশ্রয়ী এমন নাটকে কৌশলগত দুর্বলতা দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর স্বীকারোক্তি : 'অভিনয় উপযোগী নাটকের টেকনিকের দিকে আমি আদৌ মনোযোগ দেই নাই। ... বহু চরিত্র, লম্বা লম্বা বাক্য, কঠিন ভাষা, বড় বক্তৃতা...'। *আনোয়ার পাশা* সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যায়। তবুও নাটকের মানবীয় দিকটি বিশেষভাবে পুনর্বিবেচিত হয়েছে তাঁর নাটকে।

আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮) নাট্যকার হিসেবে খ্যাত। এমনটা সত্য যে, মুসলিম আবেগ, শৌর্য-বীর্যগাথা, ঐতিহ্যের আনুগত্য ও প্রেরণা থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার আকর্ষণ পরাধীন ভারতে অনেকভাবেই অনেকের মধ্যে ছিল। বিশেষত সেখানে 'নায়ক' সৃষ্টির প্রত্যয়টি ছিল দৃঢ়বদ্ধ। কাঙ্ক্ষিত জাতিত্ব চেতনাকেই তাদের উত্থানের পথ মনে করে ইতিহাস বা ঐতিহ্যিক পুনর্নির্মাণ কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে কল্পনা ও ইতিহাসের সম্মিলিত-সংহত শিল্পপ্রয়াসের চেষ্টা করেছেন নাট্যকার আকবরউদ্দীন। বাঙালি মুসলিম নাট্যকার হিসেবে প্রারম্ভিক পথনির্মাণে আকবরউদ্দীনের *সিন্ধু বিজয়* (১৯৩০), *নাদির শাহ* (১৯৫৩) নাটক। *সিন্ধু বিজয়* মুসলিম সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের কাহিনি। *নাদির শাহ* দস্যু সর্দার, ইরানের বাদশাহ ও দিগ্বিজয়ী হিসেবে নাটকে থাকলেও তার মানসিক দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নাট্যকারের হাতে আকর্ষণীয় নাট্যগুণ পেয়েছে। নাট্যকারের রূপকাত্মক নাটক *বন্দীর মুক্তি* (১৩৩৪); সামাজিক নাটক হলেও *আজান* (১৯৪৬) ও *অভিশাপ* (১৯৪৭) ইসলামের ঐতিহ্য ও প্রচারের উদ্দেশেই রচিত। *মুজাহিদ* (১৩৭০), *সুলতান মাহমুদ* (১৩৩৭), *ঝি ফেডারেশন* (১৩৫৩) তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য নাটক। নাট্যকারের এসব নাটকের শিল্পগুণ যাই

থাক কাহিনি পরিবেশন কুশলতা প্রশংসনীয়। মুসলিম জীবন, ধর্মীয় সংস্কৃতি চেতনা নাটকের অন্যতম বিষয় হলেও বাংলাদেশের নাটকে বৃত্ত (plot)র পরিচর্যার পথটি তৈরি হয়েছিল এসব নাট্যকারের ভেতর দিয়ে।

জাতীয়তাবাদী চেতনা অনেক নাট্যকারের মতো **ইব্রাহীম খলিল** (১৯১৬-১৯৭৪)র নাটকেও সৃজ্যমান রূপ লাভ করেছে। তাঁর প্রথম রচিত নাটক *সমাধি* (১৯৫৭)। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এ নাটকে তীব্রতর রূপ লাভ করেছে। খ্রি. ৭১০ থেকে ৭১২ খ্রি. পর্যন্ত দামেস্কের খলিফা ওয়ালিদের সেনাপতি মূসা বিন মূসায়ের ও তারেক বিন জেয়াদের স্পেনে বিজয় অভিযানের কাহিনি নিয়ে রচিত *স্পেন বিজয়ী মুসা* (১৯৪৯) নাটক। রোমাঞ্চকর ঘটনা এতে থাকলেও পরিচয় মেলে অভূতপূর্ব বিজয়বার্তার বাস্তব সূত্র। আকর্ষণীয় কাব্যভাষা, ওজস্বী সংলাপ, স্নিগ্ধ প্রলম্বিত ঐতিহাসিক উপচার নাটকের উদ্দীপনাকে অনেকান্ত করে তুলেছে। 'নাট্যকার ইব্রাহীম খলিল তার নাটকে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। তিনি সেই আদর্শ সামনে রেখেই চরিত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন।' কাব্যময় উচ্ছ্বাস ও ইতিহাস অবলম্বি অন্য নাটক *ফিরিঙ্গী হার্মাদ* (১৯৫৩), *ফিরিঙ্গীরাজ* (১৯৫৪), *কিসসা নয়, কাহিনী* (১৯৫৬), *নূরজাহান* (১৯৭০)। *ফিরিঙ্গী হার্মাদ* মগ ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের আক্রমণের এবং নিপীড়ন নির্যাতনের কাহিনি। ইব্রাহীম খলিল তার নাটকে ইসলামী ভাবাদর্শই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এমন স্বপ্নদর্শনই তাঁকে নাট্য রচনায় প্রলুব্ধ করেছে।

দুই. আধুনিক বোধ, ইতিহাস-পুনর্গঠন, রাজনীতি-সমাজচেতনাধর্মী নাটক

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

বাংলাদেশের সাহিত্যের আধুনিকতার প্রবক্তা, প্রবাদপ্রতীম, পুরোধা ব্যক্তিত্ব মুনীর চৌধুরী। ব্যতিক্রমী নাট্যকার, অসামান্য তীক্ষ্ণধী সমালোচক, মানবমনোজ্ঞ মনীষী, দেশপ্রেমিক মুনীর চৌধুরীর মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি : *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬১), *চিঠি* (১৯৬৬)। এছাড়া তাঁর তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বারটি একাঙ্কিকা। এ তিনটি গ্রন্থ : *কবর*, *দণ্ডকারণ্য*, *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*। ১৭৬১-র পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিকে অবলম্বন করে লেখা *রক্তাক্ত প্রান্তর* মুনীর চৌধুরীকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছে। কারণ, সপ্রতিভ ও আধুনিক জীবনদৃষ্টির প্রকাশ—যেখানে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতার কথা আছে; আর আছে সৃজিত চরিত্রে হৃদয়াবেগ ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বন্দ্বের কথা। *রক্তাক্ত প্রান্তর* মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) রচিত *মহাশ্মশান*-অবলম্বি হলেও সর্বজনপ্রিয় প্রবৃত্তির রূপায়ণ, ইচ্ছাবাসনার দ্বন্দ্ব নাটকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনকেই যেন স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা, রসবোধসম্পন্ন শ্লেষ-ব্যঙ্গ, মনুষ্যচরাচরের বিবিধ বিধানের কটাক্ষ নাটকটিকে সর্বজনপ্রিয় করে তোলে। মধ্যবিত্ত জীবনের

ক্রিয়াকর্মই তাঁর নাটকের বিষয় হয়েছে। দেশ-সমাজ ছাপিয়ে সবকিছু দিবালোকের সত্যতায় এক রকমের অনিবার্যতা অর্জন করে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অংশ হিসেবেই তাঁর এ নাটকটি লেখা—যেখানে মুসলিম ও ইসলামী জীবনধারার প্রকাশ একপ্রকাশ অনিবার্যই ছিল। 'যুদ্ধর ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানবভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে, নাটকে আমি তাকেই প্রাণদানের চেষ্টা করেছি।'

রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকে মারাঠা নেতৃত্বে বালাজি রাও পেশোয়া অপরদিকে মুসলিম নেতৃত্বে আহমেদ শাহ আবদালীর সংঘটিত যুদ্ধে মারাঠার পরাজয় দেখানো হয়েছে। নাটকের নায়ক ইব্রাহিম কার্দি আর নায়িকা জোহরা, কার্দি মারাঠা-পক্ষে যুদ্ধ করে আর বিপরীতে তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী জোহরা :

> কার্দি : তুমি এসেছো জোহরা। আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হতে পারে না।
>
> জোহরা : আমিও জানতাম আমি আসব।
>
> কার্দি : কতদিন তোমাকে দেখি না। তৃষ্ণায় দু'চোখ আমার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতদিন তোমার এই রূপ আমি দেখি নি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির উপর দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহেদী পাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ নীমিলিন চোখ– এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে।
>
> জোহরা : আমি পরীক্ষা করতে আসি সি। গ্রহণ করতে এসেছি।
>
> কার্দি : আমি তো কবে থেকেই দেউলিয়া। দান করব কোত্থেকে?

কিন্তু জোহরা তো পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চায়। মারাঠারাই তাকে হত্যা করেছে। কার্দিও তার দুঃসময়ের বন্ধুদের ছেড়ে যেতে পারে না। জোহরা বলেছে :

> আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারব না। আমি মেহেদি বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কি করে?

এখানে যুদ্ধ হৃদয়ের, রক্তাক্ত হয়েছে জোহরার হৃদয়, বিজেতারা বন্দী হয় বিজয়ীদের হাতে। মর্মস্পর্শী এ কাহিনীতে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে মানব হৃদয়ের হাহাকার। এখানে মুনীর চৌধুরী পূর্বসূরি নাট্যকারগণের চেয়ে অনেক বেশি সফল এবং সার্থক।

মুনীর চৌধুরীর মৌলিক একাঙ্কিকার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লেখা

"মানুষ"(রচনা ১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০), ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা "কবর"(রচনা ১৯৫৩, ১৯৬৬, বাংলাদেশে প্র. অ. ১৯৭২), পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড রীতিতে পৌরাণিক পুনর্নির্মাণ "দণ্ডকারণ্য" (১৯৬৬) তীক্ষ্ণধী সংলাপে উজ্জ্বল ও জীবন্ত। প্রতিবাদী নাটিকা *কবর* মুনীর চৌধুরীর সার্থক রচনা। বিভাগোত্তর সময়ে রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের শোষণ, নিপীড়নকে প্রতীকী ইঙ্গিতে এখানে শুধু তুলে আনা নয়; শাসক চরিত্রের স্বরূপ ও সামষ্টিক প্রতিরোধের শক্তিকেও নাটকে দেখানো হয়েছে। আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতে : 'এই সময়সীমার ভিতরে রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া এবং অর্থনৈতিক পুরর্বিন্যাসের ফলে বাংরাদেশে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে মুনীর চৌধুরীর নাটক প্রধানত তারই প্রতিকৃতি।' হাফিজ, নেতা, মুর্দা ফকির এমন চরিত্রকে বায়ান্নর রক্তাক্ত পটে স্থাপন করে চরম উৎকণ্ঠার পরিবেশে লেখক প্রখর দ্বন্দ্বকে তুলে এনেছেন। এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর সফলতা সংযত সংলাপে অধিকতর ব্যঞ্জনায় বাস্তবতাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলায়। তাঁর অন্যান্য মৌলিক একাঙ্ক নাটক নওজোয়ান *কবিতা মজলিশ* (১৯৪৩), *সংঘাত* (১৯৪৩), *গুণ্ডা* (১৯৪৪), *একটি মশা* (১৯৮২), *নেতা* (১৯৮২), *ঢাকা* (১৯৮২), *গতকাল ঈদ ছিল* (১৯৮২), *একাঙ্কিকা* (১৯৪৫), *রাজার জন্মদিন* (১৯৪৬), *বেশরিয়তি* (১৯৪৭), *পলাশী ব্যারাক* (১৯৪৮), *ফিটকলাম* (১৯৪৮), *আপনি কে* (রচনা ১৯৪৮, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫), *নষ্ট ছেলে* (১৯৫০), *মিলিটারী* (১৯৫০), *দণ্ড* (১৯৬৬), *দণ্ডধর* (১৯৬৬), *একতলা দোতলা* (১৯৬৫), *কুপোকাৎ* (১৯৬৬), *মর্মান্তিক* (১৯৬৭), *বংশধর* (১৯৬৭)।

নষ্ট ছেলে নাটকের মূল দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে সক্রিয় রাশেদা ও পাকিস্তানী ধ্বজাধারি বাবা এরতাজুলের আদর্শ ও দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। একজন নারীর সংগ্রামী-রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠার ঘটনাই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। নাট্যকার নবীন-প্রবীন দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, প্রগতিশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ *নষ্ট ছেলে*। লেখকের *মানুষ* নাটকটি লেখা হয়েছে দাঙ্গা নিয়ে : 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুলচাকবাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।'

কবর মুনীর চৌধুরীর নাট্যমেধার সফল রূপায়ণ। 'রণেশ দাশ গোপনে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সামনে একুশে ফেব্রুয়ারী। একটা নাটক লিখে দিতে হবে। জেলখানাতে অভিনীত হবে। রণেশদার হুকুম, আমাকে লিখতেই হলো নাটক। সেটি কবর।' (*কবর* প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার)। *কবর* নিঃসন্দেহে আধুনিক নাটক। ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত থাকলেও কার্যত রাষ্ট্র বনাম জনতা, নেতার বিপরীতে মুর্দা ফকিরের বিদ্রূপাত্মক প্রতিক্রিয়া, হানা দেওয়া

তীক্ষ্ণ উইট বেশ উপভোগ্য। সংলাপ শক্তিশালী, বুনোট নাট্যভাষা, সবকিছু ছাপিয়ে ফর্মে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাবলীল প্রয়োগ—নিশ্চিতঅর্থেই বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে আলোকসঞ্চারী পদক্ষেপ। ঠাসা গদ্যে একটুও অমনোযোগ হওয়ার সুযোগ নেই, মঞ্চ-পরিকল্পনাটিও নব-অভিযাত্রার দিকপ্রসূন। পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব (Bury The Dead) এর কথা উড়িয়ে দিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং, এটি তাঁর স্বসৃষ্ট– যেখানে অ্যাবসার্ড ফর্মের প্রয়োগ আছে। উদাহরণ :

নেতা : (চমকিয়া) কে? এটা কি আবার?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কি চাও?

গার্ড : গাড়ীতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরী নাই।

হাফিজ : (প্রথম লক্ষ্য করিল যে, মঞ্চ খালি! ভাল করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড্। সব কাজ খতম তো? গুড্ সব কাজ খতম ষ্যার। নীট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার। ভাল করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম!

গার্ড : কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর? খুইজা দেখুন?

নেতা : না চলো?

হাফিজ : কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্তানে এরকম কতো কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার... মানে...

নেতা : হুম। চলো! আর দ্যাখো মুর্দা ফরিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। (বুকে হাত চাপিয়া ধরে)

উপর্যুক্ত অংশের প্রধান ফোকাস মুর্দা ফকির। নেতার ভয়-আতঙ্ক-অস্বস্তির অকুস্থল মুর্দা ফকির। কিন্তু সেটি সংলাপে ক্রম-ক্রিয়ারত, পরিবেশ এবং আবহ-সংকেতময়তার ভেতর দিয়ে। রাষ্ট্রের অনস্তিত্ব ব্যক্তি তথা নেতার দ্বিধান্বিত সত্তায় চিহ্নিত। নেতা এখানে ভুঁইফোড়, ফাঁপা, গ্লানিযুক্ত, ক্লেদাক্ত ও হতাশাকাতর। সে বিষয়টি বিশেষ ফর্মে অনুভবগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নাটকে। একাঙ্কিকার ভেতরে সমস্ত টেনশন যেন ঠাসা, পরিপূর্ণ।

মুনীর চৌধুরীর পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরিত নাটক : জর্জ বার্নাড শ'র *You never can tell*-এর রূপান্তর *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৭), জন গলস্ওয়ার্দীর *The silver box*-এর রূপান্তর *রূপার কৌটা* (১৯৬৯), জোহান অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গের *The father*-এর রূপান্তর *জনক* (১৯৭০)।

রূপান্তরিত একাঙ্ক নাটক : *স্বামী সাহেবের অনশনব্রত* (১৯৪৬), *জমা খরচ ও ইজা* (১৯৬৮), *মহারাজ* (১৯৬৮), *গুর্গন খাঁর হীরা* (১৯৬৮), *ললাট লিখন* (১৯৬৯)

অনূদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক : উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার অবলম্বনে 'টেমিং অব্ দি শ্রু'র অবলম্বনে *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০)। এ নাটকে অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে মুনীর চৌধুরী প্রকৃত নাটকীয় আবহ সৃষ্টি, দক্ষ সংলাপ তৈরি এবং রসবোধের তীক্ষ্ণ পরিমার্জনা এনে ইন্দ্রিয়গ্রামে যথেষ্ট প্রাণ সৃষ্টি করেন। নাটকটির অনুবাদক হিসেবে মুনীর চৌধুরী একটি দৃষ্টান্ত।

অনূদিত রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক : শেকসপীয়রের *ওথেলো*, টেনেসী উইলিয়ামস-এর এ স্ট্রীটকার নেম্‌ড্ ডিজায়ার অবলম্বনে *গাড়ীর নাম বাসনাপুর*, রোমিও-জুলিয়েট, শেকস্‌পীয়রের মাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নার্থিং-এর অনুবাদ *অকারণ ডামাডোল*, জর্জ বার্নার্ড শ'র *ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান*, ইউজীন ও'নীল মর্নিং বিকা্স্ ইলেকট্রার অনুবাদ *ইলেকট্রার জন্য শোক*, শেরিডানের *দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল*।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে আবুল ফজলের অবদান তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। নানা রকমের নাটক তিনি রচনা করেছেন। আবুল ফজলের একাঙ্কিকা *একটি সকাল* (১৯৩৬), *আলোকলতা* (১৯৩৬), *স্বয়ম্বরা* (১৯৬৬)। এসব একাঙ্কিকায় ত্রিশের সাহিত্যান্দোলন ও তৎকালীন মনোভঙ্গির ছাপ বিরাজমান। *কায়েদে আজম* (১৯৪৬) তাঁর জীবনীভিত্তিক রচনা। পাকিস্তানের জনক এ নেতার জীবনাদর্শ নিয়ে এ নাটক। নাট্যকার লিখেছেন : 'কায়েদে আজম ছিলেন স্বভাব নিয়মতান্ত্রিক, – সার্থক নাটক রচনার জন্য য়্যাকশন্ (ঘটনার) দরকার, তাঁর জীবনে নাটকীয় ঘটনার ছিল একান্তই অভাব। কায়েদে আজম যে ধরনের নাটক, তাতে কালের পরম্পরা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, চরিত্রই এখানে মুখ্য, ঘটনা নেহায়েৎ গৌণ।' এটি ইতিহাস-আদিষ্ট চরিত্র হলেও নাটকীয় গুণ রক্ষার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। গোগোলের গল্প অবলম্বনে আবুল ফজলের রূপান্তরিত নাটক *ছদ্মবেশী* (১৯৭০)। একাঙ্কিকা নাটকে তাঁর নাট্যপ্রতিভার ছাপ ফুটে উঠলেও বস্তুত প্রবন্ধ এবং কথাসাহিত্যেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। *প্রগতি* (১৯৪৮) আবুল ফজলের অন্য নাটক।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬)

আ.ন.ম. বজলুর রশীদের বিপুল রচনাসম্ভারে কবি ও নাট্যকার হিসেবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। বাংলাদেশের নাটকের দৈন্যদশা থেকে মুক্তির প্রয়াসে আ.ন.ম.

বজলুর রশীদের অবদান অনস্বীকার্য। মুনীর চৌধুরী তাঁর *উত্তর-ফাল্গুনী* (১৯৬৪) সম্পর্কে বলেছেন, 'সংলাপ সর্বত্র মধুর এবং মার্জিত। কোনো কোনো স্থলে অলঙ্কারমণ্ডিত রহস্যালাপের কৌশলময় ব্যবহারে নুরুলমোমেনী সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছেন।' এমন মন্তব্যে বিভাগোত্তর সময়ের ক্ষণজন্মা নাট্যকারদের অনুসারিতে দাঁড়িয়ে যান আ. ন. ম. বজলুর রশীদ। আমাদের জাতীয় জীবনধারার গভীরে নাটক আদৃত হয়নি; অভিনয়যোগ্য নাটক তো আরও দূরপরাহত ছিল। এ বাস্তবতায় নাট্যকারের *রূপান্তর* (১৯৭০); বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন, বিজ্ঞান-বীক্ষা, সম-অধিকার সর্বোপরি পুঁজিবাদের আগ্রাসী তৎপরতা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে নাটকীয়তা পায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রঙ্গমঞ্চ ও বাস্তব জীবনকে এক সমীকরণে উপস্থাপিত করা। এর জন্য নাট্যকারের দৃশ্যনির্মাণ, সংলাপ বয়ন, দ্বন্দ্বময় পরম্পরা তৈরি অনিবার্য। আ. ন. ম. বজলুর রশীদ এক্ষেত্রে সার্থক বলা চলে। তাঁর অন্য নাটক *ঝড়ের পাখি* (১৯৫৯), *সংযুক্তা* (১৯৬৫), *উত্তরণ* (১৯৬৯), *শিলা ও শৈলি* (১৯৬৭), *সুর ও ছন্দ* (১৯৬৭), *যা হতে পারে* (১৯৬২), *একে একে এক* (১৯৬৯), *ধানকমল* (১৯৬৯), *উত্তরণ* (১৯৬৯)। আ. ন. ম. বজলুর রশীদের *ধনুয়া গাঙের তীরে*, *কোন এক দীপক সন্ধ্যায়* এবং *মেহের তোমার নাম*-এর সংকলন *ত্রিমাত্রিক* (১৩৭৩) কাব্যনাট্য। তাঁর সব নাটকই শিল্পোত্তীর্ণ নয়—তবে নাটকে শিল্প বিনির্মানের পথটি তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে। সমাজের প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিকতা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আশাবাদ তাঁর নাটকে আছে। ভোগসর্বস্ব পুঁজিবাদী সমাজের উল্লম্ফন, মিথ্যা অহংকার, নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তত্ত্ব নাটকে চরিত্র সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত *রক্তকমল*। এছাড়া তিনি কিছু কাব্য-নাটিকা লিখেছেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

কথাশিল্পী শওকত ওসমান নাট্যকার হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাটক অনুবাদও করেছেন। জার্মানির নাট্যকার মলিয়েরর নাটকের অনুবাদ করেছেন *মলিয়েরর পাঁচটি নাটক* (১৯৬৫) শিরোনামে। এছাড়া *তস্কর ও লস্কর* (১৯৪৫) তাঁর দুঅঙ্কে সমাপ্ত সামাজিক নাটক। মানবিক মূল্যবোধ, জীবনের প্রতিরোধী পর্যায় চিহ্নিত শওকত ওসমানের নাটকে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় এ নাটকের মূলচরিত্র মাহমুদ আলীর 'মেফিসটোফিলিস'রূপে পরিণতি কাহিনিতে গৃহীত। তাঁর পঞ্চাঙ্ক প্রহসন *কাঁকরমণি* (১৯৪৯)। এ নাটকে অভিজাত শ্রেণির স্বরূপকে শ্লেষাত্মক করে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার। ঘটনার গুরুত্ব ভাষানুষঙ্গী—ফলে প্রহসন হিসেবে তা সফলই বলা চলে। ঔপনিবেশিক চরিত্রের বিরুদ্ধে শোহেরের প্রতিক্রিয়ায় রচিত *আমলার মামলা* (১৯৪৯)। এছাড়া

ঐতিহাসিক পটে রচিত রূপক নাটক *বাগদাদের কবি* (১৯৫২)। 'ইতিহাস বিখ্যাত হারুনর রশীদের রাজত্বকালের একটি বিশেষ দিক, তার ব্যক্তি জীবন, প্রেম ইত্যাদিতে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী আবর্তিত হলেও নাটকে নাট্যকার তাঁর সমকালীন দেশকাল চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন নি।' নাটকের কাহিনিতে শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন আছে। কাহিনি, চরিত্রের আত্মিক দ্বন্দ্ব ও সফল সংলাপের প্রয়োগে নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত বলা চলে। নাটকটির অন্যতম চরিত্র কবি ইসহাক। গণতান্ত্রিক অধিকার সংগ্রাম নাট্যকারের মানস প্রতিপাদ্য, তা-ই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন :

মুলুক ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে, ইসলামের আনজাম নেই, ধুঁকে ধুঁকে তিলে তিলে মরেছে দেহাতী মানুষ—শহরের গলিতে ভিক্ষুক—এদিকে ইসলামের গৌরব ফলাচ্ছেন যত দাগাবাজ শয়তান খিঞ্জীরের দল। হারুনর রশীদকে আজ ইসলামের 'সবক' দিয়ে আসতে হবে কিরীচে সঙ্গীনে। লজ্জা করে না—মুসলমান ভাই ভাই তবে শাহ্ সুলতান শাহজাদের এত রোয়াব কেন? কোন ইসলামী জৌলষে? তাদের শাদী মোবারকে এত নজরানার ভড়ং কেন? ইসলাম...।

শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদার (জ. ১৯৪২)-এর যৌথ নাট্যপ্রয়াস *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৮)। এর নয়টি দৃশ্য; অঙ্ক বিভাজন অনুপস্থিত। শওকত ওসমানের রূপকাশ্রয়ী উপন্যাস হিসেবে এটি বেরিয়েছিল ১৯৬৩ তে। ক্রীতদাস তাতারীর 'দুর্মূল্য হাসি' স্বেচ্ছাচারি শাসক বাদশাহ হারুনর রশীদ পাননি। কারণ 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে। বাঁদী কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।' তাতারীর নিকট থেকে প্রেমিকা মেহেরজানকে বাদশাহ বিচ্ছিন্ন করলে তার হাসি যে কোনো কিছুর লোভেও সত্যিই দুর্মূল্য থাকে। তাঁর অনূদিত নাটক *ডাক্তার আবদুল্লার কারখানা* (১৯৭৩)। শওকত ওসমানের নাট্যকার হিসেবে ইতিহাসের ঐতিহাসিক চরিত্রের বদলে কিংবা কোনো আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে তাঁর নাটকে সামাজিক কাহিনি-চরিত্রের অধিকমাত্রায় প্রতিফলন লক্ষণীয়। নিত্য জীবনাগ্রহের সংগ্রামী দ্বান্দ্বিক চরিত্র বিপর্যয়ে-সংকটে-আনন্দে তাঁর নাটকে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। বাংলাদেশের নাটকে এমন মধ্যবিত্ত চরিত্র সৃষ্টিতে একেবারে গোড়ার পর্যায়টিতে অবলোকন করা যায় শওকত ওসমানকে। তিনটি ছোট নাটক (১৯৮৯), *পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা* (১৯৯০) শওকত ওসমানের অন্য নাটক ।

আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯)

আসকার ইবনে শাইখ বাংলাদেশের অন্যতম নাট্যকার। তাঁর নাটকেই প্রথম বিচিত্র বিষয় বৈচিত্র্যময় মাত্রা পেয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত, নাটকে প্রথম

পুরস্কার তাঁকেই প্রদান করে ১৯৬০ সালে। মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার জীবনাগ্রহ, মুসলিম ঐতিহ্য, পাকিস্তানি শোষণ, শ্রেণিশোষণ এমন প্রভূত বিষয় তাঁর নাটকীয় আবহে বন্দি হয়েছে। বস্তুত সমাজ জীবন ও ইতিহাস অবলম্বী নাটকই লিখেছেন আসকার ইবনে শাইখ। দুর্বল কহিনিতে সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধ, মিথ্যা অহঙ্কার আভিজাত্য *বিরোধ* (১৯৪৭) নাটকে নাট্যরূপ লাভ করেছে। এছাড়া তাঁর নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে রচিত সামাজিক নাটক *পদক্ষেপ* (১৯৪৮)। এটিতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কার-কুসংস্কার চেতনা বিবিধমাত্রায় দানা বেঁধে ওঠে। *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *অনুবর্তন* (১৯৫৯) নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য। *অগ্নিগিরি* ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন দুর্ভিক্ষে হতোদ্যম জনতা তখন ইংরেজ প্রতিনিধি দেবীসিংহের হাতে খাজনা আদায়ের খড়্গ নেমে এলে জনতার অগ্নিস্ফূর্তি জেগে ওঠে। জনতার সঙ্গে যুক্ত হন ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, রাণী ভবানি প্রমুখ। এইটিই বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ :

> মজনু : প্রয়োজনে জালিম মেরে ফেলতে হবে। তোমাদের ইজ্জত, মা বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে আজ তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। তোমরা আমার পূর্ণ অধিকার। এ দেশের মাটিতে সে অধিকার হারিয়ে আজ আমরা মরতে বসেছি।

নাটকটির শেষাংশে বৃটিশদের বিরুদ্ধে মজনু শাহর বিপ্লবী কণ্ঠ তুলে আনা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পুনর্নির্মাণ হয়েছে সমসাময়িক মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে। ১৮৫৭ এসেছে মুক্তিবিদ্রোহের প্রেরণা হিসেবে। এমন অনুবর্তী চেতনাদর্শে ত্যাগ ও অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) নাটকেও। নাট্যকার তিন প্রজন্মের (দাদু-বাবা-পুত্র হাসান=ফকির মজনু শাহ-তিতুমীর-বিপ্লবী) বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ চিহ্নিত করেছেন :

> দাদু : হাসান! তোর দেহের শিরায় শিরায় বইছে এমন রক্ত, তোর খান্দানে এমন ঐতিহ্য, দুঃখের সাগরে পাড়ি জমাতে যারা ভয় পায় না। জুলুমের প্রতিবাদে মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জা ধরে প্রিয়জনের চোখের পানি মুছে দিয়ে যারা চলার পথকে এগিয়ে দেয়। সে রক্ত সে ঐতিহ্য তোমার, হাসান তোমার।

এই চেতনাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, 'ইতিহাস চেতনার পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এদেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন অন্যায় অবিচার নিপীড়ন আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে।' (*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* : সুকুমার বিশ্বাস) নাট্যকারের নাটকের বিষয়স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত না হলেও প্রযোজনায় চরিত্রের বিস্তৃতির কৌশল বেশ লক্ষণীয়। 'পাগলাটে লোক' অধ্যাপক, তার জবানিতেই কালখণ্ড চিহ্নিত হয়েছে নাটকে।

প্রচ্ছদপট (১৯৫৮); *রক্তপদ্ম* (১৯৬১) নাটকে অতীতের রাষ্ট্ররূপের ধারণা ও বর্তমানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করেছেন নাট্যকার। *রক্তপদ্মে* সিপাহী জনতার আত্মত্যাগের বক্তব্য এরূপ :

> আঠারশ সাতান্নর মুক্তিসংগ্রাম আমাদের অতীতকে স্মরণীয় করেছে। সেই সংগ্রামের আহ্বান ছিল এমনি বিস্তৃত, এমনি মন মাতানো যে, তাতে সাড়া দিয়েছিল আমির, বণিক, সেপাহী-শ্রমিক, ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোক। এমনকি আজিজনের মত সাধারণ নর্তকীও।

রক্তপদ্মে শুধু স্বদেশ চেতনা নয়, রোম্যান্টিক প্রেমদৃশ্যও অঙ্কিত হয়েছে। নর্তকী আজিজন আর সুবেদার শামসুদ্দিনের প্রেম দ্রোহের পাশে প্রেমের বাঁশরি। নারী চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সাফল্য আছে। নাটকটি সিপাহী বিপ্লব থেকে টিপু সুলতানের মহীশুর যুদ্ধের নানা অনুষঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমকালস্পর্শী। লেখকের *রাজ্য-রাজা-রাজধানী* (১ম ও ২য় পর্যায়) (১৯৮২) তে ১৪টি টিভি নাটকের সিরিজ নিয়ে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণকৃত নাটক। *দুর্যোগ* (১৯৫৩) ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে জিন্নার চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদস্বরূপ লিখিত। তাঁর জীবনীভিত্তিক নাটক *লালন ফকির* (১৯৫৯)। আধ্যাত্মিক সাধক লালনকে বাস্তব জীবনপটে তুলে এনেছেন নাট্যকার। *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৪৯) আসকার ইবনে শাইখের সফল সামাজিক নাটক। প্রকৃতপক্ষে পদ্মাপারের মানুষের সংগ্রামের ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক জীবনের শাসন শোষণের রূপটিও নাটকে রূপায়িত। তাঁর অন্য নাটক *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫১) বায়ান্নর পটভূমিকায় রচিত। *দুর্যোগ*, *আওয়াজ*, *যাত্রী*, *দুরন্ত ঢেউ* নিয়ে *দুরন্ত ঢেউ* নাটক। এছাড়া *শেষ অধ্যায়* (১৯৫২), *প্রতীক্ষা* (১৯৫৭), *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৫৫), *এপার ওপার* (১৯৫৫), *তীতুমীর* (১৯৫৭), *কর্ডোভায় আগে* (১৯৮০), *রাজপুত্র* (১৯৮০), *মেঘলা রাতের তারা* (১৯৮১), *কন্যা জায়া জননী* (১৯৮৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। আসকার ইবনে শাইখ বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ, চরিত্রকে সমকালীন তাৎপর্যে উন্নীতকরণ, দার্শনিক ভাবনায় মানবমুক্তির চেতনাকে আধুনিক শর্তে অর্থারোপিত করে তোলার পটভূমিতে। নাটকে সমকালীন সমাজকে যেমন তিনি তুলে ধরেন তেমনি নাট্য-আঙ্গিকেও আনেন আধুনিকতার স্পর্শ। তাঁর কিশোর কাব্যনাট্য : *দুটি ফুল*, *কন্যা ডালিম ফুলি*, *বাদুর*, *মুক্তি অভিনব* প্রভৃতি।

থনটন ওয়াইল্ড-এর দি স্কিন অব আওয়ার টিথ অবলম্বনে অনূদিত নাটক *যন্ত্রণাচাপ*।

নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০)
শুধু নাট্যকার নন; রম্যরচনার লেখক, শিশুসাহিত্য রচয়িতা, অনুবাদক, নাট্যনির্দেশক। তবে নাটকেই তাঁর প্রসিদ্ধি। উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটক রচয়িতা, উইট ও হিউমার সৃষ্টিতে কুশলতা নুরুল মোমেনকে বাংলাদেশের নাটকে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রথম নাটক *রূপান্তর* (১৯৪৮); *নেমেসিস* (১৯৪৮) তাঁর একমাত্র ট্র্যাজেডি নাটক। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে কেউ 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' বনে যায় আবার কেউবা পীড়িত-নিরন্ন। সুরজিত আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে দুর্ভিক্ষের বাজারে নিজেকে ঘৃণ্য ও বিবেকহীন ব্যক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু পিছু ছাড়ে না তার পূর্বস্মৃতি, আত্মার পুনরুক্তি। নেমেসিস বা প্রতিহিংসার দেবীর প্রসঙ্গটি তার বিবেককে তাড়িত করে। নাটকে বিবেকের প্রবল দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়। ক্রমশ অন্যায়ের কর্মফল ভোগের বৃত্তে সে পর্যবসিত হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কে রূপান্তরিত হয়ে সে বলেছে, 'I paid the penalty with my life and saved my generations.' এমন করে সুরজিত নন্দীকে ঘিরেই গড়ে ওঠে *নেমেসিস* নাটকের পূর্ণ শিল্পসৌকর্য। সুরজিত নন্দী নামের এক স্কুল শিক্ষক বিবেক বিসর্জন দিয়ে অর্থের মালিক হয় পরে আত্মহননে তার মুক্তি মেলে। তুলনায় আসে ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লোর *ড. ফস্টাস*। এ নাটকের আঙ্গিকে আছে অভিনবত্ব। নাট্যআঙ্গিক ত্রি-ঐক্যের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ একটি চরিত্র সহযোগে তৈরি হয় নেমেসিসের কাঠামো। যার ভেতরে জীবনের অনেকরকম বিষয়ের সম্ভাবনার সূত্র তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের ভেতর নির্মিত ভুঁইফোঁড় ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষয়, পুনর্বিবেচনা, গ্লানি, শ্লাঘার একটা স্বরূপ একটিমাত্র চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সেখানে নির্ধারণ করা যায় সমকালীন সমাজ ও সমস্যার স্বরূপ। *নেমেসিস* আসলে আধুনিক সময় ও সমাজের ট্র্যান্সমিউটেশন তথা রূপান্তরিত ধ্রুবপদ। এছাড়া নুরুল মোমেনের অন্যান্য নাটক,
যদি এমন হোত (১৯৫৭) পঞ্চাঙ্ক নাটক।
নয়াখান্দান (১৯৬২) সামাজিক কমেডি নাটক।
আলোছায়া (১৯৬২) পঞ্চাঙ্ক নাটক। 'মানব হৃদয়ের আলো আঁধার, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন প্রকৃতি ও তা বহিঃপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য, সংবেদনশীল অনুভূতির তারতম্যকে বিষয়বস্তু করে লেখা নাটক'—নাটকে প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মূলচরিত্র হাম্মাদ বেশ আকর্ষণীয় চরিত্র।
আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), *শতকরা আশি* (১৯৬৭) উদ্দেশ্যমূলক নাট্যরচনা।
যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), *হোসেন সফদারের উইল* (১৯৭০), *রূপলেখা* (১৯৭০)

শিশুতোষ নাট্যগ্রন্থ : ভাই ভাই সবাই ও বিড়াল ও পানির ভাগ প্রকাশিত ১৯৮২তে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

নাটকে নবনিরীক্ষা নিয়ে অবতীর্ণ আলাউদ্দিন আল আজাদ। কাব্যনাট্য লেখায় প্রয়াস চালিয়েছেন। *ইহুদীর মেয়ে* (১৯৬২), *রঙিন মুদ্রারাক্ষস* (১৯৯৪)তে একদিকে নাটকীয় সংঘাত অন্যদিকে কাব্য-উক্তির যূথবন্ধন নির্ণয় প্রচেষ্টা। যেখানে ব্যক্তির অন্বেষণের স্বরূপ কাহিনিরেখায় রূপায়িত। তবে নাট্যকার এখানে টি. এস. এলিয়ট উদ্ভাবিত কাব্যনাট্য আঙ্গিক তৈরি করেননি। বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় তিনি কাব্যনাটক রচনার প্রয়াস চালিয়েছেন। নব-উত্থিত ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যে কাব্যনাটকের এমন ধারা বরাবরই বহমান ছিল। পাশ্চাত্য যোগে যেটা অন্য মাত্রা পায়। আলাউদ্দিন আল আজাদ এক্ষেত্রে ততোটা সফল নন। তবে কাব্যনাটক লেখার প্রয়াস বিভাগ-পরবর্তী বিভিন্ন দশকে নব-নিরীক্ষায় অন্বিত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের *মরক্কোর যাদুঘর* (১৯৫৯) রূপকনাটক। আরব্য পুরাণকথা আলাদীন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এ নাটকে। নাট্যকারের তিনঅঙ্ক বিশিষ্ট সামাজিক নাটক *ধন্যবাদ* (১৯৫১)। স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত *নিঃশব্দ যাত্রা* (১৯৭২), *নরকে লাল গোলাপ* (১৯৭৪)। নাট্যকারের অন্যান্য নাটক *মায়াবী প্রহর* (১৯৬৩), *জোয়ার থেকে বলছি* (১৯৭৪), *সংবাদের শেষাংশ* (১৯৭৫) ইত্যাদি। অব্যাহত নাট্যচর্চার প্রণোদনায় *মেঠো ফুলের ঠিকানা* (১৯৭৫), *সংবাদ শেষাংশ* (১৯৭৫), *হিজল কাঠের নৌকা* (১৯৭৬), *হে সুন্দর হে জাহান্নাম* (১৯৮৮) তাঁর সীমিত ও সীমাবদ্ধ শিল্পশক্তির প্রয়াসমাত্র।

আল মনসুর (জ. ১৯২৫)

আল মনসুর বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। নাটকের অনুপ্রেরণাকে তিনি আপাদমস্তক গ্রহণ করেছেন। নাটক নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজীবন বহমান। বিচিত্র বিষয়ে তিনি নাটক লিখলেও *পোড়াবাড়ী* (১৯৫৫), *বোবা মানুষ* (১৯৫৬) তাঁর সামাজিক নাটক। নাট্যকার এসব নাটকের কাহিনিতে নিজের জীবনাদর্শেরই প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন। তবে নাট্য-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি, সংলাপ তৈরি এসবে নাট্যকারের বেশ সাফল্য আছে। *হে জনতা আরেক বার* (১৯৭৪), *রোলার ও নিহত এল এম জি* (১৯৭২), *বিদায় মোনালিসা* (১৯৭৪), *রেভ্যুলিউশন ও খৃষ্টাব্দ সন্ধান* (১৯৭২)-এসব নাটকের রচনাশৈলি বেশ মনোমুগ্ধকর। আল মনসুর নাট্যভাষা সৃজন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া আঙ্গিকেও তিনি যথেষ্ট

পরিশ্রমী। ইতিহাসভিত্তিক বা তথাকথিত সামজিক নাটক রচনায় নয়, ক্রমশ তাঁর নাট্য-উত্তরণ ঘটেছে বস্তুনিষ্ঠ জীবন-বীক্ষা এবং স্বকালচেতনা আঙ্গিকে প্রোথিত করে। এজন্য তিনি প্রতিনিয়ত নবতর দৃষ্টিতে নাট্য-আঙ্গিকের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)

মূল চরিত্র 'বহিপীর'; বইয়ের ভাষায় তার উপস্থাপন কৌশল। এর ভেতরেই তৈরি প্রতিপক্ষ, শোষণ-প্রতিরোধ। নাটকটি পরিণতি পায় সাংকেতিক অর্থে, বৃহত্তর শর্তে—যেখানে সামন্তশক্তি অবসিত, নির্বাপিত। *বহিপীর* (১৯৬০) সুখপাঠ্য নাটক; অভিনব আঙ্গিকে সৃষ্ট চরিত্রকৌশলের গুণে নাটকটি অনন্যতার মর্যাদা পায়। *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২) তাঁর দ্বিতীয় নাটক। এতে আমেনাই মূলচরিত্র—তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু পল্লবিত। আমেনার স্বামী ও সন্তান হত্যা; আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর কোর্টে অভিযোগ অতঃপর নিরুপায় বিচারকের স্বাধীন স্বেচ্ছামৃত্যু কাহিনিকে প্রান্তে পৌঁছে দেয়। কিন্তু নাটকে থাকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রণোদনাতাড়িত নানা শর্তবন্দি বিষয়—যেটা নাটকটির গুরুত্ববহ দিক। *সুড়ঙ্গ* (১৯৫৫) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রূপক নাটক। রাবেয়ার মনোজগত; রহস্য ও রোমান্সের ক্ষেত্র পাশ্চাত্য প্রবণতায় শৈলিমাত্রা লাভ করেছে নাটকে। এটিকে অনেকটা অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকও বলা চলে। *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ নাটক। এ নাটকে ব্যক্তিজীবনের গ্লানি, বিচ্ছন্নতাবোধ, যন্ত্রণা পাশ্চাত্যরীতিতে বর্ণিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যান্য সাহিত্যের মতো এখানেও মৃত্যু একটা বৈনাশিক মাত্রা লাভ করে। উপন্যাসের মতো নাটকেও তাঁর নায়করা স্বাধীনসত্তায় বিপন্ন, আচ্ছন্ন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *বহিপীর* থেকে *উজানে মৃত্যু* পর্যন্ত ক্রমশ পরীক্ষণীয় পথেই চলেছেন। বাংলাদেশের নাটকে এরূপেই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার বাস্তবধর্মী ও প্রতীকপ্রবণ আঙ্গিককে উপস্থাপন করেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সংলাপের ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। সেখানে বলদর্পী ভূস্বামী বা সামন্ত সংস্কৃতির ভাঙনের পথটি দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক মাত্রা লাভ করে। স্বল্পপ্রজ হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তীক্ষ্ণধী সমাজদৃষ্টি এবং অনুষঙ্গি আঙ্গিক নির্মাণের গুণে বাংলাদেশের নাটকে বড় নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের একটি বিশেষ গুণ অ্যাবসার্ড বৈশিষ্ট্য। যে বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ সময়কে নাট্যকার তুলে আনেন—তা ব্যক্তিসর্বস্ব; ব্যক্তির যুদ্ধক্ষত, হতাশা, ক্লিন্নতা, বিচ্ছন্নতা, অনিশ্চয়তায় আকীর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এমন প্রবণতা নতুন শিল্পের জন্ম দেয়। অ্যালবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০)র

দ্য মিথ অব সিসিফাস (১৯৪২) থেকে এ ধারণার উৎপত্তি হলেও পরবর্তীতে তার ‘এনোভেশান’ তৈরি হয়। তখন পাশ্চাত্যের লেখকগণ্ডি পেরিয়ে তা পৌঁছায় দেশে দেশে। প্রবাসী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এদেশীয় পটভূমিতে নাটকে এমন রীতির প্রয়োগ ঘটান। *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকে জজ সাহেবের মনোজগত অ্যাবসার্ড বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি-পূর্ণ। বোধকরি এমন শিল্প-উদ্দেশেই নাটকটি রচিত। কারণ, এতে কাহিনিপ্রকাশ যৎসামান্য। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ই বাংলাদেশের নাটকে এমন রীতির প্রথম ও সফল প্রয়োগকারী বলা চলে। পরবর্তীতে সাঈদ আহমদ(জ. ১৯৩১)ও তাঁর *কালবেলা* (রচনাকাল ১৯৬১, প্রকাশকাল (১৯৭৬) নাটকে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)

আবদুল হক মননশীল ও প্রগতিশীল লেখক। বেশ কিছু নাটক লিখে তিনি খ্যাতিমান। অনূদিত নাটকও আছে। বাংলাদেশে আধুনিক এ নাট্যকারের নাট্যচেতনা শুধু স্বদেশেই নই, বাইরেও বিস্তৃত। *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬) তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহের সংকট এবং সংসারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এ নাটকটি রচিত। ফেরদৌসির জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা তাঁর নাটক *ফেরদৌসী* (১৩৭১)। এখানে ইতিহাস ও কল্পনার বিস্তার আছে। একজন শিল্পীর সাধনা ও সংগ্রামের আলেখ্য এ নাটকটি। জীবনরসিক এ নাট্যকারের চেতনা এখানে বিপুল মাত্রায় বিধৃত। আবদুল হকের পাঁচটি নাটিকার একত্র গ্রন্থরূপ *সোনার ডিম ও অন্যান্য নাটিকা* (১৯৭৬)। এ গ্রন্থের একাঙ্কিকাগুলো *সোনার ডিম* (১৯৭৬), *বাবাকে ফিরিয়ে দাও*, *জোবায়দার প্রেম*, *দেওয়াল* ও *সুলতানের বিচার*। সমাজঘনিষ্ঠ চেতনা থাকলেও তিনি গতানুগতিক সামাজিক নাটক লেখেননি। মুসলিম সমাজের ভেতরের সংকটে আঘাত করেছেন তিনি। সংস্কারদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ইহলৌকিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার পরিচর্যা করেছেন তিনি। আবদুল হক জীবনের বিশ্বাসকে পরিস্রুত করেছেন নাটকে। অনুবাদ নাটকেও তিনি সমানভাবে সফল। সমাজভিত্তির মর্মমূলে তাঁর দৃষ্টি; এবং সেটি সমস্ত সংস্কার ও কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে যুগোপযোগী চিন্তা থেকে গৃহীত। আবদুল হকের অনূদিত নাটক নির্বাচনও, তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তার সমর্থনেই নির্মিত।

অনুবাদ নাটক : *পুতুলের সংসার* (১৯৬৬), *প্রেতাত্মা* (১৯৬৬), *মহাস্থপতি* (১৯৬৬), *রসমার্গ হোম* (১৯৬৭), *হেড্ডা গাবলার* (১৯৬৭), *ইলিনয়ে অব লিঙ্কন* (১৯৬৭), *জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান* (১৯৬৮), *গণশত্রু* (১৯৯২)।

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)

সিরাজ-উ-দ্দৌলা (১৯৬৫) নাটকটি সিকান্‌দার আবু জাফরের সবচেয়ে বড় কীর্তি। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য : জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে আন্তরিক বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং সদগুণাবলীকে চাপা দেয়ার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকতা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল। এই নাটকে সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণাবলীকে আমি তুলে ধরেছি।

*সিরাজ-উ-দ্দৌলা*র ঘটনা নবাবের চৌদ্দমাসের শাসনামলের বর্ণনা। ইতিহাসের সত্যকে সমকালীন ও জাতীয় চেতনার স্ফূর্তিতে রূপদান করেছেন নাট্যকার। *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* স্বাধীনতার প্রতীকে পরিণত; বাংলা নাটকে একমাত্র সৃজিত 'নায়ক', বাঙালির ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস। এমন প্রবণতায় সত্যকল্পনার মিশ্রণে, ইংরেজ আদৃত সমস্ত বিভ্রান্তি এড়িয়ে, জাতীয় বীরের পরিচর্যায় সিকান্‌দার আবু জাফর নির্মাণ করেছেন তাঁর *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* নাটক। *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* চারিত্রিক দৃঢ়তায়, মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলায়, গ্রহণযোগ্য মর্ত্যমানবে পরিণত করায় আলোচ্য নাট্যকারের কৃতিত্ব অনবদ্য। এক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ড শিল্পশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রোসাঙ্গ রাজসভার বর্ণাঢ্য কবির জীবন কাহিনি নিয়ে আবেগধর্মী নাটক *মহাকবি আলাউল* (১৯৬৬) রচিত। মহাকবি আলাওলে (১৬০৭-১৬৮০)র বহুমাত্রিক প্রতিভা অবলম্বি হয়ে ইতিহাসের সঙ্গে কাল্পনিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ কবির প্রতি আনুগত্যই তাঁকে এমন নাটক রচনায় প্রয়াসি করে তুলেছে। সিকান্‌দার আবু জাফরের রূপকাশ্রয়ী নাটক *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) ও *মাকড়সা* (১৯৫৯)। এ দুটো নাটকই 'এক ও অভিন্ন অসর্পিল ধারার পরিবহ : শিল্পকর্ম উদ্দেশ্যমূলক; সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকামী।' *মাকড়সা* রূপকধর্মী একাঙ্কিকা। এটি একটি ব্যর্থ স্বপ্নের দ্রোহ : 'ভাইসব ঝাঁপিয়ে পড়ুন একসাথে। এ সকলেরই বাঁচার সংগ্রাম। স্বপ্নচোর ওই খুনে লোকটাকে ধ্বংস না করলে কারো মুক্তি নেই। একে একে সকলের স্বপ্নই ও কিনে নেবে। নিঃস্বপ্ন হয়ে যাবে সমস্ত দেশ।' এই স্বপ্নচোর কে? আইয়ুব খান। সমালোচকের মন্তব্য : 'প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন এবং এ শত্রুকে নির্মূল করার জন্য জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করার আহ্বান।'—সিকান্‌দার আবু জাফরের অনুবাদ আয়ারল্যাণ্ডের কবি ও নাট্যকার জন মিলিংটন সিংগ-এর নাটক *সিংগের নাটক*

(১৯৭১)। এখানে সিকান্‌দার আবু জাফর সিংগের ছয়টি নাটকের অনুবাদ করেছেন।

কল্যাণ মিত্র (জ. ১৯৩৯)
জনপ্রিয় নাট্যকার কল্যাণ মিত্র। বগুড়া থেকে প্রকাশিত তাঁর অধিকাংশ নাটক। পূর্ব-বাংলায় প্রায় স্ব-উদ্যোগে মফস্বলে বসে নাটক লেখা একটি দুর্লভ ব্যাপারই বটে। তিনি সামাজিক নাটকে নিজেকে যুক্ত রাখলেও মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত অভিজ্ঞতা তাঁর নাটককে দিয়েছে বিপুল মহিমা। তাঁর নাটকের চরিত্র নির্মাণ, ঘটনা বিন্যাস অনেকটা কলকাতার ঢংয়ের মনে হলেও স্বাধীনতার আগে কিংবা অনতি পরে নাটকের দাবীটি মুখ্যত তিনিই মিটিয়েছিলেন। সমস্ত বিরোধিতার বা আড়ষ্টতার মুখে নতুন নাট্যচর্চার পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসটি আসে তাঁর নিকট থেকেই। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে নাটক লিখেছেন কল্যাণ মিত্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ব্যঙ্গনাটক হিসেবে পঠিত *জল্লাদের দরবারে* (১৯৭২) বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে সে সময়ে। তাঁর নাটকের মধ্যে আছে : *দায়ী কে* (১৯৬০), *প্রদীপ শিখা* (১৯৬১), *টাকা আনা পাই* (১৯৬৫), *কুয়াশা কান্না* (১৯৬৫), *অনন্যা* (১৯৬৭), *ত্রিরত্ন* (১৯৬৭), *শপথ* (১৯৬৭), শুভ *বিবাহ* (১৯৬৭), *সাগর সেচা মানিক* (১৯৬৮), *একটি জাতি একটি ইতিহাস* (১৯৭২), *পাশের বাড়ি* (১৯৭৭), *বাইজী* (১৯৭৭), *লালন ফকির* (১৯৭৭) প্রভৃতি। 'অতি নাটকীয় পঙ্কিল ও অশুচিকাহিনী' নিয়ে কল্যাণ মিত্রের *চোরা গলি মন* (১৯৬৬) নাটক। এ নাটকটি অশ্লীলতার দায়ে পড়েছিল। তবে কল্যাণ মিত্র শুচি-অশুচি, শীল-অশীল ভেদ না দেখে মানুষের জীবনকে গভীর করে দেখেছেন, মানুষের চিত্তকে অনুসন্ধান করেছেন।

ফররুখ আহমেদ (১৯১৮-১৯৭৪)
নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) ফররুখ আহমদের কাব্যনাট্য। বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাট্য রচনার প্রয়াসটি *নৌফেল ও হাতেমে*র মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়। তবে পাশ্চাত্য ফর্মের কাব্যনাট্য তত্ত্বটির প্রয়োগ এখানে ঘটেনি। অঙ্ক বিভাজন, চরিত্র সৃজন, কাহিনি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় *নৌফেল ও হাতেম* যথার্থ কাব্যনাট্যের আঙ্গিক পায়নি। নৌফেল চরিত্রটি এখানে প্রধান। জীবনবাদী বৈশিষ্ট্যে সে দানবীর সাম্মানিক হাতেম তায়ীর মতো হতে চায়। এজন্য ঈর্ষাকাতর, হিংসাপ্রবণ, লোলুপদৃষ্টিতে তার অহংকে প্রতিযোগিতায়-প্রতিরোধে হাতেমের বিরুদ্ধে কার্যকর করতে চায়। কিন্তু শেষাবধি ন্যায় ও সত্যের কাছে সে হয়েছে পরাজিত। খ্যাতি-যশ-সম্মান প্রত্যাশী সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে পরিশুদ্ধি ও প্রকৃত মূল্যবোধের চর্চায় ত্যাগ ও যোগ্যতার দৃষ্টান্তই নাটকটিতে প্রতিষ্ঠা পায়। বস্তুত

এমন নৈতিকতার প্রশ্ন ও মীমাংসাই নাটকটির বিষয়। এক্ষেত্রে ভাষানির্মাণে ফররুখ আহমদের কবিমূর্তির দৃষ্টান্তই প্রতিষ্ঠিত। নাটকটির দ্বন্দ্বটি চরম মাত্রার নয়; একমুখি ও বাইরের তৎপরতাই সেখানে দৃশ্যমান। ফলে এসবের বিপরীতের কাব্যনাট্যের শর্ত এখানে অনুপস্থিত। তবুও কাব্যনাট্যের প্রাথমিক প্রয়াসে *নৌফেল ও হাতেম* ইতিহাসে গুরুত্ববহ এবং মান্য।

সাঈদ আহমদ (জ. ১৯৩১)

অ্যাবসার্ড নাটক *কালবেলা* (১৯৭৬, ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত হয়ে প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩), লোককাহিনি-ভিত্তিক রূপক নাটক *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯-এ প্রথম প্রকাশ, রচনাকাল ১৯৬৪-৬৬); দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত *মাইল-পোস্ট* (১৯৭৬, ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত হয়ে প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬)। সাঈদ আহমদের এসব নাটক ব্যতিক্রমিই বলা যায়। তিনিই প্রথম বাংলাদেশে অ্যাবসার্ড দৃষ্টিভঙ্গির নাটক রচনা করেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পূর্ব-বাংলার আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিকে প্রতীকী উপস্থাপন, চিহ্নিত বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত চরিত্র রূপায়ণ, মনোজগতে তার প্রতিস্থাপিত স্বরূপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাঙালি জীবন ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ পরিণতির স্বরূপটি এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে রূপদানের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হন নাট্যকার সাঈদ আহমদ। অভিনব এ বিষয়-প্রকল্প প্রণিধানে বাংলাদেশের নাটকে তিনি হয়ে ওঠেন ইঙ্গিতবাহি। নাটকে যোগ করেন সংক্ষুব্ধ বিষয় অনুষঙ্গি প্রকরণের। সংলাপেও তিনি ব্যঞ্জনার আবহ রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক নাট্য প্রকরণটি আমাদের নজরে আসে সাঈদ আহমদের কৌশলী বিবেচনার গুণে। তাঁর অন্যনাটক *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮), *Three plays of Sayeed Ahmed* (1979), *শেষ নবাব* (১৯৮৯)। *শেষ নবাব* সমকালীন বাংলাদেশের পটচিত্রে নির্মিত। প্রসঙ্গত বলা চলে, সাঈদ আহমদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চেতনার শুধু সমন্বয়ই নয়; একালের আর্থ-সামাজিক পটে আধুনিক চেতনাকে আমাদের নাটকে স্থাপন করেছেন। ফরাসি নাট্যকার ইউজিন আয়েনেস্কার নাটকের অনুবাদ *দ্য চেয়ারস*।

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০)

মধ্যবিত্ত জীবনগাথা-হৃতোচ্ছ্বাস তাঁর নাটকের বিষয়। আঙ্গিকেও আনিস চৌধুরী কমিটেড। ঘরোয়া ও পারিবারিক পরিকাঠামোয় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবন চিত্রায়ণে তিনি নির্ধারিত সংলাপ রচনায় শিল্পসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপড়েন, আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মগ্লানি, শ্লাঘা, স্বার্থপরতা উৎসারিত তাঁর নাটকে। বিপরীতে সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, বিবেকশর্ত কাহিনিতে দৃঢ়তায়

উদ্ভাসিত। এক ধরনের মূল্যবোধ ও জীবনস্পর্ধী বার্তা তাঁর নাটকে বিরাজমান। এমন অনুষঙ্গি বিষয়ের জন্য নাট্যকার যথাযথ আঙ্গিকও নির্মাণ করেছেন। *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এ্যালবাম* (১৯৬৫), *চেহারা* (১৯৭৯), *যেখানে সূর্য* (১৯৭৪), *তবুও অনন্যা*, *হাইজ্যাকার* প্রভৃতি তাঁর নাটক। *মানচিত্রই* তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নাটক। এ নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনপ্রবাহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় এবং পারিবারিক আলেখ্য বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যরূপ পেয়েছে। আনিস চৌধুরীর ভাষা সাবলীল, দৃঢ়। প্লটগঠনও শক্তিশালী।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮)
প্রতীকধর্মী নাটক *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০)-এ শান্তি কি 'মিথ'? অপাপবিদ্ধ না হলে 'শুভ্রা', 'সুন্দর', 'কল্যাণী', 'আনন্দ' কেউ-ই শুধু নামের অভিধায় শান্তিপ্রত্যাশী শান্তিগড়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না—নাটকটির এ দার্শনিক মর্মটি বেশ আনন্দদায়ক। একটি দৃশ্যেই এর দার্শনিক পরিকল্পনা। জিয়া হায়দার বাংলাদেশের নাটককে অবারিত করে; পাশ্চাত্যের আধুনিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। নাটকে একই বিষয়ের অনুবর্তন নয়; প্রভূতমাত্রায় আন্তর্জাতিকীকরণে প্রয়াসী হয়েছেন। *দ্বাররুদ্ধ* (আতাউর রহমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনূদিত, ১৯৭০), *প্রজাপতি নির্বন্ধ* (আতাউর রহমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনূদিত, ১৯৭০), *এলেবেলে* (১৯৮১), *ডক্টর ফস্টাস* (অনুবাদ, ১৯৮১), *দুটি নাটিকা* (উন্মাদ সাক্ষাৎকার ও মুক্তি মুক্তি ১৯৮২), *অ্যান্টিগোনে* (অনুবাদ, ১৯৯০), মার্কিন নাট্যকার টম জোন্‌স-এর *দি ফ্যানটাস্টিক্স* অবলম্বনে লেখা *তাইরে নাইরে না* (১৯৯২) তাঁর শিল্পিত প্রচেষ্টার উদাহরণ। জিয়া হায়দারের মুক্তিযুদ্ধের নাটক *সাদা গোলাপে আগুন* ও *পংকজ বিভাস* (১৯৮২)। এ দুটো নাটক সংহত ও শিল্পগুণান্বিত। এতে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবরুদ্ধ বন্দিদশা অঙ্কিত হয়েছে।

দুই.

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৪-১৯৭৬) কবি হলেও নাটক লিখেছেন। বাংলা লোকনাট্যের ধারা কিংবা কাহিনি কিংবদন্তীতে বিধৃত লোকায়ত কাব্যসুর তাঁর রচনারীতির আকর্ষণীয় ক্ষেত্র। বাংলাদেশের নাটকেও এমন ধারাটির পরিচর্যা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। *পদ্মাপার* (১৯৫০) তাঁর প্রথম নাটক। এটি প্রাচীন যাত্রারীতিতে রচিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র মোনাই-এ লোকনাট্যের রীতিটি পরিলক্ষিত। এর গানগুলি কোনোটি লেখক বিরচিত; কোনোটি সংগৃহীত। কবির দ্বিতীয় লোকনাট্য *মধুমালা* (১৯৫১)। 'মধুমালা মদনকুমার' লোককাহিনি অবলম্বনে এটি রচিত। জসীম উদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* (১৯৫১) পূর্বোক্ত দুটো লোকনাট্য থেকে একটু ভিন্ন

রকমের। মুসলিম চরিত্রের পূর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাটকের বাস্তবতাকে তৈরি করা হয়েছে। এ নাটকের দ্বন্দ্ব চম্পা ও মোড়লের, বাস্তবতা পেশাভিত্তিক জীবনের; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্ভ্রম-মর্যাদা এবং অস্তিত্ব। নাটকটির সংলাপ চলিতরীতির, আঞ্চলিক ঢংয়ের; নাটকের বৃত্তে কবিতা সুন্দরভাবে প্রোথিত। *পল্লীবধূ* (১৯৫৬) পল্লীকবির হাতে রচিত পল্লীর কথকতা। এটি ১৯৫৬ তে প্রকাশিত হলেও লেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালে। সে সময়ের নাটক, তারুণ্য, 'নক্সীকাঁথার মাঠে'র জনপ্রিয়তা এ নাটকের পথরেখায় স্থিত। নাটকের সংলাপে সে চিহ্নটি আছে। *বাদলবাঁশী* (১৯৫৬) নাট্যকারের ছয় দৃশ্যের একাঙ্কিকা। *করিম খাঁর বাড়ি* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া*, *জীবনের পণ্য*, *গাজনচরের কাইজা* জসীম উদ্দীনের অন্যান্য নাটক। *ওগো পুষ্পধনু* (১৯৬৮) তাঁর কাব্যনাট্য। **সৈয়দ আলী আহসান** (১৯২২-২০০২) উল্লেখনীয় নাটক *মুশতরী* (১৩৫০), *কোরবানী* (১৩৫০), *জোহরা*। সৈয়দ আলী আহসান তেমন গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক নির্মাণ করতে পারেননি বিভাগ-পরবর্তী নাটকে। তাঁর নাট্যভাষা কাব্যগুণসমৃদ্ধ। নাটকে তিনি মুসলিম মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তবে নাটক রচনার দক্ষতা ও সামর্থ্য সৈয়দ আলী আহসানের থাকলেও পাকিস্তানের আদর্শ ও চেতনাগত দুর্বলতায় শিল্পের ক্ষেত্রটি তিনি স্পষ্ট করতে পারেননি। একটা বিশেষ লক্ষ্যে ঝুঁকে পড়লে যথারীতি শিল্প বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তবে অনূদিত নাটক *ইডিপাস* (১৯৫২) তাঁর সফল নাট্যকর্ম। এটি বাংলা নাটকে একটি অনবদ্য সংযোজন। সমাজের অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করে তুলে ধরেছেন **ওবায়েদ-উল-হক** (১৯১১-২০০৭)। *দিগ্বিজয়ী*, *চোরাবাজার*, *নেতা এলো দেশে*, *ভোট ভিখারী* এবং *জাল ভেজাল* সমন্বয়ে তাঁর একাঙ্কিকা সংকলন *দিগ্বিজয়ী-চোরাবাজার* (১৯৫০)। তাঁর জীবনবাদী চেতনার প্রকৃষ্ট প্রয়াস *এই পার্কে* (১৯৬৩) নাটকটি। বেকার নায়ক আলিমের ট্র্যাজেডি এ নাটকের মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত লেখকের অন্য সামাজিক নাটক *রুগ্ণা পৃথিবী* (১৯৬৮)। *টমি আর পুসি* (১৩৪৩) তাঁর অন্য নাটক। সাহিত্যরসিক, নাট্যপিপাসু ওবায়েদ-উল-হক জীবনের বিচিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। কর্মযোগী এ নাট্যকারের রম্যজ্ঞানও ছিল উচ্চমাত্রার। বাংলাদেশের নাট্যভাষার সে রূপটি একটি বাড়তি মাত্রা। **মোহাম্মদ আবুল হাশেম** মর্যাদা ও অধিকারের আবর্তে *গরীবের ক্ষেত* (১৯৫১) রচিত। স্থূল আবেগ, সচেতন দৃষ্টিচেতনা, মানবীয়তা এসব নাটকে আরোপিত। সে অর্থে নাটক নয় কিন্তু নবসৃষ্ট চেতনার ধারাটিতে এ নাটকের গুরুত্ব আছে। **আযীম উদ্দীন আহমদ** (১৯০৪-১৯৭৩) বিভাগোত্তর বাংলাদেশের অন্যতম নাট্যকার। নাটকে কাহিনি ও সংলাপে ঐতিহ্যগত প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গেরই চর্চা করেছেন তিনি। তাঁর লোককাহিনীভিত্তিক নাটক *মহুয়া* (১৯৫২),

কাঞ্চন (১৯৬২)। *মা* (১৯৬০), *অহঙ্কার* (১৯৬০) তাঁর সামাজিক নাটক। বাংলাদেশে প্রচলিত ধারাতেই তিনি নাটক লিখেছেন। নাটকে নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি সমাজের ভিত্তি এবং অস্থির জীবনচিত্রের একটা স্বরূপ তাঁর এসব নাটকে বিরাজমান। সাধারণত বাংলাদেশেরে নাট্যঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই তিনি নাটক লিখতে ব্রতী হয়েছেন। বিভাগ-পরবর্তী সময়ে তাঁর নাটকের প্রতি আনুগত্য ও অনুপ্রেরণা প্রশংসনীয়। পূর্ব-পাকিস্তানে নাটক লিখেছেন **এম. গোলাম রহমান**। তাঁর *পলাশী* (১৯৫৪), *ইরানের দুহিতা* (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য নাটক। প্রথমে পাণ্ডুলিপি *মিরকাশিম* নামে রচিত হয়, পরে নাম হয় *উদয়নালা* (১৯৫২)। এ নাটক সম্পর্কে লেখক বলেন 'উদয়নালার যুদ্ধে বেইমানের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশে ও আজ পাকিস্তানের নাগরিকের মনে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিবার মানসে'—এর অবতারণা। অন্য নাটক *ফিরোজ শাহ* (১৯৫৩) ও *ইরান দুহিতা* (১৯৫৫)। ইরান দুহিতা 'আনারকলি'র জীবনবৃত্তান্ত ভিত্তিক নাটক। তবে এসব নাটকে শিল্পমান তেমন উত্তীর্ণ নয়। তাঁর অন্য নাটক *ভুল যখন ভাঙলো* (১৯৬১), *চৌধুরী লজ* (১৯৬৬), *জাহাঙ্গীর* (১৯৬৬)। গোলাম রহমানের ইতিহাস-আনুগত্য এবং জীবনরস দুটোরই সফল সমন্বয় ঘটিয়েছেন নাটকে। প্রকৃত অর্থে, বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তিটিরই চর্চা করেছেন তিনি। প্রধানত, মুসলিম চরিত্র ও ইতিহাস তাঁর নাটকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। **ফকীর লোকমান হাকিমে**র *যুগের ডাক* নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৫২ সালে। সমাজের সমসাময়িক সমস্যা এ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। গতানুগতিক ধারাতেই তিনি নাটক লিখেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে নাটকের যাত্রারথে অন্যদের মতো তিনিও ঐক্য ও জাতীয় ভাবনাকে নাটকে এনেছেন। **বোরহান উদ্দিন আহমদ** নাটক লিখেছেন *টিপু সুলতান* (১৯৫২) ও *মীর কাশিম* (১৯৫২)। এসব নাটকের ভাষা ও প্লট দুর্বল। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ অনুপস্থিত। এ সময়ে একই বিষয় নিয়ে অনেকেই নাটক লিখেছেন, সে ধারাতেই বোরহান উদ্দিন নাট্যচর্চায় উদ্যোগী হয়েছেন। প্রধানত জাতীয়তাবাদী চেতনা, কিংবা ঐক্যবুদ্ধির জাগরণে মুসলিম চরিত্র অবলম্বনে বিজয়গাথা প্রচার করা হয়; এ নাটকসমূহের উদ্দেশ্যও তাই। ইসলামী ভাবধারার লেখক **মুফাখ্‌খারুল ইসলাম** (জ. ১৯২১) তাঁর ঐতিহাসিক নাটক *আউলাদ* (১৯৫৮)। আর পারস্য কবি হফিজের জীবনের একটি ঘটনার রূপায়ণ *মুর্‌শিদ* (১৯৫২)। নাটক রচনায় তাঁর সাফল্য উলেখযোগ্য মানের নয়। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্ভাব্য আলেখ্য সম্প্রচারবাণী বিধৃত হয়েছে এসব নাটকে। বিভাগ-পরবর্তী মুসলিম চেতনাদর্শে, এমন বিবেচনাই ছিল তাঁদের ভাবজগতের অন্যতম বিষয়। সে কারণে সাহিত্যে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয়। মুফাখ্‌খারুল ইসলাম নাটকে সে কাজটিই সম্পন্ন করেছেন। **আবদুর রউফে**র

এরাও মানুষ (১৯৫২) বিভাগ-পরবর্তী রচিত নাটক। জীবনদর্শন আছে, কাঙ্ক্ষিত পটচিত্রও গুরুত্ববহ। সমাজ-অনুষঙ্গি এ নাটকে অধিকার চেতনার স্বরূপচিহ্নিত হয়েছে। নাট্যভাষা প্রশংসনীয় নয়। নাটক পূর্ণায়ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-নির্ভর। **এস. এম. হাবিবুর রহমান**র *মাটির মানুষ* (১৯৫২) পূর্ব-পাকিস্তানের ভাবলালিত্য ও মধ্যবিত্ত চেতনা থেকে গৃহীত। এ প্রবণতায় অনেক নাট্যকারই নাটক লিখেছেন। বহির্মুখি আবর্তের, চালচিত্রের কাহিনিতে এ নাটকের শিল্পগুণ ব্যহত। এক ধরনের দৃশ্যমান জগতের আয়োজন কিছু পাত্রপাত্রীর ভেতর দিয়ে পরিচালিত। নাট্যরস শিথিল, গতানুগতিক। তবু আয়োজনটি প্রশংসানীয়। **শাহিদা খাতুনে**র স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আবেগ-অনুবর্তী নাটক *আজাদী* (১৯৫২)। সদ্য পাকিস্তনে সমাজ শ্রেণিতে গৃহীত মধ্যবিত্ত আজাদীর চেতনা ছড়িয়ে দিতে চায় সমাজে। এর ভাষা দুর্বল, কাঠামো অপরিপকত্ব, চরিত্র সৃষ্টিতে অসংবদ্ধতা আছে। নাটকের উৎকর্ষবিন্দুটি তেমন আগ্র-উদ্দীপক নয়। **মোহাম্মদ নেজামউল্লাহ** নাটক *শহীদ সেরাজ* (১৯৫২)। এটি আবেগধর্মী নাটক। এ নাটকের কোনো সাহিত্যগুরুত্ব পাওয়া যায় না। বর্গীর অত্যাচারের যুগ শেষ হলেও এ যুগের দুর্নীতিবাজ, শোষকরূপি 'জোঁক'রা আছে সমাজে। এরূপে **ফররুখ শিয়রে**র নাটক *ব্যাকমার্কেট* (১৯৫৩), মঞ্চসফল এবং কালোত্তীর্ণ নাটক। *সামনের পৃথিবী* (১৯৬০) ফররুখ শিয়রের অন্য নাটক। সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি নাটকে এনেছেন। এজন্য সমাজমনস্ক ও আধুনিক দৃষ্টিচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। **সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ** *বঙ্গ গৌরব* (১৯৫৩), *হোসেন শাহ* নাটক লিখেছেন। বঙ্গীয় ইতিহাসকে নাটকে নিজের দৃষ্টিকোণে তুলে ধরেছেন সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ। তাঁর নাটকে বঙ্গীয় গৌরব ও সাংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত। তবে নাট্যভাষা দুর্বল, আঙ্গিক প্রথাবদ্ধ। তবুও বাংলাদেশের নাট্যযাত্রার ক্ষেত্রটিতে তিনি অনবদ্য অবদান রেখেছেন। গ্রামজীবন ও সমাজস্নিগ্ধ স্বপ্নমেদুর প্রসন্ন নাট্যকার **ডাক্তার শাহাদত আলী খান** (জ. ১৯১৭)। *ছোটমা* (১৯৫৩), *ভুল* (১৯৫৫), *মাটির বুকে* (১৯৬০), *প্রতিশোধ* (১৯৬৮), *প্রভার বিয়ে* (১৯৬৮), *সংঘাত*, *বিভ্রাট*, *চিরকুমারী সভা* তাঁর নাটক। সমসাময়িক সমস্যা, সংগ্রামী রূপ, প্রেম-মমতা, দুঃখ-দুর্দশা বিরাজমান এসব নাটকে। নাট্যকারের একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক *মনসবদার* (১৯৬৯)। ঈশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধ এ নাটকের মৌল প্রতিপাদ্য। **আবু জাফর শামসুদ্দীন** (১৯১১-১৯৮৮)র নাটক *শনিগ্রহ ও পৃথিবী* (১৯৫৩)। একটু ভিন্ন প্রবর্তনার নাটক লিখেছেন তিনি। আধুনিক মনস্কতায় নাটক লিখলেও এ পর্যায়ে তাঁর তেমন উত্তরণ ঘটেনি। বিশেষ কোনো প্রকরণও সৃজন করতে পারেননি । বিভাগ-উত্তর সময়কালে সমাজসম্ভূত বিষয়ের দৃষ্টিচেতনায় তাঁর নাটকীয় আবহটি অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর নয়। বিভাগোত্তর সময়ে নাটক লিখেছেন **এ এইচ এম বসিরউদ্দীন**। জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রাধান্য পেলেও

নাটকে মানবীয় ভাবচিন্তার বিকাশ পরিলক্ষিত। তাঁর নাটক *মোহাম্মদী বেগ* (১৯৫৪), *সংশোধন* (১৯৫৪), *সোহরাব রুস্তম* (১৯৫৪)। বাঙালি মুসলমান চেতনার নাট্য আবহটি এভাবেই বিধৃত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণে নাট্যকার যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। অনেকেই এরূপে নাটক লিখলেও বসিরউদ্দীন তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি। **আবু যোহা নূর আহমদ** (জ. ১৯০৭) ইতিহাসভিত্তিক নাটক *আনারকলি* (১৯৫৪)। এ বিষয়ে অনেক নাটক লেখা হলেও এর প্রয়োজন মানবীয় পরিকাঠামোতে। 'আনারকলি' নানা লেখকের নিকট নানাভাবে গৃহীত। এ ধরনের নাটকে নাট্যভাষা গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের সেটিংসসহ চরিত্র-নির্মাণ ও কাহিনি বয়ানে হতে হয় সচেতন। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যও জরুরি। *আনারকলি* এখানে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর নয়। সম্ভাব্য জীবনের রূপও বৈচিত্র্যময় নয়। তবুও এটি আস্বাদনযোগ্য নাটক। লেখকের অন্যান্য নাটক : *স্বাপ্নিক শাজাহান*, *তামাসা*, *আমাদের বেতার নাটক*। **কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস** *স্মাগলার* (১৩৬১) পূর্ব-পাকিস্তানের গোড়ার লিখিত। নাটকের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে প্রায় একই মন্তব্য করা যায়। দুর্বল, পরিচর্যাহীন, অকার্যকর। সংলাপ, বর্ণনা, চরিত্রানুগ কথকতা কায়েম হয় না। কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রচণ্ড সমাজ-অনুবর্তী, বাস্তবানুগ কিন্তু শিল্পমানের ক্ষেত্রটি আয়ত্তে আনেন না। সেটি পরিশুদ্ধও নয়। নাট্যক্রিয়ার জন্য কিংবা সময় প্রবাহে অর্জিত সাফল্যের জন্য *স্মাগলার*কে কোনো নাটক নয়। স্মর্তব্য, বিষয়গুণে নয় আঙ্গিকের ঋজুতায় সৃজিত পরিবেশের নির্মাণে বহাল থাকে নাট্যক্রিয়া। সেটি কাজী ইলিয়াসের নাটকে পরাহত। **রাজিয়া খান** (১৯৩৬-২০১১) দীর্ঘ সাহিত্যচর্চায় নাটক লিখেছেন। কিন্তু নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের নাটক *আবর্ত* (১৯৫৫) এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে লিখেছেন *তিনটি একাঙ্কিকা* (১৯৮৬)। একাংকিকার নাটকগুলো : *নোংরা নাটক*, *পিপাসা*, *নক্ষত্রের গান*। আধুনিক মনস্কতার ছাপ এসব নাটকে থাকলেও জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ এতে অনুপস্থিত। তবুও রাজিয়া খান নাটকের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, দীর্ঘ ব্যবধানে সে উপলব্ধিটুকু তিনি আমাদের নাটকে প্রদান করেছেন। বিভাগ-পরবর্তী অন্যতম নাট্যকার **কে. এম. শমসের আলী**। তাঁর নাটক *সোনার কলম* (১৯৫৫)। প্রতীকী চিন্তা লুক্কায়িত এ নাটকে। একটু ভিন্ন ধারার নাট্যকার। *জীবন সংগ্রাম* (১৯৫৫) **শফিকুল কবিরে**র নাটক। গতানুগতিক রীতিতেই রচিত। উঠতি মধ্যবিত্তের বেড়ে ওঠার কিংবা প্রতিক্রিয়ার সূত্র ধরে তাঁর এ নাটক। নাট্যভাষা দুর্বল, টাইপ প্রযোজনা। *মৃত্যু ও ক্ষুধা* (১৯৫৫), *সীমা* (১৯৫৫) **বিশ্বামিত্রে**র নাটক। প্রবণতায় সমাজঘনিষ্ঠ চেতনা প্রতিফলিত। নাট্যকারের নাট্যউৎকর্ষ রসাস্বাদিত নয়। উদ্দেশ্যনির্ভর নাটকে তা পাওয়াও বিরল ব্যাপার। তবুও চেতনাগত পরিমাপে বিশ্বামিত্র অনেক উচ্চমাপের

নাট্যকার। বিষয়ে তিনি গতানুগতিক নন। *আজাদীর পরে* (১৯৫৫)র সংবাদ জানিয়ে লিখেছেন **মাহতাবউদ্দীন সরকার**। এ নাটকগুলো বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসের পথনির্মাণটি সম্পন্ন করেছিল। এর নাটকীয়তা কিংবা নাট্যভাষা বিষম দুর্বল। *বিচার* (১৯৫৬) **মোজাহারুল ইসলামে**র নাটক। বিভাগ-পরবর্তীকালে আবেগ আর অনুপ্রেরণা অর্জনের কারণে অনেকেই সমকালীন সমস্যা নিয়ে নাটক লিখেছেন। কিন্তু নাট্যভাষাটি অর্জিত হয়নি। বস্তুত একই নির্ধারিত আবেগে কিংবা মনের নির্ধারিত বাসনা পরিপূর্ণতায় নাটক লেখা চলেছে। মোজাহারুল ইসলাম সেরকমেরই একজন নাট্যকার। **আশরাফ-উজ-জামান** (জ. ১৯১১)র নাটক *সয়লাব* (১৯৫৬)। এটি নাট্যকারের জীবনচেতনাধর্মী নাটক। বিশেষ দৃষ্টিচেতনায় তাঁর এ নাটকটি গৃহীত। কিন্তু এ পর্যায়ে তাঁর সাফল্য তেমন পরিলক্ষিত নয়। **কালীপদ দাসে**র নাটক *চারশো বিশ* (১৯৫৬), *বাস্তুহারা* (১৯৫৬), *জয় বাংলা* (১৯৭১)। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। বিষয়ে সাম্যচিন্তা, প্রখর মানববাদী এবং বাঙালির ঐক্যচেতনার অনুপেরণাদাত্রী তাঁর নাটক। প্রচণ্ড কমিটেড নাট্যকার, প্রচলিত ধারাতেই নাটক লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন। **মোঃ ময়নুল হকে**র বেশির ভাগই সামাজিক নাটক। পল্লীর শোষণ-নির্যাতনকে অবলম্বন করে নাটক *পল্লীশোষক* (১৯৫৭); এছাড়া লিখেছেন *নরপিশাচ* (১৯৬৮)। সমাজনির্ভর এসব নাটক বেশ জনপ্রিয় ছিল। কারণ, সমাজের রূপান্তর-পরিবর্তন ও পরিণতির স্বরূপটি সে সময় সদ্য-উত্থিত মাত্র। এমন সামজিক গুরুত্ব এসব নাটকে থাকলেও রীতি-আদর্শ ও মঞ্চায়নের পরিকল্পনায় তা একেবারে গতানুগতিক, প্রথাবদ্ধ। অবশ্য কাঙ্ক্ষিত প্রকরণ এসব নাট্যকারের নিকট থেকে সে সময়ে আশা করাটাও একটা বাতুলতা মাত্র। *ঝড়* (১৯৫৭), *মুক্তি* (১৯৬০), *শেষপ্রহর* (১৯৬০), *মসনদ* (১৯৬১), *সূর্যমুখী* (১৯৬১), *রিক্তের বেদন* (নাট্যরূপ) (১৯৬২), *কাদামাটির দূর্গ* (১৯৬৪), *মেঘের পারের মেঘ* (১৯৬৪), *কেদার মাস্টার* (১৯৬৭), *বন্ধন* (১৯৬৮), *দুইপক্ষ* (১৯৬৮) প্রভৃতি নাটক লিখে বিভাগোত্তর নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার **অন্নদামোহন বাগচী**। পরিশীলিত রুচিতে বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক লিখেছেন তিনি। নাট্যভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্গীকারে ঋদ্ধ তাঁর নাটক। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা অনুষঙ্গ তাঁর নাটকে থাকলেও, সাস্কৃতিক চেতনার সম্ভাব্য স্বরূপকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। **এ মাজেদে**র নাটক *বন্ধুর চরিত্র* (১৯৫৭)। নীতিশিক্ষামূলক নাটক। শিল্পগুণ তেমন উন্নত নয়। লেখকের দৃষ্টিচেতনাও প্রথাবদ্ধতায় পর্যবসিত। **প্রসাদ বিশ্বাস** সামাজিক নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক *অবিচার* (১৯৫৮), *জবাবদিহি* (১৯৫৯), *পাকা রাস্তা* (১৯৬১), *ভোরের স্বপ্ন* (১৯৬২), *নাজেহাল* (১৯৬৩), *ফেরিওয়ালা* (১৯৬৩), *পরাজয়* (১৯৬৩), *বিচার* (১৯৬৩), *বিশ্বজননী সারদামনি* (১৯৮৯)। এসব নাটকের মধ্যে সমাজের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব

প্রতিফলিত। এসব নাটক লিখে জনপ্রিয় হন প্রসাদ বিশ্বাস। প্রেম ও সংস্কার দ্বন্দ্বও এসব নাটকের অন্যতম উপজীব্য। সংলাপ ও ভাষাভঙ্গি সাবলীল। **সৈয়দ মকসুদ আলী**র নাটক *ইউরেকা* (১৯৫৯)। এ নাটকে তিনি প্রথা ও রীতিকে অস্বীকার করেননি। জাতীয় চেতনা বোধেরই ঘটেছে পুনরাবৃত্তি। নাটকের এ পর্যায়টি তাঁর হাতে তেমন সফলতা আসেনি। **শেখ শামসুল হক** সমাজঘনিষ্ঠ নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক *চাষীর ভাগ্য* (১৩৬৬-২য় সং.), *দাওয়াল* (১৯৬০)। নাট্যকারের রচিত লোকনাট্য *বরণ-ডালা* (১৯৬৮)। নাট্যঐতিহ্যকে ধারণ করে নাটক রচনা করেছেন শেখ শামসুল হক। তাঁর রীতিটি যাত্রা ঢংয়ের। এ নাটকে আধুনিক দৃষ্টিচেতনা পরিলক্ষিত হয় না। প্রাচ্য-রীতিটি কায়েম হলেও তা প্রথাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। **ফয়েজ আহ্‌মদ** সামাজিক নাটক লিখেছেন। *মুক্তাহার* (১৯৬০), *শেষ ফল* (১৯৬৬), *হারানো মানিক* (১৯৬৮) নাটকে জীবনের সত্যতাকে প্রকাশ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এ নাট্যকার সমাজধর্মী বিষয়কে ভিন্ন প্রস্তাবনায় নাটকে পরিবেশনার গুণে। জীবনের সন্ধানসূত্রও এখানে পরিলক্ষিত। এ নাট্যপ্রবণতা পরবর্তী সময়ে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। **মিহির লাল দত্ত** (জ. ১৯৩৫)র নাটক *এই পৃথিবীতে* (১৯৬০), *অন্ধগলি* (১৯৬০), *এরা কারা* (১৯৬৮), *সম্রাট শাহ্‌জাহান* (১৯৬৯), *সবাই রাজা* (১৯৬৯), *সম্রাজ্ঞী নূরজাহান* (১৯৬৯)। এসব নাটকে ইতিহাস থাকলেও মানবীয় চেতনায় তা বিচিত্রভাবে পরিলক্ষিত। স্থান-কাল ও ঘটনার ঐক্য এসব নাটকে যথাযথভাবে নিরূপিত হলেও শিল্পমানে দুর্বল। নাট্যআবহে উৎকর্ষ তেমন আকর্ষণীয় নয়। তবুও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি নাট্যকারের রচনায় প্রসাদগুণ তৈরি করে। তবে তাঁর নাটকে অতিনাটক (melodrama) আছে বলেই মনে হয়। **রাজিয়া মহ্‌বুব** (জ. ১৯২৮) শিল্প মন ও এ বিষয়ক নীতিশিক্ষার চেতনায় লেখা *সাগর কন্যা* (১৯৬০)। এ ভিন্ন ধরনের নাটকে স্থান-কাল-পরিবেশ অক্ষুণ্ন হলেও নাট্যউৎকর্ষ দুর্বল। শিল্পের চেয়ে নীতির দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি অতীব মনে হয়েছে। **লায়লা সামাদ** (১৯২৮-১৯৮৯) সাহিত্যের নানা শাখায় কাজ করলেও নাটক লিখে সাফল্য পেয়েছেন—এমনটা বলা চলে। তাঁর নাটক *বিচিত্রা* (১৯৬০)। এছাড়া তাঁর অনূদিত নাটক *মন্তব্য নিস্প্রয়োজন* (১৯৭৫), *লাল লণ্ঠন*। লায়লা সামাদ নাটকে আধুনিক দৃষ্টিচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের নানাকৌণিক ব্যাখ্যায় তাঁর অনূদিত নাটকগুলো সফল। তবে সেটিং কিংবা দৃষ্টিকোণ দুর্বল হওয়ায় শিল্পমান কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে না। নাটকের নাটকীয়তাও যথোচিত মনে হয় না। তবুও নাট্যযাত্রায় তিনি সফল শিল্পী। **টিপু সুলতানে**র নাটক *যোগ বিয়োগ* (১৯৬০)। প্রতীকী নাটক। ষাটের দ্বান্দ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এ নাটকে জীবনের নানা সঙ্গতি-অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। পুঁজির অপবিকশিত পরিক্রমায় মধ্যবিত্তের সমাজ অবস্থান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও এ নাটকের উপজীব্য। নাটকের

আঙ্গিক ঋজু এবং আগ্রহ-উদ্দীপক। **এন. এস্ হুদা**র রাজনৈতিক চেতনাধর্মী নাটক *১৪ই আগস্ট* (১৩৬৮)। কাল্পনিক নাটক *দরবারে আম* (১৯৬৬)। রাজনৈতিক ভাবনা অবলম্বনে নাটক লিখেছেন এন. এস. হুদা। পাকিস্তানের ভাবমূর্তিকে ধারণ করে তৎসময়ে অনেকেই নাটক লেখেন, তবে তাঁর এসব নাটক শিল্পোত্তীর্ণ নয়। নাট্যচেতনায় কল্পনার প্রশ্রয় থাকলেও তা গৃহীত হয় না এসব নাটকে। তবু নাট্যধারায় এর প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। **হারুনূর রশিদে**র সামাজিক নাটক *একদিন এক রাত* (১৯৬১), *বিফল স্বপ্ন* (১৯৬৫)। খ্যতিমান ও জনপ্রিয় এ নাট্যকার বেশ কিছু নাটক লিখেছিলেন মফস্বলে বসে। পূর্ব-পাকিস্তানে এটি দুর্লভ বিষয়। তাঁর নাটকের শিল্পগুণ সুলভ নয়। গতানুগতিক চিন্তায় বহির্দৃশ্য চিত্রায়ন করেছেন নাট্যকার। বাইরের ঘটনা, চালচিত্ররূপে তাঁর নাটকে পরিবেশিত। অনেকটা প্রেম-রোম্যান্স, ব্যক্তি ও সমাজ দ্বন্দ্ব নিয়ে নাটক। তাঁর নাট্যভাষা আকর্ষণীয়। পূর্ব-বাংলার ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় লিখেছেন **আজিজ মেহের** (জ. ১৯৩২)। *টিপু সুলতান* (১৯৬২), *তারাবাঈ* (১৯৬৩), *ঝড়ের পাখি* (১৯৬৫), *বাজিছে দামামা নিরক্ষবৃত্তে* (১৯৬৭), *ম্যাকসিম গোর্কির মা* (১৯৮৬) তাঁর নাটক। এসব নাটকে মানবিক দিকটি দৃঢ় না হলেও আদর্শের চেতনা তিরোহিত নয়। নাট্য-উৎকর্ষ দুর্বল এবং দৃষ্টিকোণ (point of view) সীমাবদ্ধ। তবে আজিজ মেহের ছড়াতে চেয়েছেন, শিল্পের আবর্তে। ম্যাক্সিম গোর্কির *মা*র নাট্যরূপই তার প্রমাণ। **মিয়াজান আলী** (জ. ১৯১৪) 'মিঞাজী' ছদ্মনামে পরিচিতি পান। সমসাময়িক সমাজ ও 'ব্যক্তি'জীবনের নানাবিধ সমস্যা তাঁর নাটকের বিষয়। নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে স্বার্থান্বেষী চক্র, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে তাঁর আঙ্গিক দুর্বল হলেও তাঁর নাট্যরচনার প্রয়াসটি প্রশংসিত বটে। মিয়াজান আলীর নাটক *পাক-শিক্ষায় ঘূর্ণিপাক* (১৯৬২), *পাক-ভ্রমণে বিপাক* (১৯৬৩), *বিশ্বরূপ* (১৯৬৬)। মধ্যবিত্ত জীবনের অসামঞ্জস্য ও সমস্যা নিয়ে **এম. টি. রহমানে**র নাটক *প্রবাহ* (১৯৬৩)। তবে তা শিল্পসমৃদ্ধ নাটক নয়। অন্যান্যদের মতো ইতিহাস-অনুবর্তী বা সমাজঘনিষ্ঠ স্থূলতার আবর্তে বন্দি নয় তাঁর নাট্যভাষা। কিন্তু এটির বহুমাত্রিক চর্চা হয়নি তাঁর নাটকে। **জোবেদা খানম** (১৯২০-১৯৮৯) বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত শিশু সাহিত্য গ্রন্থমেলা সিরিজে বের হয় তাঁর ছোটদের একাঙ্কিকা (১৩৭০)। এছাড়া তাঁর নাটক *ওরে বিহঙ্গ* (১৩৭৫), *ঝড়ের স্বাক্ষর* (১৯৬৭) প্রভৃতি। **নীলিমা ইব্রাহীম** (১৯২১-২০০২)র নাটকে নারীর অধিকার কিংবা অন্তর্নিহিত শক্তির কথা বর্ণিত আছে। নীলিমা ইব্রাহীমের নাট্যভাষা আধুনিক। কয়েক দশকের চর্চায় নীলিমা ইব্রাহীমের নাট্যভাষা পরিপক্ব। চরিত্রবিন্যাস, কাহিনি-নির্মাণ, পটবিন্যাস ঋজু এবং যথাযথ। *দু'য়ে দু'য়ে চার* (১৯৬৪), *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪), *রোদ-জ্বলা বিকেল* (১৯৭৩), *সূর্যাস্তের*

পর (১৯৭৪) তাঁর নাটক। *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১৯৯৬) কথানাট্যটি মুক্তিযুদ্ধে নারীর চিত্রাঙ্কন। গতানুগতিক প্রবাহটিতে নয় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে তাঁর নাট্যভাষা। *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* সাম্প্রতিক সময়ে একক অভিনয়ে আলোচিত একটি কথানাট্য। **মোঃ জালাল উদ্দিন** (জ. ১৯৪২)র *গাঁয়ের বুকে* (১৯৬৪), *দুই ভাই* (১৯৬৫), *ডাকাত* (১৯৬৭), *অনেক আঁধার* (১৯৬৭), *ভিখারীর ছেলে* (১৯৬৭), *ভিখারীর মেয়ে* (১৯৬৭), *কুসুম তারা* (১৯৬৭), *রাজ্যহারা* (১৯৬৮), *প্রীতি চন্দন* (১৯৬৮), *মালীর ছেলে* (১৯৬৮), *রাজরক্ত* (১৯৬৮), *রক্তে রাঙা বাংলাদেশ* (১৯৭২), *কিছু খেতে দাও* (১৯৭৫), *রঙ্গিলা একটি মেয়ের নাম* (১৯৯৬), *মাঝির মেয়ে* (১৯৯৬) ইত্যাদি নাটক। নানা বিষয়ে নাটক রচিত হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো ভাষা রচিত হয়নি তাঁর হাতে। একই আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে তাঁর নাটকের বিষয়। কিংবা কখনো স্থূল জনপ্রিয়তায় হয়েছে বন্দি। পূর্ব-পাকিস্তানের নাটকে মোঃ জালাল উদ্দিন কিংবদন্তী, পুরাণ, লোকউপাদান, গ্রামীণ উপাদানে নাটক লিখে স্বতন্ত্র নাট্যকার হিসেবেই পরিগণিত, বলা যায়। **মালিহা খাতুন** (জ. ১৯২৮) *প্রফেসর* (১৯৬৪), *সূর্যের ওপিঠ* (১৯৮৫), *আলো না আলেয়া* (১৯৮০), *অনেক সূর্যের আলো* (১৯৮৫), *সব সোনা কি আলো* মালিহা খাতুনের এসব নাটকে মধ্যবিত্ত জীবন চেতনা বিধৃত। জীবনের আশাবাদ, অধিকার, সম্ভাব্যতা চিত্রিত তাঁর লেখায়। তবে নাট্য-উৎকর্ষ দুর্বল, পট গঠনও কাঙ্ক্ষিত নয়। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী নাটকেই তাঁর সাফল্য পরিলক্ষিত। চুয়াডাঙ্গার অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংগঠক ও দলীয় নাট্যকার **মোঃ আলাউদ্দিন**। গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখা *ধানের শীষে আগুন*। জীবন বাস্তবতার মুখোমুখি যুদ্ধ ও সংগ্রামী মানুষের চালচিত্র *রক্তগোলাপ* (১৯৬৮)। *নকল মানুষ* (১৯৬৮), *বোবা কান্না* (১৯৬৬), *আপট্রেন* (১৯৬৬) এসব তাঁর নাটক। মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত *রক্ত দিয়ে আনলাম* (১৯৭২), যদিও এর কাহিনি শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই। তাঁর অন্য নাটক *একটি তিলের জন্য* (১৯৭৯), *চরিত্রের সন্ধানে নাট্যকার* (১৯৭৯), *পৃথিবী ঘোরে* (১৯৭৯), *কাচমহল* (১৯৭৭), *চিতাপ্রান্তর* (১৯৯৬) প্রভৃতি। নাটকে কমিটেড মোঃ আলাউদ্দিন, জীবনের সন্ধানসূত্রই পেয়েছেন নাট্য-উপকরণের মধ্যে। স্বাধীনতা-পূর্বকালে নাটক লিখেছেন **আবদুল মান্নান সৈয়দ** (১৯৪৩-২০১০)। তাঁর ভাষ্য 'ষাটের শেষদিকে নাটক নিয়ে মেতেছিলাম। কাব্যনাট্য তো লিখেছিলামই—এমনকি গদ্যনাট্যও কয়েকটি... সত্তরের দশকেই আমার ঐ নাট্যরচনার ইচ্ছা নির্বাপিত হয়।' তাঁর পূর্ণাঙ্গ গদ্যনাটক *না ফেরেশতা না শয়তান* (১৯৭০-৭১)। এছাড়া *সুখ-অসুখ* (১৯৬৭), *যুক্তিহীন যুগ* (১৯৬৮), *এসো অসম্ভব, এসো* (১৩৭৩), *সংসার* (১৯৭০), *একটি ভীষণ খেলা* (১৩৭৩)। *না ফেরেশতা না শয়তান* একটি ভঙ্গুর সমাজের ব্যক্তিসর্বস্ব চরিত্রের অস্থির

দোলাচলতা, পিছুটান প্রবণতার প্রতিচিত্র। ষাটের নতুন নাগরিক সমাজ জামিলের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিচেতনা আকর্ষণীয়। নাটকের প্লট দৃঢ়প্রযত্ন, পরীক্ষিত। অন্যান্য একাঙ্কিকাতেও মান্নান সৈয়দ সফল। **ফতেহ লোহানী** (১৯২০-১৯৭৫) অনূদিত নাটক ডেথ *একটি সামান্য মৃত্যু* , *বিলাপে বিলীন* (১৩৭৪)। তাঁর মৌলিক নাটক *নিভৃত সংলাপ*, *দূর থেকে কাছে*, *সাগর দোলা*। মেধাবী নাট্যকার, বাংলাদেশের নাটকে প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। জনপ্রিয়ও বটে। উইট, হিউমার, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ আর সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থাপনা তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। খুব সূক্ষ্ম বিষয়কে তির্যক দৃষ্টিতে, গভীর করে পৌঁছান পাঠকের নিকট। এজন্য প্রকরণও তৈরি করেন। শুধু দৈশিক পটচিত্রে নয়, বিদেশী নাটকের অবয়বেও নাটক লিখে নানামুখি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এবং সফলও হয়েছেন। এ নাট্যকার নাটকে একই সঙ্গে যুক্ত করেছেন আধুনিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির। জাতীয় সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে **নূরউল আলমে**র নাটক *এক বৃন্তে দু'টি ফুল* (১৯৬৮)। বাংলা-উর্দু দুই ভষিক ঐক্যে পাকিস্তানের সংহতির প্রস্তাবনায় কিছু চরিত্রকে নির্মাণ করে, তাদের ভেতরে প্রেম-রোম্যান্স সৃষ্টি করেছেন। নূরউল আলম দুর্বল ও আদর্শ-উদ্দেশ্যভিত্তিক নাটক রচয়িতা। বাংলাদেশের নাটকে তাঁর নাটক নির্দিষ্ট কোনো দিশা দিতে পারেনি। **হাবীবুর রহমান** (১৯২৩-১৯৭৬) প্রধানত শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান। *বিড়ম্বনা* (১৯৭০), *কালের পুতুল* (১৯৭০) নাটক লিখেছেন। কিছু বেতার নাটকও লিখেছেন তিনি। বিভাগ-উত্তর সময়ে হাবীবুর রহমান বিচিত্রমুখি কাজ করছেন। বড় ও মনস্বী লেখক। নাট্যসাহিত্যে এ নাটকগুলো সময় ও সমাজ অনুবর্তী। শিল্পমানে অনেকটা পরিণত তাঁর রচনা। বাংলাদেশের নাটকে পরীক্ষিত নাট্যকার **খায়রুল বাসার** (জ. ১৯৪৮)। দীর্ঘ সময় তিনি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক *আবর্তন* (১৯৭০), *সূর্য এক প্রত্যাশা* (১৯৭৬), *পানকৌড়ি* (১৯৮৩), *দুবেলা ডাঙ্গির চর* (১৯৯১), *জীবন এখানে কোরাস গান* (১৯৯১) প্রভৃতি। এসব নাটক মুক্তিযুদ্ধ পর্বে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে লেখা হলেও জনমানুষের জীবনভাবনাকেই তুলে আনা হয়েছে। নাট্যকারের নাটক বাস্তবানুগ। ভুঁইফোঁড় কোনো বিষয় নিয়ে তিনি নাটক লেখেননি। সর্বদা তাঁর নাটকে গণ-মানুষের অধিকারের বিষয়টি চিহ্নিত। তবে এছাড়া মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র বিষয়ও তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। খায়রুল বাসার তাঁর নাটকে নানা বিষয় সন্ধানী হলেও তেমন কোনো কাঙ্ক্ষিত বা প্রভাবিত ভাষা সৃষ্টি করতে পারেননি। তবুও তাঁর নাট্য-আঙ্গিক দুর্বল নয়। *বঞ্চিত বাংলার উপাখ্যান* **লুৎফর রহমানে**র নাটক। সে অর্থে এটি আধুনিক নাটক নয়। যাত্রা আদলে উপাখ্যানধর্মী এসব নাটকে জাতীয়তাবাদী চেতনাকেই প্রলুব্ধ করা হয়েছে মাত্র। কালগত গুরুত্ব অবশ্যই আছে এসব নাটকের। **সৈয়দ নূরুল হুদা** প্রেম ও রোম্যান্সধর্মী নাটক *লায়লী মজনু*। নাট্যঐতিহ্যের বহমান ধারায় রচিত এ

নাটকে আধুনিক কোনো মাত্রা তৈরি হয়নি। তাছাড়া সৈয়দ নূরুল হুদার নাট্যভাষাও দুর্বল। **আবদুল জলিলের** যুদ্ধ বিধৃত নাটক *খুনে লাল বাংলা*। যুদ্ধ বিবৃতি আর আবেগের স্ফুরণ আবদুল জলিলের নাটক। এ নাটকে যুদ্ধসংবাদ আছে কিন্তু নাট্যভাষা নেই। নাটকের আঙ্গিক দুর্বল, পরিকাঠামো পরিকল্পনাহীন। এ রকমের অনেক নাটকের মতো গতানুগতিক এ নাট্যকারের নাট্যচর্চা। **আবদুল হাকিমের** মুক্তিযুদ্ধের নাটক *বাংলা রক্ত মঞ্চে*। মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ বিবৃত, চেতনাগত ঐক্য ও স্বপ্নসাধ চিত্রিত। আবদুল হাকিম নাটক লিখলেও নাট্যভাষা অসংযত, দুর্বল। শুধু বিষয় বর্ণিত হলেই তা নাটক নয়। নাট্য-পরিকল্পনাও ঋজু নয়, অপরিকল্পিত। **আহমেদ মুসা** (জ. ১৯৫৭) তিনটি মঞ্চনাটক *হবুচন্দ্র সমাচার*, *এক যে ছিল আকাল*, *নাদের আলীর সাহিত্য সম্মেলন*। নাটিকা *লাঠিয়ালগণ* এবং পথনাটক *আহা বেশ বেশ বেশ*। তাঁর একক অভিনয়ের নাটক *নাইওরি*। *হবুচন্দ্র সমাচার* অনবদ্য হাসির নাটক। আহমেদ মুসা নাটকে বেশ কিছু কাজ করেছেন। নানামাত্রিক সে কাজের ধরণ। সময়ের অগ্রগমনে নাটক পরিবর্তিত বৈচিত্র্যে আসীন। মঞ্চনাটকে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি পথনাটক, প্রফেশনাল ইত্যাদি বেশ রকম সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া নাটকে পাশ্চাত্য যোগও ঘটেছে। তাঁর পথনাটক *আহা বেশ বেশ বেশ* জনপ্রিয়। হাস্যরোল শুধু নয়, আছে এক ধরনের উইট ও বুদ্ধির প্রয়োগ। মঞ্চনাটকেও আহমেদ মুসা সফল ও পরীক্ষিত। **আ. স. ম. মাহবুবুর হোসাইন** মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ানুগ নাটক *রক্ত দিয়ে লেখা* । এসব গতানুগতিক নাটকে মুক্তিযুদ্ধের শৌর্য-বীর্য গাথা প্রকাশিত। তবে বিষয়ের বহুমাত্রিকতা থাকা সত্ত্বেও এগুলো কোনো শিল্পসম্মত নাটক হয়ে ওঠেনি। নাট্যকাররা নিছক আবেগেরই স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, নাটকের গুণ অর্জিত হয়নি। প্রথাগত ধারায় **আবু হাসান যশোরী**র মুক্তিযুদ্ধ বৃত্তান্তধর্মী নাটক *স্বাধীন বাংলা*। আকাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নাপুত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শুধু বিষয় অবলম্বি নাটক *স্বাধীন বাংলা*। এ নাটকে জীবনের কোনো সম্ভাব্য রূপ, বৈচিত্র্যময় বিষয় উঠে আসে না। একইরূপে নাট্যভাষাটিও রচিত হয়নি। **আবদুলা ইউসুফ ইমাম** যুদ্ধের নাটক *বাংকার*। যুদ্ধ বাস্তবতায় রচিত এ নাটকে জীবনের স্বরূপটি নেই, নিছক যুদ্ধাবর্ত, অভিযান, মনোচিন্তা এবং অনিবার্য ও মানবীয়গুণ বৈশিষ্ট্যের কিছু বিষয় উঠে এসেছে। নাটকের প্লট দুর্বল, দ্বিধান্বিত, একই ঘটনার পুনরাবর্তন। আবদুল্লা ইউসুফ নির্ধারিত আবর্তেই থেকেছেন, দার্শনিক উত্তরণও নেই। *হুতোম প্যাঁচার দেশে* **আবদুন নূরে**র রূপান্তরিত নাটক। গুরুত্বপূর্ণ এ নাটক অনেকটা নিরীক্ষাপ্রবণ, বিষয়ভিত্তিক। আবহটি স্বসমাজের। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিচেতনা পরিস্রুত। **আজমিরী ওয়ারেশে**র নাটক *উন্মোচন*। বিভাগ-উত্তরকালে রচিত। শুদ্ধ জীবনচেতনায় গ্রন্থিমুখ উন্মোচিত হলেও, ক্লাইমেক্স দুর্বল। কাঠামোটিও অসংযত।

নাট্যপরিচর্যায় তেমন যত্নও পরিলক্ষিত নয়। **আখতার কমল** *রঙহীন সিগন্যাল* লিখেছেন। এর কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব উপার্জন হয়নি, উদ্দেশ্যহীন মনে হয়। এক ধরনের বিশ্বস্ততা ও সত্যরূপ গৃহীত হলেও পরিকল্পিত নয়। তাছাড়া আখতার কমালের পরিচর্যাও দুর্বল। বিভাগ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণির এলোমোলো বাস্তবতা ও অস্থির ভাববিন্যাসেরই স্কেচ *রঙহীন সিগন্যাল*। **আনোয়ার তালুকদারের** নাটক *দাঁড়াবো শুধুই* ও *উৎস থেকে সমুদ্দুর*। এসব নাটক জীবনের বিচিত্র ভাবনার বাঁক ও স্মারকচিহ্ন হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের নাটকের গোড়ার জলসিঞ্চনে এর গুরুত্ব আছে। নাট্যভাষাটিও ঋজু। মধ্যবিত্ত চেতনা বিধৃত, অসংবদ্ধ মনের উচ্ছ্বাস। আনোয়ার তালুকদার ক্লাইমেক্স বা পরিণতির শর্তটি তেমন আয়ত্তে না আনতে পারলেও নাট্যআবহটি অসংবদ্ধ থাকে না। এ পর্যায়ে সময়ের অন্যান্যদের থেকে তিনি একটু অগ্রগামীই বলা যায়। তবে পরবর্তী সময়ে তাঁর নাটক তেমন উল্লেখনীয় প্রভাব ফেলতে পারেনি। **এম. এ. আজম** লিখিত নাটক *এই শতাব্দী ও তারপর*। মধ্যবিত্ত প্রেরণাপ্রসূত এ নাটকে স্বপ্ন-আবেগ ও বাস্তবতার স্বরূপ প্রতিফলিত। চেতনার দৃঢ়তা নেই, গ্রন্থিমুখ বা নাট্য-উৎকর্ষ গাল্পিক বা উপন্যাসোপম, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিচর্যা স্থূল। এক ধরনের স্বপ্নাপ্লুত আবেগ, অসংযত আস্থা-অনাস্থার পরিকাঠামো তৈরি হয় এ নাটকে। তাঁর অনুবাদ নাটক *বিভ্রান্ত অতীত*। এ নাটকে তিনি তেমন সফল নন। এম. এ. আজমের নাট্যভিত্তি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। যেটির গুরুত্ব সদ্য পূর্ব-পাকিস্তানে কম নয়। **এম. এ. মজিদের** মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক *জলাদের দরবার*। নাট্যরথে রক্তপাত, যুদ্ধ অনেককাল থাকলেও এম. এ. মজিদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এমন নাটকে ঐ যুদ্ধ পরিবৃত্তই, একটু স্বপ্নবৈভবআকাঙ্ক্ষায় বিচিত্র করে তোলেন। নাম দেন জলাদের দরবার। জনপ্রিয় নাটকে জীবনের মাত্রা নানামুখি না হলেও এর মেসেজ পৌঁছায় জনতার দরবারে। প্লট দুর্বল, আঙ্গিক অপরিণত। *সোনার বাংলা* **এম. এ. বারীর** নাটক। এ নাটকে তিনি স্বাজাত্য চেতনার অনুবৃত্তি। নির্দিষ্ট কোনো শৈলি তৈরি হয়নি তাঁর। নাটকের প্রবাহ ও প্রতিক্রিয়া স্থূল, অসংবদ্ধ। *কিংশুক যে মরুতে* **এহসানউল্লাহ্**র নাটক। একটু ভিন্ন প্রবণতার নাটক। এ নাটকে সাতচল্লিশ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপটির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে পারি। নাট্যকারের সংলাপ এবং বর্ণনা প্রাণ-উদ্দীপক। তবুও শিল্পগুণ নিয়ে এ পর্যায়ে কেউই যথাযথ থাকেননি; করেননি দৃঢ়প্রযত্ন নিরীক্ষা। ফলে বিষয়ের ঔজ্জ্বল্য নাটকে থাকলেও প্রকরণ দুর্বল, অবহেলিত। *শান বাঁধানো ঘাট* **কাজী জাকির হোসেনের** নাটক। গতানুগতিক বৃত্তে তাঁর নাটক। জীবনের রোম্যান্টিক দিকটিই তাঁর নাটকে দৃকপাত হয়েছে। **কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস** (১৯০৬-১৯৭৫) স্ট্রিন্ডবার্গের সাতটি নাটকের অনুবাদ করেছেন। এগুলো হলো : *পিতা*, *মিস জুলি*, *সবল মেয়ে*, *বন্ধন*, *বন্ধু ও বান্ধবী*, *ঈস্টার*,

রকমারী অপরাধ। স্ট্রিন্ডবার্গ স্বভাববাদী নাট্যকার। ইউরোপে এ ধারাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সংস্কার-কুসংস্কার এসব তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস এক্ষেত্রে দিয়েছেন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়। তাঁর দেশীয় আবহের প্রতি মনোযোগ এ নাটককে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। *দুঃশাসনের বেড়াজাল* **গগন তানু**র নাটক। রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে রচিত হয়েছে এ নাটক। তাঁর নাটকে প্রচুর সম্ভাবনা থাকলে শেষ পর্যন্ত তা উদ্দীপনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উদ্দেশ্যসাধনের ভেতরেই পর্যবসিত হয়েছে। নাট্যকারের ভাষাভঙ্গি দৃঢ়, সাবলীল, সক্রিয়। মানমুক্তির সারস্বত বিষয়টিই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে। **চমক রতন** *বাংলার বীর বীরাঙ্গনা* বাংলাদেশের বাঙালির চেতনার ঐক্যসূত্র চিহ্নিত নাটক। এ নাটকের ভাষা একই রকমের পুনরাবৃত্তিমূলক। কিন্তু একটা সময়ে এসব নাটকের উপযোগিতা এবং গুরুত্ব অনেক। নাটকের ভূমিকা মানুষের স্বপক্ষে কিন্তু সেটির জাগরণ কিংবা ঐক্যের সন্ধানসূত্র ঘটে কার্যকর উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে। বস্তুত সে কাজটিই সম্পন্ন করেছিলেন নাট্যকারবৃন্দ। **চিত্তরঞ্জন ঘোষ** রবীন্দ্রনাথের *শ্যামা*র নাট্যরূপ *শ্যামা প্রেম*। রবীন্দ্রনাথের নাটক সর্বকালীন এবং সর্বাধুনিক। এ স্বরটি বজায় রেখেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। **টি আহমদ** *রক্তস্বাক্ষর* জাতীয় চেতনার ধারাবাহিকতায় রচিত। পূর্ব-পাকিস্তানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ধারায় কখনো ইতিহাসভিত্তিক, কখনো সাম্য চেতনাভিত্তিক, কখনো মুক্তিলাল অভ্যুদয়ের দিকে দৃকপাত করে নাটক লেখা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় টি আহমদের নাটকে *রক্তস্বাক্ষর*। উদ্দীপনামূলক এ নাটক সংহত এবং সংযত প্রকরণে বাধা। **তা. ম. আসাদুজ্জামানের** মুক্তিলাল বিজয়ের পাদপীঠে রচিত *জল্লাদের পতন*, *এক নদী রক্ত*; মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ নাটকগুলো বাংলাদেশের জাতীয় প্রেরণার উৎস। রাজনৈতিক ভাবধারাই এতে বিপুলভাবে প্রবাহিত। কিন্তু এ নাটকের প্রেরণা থেকেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ঐক্য কার্যকর হয়ে ওঠে। অনবদ্য এ নাটকের ভাষা, উচ্চারণে পেয়ে যাওয়া চলে স্বাধীন বাংলাদেশের সন্ধানসূত্র। স্বাধীনতার সঙ্গে মুক্তি ও শোষণমুক্তি সমাজের স্বপ্নও এতে বিধৃত। **দিলীপ সরকারে**র নাটক *বাংলার বিজয়*, *বাংলার বীরাঙ্গনা*, *অনেক রক্তের পরে*। এসব নাটকের ভেতর দিয়ে জাতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। নাটকের ভাষা রচিত হয়েছে এসব নাটকে। বাংলাদেশের নাটকের ভিত্তিও বিরাজমান এমন জাতীয় চেতনার স্বপক্ষে। তবে প্রকরণ গুণে এ নাটকগুলোর সফলতা ততোটা নেই। *সুখিয়া দুখিয়ার সুখ দুঃখ* **নীরারেন্দু করে**র নাটক। এর বিষয়গুণ গতানুগতিক, শিল্পমান অনুপস্থিত। **ফিরোজ আল মুজাহিদের** *মুক্তি পাগল বাঙালি* নাটকটির নামকরণেই আত্মচেতনার উদ্ভাসন। একইসঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ভাবনার সত্যতাকে অনুমান করা যায়। বাঙালির আর্থ-রাজনৈতিক

চেতনাগত মুক্তির ঐক্যবিন্দুটি স্পর্শ করেন নাট্যকার। নাটকটিতে শিল্পগত উৎকর্ষের চেয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্তির উদ্বোধনই গুরুত্বপূর্ণ। সেভাবেই নাট্য আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর *অন্য নাটক স্বপ্ন* (১৯৫৭), মুক্তিপাগল বাঙালিরই স্বপ্ন। *মস্‌নদ* (১৯৩১) **বন্দে আলী মিয়া** (১৯০৬-১৯৭৯)র নাটক। নাট্যআবহে জীবনের মোহ, ভোগ, লালসা, আত্মদ্বন্দ্ব পরাভূত চেতনা মানবীয় গুণে পরিব্যাপ্ত এ নাটকে। এমন বিষয় নিয়ে অনেকেই নাটক লিখেছেন। এ পর্যায়ে কবিদের নাটক লেখার আয়োজনে 'মস্‌নদ' একটি ইমেজ সৃষ্টিকারী বিষয়রূপেই পরিগণিত মনে হয়। বন্দে আলী মিয়ার নাটকে তাঁরই অনুবর্তন ঘটেছে। তাঁর অন্যান্য নাটক *বনের ফুল* (১৯৩৫), *কামাল আতাতুর্ক* (১৯৪৮), *বৌদিদি* (১৯৪৯), *রেস্টুরেন্ট* (১৯৪৯), *জোয়ার ভাটা* (১৯৫৫)। এছাড়া *তিনটি নাটিকা* (১৯৩৮)। **মোসলেহ উদ্দীনের** *সিনেমা বিভ্রাট* মধ্যবিত্ত চেতনাপ্রসূত হাল্কা রসাত্মক নাটক। এক ধরনের সমাজচিত্র, সাংস্কৃতিক কৃত্রিমতা বিষয় হয়েছে এ নাটকের। এর প্রকরণও সে পরিপ্রেক্ষিতেই নির্মিত। কিন্তু শিল্পরস উচ্চমাত্রার নয়। *হালুয়া* (১৯৫৫) **ওহীদুল আলমে**র নাটক। এর আঙ্গিক দুর্বল। নক্সাধর্মী নাটক এটি।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের নাটক

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্রে আরও রাজনীতি বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত আরও বেশি রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন দেশে স্বার্থবুদ্ধি যেমন প্রকট হয়ে ওঠে তেমনি প্রান্তিক মানুষদের দুর্গতি বাড়তে থাকে। এসবের আবর্তে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটে পাকিস্তানি কায়দায় সামরিক শাসন। মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্ত আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একদিকে পরিশোধিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় উঠতি পেটি-বুর্জোয়া, ভুঁইফোঁড় শ্রেণি তৈরি হয়। গ্রামের একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে থাকে। শহর প্রাণচাঞ্চল্য হয়ে ওঠে। ভোগবাদ, লালসা, আত্মকেন্দ্রিকতা মধ্যবিত্তকে ছেয়ে ফেলে। এ পর্যায়ে রাজনীতি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেকের অংশীদার হয়ে যায়। নাটক বিবর্তিত হয়। নাট্যদল তৈরি হয়। দেশের সীমানা পেরিয়ে তা পৌঁছায় বাইরে। স্বাধীনতা অনেক রকমের পরিবেশ তৈরি করে। আত্ম-অস্তিত্ব চিহ্নিতকরণে, ব্যক্তিমানুষ নিরীক্ষণে, প্রান্তের মানুষকে মর্যাদাবান করে তোলায়। মধ্যবিত্ত ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশীদার হয়ে যায়। প্রচুর নাটক লেখা হয়, মঞ্চে যায়, দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা হয়। তবে এমনটা বললে ভুল হয় না, সবকিছুর কেন্দ্রে থাকে মধ্যবিত্ত। তারাই নাটকের

পরিশুদ্ধ ও পরিশীলন পরিচর্যায় ব্রতী হয়। এরূপ আবর্তে একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের বাস্তবতা সূচিত হয়।

১৯৭২ থেকে স্বাধীন দেশে নাটকের পূর্ণযাত্রা আরম্ভ। তখন নাটকের মঞ্চমূল্য যেমন বাড়ে, তেমনি সাহিত্য গুরুত্বও তৈরি হয়। শেক্সপীয়রীয় নাট্যআঙ্গিক ছাড়াও ব্রেশ্‌ট (১৮৯৮-১৯৫৬) যিনি 'এপিক পোয়েম' ফর্মে নাটক তৈরি করেছেন—এরপর আয়োনেস্কো (১৯১২-১৯৯৪), স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৭২) সমস্ত ফর্মের বিনাশ সাধন করে চেতন-অবচেতন ভাবনায় ডুবে নাটককে আনেন নতুনত্ব। এঁদের নাটক এ-পর্যায়ে অনূদিত হয়ে অভিনীত হতে শুরু হয়। নাটকের মঞ্চ-রূপায়ণ কিংবা সাহিত্যগুরুত্বও তখন নতুন করে ভাবিত হতে থাকে। বাংলাদেশের নাটকে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, আলী যাকের, সৈয়দ শামসুল হক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। নাটকে সত্তর-আশির দশকে পাবন আসে। ক্রমশ শুদ্ধ সংগ্রাম ও চেতনার হাতিয়াররূপে নাটক লেখা হয়। মঞ্চেও দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শনী চলে। শুধু মৌলিক বা অনূদিত নাটক নয়, উপন্যাস অবলম্বনে নাটক কিংবা প্রাচীন মধ্যযুগের বিষয় নিয়ে নাটগীত বা কথানাট্য ধাঁচের পরিবেশনা পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। এক্ষেত্রে সেলিম আল দীন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তবে এসব নাট্যকাররা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নাটক লেখেন, নাটকে উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়ী লৌকিক চেতনা। যার পুনর্নির্মাণে নাটক অর্জন করে আধুনিক রূপাবয়ব। একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের হতাশা-নৈরাশ্য-গানি যে তৈরি হয়নি তা নয়। নগরজীবনকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজির প্রকোপে ব্যক্তিমানুষের ক্ষয় ও অবসাদ নানাভাবে নাটকে পরিবেশিত হয়। রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র, মৌলবাদ, সন্ত্রাস এসবের বিপরীতে নাটক উপস্থিত হয়। মঞ্চেও একই ঘটনাধারা চলতে থাকে।

এ পর্যায়ে নাটকে বাংলাদেশে অনেক মঞ্চ নাট্যকর্মীদের পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হয়। বেতার ও টিভিনাটকও জনপ্রিয় হয়, উপন্যাসকারের উপন্যাস যখন নাট্যরূপ হয়, মঞ্চের অভিনেতারা তখন সেখানে অভিনয় করেন। এছাড়া প্রফেশনাল থিয়েটার, পথনাটক, এপিকনাটক, কাব্যনাটক ইত্যাদিও পরিবেশিত হয়। মিডিয়ার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকর্মীরা 'প্রফেশনাল' হয়ে ওঠেন। তবে মঞ্চই সর্বসাকুল্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত। মঞ্চ-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই নাট্যকর্মীরা নানারকম প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। এক্ষেত্রে যে 'স্টার' হওয়ার প্রতিযোগিতা নেই তা নয়; বাণিজ্য যে চলছে না তাও বলা যাবে না—কিন্তু মঞ্চেই ত্যাগী-অনুরাগী-প্রতিভাধর নাট্যকর্মীরা তৈরি হয়ে চলেছে। এই মঞ্চেই *বিষাদ-সিন্ধু* কিংবা *চিলেকোঠার সেপাই*-এর মতো উপন্যাস পাঠকনন্দিত হচ্ছে। এটা অসাধ্য সাধন ছাড়া আর কি? অন্যদিকে শেক্সপীয়রই শুধু নন মলিয়ের

(১৬২২-১৬৭৩), ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), বেশ্‌ট, এখন পাশ্চাত্য নাট্যকার নন; অভিনয় এবং পরিবেশনার গুণে আমাদেরই নাট্যকার। এটা বোধকরি সম্ভব হয়েছে একমাত্র মঞ্চের কারণেই। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে আবার নতুন করে নতুন ভঙ্গিতে নিয়ে আসছেন নাট্যকাররা। পালা, মঙ্গল আখ্যান, মৈমনসিংহ গীতিকা কিংবা ক্ষুদ্রজাতিসত্তাকেও মঞ্চে উপস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এতে করে আমাদের জাতীয় চেতনা যেমন হয়েছে শানিত ও পুনর্নির্মিত তেমনি প্রজন্মান্তরের পথরেখায় লৌকিক সংস্কৃতি হয়েছে বিকশিত। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটক বলতে এখন মঞ্চকেই বোঝায়। যদিও সত্তর-আশির তুলনায় নব্বুই-পরবর্তী সময়ে সাহিত্যরূপে নাটককে তেমন পাওয়া যায় না। সেলিম আল দীনের মতো দুএকজন ছাড়া বাকিদের শূন্যগর্ভই মনে হয়। কারণ, ঐ মিডিয়াপ্রীতি—যেখানে অনেক নাটক আছে কিন্তু রস-উত্তীর্ণ, সাহিত্য গুণান্বিত নাটক নেই। নাট্যরসের প্রবল অভাব। এমনকি এ সময়ে মঞ্চের ঝোঁকও হতে চলেছে নিম্নগামী; ফলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও সৃজনশীলতায় একরকমের বন্ধ্যাত্ব চলছে। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের প্রবল অভাব। পরিবেশের প্রতিকূলতাই কি এর কারণ? তবুও এর ভেতরেই শুদ্ধ, পরিশ্রমী ও অনুরাগী মঞ্চকর্মীরা আছেন, নাটককে এগিয়ে নিচ্ছেন। এড়িয়ে চলেছেন পুঁজির বাজারকে। থিয়েটারকে ভালোবেসে ছড়াচ্ছেন সর্বত্র। সেটা আমাদের নাট্যাঙ্গনে আশার সঞ্চারই বটে।

দুই.

আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮)

আবদুল্লাহ আল মামুন মৌলিক নাটক লিখেছেন। কয়েক দশকের নাট্যচর্চায় বাংলাদেশের নাটকে তিনি নাট্যজনরূপে স্বীকৃত। ষাটের দশকে তিনি বেতার এবং টেলিভিশনে নাটক লেখেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বাঙালির জাতীয় চেতনা তাঁর নাটকে মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠে। ভূমিমূল অনুষঙ্গি বিষয়কে আধুনিক মূল্যবোধের মাত্রায় জিজ্ঞাসু করে তোলেন। পুনর্নির্মাণ করেন এদেশের ব্রাত্য ও প্রান্তিক মানুষের শোষণচিত্র এবং সংগ্রামের দিশাকে। মৌলবাদ, কূপণ্ডূকতা, কুসংস্কার, অনাচার এসবের বিরুদ্ধে তিনি প্রবলরূপে সোচ্চার। শুধু নগর কিংবা গ্রাম নয়, বিবেকের বোধকে শানিত করে তোলেন তিনি তাঁর নাটকে। এজন্য শ্লেষ বা বিদ্রূপাত্মক সংলাপ যেমন আছে তাঁর নাটকে তেমনি মানবমুক্তির প্রত্যয়টিও ধ্বনিত থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪ প্র. অ.), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৪ প্র. অ.)—এ নাটক দুটি বিষয়ে এবং উপস্থাপনে একেবারে অনবদ্য। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের স্কুলমাস্টারের শেষ সংলাপ বেশ আকর্ষণীয়। আবদুল্লাহ

আল মামুনের নাটক : *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *শপথ* (১৯৭৮), *সেনাপতি* (১৯৮০, ১৯৭৯ প্র. অ.), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০, ১৯৮২ প্র. অ.), *ক্রসরোডে ক্রসফায়ার* (১৯৮১), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪, ১৯৮৩ প্র. অ.), *আমাদের সন্তানেরা* (১৯৮৯), *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮), *দূরপাল্লা* (১৯৮৮), *তোমরাই* (১৯৮৮, ১৯৮৭ প্র. অ.), *কোকিলারা* (১৯৯০), *মুক্তিযুদ্ধের নাটক সমগ্র* (১৯৯৩), *স্পর্ধা* (১৯৯৬, ১৯৯৩ প্র. অ.), *বুদ্ধিজীবী* (১৯৭৪), *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩, ১৯৯২ প্র. অ.), *তাহারা তখন* (১৯৯৬ প্র. অ.), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৭, ১৯৯৫ প্র. অ.), *মেহেরজান আর একবার* (১৯৯৮, ১৯৯৭ প্র. অ.) তিনটি নাটকই প্রায় একই বিষয় অনুসারি। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্ম ব্যবসায়ী, রাজাকার, ফতোয়াবাজ, সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট ও তাণ্ডবকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এসব নাটকে নব্বুই দশকের স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারদের উত্থান এবং ক্ষমতার দাপট আর বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধা বা দেশপ্রেমিক শক্তির অবক্ষয় ও পতন দৃশ্য বাস্তবসত্য হয়ে উঠেছে। তবে নাট্যকার শেষাবধি নাটকে ইতিবাচক অর্থেই সমাপ্তি টানেন—যেখানে মৌলবাদী বা রাজাকারদের পতন বা আত্মসমর্পনকেই দেখানো হয়েছে। তাঁর *চরিদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩, ১৯৭৬ প্র. অ.) প্রফুল্ল রায় (জ. ১৯৩৪)র উপন্যাসের নাট্যরূপ। অনূদিত নাটক *ডক্টর ফস্টাস* (১৫৯২), জার্মান নাট্যকার ফ্রান্জ ক্রোৎজ (জ. ১৯৪৬) এর *রিকোয়েস্ট কনসার্ট* অবলম্বনে রূপান্তর *একা* (১৯৯৪)। এটি একঘণ্টার সংলাপহীন একটি নাটক। প্রাত্যহিকতায় বেড়ে ওঠা একটি মেয়ের আত্মহত্যার গল্প এটি। এছাড়া 'কুরসী', 'বিবিসাব', 'উজানপবন' সমন্বয়ে *তিনটি পথনাটক* বেরিয়েছে ১৯৯১ সালে।

আলী যাকের (জ. ১৯৪৪)

বাংলাদেশের নাটকে আলী যাকের দক্ষ অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে বিশ্বের খ্যাতিমান নাট্যকারদের নাটক অনুবাদ করে তিনি এদেশের নাট্যচর্চাকে নবতর মাত্রা দিয়েছেন। এমন অনুবাদকে তিনি মঞ্চেও সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তবে এসব নাটক বিদেশী হলেও সমকালীন দৈশিক বাস্তবতা, মানবচরিত্রের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য বিপুল সম্ভাষণে উচ্চারিত। যেমন শেক্সপীয়র কিংবা ব্রেশ্‌ট বিদেশী হিসেবে নয়, এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে স্বমহিমায় তুলে এনেছেন নাট্যকার। আলী যাকের অনূদিত নাটকে মঞ্চ-পরিকল্পনা কিংবা শিল্পমাত্রার বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখেন। আমাদের নাটকে সন্দেহ নেই, মুনীর চৌধুরী এ ধারাটির সূচনা করেন। পরবর্তীতে সেটি অনেকভাবে বিবর্ধিত হয়েছে। বলতেই হয়, আধুনিকতার মাত্রাবাহী এসব নাটক

মঞ্চে জনপ্রিয়ও হয়েছে। আলী যাকের অনেক নাটক অনুবাদ করেছেন এবং মঞ্চে নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের মঞ্চে বিদেশী নাটকের রূপান্তরের ও পরিবেশনের একটি ধারা তিনি তৈরি করেছেন। এডওয়ার্ড এ্যালবীর *এভরিথিং ইন দ্য গার্ডেন* অবলম্বনে *এই নিষিদ্ধ পল্লীতে* (১৯৭৩, ১৯৭৩ প্র. অ.), উইলিয়াম শেক্সপীয়রের *হ্যামলেট* অবলম্বনে *দর্পণ* (১৯৯৩, ১৯৯১ প্র অ.), ব্রেশ্‌টের গুড *উওম্যান অব সেৎজুয়ান*-এর অনুবাদ *সৎ মানুষের খোঁজে* (১৯৭৪, ১৯৭৬ প্র. অ.), কার্ল স্যুখমায়ার রচিত *দ্য ক্যাপ্টেন অব কোপেনিক* অবলম্বনে *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮০-৮১, ১৯৮১ প্র. অ.) প্রভৃতি তাঁর নাটক। আন্তন চেখবের *সীগাল*-এর রূপান্তর *শঙ্খচিল* (১৯৯৭ প্র. অ.)। কার্ল সুখম্যায়ার রচিত *ক্যাপ্টেন অব কোপেনিক*-এর অনুবাদ *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮০ প্র. অ.)।

আসাদুজ্জামান নূর (জ. ১৯৪৬)
আসাদুজ্জামান নূর অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁর বার্টোল্ড ফ্রেডারিক ব্রেশ্‌ট (১৮৯৫-১৯৫৬)-এর *দ্যা রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য সিটি* অবলম্বনে *মোহনগরী* (১৯৮২)। এছাড়া ব্রেশ্‌ট-এর *Herr puntilla and his man matti*-র সফল ও জনপ্রিয় রূপান্তর *দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা* (১৯৭৬)। এ নাটকটি তিনি পরিবেশন করেছেন দক্ষ নির্দেশনায় এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের সমাজের শোষণ নির্যাতন, মৌলবাদী তাণ্ডব, ক্ষয়িষ্ণু বাস্তবতার প্রতিচিত্র এ নাটক। অনুবাদ ও রূপান্তরিত এ নাটকে আসাদুজ্জামান নূর নিজের চিন্তা ও মননের স্বাধীনতা যথোচিত বজায় রেখেছেন। মলিয়েরের অবলম্বিত তাঁর অন্য নাটক *বিদগ্ধ রমনীর কূল* (১৯৭৪), এক্ষেত্রে অনেকটা মূলানুগ তিনি। কিন্তু রূপান্তরে সেটি হয়ে উঠেছে এ দেশীয় ও বাস্তবানুগ। ঈষৎ পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে তাঁর নাটকের পরিবেশটি হয়ে উঠেছে গ্রহণীয়।

এস. এম. সোলায়মান (১৯৫৪-২০০১)
এস. এম. সোলায়মান গুণী নাট্যকার। অনেক নাটক লিখেছেন এবং তা মঞ্চে সফলতার সঙ্গে প্রদর্শনও করেছেন। হানাদার কিংবা মৌলবাদের হাতে এদেশের সংস্কৃতি কীরূপে বিনষ্ট হচ্ছে তার উপভোগ্য প্রতিচ্ছবি *এই দেশে এই বেশে* (১৯৮৭)। নাট্যকারের *ইঙ্গিত* (১৯৮৫), *গনি মিয়া একদিন* (১৯৯৭) জনপ্রিয় নাটক। চট্টগ্রামের লোককাহিনি 'নছর মালুম' ও 'ভেলুয়া সুন্দরী' অবলম্বনে এস. এম সোলায়মানের নাটক *আমেনা সুন্দরী* (১৯৮৯)। ইতালীয় নাট্যকার দারিও ফোর প্রহসনধর্মী *একসিডেন্টাল ডেথ অব এন এনার্কিস্ট* (১৯৭০) অবলম্বনে তাঁর *আহ্ কমরেড*। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় অরুণ এ নাটকের নায়ক। দেশীয়

আবহটি মূলত এমন ঘটনার ভেতর দিয়েই যুক্ত হয়। তাঁর অন্য নাটক *মুখোমুখি কংস* (১৯৮০), *ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল* (১৯৮০), *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *এলেকশান ক্যারিকেচার* (১৯৮০), *ইন্সপেক্টর জেনারেল* (১৯৮১), *তালপাতার সেপাই* (১৯৮২), *রাক্ষস-খোক্কস* (১৯৮৪), *সক্রেটিসের সন্ধানে* (১৯৮৫)। ইবসেনের নাটক অবলম্বনে রচিত *জনতার শত্রু* (১৯৯০)। ভারতীয় নাট্যকার স্বদেশ দীপকের *কোর্ট মার্শাল*-এর রূপান্তর করেছেন এস. এম. সোলায়মান। এটি থিয়েটার আর্টের প্রযোজনা ১৯৯৩ সালে। আবু তাহেরের গল্প অবলম্বনে তাঁর অমর সৃষ্টি *গোলাপজান* (১৯৯৫)। এ ছাড়া *ব্যর্থ ফ্যান্টাসী* (১৯৯৬), সারভেন্তেসের রূপান্তর *স্বপ্ন দ্যাখো মানুষ* (১৯৯৭), আমজাদ হোসেনের গল্প অবলম্বনে *কাল সকালে* (২০০০), *নাট্যকোলাজ*, *শিকল পরিয়ে দাও*, *সূয্যি মামার বরযাত্রী*, *ঘোড়া এলো শহরে*, *নানা রঙের দিনগুলি*, *খানদানি কিস্‌সা*, মলিয়েরের রূপান্তর *বিবাহ সমাচার*, জসীম উদ্‌দীনের 'কবরে'র নাট্যরূপ, *সোজন বাদিয়ার ঘাট* নাটক রচনা করেছেন। এস. এম. সোলায়মানের জীবনের শেষ নাটক *চলমান শোকগাথা*। প্রধানত লৌকিক জীবনকে নাটকে বিষয় করেছেন নাট্যকার। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য লৌকিক এসব নাটক, পূর্ণাঙ্গ আধুনিক মাত্রায় মঞ্চে আনার কৌশল। নিখুঁত তাঁর সংস্কৃতিজ্ঞান। নাটকের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তিনি আধুনিক ও প্রগতি মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের নাটকে তিনি একজন অনিবার্য নাট্যকার।

বজলুল করিম (মৃত্যু ১৯৭৭)

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩র ড্রামা সার্কেলের পরিচালক বজলুল করিমের অনূদিত নাটক *আর্মস এন্ড দি ম্যান*, *সবাই আমার ছেলে*, *সপ্তসূরের থিবী আক্রমণ*, *দাঁনতোর মৃত্যু* (১৯৭৭)। বজলুল করিম আমৃত্যু আজীবন নাটকের লোক, বিরাট নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রচার নিরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন নাটক নিয়ে। বিদেশী নাটকের অনুবাদও করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যরুচি নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। *আর্মস এন্ড দ্যা ম্যান* তাঁর সৃজনী চেতনার পরিচায়ক। *সপ্তসুরের থিবী আক্রমণ* একটু ভিন্নধর্মী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নাটক।

মমতাজউদদীন আহমদ (জ. ১৯৩৫)

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ নাট্যকার এবং নাট্যাভিনেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি কমিটেড এ নাট্যকার। তাঁর *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৯১, ১৯৮৯ প্র. অ.) তাঁর আড়াইশ বারেরও অধিক মঞ্চস্থ নাটক। এ নাটকের কাহিনি স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের পরিবৃত্তে রচিত। আহমদ শরীফ বলেন :

‘এ নাটক অনন্য, অসামান্য। জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যোগ ও আয়োজনের এমন সমাবেশ, সমাজ, রাজনীতি এবং দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত ও দুস্কৃতির এমন বাস্তব, সামগ্রিক ও সাময়িক চালচিত্র একাধারে ও যুগপৎ আর কখনো দেখেছি বলে এ মুহূর্তে মনে পড়ে না।’ বাঙালির সাংগঠনিক ঐক্য এবং দ্রোহ নাটকে চিহ্নিত। নাট্যকার এখানে এক প্রকার গন্তব্যের দিশা নির্দেশ করেছেন। নাটকে স্বামী হারানো বীরাঙ্গনা মায়ের চরিত্রটি বিশাল ঐশ্বর্য ও মাহাত্ম্যে নির্মিত। ‘মা’ এখানে নিজের অতীত-বর্তমান, দেশাত্মচেতনা, মাতৃত্ব, ক্ষুরস্য রক্তরঞ্জিত শক্তি ও মুক্তিমন্ত্রের প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত। সমকালীন সমাজের দুর্নীতি, অবক্ষয়, মিথ্যাচার—এমন প্রভৃত বার্তা এ নাটকে সার্থকরূপে নাট্যস্পর্শ লাভ করেছে আর দ্বন্দ্বও পেয়েছে নানামাত্রিক রূপ। এছাড়া চিরন্তন সংস্কার-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্ব, বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের দ্বন্দ্ব এখানে চরমমাত্রা লাভ করেছে। মমতাজউদ্‌দীন আহমদ এমন বিষয় অনুষঙ্গি সংলাপ-ভাষা ও মঞ্চসজ্জাও নির্মাণ করেছেন। কানাকড়ির মূল্য নেই, সে কানাকড়ি সাতঘাটের হলে তা তুমুল অকিঞ্চিৎকর। নারীর ইজ্জত, মাতৃত্ব, মায়েরমূল্য, শোষিতের ক্রন্দনধ্বনি নাটকে প্রতীকায়িত; বীরাঙ্গনা ও তার সাত সন্তানের মধ্যে। নামকরণের ব্যঞ্জনাটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মঞ্চের প্রয়োগ ও প্রক্ষেপণও সাবলীল। এ নাট্যকারের *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮৮)ও স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। বর্ণমালা রাজ্যের রাজা অনুস্বার বিসর্গ সৌরভের পুত্র, রানী চন্দ্রবিন্দুর পতি, বহুব্রীহির প্রণয়পুরুষ আর মৃগনাভির পিতা। পাপিষ্ঠ, বোকা, লোভী, দুর্মর, মেরুদণ্ডহীন চরিত্র রাজা অনুস্বার। নাটকে অন্য উল্লেখনীয় চরিত্র গুপ্তচর পাদটীকা। লোকনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এ নাটকে মানব চরিত্রের বিচিত্র দিকের মূল্যায়ন করা হয়েছে—একই সঙ্গে তুলে আনা হয়েছে হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্যের রূপ-রস ঐতিহ্য। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ উত্তরিত পর্ব *বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল* (১৯৭৫) রচিত। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধফিরতি তরুণদের হতাশা, যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন নাট্যকার *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৬) নাটকে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজুর উচ্চারণ ‘give me light of your light’ অনবদ্যই বলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের নাটক *সজলের মা* (২০০৩ প্র. অ.)। গ্রীক সমাজের ক্রীতদাস নেতা ‘স্পার্টাকার্স’কে পুনর্মূল্যায়ন করে এ সমাজের শ্রেণিচরিত্রের বিষয়টিও তিনি তুলে আনেন নাটকে। নাট্যকারের অন্যান্য নাটক *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১), *যামিনীর শেষ সংলাপ* (১৯৭৬), *হরিণ চিতা চিল* (১৯৭৪), নাট্যত্রয়ী *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (স্বাধীনতা যুদ্ধবিষয়ক চারটি একাঙ্কিকা :*স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, রচনাকাল ১৯৭১; *এবারের সংগ্রাম*, ১৯৭১; *স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ১৯৭১; *বর্ণচোরা*, রচনাকাল

১৯৭২) (১৯৭৬), *হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার* (১৯৭৭), *চয়ন তোমার ভালোবাসা* (১৯৭৮), *এই সেই কণ্ঠস্বর* (১৯৮৪), *প্রেম বিবাহ সুটকেস* (তিনটি হাসির নাটক, ১৯৮৭), *বিবাহ* (১৯৮৫), *বকুলপুরের স্বাধীনতা* (কিশোর নাট্য সংকলন, ১৯৮৬), *রঙ্গ পঞ্চদশ* (১৯৮৭), *পুত্র আমার পুত্র* (১৯৯৪), *হাস্য লাস্য ভাষ্য* (১৯৯৭), *একই নাটক চার রকম* (১৯৯৭), *তরুকে নিয়ে নাটক* (১৯৯৮), *মনের মতো রাজা* (১৯৯৯), *বটবৃক্ষের ধরম করম* (২০০১ প্র. অ.)। রূপান্তরিত নাটক *দখিনের জানালায়*, *ক্ষত বিক্ষত* (১৯৮৬), *ঝরা পাতা*; এছাড়া শেক্সপীয়র অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক *খামাখা খামাখা* (১৯৯৮ প্র. অ.) । এছাড়া মীর মশাররফ হোসেনের নাটক *জমীদার দর্পণ* (১৯৮৩ প্র. অ.) এবং কাজী নজরুল ইসলামের *রাক্ষুসী* (১৯৯১ প্র. অ.) গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন মমতাজউদদীন আহমদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *দুই বোন* (১৯৩৪) উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। এটি থিয়েটারের প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় ১৯৭৮ সালে। তাঁর পথনাটক *গন্তব্য বহুদূর* (১৯৯১ প্র. অ.)।

মামুনুর রশীদ (জ. ১৯৪৮)

মামুনুর রশীদের সঙ্গে সমার্থকরূপে জড়িত 'আরণ্যক' (১৯৭২) নাট্যদলের কর্মকাণ্ড। শ্রেণিসংগ্রামের চেতনায় মামুনুর রশীদের মৌলিক নাটক *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২ প্র. অ.), *গন্ধর্ব নগরী* (১৯৭৪ প্র. অ.), *ওরা কদম আলী* (১৯৭৯, ১৯৭৬ প্র.অ.), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *যে দিবস* (১৯৮১), *ইবলিশ* (১৯৮৩), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *খোলা দুয়ার* (১৯৮৪), *গিনিপিগ* (১৯৮৫), *অববাহিকা* (১৯৮৬), *নীলা* (১৯৮৭), *সমতট* (১৯৮৮), *পাথর* (১৯৯২), *জয়জয়ন্তী* (১৯৯৭, ১৯৯৫ প্র. অ.), *রাষ্ট্র বনাম* (১৯৯৭) প্রভৃতি। প্রতিবাদী ভাবনা পৌনঃপুনিক চরিত্র তৈরি করে তাঁর নাটক। জয়ী জীবনের পাশে মহাজন, সুদখোর, অসৎ মাতবর, গ্রাম্য মোড়ল প্রমুখ শ্রেণিশক্তি দ্বন্দ্বমুখর প্রবর্তনা রচনা করে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক চেতনাদর্শ তথা সামগ্রিক মানবমুক্তির প্রয়াসটির নানামুখি বীক্ষণ শুরু হয়। নাটক এমন দায়বদ্ধতায় ঐতিহ্যমূলক তাৎপর্যে শানিত। মামুনুর রশীদ উল্লি-খিত নাটকে এমন বিষয়টিই এনেছেন। শুরু থেকেই 'আরণ্যক' নাট্যদল সমাজমুক্তির অঙ্গীকার স্কন্ধে ধারণ করে। তাঁর নাটকে সস্তা আবেগের স্ফুরণ থাকে না। সংলাপ-নির্মাণে তিনি সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ। রূঢ় বাস্তবতা ও সংগ্রামকে শুধু উস্কে দেওয়াই নয় নতুন করে বাঁচার পথেরও নিশানা দেয়। এক্ষেত্রে *সমতট* একটি বাস্তব উদাহরণ। সে প্রত্যয়ে তাঁরা যেমন নিয়মিত মঞ্চনাটক থাকে তেমনি পথনাটকের ভেতর দিয়ে প্রান্তিক মানুষের কাছাকাছি পৌঁছারও চেষ্টা করে। যেমন মান্নান হীরার *ক্ষুদিরামের দেশে*, *মৃগনাভী*, *মণিমুক্তা* মামুনুর রশীদের *কদম আলীর*

মে দিবস এমন পথনাটক জনসচেতনতা সৃষ্টি কিংবা স্বাধীন দেশে মানুষের অধিকারের চেতনাকে শাণিত করে। এ জন্য তাঁদের নাটকের সংলাপে এসেছে ব্রাত্য মানুষের অঞ্চলগত কথকতা। তাদের উৎপাদন সম্পর্ক ও লৌকিক জীবনাচার অনুষঙ্গি ভাষা। গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফে (১৭৪৯-১৮১৭)র কীর্তিময় জীবন নিয়ে রচিত মামুনুর রশীদের *লেবেদেফ* (১৯৯৭, ১৯৯৫ প্র. অ.)। মৈমনসিংহের লোককাহিনি 'সঙ' আঙ্গিকের মাধ্যমে মামুনুর রশীদ সমকালীন জীবনের এক গীতল আখ্যান রচনা করেন *সঙক্রান্তি* (২০০১) নাটকে। কমিক সমাজে সঙ সেজে যে খেলায় মত্ত স্বার্থবাজরা তার প্রকৃত রূপটি কি ভেলকিমাত্র নয়? বিদূষক বা ক্লাউন যাই বলি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সমাজে মূল্যবোধের নীতিটিই এখানে বক্তব্য হয়ে আসে।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)
সব্যসাচী লেখক। কাব্যনাট্য লিখেছেন পাঁচটি। তাঁর অমর পংক্তিমালার শিল্পোত্তীর্ণ কাব্যনাট্য *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) ও *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২)। প্রথমোক্তটি মুক্তিযুদ্ধের কাব্যনাট্য। আধুনিক সময় বাস্তবতায় টি. এস. এলিয়ট প্রবর্তিত কাবনাট্য ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাট্য লেখেন। চরিত্র-কাহিনি-প্লটবিন্যাস একত্রে গ্রথিত হলেও নাটকই মুখ্য আর কাব্যগুণের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে জটিল ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের আন্তর কাঠামোয়। সংলাপ-ভাষা-শব্দনির্মাণে প্রয়োজনীয় পুরাণপ্রতিমা, ইতিহাস; *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* ও *নূরলদীনের সারাজীবনে* অনুপম শৈলিতে বিধৃত। বাংলাদেশের নাটকে এগুলো সফল মঞ্চনাটক হিসেবেও দর্শক সমাদৃত হয়েছে। এসব নাটকে সৈয়দ শামসুল হক মঞ্চ-পরিকল্পকও বটে। ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎ ও সামূহিক জীবন তপ্তমুখর হয়ে প্রাণবন্ত বাণীমূর্তি লাভ করে। সেখানে শুধু দ্বন্দ্বই নয়, সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া জীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলি ব্যক্তিগত বৃত্তে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এলিয়টিয় আধুনিক পরিবৃত্ত এমন কাব্যনাট্যে ধরা পড়ে। যেখানে প্রভুত্ব, ভয়, ক্রোধ যেমন আছে তেমনি মুক্তি, সংগ্রাম, শুদ্ধতার দিকটিও অনিবার্য। এর মধ্যেই প্রচ্ছন্নরূপে সমাজমুক্তির শর্তটি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নূরলদীন কালসীমা অতিক্রম করে বাঙালির সম্মিলিত শক্তিচেতনার প্রতীকে পরিণত। সৈয়দ শামসুল হক উল্লিখিত কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে প্রবল বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন—সেখানে এমন বাস্তবতা অনুষঙ্গি ভাষা-সংলাপ-ছন্দ-পুরাণ-পুরাবৃত্ত রচনা করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে এ দুটি সফল কাব্যনাট্যের উদাহরণ। তাঁর অন্য কাব্যনাট্য শেক্সপীয়রের *জুলিয়াস সীজার* অবলম্বনে *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮৮, ১৯৮২ তে প্র. অ.), *ঈর্ষা* (১৯৯১)। এছাড়া *সৈয়দ*

শামসুল হকের সাতটি নাটক (২০০৮)-এর মধ্যে *বাংলার মাটি বাংলার জল*, *খাট্টা তামাশা* (১৯৯৫ প্র. অ.), *আমাদের জন্য হলো* (১৯৯১ প্র. অ.), *তোরা সব জয়ধ্বনি কর*, *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* (১৯৮৭, ১৯৮৬ প্র. অ.), *মুখোশ* (১৯৯৩ প্র. অ.), *কৃষ্ণপক্ষ* অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-বঙ্গের জীবন ও উপলব্ধি নিয়ে *বাংলার মাটি বাংলার জল* রচিত। *আমাদের জন্য হলো* একটি 'প্যাশন পে'—বায়ান্নর প্রেক্ষাপটে; *তোরা সব জয়ধ্বনি কর* এবং *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* যথাক্রমে একাত্তরের গণহত্যা ও পঁচাত্তর-পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে রচিত। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লটে লিখিত *খাট্টা তামাশা* আর সামরিক শাসনের অপতৎপরতা নিয়ে কৃষ্ণপক্ষ; *মুখোশ* রচিত হয়েছে চিলির নাট্যকার এরিয়েল ডর্ফম্যানের *ডেথ অ্যান্ড দা মেইডেন*-এর রূপান্তর হিসেবে। এ নাটকের বিষয়ও আমাদের একাত্তর ও সে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এসবের মধ্যে আধুনিক জীবন বাস্তবতাকেই নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। প্রতিক্রিয়াশীল ও অপবিকশিত পুঁজিবাদে ব্যক্তিমানুষের সংকটই সেখানে মুখ্য। এছাড়া সৈয়দ শামসুল হকের *ম্যাকবেথ* (১৯৮৩ প্র. অ.)-এর অনুবাদও আকর্ষণীয়। তাঁর *নারীগণ* (২০০৭) জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)

বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার সেলিম আল দীন। প্রকরণে এনেছেন এ্যাকশনের বিপরীতে নিরীক্ষাধর্মী ন্যারেটিভ ফর্ম। এ পর্যায়ে তাঁর নাটকে বাঙালির লোকায়ত জীবন, দেশজ ইতিহাস-ঐতিহ্য-নৃতত্ত্ব নাট্যরূপ পেয়েছে। এক্ষেত্রে ভূমি-মাটির অন্তর থেকে উঠে আসে তাঁর প্রান্তস্পর্শী ব্রাত্য মানুষ। তাদের জীবনের স্বর ও সুরকে বর্ণনাভঙ্গিতে মঞ্চে তুলে আনেন নাট্যকার। সেখানেই নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রাম উঠে আসে। স্মর্তব্য, পাশ্চাত্য অনুসরণীয় রীতিতে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) থেকে অদ্যাবধি নাটকের যে চর্চা চলেছে সেলিম আল দীন তাকেই আঘাত করেছেন; বিপরীতে যা কিছু নিজস্ব, স্বদীক্ষিত—তাই পুনর্গঠন বা অবলম্বন করে নাটকে প্রয়াসী হন। এজন্য কবিগান, পাঁচালী-জারী-সারী বা ঐতিহ্য আনুষ্ঠানিকতায়—আচার, মূল্যবোধ, সংস্কার, প্রথাকে নাটকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন তিনি। প্রাচ্য-দর্শনই তাঁর মোক্ষ। তাঁর সমস্ত নাটকেই প্রাচ্যের প্রবণতাটি আঙ্গিকে উজ্জীবীত। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে এ রীতিকে বস্তুত তিনিই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পুনর্গঠনের প্রয়াসেও তিনি করেছেন আধুনিকতার অর্থারোপ। পাঁচালী রীতির প্রয়োগ বাংলাদেশের মঞ্চে জনপ্রিয়ও হয়েছে। কারণ বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্যশিল্পের মাঙ্গলিক আরাধনা, নারীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা-আনুগত্য, পুরুষধর্ম যে রূপরীতিতে বাধা পড়ে—তা যেমন স্পন্দিত চিত্তের স্পর্শক তেমনি যাবতীয়

অনিবার্যতায় করে তোলে দ্বন্দ্বময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবহ। নাটকের এমন চিন্তা ও রূপরীতি বাইরের প্রবর্তনায় নির্বিকার মনে হলেও, ভেতরে রয়েছে 'অ্যাকশন'। এটাই এর প্রাণ ও পুঁজি। ইতিহাস ও পুরাণের পুনর্নির্মাণভিত্তিক তাঁর প্রথম নাটক *অনিকেত অন্বেষণ* (১৯৭০)। এরপর সেলিম আল দীনের নাট্যযাত্রা শুরু। তাঁর নাটকের প্রথম পর্যায় ১৯৭২-১৯৭৯ পর্যন্ত। এ সময় লেখা নাটক : *নীল শয়তান : তাহিতি ইত্যাদি* (১৯৭২), *সর্প বিষয়ক গল্প* (প্রথম প্রযোজনা : ১৯৭২), *জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (রচনা ও প্রযোজনা : ১৯৭২), *এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা* (১৯৭৩), *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* (১৯৭৩), *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ* (১৯৭৩), *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী* (১৯৭৬), *শকুন্তলা* (১৯৭৭) এবং *আতর আলীদের নীলাভ পট* (১৯৭৫)। এসব নাটকে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের বাস্তবতাকে প্রতীকধর্মী করে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার। এগুলো অনেকাংশে কৌতুকনাট্য, শেষ-বিদ্রূপরূপে পরিবেশিত। *মুনতাসীর* নাটকটি সংবাদ কার্টুনের ধারাতেই রচিত, 'মিউজিক্যাল কমেডি' নামে চিহ্নিত। পুরাণ পুনর্গঠনে রচিত *শকুন্তলা*—এ সময়কালে সেলিমের নাটকগুলো 'নক্সা'তুল্য, সমসাময়িক বিষয়কে শ্লেষাত্মক, পরিহাসকাতর করে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।

সেলিম আল দীনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটকসমূহ পাশ্চাত্য প্রভাববঞ্চিত। বস্তুত দেশজ নাট্যরীতিটি এ পর্যায়ে শুধু পরীক্ষায় আনা নয়, সাফল্যেও পর্যবসিত হয়েছেন, সন্দেহ নেই। এর প্রমাণটি ধরা পড়ে *কিত্তনখোলা* (১৯৮০, ১৯৮১ প্র. অ.)র ভেতর দিয়ে। সেলিম বর্ণনাত্মক রীতির এ নাটককে কথানাট্য বলে অভিহীত করেন। এ পর্যায়ের অন্যান্য নাটক *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৫), *হাত হদাই* (১৯৮৯)। কথানাট্য নামাঙ্কিত এ তিনটি নাটক ত্রয়ী বলেও পরিচিত। *কিত্তনখোলা* থেকেই সেলিম আল দীনের প্রকৃত শিল্পসত্তা চিহ্নিত হয়েছে। এখানে পঞ্চাঙ্কের বাইরে বর্ণনাত্মক রীতিটি কাহিনিতে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আবহমান বাংলার প্রান্তিক মানুষের জঙ্গমতা ও প্রত্যয়কে পুনর্গঠিত ঐতিহ্যে প্রকাশ করেছেন। একইভাবে *কেরামতমঙ্গল* নাটকে কেরামত এ বাংলার এক সন্তপথিকরূপে পরিবেশিত। সে দেখে উন্মূল-বিচ্ছিন্ন-বন্ধ্যা এক সমাজকে। যে সমাজে তালুকদাররা ব্যক্তিস্বার্থে বাধিয়ে দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-পরিত্যক্ত নওশাদ কর্মজীবিকা পালন করতে গিয়ে অবৈধ গর্ভধারণের 'কুলটা' তিলক পরে ললাটে, সে সমজের প্রতি তীব্র ভ্রূকুটি নাট্যকারের। কেরামত এসবের ভেতর দিয়ে পূর্ব-বাংলা ও স্বাধীন বাংলাদেশকে অবলোকন করে; এগারোটি কাহিনি যেন একত্রে গ্রথিত, পূর্ব-বাংলার পাকশাসক থেকে মুক্তিযুদ্ধ, এরপর আবার বিষণ্নতা ভ্রূণরক্ষার সংগ্রামে সে কি পরাস্ত? সমস্ত লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে, নরকের নির্দয়তায়, পাপের গ্লানিতে সে হয়ে ওঠে এক সন্তপুরুষ। *হাত হদাই* আঞ্চলিক ভাষ্যে পরিবেশিত

উপকূলবর্তী মানুষের আখ্যান। নাবিক আনার ভাণ্ডারীর যে সংগ্রামের কাহিনি তা আসলে মানুষের জীবন সংগ্রামেরই কাহিনি। *হাত হদাই*-এ সেলিম আল দীন অনেক প্রসারিত, জীবন্ত, কৃতিত্বপূর্ণ। তবে এ তিনটি নাটকের কাহিনি 'এপিক রিয়েলিজম' বলা চলে। লেখকের ভাষ্যেও বৌদ্ধ জাতক, মেটামরফোসিস কিংবা ইনফার্নোর পৌরাণিক প্রতিবিম্বের প্রেরণার কথা আছে। এরপর কথানাট্য থেকে আখ্যানরীতির দিকে এগিয়েছে নাটক *চাকা* (১৯৯০, ১৯৯১ প্র. অ.), *হরগজ* (১৯৯২), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩)। *চাকা* অনেকটা রূপকের ইঙ্গিতবাহী। কথকের বর্ণনায় নাটকটির মানবীয় পরিচর্যাটি পরিবেশিত। এখানে গল্পটিও বিচিত্রমুখি। শববাহী এক শকট—সে আসলে শোষিত-অখ্যাত-নিপীড়ত মানুষেরই চক্রযান। একইরূপে *হরগজ*ও একটি জনপদের গল্প। *যৈবতী কন্যার মন*-এ আধুনিক ও মধ্যযুগের দুই নারীর শিল্পিত সমন্বয় ঘটিয়েছেন নাট্যকার। দেশ-কাল-সমাজ-ইতিহাসের ঘটেছে দৃঢ়তর যোজনা। এছাড়া তাঁর পাঁচালীরীতির নাটক *বনপাংশুল* (১৯৯৮) ও *প্রাচ্য* (২০০০)। সেলিম আল দীন পালারীতির আদলে লিখেছেন *একটি মারমা রূপকথা* (১৯৯৫)। *বনপাংশুল* 'কথা', 'বোলাম', 'নাচাড়ি' তথা সংলাপ, স্বগত উচ্চারণ, রাগভিত্তিক গান—পরিবেশন করা হয়, সেখানে বিষয় বিপন্ন বনবাসী-সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপায়ণ। মান্দাই নামক এক লুপ্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে এ নাটকের কাহিনি। তাঁদের পূজা-পার্বন, বিশ্বাস-মূল্যবোধ-সংস্কার নিয়ে নাটকটি রচিত। এদের প্রয়োজনীয় সঙ্গীতেরও আয়োজন এতে রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের স্বর, শাশ্বত ঐতিহ্য-অবগাহনে মহাকাব্যিক রূপায়ণ ঘটে, যেটা বাস্তব এবং পূর্ণাঙ্গ। বাংলা নাটকে এমন আঙ্গিক অভিনব এবং সর্বাধুনিক বৈশিষ্ট্যজাত সন্দেহ নেই। *প্রাচ্য* নাটকে মনসামঙ্গলের চরিত্র বা ঘটনার বিপরীত রূপ তুলে ধরা হয়েছে, যেমন : বাসররাতে নববধূর মৃত্যু। এছাড়া 'সর্বপ্রাণবাদ' তত্ত্বের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মারমা রূপকথা মারমা নৃ-গোষ্ঠীর নাটক। উপজাতিদের প্রচলিত পালার অবলম্বনে এটি রচিত। *নিমজ্জন* (২০০৪)-এ প্রতিরোধ ও আশার কথা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এসব প্রত্যেকটি নাটকেই তাঁর 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং 'একাঙ্গীকরণ'তত্ত্বের প্রয়োগ বিধৃত। তার সংজ্ঞাটিও হয়তো একরূপে উঠে এসেছে। তবে এমনটা বলা চলে, এমন তত্ত্বের অভিধা সাম্প্রতিক নির্ণিত হলেও ধারণাটি ঐতিহ্যিক ও ইতিহাসের নির্ধারিত ধারাতেই ত্রিকালে বিদ্যমান। 'একাঙ্গীকরণ' বা 'ফিউশনে' বোধ ও ভাবের ফিউশন, বিষয় ও আঙ্গিকের ফিউশন, তত্ত্ব ও দর্শনের ফিউশন আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বে কখনওই তিরোহিত নয়। সুতরাং তত্ত্বের আরোপে নয় সেলিম আল দীনের নাটকের বিশেষত্ব পাঁচালীর বৈচিত্র্যময় পুনর্গঠন ও অর্থারোপের ব্যাপকতায় এবং সে অনুষঙ্গি আঙ্গিক নির্বাচনে। মঞ্চেও তা এসেছে অভিনব ভঙ্গিতে। *ঊষা*

*উৎসব ও স্বপ্নরমনীগণ*কে নাটনৃত্যগীতি বলে অভিহিত করেছেন সেলিম আল দীন। *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭), *ধাবমান* ও *পুত্র* (২০০৭) কথানাট্য ধারার এ নাটকগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

দুই.

অনন্ত হীরা (জ. ১৯৬৮) পথনাটকের কর্মী, সংগঠক। এ ধারার নাটকে কাজ করেছেন। *লোকনায়ক* (২০০৫) তাঁর জনপ্রিয় নাটক। এছাড়া *বিচার* (২০০১), *ক্ষমাহীন ক্ষমা* (২০০০) তাঁর অন্য নাটক। এ সময়ের বাস্তবানুগ সমস্যাকে নিরীক্ষাধর্মী প্রেজেন্টেশনে নিয়ে যাবার প্রত্যয়টি তাঁর মধ্যে বিরাজমান। প্রান্তিক মানুষের স্বরটি তাঁর নাটকে বিপুল প্রত্যয়ে পর্যবসিত। অনন্ত হীরা কমিটেড নাট্যকার সে কারণেই পরিস্রুত ভঙ্গি বাস্তবানুগ এবং জীবন-অনুবর্তী। সেটি নির্ধারিত মুখের ভাষাতেও। সংলাপেও সার্থক সে শর্ত। **অনিমেশ সাহা লিটু** শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার বরিশালের দলীয় নাট্যকার। তাঁর নাট্যরূপ কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাস *কালাকাল*। পথনাটক : *দুঃসহ স্মৃতি* (২০০৩), *বোধোদয়* (২০০৪), *ফিরে আসা* (২০০৫)। আধুনিক জীবন-বীক্ষায় পথনাটকের যে শক্তি এবং উদ্দেশ্য তা লিটু প্রমাণ করতে সচেষ্ট। **অভীক ওসমান** (জ. ১৯৫৬) মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী নাট্যকার হিসেবে *তিরোহিত সুন্দর আমার* (১৯৭৫), *গন্ধরাজ* (১৯৮৩), *শংখ উপাখ্যান* (১৯৯৩), *রাত ফেরার* (১৯৭৮) কাহিনি লিখেছেন। প্রতীকী মাত্রা থাকলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরের উত্তাপে এমন নাটক রচনা। পরবর্তী সময়ে তিনি পথনাটকে ফিরেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন শোষণ, ক্ষাত্রশক্তির তোষণ চলে আসে নাটকে। থিয়েটারের যাত্রাটি ক্রমশ ঋজু হয়েছে, বাংলাদেশের নাটকে। তাঁর পথনাটক : *অবশেষে জেনারেল* (১৯৮৬)। **অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়** বিভাগ-পরবর্তী সময়ে ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক নাটক লেখা হয়েছে। সেটি কখনো জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক কখনোবা ঐক্যআস্থার কেন্দ্র থেকে। এমনটি সাংস্কৃতিক ধারাবহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের পরেও অনেকেই বহাল রেখেছেন। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় এ ধারার নাটকে *আনারকলি* (১৯৭৭) লিখেছেন। তবে তাঁর নাটকের ভাষা গুরুত্ববহ পর্যায়ে পৌঁছেনি। **অনিলবরণ দত্তে**র নাটক *স্বীকৃতি* (১৯৭৮), *কে দেবে কবর* (১৯৭৮)। গতানুগতিক বিষয়ানুষঙ্গি, প্রকরণেও স্ফূর্তি নেই। সমকালীন দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ চেতনায় আবর্তিত হয় তাঁর নাটক। এসব নাটকের ভাষাভঙ্গি দুর্বল, গভীর সমাজভিত্তি না থাকায় তেমন কোনো ঘরানা সৃষ্টি করতে পারেনি। সমাজ-অভিজ্ঞতায় নির্মিত অরুণ চক্রবর্তীর নাটক *বাবু খেলা দেখে যান* (১৯৭৭)। মঞ্চসফল নয়, সেটির নিরীক্ষাও সেকালে তেমন ছিল না, নিছক টেক্সট হিসেবেই একটা গুরুত্ব পাওয়া যায়। **অরুণ কুমার দে**র প্রথানুগ নাটক *গরীবের ছেলে*

(১৯৮০)। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি অর্জিত এ নাটকে। **অগ্নিদূত** মধ্যবিত্ত চেতনার প্রতীকী প্রত্যয়ে রচিত *অন্ধকারের নীচে সূর্য* (১৯৮০), *রবিবারের সকাল* (১৯৮০) নাটক। গল্পভঙ্গি সুন্দর। নাটকের ইমেজ পরিলক্ষিত। নাটকের ক্রিয়ায় যে পরিহাসপ্রিয়তা কিংবা প্রতিক্রিয়ার যে পরিবেশ সেটির পরিচর্যা এতে পরিলক্ষিত। তবে নিরীক্ষা দুর্বল। **অমর সাহা** পিরোজপুর নাট্যচক্রের সংগঠক, দলীয় নাট্যকার। *মরা মানুষের রং* (১৯৭৯), *পিপাসার মৃত্যু* (১৯৮১), *সত্য যেখানে মরে গেল* (১৯৮১), *অথবন্ধু সমাচার* (১৯৮১), *মৃত্যু মানে পরাভব* (১৯৮১), *নীলখাম* (১৯৮১), *পাঞ্জা* (১৯৮০), *স্বাধীনতার ঝড়* (১৯৮১), *ভাগীরথী* (১৯৯৪), *পুরানো কড়চা* (১৯৯৪) এসব তাঁর নাটক। কমিটেড নাট্যকার। সমাজ-বীক্ষণের জায়গাটিতে তিনি দুর্বল নন, দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আছে, সে বিশ্বাসটিও নাটকে জাগরূক। এক পর্যায়ে আরও সংক্ষুব্ধ চিত্তে হাত দেন পথনাটকে। অর্জিত নাট্যভাষায় তাঁর পথনাটক : *চেতনার উন্মেষ* (১৯৮০), *চশমা* (১৯৯৩)। **অনুপকুমার ভৌমিক**, কর্মযোগী নাট্যকার, *শোভনার বাঁধ* (১৯৮৪) হয়ে ওঠে তাঁর নাটকের প্রেরণা। জীবনাশ্রিত নাটক। সম্ভাবনা তাঁর প্রচুর। **অলোক বসু** ভুঁইফোঁড় নন, অস্তিত্বের আখরে নিরঙ্কুশ সত্যে জীবনরসের প্রতিটি মাত্রাকে বোনেন তিনি। সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, বাঁচার অঙ্গীকার জীবনের সত্য থেকে অর্জিত। প্রচণ্ড পরিহাসপ্রিয় ও ব্যঙ্গাত্মক পর্যালোচনা তাঁর নাটক। প্রান্তিক মানুষের পক্ষে তিনি, আর বোধের দীক্ষা শোষণমুক্তির জন্যে, সামষ্টিক মানুষকে তৈরি করেন তিনি নাটকে, ছড়িয়ে দেন অনেকমুখে। তাঁর নাটক *ঘরামি* (২০০১) *তেভাগার পালা* (১৯৯৯), *শুধু একাকী* (১৯৯৯)। পথনাটক : *বান্দরের কিস্‌সা* (১৯৯৪), *মাদার* (১৯৯৪), *অগ্নিদহন* (২০০১)। বান্দরের কিস্‌সায় মিশে আছে চমৎকার নাট্য-আমোদ। **অভিজিৎ সেনগুপ্ত** সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাপৃত সমাজ-কাঠামো আর জটিল জীবনাবর্তের প্রতিকৃতি তাঁর নাটকে প্রতিফলিত। রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের বিরুদ্ধে উঠে আসা সম্মিলিত মানুষের প্রত্যয়টি ধ্বনিত, অনেকটা পৌরাণিক পুনর্নির্মিতিতে। তাঁর নাটক *ক্রান্তিকাল* (২০০১), *অর্ফিয়ুস* (২০০১), *বেলা শেষের গল্প* (২০০৪)। **আতাউর রহমান** (জ. ১৯৪১)বাংলাদেশের মঞ্চ-অভিনেতা ও নির্দেশক আতাউর রহমান। নাট্যভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর সহযোগে ফেরেংক মলনারের *লিলিয়ম*-এর রূপান্তর *ভেঁপুতে বেহাগ* (১৯৭৪)। জিয়া হায়দার সহযোগে তাঁর অনুবাদ *দ্বাররুদ্ধ* (১৯৭০) এবং নিকোলাই গোগলের দ্য ম্যারেজের রূপান্তর *প্রজাপতি নির্বন্ধ* (১৯৭০)। আতাউর রহমান বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মঞ্চের জন্য যেমন তেমনি নাট্যপাঠেও তাঁর যোগ্যতা অবিকল্প বলা চলে। বাইরের নাটককে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসা শুধু নয় তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে ভিন্ন পাঠ। *ভেঁপুতে বেহাগ* খুব মনোমুগ্ধকর রূপান্তর। এ কাজে যথেষ্ঠ স্বাধীনতা নিয়েছেন

তাঁরা, যেটি এদেশীয় কনটেক্সট্ পেয়ে গেছে। *দ্বাররুদ্ধ*ও ভালো মানের কাজ। বাংলাদেশের নাট্য-পরিমণ্ডলে এ অনুবাদগুলো একদিকে যেমন সুরুচির সংবাদ বয়ে এনেছে অন্যদিকে তেমনি 'ইলাস্ট্রেশান'-এর ক্ষেত্রটিকে দিয়েছে চিনিয়ে। **আজাদ আবুল কালাম** (জ. ১৯৬৬) তরুণ নাট্যকার আজাদ আবুল কালামের *সার্কাস সার্কাস* (১৯৯৮ প্র. অ.) মঞ্চসফল নাটক। এছাড়া তাঁর মৌলিক নাটক *ট্রাজেডি পলাশবাড়ী* (২০০৫)। তৌফিক আল হাকিমের গল্প অবলম্বনে রচিত *দুই বলদের গল্প* (১৯৯৭)। আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অস্তিত্বের পুনর্বিবেচনা, পুনর্বহালের একটা চেষ্টা উত্তর-উপনিবেশিক বিশ্বে বিরল নয়। বাংলাদেশের নাট্যকাররা এক ধরনের সচেতন চিন্তায় সে কাজটি নীরবে সম্পন্ন করে চলেছে। *সার্কাস সার্কাস* মঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধশিল্প। কাহিনি-চরিত্র-আবহ নির্মাণ সবকিছুতে সামগ্রিকতা এসেছে, এক ধরনের স্বাভাবিকতা আছে। নাট্যভাষা বিষয়ানুগ। আজাদের সম্ভাবনার সংবাদ আছে এ নাটকে। **আবদুল মতিন খান** *মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব* (১৯৮০), *সম্মেলন* (১৯৮১) ভণ্ড রাজনীতিবিদ ও আমলাদের কৃতকর্মের ব্যঙ্গচিত্র। *মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব*-এর ভূমিকায় আছে 'সৌরমণ্ডলীর নির্দিষ্টতায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তন তাই এদেরই এরকম কতিপয় গ্রহ-উপগ্রহেরই নিয়মিত পথ-পরিক্রমা দেখানোর চেষ্টা নেয়া হয়েছে এ নাটকে।' এমন বক্তব্য থেকেই তাঁর নাট্যমেজাজটি বুঝে নেওয়া সম্ভব। *শকুন্তলা* (১৯৮১) 'স্ত্রীর ওপর স্বামীর 'সর্বতোমুখী প্রভুতা' নষ্ট করার উদ্দেশে এ কাজটি করা'—এমনটা বলেছেন নাট্যকার। প্রকৃতঅর্থে কালিদাসের 'শকুন্তলা'কে একালের উপযোগী করে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। এখানে 'শকুন্তলা' স্বাবলম্বী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর ইতিহাসের পুনর্নির্মাণভিত্তিক নাটক *গিলগামেশ* (১৯৮২)। লেখকের অন্য নাটক *বজ্রানলে ও লালু* (১৯৮২)। **আবদুল্লাহেল মাহমুদ** (জ. ১৯৫৫) আশির দশকের কমিটেড নাট্যকার। প্রান্তিক মানুষ ও তাঁদের শ্রেণিচেতন বক্তব্য নাট্যউপজীব্য হয়ে ওঠে। *সাত পুরুষের ঋণ* (১৯৮২), *নানকার পালা* (১৯৮৭), *প্রাকৃতজন কথা* (১৯৯৭), *কৈবর্তগাথা* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর নাটক। খুব গুরুত্বপূর্ণ এ নাট্যকার। তাঁর দায়বদ্ধতার জায়গাটি এসব নাটকের পরিচয়ে খুব সহজেই অনুমান করা যায়। কৈবর্ত বিদ্রোহের ইতিহাসগত সংবাদ আমাদের জানা কিন্তু সেটি আধুনিক আবর্তে তুলে আনলে তা পায় ভিন্ন মাত্রা। একইকথা নানকার বিদ্রোহের খবর প্রসঙ্গেও বলা চলে। নাটকে এ বিদ্রোহসমূহের প্রতিফলন এক ধরনের সমাজচেতনার ইঙ্গিত দেয়। যেটি এ সময়ের প্রতিক্রিয়াশীল ও বৈষম্যময় সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এতে করে প্রাকৃতজন অধিকারটিও কায়েমের প্রত্যয় থাকে। প্রকৃতঅর্থে প্রগতির পরিচর্যাটি এভাবেই কায়েম হয় নাটকে। এ নাট্যকারের নাট্যভাষা, স্ফূর্তিময় আবহ ও সংলাপ সবকিছুই অর্থবহ

বলা যায়। **আবদুস সেলিম** (জ. ১৯৪৫) ব্রেশ্‌ট-এর *মাদার কারেজ এন্ড হার চিলড্রেন* এবং *দ্য লাইফ অব গ্যালিলিও* (১৯৩৮-৩৯) অবলম্বনে যথাক্রমে *হিম্মতী মা* (১৯৮৫ প্র. অ.) এবং *গ্যালিলিও* (১৯৮৮ প্র. অ.) তাঁর নাটক। দুটো নাটকই মঞ্চসফল। বহুবার মঞ্চে এসেছে। ব্রেশ্‌ট এ সময়ে সবচেয়ে আধুনিক এবং ইউনিক নাট্যকার। সুতরাং তাঁর নাটকের আলোচনা নয় কিন্তু যেটি বলা দরকার রূপান্তরের সাফল্য। এটি আর ব্রেশ্‌ট নয়, আবদুস সেলিমের নাটক। এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন নাট্যকার। পরিপ্রেক্ষিতটি তৈরি করেছেন এদেশীয় করে। *হিম্মতী মা*র পরিচয়টি আমাদের সমাজেই নিহিত। আর গ্যালিলিও সমস্ত শক্তির, প্রেরণার, আদর্শের মূলমন্ত্র। ব্রেশ্‌ট খুব বড় মাপের নাট্যকার, সেজন্য সমাজ-অসঙ্গতি কিংবা প্রথানুগ-বিপরীত ব্যাপারগুলো তাঁর নিকট বেশ গভীর মাত্রা পায়। গ্যালিলিও শুধু একালের নন, সর্বকালের কৃতি ব্যক্তিত্ব। এটির উপস্থাপন বাংলাদেশের নাটকের জন্য খুবই ইতিবাচক সংবাদ। আবদুস সেলিম দুটো নাটকেই নিজস্ব থেকেছেন, তিনি ব্রেশ্‌টকে অপচয় করেননি। **আবুল মোমেন** (জ. ১৯৪৮)-এর *সুখ যাত্রা* (১৯৮৬), *স্বপ্নের আগন্তুক* (১৯৭৫) স্বকালবিদ্ধ নাটক। টেক্সট্ হিসেবে মধ্যম মানের। নাটকের ক্রিয়া বা কমিটেড ব্যাপারটি তেমন উপস্থিত নয় তাঁর নাটকে। নাট্যভাষাও উত্তরিত নয়। আবুল মোমেন নাটকের পরিবেশটিও ক্রিয়ায় (action) বা দ্বন্দ্বাত্মক করে তুলতে অসমর্থ হন। **আমিনুর রহমান** 'দিবালোক' ঝিনাইদহের নাট্যকার। *অলিখিত সংলাপ* (১৯৯১), *একজন তাহমিনা* (১৯৯১), *অংকুরের ডাক* (১৯৯৩) তাঁর নাটক। আমিনুর রহমানের নাটকের সংলাপ বিষয়ানুগ, তবে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য আসেনি। **আব্দুল হাই দূর্বার** উত্তরা থিয়েটার ঢাকার নাট্যকর্মী। *ময়নার চর* (১৯৭৩), *এরফান বাওয়ালীর কবর* (১৯৮৮), *ধোলাই* (১৯৯৬), *বদহজম* লিখে তিনি গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেন। তবে সবচেয়ে সাফল্য তাঁর পথনাটকে। অনেক অভিজ্ঞতা ও আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে পারেন তিনি এ প্রকরণে। জাতীয় মুক্তির, অধিকার কায়েম ও শোষণমুক্ত সমাজের অঙ্গীকার সেখানে পরিব্যাপ্ত। নাট্যকারের পথনাটক : লড়াই (১৯৮৬), *স্বাধীনতা কথা বলে* (১৯৮৭), *আহত একুশ* (১৯৯৪), *নয়ছয়* (১৯৯৬), *ফিরে দেখা* (২০০০)। **আজিজুস সামাদ** নাটক লিখে খ্যাতিমান। দীর্ঘ সময় তিনি নাটকে ক্রিয়াশীল। *কীর্তিনাশা* (১৯৯২), *কালান্তর* (১৯৯৪), *প্রহেলিকা* (১৯৯৫), *বঙ্গরঙ্গ* (১৯৯৬), *হিং টিং ছট* (১৯৯৭), *বৃত্ত* (১৯৯৮), *বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতা* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর নাটক। এসব নাটকে তিনি সামাজিক অসঙ্গতি, পরিহাস ও ব্যঙ্গের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জীবনের সূক্ষ্মতর দিকের প্রতি তাঁর ইঙ্গিত থাকে বহাল। তাঁর নাটকে রসবোধ আছে। তবে কিছুতেই তা হালকা বা তুচ্ছতায় পর্যবসিত নয়। আজিজুস সামাদ বিশেষ মুহূর্তে পথনাটক লিখেছেন, সেটি তেমন গুরুত্ববহ নয়। তবে

নাটকে তাঁর প্রধানতম দিক সূক্ষ্ম রসবোধ ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা। নাট্যকারের পথনাটক : *কল্পতরু* (১৯৯৪), *কাঁটা* (১৯৯৬) প্রভৃতি। **আশীষ খন্দকারে**র নাটক *একটি শিরোনামহীন নাটক* (১৯৯৮) ও *আলোছায়া* (১৯৯৯)। জীবনের প্রতীকী আবর্তের এসব নাটক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সভ্যতা ও রুচির একটা গৎবাধা কাঠামো বর্তমান এসব নাটকে তবুও সূক্ষ্মতর সংকেতে এর অপ্রয়োজনীয়তা কিছু নেই। সমকালের সমাজ আবর্তের বিষয়গুলোই এতে বিধৃত। কিন্তু বিষয়ের চেয়ে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া তৈরি। আশীষ এতে অব্যর্থ নন, তবে দক্ষতা পরিপক্ব নয়। **আহমেদ কামাল খোকন** এ সময়ের নাট্যকার। *অবশিষ্টাংশ* (১৯৯৯), *চোখকাগজ* (১৯৯৯), *চক্রবন্দী* (২০০০) এসব নাটকে জীবনের সম্ভাব্য দিকেরই চিত্রার্পণ হয়েছে। তাঁর পথনাটক : *নমস্য নমস্কার* (১৯৯৯)। এসব নাটকের ভিতর দিয়ে বর্তমান সময়ের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। **আজহার হাবলু** (জ. ১৯৬৪) বিদ্রোহী নাট্যগোষ্ঠী, ময়মনসিংহের দলীয় নাট্যকার ও সাধারণ সম্পাদক। *বিতাড়িত সুন্দর* (১৯৯৬), *বেদনার নোঙর* (১৯৯৭), *আলারাখা* (১৯৯৯), *বর্ণমালার চোখে জল* (২০০১), *মজার ইস্কুল* (২০০২), পোড়ামুখী (২০০৭) তাঁর নাটক। পাঠ-অভিজ্ঞতায় **আফসার আহমেদের** নাটক *প্রেমপুরাণ* (১৯৯৯)। শিল্পিত তাঁর রচনা। সমাজ কিংবা উপযোগিতার নানাবিধ প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ ইঙ্গিতেই তিনি তুলে আনেন। *প্রেমপুরাণ* মঞ্চ-উপযোগী যেমন তেমনি পঠনেও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে তাঁর নাট্যভাষা এবং আঙ্গিকে একটু অসঙ্গতি থাকলেও নাটকের কথনে তা উৎরে গেছে। বিষয়ের গভীরে পৌঁছা এবং আত্মস্থ করারও প্রয়াসটি আছে এ নাটকে। কোনো কিছুই তাঁর নাটকে অবাস্তব হয়ে ওঠেনা। **আসাদুল্লাহ ফারাজী** শহীদ সমর থিয়েটার জামালপুরের নাট্যকর্মী, দলীয় নাট্যকার ও নির্দেশক। *মানুষ অমানুষ*, *রাইক্ষসের পাচালী*, *বীরাঙ্গনা বিমলরা*, *সী মোরগ*, *সোহাগী বাঈদানীর ঘাট* প্রভৃতি নাটক লিখেছেন। নাটকের ভেতর দিয়ে সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্নটি কায়েম থাকে। এক ধরনের অস্তিত্বানুগ টাইপ বিস্তারিত হয় তাঁর নাটকে। নাট্যকারের পথনাটক : *রাইক্ষসের ক্ষিধা*, *সুখের ঠিকানা-১*, *সুখের ঠিকানা-২*, *যৌতুক*। **আলী আনোয়ার মোল্লা** 'তির্যক নাট্যদল' চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। *আয়না* (১৯৭৪), *স্টেজ রিহার্সেল* (১৯৭৫), *বোবা মিনার* (১৯৭৫), *চার্টার অব ডিমান্ড* (১৯৭৯) প্রভৃতি নাটকে সময়চিহ্ন বা সময়ের ক্ষতটি ব্যঙ্গাত্মক বা প্রচলিত ভাষ্যে প্রচারিত। নাটকে যতোটা জীবনের ক্যারিকেচার বিধৃত ততোটা শিল্পমানে উত্তীর্ণ নয়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়খণ্ডটি এখানে বিধৃত। সে অনুষঙ্গি ভাষাও এখানে নির্ণীত। **আব্দুর রাজ্জাক** রংপুর থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। *মঞ্চে যা দেখবেন* (১৯৮১), *ময়নার বিয়ে* (১৯৮২), *চুপ থাকবেন না* (১৯৮৪), *ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে* (১৯৮৫), *ভুল যখন ভাঙলো* (১৯৮৫), *রক্তে আঁকা মানচিত্র* (১৯৮৪) আশির এসব নাটকে মধ্যবিত্তের

আশা-আশ্বাস আর হতাশা প্রতিফলিত। নাটকের উপস্থাপনাগুণ চমৎকার। দেশাত্ম ভাবনা ই মূল প্রতিপাদ্য। এক ধরনের মূল্যবোধের আঁচড়ে বন্দি এসব নাটক। **আরিফুল হক রুজু** বিকন নাট্যকেন্দ্র, রংপুরের সঙ্গে যুক্ত। এস. এম. সোলায়মানের গল্পের নাট্যরূপ *জনম দুঃখী মা* (১৯৯২), *লক্ষ্মী নূরজাহান* (১৯৯৩), *কার্তিকের জ্যোৎস্না* (১৯৯৪), *ভালোবাসা বন্ধ থাকবে* (১৯৯৪), *মানচিত্রের গল্প* (১৯৯৭), *তবু স্বপ্ন* (২০০০), *গন্তব্যহীন গন্তব্য* (২০০২) এমন অনেক নাটক আরিফুল হক রুজু লিখেছেন। এক ধরনের সারপ্রাইজিং আছে তাঁর লেখায়। সাংবাদিকসুলভ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিভাকে যেমন নানামুখি করেছে তেমনি উপযোগিতা বা তাৎক্ষণিক পাওয়া না পাওয়ার বাইরে অন্য কিছু তিনি কায়েম করতে পারেননি লেখায়। তবু বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে এর লেখার গুরুত্ব কম নয়। পথনাটক : *কল্পকাহিনী-১* (১৯৯৪), *একটি কারখানার গল্প* (১৯৯৪), *কল্পকাহিনী-২* (১৯৯৫), *দাদা আর যাবো না* (১৯৯৬)। **আলো দাশগুপ্ত** সংগঠক, নাট্যকার। *নাম বিভ্রাট* (১৯৭৫)-এর পর আর তেমন লেখেননি। **আনোয়ার তালুকদার** রচিত *দাঁড়াবো শুধুই* (১৯৭২), *উৎস থেকে সমুদ্দুর* (১৯৭৪)। যুদ্ধ-পরবর্তী প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের ব্যাপারগুলোই পাত্র-পাত্রীদের ভেতর দিয়ে উঠে আসে। তেমন কোনো নির্ধারিত পরিচয় বা প্রয়োজনা পরীক্ষায় আর এগোননি। **আজমিরী ওয়ারেশ** স্বাধীনকা উত্তরকালে নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। *উন্মোচন* (১৯৭২) তাঁর নাটক। আজমিরী ওয়ারেশ-এর নাট্যভাষা নেই। বিশেষ উদ্দেশের উন্মোচন কার্যকররূপে বর্ণিত। **আক্তার কমল** মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সমাজের বক্তব্য নিয়ে *রংহীন সিগন্যাল* (১৯৭২)। এসব নাটক আমাদের মঞ্চের পথসৃষ্টি করে দিলেও কোনো দার্শনিক ভিত্তি অর্জিত হয় না। **আবু সালেক খান** রাজনৈতিক মোটিফ থেকে লেখা *প্রত্যাবর্তনের দেশে* (১৯৭৬)। এসব নাটকে বিশ্বাসের দুর্বলতা ও চিন্তার স্বচ্ছতাও আছে। **আহ্‌মেদ সিদ্দিকী** *সক্রেটিসের সন্ধানে* (১৯৮৫), *চুরি কেইস* (১৯৮৮), *রূপকুমার* (১৯৯৬) আহমেদ সিদ্দিকীর নাটক। একটু উচ্চমার্গের প্রচেষ্টা, সক্রেটিসকে আনতে চান, পরিচিতি করান, আদর্শে প্রাণিত করার চেষ্টা করেন। মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এটি কার্যকর। অন্যান্য নাটক নক্সা টাইপের। **আনোয়ার তালুকদার** রাজনৈতিক চেতনা ধরেই *ডেটলাইন*। স্বাধীন বাংলাদেশের অনর্থের সংবাদ, কিংবা অস্থিরতার ভেতর দিয়েই এগুনো, নাটকে চালচিত্র আকারে আসে, বোধ করি হিতসাধনের উপায় প্রস্তাবনায় *ডেটলাইন* (১৯৭৭)রচিত—সেটি যতোই অপ্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন হোক। **আসিফ মুনীর** ঠুনকো মধ্যবিত্ত সমস্যার পরিবৃত্তে নাটক। আসিফ মুনীর লিখেছেন, *আসমান তাঁরা শাড়ী* (১৯৯১), *বাজিমাৎ* (১৯৯৪)প্রভৃতি নাটক। এ নাটকের ধারাটিই এখন মিডিয়ায় বেশি সক্রিয়। তবে নাটকে সত্যিকারের বিশ্বাসটুকু অনার্জিত। কারণ পরিসর চাই,

যত্ন ও পরিচর্যা, উদ্যমতা ও ঝুঁকিপূর্ণ সাহস দরকার নাটকে। **আনন জামান** *শিখণ্ডী কথা* (২০০৬) সফল মঞ্চপরিবেশনা পেয়েছে। *মহাভারত* আখ্যান পায়। সর্বাঙ্গীন মাত্রিকতা সেখানে অবিলুপ্ত নয়। ভাষা সুন্দর। সেটিংস ইলাস্ট্রেশান পরিপূর্ণ। পাত্রপাত্রীদের দ্বারা মাহাভারত পরিলেখা যেন উজ্জ্বল; কিন্তু তা শুধু অতীতের নয় বর্তমানের ভাষ্যে সমুজ্জ্বল। আনন জামানের পথনাটক : *প্রকৃতি বিলয়* (২০০৪)। একটু ভিন্ন প্রবণতার চরিত্র মনে হচ্ছে, তবে সমন্বয়ী এবং আশাবাদী। *শকসো* (২০০৬) তাঁর অন্য মঞ্চনাটক। **আব্দুল হালিম আজিজ** দৃষ্টিপাত নাট্যদল, ঢাকার কর্মী। *পোস্টার* (১৯৮৪), *শেষ যুদ্ধ* (১৯৮৪), *চিতেশ্বরের কইতরী* (১৯৮৫), *ইচ্ছামতির কিচ্ছা* (১৯৮৬), *তিন পুরুষের মাথায়* (১৯৮৯), *হানাদার* (১৯৯১), *রূপবতী* (১৯৯২), *বুদ্ধ* (১৯৯৭), *মানুষ সংবাদ* (২০০২) এরকম অনেক নাটক লিখেছেন, প্রতিষ্ঠা প্রেরণায় ও দর্শনে। আবদুল আজিজ নানা রকমের বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তবে প্রান্তিক আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি বেশি সক্রিয়। তাঁর পথনাটক : *রাক্ষস* (১৯৮৫), *মহারাজের দেশে* (১৯৮৭), *লড়াই* (১৯৮৮), *রাজার হলো সাজা* (১৯৯০), *ঘাতক* (১৯৯২), *ঘাতক সমাচার* (১৯৯৮), *খেলাধুলা* (১৯৯৯), *আমাদের কথা* (২০০৩) প্রভৃতি। ইতিবাচকতার পরিবৃত্তে **ইউসুফ আলী খোকনে**র নাটক *জলপরী* (২০০৪)। পথনাটকও লিখেছেন, জীবনের সত্যের সঙ্গে মিলিয়েছেন তিনি নাটককে। তবে প্রকরণ দুর্বল। তাঁর পথনাটক : *খনন* (২০০৩), *লালী* (২০০৫)। **ইজিবর রহমান** পাবনা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটক *মৌচাক*, *ইদানীং আমরা সেপাই* (১৯৮৯), *মুখোশ* (১৯৯৩), *প্রেক্ষাপট* (১৯৯১), *ক্রমশ*, *সামনে খোঁড়া কবর*, *ডাস্টবিন সমাচার*। **ইনামুল হক** এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি। ক্ষুদ্রস্বার্থের বাইরের জাতীয় চেতনার ইঙ্গিত আছে তাঁর *গৃহবাসী* (১৯৮৮, ১৯৮৩ প্র. অ.) নাটকে। *নির্জন সৈকতে* লিখেছেন ইনামুল হক। তাঁর অনুবাদ নাটক : *ঝড়*, *কৃষ্ণচূড়া*। **ইসরাফিল শাহীন** (জ. ১৯৬৪) নাটকে প্রতীকী-পরীক্ষার পরিহাস রচনা করেন। *পুতুল খেলা* (১৯৯২) তাঁর উল্লেখনীয় নাটক। কাহিনি উচ্চতা আছে। শিল্পমান ঋজু, দুর্বল নয়। উৎকর্ষমাত্রাও সঠিক। পাঠ-অভিজ্ঞতা আছে। এমন নাটক পথিকৃতের ভূমিকায়, নাট্যশিল্প এবং বিশ্বাসমূর্তি তা যে কিছুতেই তাৎক্ষণিক আবেগ আলোড়িত হলে চলে না, নিশ্চয়ই থাকতে হয় জীবনদর্শনের বিস্তৃতি, তা প্রমাণ হয়। ইসরাফিল শাহীন সেভাবেই ভাবমূর্তি অর্জন করেন তাঁর নাটকে। **ইন্দু সাহা** নাট্যফৌজ ঢাকার নাট্যকার ইন্দু সাহার নাটক অনেক। নানা কিসিমের। বাস্তবানুগ ও প্রতীকী পর্যায়ের। কিন্তু তাঁর নাটকে যুক্ত হয় না কোনো আধুনিক প্রকরণ। প্রথানুগ ও ফর্মাল পথেই তাঁর যাত্রা। তাঁর নাটক : *বেকার নিকেতন* (১৯৭৪), *বিন্দু থেকে চেতনা* (১৯৭৬), *কিষাণ বৌ* (১৯৭৭), *বাঘ ও পদাতিক* (১৯৭৭), *টার্মিনাল* (১৯৭৮), *টুনি তালসোনাপুর যাচ্ছে* (১৯৭৯), *একজন*

মুন্সীর পোস্টার (১৯৮০), *দেয়াল ভাংবোই* (১৯৮৬), *নূরবানু ও মানচিত্র* (১৯৮৮), *অরণ্য জনারণ্য* (২০০৪) প্রভৃতি। উত্তরিত তাঁর অভিজ্ঞতা। প্রচার ও পরিবর্তন চান তিনি নাটকে। কমিটমেন্টের অস্ত্র করে তোলেন নাটককে। প্রকৃতপক্ষে, এমনটার বিলুপ্তি না হলে শিল্প নয়, শুধু তাৎক্ষণিক স্থূলতার কর্মপ্রণালীই রচিত হবে। **এ কে কবীর** *নতুন বিপ্লব*, *লালু ঠিকাদারের বস্তি*, *প্রতিবাদ*, *নির্বাসন*, *আশ্রয় শিবির*, *হোয়াইট অক্টোপাস*, *এই অরণ্যে*, *মধুপাগলা*, *বটতলার পাগলা*, *কিল দেশ*, *পণ্ডিত মশাই*, *মাধুরীর বিয়ে*, *রূপালী চাঁদ*, *আরশীনগর*, *সাম্বপ্রতিক সমাচার* তাঁর নাটক। এছাড়া পথনাটক : *রক্তাক্ত ফাল্গুন*, *লালগোলাপ*, *যুদ্ধ যুদ্ধ*, *কদমতলী আর্মী ক্যাম্প*, *মুক্তযোদ্ধা*। এ. কে. কবীরের নাটকের বিষয় ও পরিবৃত্ত একই। তিনি অনেক নাটক লিখেছেন কিন্তু নাট্যভাষা কয়েম হয়নি নাটকে। কারণ, তাৎক্ষণিক আলোড়নে পর্যবসিত। কর্মগুণ হারিয়ে ফেললে সেগুলো আর নাটক থাকে না। এজন্য দার্শনিক বুদ্ধিতে শিল্পগুণস্পর্শী সাহিত্য করাই প্রয়োজন। **এম. এ. ওয়াজেদ** পঞ্চসিঁড়ি বরিশাল নাট্যগোষ্ঠীর কর্মী। *রক্তের ঋণ* (১৯৮৪), *পল্লী মেয়ে* (১৯৮৫), *বাঁধো ব্যাটাকে* (১৯৮৬), *নতুন সূর্য* (১৯৮৬), *রক্তঝরা একুশে* (১৯৮৭), *সেই কাল রাত* (১৯৮৭) প্রভৃতি তাঁর নাটক। নাটকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকটিই তাৎক্ষণিক আবগের প্রাবল্যে জর্জরিত। একুশ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর নাটকে বিধৃত। গণ-আবেগটিকে মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় শানিত করেছেন। সমকাল ও সমাজ অনাচার বা ক্ষেদ যে নাটকে নেই তা-ও নয়। **এস. এম জয়নাল আবেদীন** চাঁদপুর ড্রামার নাট্যকর্মী। *জীবনযুদ্ধ* (১৯৮৫), *নো ভেকেন্সি* (১৯৮৫), *পলাশডাঙ্গার ময়না* (১৯৮৫), *মাধববাবুর তানপুরা* (১৯৮৫), *স্বর্গের সন্ধানে* (২০০৫) এসব নাটকের ভেতর দিয়ে এস. এম. জয়নাল আবেদীন সংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিহীন, অন্তেবাসী মানুষ থাকে তাঁর কেন্দ্রে। কিন্তু শিল্পভাষা সরল ও অনুত্তাপিত। এজন্য পথ রচনা হচ্ছে নানা নাটকে। তাঁর পথনাটক : *একজন রাহেলা* (২০০৫)। **এম. এ. মজিদ** (জ. ১৯৫৯) যাত্রার ঐতিহ্য এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বজায় রেখে নাটক লিখেছেন। তাঁর যাত্রা নাটক: *মোগল হাটের সন্ধ্যা* (১৯৭৯), *রতন মঞ্জরী* (১৯৭৯), *বিদ্রোহী বান্দা* (১৯৭৯), *কবি চন্দ্রাবতী* (১৯৭৯), *ঘুণে ধরা সমাজ* (১৯৭৯), *ফরিয়াদ* (১৯৮০), *ভিখারীর ছেলে* (১৯৮০), *চাকুরী চাই* (১৯৮১), *রঘু ডাকাত* (১৯৮২), *বিষে ডাকাত* (১৯৮৩), *রক্ত দিল যারা* (১৯৮৪), *নীল কুঠির কান্না* (১৯৮৫), *বাঙ্গালী* (১৯৯৫), *৪২-এর বিপ্লব* (১৯৮৬), *রক্তের দাবী* (১৯৮৭), *দেশের ডাক* (১৯৮৭), *বেহুলা লখিন্দর* (১৯৯৩), *মহুয়া* (১৯৯৪), *লালন ফকির* (১৯৯৪), *ঘুমাও তুমি প্রিয়া* (১৯৯৪), *মহাকবি মাইকেল* (১৯৯৫), *বিদ্রোহী ফকির মজনু শাহ* (১৯৯৫), *উদয়নালা জ্বলছে* (১৯৯৫), *রক্তে রাঙা সোনার বাংলা* (১৯৯৫), *দাতা হাতেম*

(১৯৯৬), *দংশন* (১৯৯৬), *ভাওয়াল সন্ন্যাসী* (১৯৯৬), *এই দেশ এই মাটি* (১৯৯৭), *পেটের জ্বালা* (১৯৯৭), *সুন্দরবনের ডাকাত* (১৯৯৭), *ঘুমন্ত সমাজ* (১৯৯৭), *রক্তে ধোয়া ধান* (১৯৮৭), *ঈশা খাঁ* (১৯৮৭), *থামাও যুদ্ধ* (১৯৮৮), *মানিকব পীরের দরগা* (১৯৮৮), *মাইনে করা মা* (১৯৮৮), *রাই-কমল* (১৯৮৯), *ভাষার ডাক* (১৯৯০), *জনতার শত্রু* (১৯৯০), *সাত কোটির মুজিব* (১৯৯১), *স্বাধীনতার ডাক* (১৯৯২), *চুকনগরের গণহত্যা* (১৯৯৩), *বিদ্রোহী নজরুল* (১৯৯৩), *হাছন রাজা* (১৯৯৩), *নদীর নাম মহানন্দা* (১৯৯৩)।

অন্য নাটক : *থামাও রক্তপাত* (১৯৯৩), *চারণ কবি মুকুন্দ দাস* (১৯৯৪), *নেতাজীর ডাকে দিল্লী চল* (১৯৯৪), *সাঁই ফকির আলেফ চাঁন* (১৯৯৪), *সালাম বিজয়ী বীর* (১৯৯৪)। এসব নাটকে স্বাধীনতা বা জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরধ্বনি বিধৃত হয়েছে। **কালীপদ দাশ** মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক *জয়বাংলা*, *সোনার বাংলা*, *বীর বাঙালি*, *বাংলার মাটি*। এসব নাটক রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য অপরিষ্কার নয়। মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর বিজয়গাথা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক নেই, কিন্তু এ চেতনার ছড়ানো ছিটানো রূপে অনেক নাটক রচিত হয়ে চলেছে। এ প্রয়াসেরই উদাহরণ এ নাটকগুলো। কালীপদ দাশের নাটক সে প্রবণতারই। **কাজী জাকির হাসান** *জনৈকের মহাপ্রয়াণ* (১৯৭৮), *শরবিদ্ধ যন্ত্রণা* (১৯৭৮), *দিকচিহ্নহীন* (১৯৭৯), *রাজায় রাজায়* (১৯৭৯) কাজী জাকির হাসানের নাটক। আধুনিক নাটকের বিষয় নিরীক্ষায় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক ভঙ্গিটি তাঁর নাটকে একটু প্রচ্ছন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গরূপে রাজনৈতিক। **কাইজার আহমেদ** *বায়ান্নর শকুন* (১৯৮৩) কাইজার আহমেদের রাজনৈতিক নাটক। বিষয়-গৌরবে নাটকটি মূল্যবান। যথেষ্ট মুন্সীয়ানার বিষয়টি আছে তাঁর নাটকে। **কাজী রফিক** *মনসার পালা* করেছেন। মধ্যযুগীয় পুনর্নির্মাণে আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ প্রদান। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য থেকেই এসব নাটক করা। প্রধানত পথনাটক করেছেন। তাঁর পথনাটক *সারি সারি লাশ*, *তারামন বিবি*, *চোর* প্রভৃতি। এখানে বিষয়-নির্বাচনই তাঁর বাস্তবতার স্মারক। নাট্যপ্রকরণ পরিচর্যাহীন। **কবীর আনোয়ার** *পোস্টার* (১৯৮৬), *জনে জনে জনতা* (১৯৮৪), *রূপের পসরা* এসব নাটক নিয়ে কবীর আনোয়ার খ্যাতিমান। তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিন্যাস থাকলেও প্রবলরূপে মঞ্চ-উপযোগী। এক ধরনের দায়বদ্ধতা থেকে তিনি এসব নাটক লিখেছেন। সেটি উদ্দেশ্যহীন নয়। ফলে বিষয়ে যে ক্রোধ ও আক্ষেপ থাকে, সেখানে আঙ্গিকগত কার্যকারিতা দুর্বলই হয়ে পড়ে। **কালাম মাহমুদের** নাটক *বিপ্লবের গান* (১৯৯৩)। মানব মুক্তির প্রত্যয়ী কথকরূপে পরিগণিত বিপবের গান। এর মূল্যায়ন শুধু কনটেকস্টে নয়, সুর-ধ্বনিব্যঞ্জনা ও পটভূমিও দরকার। **কচি খন্দকারের** নাটক *জ্বালাতন* (১৯৭৯), *একালে মানুষের*

গপ্পো (১৯৯১) ছাড়াও বেশকিছু পথনাটক লিখেছেন। সব মিলে তিনি সচল মানুষ। কিন্তু শিল্পমাত্রা দুর্বল। তাঁর পথনাটক : *ভূতের গদি* (১৯৮৪), *ঐতিহ্য ও কিছু প্রশ্ন* (১৯৯৬), *একটি অসম্ভব প্রত্যাশা* (১৯৯৮), *বিপন্ন দেশ, মানুষ, অস্তিত্ব* (১৯৯৯), *রক্তাক্ত* (১৯৯৯) প্রভৃতি। মানবতা ও মানুষের পক্ষেই তাঁর নাটক। **কুতুব উদ্দিন আহমদ** *প্রবালের ভিন্ন রং* (১৯৯৮), *নদীতে আগুন জ্বলে* (১৯৯৯), *সাদেক আলী ঘটক* (১৯৯৯), *অতএব শুভসংবাদ* (২০০০), *নাগীন* (২০০১), *একটি সুন্দর প্রেম* (২০০৩) প্রভৃতি নাটকে কৌশলি কুতুবউদ্দিন আহমদ। সব নাটক একই বিষয়-রূপে নয়, রোম্যান্টিক মার্জনা, বিদ্রূপাত্মক আশ্রয় পরিলক্ষিত। নাট্যকারের নাটকে প্রতিরোধের চেয়ে সূক্ষ্মতর পরিহাসপ্রিয়তা, সমাজজীবনের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কারণই যেন বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে। এখন আধুনিক নাটকে এমন গুণ অলক্ষ নয়। তবে নদীতে আগুন জ্বলে বা অতএব শুভসংবাদ-এর আঙ্গিককৌশল দুর্বল। **কুমার প্রীতীশ বল** একাত্তরের বীরগাথা উচ্চারিত *কথা ৭১* (২০০৭, ২০০৫ প্র. অ.) নাটকে। কুমার প্রীতিশ বল অনেক উচ্চগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এ নাটকে। চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছেন, প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বকীয় আখ্যান বয়ানে। এ নাটকের আঙ্গিক উচ্চমানের। প্রজন্মান্তরের স্মারক *কথা ৭১*। সংলাপ উদ্দীপনাময়, চরিত্রানুগ আবহনির্মাণ, মঞ্চপ্রয়াস শিল্পমণ্ডিত। বাংলাদেশের নাটকে এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। এছাড়া তাঁর নাটক *নুরুন্নেহার পালা* (২০০২)। **কাজী রোজী** সাত্ত্বিক নাট্যসম্প্রদায় ঢাকার কর্মী। তাঁর নাটক *কুসুম বেত্তান্ত* (২০০৪)। এছাড়া পথনাটক *পঞ্চদেব* (২০০৪)। কাজী রোজী সৃজনশীল নাট্যকার। 'কুসুম'কে প্রান্তিক প্রতীকায়নে তুলে আনেন। প্রতিরোধ বার্তাই শুধু নয়; ভেতরের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, সংস্কার-কুসংস্কার সৃজনী হয়ে ওঠে চরিত্রের ভেতরে। একটা ঐতিহ্যিক সম্বন্ধসূত্র তৈরি করেন লেখক। বাংলাদেশের নাটকে এ পর্যায়ের বিষয়কে নানামুখি করে তোলার অর্থ, সমস্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রত্যয় আর অধিকতর মর্যাদাবান ও শ্রমী মানুষের স্বীকৃতি। **কাজী মাহমুদুর রহমানের** (জ. ১৯৪২) *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাতটি নাটক* (২০০৭) বেরিয়েছে। এ নাটকগুলো *সাত আসমানের সিঁড়ি, স্বর্ণতোরণ, চাঁদ পোকা ঘুণ পোকা, বধ্যভূমিতে শেষ দৃশ্য, বিজয়গাথা, আরজ আলী সব বাউলের রাতে, একবার, তারপর অন্যকিছু, পুরাণের পাখি*। কাজী মাহমুদুর রহমানের এ সিরিজ প্রশংসনীয়। প্যাকেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ প্রয়াসে বর্ণিত। মেধাবী এ নাট্যকার নাট্যভাষাতেও উত্তীর্ণ। অনেক তত্ত্বকে তিনি তথ্য করে তুলেছেন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত সত্যে বাঙময়। **খালেদা হানুম** রুডলফ বেসিয়ার অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক *সহসা জীবন* (১৯৭৩)রচনা করেছেন। এখানে রূপান্তরে তিনি অনেকটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। সৃজনশীল এ নাট্যকারের নাট্যভাষাও দুর্বোধ্য নয়। সাবলীল এবং স্বচ্ছ। **খালেদ**

খানের নাটক *শয়তানের আশ্রমী* (২০০২), *বাবার আঁকা লাল সূর্য* (১৯৯৫)। নাট্যকারের নাট্যগুণ নানামুখি। অভিজ্ঞ এ নাট্যকার। অভিব্যক্তিবাদী প্রয়াস আছে। আধুনিক নাট্যবিশ্বের মাত্রায় তিনি বিষয়কে কায়েমী করে তুলতে চান। তবে চেতনাগত ভিত্তিটি অমোঘরূপেই থাকে তাঁর নাটকে। খলেদ খানের এ নাট্যপ্রয়াস বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ। **খান মোহাম্মদ ফারাবী** (১৯৫২-১৯৭৪) সৃজনশীল বহুমাত্রিক লেখক। তাঁর নাটক *আকাশের ওপারে আকাশ* (১৯৮২)। প্রবন্ধ লিখলেও একমাত্র এ নাটকে মেধার পরিচয় দিয়েছেন। স্বল্পায়ু এ লেখকের নাটকে নাট্য আবহ কবিত্বপূর্ণ। অন্তর্মুখি জীবনবীক্ষণই তিনি আয়াসলব্ধ করে তোলেন নাটকে। ফারাবীর নাটকে নাটকীয়তার অবকাশটি দুর্বল মনে হয়। হয়তো কবিভাবটুকু গ্রাস করে বলেই তা বহিরাশ্রয় পায় না। **খায়রুল বাসার** *জীবন এখানে কোরাস গান* (১৯৯০), *জনৈক ইমান আলী* (১৯৯১), *বার মাসে তের মুখোশ* (১৯৯৪), *পোকা* (১৯৯৬), *হালখাতা* (১৯৯৮), *বাস্তুভিটে* (২০০২)—এসব নাটক লিখে খায়রুল বাসার নাট্যকৃতি দেখিয়েছেন। *জীবন এখানে কোরাসগান* প্রত্যয়ী নাটক। জীবনের সারস্বত সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেতে চান নাটকে। এছাড়া মানবসত্যের দৈনন্দিনতাও বিচিত্রপ্রয়াসে গৃহীত তাঁর নাটকে। **খায়রুল আলম সবুজ** (জ. ১৯৫২) ফরাসী নাট্যকার জাঁ আনুই-এর *আন্তিগোনে*র অনুবাদ করেছেন। এটি থিয়েটারের প্রযোজনা ১৯৯২-এ। সফোক্লিসের নাটককে নবরূপে পরিবেশন করেছেন জাঁ আনুই। বাংলাদেশে আন্তিগোনের অনুবাদক নীতি-অহং-মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে সৃজনশীলতায় একটা সাংস্কৃতিক মাত্রায় পরিবেশন করেছেন খায়রুল আলম সবুজ। তাঁর নাটপাঠ পরিপক্ব ও পরিশ্রমী। এচাড়া তাঁর নাটক *নোরা* (১৯৯৬)। **গোলাম শফিক** (জ. ১৯৬১) *শিলারী* (২০০৭) কুসংস্কার বা বুজরকি পেশার বিশ্বাস ও আচ্ছন্নতা নিয়ে রচিত নাটক। সাম্প্রতিক সময়ের এ নাটকটি নাট্যকারের কর্মদক্ষতা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। গোলাম শফিকের অন্য নাটক এই পিরীতি সেই পিরীতি নয়। **গোলাম আম্বিয়া নূরী** চরাঞ্চলের বিধৃত ভাষায় রচিত, সংগ্রামের কাহিনি *কুমারখালির চর* (১৯৮১)। নদী-দ্বীপ-চর অঞ্চলের সংগ্রাম, জঙ্গমতা নিয়ে এ নাটক। বিচ্ছিন্নভাবে নয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এ নাটকে এক ধরনের সত্যতা যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি প্রবাহও কায়েম হয়েছে। নাটকের নির্মাণ স্থূল, তবে চরিত্রানুগ। তাঁর অন্য নাটক বাজতলীর পরী। তবে নাটকে তাঁর আরও পরিচ্ছন্ন ও যত্নবান হওয়া দরকার। **গিয়াসউদ্দিন সেলিম** *ঠ্যারো* (১৯৯১), *চিলেকোঠা* [আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস অবলম্বনে] (১৯৯১) গিয়াসউদ্দিন সেলিমের নাটক। *চিলেকোঠা* দুরূহ নাট্যপ্রয়াস। একটি অসম্ভব কাজ। বিরাট বৈভবে এটি মঞ্চে এসেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমানের অন্তর্মুখি চেতনাকে নাটকে বাঙময় করা বেশ

কঠিন—এটি সম্পন্ন করেছেন সেলিম; অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। নাট্যকারের নির্বাচন প্রশংসনীয়, সংলাপ ঋজু, মধ্যবিত্ত চরিত্রের রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাসের শিল্পরূপ আকর্ষণীয়। **গোলজার হোসেনে**র নাটক *বিজয়* (১৯৯০), *স্বাধীন* (১৯৯১), *কদমতলীর কালাচাঁন* (১৯৯৯), *বাঁশ* (২০০৩)। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্রুত চেতনায় তিনি নাটক রিখেছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেননি তিনি এসব নাটকে। তাঁর পথনাটক: *আর কতদিন* (১৯৯১), *চোখ থাকতে অন্ধ* (১৯৯১), *সপ্ত ডিঙি পেরিয়ে* (১৯৯২), *নৈরাশ* (১৯৯৩), *হাবুরা* (১৯৯৪), *অচিনপুর* (১৯৯৫), *ভেলকি* (১৯৯৫), *ওরা কারা* (১৯৯৭), *জুলুম* (১৯৯৮)। সমাজিক শোষণ-নির্যাতন চিত্রই অনেকটা স্থূল হয়ে ওঠে তাঁর নাটকে। **গোলাম সারোয়ার** (জ. ১৯৫২) মলিয়েরে *জর্জ দ্যাঁদ্যা* এবং *দা বুর্জোয়া জেন্টলম্যান* অবলম্বনে যথাক্রমে *ঘরজামাই* (১৯৯৮) এবং *ভদ্দরনোক* (১৯৯৮, ১৯৮৩ প্র. অ.)। গোলাম সারোয়ারের রূপান্তরে দেশীয় পরিবেশ যেমন বিরাজমান তেমনি অবলম্বিত ভাষায় কৌতুক ও বাস্তবতার মিশেল চমৎকারভাবে গৃহীত হয়েছে। নাটকটি রূপান্তরে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। *বিদ্যাসুন্দর*, *ক্ষত মজুর খইমুদ্দিন* (১৯৯১), *পালা বদলের পালা* (১৯৯১), *মাজার সমাচার* (১৯৯৬), *পালাকারের নকশা* (১৯৯৭), *সোঁদামাটির গন্ধে* (২০০০) এসবেও তিনি যথোচিত নাট্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গোলাম সারোয়ার বাংলাদেশের নাটকে অনুবাদের ভেতর দিয়ে যুক্ত করেছেন নতুন মাত্রা। তাঁর অন্য রূপান্তরিত নাটক : *বিলকিস বানুর কন্যারা* (২০০৩ প্র. অ.)। **জিয়া আনসারীর** *চোর চোর* (১৯৭৯, ১৯৭৬ প্র. অ.)মঞ্চে আসে আবদুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশনায়। সামাজিক চেতনাপুষ্ট নাটক এটি। নির্দেশনার গুণ এ নাটকটি পেলেও নাট্যকারের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের অনতিপরের মঞ্চে এ নাটকটি জনপ্রিয়ও বটে। *নির্ভরযোগ্য গুজবে প্রকাশ* (১৯৭৭), *ঠিকানা পেয়েছি* (১৯৭৭) এ দুটি নাটকে **জহুরুল ইসলাম** মধ্যবিত্ত সত্যকেই গ্রহণ করেছেন। নাট্যপ্রয়াস তেমন আগ্রহী নয়, কৌশলেও দৃঢ়প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয় না। তেমন প্রভাবিত ভাষা এখানে পাওয়া যায় না। **জগলুল আলম** *ছয় বেহারার পালকি* (২০০০) লোককাঠামো পরিচর্যায় নাটক। নাট্যসূত্র আছে। জগলুল আলম বাঙালি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অস্বীকার করেননি। বিষয়ে নতুনত্ব আছে, আঙ্গিক প্রকৌশলও মাত্রিকতা উত্তীর্ণ। এক্ষেত্রে নাট্যকারের আধুনিক চেতনার স্বাক্ষর আছে। **জুনায়েদ ইউসুফের** *বাড়িতে একা* (১৯৯৮), *বন্ধু খুঁজছে তনতু* (২০০১) প্রথানুগ পরিবৃত্তের নাটক। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্ধিসূত্র নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। **জামিউর রহমান লেমন** (জ. ১৯৬১) প্রতিশ্রুতশীল ও দায়বদ্ধ নাট্যকার। *জন হেনরি* (১৯৮৫), *একজন আমেনা* (২০০২) প্রতিনিধিত্বশীল নাটক। এছাড়া পথনাটক : *একবার ফিরে যাও* (১৯৮৫), *ঐ ওরা আইতাছে* (১৯৮৫),

একজন মিসির আলী (১৯৮৬), *জীবন নোঙর* (১৯৮৬), *কুকুর ও বংশদণ্ড* (১৯৮৭), *সোনালী স্বপ্ন* (২০০৩) কিছুটা প্রতীকী এবং প্রান্ত-অনুবর্তী বিষয়কে নিয়ে লিখিত। জামিউর রহমানের নাটকে আধুনিক নাট্যআঙ্গিকের ইঙ্গিত আছে। **জাহাঙ্গীর আলম সুজন** স্বরলিপি থিয়েটার নরসিংদীর দলীয় নাট্যকার তিনি। *সূচনা* (১৯৯৩), *ছন্দপতন* (১৯৯৬), *নীলা* (১৯৯৭), *কফি হাউজ* (১৯৯৯), *বিপরীত স্রোত* (২০০০), *তারপর* (২০০০), *দুর্গম পথ* (২০০১), *হৃদয়পুরের বৃত্তান্ত* (২০০২), *তিথির তৃতীয়া* (২০০২), *বিবিসাব* (২০০৪) জাহাঙ্গীর আলম সুজনের মৌলিক নাটক। তাঁর পথনাটক : *অন্ধকারে মানুষ* (১৯৯০), *প্রয়োজন বনাম লোভ* (২০০২), *কোন এক নঈমুদ্দী* (২০০২), *অতএব হোসেন আলী* (২০০৫)। উল্লিখিত এসব নাটকে বিচিত্র বিষয় অনুসৃত হয়েছে। তবে এ পর্যায়ের নাট্যাঙ্গিক গতানুগতিক। **জাহাঙ্গীর আলম** রংপুরের নাট্যদল 'সারথি'র কর্মী ও সংগঠক। তাঁর পথনাটক : *শেষ ঠিকানা* (১৯৯৪), *ননস্টপ* (১৯৯৫), *কালের লড়াই* (১৯৯৫), *জুতা আবিষ্কার* (১৯৯৫)। **জি এম. মেহেদি হাসান** যশোর নোয়াপাড়া নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটক বর্তমান দিনকাল [*এ ডলস হাউস* অবলম্বনে] (১৯৯৫), *অনুশোচনা* (১৯৯৬), *শ্রমিকের অধিকার* (১৯৯৮)। তাঁর পথনাটক : *সঞ্চয়* (১৯৯৬), *আন্দোলন* (১৯৯৭)। ভূমি-মানুষ অনুষঙ্গি নাট্যকার। নাট্যকারের দায়বদ্ধতাই নাটকে শিল্পবীক্ষা অর্জন করে। **ঝিমিত ঝিমিত চাকমা** রাঙ্গামাটি জুম এসথেটিকস কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটক *অহ্‌দত* (১৯৯৫), *আন্দলত পহর* (১৯৯৬), *কাত্তোন* (২০০০), *বড়গাঙ* (২০০৫)। আদিবাসী নৃ-চেতনা, আন্দোলন সংগ্রামের রূপটি এসব নাটকে বিধৃত। সংখ্যলঘুর আত্মপরিচয়, দ্বান্দ্বিক প্রত্যয়, নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বিন্যাস নিয়েই এ নাটক। অবিকৃত ভাষায় এ নাটক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নাটকে এটি ভিন্ন সংযোজন। আদিবাসী সংস্কৃতির রূপবৈচিত্র্য, অস্তিত্ব এসব নাটকের ভেতর দিয়ে পরিকীর্ণ। আরউইন শ রচিত *বেরী দ্য ডেড* অবলম্বনে *কবর দিয়ে যাও* (১৯৮৬) **জামালউদ্দিন হোসেনে** (জ. ১৯৪৩)র নাটক। নাটকের পাঠ-অভিজ্ঞতায় নাট্যকার ঋদ্ধ। অরউইন শ-কে নিজস্ব বুদ্ধিতে কায়েম করেছেন তিনি নাটকে। *কবর দিয়ে যাও* সুখপাঠ্য অনুবাদ। **জামিল আহমেদ** (জ. ১৯৫৫) মঞ্চনাটকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর নির্দেশিত *বিষাদ-সিন্ধু* (১৯৯১) উচ্চমানের নাট্যপ্রযোজনা। এছাড়া অন্য নাটক *চাকা*, *এক হাজার আউর একটি রাতে*। **জাহিদ রিপনে** (জ. ১৯৬৯)র *পদ্মগোখরো* (২০০৭, ২০০৬ প্র. অ.) কাজী নজরুল ইসলামের গল্প অবলম্বনে রচিত। নজরুলের গল্পকে অনেকেই নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং সাফল্যও এসেছে। জাহিদ রিপন স্বতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন এ নাটকে। এবং পরিবেশ-প্রতিশ্রুতির আবহে তিনি নাট্যশর্তও বজায় রেখেছেন। এছাড়া *কাজল রেখা* (১৯৯৭), *এখনই* (১৯৮৯ প্র. অ.) তাঁর নাটক। **তারিক আনাম**

খান মলিয়ের *দ্য মাইজার* অবলম্বনে রচনা করেন *কঞ্জুস* (১৯৮৩)। দেশীয় আবহের ভেতর দিয়ে নাট্যকার একে করে তুলেছেন নিজের। তারেক আনাম খান এ নাটকে শিল্পিত মেধার পরিচয় দিয়েছেন। *বিচ্ছু, জেরা* নাট্যকারের রূপান্তরিত নাটক। ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক বিষয়টিকে প্রজ্ঞা ও অর্থে দীপিত করে তোলেন নাট্যকার। নাটকটি অনেকবার মঞ্চে এসেছে। জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। মলিয়েরের জীবনবোধকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত প্রদানে তারিক আনাম যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। *লাশঘর* (২০০৭), *কৃষ্ণকাঠি* (২০০৮), *মঙ্গলমুখ* **তানভীর আহমদ সিডনী** (জ. ১৯৭৬)র নাটক। নাট্য–অভিজ্ঞতাও কায়েম হয়েছে এখানে। এছাড়া তাঁর নাটক *কর্ণকথা* (২০০৫), *নেপথ্যকথা* (২০০৫), *মৃত্যুপাখি* (২০০৭)। সক্রিয় এ নাট্যকার জীবনের অশুভ ও অনাস্থার বিরুদ্ধে নিয়ে আসেন শুভপ্রত্যয়, যেটি শুধু উদ্দেশ্য-আবর্তে নয় শিল্প-সামর্থ্যের পর্যাবৃত্তেই। এজন্য তাঁর সংলাপ ঋজু, ভাষাভঙ্গি উন্নত। **তাহমিনা আহমেদ** আর্থার মিলারের নাটক *দ্য ক্রুসিবল*-এর অনুবাদ *ক্রুসিবল* (১৯৯৮ প্র. অ.)। বিশ্বসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার আর্থার মিলার। *ক্রুসিবলের* ভেতর দিয়ে খ্যাতিমান এ নাট্যকারের জীবনবোধ ও প্রকরণগুণটি আমাদের অর্জন করা সম্ভব হয়। নাট্যাঙ্গিক তথা মঞ্চ নিয়ে তাঁর যে কর্মকাণ্ড সেটির বিশ্বজুড়েই প্রসিদ্ধি আছে, তাহমিনা আহমেদের এ প্রয়াসে আমরা সে অনুভবগুলো উপলব্ধিতে আনতে পারি। **মহীউদ্দীন** (১৯০৬-১৯৭৫) প্রধানত কবি। তিনি জার্মান কবি গ্যেয়টে (১৭৪৯-১৮৩২)-এর *ফাউস্ট* (১৮৩২)-এর চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছেন ১৯৭৩ সালে। পরিশ্রমী মার্কসবাদী এ কবি গ্যেয়টের মর্মবীণায় নিজেকে বাজিয়েছেন। এটি বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্যেয়টের আধ্যাত্মিক ফর্মটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। ভাববাদের ভেতরে বাস্তববাদের প্রকোষ্ঠকে নিপুণ করে চেনা যায় এরূপ অনুবাদে। **নাজমুল আহসানে**র *শিরায় শিরায় ঘণ্টা বাজে* (১৯৭৯), *বিবর্তনের শেষ সনদ* (১৯৮০), *বর্ণমালার মিছিল* (১৯৮০), *প্রেম নেই প্রেম চাই* (১৯৮৩), *গাজী কালু চম্পাবতী* (১৯৮৪), *মীরজাফরের কৈফিয়ত* (১৯৮৪), *সুখী রমণী গুনাই বিবির কেচ্ছা* (১৯৮৬), *মহুয়ার পালা* (১৯৯২), *দুই বিঘা জমি* (১৯৯৬), *পালা বদলের পালা* (১৯৯৬), *সৎ মা* (১৯৯৭), *কমলা সুন্দরী* (২০০০)–এসব নাটকে লোকায়ত জীবনকে বিচিত্র অভীপ্সায় অনুবাদ হতে দেখি। উঠে আসে ব্রাত্য জীবনের স্বরূপ ও সংবাদ। এসব নাটকের মঞ্চায়ন জটিল এবং বৃহত্তর পরিবৃত্তের। শেকড়সন্ধানী এ কাব্যপ্রয়াস উপভোগ্য। নাজমুল অত্যন্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে এটি নাটকে কায়েম করেছেন। **নাসিরউদ্দিন ইউসুফে** (জ. ১৯৫০)র *একাত্তরের পালা* (১৯৯৩) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হলেও সাতাশি সাল ধরে রাজাকারদের মুক্তিযুদ্ধ নিধনের কলাকৌশল এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার স্বরূপটি চিহ্নিত হয়েছে। নাটকে পরাজিত

রাজাকার স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মী হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিধনযজ্ঞে ব্যাপৃত হয়। এক অর্থে পরিকল্পিতভাবে রাজাকার মঈনুদ্দিন যাবতীয় বিনষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ *একাত্তরের পালাকে* বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সংলাপে তিনি তীক্ষ্ণধী। **নাজমুল আলম** গল্পকার হলেও নাটক লিখেছেন। *উপরে উঠার সিঁড়ি, সারেং, মরা মানুষের পাঠশালা* ও *ফুল্লরা অপেরা* (১৯৯৩) তাঁর নাটক। *ফুল্লরা অপেরা* যাত্রাশিল্পীদের জীবনযাপনের চিত্রনাট্য। তাঁর নাটকে সাহিত্যগুণ যথোচিত। **নাজিম মাহমুদ** (১৯৩২-১৯৯৮)র নাটক *উজীর ঘোড়ার গপ্পো* (১৯৯৪)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে অনেকবার। জীবনবোধে পূর্ণ এ নাটক। সমাজমনের বিচিত্র বীক্ষণ অর্জিত এ নাটকে। সমকালীন রাষ্ট্রাচার, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, পশ্চাৎপদতা *উজীর ঘোড়ার গপ্পের* কাহিনি হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনা ও প্রগতি চেতনাই এ নাটকের ভিত্তি। ভাষা ও সংলাপের সাফল্য সুনিশ্চিত, শিল্পমানেও এটি উন্নত। *কালো অশোক লাল ফুল* (১৯৭৪) **নিরঞ্জন অধিকারী** (জ. ১৯৪৭)র নাটক। নাটকের বিষয়ে জীবনের বিশ্বস্ততার সত্যটি নিরূপিত। প্রকৃতির সত্যে ইমেজ তৈরি হলেও বাস্তবানুগ এ নাট্যকার সর্বসাকুল্যে জীবনকেই প্রদীপ্ত করে তুলেছেন। নাট্যকারের অন্য নাটক *শ্যামলী কেবলই নীল হয়, রাজাকারের কিসসা*। *গুড বাই ঢাকা* (২০০৩) **নজরুল ইসলাম খানে**র নাটক। তাঁর পথনাটক : *খেয়ালী রাজা* (২০০২)। নাটক রচনায় তেমন পথ রচিত হয়নি তাঁর। প্রথানুগ নাটকে তাঁর কৃতিত্ব তেমন নেই। তবে জ্যাঁ আনুই অবলম্বনে নাটক *চাঁদের বলয়* (১৯৮১)-এ তিনি শিল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। **নাসের সরকার মনি** তরুণ নাট্যগোষ্ঠী মৌলভীবাজারের কর্মী। *টাইসনরা* নাসের সরকার মনির নাটক। নাট্যকর্মীর কমিটমেন্টে দায়বোধটাই তাঁর মুখ্য। পথনাটক : *রফিক ব্রীজ* (১৯৯৪), *ক্যাম্পাস থেকে কারাগারে* (২০০০), *আলোর পানে* (২০০২), *আর্সেনিক বিষক্রিয়া* (২০০২), *মুখপোড়া বর্ণচোরা* (১৯৯৯), *স্বপ্ন* (২০০১) প্রভৃতি লিখে সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। **নুরুল ইসলাম** রংপুর নাট্যচক্রের সঙ্গে যুক্ত। *ইদানিং ক্লিওপেট্রা* , *রাঙা বৌদি, বংশ বিড়ম্বনা, বিদ্রোহী মুসা শাহ* নুরুল ইসলামের নাটক। সমাজভিত্তিতে রচিত তাঁর নাটক। তবে তাঁর নাট্য-পট দুর্বল। **নির্মল ঘোষ ঝুনু** অঙ্কুর নাট্য একাডেমী ঝিনাইদহের কর্মী। *রক্তশপথ* (১৯৯৭), *কাফন* (১৯৯৭) তাঁর নাটক। পথনাটক : *প্যাঁচা* (১৯৯৭), *যৌতুক* (১৯৯৯)। মফস্বলের নাট্যকর্মী হলেও চেতনায় ঝুনু অনেক সবুজ। পথনাটকের বাইরে শিল্পমুখি উজ্জ্বল নাটক তেমন কিছু আসে না তাঁর হাত দিয়ে। **নারায়ণ চন্দ্র নন্দী** অঙ্কুর নাট্য একাডেমি ঝিনাইদহের সঙ্গে যুক্ত। *আমরাও মানুষ* (২০০০), *মিনার স্বপ্ন* (২০০১) এ নাটকগুলোর পাশাপাশি তাঁর পথনাটক : *আহ্বান* (১৯৯৯), *ছেলে কার* (২০০০), *আগামী* (২০০০), *সুখির স্বপ্ন* (২০০২), *কলিম চাচার সংসার* (২০০২), *সোনালী দিগন্ত*

(২০০২) প্রভৃতি। তিনি পথনাটকেই বেশি সক্রিয়। এতে নাট্য দায় আছে যেখানে আশাবাদ কিংবা সজাগ স্বপ্ন আছে কিন্তু বোধ ততোটা নেই। বৈচিত্র্যময়, সার্থকতামণ্ডিত তেমন কিছু আসে না। **নিশান সাবের** অরণি থিয়েটার মেহেরপুর। *বিমূর্ত বিবর্তন* (২০০০), *এবং* (১৯৯৯), *বাহান্নো* (১৯৯৮) নিশান সাবেরের নাটক। তাঁর পথনাটক : *বোবা জননী* (২০০১), *বিস্মৃতি* (২০০১), *ধবংশ চাই না* (২০০০), *তামাশা* (২০০২), *ইদারা* (২০০১) প্রভৃতি। একটু ভিন্ন আবেগের নাটক এগুলো। সমাজ-রাজনীতির বাইরে কিছু নেই কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল জীবনের সত্যতা আছে। ঢাকার বাইরে থিয়েটারের এ প্রয়াসটি অনেক বড় কাজ। **নূরুল করিম নাসিম** বড় লেখক। প্রবন্ধ লিখেছেন, বিচিত্র বিষয়ে তাঁর লেখালেখি। নাটকেও তিনি মননধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক *সোনার হরিণ*, *বিজন বাড়ি নাই* (১৯৭৪), *মানুষের জন্য* (১৯৭৬), *সম্রাট সাবধান*, *মহারাজ আসবেন* প্রভৃতি। জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি সমন্বয় করেছেন সম্ভাব্যতার সঙ্গে। তাঁর নাটকে শিল্পমান হতাশার নয়। কারণ, *বিজন বাড়ি নাই* কিংবা *সোনার হরিণ* অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাদীপ্ত। রচনা অন্তঃসারশূন্য নয়। *মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে* (১৯৯১), *মুক্তি* (১৯৯২), *নীলিমায় নীল* (১৯৯২), *হৃদয়ে বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *মানুষ* (১৯৯৪), *অন্য কোনখানে* (১৯৯৪), *তুমি কি কেবলি ছবি* (১৯৯৪), *রাসেলের যুদ্ধযাত্রা* (১৯৯৪), *দাঁড়িয়ে আছি গানের ওপারে* (১৯৯৪), *আমি* (১৯৯৪), *না পান্না না চুনি* (১৯৯৫), *অন্য রকম ভালবাসা* (১৯৯৫), *সুখ* (১৯৯৫) প্রভৃতি **পান্না কায়সার** (জ. ১৯৪৭)র নাটক। মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যবিত্ত তাঁর বিষয়। তবে এসব নাটকে কোনো ভাষাই তৈরি হয়নি। **পরেশ আচার্য** *প্রতিজ্ঞা*, *কার পাপে*, *কান পেতে শোন*, *আকাশ অনেক উঁচু*, *অনেক আলো কিছু অন্ধকার*, *খোকন গানের মাস্টার*, *কনক কেন কাঁদে*, *দুর্গতিনাশিনী দুর্গা*, *বিকেলে ভোরের ফুল*, *প্রতিদিনের একটি দিনে*, *এরপর তারপর*, *মেঘে ঢাকা আকাশ*, *যদি জানতেন* প্রভৃতি পরেশ আচার্যের নাটক। অভিজ্ঞ নাট্যকারের নাটকে জীবনাজ্ঞিতার কথাই আছে। কিন্তু লেখনীতে কোনো শিল্পবুদ্ধির পরিবেশ নেই। প্রায় একই আবর্তের কাহিনি বলেছেন তিনি। **প্রদীপ দেওয়ানজী** চট্টগ্রাম প্রতিনিধি নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যকর্মী । *আসবে সুঠাম সময়*, *অবাক রাজার অবাক কাণ্ড*, রাকস প্রভৃতি তাঁর নাটক। নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁর সাফল্য দূরায়ত নয়। **ফরহাদ মযহার** (জ. ১৯৪৭)র নাটক *প্রজাপতির লীলালাস্য* (১৯৭৫), *ঘাতক দেশকাল* (১৯৭৮)। কবিচেতনা গৃহীত হলেও নাটকে তিনি অনেকাংশে সফল। *প্রজাপতির লীলালাস্য* মেধাবী রচনা। দায়বোধের অঙ্গীকারের চেয়ে জীবনের সূক্ষ্মতর বোধ ও বিবেচনাই বেশি কার্যকর তাঁর রচনায়। মানবজীবন রহস্য এবং তার সম্ভাবিত সমূল প্রকাশ তাঁর নাটক। মৌলবাদ ও ধর্মীয় পীড়নকে বিষয় করে **ফাল্গুনী হামিদ** (জ. ১৯৬০)র নাটক *হায়েনা* (১৯৯২ প্র.

অ.), *দোররা* (২০০০ প্র. অ.)। ফাল্গুনী হামিদের সমাজ ট্রিটমেন্ট অবলম্বিত করে লেখা এ নাটক কুসংস্কার ও অন্ধ-আচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিপুল প্রতিবাদ। নাট্যভাষা তৈরি হয় তেমন দৃষ্টিকোণ থেকেই। **ফুজায়েল আহমদ** মৌলভীবাজারের নাট্যকর্মী। তাঁর নাটক *শকুন* (১৯৯২), *গ্রামের নাম রসুলপুর* (১৯৯৩)। পথনাটক : *একটি লাশ ও কিছু কথা* (২০০১), *আরমান আলীর বাংলাদেশ* (২০০৩)। শোষণের বিচিত্রজাল এবং তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া বিধৃত এসব নাটকে। নাট্যভাষা আরোপিত নয়। জীবনের সত্যাসন্ধ রূপ প্রগতিবাদী চেতনায় বিধৃত হয়েছে। *পাণ্ডুলিপির আড়ত* (১৯৭৩) **বুলবন ওসমান** (জ. ১৯৪০)র নাটক। বুলবন ওসমান গল্প লিখলেও নাটকে সে গল্পসত্যটি কায়েম রেখেছেন। নাটকের দ্বন্দ্বাত্মক চেতনা আকর্ষণীয়। *পাণ্ডুলিপির আড়ত*-এর ভাষাভঙ্গি শুদ্ধতা, নাট্য-উৎকর্ষ বিরাজমান। **বশীর আল হেলাল** (জ. ১৯৩৬)র নাটক *স্বর্গের সিঁড়ি* (১৯৭৭)। মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও তিনি এ নাটকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। চরিত্রানুগ সৃষ্টি কিন্তু ভাষা আড়ষ্ট মনে হয়। **বিপ্লব বালা** (জ. ১৯৫৫) নাট্যরূপ দিয়েছেন *বিষাদ সিন্ধু*র ১ম পর্ব (১৯৯১ প্র. অ.) ও ২য় পর্ব (১৯৯২ প্র. অ.)। শেক্সপীয়রের *হ্যামলেট*-এর নাট্যরূপ *হ্যামলেট ওহ্ হ্যামলেট* (১৯৯৫), *গুনাই বিবি* (২০০০), *কে জাগিবে আজ* (১৯৯৪), *হায় বাংলা হায় বেহুলা* (১৯৯৫) তাঁর নাটক। বিপ্লব বালা গুণী নাট্যকার। তাঁর বিরাট কাজ *বিষাদ-সিন্ধু*র নাট্যায়ন। বাংলাদেশের নাটকে এ প্রয়াস অভিনব। এতে বর্ণনার ভিত্তিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যথোচিত আবহ-নির্মিত হয়েছে নাটকে। মীর মশাররফ হোসেনকে বজায় রেখে নাট্যকার নিজস্ব সৃজনশীলতায় চরিত্রকে এনেছেন। নাটকটি মঞ্চসফলও হয়েছে। *হনন* (১৯৯৬), *পোড়ামাটি* (২০০১), *ভোজ* (২০০১) নাটকে **বাবুল বিশ্বাস** (জ. ১৯৫৯) সংযত, যত্নশীল। নিজস্ব নাট্যভাষা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তিনি। শিল্পসাফল্য অর্জিত হয়েছে জীবনবোধের সূক্ষ্মতর পরিচর্যায়। কমিটেড এ নাট্যকার নাটকের এক্সপোজিশান থেকে পরিণতি পর্যন্ত একটি প্রবাহ বজায় রাখেন নাটকে। **বৃন্দাবন দাসের** পথনাটক : *কাঁদতে মানা* (১৯৯৭), *অরণ্য সংবাদ* (১৯৯৭), *দড়ির খেলা* (১৯৯৮)। সমকালীন বিষয়ানুগ এ নাটকগুলোতে এক ধরনের সৃজনী প্রয়াস ও শুদ্ধতা অর্জন করেছেন নাট্যকার। *সূর্যোদয়ে গন্ধ* (১৯৭৯), *তুমি সে সখা* (১৯৮৪), *অন্যপথ* (১৯৮৪), শেক্সপীয়রের রূপান্তর *শ্রীমতি ভয়ংকরী* (১৯৮৮), *জাতের পদাবলী* (১৯৯৬), *চার কনে এক বর* (১৯৯৭), *বিদায় প্রার্থনা* (১৯৯৮), এছাড়া ওমর আলীর গল্প অবলম্বনে *তথৈবচ* (২০০০) **বিশ্বনাথ বিশ্বাসে**র নাটক। পরিশ্রমী নাট্যকার। জীবনের সূক্ষ্মতর পর্বে ফেলেছেন প্রতীকী আলো। তাঁর নাট্যভাষা নিজস্ব। গ্রন্থিমোচন দুর্বল নয়। মেসেজটি শিল্পসম্মত। **বিশ্বজিৎ চৌধুরী বাবু**র রচিত *ফতোয়া* (১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধের কথকতা* (২০০১)। পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে

তিনি প্রতিরোধী। তাঁর পথনাটক : *মহারাজার খতিয়ান* (১৯৮৮), *সংগ্রাম* (১৯৮৮), *এবং জারজ সন্তান* (১৯৮৮), *রঙ্গিলা রাজা* (১৯৮৮), *গাঁজা* (১৯৯৫), *ভালোবাসা অতঃপর* (১৯৯৫), *ভুল* (১৯৯৬), *মশা* (২০০৩)। *রাজসিংহাসন* (১৩৮২), *গরীবের আর্তনাদ* (১৩৮৫), *যৌতুক হলো অভিশাপ* (১৩৮৮), *মানুষ অমানুষ* (১৩৮৯), *ঘুমন্ত সমাজ* (১৩৯৩), *শাহী ফরমান* (১৯৯৬), *মধুমালতী রূপকুমার* (১৯৯৭) লৌকিক ও প্রান্ত-অনুবর্তী নাট্যকার হিসেবে খ্যাতিমান **মোঃ মতিউর রহমান**। এসব নাটকে লেখক হিসেবে তিনি প্রথানুগ। তাঁর পুনর্নির্মাণ বিশ্বাসটি প্রায় সব নাটকেই থাকে কার্যকর। *কিংশুক যে মরুতে* (১৯৭৪) **মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ**র নাটক। প্রবণতায় পূর্বসূরির আনুগত্য ও প্রেরণা আছে। **মাসুম রেজার** নাটক *আরজচরিতামৃত*, *কাকলাস* (১৯৮৬), *জীবন্ত পোস্টার*, *খোয়াব*, *শারমেয়*, *লেবাস*, *বিরসা কাব্য*, *শামুকবাস*। পুরাণ প্রসঙ্গকে পুনর্নির্মিত করে রচিত হয়েছে *নিত্যপুরাণ* (২০০১ প্র. অ.)। মাসুম রেজার *আরজচরিতামৃত* অভিনব নাট্যপ্রয়াস। ভঙ্গিটি মধ্যযুগীয় হলেও প্রবল প্রাচুর্যে তিনি এতে আধুনিক। কুসংস্কার ও অন্ধ-আচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত। নাটকের দায়কে পর্যবসিত করেন, জীবনের অনিবার্যতায়। *শামুকবাস*ও জননন্দিত নাটক। মাসুম রেজার নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, পৌরাণিক অবয়বকে ভেঙ্গেচুরে একালের এবং আধুনিক আবর্তে পাঠকের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলায়। **মলয় ভৌমিকে**র ভূঁই (১৯৯০), *গরু* (১৯৯১), *শতগ্রন্থি* (১৯৯২), *হঠবন্ধ* (১৯৯৯), *শবব্যবচ্ছেদ* (২০০০), *চৌরাস্তা* (২০০১), *দায়-দায়িত্ব* (২০০৩), *বহে প্রান্তজন* (২০০৩ প্র. অ.), দণ্ড (২০১৪) শোষণ নিপীড়ন ও নির্যাতনের চালচিত্র। কখনো রাজশাহী বা চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষ্যে পরিবেশিত এসব নাটক সংগ্রামশীল প্রান্তিক মানুষেরই প্রতীকী চিত্র। **মান্নান হীরা** (জ. ১৯৫৭) পথনাটক লিখেছেন। বেরিয়েছে *পথনাটক সমগ্র ১* (২০০৭)। তাঁর নাটক *পন্তা আকালী*, *মংগা কাহিনী*, *ওয়ারিশ*, *মণিমুক্তা*, *ঘুমের মানুষ*, *ফেরারী নিশান* (১৯৮৪), *ক্ষুদিরামের দেশে* (১৯৮৩), *ইদাঁরা*, *বৌ*, *জননী বীরাঙ্গনা*, *বাংলার বাদশা*, *মেহের জান*, *একাত্তরের রাজকন্যা*, *সুখ দৈত্য*, *মৃগনাভী*, *শেকল* (১৯৯১), *আদাব* (১৯৯১), *পাথর* (১৯৯২), ফুটপাত, রেফারী প্রভৃতি। মান্নান হীরার রূপান্তর শেক্সপীয়ারের *কোরিওলেনাস*। উপেক্ষিত অথচ অনবদ্য এ সৃষ্টি সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন। পুটার্কের মহান গ্রীক ও রোমানদের জীবনী থেকে এর কাহিনি নিয়েছেন শেক্সপীয়র। সবকিছু মিলে মান্নান হীরা দাঁড়িয়েছেন নিজস্ব জায়গায়। একই সঙ্গে ছড়িয়েছেন সর্বত্র। বাংলাদেশের নাটকে অনেক নতুন বিষয়কে তিনি নিয়ে এসেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে। মান্নান হীরার মঞ্চনাটক : *খেলা খেলা* (১৯৯৮), *আগুনমুখা* (১৯৯৪), *একাত্তরের ক্ষুদিরাম* (১৯৯৬), *ভাগের মানুষ*, *ময়ূর সিংহাসন* (২০০১), *একজন লক্ষিন্দর* (১৯৯৭)।

প্রত্যেকটি নাটকেই তিনি বিষয় নির্বাচনে এবং উপস্থাপনে হয়েছেন অভিনব। *একাত্তরের ক্ষুদিরাম* কিংবা *একজন লক্ষিন্দর, ভাগের মানুষ* কোনোটাই অগুরুত্বহ নয় নাটকে। সমাজ-রাজনীতি-আধিপত্য কীভাবে জীবন ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে তার মর্মন্তুদ চিত্র আছে এসব নাটকে। মান্নান হীরা একই সঙ্গে দেশ-জাতি ঐতিহ্য সম্পর্কেও সচেতন। সে রূপেই তাঁর নির্মাণ-কাঠামো পরিব্যাপ্ত। **মৃত্তিকা চাকমা** জুম ইসথেটিকস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটির সংগঠক। তাঁর নাটক *দেবংসি আহ্ধর কালা ছাবা* (১৯৮৯), *গোঝেন* (১৯৯০), *মহেন্দ্রের বনভাঝ* (১৯৯১), *এক জুর মানেক* (১৯৯২), *জোঘ্য* (১৯৯৪), *হক্কানীর ধনপানা* (১৯৯৯), *এগাত্তুরের তরনী* (২০০১), *ভূদ* (২০০২), *চিত্রনদীর পারে* (২০০৫)। আদিবাসী সংস্কৃতি ও সংগ্রামের প্রতীকী চিত্রার্পণ তাঁর নাটক। আমাদের প্রকৃতিবৈচিত্রের স্বকরূপ শুধু নয়, একই সঙ্গে মানবাধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নটিও এসব নাটকের ভেতর দিয়ে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। এসব নাটকের আদিবাসীদের ভাষার রূপটিও আমাদের সংস্কৃতি বিবেচনার অনবদ্য স্মারক। **মিলন চৌধুরী** চট্টগ্রামের নাট্যকার। প্রখর জীবনবাদী ও পরিহাসপ্রিয় এ নাট্যকারের নাটক : *যায় দিন ফাগুনো দিন* (১৯৭৮), *চর্যাপদের হরিণী* (১৯৭৭), *একজন পিরামিড* (১৯৮৩), *আভ্যন্তরীণ খেলাধুলা* (১৯৮৬), *নিবারণের স্বপ্ন স্বদেশ* (২০০১) প্রভৃতি। মিলন চৌধুরীর সূক্ষ্মতর সমাজ বিবেচনা আছে কিন্তু তা কিছুতেই নাটকে উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে প্রকাশিত হয় না। তাঁর নাট্যভাষাও প্রশংসিত। **মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনে**র *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের উদ্ধার পর্বের দ্বিতীয় প্রবাহের বিস্তার অবলম্বনে নাটক *কারবালার পর* (২০০৭)। এছাড়া তাঁর নাটক *বিষাদরূপ সিন্ধু* (২০০৭)। *৭১'এর গল্পগাথা* (১৯৯৭), *আর কতোদিন* (১৯৯৮), *ঘুণপোকা* (১৯৯৯), *মান্যবর ভুল করেছেন* (২০০১), *উল্টোরথের যাত্রী* (২০০৩) লিখেছেন। মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন পরিশ্রমী নাট্যকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনার প্রতি কমিটেড তিনি। তাঁর *বিষাদ-সিন্ধু*র পরিবর্তিত নাট্যায়ন বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। **মনোজ সেনগুপ্ত**র *থেটারবাবু* (১৯৭৯), *তিন সংগী* (১৯৭৯), *সূর্য ওঠার আগে* (১৯৮২), *বিক্রম ও আদালত* (১৯৮৮), *মহড়া চলছে* (১৯৯০) প্রভৃতি নাটক। দীর্ঘ সময়ে নাট্য-পরিচর্যায় জীবনের বিচিত্রমুখি সমাচারকে তিনি নাটকে তুলে এনেছেন। অঙ্কুর নাট্যএকাডেমি ঝিনাইদহের নাট্যকর্মী। *ঝিনেদা থেকে বলছি* (২০০৪), *পাওয়া হয় নাই পথ ভুলিয়া* (২০০৫) **মোকাররম হোসেন টুলা**র নাটক। এছাড়া তাঁর পথনাটক : *পিয়ার ঘাটের বাঁশী* (১৯৯৭), *বয়াতীর বিলাপ* (১৯৯৮), *মিলন হবে কতোদিনে* (২০০১) প্রভৃতি। **মিতুল সাইফ** মিতালী সাস্কৃতিক সংঘ ঝিনাইদহের কর্মী। *রক্তাক্ত একাত্তর* (১৯৯০), *এই প্রবাহ* (১৯৯০), *দেয়াল মেয়ে মানুষ* (১৯৯২), *সুইট ভাষা বাংলা* (১৯৯৩), *অন্ধকারের দেশে* (১৯৯৪), *উল্টো জীবন* (২০০০), *মরা গাঙে জোয়ার*

(২০০০), *পাচু বিবির গল্প* (২০০০) প্রভৃতি মিতুল সাইফের নাটক। তাঁর পথনাটক : *এখনও অন্ধকার* (১৯৯৬), *সবুজ গা এর ময়না* (১৯৯৪), *সোনার বংলা* (১৯৯৮)। *বিলাসী* (১৯৯৮), *হৈমন্তী* (১৯৯৮), *কমলান্তের উইল* (২০০২), *দুই বিঘা জমি* (২০০৩), *হৃদয়ে নতুন সূর্য* (২০০২) ইত্যাদি **মোঃ রওশন আলী**র নাটক। **মিন্টু বসু** (জ. ১৯৪৮) বরিশালের নাট্যকর্মী। মিন্টু বসুর নাটক *অন্য এক কালাপাহাড়* (১৯৮৫), *ঢোল* (১৯৮৫), *জনতা আর একবার* (১৯৮৭), *ঘাতক চারিদিকে* (১৯৮৮), *সরাইখানা* (১৯৮৯), *ইদানিং স্বদেশ* (১৯৮৯), *গৌরবগাঁথা* (১৯৯২), *ঐ মহামানব আসে* (১৯৯৪), *স্মরণ* (১৯৯৭), *সবার উপরে মানুষ সত্য* (২০০২), *গ্রাস* (২০০২)। এসব নাটকে একজন পূর্ণাঙ্গ বাঙালি চেতনার স্মারক বলে মনে হয় তাঁকে। মিন্টু বসুর পথনাটক : *বুকের মধ্যে জ্বলন্ত প্রতিবাদ* (১৯৮৮), *ভোটার বিদ্রোহ* (১৯৮৮), *বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি* (১৯৯১), *এ লজ্জা লুকাবো কোথায়* (১৯৯৫), *বিপ্লবের মৃত্যুনেই* (২০০০), *আলোর পথযাত্রী* (২০০০), *এসো প্রতিবাদের রণাঙ্গণে* (২০০৩) প্রভৃতি। কমিটেড এ নাট্যকর্মী দীর্ঘ নাট্যপরিচর্যায় সম্ভাবিত সময়কেই আমাদের সামনে তুলে আনেন। **মোহিত চট্টোপাধ্যায়**র নাটক *মৃত্যুসংবাদ* (১৯৭৫)। এ নাটকের ভাষাভঙ্গি ও প্রবণতা একই তলে কাঠামোবন্দি। এবং সেটা আছে বলেই *মৃত্যুসংবাদ* নাট্যবীক্ষা পেয়ে যায়। **মির্জা এ কাসেম** *কার ভুলে* (১৯৭৮), *পত্র নং ৩৫৭* (১৯৭৮) মির্জা এ কাসেমের নাটক। এগুলো স্কেচধর্মী এবং নাট্যগুণ বর্জিত। *ননপলিটিক্যাল* (১৯৭৯), *বাক্স এক* (১৯৭৯), *বাক্স দুই* (১৯৭৯) **মোনাজাতউদ্দিনে**র নাটক। প্রকৃতঅর্থে নাটক নয়, সমকালের সমাজভঙ্গিকে দৃষ্টিবন্দি করেছেন লেখক। চালচিত্র তথা দৃষ্টিগোচর অভিজ্ঞতারই কর্মপ্রয়াস এ নাটক। এখানে নাটকের গল্প নাটক রচনার প্রয়াসে নয় নিছক বক্তব্য প্রকাশের ভাষ্যে পরিগণিত। **মীর শামসুল ইসলাম** *জাহাজের ইঞ্জিন বিকল* (১৯৮৭), *আর কদিন ইস্টিশনে* (১৯৮৮), *আদালতে প্রেমের গল্প* (১৯৮৯) মীর শামসুল ইসলামের নাটক। নাটককে গ্রহণ করেছেন তিনি জীবনের সত্যকে প্রকাশের জন্য। এটি নাট্যরচনার যত্নে প্রমাণ মেলে। তবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নেই। গতানুগতিক বিষয়ই নাট্যবন্দি। আন্তরিকতা থাকলেও, তাঁর ভাষা দুর্বল। **মনির হুসেন** পদধ্বনি থিয়েটার ঢাকার নাট্যকর্মী। *মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন* (১৯৯১), *কালের কাল* (২০০২) প্রভৃতি মনির হুসেনের নাটক। *মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন* তাঁর পাঠকপ্রিয় নাটক। অন্যান্য নাটকে সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতির চিহ্নসমূহ বিষয়ী করেছেন তিনি। এ বিবেচনাটি তাঁর পথনাটকের মধ্যেও বিরাজমান। তাঁর পথনাটক : *মিসকিন* (১৯৯৩), *জঞ্জাল* (১৯৯৪), *বালি* (১৯৯৩), *জনৈক ক্যানভাসার* (১৯৯২) *চীজ* (১৯৯০)। **মোঃ মহসিনে**র নাটক *একখণ্ড জমি* (১৯৮৫), *গেদু মিয়ার বস্তি* (১৯৮৫)। তাৎক্ষণিক আবেগ ও সম্মতি থেকে রচিত এসব নাটকের

সাহিত্যগুণ অবসিত। **মহিউদ্দিন ছড়া** *হ্যালুসিনেশন* (১৯৯২), *অতএব সাবধান* (১৯৯৪), *ব্যাচেলর* (১৯৯৪), *শয়তান* (১৯৯৭), *পাপচক্রে* (১৯৯৭), *ধলা মিয়ার বিয়ে* (২০০০) লিখিত হয়েছে। নীতিশিক্ষার আবর্তে রচিত লেখকের এসব নাটক তেমন শিল্পমানস্পর্শী নয়। **মোঃ রফিকুল ইসলামে**র নাটক *ভিটে* (১৯৯৪), *সূর্যমুখো* (২০০২) প্রভৃতি। দায়বদ্ধ নাট্যকার। সমাজচেতনা তাঁর গভীরে প্রোথিত। সমাজমুক্তির অধিকারচেতনা তাঁর নাটকের অনুপ্রেরণা। রফিকুল ইসলামের পথনাটক : *বিজয়ের ২৫ বছর* (১৯৯৪), *মা-ই সব* (২০০৩) প্রভৃতি। *রাজাকারের দেশে* (১৯৯০), *এখনও সময় আছে* (১৯৯২) **মোয়জ্জেম হোসেন চৌধুরী**র নাটক। সমাজ-রাজনীতি পরিশ্রুত এ নাটকের বিষয়গুণ স্বাকালবিদ্ধ কিন্তু নাটকীয়তার সারস্বত রূপ অনুল্লেখ্য। *অন্তর বাউল*, *বিষক্ষয়*, *পৃথিবীর জন্যে*, *ধূসরতীর্থ* **মাজহারুল হক পিন্টু**র রচনা। সৃজনী গুণ তাঁর রচনায় বিরাজমান। নাটক ছাড়াও তাঁর পথনাটক : *অন্তর বাজাও* (১৯৯৮), *ডেট লাইন* (২০০১), *ফিল্মি দুনিয়ার বিষ অর্জন* (১৯৯৫), *ঘনঘোর বরষার* (১৯৯৫), *ক্যানভাস* (১৯৯৭) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর গীতিনাট্য : *বাংলাদেশের ঢোল* (১৯৯৬), *কর্মফল* (১৯৯৬)। এবং একক নাট্য : *জাল* (১৯৯৮)। **মনজুরুল হাসান দুলালে**র নাট্যরূপ *চাঁদের অমাবস্যা* (২০০৭) ও *কাঁদো নদী কাঁদো* (২০০৭); সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটো উপন্যাসের নাট্যরূপ। মনজুরুল দুলালের এ প্রয়াসটি একদিকে যেমন সাহসী অন্যদিকে তেমনি আধুনিক। দুঃসহ এ কাজটি বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিষয় ও পরিবেশ বর্ণনায় নাট্যরূপের যে চিত্রিত অবয়ব সেটি প্রশংসনীয়। তবে ডিটেলের সংকট নেই তা বলা যাবে না। চেতনার প্রবাহরীতির পরিবেশও তেমন কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠেনি। অনেক দৃশ্যপট সংক্ষিপ্তও বটে। তবুও এ প্রয়াস উজ্জ্বলতর, সন্দেহ নেই। **মোহাম্মদ বারী** *সময়ের প্রয়োজনে*র নাট্যরূপ দিয়েছেন। মূল গল্প জহির রায়হান। মোহাম্মদ বারী কাহিনি ও ঘটনাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় করে তুলেছেন চরিত্রানুগ। এজন্য তাঁর শিল্পিত মেধা প্রশংসনীয়। তবে কিছু জায়গায় গল্প-কাঠামো একটু দুর্বল মনে হয়। পূর্ণাঙ্গ পরিবেশটিও ক্ষণিক প্রয়াসে ঝুলন্ত। তবে জহির রায়হানের গল্পের সম্পূর্ণতা তেমন লজ্জিত হয়নি। **মাহমুদুল ইসলাম সেলিম** (জ. ১৯৬৫) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক*-এর নাট্যরূপ ২০০৭ সালে। মাহমুদুল ইসলাম সেলিমের এটি অনবদ্য কর্মপ্রণালী। খুব দুর্বোধ্য এ কর্মপ্রয়াসে অনেকটা সফল বলা যায় নাট্যকার। সংলাপ এবং পরিবেশ নির্ণয়ে একটু অযত্ন আছে। সেক্ষেত্রে মানিকের মতো কঠোর বাস্তববাদী লেখকের অনুগামী হওয়াটাই অনুবাদকের পক্ষে শ্রেয়। সেটির সতর্কতা দরকার ছিল। তবুও এটি নিঃসন্দেহে সফল একটি প্রয়াস। **মানব সরকার** হ্যারল্ড পিন্টারের *নো ম্যানস ল্যান্ড*-এর অনুবাদ। এতে শূন্যতাবোধ ও হতাশার চিত্র এদেশীয় আদলে সাবলীল করে তুলে

ধরেছেন মানব সরকার। অভিব্যক্তিবাদী এ নাটকারের অনুবাদকর্ম দুরূহ। তবু মানব সরকার প্রেজেন্টেশনে দুস্তর পথ অতিক্রম করে গেছেন বলেই মনে হয়। **মনজুরুল হক মিলন** গণনাট্য পরিষদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাট্য সংগঠক। তাঁর নাটক : *জোয়াল* (১৯৯৪), *ঠগ* (১৯৯৭), *হুজুর কেবলা* (২০০০), *গ্রাস* (১৯৯৮), *মহুয়া সুন্দরী* (১৯৯৬), *ইয়াসীন চোরা* (২০০৫)। এছাড়া তাঁর পথনাটক : *সংবিদ* (১৯৯৩), *পুল ইন পুশ ব্যাক* (১৯৯৪), *ফতোয়াবাজ* (২০০১), *কি চমৎকার গণতলা* (১৯৯৫) প্রভৃতি। *জলশিকারী*, *প্রেক্ষাপট গণতন্ত্র* (১৯৯১), *বাতাসে লাশের গন্ধ* (১৯৯২), *গোলমালের জম গোলমালের আযম* (১৯৯২), *জেগে ওঠে জলেশ্বরী* (১৯৯৬) **মোহাম্মদ আমিনে**র নাটক। সাম্প্রতিক প্রয়াসে বর্ণিত এ নাটকে সৃজনীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। তবে এতে যে নীতিকথার প্রকোপ নেই তা বলা যাবে না। **রণেশ দাশগুপ্তের** (১৯১২-১৯৯৭) স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত নাটক *ফেরী আসছে* (১৯৭২)। এটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক। মার্কসবাদী রণেশ দাশগুপ্ত যুদ্ধের ভেতরে শ্রেয়োবোধের প্রত্যয়টি প্রতিধ্বনিত করেছেন তাঁর নাটকে। মলিয়েরের রূপান্তর *তৈল সংকট* (১৯৭৪), *শেক্সপীয়র দ্য সেকেন্ড* (১৯৮৫) **রশীদ হায়দার** (জ. ১৯৪১)র নাটক। কথাকারের প্রতিশ্রুতিই তাঁর বহাল আছে এসব নাটকে। পাশ্চাত্য নাট্যভিত্তিতে দুটো নাটকেই তিনি সাবলীল এবং গুরুত্বপূর্ণ। **রাজীব হুমায়ুন** (জ. ১৯৫১) সম্মিলিত জনতার মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ *নীলপানিয়া* (১৯৯২)। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস পেরিয়ে শত্রুর প্রতিরোধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো জনতার ঐক্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে এ নাটকে। নাটকটিতে বর্ণিত আঞ্চলিক সংলাপ সংঘবদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে জাগরণ। *ভূমিকম্পের আগে* (১৯৭৭), *ভূমিকম্পের পরে* (১৯৭৭), *ভোরের মিছিল* (১৯৭৭), *সমুদ্র সন্ধানে* (১৯৭৮), *অমৃতস্য পুত্রা* (১৯৮৪), *দোহাই হাসবেন না* (১৯৭৯), *শেষ বিচার* (১৯৭৪), *রাজার বাড়ী কতদূর* (১৯৭৪), *পিতামহের উদ্দেশে* (১৯৭৫), *আলোকিত যৌবন* (১৯৭৬), *রাজঅভিষেক* (১৯৭৬) **রতনকুমার ঘোষে**র নাটক। বড় কোনো অঙ্গীকার এসব নাটকে পরিলক্ষিত হয় না। **রানা নাসের** *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৮৬), *একটি নবজাতক শিশু এবং কিন্তু* (১৯৮৫), *এ লাশ রাখবো কোথায়* (১৯৮৩), *আসমানী* (১৯৮৬), *পাঁচ শয়তানের ব্লাড প্রেসার* (১৯৮৮) অঙ্গীকারঋদ্ধ নাটক। দায়বদ্ধ নাট্যকার সমাজের ব্যক্তিমানুষকে অবিকল তুলে আনতে চান। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তিচিহ্নিত মানুষ ও তার ভেতরের হতাশা নৈরাশ্য বিধৃত হয় নাটকে। তবে ঐতিহ্যগত সত্যটি থাকে পটচিত্রে। রানা নাসের আঙ্গিকে পূর্ণাঙ্গ নন। **রেজানুর রহমান** নানা বিষয়ে নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক *চূড়ান্ত ঘোষণা* (১৯৮৩), *মিছিল* (১৯৮৩), *হ-য-ব-র-ল* (১৯৮৭), *কুকুর হইতে সাবধান* (১৯৯০), *আনন্দ ঢেলা* (১৯৮৯), *বিবৃতি* (১৯৮৯), *উৎসব* (১৯৯০), *রাহু* (১৯৯০), *রং*

তামাশার খেলা (১৯৯০), *এক্কাদোক্কা* (১৯৯১), *তাহাদের কথা* (১৯৯৪), *নিঃশব্দ নিয়তি* (১৯৯৬), *হাট্টিমাটিমটিম* (২০০২) প্রভৃতি। এসব নাটকে রঙ্গরস আছে কিন্তু প্রজ্ঞার দিকটি দুর্বল। হাস্যরসকে শিল্পমাত্রায় উত্তরণ, পরিশ্রমের কাজ, সেটি এখানে নজরে আসে না। *একটি পতাকা* (১৯৮৮), *শকুনের দৃষ্টি* (১৯৯০), *আবার কেন রক্ত ঝরে* (১৯৯২), *রক্তাক্ত বর্ণমালা* (১৯৮৯) এবং পথনাটক : *শিউলী* (১৯৯৯), *বাঁচতে চাই* (২০০১) লিখেছেন **রফিকুল ইসলাম**। রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করে নাটকে আনেন তিনি জিজ্ঞাসা। সে প্রশ্নেই নাটকগুলো লেখা। শিল্পসফল নয় তাঁর সবগুলো নাটক। **রবিউল আলম** মনস্বী নাট্যকার। কিছু বিদেশী নাট্যকারের নাটকও তিনি অনুবাদ করেছেন। নাট্য-পাঠে তিনি প্রতিশ্রুতিশীল। সময়ের নাট্যরথে তাঁর নাটক : *জননীর মৃত্যু চাই* (১৯৭৪), *অথচ অন্ধকার* (১৯৭৫), *সমাপ্তি অন্যরকম* (১৯৭৫), *আকাঙ্ক্ষিত একজন* (১৯৭৬), *কখনো সৈকতে* (১৯৭৮)। আবু রুশদ-এর গল্প অবলম্বনে *শাড়ী বাড়ী গাড়ী* (১৯৭৭), শেক্সপীয়রের অনুবাদ *অ্যাজ ইউ লাইক ইট* (১৯৯২) এবং *রাজা সাহিত্য কারখানা* (১৯৯৬) প্রভৃতি তাঁর নাটক। **রামেন্দু মজুমদার** (জ. ১৯৪২) শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে নাট্যরূপ *ক্রীতদাসের হাসি*। প্রতিরোধী শাসক শক্তির তোষণের বিপক্ষে স্বাধীনচেতা ক্রীতদাস তাতারীর উচ্চারণ নিয়ে এ উপন্যাস। রামেন্দু মজুমদার সংগঠক, কয়েক দশকের নাট্যপথিক। তাঁর হাতে এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রামেন্দুর মঞ্চ-অভিজ্ঞতা এতে পরিব্যাপ্ত। ৩৬ বছর ধরে তিনি সম্পাদনা করছেন 'থিয়েটার' পত্রিকার। **লিয়াকত আলী লাকী** (জ. ১৯৫৭) লোকনাট্যদলের নাট্যকার। মঞ্চ পরিকল্পক, সংগঠক ও অভিনেতা। মৈমনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে লিয়াকত আলী লাকীর প্রেমের আখ্যান *সোনাই মাধব* (১৯৯৩)। একে পদাবলী যাত্রা বলা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝির* নাট্যরূপ দিয়েছেন। এছাড়া দিয়েছেন *রঙ্গিণী*, *ববি* (১৯৯৬) ও *বাংলার মুখ* (২০০৪)র নাট্যরূপ। তাঁর পথনাটক : *রয়েল বেঙ্গল টাইগার* (১৯৮৪), *নির্মূল* (১৯৯৩), *নির্মাণ* (১৯৯৮), *মহাপ্রয়াণ* (১৯৯৬)। **শংকর সাওজাল** (জ. ১৯৫২) *মহারাজার অনুপ্রবেশ*, *টিয়া পাখির সমাচার*, *সার্কাস*, *জাগে লক্ষ নূর হোসেন*, *নির্বাসন*। **শহীদুল আমিন** নাট্যকারের *মঞ্চ নাটক সমগ্র* (২০০৫)-এর অন্তর্ভুক্ত পুতুল *নাচ*, *নাটক না সত্যি*, *রাহুমুক্তি*, *কনে দেখা*, *ভুল*, *এম. এল*, *সোনার বাংলা*। মঞ্চে আত্মত্যাগী এ নাট্যকার। নাটকগুলো মঞ্চের পরিচর্যায় নির্মিত। **শোভনময় ভট্টাচার্য** *সূর্যসেন* (২০০৭, ২০০২ প্র. অ.) চমৎকার নাট্যরূপ গৃহীত। সূর্যসেন সর্বকালের বিপ্লবী চরিত্র, বিশেষ করে এদেশের প্রেক্ষাপটে, 'মুক্তির মন্দিরও সোপান তলে...' প্রাণ বলিদানের কাহিনি নিয়ে নাটক। শোভনময় ভট্টাচার্য পরিচর্যায় যত্নশীল। সৃজনশীল মেজাজে জীবনবৃত্তান্তের পাশাপাশি মুখর

প্রতিরোধকে তুলে এনেছেন নাটকে। সফল প্রযোজনাও সম্পন্ন হয়েছে নাটকটির। **শাহনুর খান** *পেণ্ডুলামের খুনী* (১৯৭২) শাহনুর খানের নাটক। মূল্যবোধ ও পরিশীলিত চেতনা বিধৃত লেখকের রচনায়। **শেখ আকরাম আলী** ঢাকা মঞ্চের সদস্য এবং দলীয় নাট্যকর্মী। *মাদারীর খেলা* (১৯৯১), *এখনো যুদ্ধ* (১৯৯৩), *লাশ '৭৪* (১৯৯৩), *সূর্যোদয়ের আগে* (১৯৯৩), *কবিপ্রিয়া* (১৯৯৫), *শকুন* (১৯৯৭) সমকালীন সমস্যা জর্জরিত সমাজস্বরূপকে তুলে আনেন নাটকে। কিছু নাটকে তিনি পরিপক্ব শিল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। **শহিদুল হক খান শ্যাননে**র নাটক *ঘুণ* (১৯৯৮), *বাইদ্যানীর গান* (১৯৯৮), *লাল নীল কাব্য* (২০০২), *সে এক রাজ্য* (২০০২), *নরক* এছাড়া তাঁর পথনাটক : *সেই দিনগুলি* (১৯৯৮), *পুকুর চুরি* (২০০১), *ঘাস* (২০০২)। ব্রাত্য, পেশাজীবী মানুষকে প্রকৃত মর্যাদায় পুনর্নির্মিত করতে চান নাট্যকার। নাট্যভাষায় গভীর জীবনস্পর্শী এ নাট্যকার, উত্তরিত তাঁর জীবনবোধ। কমিটেড, আত্মত্যাগী এ নাট্যকার বেশ কিছু নাটকে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। **শিশির রহমান** *পদ্মাপাড়ের কথকতা*, *নিলামের বাজার*, *হাসির বিয়ে*, *কুয়াশামুক্ত স্বপ্ন*, *পঞ্চভূতের রং তামাশা*, *গোয়েন্দার বার বছর* (১৯৯২), *রাজা ও শ্রমিক* (১৯৯৩), *কথাডা কি হাছানি* (১৯৯৩) প্রভৃতি তাঁর নাটক। শিশির রহমান প্রান্তিক মানুষোর প্রতিচ্ছবিকে তাৎপর্যময় করে তোলেন নাটকে। **শোভনময় ভট্টাচার্য** চট্টগ্রামের থিয়েটারকর্মী। তাঁর নাটক *চিক্কুর* (১৯৯৫), *শিকল* (১৯৯৭), *গ্রহণ* (১৯৯৯), *সূর্যসেন* (২০০২), *গন্তব্য* (২০০২)। পথনাটক : *একাত্তরের তেলেসমাতি* (১৯৯৫), *এপিঠ-ওপিঠ* (১৯৯৯), *২১'র ইতিবৃত্ত* (২০০০), *দালাল* (২০০০), *দানব* (২০০৩)। ঐতিহ্যগত সংগ্রাম ও সংস্কৃতির আহ্বানকে পরিস্রুত করেন নাটকে। শোভনময় ভট্টাচার্যের নাট্যভাষা উন্নত এবং কার্যকরি। নাটকেও তিনি সাবলীল। **শান্তিময় চাকমা** জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, রাঙ্গামাটির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটক *যে দিনত যে কাল* (১৯৮৪), *ঝিঝু রামর স্বর্গত যানা* (১৯৮৫), *ঝরা পাদার জীংকানী* (১৯৯৪)। তাঁর নাটিকা *আন্ধারত জুনি পহ্‌র* (১৯৮৪)। নিজের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিময় চাকমা। চাকমা ভাষায় রচিত নাটকে সংখ্যালঘু সংস্কৃতি ও প্রতিরোধের চেতনাকে নির্মিত করেন নাট্যকার। উৎপাদন সম্পর্ক, সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার স্বপ্নকে পরিস্রুত করেন নাটকে। শান্তিময় চাকমা পাহাড়ী সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকেও সারস্বত করে তোলেন নাটকে। **শ্যামল ভাদুড়ীর** নাটক *তথাপি সূর্য আসে*, *ধ্বস*। আর পথনাটক : *রক্তবীজের বংশধর*। এসব নাটকের ভেতর দিয়ে শ্রেয়োবোধের দিকেই তিনি সঞ্চারিত করেন মানুষ-সমাজ ও সংস্কৃতিকে। **শাহজাহান প্রামাণিক** থিয়েটার চাঁপাইনবাগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটক *অরণ্যে কি*, *রানার রং সাইডে*, *ময়না এখন* মুক্ত, *আমি যদি রাজা হতাম*, *লম্পট রাজার* ভণ্ড *হুজুর*, *রক্তসূর্য*। রিজিয়া রহমানের গল্প অবলম্বনে *একটি*

ফুলের জন্য। এছাড়া তিনি বেশ কিছু গীতিনাট্য লিখেছেন। যেমন *রক্ত লাল*, *হাজার কোকন জাগবে*, *আমার বাংলা*, *ক্ষেমজুরের দূর্গ* প্রভৃতি। এসবের ভেতর দিয়ে প্রগতি মনস্কতাই শুধু নয়, স্বদেশ ও স্বকালের মুক্তি চেতনার ধ্বনিও প্রতিফলিত। **শাহ আলম বাবলু** পদক্ষেপ থিয়েটার, গাইবান্ধার কর্মী। *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮৬), *ফ্যাসাদের দিনকাল* (১৯৮৮), *হায়রে কোষ্টা* (১৯৮৬), *গাঁজা আমার রাজা* (১৯৮৮) শাহ আলম বাবলুর নাটক। তাঁর পথনাটক : *কালের সাক্ষী* (১৯৮৮), *আমরা সবাই* (১৯৮৮) প্রভৃতি। প্রতিরোধী চরিত্রকে বাঙময় করে তোলেন। উৎপাদনের সম্পর্কের ক্ষেত্রটি তিনি নিরূপণ করেন। **শেখ নজরুল ইসলাম** বাগেরহাট থিয়েটারের কর্মী। *নির্বাসিত সত্য* (১৯৮১), *একালের তীতুমীর* (১৯৮৫), *দর্পণ* (১৯৮৫), *আলো থেকে অন্ধকার* (১৯৮১), *এই দেশে* (১৯৯২) তাঁর মৌলিক নাটক। *নির্বাসিত সত্য* এবং *একালের তীতুমীর* বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সত্যকে শিল্পিত সত্যে প্রকাশ করে। **শুভাশিস সিনহা** (জ. ১৯৭৮) মণিপুরী থিয়েটার, মৌলভীবাজার-এর কর্মী। *মেঘ বৃষ্টি রোদ* (১৯৯৬), *আজবপুরের বর্ষবরণ* (১৯৯৭), *নারাগ ডাঙর ইলি* (মণিপুরী ভাষায়) (১৯৯৭), *নাই রাজার রাজদরবার* (১৯৯৭), *কানাইলালের সানাই* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর নাটক। *প্রতিরূপকথা* (২০০৭), *ভানবিল* (২০০৮), তাঁর মঞ্চনাটক। এ নাটকে তিনি অনেকটা সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রূপকেই শিল্পিত করে তুলেছেন। নাট্যভাষা পরিশীলিত এবং স্বাভাবিক ভাব অনুসৃত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রুদ্রচণ্ড* মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি ২০০৬-এ। **শান্তনু কায়সার** (জ. ১৯৫০) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৯৪)-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এখানে নাট্যকারের সংহতি ও যত্ন পরিলক্ষিত। মূল চরিত্র 'তিতাস' অপরিবর্তিত রয়েছে বলেই মনে হয়। এছাড়া *সাজনমেঘ*, *রূপান্তর* তাঁর নাটক। **সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম** (জ. ১৯৫১) শেক্সপীয়রের *কিং লীয়ারের* সফল অনুবাদ করেন। এর প্রথম মঞ্চায়ন করে থিয়েটার ১৯৯৩ সালে। এ ছাড়া তাঁর অন্য নাটক *ভুবনের ঘাটে* (২০০৩)। **সায়্যাদ কাদির**(জ. ১৯৪৬)র গুরুত্বপূর্ণ নাটক *সাড়ে সাতশো সিংহ* (১৯৭৬)। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এ প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকার আর বেশি সক্রিয় থাকেননি নাটক রচনায়। অন্য নাটক *অপচয়ের যন্ত্রপাতি*। *সাড়ে সাতশো সিংহ* আধুনিক প্রকরণ পরিচর্যায় গৃহীত। নাট্যকার নিরঙ্কুশ জীবনবোধে কার্যকরি এ নাটকে। প্রতীকী হলেও অভিব্যক্ত জীবনবোধ আমাদের দেশ-সমাজ-কালস্পর্শী। **সিরাজ হায়দার** *আলো একটু আলো* (১৯৭৬), *বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন* (১৯৭৬), *পাগলা কুকুর* (১৯৭৭) সিরাজ হায়দায়ের নীতিকথামূলক নাটক। এতে শিল্পগুরুত্ব তেমন কার্যকর নয়। **সাজেদুল আউয়াল** (জ. ১৯৫৮) মালোপাড়ার জীবন নিয়ে রচিত কাব্যাখ্যান *ফণীমনসা* (১৯৭৯, ১৯৮০ প্র. অ.)। তিনশ বছর

আগের এক জনপদের কাহিনি *ফণীমনসা*। যৌবনময়ী এ নদীতে চর জাগলে জেলে অধিকারের বিপরীতে ইটখোলার মালিক তা দখল করতে চায়। শেষে অধিকারহারা স্বেদক্ষরিত সংগ্রামী জনতার পরাজয় ঘটে, কিন্তু প্রজন্মান্তরের ঐ অধিকারের ইঙ্গিতটি বজায় থাকে। **সালাম সাকলাইনে**র মৌলিক নাটক *কালো ভেড়া বধ কর* (১৯৮৯)। *বানরের পিঠা বন্টন* (১৯৮৬), *মৃত্যুঞ্জয় মানুষেরা* (১৯৯১), *জাহেন আলীরে ধর* (১৯৮৪), *কথাকীত্তন* (১৯৯২), *শিবানী সুন্দরী* (২০০১), *হামেদ আলীর স্বর্গদর্শন* (১৯৯২) প্রভৃতি তাঁর নাটক। সমকালীন সমাজ প্রবাহে এসব নাটক গুরুত্ববহ। **সাইফুর রহমান মিরনে**র পথনাটক : *এখানে এখনো* (১৯৯২), *গণরায়* (১৯৯২), *লক্ষ প্রাণের মূল্যে* (১৯৯৩), *যুদ্ধবাজ* (১৯৯৪)। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে দেশবিরোধী শক্তির উত্থান ও প্রতিরোধে রচিত তাঁর পথনাটকসমূহ। মিরনের প্রতিশ্রুতি এসব নাটকে পরিব্যাপ্ত। **সৈয়দ মহিদুর রহমান** *মোকরফ ফেরেস্তার দেশে*, *৩৪'এর প্যারাসাইট*, *সাবধান ওরা আছে* এবং পথনাটক : *ইবলিশের দরবার*, *এখানে হায়েনার মুখ*, *সাপের খেইল*, *আমরা দিওয়ানা*, *লীলা*, *শকুন* লিখেছেন। বাংলাদেশে শোষকচরিত্র ও রাজনৈতিক হীনন্মন্যতা নিয়ে তাঁর নাট্যপ্রয়াস। **সৈকত খন্দকার খোকন** সমকালে, ঢাকার নাট্যকর্মী। তাঁর নাটক *ঘুমপাড়ানীর কড়ি* (১৯৯১), *শ্যাডো* (২০০২)। পথনাটক : *মগজ ধোলাই* (১৯৮৭)। তরুণ এ নাট্যপ্রতিভা এখনও সম্ভাবনার আবর্তে আরাধ্য। **সাবিনা বারী লাকী** *জেনেশুনে বিষ করেছি পান* (১৯৯৯), *আমাদের পৃথিবী* (২০০২) মধ্যবিত্ত নগরমনস্ক চেতনার নাটক। এর নাট্যগুণ থাকলেও অন্তর্চেতনা দুর্বল। *কতদিন এই দিন* (১৯৯১), *কতিপয়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯২), *কুলাঙ্গার* (১৯৯৫) **সাদেক বাচ্চু**র নাটক। সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত এসব নাটক। তবে তাঁর নাট্যভাষা উত্তীর্ণ নয়। পরিবেশটি রচিত হয় নাটকে, যেটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। **সোলায়মান মজিদ** বিদ্রোহী নাট্যগোষ্ঠী ময়মনসিংহের দলীয় নাট্যকর্মী। তাঁর নাটক মন্ত্রী *কদম আলী* (১৯৮৪), *কৃষ্ণছবি নরকে* (১৯৮৪), *বাদীপক্ষ সরকার* (১৯৮৬), *একুশের গপ্পো* (১৯৯০), *নির্বাসিত সুন্দরী* (১৯৮৫), *পাগলাসুমারী* (১৯৯৮), *কংসে প্রেম ধবংশ* (১৯৯৪), *দেশ ও সখীমন* (১৯৯৮)। পুনরুত্থিত আত্মচেতনা ও তার জীবনছবি। বাংলাদেশের নাট্যঐতিহ্যের ধারায় তাঁর রচিত বিবিধ নাটক। সমকালস্পর্শী তো বটেই। আঙ্গিকে সোলায়মান মজিদ স্বতন্ত্র। **সারোয়ার চৌধুরী** ময়মনসিংহের বহুরূপী না. স.-এর কর্মী। *কাকতারুয়ার পালা* (১৯৯৮), *এখনো মীরজাফর* (১৯৯৮) তাঁর নাটক। নামকরণের রসবোধ এবং কমিটমেন্ট থেকেই এর অন্তর্সংবাদ জারিত। মীরজাফর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নাটকে, প্রসঙ্গত সমাজে এখনও বিস্মৃত নয়। **সনজীব বড়ুয়া** অঙ্কন থিয়েটার ইউনিট চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। *বাজলো রাজার বারোটা* (১৯৭৯), *মহারাজ অসুস্থ* (১৯৯১), *পাথর প্রতীমা* (১৯৯৩) তাঁর

নাটক। রসবোধ ও পরিহাস পরিস্রুত নাট্যকার তিনি। সফল তাঁর নাট্যপ্রয়াস, কারণ গৃহীত কাহিনিঐক্য ও উৎকর্ষবিন্দুর নির্ঘণ্ট। নাট্যরচনায় যত্নও অপরিচ্ছন্ন নয়। **সুচরিত চৌধুরী** অনন্য থিয়েটার চট্টগ্রামের সংগঠক। তাঁর নাটক *হাসির রাজা গোপাল ভাঁড়* (১৯৯৩), *জন্মভূমি* (১৯৯৭), *হাউজ টু নো লেট* (১৯৯৯), *মহাকাল* (২০০২), *আবার নন্দিনী* (২০০৪), *ভূত* (২০০৫), *ভবিষ্যৎ* (২০০৫), *একটি অমীমাংসিত রহস্য* (২০০৫)। নাট্যকারের পথনাটক : *জুঁইখালীর সংগ্রাম* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন* (১৯৯৫), *বীরকন্যা* (১৯৯৬), *বিজয়ী বাঙ্গালী* (১৯৯৮), *মৃত্যুবীজ* (১৯৯৯), *চেৎ তো গং* (২০০১), *নেই মানুষের দেশে* (২০০৩)। সুচরিত চৌধুরী প্রকরণে প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণে পরিশুদ্ধ। নাটকের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎ-পরবর্তী বিচিত্র জীবনের সংবাদ প্রতিধ্বনিত। **সৈয়দ মুফাজ্জল সাদাত মুক্তা** নাট্যমেলা হবিগঞ্জের সংগঠক। *অন্যতম জঘন্য* (১৯৯৫), *নিয়ামত আলীর সংসার* (২০০১) সৈয়দ মুফাজ্জল সাদাত মুক্তার নাটক। নাটকে জীবনবাদী চেতনাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এ প্রত্যয়ে রচিত পথনাটক : *পিচ্ছিল রাস্তা* (১৯৯৭) এবং গীতিনাট্য : *রেললাইন বহে সমান্তরাল* (১৯৯৯)। **সুভাস দাস** প্রতীক, ঝালকাঠির সঙ্গে যুক্ত। *আমার নাম সুলতান* (১৯৮২), *মুক্তিযোদ্ধা সুলতান* (১৯৮২), *আমি মেহেদী বলছি* (১৯৮৪), *নবাব* (১৯৮৬), *চেরাগ আলীর কিচ্ছা* (১৯৮২) সুভাস দাসের নাটক। মুক্তিযোদ্ধা সুলতান বিজয়ীরূপে বর্ণিত তাঁর নাটকে। ইতিহাসগত ভিত্তিটি স্বচ্ছ চেতনা ও প্রেরণা থেকে উঠে এসেছে তাঁর নাটকে। সুভাস দাসের পথনাটক : *নসু মিয়ার প্যাচাল* (১৯৮২), *পলাশীর সুবোধ শয়তান* (১৯৮৬)। **সালাহউদ্দীন আহমদ মিল্টন** কলমের সৈনিক নাট্যদল মাগুরার কর্মী। তাঁর নাটক *সিপাহীবীর মঙ্গল পাণ্ডে* (২০০১), *জলতরঙ্গ* (২০০১), *নষ্ট প্রহর শেষে* (২০০২), *উদরে উঁই পোকা* (২০০২), *মানুষ* (২০০৩) প্রভৃতি। মঙ্গল পাণ্ডে পুনরুজ্জীবীত নাট্যকারের হাতে। সমাজভূমিষ্ঠ নাটকে গৎবাধা নন মিল্টন, ইতিহাস খুঁড়ে বিদ্রোহের সৈনিকদের পরিচিত করান, তুলে আনেন তিনি। তাঁর পথনাটক : *রক্তাক্ত সংগ্রাম* (১৯৯৭), *তৈল মর্দন* (২০০১), *একজন মুক্তিযোদ্ধা* (২০০২), *নো তাফালিং* (২০০৩)। অনন্য নাট্যদল করেন **সুনীল দত্ত**। *একই প্যাচাল* (১৯৯৫), *আশ্রয়* (১৯৯৬), *অমাবস্যায় চন্দ্রমুখ* (১৯৯৮), *কেষ্টা* তাঁর নাটক। এক ধরনের সমকাল চেতনায় আরূঢ় এ নাট্যকার। দায়বোধের পরিচর্যায় রচিত তাঁর পথনাটক : *যদি এমন হয়* (১৯৯৪), *নগরভবনের নাগর* (১৯৯৭), *ফাগুনের চোখে জল* (১৯৯৮)। পথনাটকের বৈশিষ্ট্য গতানুগতিক, উদ্দেশ্যসাধিত। তবে এ আঙ্গিকের ধারায় সুনীল কুমার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। **সামসুজ্জোহা বাবলু** শিখা সংসদ রংপুরের সঙ্গে যুক্ত। *বাংলার সন্তান* (১৯৭৩), *নাটক কিন্তু নাটক নয়* (১৯৭৭), *বিলাতী* (১৯৮৬), *আজব দেশের আজব রাজা* (১৯৮৬), *নবাব আলীর নবাবী*

(১৯৮৬), *দেবী* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর নাটক। **সিরাজুল ইসলাম** সারথি সাতমাথা রংপুরের নাট্যকর্মী। তাঁর নাটক *ট্যবলেট ক্যাপসুল ও ফাইল* (১৯৭২), *সুতরাং পরে হবে* (১৯৭৩), *জলসড়ক* (১৯৭৬), *যুগল সমাধি* (১৯৭৮), *স্পেশাল ট্রেন* (১৯৮০) প্রভৃতি। নাট্যকারের পথনাটক : *রাক্ষস* (১৯৭৯), *ভেলকিবাজী* (১৯৯৪), *এদের ধরিয়ে দিন* (১৯৮৯), *সময়ের সাহসী* (১৯৯০), *ফান্দিছে* ১ম ও ২য় পর্ব (১৯৯১ ও ১৯৯২), *মায়ের ডাক* (১৯৯৫)। এসব নাটকের ভেতর দিয়ে তিনি ক্রমে-উত্তরিত। **সাইমন জাকারিয়া** (জ. ১৯৭২)র প্রথম নাটক *শুরু করি ভূমির নামে* (২০০০)। এছাড়া চর্যপদ অবলম্বনে লিখেছেন *ন নৈরামনি*। তারাশঙ্করের *কবি* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার। *এ নিউ টেস্টামেন্ট অফ রোমিও* শেক্সপীয়রের *রোমিও এন্ড জুলিয়েট* অবলম্বনে। সাইমন জাকারিয়া প্রান্তস্পর্শী নাট্যকার। অনেক অস্পৃশ্য বিষয় তিনি যেমন নাটকে তুলে এনেছেন তেমনি শেক্সপীয়রের মতো আধুনিক নাট্যকারও আছে তাঁর কর্মকাণ্ডের তালিকায়। *কবির* নাট্যরূপে তিনি অনেকাংশে সফল এবং পরিশুদ্ধ। **সুনন্দ বাশার**-এর সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* (২০০৭) উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। বাঙালি চেতনার স্বরূপ ও তার দ্বন্দ্বময় উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। উপন্যাসটির গল্প-নির্বাচন এবং নাট্যভাষা পরিচর্যায় সুনন্দ বেশ পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসটি তাঁর এ নাটকে উঠে এসেছে। **সুবর্ণা মোস্তফা**র শেক্সপীয়রের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* এর রূপান্তর করেছেন এবং তা প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৭ সালে। অনেক পাঠ-অভিজ্ঞতায় আত্মস্থ তাঁর শেক্সপীয়র। সেজন্য নিখুঁত পরিচর্যায় তিনি এটি দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা অনুবাদে সুবর্ণা মোস্তফার এ অনুবাদটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি অনেকরূপে মূলানুগ। এবং পরিশ্রমী, সৃজনী মেধার পরিচর্যা করেছেন। নাট্যাভিনেতা **সদরুল পাশা**র অনুবাদ *ম্যাসাকার*। তাঁর অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ বলা চলে। কিন্তু যথেষ্ট আড়ষ্ট মনে হয়। **সাইদুস সাকলায়েন** ইউজিন আয়েনেস্কার নাটকের অনুবাদ করেছেন *দ্য লেসন* নামে। সাইদুস সাকলায়েন এ কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এ অনুবাদকর্মটি ইতোমধ্যেই পেয়েছে পাঠকপ্রিয়তা। *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ* (১৯৭৩), *কৃষ্ণচূড়ার লাল কিম্বা রজনীগন্ধার সাদা*, *আরেকটা শহর চাই*, *কসাই* (১৯৭৭) **হাবিবুল হাসানে**র নাটক। এসব নাটকে তাঁর পরিচর্যা দুর্বল নয়। তবে কিছু নাটকে নাট্যক্রিয়ার আবহটি দুর্বল। *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ* তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নাটক। *স্বপ্ন*, *অসময়*, *১৯৭১*, *নৃপতি*, *মহাপুরুষ* (১৯৮৬ প্র. অ.) **হুমায়ূন আহমেদ** (১৯৪৮-২০১২) র মঞ্চনাটক। কিশোর নাটিকা *স্মৃতিচিহ্ন*। হুমায়ূন আহমেদ মধ্যবিত্ত জীবনাগ্রহ নিয়ে নাটক লিখেছেন। প্রচণ্ড জনপ্রিয় তাঁর টেলিভিশন নাটক। মঞ্চেও তিনি বেশ কিছু নাটক নিয়ে

গেছেন। হয়েছেন জনপ্রিয়। তাঁর কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে আছে যেমন পরম্পরা রয়েছে তেমনি আছে প্রতিপার্শ্ব বিরচনে সংলাপ-অনুবন্ধী 'ডিমান্ড'। ফলে একটা শিল্পমাত্রাও অর্জিত হয় সেখানে। বাংলাদেশের নাটকে গুরুত্ববহ এবং জনপ্রিয় নাট্যকার। **হাবিব আহ্সান কোহিনুর** র নাটক *পলাতক পালিয়ে গেছে*, *তরুণ ও বহমান ক্ষত*, *সাক্ষাৎকার*, *ব্যক্তিগত পৃথিবী*। এসব নাটকের বিষয় আবহ আঙ্গিক স্থূল। নাট্যপরিচর্যা দুর্বল। **হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যে**র নাটক *একুশের নাম বাংলাদেশ* (১৯৭৭), *জনতার আদালত* (১৯৭৭)। দায়বদ্ধ নাট্যকার এসব নাটকের ভেতর দিয়ে চেতনাগত স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এর নাট্যআবহ প্রথানুগ। **হাবিবুর রহমান** *মায়াকানন* (১৯৭৬), *আলোর ফুল* (১৯৭৬) হাবিবুর রহমানের নাটক। এসব নাটকে প্রথানুগ তিনি। শিল্পভাষা দুর্বল।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ জ্ঞানের সাহিত্য। ব্যক্তিধর্ম ও বস্তুধর্মী দুরকমেরই প্রবন্ধ আছে। এর বাইরে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধও লেখা হয়। তবে সর্বসাকুল্যে প্রবন্ধ হচ্ছে মননের সাহিত্য, মননধর্মী শিল্প। বাংলাদেশে বিভাগোত্তর পর্বে অনেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এ ধারা ততোটা সমৃদ্ধ বলা যায় না। এর কারণ হিসেবে বলা চলে, বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংকট ও উদার-মুক্তচিন্তার সমস্যা। এক পর্যায়ে বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা কি-না তা নিয়েও দ্বিধা ও ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে। আর্থিক দুর্গতি থাকার কারণে বাঙালি মুসলমানরা এমনিতেই নানাভাবে নিগৃহীত ছিল, সংস্কারাচ্ছন্নতায় ছিল অবরুদ্ধ, ফলে মূল্যবোধ বিকশিত হতে পারে না– যদিও ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনা প্রতিষ্ঠার একপর্যায়ে তাঁরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে, স্বকীয় অবস্থান সম্পর্কে কোষ্ঠীবিচারও স্পষ্ট হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রবন্ধ নানাভাবে বিকশিত হয়। আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার ভেতরে যুক্তি ও মুক্তির পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভাষা-সংস্কৃতিচিন্তার পথ খুলে যায়। বাংলা ভাষাও এতে সমৃদ্ধ হয়। বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলায় গবেষণাধর্মী কাজ শুরু হয়, শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের স্বধর্মই শুধু নয়, অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক চেতনায় প্রবন্ধ লেখা হয়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর ধারণা এতে যুক্ত হয়। গঠন কাঠামোতে অনেকেই নিজস্ব শৈলি তৈরি করতে সক্ষম হন। আত্মধর্মী প্রবন্ধে ব্যক্তির যুক্তি ও মত শুধু নয়, মননঋদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্যও রচিত হয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমেদ বিভাগোত্তর সময়ে প্রবন্ধ লেখেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে তার সমৃদ্ধি আরও কল্লোলিত হয়। আহমেদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ লেখেন। তাঁদের প্রবন্ধে প্রকাশভঙ্গি ও ভাবনায় তৈরি হয় নবতর দৃষ্টিচেতনা। উইট, হিউমার আর প্রজ্ঞার সমন্বয়ে বাংলা প্রবন্ধ এখন বেশ উত্তুঙ্গস্পর্শী বলা যায়।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক (১৯৪৭-১৯৭০)

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)
পুঁথি সংগ্রাহক, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক হিসেবে পথিকৃৎ। *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ* (১৯১৪), *পুঁথি পরিচিতি* (আহমদ শরীফ সম্পা.) (১৯৫৮), *প্রাচীন পুঁথির বিবরণ* (অপ্রকাশিত)। চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস *ইসলামাবাদ* (সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পা.) (১৯৬৪) এবং মুহাম্মদ এনামুল হকের সহযোগে *আরাকান রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৩৫)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)
বহুভাষাবিদ, গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য প্রভূত কর্ম যেমন সম্পাদন করেছেন তেমনি বাঙালি-সংস্কৃতির বিকাশেও যুগান্তকারী মত প্রদান করেছেন। তিনি অনেক সম্পাদনার ভেতর দিয়ে অমরকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গবেষণাকর্ম : *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা* (১৯২০), *Les Chants Mystiques De Kanna at de Saraha* (1928), *Les Sons* (1929), *বাংলা ব্যাকরণ* (১৩৪২), *ভাষা ও সাহিত্য* (১৯৩১), *রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম* (১৯৪২), *শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ* (১৯৪২), *Hundred Sayings of the Holy Prophet* (1945), *ইকবাল* (১৯৪৫), *আমাদের সমস্যা* (১৯৪৯), *বাংলা সাহিত্যের কথা* (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), *বিদ্যাপতি শতক* (১৯৫৪), *বাংলা আদব কি তারিখ* (১৯৫৭), *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত* (১৯৬৫), *Essays on Islam* (1945), *Traditional Culture in East Pakistan* (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে) (১৯৬৩), *Buddhist Mystic Songs (1966)*, *Tales From the Quran* (1970) প্রভৃতি।
সংকলন ও সম্পাদনা : *পদ্মাবতী* (১৯৫০), *গল্প সংকলন* (১৯৫৩), *প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী* (১৯৫২), *পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান* (দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ১৯৬৫)।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)
মনস্বী, গবেষক-প্রাবন্ধিক। কর্মজ্ঞ এ পণ্ডিতের জীবন বর্ণাঢ্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে সত্যনিষ্ঠ ও কৌতূহলী গবেষণা করেছেন। এনামুল হক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক অনালোকিত দিকের প্রতি দৃকপাত করেছেন। *আবাহন বা জাতীয় সঙ্গীত সমষ্টি* (১৯২২), *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (১৯৩৫), *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা, ১৯৩৫),

চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), *বাংলা ভাষার সংস্কার* (১৯৪৪), *পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলাম* (১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জুরী (১৯৫২), *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৫৭), *মনীষা-মঞ্জুষা* ১মখণ্ড (১৯৭৫), *মনীষা-মঞ্জুষা* ২য়খণ্ড (১৯৭৬), *মনীষা-মঞ্জুষা* ৩য়খণ্ড (১৯৮৪) তাঁর গবেষণা ও মননশীল প্রবন্ধ। গবেষণা-প্রবন্ধে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের একেবারে উৎসভূমে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এনামুল হকের অনেক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (স্বরবর্ণাংশ সম্পাদনা, ১৯৭৪), *Perso-Arabic Elements in Bengali* (with Dr. G. M. Hilali, 1967), *Abdul Karim Sahitya Bisharad Commemoration Volume* (Asiatic society of Bangladesh, 1972), *Dr. Mohammad Shahidullah Felicitation Volume* (Asiatic society of Pakistan, 1966) এসব সম্পাদিত গ্রন্থ ছাড়াও অনেক স্মারকগ্রন্থের কাজও সম্পন্ন করেছেন তিনি।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)

ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বাঙালি মুসলিম চেতনার উদ্বুদ্ধকরণমন্ত্রে ব্রতী। বাগ্মী ও সৃজনী প্রতিভা। প্রধানত ইসলাম ধর্ম-মূল্যবোধই ছিল তাঁর চর্চার প্রধান জায়গা। এ বিষয়ক গবেষণা ও চিন্তাই তাঁর আরাধ্য। *মোস্তফা চরিত* (১৯২৩) আকরম খাঁর সবচেয়ে বড় সাহিত্যকীর্তি। প্রকৃত ভাষাশিল্পীর দক্ষতায়, প্রসাদগুণে তিনি এটি রচনা করেছেন। যুক্তিসিদ্ধ জীবনীটি উৎকৃষ্ট গদ্যে বিরচিত। রচনাটি ধর্মান্ধ সমাজ দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। তাঁর অন্য গ্রন্থ : *সমস্যা ও সমাধান*, *মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য*, *বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম*, *মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, *তফসীরুল কোরআন* ৫ম খণ্ড, *মুক্তি ও ইসলাম*।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ (১৮৯৮-১৯৭৪)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা মুসলিম গদ্য লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্। তাঁর দুখণ্ডে রচিত *পারস্য প্রতিভা* প্রবন্ধ আমাদের সাহিত্যের অমরকীর্তি। সুললিত ও স্বচ্ছ গদ্যরীতিই *পারস্য প্রতিভার* মূল আকর্ষণ। মুসলিম শৌর্য বা বীরত্বগাথা আকর্ষণীয় গদ্যে পরিবেশন প্রচেষ্টায় *পারস্য প্রতিভা* রচিত। *পারস্য প্রতিভার* প্রথমখণ্ড বের হয় ১৯২৬ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ সালে। বরকতুল্লাহ্র দার্শনিক ভাবনা ও পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ *মানুষের ধর্ম* (১৯৩৪) প্রবন্ধে। অসাম্প্রদায়িক মনন ও আধুনিক চিন্তাশক্তির প্রকাশ তাঁর এ গ্রন্থটি। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ এছাড়া *কারবালা ও ইমামবংশের ইতিবৃত্ত* (১৯৫৭), *নবীগৃহ সংবাদ*[মক্কা খণ্ড] (১৯৬০),

নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (১৯৬৩), *হযরত ওসমান* (১৯৬৯) গ্রন্থ রচনা করেন।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)
অসাধারণ মেধাবী, প্রবন্ধ ও সৃষ্টিশীল রচনা উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বিরাজমান। প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা 'চতুরঙ্গ'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক। বাংলা প্রবন্ধে তিনি তীক্ষ্ণধী ধারাটির পথিকৃৎ। সমাজ-অন্বিষ্ট প্রবন্ধকার। কবিতাবিষয়ক দ্বন্দ্বাত্মক আলোচনার গ্রন্থটি খুব তাৎপর্যময় ও পাথেয় বললে ভুল হবে না। তাঁর শরৎ মূল্যায়নও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজমনের পটভূমিতে নির্ণীত সাহিত্য সমালোচনার ধারাটি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ইম্যানুয়েল কান্ট* (১৯৩৬), *মার্কসবাদ* (১৯৪৮), *বাঙলার কাব্য* (১৯৫৪), *শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, *Kant on philosophy in General* (1935), *Poetry Monods and Society* (1941), *Rabindranath Tagore* (1962), *The Bengali novel* (1968) তাঁর গ্রন্থ।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)
মননশীলতার পথিকৃৎ প্রাবন্ধিক। বুদ্ধির মুক্তির দিশায় রচনা করেছেন বেশ কিছু পুস্তক। বিজ্ঞানচর্চায়ও তিনি কিংবদন্তীতুল্য। *সঞ্চরণ* (১৯৩৭), *নজরুল কাব্য পরিচিতি* (১৯৫৮), *সেই পথ লক্ষ যার* (১৯৭০), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* প্রভৃতি তাঁর পুস্তক।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)
চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী লেখক। ভাষাভঙ্গি সহজ, সরল ও সাবলীল। প্রবন্ধসাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। *মহামানুষ মুহসীন* (১৯৪০), *মরুভাস্কর* (১৯৪১), *সৈয়দ আহম্মদ*, *কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ* (১৯৪৯), *মানচয়নিকা* (১৯৫১) তাঁর গ্রন্থ।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)
আবুল ফজল মূলত প্রাবন্ধিক। পূর্ব-বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎসধারায় বিবেক, মুক্তি, কল্যাণ এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। *বিচিত্র কথা* (১৯৪০) প্রবন্ধে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দায়, বুনিয়াদ নিয়ে মুক্ত আলোচনা বিধৃত। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (১৯৬১) প্রবন্ধগ্রন্থে লেখকের কাণ্ডজ্ঞানের দর্শন যুক্ত হয়েছে মানবতার হিতসাধনায়। *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৫) গ্রন্থের মূল্যবান প্রবন্ধ

'শিল্পীর সাধনা'। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের দ্বন্দ্ব ও প্রত্যয় যেমন এখানে আলোচিত তেমনি বিবর্তিত ইতিহাসে শিল্প যে আত্মার খোরাক তারও ব্যাখ্যা আছে। *বিদ্রোহী কবি নজরুল* (১৯৫৭), *সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র* (১৯৬৮), *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০), *মানবতন্ত্র* (১৩৭৯), *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৪), *শুভবুদ্ধি* (১৯৭৪), *একুশ মানে মাতা নত না করা* (১৯৭৮), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ* (১৯৭৯) আবুল ফজলের মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন* (১৯৮১)।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)
'খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান' এস ওয়াজেদ আলী। প্রতিভাবান ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ঐতিহাসিক রচনা *গ্রানাডার শেষ বীর* (১৯৪১)। গ্রন্থটি সম্পর্কে 'ভারত' পত্রিকা ১৯৪০ সালে লিখেছিল 'স্পেনে গ্রানাডা হইতে বিচ্যুত শেষ মূর বীর আবদুলার পরাভব সকল এশিয়াবাসীর সমবেদনা আকর্ষণ করিবে। পুস্তকখানির ভাষা সরল, অথচ হৃদয়গ্রাহী।' এস. ওয়াজেদ আলীর ছাব্বিশটি প্রবন্ধ নিয়ে *জীবনের শিল্প* (১৯৪১)। *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৯৪৩) গ্রন্থে রয়েছে তেত্রিশটি রচনা। *ভবিষ্যতের বাঙালী* (১৯৪৩)র বিষয়বস্তু সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বিন্যস্ত। এসব প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য আছে। বিভাগ-পূর্ব কালেই *ভবিষ্যতের বাঙালী* প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমান ও তার ভাষা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে উচ্চাশা তিনি পোষণ করেছেন তা এখন নির্ভুল সত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বাঙালি মুসলমান এবং তাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ—এ সত্যসম্ভাব্যতা তাঁর উক্তিতে আজ অমোঘ।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)
কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং ছান্দসিক। ছন্দ নিয়ে তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত দিয়েছেন। *ছন্দ সমীক্ষণ* (১৯৭৯) তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ। ছন্দ সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও বিশেষণী মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ছন্দের বিবর্তন, কারুকাজ ও সৃষ্টিপ্রয়াস আবদুল কাদির যৌক্তিক করে তুলেছেন তাঁর লেখায়। আবদুল কাদিরের মননসমৃদ্ধির আরেকটি মাত্রা *কবি নজরুল* (১৯৭০)। নজরুলের প্রথম জীবনীকার কবি আবদুল কাদির। তাছাড়া নজরুলের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, চিঠিপত্র ও প্রকাশনাও প্রথম করেন কবি আবদুল কাদির। নজরুল বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। *বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা* (১৯৪৪), *মওলানা মোহাম্মদ নাঈমুদ্দীন* (১৯৭৯), *কাজী আবদুল মওদুদ* (১৯৭৬), *লোকায়ত সাহিত্য* (১৯৮৫)। এসব মৌলিক রচনা ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন *কাব্য মালঞ্চ*,

মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প, *নজরুল রচনাবলী* (১ম খণ্ড–৫ম খণ্ড), *রোকেয়া রচনাবলী*, *শিরাজী রচনাবলী*, *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, *ইয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলী*, *আবুল হোসেন রচনাবলী*, *কাব্যবীথি* ইত্যাদি।

সালাহ্উদ্দীন আহমদ (১৯২৪-২০১৪)
খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত। মনস্বী গবেষক। সালাহ্উদ্দীন আহমেদ ইতিহাসের সত্যাসন্ধ ব্যক্তি। কিন্তু শুধু ইতিহাসেই তাঁর আগ্রহের বিষয় নয় বিচিত্র বিষয়ে লিখেছেন তিনি। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও কিছু আকর গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর গ্রন্থ : *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯১), *বাংলাদেশ : জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র* (১৯৯৩), *ইতিহাসের সন্ধানে* (১৯৯৫), *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835* (1965), *Bangladesh : Tradition and Transformation* (1947), *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh : An Introductory Outline* (1994)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৮-১৯৯৯)
তমুদ্দনের বিকাশ (১৯৪৯), *সত্যের সৈনিক আবুজর* (১৯৪৯), *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম* (১৯৫৭), *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন* (১৯৬৮), *ইসলাম ও মানবতাবাদ* (১৯৬৮), *নূতন সূর্য* (১৯৭৪), *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে* (১৯৭২), *দর্শনের নানা সমস্যা* (১৯৭৭), *ধর্ম ও দর্শন* (১৯৮১), *মরমী কবি হাসন রাজা* (১৯৭৯), *হাসন রাজা* (১৯৭৭), *আমাদের জাতীয়তাবাদ* (১৯৮৬), *নয়া জিন্দেগী* (১৯৯৬), *বিজ্ঞান ও দর্শন* (১ম খণ্ড ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ১৯৮৫) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। মুসলিম দার্শনিক ও খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ। হাসন রাজা বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর ভাবাদর্শে আবাল্য লালিত এ লেখক।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)
সৈয়দ আলী আহসান অনুপম গদ্যরচনাকার। বাক্যতৈরিতে তিনি চমৎকার স্বাচ্ছন্দ্যময়। কাব্যময়তা লুক্কায়িত থাকে বচনের অন্তর্কাঠামোয়। বাংলাদেশের কাব্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে তিনি অদ্যাবধি অনবদ্য। তাঁর শিল্পসাহিত্যবিষয়ক আলোচনা সুধীমহলে সমাদৃত। কারণ হিসেবে বলতেই হয় তাঁর অন্তরঙ্গ বিশেষণ প্রবণতা। কবিতার আন্দোলন বিষয়ক ধারণা ও তৎ-উপ্ত আবেগের ইন্ধন, তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা কিংবা যুক্তিপারম্পর্য আকর্ষণীয়। কবি সৈয়দ আলী আহসানের গ্রন্থসমূহ :

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (যুগ্মভাবে, ১৯৫৪), *নজরুল ইসলাম* (১৯৫৪), *Essays in Bengal Literature* (1956), *কবি মধুসূদন* (১৯৫৭), *কবিতার কথা* (১৯৫৭), *সাহিত্যের কথা* (১৯৬৪), *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা* (১৯৬৮), *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে* (১৯৭০), *রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা* (১৯৭৪), *মধুসূদন : কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ* (১৯৭৫), *আধুনিক জার্মান সাহিত্য* (১৯৭৬), *সতত স্বাগত* (১৯৮৩), *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (১৯৮৩), *সরহ পার দোহাকোষ গীতি* (১৯৯৩), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ* (১৯৯৪), *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ* (১৯৯৬), *মৃগাবতী* (১৯৯৮), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৫)।

তিনি *পদ্মাবতী* (১৯৬৮), *মধুমালতী* (১৯৭২) ছাড়াও অনেক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদ মননধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বিশেষণ নিজস্ব এবং অবশ্যই সৃষ্টিধর্মী। বিশেষণে আছে নবতর যুক্তি ও সিদ্ধি। তাঁর শিল্প বিষয়ক আলোচনা বেশ মনোগ্রাহী। প্রধানত সমাজবিন্যাসের ভেতরে ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের বিবর্তন এবং সে অনুষঙ্গি ধারণায় সাহিত্যের নন্দনকে কার্যকরি করে তোলা—তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম দিক। ভাষা পেলব; দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় তা শৈল্পিক। ক্ষণে ক্ষণে কবিমন আচ্ছন্ন করতে চায় যুক্তিকে। তবে সব্যসাচীর দক্ষতায় প্রবন্ধের প্রকৃষ্টরূপ থাকে বহাল। *শিল্পীর সাধনা* (১৯৫৫), *সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু* (১৯৭৪), *নজরুল গবেষণা : ধারা ও প্রকৃতি* (১৯৯২), *মায়াকভস্কি ও নজরুল* (১৯৮৫), *রবীন্দ্র ক্ল্যাসিক আবিষ্কার* (১৯৮২), *সাহিত্য সমালোচনা* (১৯৮৯), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *সাহিত্য সমালোচনার ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত* (২০০০) তাঁর প্রবন্ধের বই।

আবদুল্লাহ আল-মুতী (১৯৩০-১৯৯৮)

প্রধানত বিজ্ঞান লেখক। কিশোরদের জন্য লিখেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর গ্রন্থ : *এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে* (১৯৫৫), *অবাক পৃথিবী* (১৯৫৫), *আবিষ্কারের নেশায়* (১৯৬৯), *রহস্যের শেষ নেই* (১৯৬৯), *বিজ্ঞান ও মানুষ* (১৯৭৫), *শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৫), *জানা অজানার দেশে* (১৯৭৬), *সাগরের রহস্যপুরী* (১৯৭৬), *আয় বৃষ্টি ঝেঁপে* (১৯৮০), *এ যুগের বিজ্ঞান* (১৯৮১), *মেঘ, বৃষ্টি রোদ* (১৯৮১), *ফুলের জন্য ভালবাসা* (১৯৮২), *সোনার এই দেশ* (১৯৮৩), *তারার দেশের হাতছানি* (১৯৮৪), *বিচিত্র বিজ্ঞান* (১৯৮৫), *বিপন্ন*

পরিবেশ (১৯৮৫), *প্রাণলোক : নতুন দিগন্ত* (১৯৮৬), *বিজ্ঞানের বিস্ময়* (১৯৮৬), *ছবিতে আমাদের পরিবেশ* (১মখণ্ড-১৯৮৭, ২য়খণ্ড-১৯৯০), *টেলিভিশনের কথা* (১৯৮৭), *বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা* (১৯৮৮), *কীটপতঙ্গের বিচিত্র কথা* (১৯৮৮), *কাজী মোতাহার হোসেন* (১৯৮৮), *বিজ্ঞান এগিয়ে চলে* (১৯৯১) প্রভৃতি। আবদুল্লাহ আল-মুতী উন্নতরুচির এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংস্কৃতিজ্ঞান ছিল উচ্চমানের। *স্বাধীনতা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৫) তাঁর অন্য গ্রন্থ।
আবদুলাহ আল-মুতীর সম্পাদনা গ্রন্থ *বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা* (১৯৮৮)।

আহমদ রফিক (জ. ১৯২৯)
প্রাবন্ধিক আহমদ রফিকের প্রবন্ধ ও গবেষণা প্রবন্ধ : *শিল্প সংস্কৃতি জীবন* (১৯৫৮)। এখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। ভাষা আন্দোলন নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : *নজরুল কাব্যে জীবন সাধনা* (১৯৫৮), *পদ্মাপারের সেই গাল্পিক যাদুকর* (১৯৭৬), *আরেক কালান্তরে* (১৯৭৭), *বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি* (১৯৮৬), *ছোটগল্প : পদ্মাপারের রবীন্দ্রগল্প* (১৯৮৭), *রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ* (১৯৮৭), *কেমন আছেন* (১৯৮৭), *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস* (১৯৮৭), *আদি মানবের সন্ধানে* (১৯৮৯), *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য* (১৯৯১), *এই অস্থির সময়* (১৯৯৬), *রবীন্দ্র চিত্রশিল্প* (১৯৯৬), *জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষণা* (১৯৯৭), *এই পৃথিবীর মানুষ* (১৯৯৭), *রবীন্দ্রভুবন পতিসর* (১৯৯৮), *চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিতা* (২০১৩)।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)
সত্যেন সেন আজীবন সংগ্রামী মানুষ। মানবতার পূজারী। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রবন্ধের বইগুলো গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস ও যুক্তিকে তিনি প্রোথিত করেন। তাঁর গ্রন্থ : *মহাবিদ্রোহের কাহিনী* (১৯৫৮), *বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রাম*, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, *বিশ্বমানবের মহাতীর্থে*, *মসলার যুদ্ধ* (১৩৭৫), *শহরের ইতিকথা* (১৩৮০ ব.), *মেহনতী মানুষ প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, *মানব সভ্যতার উষালগ্নে* (১৩৭৭), *অভিযাত্রী* (১৩৭৬) প্রভৃতি।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

বিভাগোত্তর বাংলাদেশে খ্যাতিমান চিন্তাবিদ, প্রবন্ধকার মুহম্মদ আবদুল হাই। মৌলিক রচনা ছাড়াও বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা, সংকলন প্রকাশ, ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন এবং ইতিহাস রচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯), *ভাষা ও সাহিত্য* (১৯৬০), '*A Phonetics and Phonological Study of Nassals and Nasalization in Bengali*' (১৯৬০), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৬৫) তাঁর গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাশৈলি সাবলীল; স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ নান্দনিক। তাঁর *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (১৯৬৪) ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক আকর গ্রন্থ। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* [আধুনিক যুগ] (১৯৫৬) সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে রচিত। এটি বহুল পরিচিত ইতিহাসগ্রন্থ। মুহম্মদ আবদুল হাই অনেক ইংরেজি প্রবন্ধও লিখেছেন। দেশ-বিদেশে স্বনামখ্যাত এ প্রাবন্ধিকের রচনাশৈলি অত্যন্ত সাবলীল এবং আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তি রচনার তিনি পথিকৃৎ।

মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩)
মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন মযহারুল ইসলাম। একাধারে তিনি ফোকলোর বিশেষজ্ঞও বটে। *কবি পাগলা কানাই* (১৯৫৯), *কবি হেয়াত মামুদ* (১৯৬১), *ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন* (১৯৬৭), *লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস* (১৯৭০), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (১৯৭৪), *সাহিত্যের পথে*, *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী* (১৯৮০), *ফোকলোর চর্চায় লোকতাত্ত্বিক বিশেষণ পদ্ধতি* (১৯৮২), *Social change and Folklore* (1985), *Folkiore : The Pulse of the People* (1984), *A History of Folk Collections in India and Pakistan* (1970) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)
মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত। *সংস্কৃতি কথা* (১৯৫৮) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের বই। সংস্কৃতির রুচিজ্ঞানকে অব্যর্থ যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। সংস্কৃতি কথা গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধই মূল্যবান। মননশীল চিন্তার স্মারক তাঁর রচনাপুঞ্জ।

নীলিমা ইব্রাহীম (১৯২১-২০০২)
মেধাবী গবেষক, গদ্যকার। অনেক রকমের প্রকাশনা, একদিকে সৃজনশীল অন্যদিকে গবেষণাধর্মী। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মননশীলতার বিষয়টি অমূলক নয়। নারী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুর্মর সাংগঠনিকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের বই : *শরৎপ্রতিভা* (১৯৬০), *বাংলার কবি মধুসূদন* (১৯৬১), *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক* (১৯৬৪), *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা* (১৯৭২), *বেগম রোকেয়া* (১৯৭৪), *বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৮৭), *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯১), *সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত : অতঃপর অমানিষার অন্ধকার* (১৯৯৫), *অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি* (১৯৯৫), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১ম খণ্ড ১৯৯৬, ২য় খণ্ড ১৯৯৭), *বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব* (১৯৯৬) প্রভৃতি।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)
লোকসাহিত্যের অধ্যয়ন, গবেষণা ও সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন নিবেদিতপ্রাণ এক বিরল সাধক। তিনি বিখ্যাত হারামণি (১-১০, ১৩ খণ্ড) সংকলনের জন্য। মনসুরউদ্দীনের মৌলিক গ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* । গ্রন্থটির প্রথমখণ্ড বের হয় ১৯৬০ সালে, পরিমার্জিত আকারে ১৯৬৫ সালে; দ্বিতীয়খণ্ডটি ১৩৭১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে ১৯৮১ তে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, কীর্তি ও সাধনার একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ।

কাজী আবদুল মান্নান (১৯৩০-১৯৯৪)
মনস্বী গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর পিএইচ. ডি. থিসিস *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (upto 1855)*। এছাড়া লিখেছেন, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (১৯৬১), *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (১৯৭০), *রবীন্দ্র নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৯), *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ* (১৯৯০)। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থ *মোশাররফ রচনা-সম্ভার* (পাঁচ খণ্ড) বের হয় ১৯৭৬, ১৯৮০ এবং ১৯৮৫ সালে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, দেশে-বিদেশে স্বনামে পরিচিতি পেয়েছিলেন এ অধ্যাপক। বাংলাদেশের গবেষণা-প্রবন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)
'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের পথিকৃৎ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ-এর উত্তরসূরি; কৃতি, মননশীল প্রাবন্ধিক আবদুল হক। আজীবন অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিশীল লেখক। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ

ক্রান্তিকাল (১৯৬২) ও *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৮৬)। এছাড়া লিখেছেন : *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *সাহিত্য ও স্বাধীনতা* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলন : আদিপর্ব* (১৯৭৬), *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৪)।

মোতাহার হোসেন সুফী (জ. ১৯৩২)
আবদুল্লাহ : উপন্যাস বিচার (১৯৬২), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৬৭), *সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দিন আহমদ* (১৯৮২), *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য* (১৯৮৬), *কাজী মোহাম্মদ ইদরিস* (১৯৮৯), *স্মরণীয় স্থান* (১৯৯০), *সংস্কৃতি : সংগ্রাম* (১৯৯১) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। গবেষণা-ধর্মী এসব লেখায় সুফী মোতাহার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)
গবেষক, কৃতী লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর কর্ম-পরিধি দূর পরিব্যাপ্ত। *আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র* (১৯৬২), *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৫), *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্* (১৯৬৯), *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ১৯৫৭-১৯২০* (১৯৭০), *বাংলা কবিতার ছন্দ* (১৯৭০), *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব* (১৯৭৪), *সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা* (১৯৭৮), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী* (১৯৭৮), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত* (১৯৮১), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস : ১৯২১-৮১* (১৯৮২), *রবীন্দ্রচেতনা* (১৯৮৪), *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত* (১৯৮৫), *ভাষা আন্দোলন : শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা* (১৯৯২), *মধুসূদন* (১৯৯৩), *নজরুলচেতনা* (১৯৯৬) প্রভৃতি। এছাড়া বেশকিছু অনুবাদ ও সম্পাদনাগ্রন্থ রয়েছে। সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর স্থান অনেক উচ্চ।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)
শহীদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মননশীল প্রাবন্ধিক। বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে গুণী প্রবন্ধকার ও সমালোচক। প্রবন্ধে রয়েছে যুক্তিনিষ্ঠতা ও প্রগতির স্বাক্ষর। তিনি একদিকে সাহিত্য অন্যদিকে সময়-স্বদেশ-সমাজ নিয়েও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষণের ও আগ্রহের কেন্দ্র। *রবি-পরিক্রমা* (১৯৬৩) রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সমাজ-হিন্দু-মুসলমান এসব বিষয়ে ব্যবহারিক ও বিশেষণাত্মক মূল্যায়ন। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র সমালোচনার ধারাটি বিবেচনায় এনে লেখকের স্বতন্ত্র অবস্থান ব্যাখ্যার চেষ্টা রয়েছে। *সাহিত্যের নবরূপায়ণ* (১৯৬৯) পূর্ব-বাংলার সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যায়নগ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ *বাংলা*

বানান ও লিপি সংস্কার (১৩৬৮ ব.), *রঙিন আখর* (১৩৭০ ব.), *Colloqual Bengali* (1963)। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ভাষা বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ এবং সম্পাদনা গ্রন্থও রয়েছে।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)
প্রাবন্ধিক আনোয়ার পাশা সাহিত্য-সমালোচনাতেই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। *রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৭০ এবং ১৩৮৫ সালে। বিশ্লেষণাত্মক এ গ্রন্থটি তাঁর উলেখযোগ্য কীর্তি। এছাড়া আনোয়ার পাশার প্রবন্ধগ্রন্থ *সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল* (১৯৬৭)। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আনোয়ার পাশা রচনাবলী* (প্রথমখণ্ড ১৯৮১, দ্বিতীয়খণ্ড ১৯৮৩, তৃতীয়খণ্ড ১৯৮৭) বেরিয়েছে। সেখানে আনোয়ার পাশার নানা সময়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রথিত রয়েছে। এছাড়া মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) সহযোগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাব্যের সম্পাদনাও করেছেন আনোয়ার পাশা।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুউল্লাহ (১৯৩৬-২০১৩)
গবেষণা-প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্। তাঁর প্রবন্ধ : *নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৬৩), *মধুসূদন–রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৭), *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (১৯৬৫), *সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা* (১৯৭০), *নজরুল কাব্যের স্বরূপ* (১৯৭৪), *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (১৯৭৮), *কবিতা ও প্রসঙ্গকথা* (১৯৭৫), *সাহিত্যের রূপকার* (১৯৮১), *বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন* (১৯৮০), *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (১৯৮২), *বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষাপ্রীতি* (১৯৮০), *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন* (১৯৮৩), *প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার ইতিবৃত্ত*, *ভাষা আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন*, *বাংলা কাব্যে স্বদেশপ্রেম*, *রেনেসাঁর কথা*।
জীবনী : *গোলাম মোস্তফা* (১৯৮৭), *সুফী মোতাহার হোসেন* (১৯৮৮) এছাড়া কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন।

আবু জাফর শামসুদ্‌দীন (১৯১১-১৯৮৮)
বাস্তববাদী ও মননশীল বুদ্ধিজীবী আবু জাফর শামসুদ্‌দীন ধ্রুপদী মানের প্রবন্ধ লিখেছেন। *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্য* (১৯৬৪), *Sciology of bengal politics* (১৯৭৩), *সোচ্চার উচ্চারণ* (১৯৭৭), *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (১৯৭৯), *মধ্যপ্রাচ্য ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি* (১৯৮৫), *সোভিয়েট দেশে মুসলিম জীবন* (১৯৮৬), *লোকায়ত সমাজ ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি* (১৯৮৮),

বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা (১৯৮৯)। আর্থ-সমাজ-রাষ্ট্রের সমস্যাকে প্রাবন্ধিক সামগ্রিক ও সঙ্গত প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক ও বিবর্তিত সমাজ দর্শনকে আলোচনায় যৌক্তিক করে তোলেন। ফলে আবু জাফর শামসুদ্দীনের তত্ত্বচিন্তা বায়বীয় না হয়ে একেবারে মর্মের সত্য হয়ে ওঠে। সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস বাস্তবতার নিরিখে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬)
দ্যুতিময় প্রবন্ধকার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। প্রগতিবাদী ও জননন্দিত বুদ্ধিজীবী। তাঁর দর্শন মার্কসবাদী, কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য সেখানে তেমন প্রবল নয়। লেখায় আছে সমকাল মনস্কতা, সমস্ত কল্যাণকর ব্রতের নির্দেশনা, আত্মসামলোচনার আদেশ। তবে পুঁজিবাদ, সামরিকতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্মবিপরীতে চাবুক ফেলেন তিনি। এমন বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধশৈলিটি হয়ে ওঠে শাণিত, বৈদগ্ধ্য এবং রম্যরসজারিত। অসামান্য ভঙ্গিটিতে অর্জিত হয় সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ এবং পরিতৃপ্ত কৌতুকআমোদ। যেটা যুক্তির ভেতর দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছায়। এ প্রবন্ধের সাহিত্যগুণ সরস, স্পর্শকাতর এবং বহুকৌণিক। এভাবে বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় তিনি হয়ে ওঠেন অনিবার্য। *অন্বেষণ* (১৯৬৪), *দ্বিতীয় ভুবন* (১৯৭২), *নিরাশ্রয় গৃহী* (১৯৭৪), *অনতিক্রান্ত বৃত্ত* (১৯৭৬), *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক* (১৯৬৯), *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ* (১৯৭৮), *অন্বেষণ* (১৯৬৪), *তাকিয়ে দেখি* (১৯৭৪), *আরণ্যক দৃশ্যাবলী* (১৯৭৪), *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি* (১৯৮১), *আমার পিতার মুখ* (১৯৭৬), *মুখোশ ও মুখশ্রী* (১৯৮৫), *আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ* (১৯৮৫), *স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়* (১৯৮৮), *বাঙালীকে কে বাঁচাবে* (১৯৯১), *বৃত্তের ভাঙা-গড়া* (১৯৮৯), *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ* (২০০০), *কুমুর বন্ধন* (১৯৭৭), *রাষ্ট্র ও কল্পলোক* (১৯৯১), *উপরকাঠামোর ভেতরেই* (১৯৮৪), *বেকনের মৌমাছিরা* (১৯৭৮), *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি* (১৯৭৯), *একই সমতলে* (১৯৮০), *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ* (১৯৮০), *বাঙালী কাকে বলি* (১৯৮৮), *টলস্টয় অনেক প্রসঙ্গের কয়েকটি* (১৯৮৫), *নেতা, জনতা ও রাজনীতি* (১৯৮৮), *গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে* (১৯৯১), *শেষ মীমাংসার আগে* (১৯৮৮), *উদ্যানে ও উদ্যানের বাইরে* (১৯৮৯), *শ্রেণী, সময় ও সাহিত্য* (১৯৯০), *স্বপ্নের আলোছায়া* (১৯৯১), *কেউ বলে বৃক্ষ, কেউ বলে নদী* (১৯৯০), *দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য মিথ্যা* (১৯৯২), *লেনিন কেন জরুরি* (১৯৯২), *আপনজন* (১৯৯৪), *অপরিচিত নায়ক পরিচিত দুর্বৃত্ত* (১৯৯২), *বাঙালীর জয়-পরাজয়* (১৯৯৪), *লিঙ্কনের বিষণ্ন মুখ* (১৯৯৪), *এর পথ ওর প্রাচীর* (১৯৯৫), *ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি* (১৯৯৫), *মাঝখানের মানুষেরা* (১৯৯৫), *দুই বাঙালীর*

লাহোর যাত্রা (১৯৯৬), *পতঙ্গ ভৃত্য ও দৈত্য (১৯৯৬)*, *রাষ্ট্রের মালিকানা* (১৯৯৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০০০), *শেক্সপীয়রের মেয়েরা* (২০০৪), *প্রভুর যত ইচ্ছা* (২০০৫), *বিচ্ছিন্নতার সত্য-মিথ্যা* (২০০৮), *রাষ্ট্রতন্ত্রে সমাজদ্রোহিতা* (২০১৩) প্রভৃতি গ্রন্থে আর্থ-সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রত্ন-ইতিহাস, ধর্মবীক্ষা, মানব সম্বন্ধসূত্র সাবলীল ব্যাখ্যাত হয়। বস্তুত বাঙালি মধ্যবিত্তের দিকেই তাঁর শাণিত বাণ নিক্ষিপ্ত। লেখকের সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ *শ্রেণী সময় ও সাহিত্য* (১৯৮৬)। এছাড়া আত্মজৈবনিক রচনা *আমার পিতার মুখ* (১৯৮০)। অদ্যাবধি এ প্রবন্ধকার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তাশীল নানা প্রবন্ধ লিখে চলেছেন।

আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭)
বাংলা সাহিত্যের মনস্বী অধ্যাপক। অনেক গ্রন্থ প্রণয়নে ও সম্পাদনায় অদ্যাবধি ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে। গবেষণায় আনিসুজ্জামান পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্রজ্ঞা ও মেধার সমন্বয়ে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ উচ্চমানস্পর্শী। এছাড়া নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায় তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৭৫), *স্বরূপের সন্ধানে* (১৯৬৯), *Social Aspects of Endogenous Intelectual Creativity* (1979), *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the official Library and Records* (1981), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ* (১৯৮৩), *পুরনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী* (১৯৮৮), *Creativity, Reality & Identity*, *Cultural Pluralism* (১৯৯৩), *Identity, Religion and Recent History* (1995) প্রভৃতি। তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থ : *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৮), *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ* (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, ১৯৬৮), *দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ* (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, ১৯৬৮), *Cultural thought* (আনোয়ার আবদেল-মালেক সহযোগে, ১৯৮৩), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* ১-৪ খণ্ড (১৯৮২-১৯৮৬), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (অন্যদের সহযোগে, ১৯৯৩), *অজিতগুহ স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯০), *স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন* (১৯৯২), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯৩), *নজরুল রচনাবলী* ১-৪ খণ্ড (১৯৯৪-১৯৯৫), *নারীর কথা* (মালেকা বেগম সহযোগে, ১৯৯৪), *ফতোয়া* (অন্যদের সহযোগে ১৯৭৭), *মধুদা* (অন্যদের সহযোগে, ১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০০৭) প্রভৃতি। বিচিত্ররকম প্রবন্ধ লিখেছেন আনিসুজ্জামান। প্রগতিমনস্ক, সত্যাসন্ধ এ প্রাবন্ধিক এক মহীরুহ ব্যক্তিত্বে পরিণত। অনুসরণীয় এ প্রাবন্ধকার সম্প্রতি আত্মস্মৃতিমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে

চলেছেন। তাঁর প্রবন্ধ স্বচ্ছচিন্তার এবং স্বয়ংভূ-মাত্রাসঞ্চারী। একজন অভিজ্ঞ সাংস্কৃতিক কর্মীও বলা চলে তাঁকে। ২০০৬-এ বেরিয়েছে *চার দশকের প্রবন্ধ*।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)
গবেষণা ও সমালোচনা গ্রন্থে মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যরুচি অদ্যাবধি সর্বজনবিদিত। *মীর-মানস* (১৯৬৫)-এ লেখক মীর মশাররফ আর শিল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী মশাররফকে কাটাছেঁড়ায় নেমেছেন। যুক্তিতে-বিশেষণে; সঙ্গত-সসম্ভ্রমে মশাররফের চিত্তদ্বন্দ্ব চিহ্নিত করেছেন। উঠে এসেছে সমাজ-সংস্কৃতি-আচার-সংস্কার; নতুন তথ্যে ও ভাষ্যে। মশাররফ আলোচনায় দিক্ উন্মোচনকারি এ গ্রন্থটি গবেষণা ও সমালোচনা সাহিত্যে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। মুনীর চৌধুরীর *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯) ও *বাঙলা গদ্যরীতি* (১৯৭০) অন্যতম গ্রন্থ। গদ্যের রীতি-প্রকৃতি, ভাষাতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা, বাংলা লিপি-বানান ইত্যাকার বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থটি। পূর্ব-বাংলায় বাংলাভাষার চর্চা-সমৃদ্ধি-নিরীক্ষা এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থটি।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)
আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫) হাসান হাফিজুর রহমানের অনবদ্য কবিতা আলোচনা গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে আধুনিক কবিতা রূপরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবেগবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ এ প্রবন্ধগ্রন্থটি বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার আলোচনায় অমূল্য সম্পদ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *মূল্যবোধের জন্য* (১৯৭০), *সাহিত্য-প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *আলোকিত গহ্বর* (১৯৭৭)। *প্রবন্ধসমগ্র* (২০০৫)র মধ্যে *অগ্রন্থিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ*ও সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালি চেতনা ও মননপিপাসার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর এসব প্রবন্ধে। সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনায় জিজ্ঞাসা যেমন আছে তেমনি আছে তার যুক্তিনিষ্ঠ নিষ্পত্তির চেষ্টা। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সর্বাধুনিক জাতি গঠনে হাসান হাফিজুর রহমান বিচিত্র তত্ত্ব ও দর্শনের সমন্বয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এসব প্রবন্ধে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির প্ররোচনা তৈরি হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে—যেমনটা শানিত বুদ্ধির ভেতর দিয়ে তাঁর তর্কের ও যুক্তির ঘটেছে মূল্যায়ন-নির্ভর মীমাংসা। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হন তিনি। প্রাবন্ধিকের মধ্যে কবিবুদ্ধির প্রভাব মাঝেমধ্যে মিললেও এক রকমের পরিশুদ্ধ বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতাই লেখায় সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান শুধু সাহিত্য আলোচনামূলক প্রবন্ধই লেখেননি নিখাদ মননধর্মী প্রবন্ধ লিখেও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উলেখযোগ্য এবং মূল্যবান সম্পাদনা *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র* (১৬

খণ্ডে), *একুশে ফেব্রুয়ারি* (২০০৩) প্রভৃতি। *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র* রচনায় তাঁর রচনাটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তথা আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-২০১১)
গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেছেন কাজী দীন মুহম্মদ। বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়ে তিনি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে তাঁর রচনায় ইসলামী ভাবাবেগ ও মনস্কতা যুক্তির কেন্দ্রে থাকে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গ্রন্থসমূহ : *সাহিত্য সম্ভার* (১৯৬৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* [প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ড] (১৯৬৮), *সেকালের সাহিত্য* (১৯৬৯), *সাহিত্য ও আদর্শ* (১৯৭০), *সাহিত্য শিল্প* (১৯৬৯), *পাকিস্তানী সংস্কৃতি* (১৯৬৯), *ইসলামী সংস্কৃতি* (১৯৭০), *মানব জীবন* (১৯৭০), *সুফীবাদের গোড়ার কথা* (১৯৮০), *ভাষাতত্ত্ব* (১৯৭১), *জীবন সৌন্দর্য* (১৯৮৯), *প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা* (১৯৮২), *বর্ণমালা* (১৯৮৪), *সুখের লাগিয়া* (১৯৮৯), *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব* (১৯৯০), *আল কাওসার* (১৯৯১), *নাস্তিকতা ও আস্তিকতা* (১৯৯১) প্রভৃতি। কাজী দীন মুহম্মদের কিছুগ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন।

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ও পুনর্গঠনে প্রায় একক ও অবিসংবাদিত অবদান রেখেছেন আহমদ শরীফ। তাঁর রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড) (১৯৭৮) ও *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড) (১৯৮৩) আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, দার্শনিক দৃষ্টিচেতনায় বিশেষিত ও মূল্যায়নে পুনর্গঠিত। আহমদ শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) সম্পাদনা ও পরিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত যেমন করেছেন তেমনি অনালোচিত ও অবিদিত প্রসঙ্গকেও পরিপূরক ব্যাখ্যা করেছেন। এরূপে তা হয়েছে পূর্ণায়ত এবং পটভূমিতে সুনির্দিষ্ট। আহমদ শরীফের ইতিহাসমূলক এ সাহিত্যগবেষণা শুধু ধারা বর্ণনা নয়, যৌক্তিক ও সামূহিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণিত। এটাই তাঁর বিশেষত্ব। এছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদনার ভেতর দিয়ে অনেক অনালোকিত অধ্যায়ের আবিষ্কার ও অনুসন্ধান তিনি করেছেন। আহমদ শরীফের প্রত্যেকটি সম্পাদনার বিষয়গুরুত্ব অনেক মূল্যবান। তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থের প্রত্যেকটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* (১৯৭২), *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (১৯৭৭), *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য* (১৯৮৫), *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ* (১৯৮৭) তাঁর অসামান্য গবেষণাকর্ম।

মননশীল গ্রন্থে আহমদ শরীফ উদার ও মুক্তচিন্তায় সমাজ-নৃতত্ত্ব-ইতিহাস-ধর্ম-দর্শনকে বিচিত্ররূপে, পরিশুদ্ধ রুচিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি উদার ও মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর বিচিত্র রকম চিন্তার গ্রন্থ রয়েছে। *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (১৯৬৯), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে* (১৯৭০), *যুগ-যন্ত্রণা* (১৯৭৪), *কালিক ভাবনা* (১৯৭৪), *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (১৯৭৯), *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫), *বাঙলা ভাষাসংস্কার আন্দোলন* (১৯৮৬), *ইদানীং আমরা* (১৯৮৬), *এবং আরো ইত্যাদি* (১৯৮৭), *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা* (১৯৮৭), *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি* (১৯৮৯), *একালে নজরুল* (১৯৯০), *বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র* (১৯৯০), *মানবতা ও গণমুক্তি* (১৯৯০), *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা* (১৯৯১), *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা* (১৯৯১), *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালিত্ব* (১৯৯২), *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন* (১৯৯২), *সংস্কৃতি* (১৯৯২), *শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি* (১৯৯৩), *সংকট : জীবনে ও মননে* (১৯৯৩), *মুক্তি নিহিত : নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়* (১৯৯৩), *প্রগতির বাধা ও পন্থা* (১৯৯৪), *এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা* (১৯৯৪), *সময়, সমাজ, মানুষ* (১৯৯৫), *দেশ কাল জীবনের দাবী ও সাক্ষ্য* (১৯৯৫), *স্বদেশচিন্তা* (১৯৯৭), *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা* (১৯৯৭), *উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা* (১৯৯৮), *মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ* (১৯৯৮), *স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র* (১৯৯৮), *বিশ শতকের বাঙালী* (১৯৯৮), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *বিশ্বাসবাদ, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, মৌলবাদ* (২০০০), *কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়* (২০০০), *কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা* (২০০০), *নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে* (২০০৪), *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাংলা* (২০০৪) বিবিধ বিষয়ের মুক্তচিন্তার গ্রন্থ।

গোলাম মুরশিদ (জ. ১৯৪০)

গবেষক, প্রাবন্ধিক গোলাম মুরশিদ। তাঁর ভাষা সাবলীল, তৎসম শব্দের ব্যবহারে ভাষাকে অহেতুক ভারী করে তোলেন না। এর একটা কারণ বোধকরি প্রায় দুদশক তাঁর সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে সংযুক্তি। জটিল সব ভাষ্যকে অনায়াসে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন তিনি। এতে থাকে না কোনো ক্লান্তি। তবে দীর্ঘ সময়ে গোলাম মুরশিদের লেখায়, চিন্তায়, পাঠ-অভিজ্ঞতায় ঘটেছে পর্বান্তর। এ পর্বান্তর লক্ষণীয়, প্রথমদিকের গবেষণা গ্রন্থগুলো, এবং *আশার ছলনে ভুলির* পরের লেখায়। তাঁর গ্রন্থ : *বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক* (১৯৬৮), *বিদ্যাসাগর* (১৯৭০), *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization* (1983),

রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা (১৯৮১), *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব* (১৯৮৪), *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া* (১৯৮৫), *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (১৮৫৪-১৮৭৬) (১৯৮৫), *কালান্তরে বাংলা গদ্য : ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্য* (১৯৯৩), *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর* (১৯৯৪), *আশার ছলনে ভুলি* (১৯৯৫), *যখন পলাতক : মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (১৯৯৩), *উজান স্রোতে বাংলাদেশ*, *স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি*, *Lured by Hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt* (2003), *The Heart of a Rebel poet : Letters of Michael Madhusudan Dutt* (2003), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (২০০৬), *কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* (২০০৮)। এছাড়া হাসান মুরশিদ ছদ্মনামে ১৯৭১ সালে তিনি লিখেছেন *স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি*। লন্ডন থেকে বেরিয়েছে *Bengali-English-Bengali Dictionary* (1988)।

সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ : *বিদ্যাসাগর*।

এছাড়া বাংলা একাডেমি প্রণীত বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (২০১৪)র সম্পাদনা করেছেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (জ. ১৯২৭)

মননশীল বুদ্ধিজীবী। বাংলা সাহিত্যের নিরলস গবেষক। মুক্তবুদ্ধির নিরত সাধক, কর্মী। অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন আছে যাবতীয় কর্মকাণ্ডে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মননশীল গদ্যেও একটা শৈলি আয়ত্ব করেছেন তিনি। তাঁর কথনভঙ্গিটি প্রবন্ধসাহিত্যে ভিন্নমাত্রার জন্ম দিয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের গবেষক হিসেবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এ পর্যায়ের গ্রন্থ : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮), *নজরুল ইসলাম* (১৯৮৩), *বাংলদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা* (১৯৬৯), *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা* (১৯৭০), *Bengali Muslim Public Opinion* (1976), *উচ্চ শিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ* (১৯৭৬), *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (১৯৭৭), *সমকালে নজরুল ইসলাম* (১৯৮৩), *আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন* (১৯৮৪), *আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ* (১৯৯৪), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৪) প্রভৃতি। এছাড়া সম্পাদনা প্রবন্ধগ্রন্থ : *বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (১৯৯০), *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯১), *আবহমান বাংলা* (১৯৯৩), *সেরা সুন্দরম* (২০০৪)।

রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪)
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। নজরুল বিশেষজ্ঞ ও লেখক। *নজরুল নির্দেশিকা* (১৯৬৯), *ভাষাতত্ত্ব* (১৯৭০), *An Introduction to Calloquial Bengali* (1970), *নজরুল জীবনী* (১৯৭২), *বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা* (১৯৭৩), *ঢাকার কথা* (১৯৮২), *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা* (১৯৯১), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৮২), *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার* (১৯৮২), *বাংলা ভাষা আন্দোলন* (১৯৮৪), *শহীদ মিনার* (১৯৮৬), *আব্দুল কাদির* (১৯৮৭), *আমাদের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯০), *ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৩), *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* (১৯৯৭), *নজরুল প্রসঙ্গে* (১৯৯৭), *বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৯৭), *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী* (১৯৯৮) প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬)
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ও শিল্প-সাহিত্যের সমালোচক। কবি হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। সাহিত্যের প্রগতিবাদী ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁর মননধর্ম আকর্ষণীয়। শিল্পকলা বা সাহিত্য-আন্দোলনের অনেক বিষয়কে তিনি বাংলাদেশে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য বিশেষণে এনেছেন নতুন রুচি ও জিজ্ঞাসা। ভাষাভঙ্গি উজ্জ্বল। তাঁর সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ : *স্বদেশ ও সাহিত্য* (১৯৬৯), *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশ*, *জার্নাল ৭১* (১৯৭২), *শ্রাবণে আশ্বিনে* (১৯৭৫), *বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ* (১৯৭৮), *বাংলাদেশের লোকশিল্প* (১৯৮২), *নিস্তব্ধতার সংস্কৃতি* (১৯৮৩), *বাংলাদেশের গ্রাম* (১৯৮৪), *শিল্পকলার ইতিহাস* (১৯৮৫), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ সাহিত্যে রাজনীতিতে* (১৯৮৭), *কামরুল হাসান* (১৯৯১), *এক অনিশ্চিত বসন্তের কাল* (১৯৯১), *বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণীসংগ্রাম* (১৯৯৩), *রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা* (১৯৯৫), *প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে* (১৯৯৬), *জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা* (১৯৯৬), *অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৯৬), *শাহাবুদ্দীন* (১৯৯৭), *আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা* (১৯৯৭), *জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিকতা* (১৯৯৭), *হত্যার রাজনীতি ও বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা* (২০০০), *The Quest of Zainul Abedin*, *Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh*, *Rural Society, Power Structure and Class Practice*, *মাইকেলের জাগরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* প্রভৃতির লেখক।

সৈয়দ আকরম হোসেন (জ. ১৯৪৪)
গবেষণা-প্রবন্ধে নতুন রীতিপদ্ধতির প্রবর্তক, চিন্তায় স্বতন্ত্র সম্ভাবনার দিকনির্দেশক সৈয়দ আকরম হোসেন। ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণা-পদ্ধতি অনেকের নিকট সমাদর পেয়েছে। তাঁর গবেষণার যুক্তি-উপস্থাপন, বিষয়-বিশেষণ আর উদ্দেশ্যে পৌঁছার পাঠ খুবই প্রাঞ্জল এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে লেখকের পিএইচ. ডি. গবেষণা *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ* (১৯৬৯) একটি দৃষ্টান্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য* (১৯৯৭) গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আকরম হোসেনের জীবনীগ্রন্থ : *এস. ওয়াজেদ আলী* (১৯৮৭), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (১৯৮৮), *আবদুর রাজ্জাক* (১৯৯০)। সম্পাদনা করেছেন বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী* (১৯৮৬)।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (জ. ১৯৩৩)
ভাষা ও ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ, সাহিত্য সমালোচক। গ্রন্থ রচনায় মোহাম্মদ আবদুল কাইউম যত্নবান। তাঁর *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা* (১৯৭০), *A Critical Study of Early Bengali Grammars : Halhed to Haughton* (1983), *চকবাজারের কেতাবপট্টি* (১৯৯১), *উনিশ শতকের ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতি* (১৯৯১), *অভিধান* (১৯৮৭), *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা : সমকালের দর্পণে* (১৯৯১), *নানা প্রসঙ্গে নজরুল* (২০০২) প্রভৃতি গ্রন্থ।
জীবনী : *মুহম্মদ এনামুল হক* (১৯৮৭), *খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ* (১৯৮৯), *কাজী ইমদাদুল হক* (১৯৯৩)। এছাড়া তাঁর সম্পাদনাগ্রন্থ : আর্জুমন্দ আলীর *প্রেমদর্পণ*, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (১মখণ্ড-১৯৮৯, ২য়খণ্ড-১৯৯১, ৩য়খণ্ড-১৯৯৩), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যক প্রসঙ্গ* (১৯৯২), *সাময়িকপত্র রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : ঢাকা প্রসঙ্গ* (১৯৯২), আলাওল বিরচিত *সতী-ময়না ও লোর চন্দ্রানী* (১৯৯২), *মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদ-সিন্ধু* (১৯৯১) প্রভৃতি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)
আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মূল্যবান প্রতিভা। এমন নিবিড়-মনস্ক লেখক বিরল বলা চলে। অনেক গ্রন্থ প্রণেতা, প্রচুর কাজ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি অনিবার্য হয়ে উঠেছেন। বোধের উচ্চতায়, সাহিত্যের বিশেষণে, তার যুক্তিকে করেন সম্প্রসারিত। এজন্য তাঁর পাঠ-অভিজ্ঞতা, আন্তর্পাঠ যেমন আছে তেমনি নিবিড় পরিশীলন ও যত্নে অনবদ্য করে

তোলেন দীক্ষিত চেতনাকে। কয়েক দশকের এ কার্যক্রমে তিনি এতটুকু অস্থির নন। আবদুল মান্নান সৈয়দ একাধারে সৃজনশীল সাহিত্যিকও বটে। বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক সমন্বিত চিন্তার আধার আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রন্থ *শুদ্ধতম কবি* (১৯৭০), *জীবনানন্দ দাশের কবিতা* (১৯৭৪), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (প্রথম খণ্ড ১৯৭৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৭), *নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা* (১৯৭৭), *করতলে মহাদেশ* (১৯৭৯), *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা* (১৯৮০), *বেগম রোকেয়া* (১৯৮৩), *আমার বিশ্বাস* (১৯৮৪), *ছন্দ* (১৯৮৫), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (১৯৮৬), *নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর* (১৯৮৭), *চেতনায় জল পড়ে পাতা নড়ে* (১৯৮৯), *পুনর্বিবেচনা* (১৯৯০), *দরোজার পর দরোজা* (১৯৯১), *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৩), *বিবেচনা পুনর্বিবেচনা* (১৯৯৪) প্রভৃতি। এছাড়া প্রায় অর্ধশত ভূমিকা সম্বলিত সম্পাদনাগ্রন্থ লিখেছেন।

রনেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)
মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক। সমাজ-অনুসন্ধিৎসু সমালোচক। বস্তুর পরিবর্তন-রূপান্তরধর্মকে পরীক্ষায় এনে শিল্পজগতকে চিহ্নিত করেন। গদ্যশৈলি অনবদ্য। তাঁর প্রবন্ধের বই *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৩৬৬), *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে* (১৩৭৩), *ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম* (১৯৭২), *আলো দিয়ে আলো জ্বালা* (১৯৭০), *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ* (১৯৮৬)। নেরুদা, লুকাচ কিংবা টলস্টয়-দস্তভস্কির দৃষ্টিকোণের অনুসরণ করে স্বকীয়তা বজায় রাখেন তাঁর প্রবন্ধে। তথ্যমূলক লেখা, সেখানে জীবনের বাস্তব ও প্রগতির দর্শন পরিস্রুত হয় তাঁর লেখায়। 'জনতাই আমাকে শিখিয়েছে, ঋত্বিক কি বস্তু। এমন একটা সময় ছিল যখন আমি জনতার কাছে যেতুম কবির সহজাত ভীরুতা নিয়ে, নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট লাজুকতা নিয়ে। কিন্তু একবার জনতায় ডুব দিলে আমার রূপান্তর ঘটে যায়'—এরূপে তাঁর বক্তব্য বিরচিত, সমর্থন নিজের, কিন্তু কায়েম নেরুদা। এমনটাই রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ। বাংলাদেশের সাহিত্যে সমাজ ভিত্তির দর্শন তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এজন্য শুধু এদেশের লেখক নয় তাবৎ বিশ্বের লেখকদের চেতনাকে একীকৃত করেছেন এবং যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনটাই তাঁর মননবৈশিষ্ট্য।

বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯৩১)
মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, লেখক বদরুদ্দীন উমর। তিনি মূলত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সংস্কৃতি, শ্রেণিচেতনা, কৃষক আন্দোলন ও সমস্যা, জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের যুক্তি ও বিশেষণ মনোগ্রাহী। বদরুদ্দীন উমরের সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বহ কাজ পূর্ব-

বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। এটি বাঙালির ভাষা আন্দোলন বিষয়ক একটি আকর (authentic) পুস্তক। লেখকের এ 'ভাষা' গ্রন্থটি যেন অনেকটা উপন্যাসতুল্য দৃশ্যপটে চিত্রিত মনে হয়। তাঁর অন্য প্রবন্ধগ্রন্থ : *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭), *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৮), *পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বঙ্গদেশের কৃষক* (১৯৭২), *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* (১৯৭৪), *বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা* (১৯৭৪), *যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ* (১৯৭৬), *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮০), *বাঙলাদেশে মার্কসবাদ* (১৯৮১), *বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক* (১৯৮৭), *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন* (১৯৮৪), *মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল* (১ম খণ্ড ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ১৯৮৫), *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, *বাঙলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা*, *বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, *বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি*, *সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি*, *পাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা*, *বিপব ও প্রতিবিপব*, *ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে*, *নব্বইয়ের নাগরিক বুর্জোয়া অভ্যুত্থান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র*, *মুক্তি কোন পথে?*, *আমাদের ভাষার লড়াই*, *বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র*, *বাঙলাদেশে দুর্নীতি সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য*, *সাম্রাজ্যবাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা*, *বাঙলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি*, *বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির দুই রূপ*, *বামপন্থি মহলে অনৈক্য ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রসঙ্গে*, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, *গণ আদালত একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের জের*, *Society and Politics in East Pakistan* (1973), *Politics and Society in Bangladesh*, *Towards the Emergency in Bangladesh*, *General Crisis Bourgeoisic*, *আমাদের সময়কার জীবন*, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশের কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, *বাঙলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, *বিবিধ প্রসঙ্গ*, *সাক্ষাৎকার*, *জনগণের হাতে ক্ষমতা—নির্বাচন না অভ্যুত্থান*, *প্রতিবিপব ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, *বাঙলাদেশের বামপন্থিরা*, *সংসদীয় রাজনীতি জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (২০০৪)। এমন অনেক গ্রন্থের ভেতর দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মননচিন্তায় ধারায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। মানবতাবাদী এ প্রাবন্ধকারের লেখায় যুক্তির সামর্থ্যটি আকর্ষণীয়।

হায়াৎ মামুদ (জ. ১৯৩৯)

মননশীল প্রাবন্ধিক ও গবেষক। পাঠ-অভিজ্ঞতা প্রচুর। বাংলাদেশের সাহিত্য সমালোচনায় হায়াৎ মামুদ বিশিষ্ট বলা চলে। সম্প্রতি তাঁর সত্তরতম জন্মদিবসে *প্রবন্ধসমগ্র* (২০০৮) বেরিয়েছে। রুশ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ব্যাকরণের অন্ধিসন্ধি, সম্পাদনা—এমন অনেক কাজ করেছেন হায়াৎ মামুদ। তাঁর প্রবন্ধ ভারিক্কী, মননচিন্তাধর্মী, বিশেষণাত্মক। মার্কসীয় ভাবচেতনা থাকলেও শিল্পবীক্ষণে তার মাত্রানুগ প্রয়োগই ঘটান তিনি। উইট আছে তাঁর লেখায়—যেমনটা সচরাচর অনেকের মধ্যে দূরান্বয়ী, নিবিড় ভঙ্গিতে সময় ও সমাজের বিন্দুতে ব্যক্তিত্বকে অনুসন্ধান করেন। তখন ঐ ব্যক্তিত্বের সাহিত্যও নিপুণ যুক্তি পায় হায়াৎ মামুদের তীক্ষ্ণধী দৃষ্টিচেতনায়। আবহমান বাংলা ও বাঙালির জাতিত্বচেতনা একটা দায় ও ইতিহাসের ইঙ্গিতে তাঁর নিকট যথার্থ মূল্য পায়। অন্তর্বয়নে স্বাতন্ত্র্য এ লেখকের অনেক গ্রন্থ। নানাধর্মী রচনার মধ্যে *স্বগত সংলাপ* (১৯৬৭), *মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা* (১৯৬৮), *প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি*, *বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই* (১৯৮৪), *বাংলাদেশের মাতৃভাষার অধিকার* (১৯৮৬), *সোমেন চন্দ* (১৯৮৭), *সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গান্তর* (১৯৮৮), *প্রতিভার খেলা নজরুল* (১৯৮৮), *দিনযাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ* (১৯৯৮), *গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদফ* (১৯৮৫), *ভ্রমি বিস্ময়ে* (১৯৮৯), *অবহেলিত ধ্রুবপদ ও কিন্নর দল* (১৯৯১), *নষ্ট বঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রব্রজ্যা* (১৯৯৪), *উৎসে ফেরার ছলচাতুরি* (১৯৯৬), *সাহিত্য : কালের মাত্রা* (২০০৩); তাঁর ব্যাকরণ বিষয়ক বই *বাংলা লেখার নিয়ম*, *মাতৃভাষায় ব্যাকরণ*। হায়াৎ মামুদ শিশুসাহিত্য নিয়ে তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখেছেন যেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *উৎসে ফেরার ছলচাতুরি* প্রবন্ধগ্রন্থে।

হায়াৎ মামুদের আত্মধর্মী গ্রন্থ : *অবহেলিত ধ্রুবপদ ও কিন্নরদল* (১৯৯১)।

সম্পাদনা : *ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ*, *তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ*, *সত্যেন সেন রচনাসমগ্র* (যৌথ), *ভাষা আন্দোলনের পটভূমি* গ্রন্থমালা (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৫), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৬), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* (১৯৯৬), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (উপন্যাসসমগ্র নাটকসমগ্র গল্পসমগ্র) (১৯৯৬)

জীবনী : *সোমেন চন্দ*, *সিকান্দার আবু জাফর* (১৯৮৮), *আহমদ মীর* (১৯৮৯), *আবু জাফর শামসুদ্দীন* (১৯৯০), *লিয়েফ তলোস্তয়* (১৯৯১)।

আবদুশ শাকুর (১৯৪১-২০১৩)

মহামহিম রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৭), *সঙ্গীত সংবিৎ* (১৯৯৭), *গোলাপ সংগ্রহ* (২০০৪), *সংগীত সংগীত* (২০০৫), *মহান শ্রোতা* (২০০৬), *ভাষা ও সাহিত্য* (২০০৬),

রবীন্দ্রজীবনের অনুজ্জ্বল অঞ্চল (২০১৩) আবদুশ শাকুরের উল্লেখনীয় প্রবন্ধের বই। সম্পাদনার কাজও করেছেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা রবীন্দ্রজীবনীর দুটো খণ্ডের প্রকাশ। রবীন্দ্র জীবনীর প্রথম খণ্ডের উপজীব্য 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারশত বছরের সামাজিক সাংস্কৃতিক বংশগতিসহ আর্থিক, পারিবারিক ও প্রাতিস্বিক পর্বের বিস্তৃত বিবরণ।' আবদুশ শাকুর লিখেছেন : 'রবীন্দ্রজীবনীর-এর প্রথম খণ্ডে গ্রন্থিত হয়েছে বিস্ময়বালক রবীন্দ্রনাথের চার শত বৎসরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বংশগতির বিবরণসহ সর্বপ্রাথমিক-কিন্তু-সার্বিক প্রস্তুতিপর্ব সংবলিত প্রথম পনেরো বছরের বৃত্তান্ত। আর দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রাস্থিত হয়েছে তাঁর সৃজনপর্বের প্রথম পালায় সমৃদ্ধ দ্বিতীয় পনেরো বছরের বিবরণ।' বাংলাদেশে এ এক নতুন রবীন্দ্র-বীক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের রম্য লেখক পরশুরাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রম্যসাহিত্যের সংকলন সম্পাদনা করেছেন তিনি। আবদুশ শাকুর নিজেও একজন রম্যলেখক।

২.

মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১) *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (তিন খণ্ড, ১৯৪৭-১৯৫০), *পূর্ব পাকিস্তানের পাখি* (১৯৬০), *পূর্ব পাকিস্তানের বন্যজন্তু* (১৯৬০) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে অমর হয়েছেন। বিশেষ করে *চট্টগ্রামের ইতিহাস* তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়। **মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী** (১৯০৮-১৯৭৯) বিবিধ প্রবন্ধ, কবিতা ও গান রচনা করেন। লোকসাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তিত্বের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। *লোকসাহিত্যে ছড়া* (১৯৬২), *লোকসাহিত্যে ধাঁ-ধাঁ ও প্রবাদ* (১৯৬৮), *বাংলার লোকসাহিত্য পরিচিতি*, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত* তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। **গোলাম সাকলায়েন** (১৯২৬-২০০৫) নিষ্ঠাবান গবেষক, অধ্যাপক। মর্সিয়া সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রধানত মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যের দিকেই তাঁর মনোযোগ। তবে এর বাইরে আধুনিক সাহিত্যের নানা বিষয়ে তিনি কাজ করেছেন। *পূর্ব-পাকিস্তানের সুফী সাধক* (১৯৬৪), *ফকির গরীবুল্লাহ* (১৯৬২), *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য* (১৯৬২), *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (১৯৬৭), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (১৯৬৯), *সাহিত্য পরিচয়* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য* (১৯৮০), *পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু সন্ত প্রসঙ্গ* (১৯৮৭), *গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্র* (১৯৮৮) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। জীবনী : *শেখ ফজলুল করিম* (১৯৭১), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ* (১৯৮৭), *বন্দে আলী মিয়া* (১৯৮৮), *মোহাম্মদ ইদরিস আলী* (১৯৮৯) তাঁর কয়েকটি সম্পাদনা গ্রন্থও রয়েছে। **আতাউর রহমান** (১৯২৫-১৯৯৯) কবিতা রচনার পাশাপাশি মনস্বী গবেষক। বিশেষত নজরুল বিষয়ক তাঁর একাধিক গবেষণাগ্রন্থ

পাঠককুলের নিকট সমাদৃত হয়েছে। নিবিষ্ট এ গবেষক বাংলাদেশের নজরুল গবেষণায় অনবদ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নজরুলকে উদার অসাম্প্রদায়িক ও যুগচেতনার দুর্দান্ত কবি হিসেবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রমসাধ্য নজরুল গ্রন্থসমূহ তাঁর আকর গ্রন্থই বলা যায়। ভাষা শক্তিশালী, সহজবোধ্য ও সাবলীল। কবির মূল্যায়ন আবেগ-নির্ভর নয় কিংবা কবির চোখে কবিকে সহানুভূতির সম্বন্ধে নয়; বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাই করেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (১৯৬৩), *কবি নজরুল* (১৯৬৮), *নজরুল কাব্য সমীক্ষা* (১৯৭২), *নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি* (১৯৯৩), *নজরুল জীবনে প্রেম ও বিবাহ* (১৯৯৭)। জীবনী : *বেনজীর আহমদ* (১৯৯৪)। **মোবাশ্বের আলী** (জ. ১৯৩১) প্রবন্ধকার, সাহিত্য সমালোচক। অনেক প্রবন্ধগ্রন্থের প্রণেতা। সৃজনশীল গদ্যকারও বটে। তাঁর রয়েছে বিচিত্রধর্মী গ্রন্থ। *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (১৯৬৩), *নজরুল প্রতিভা* (১৯৬৯), *বিশ্বসাহিত্য* (১৯৭৪), *বাংলাদেশের সন্ধানে* (১৯৮৬), *শিল্পীর ট্র্যাজেডি* (১৯৮৫), *রবীন্দ্রনাথ : অন্তরঙ্গ আলোকে* (১৯৮৯), *শেলী : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯০), *বরিস পাস্তেরনাক* (১৯৯০), *এন্টিগোনি* (১৯৯০), *নজরুল : সমাজ পরিবেশ কাল* (১৯৯১), *নজরুল ও সাময়িকপত্র* (১৯৯৪), *গ্রীক ট্র্যাজেডি* (১৯৯৩), *গ্রীসের গল্প* (১৯৯৩), *গ্রীসের দশটি গল্প* (১৯৯৪), *গ্রীসের আরও গল্প* (১৯৯৫), *রবীন্দ্রনাথ : গল্প থেকে নাটক* (১৯৯৪), *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি* (১৯৯৫), *শিল্পীর ভুবন* (১৯৯৬), *গ্রীসের ঐতিহাসিক* (১৯৯৬), *রমনীর রোষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৭), *সিসিফাস ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৭), *তর্পন বাহকেরা* (১৯৯৭), *দয়ালুরা* (১৯৯৭), *মধুসূদনের বিশ্ব* (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর রচনা। বিশিষ্ট বাউল গবেষক আনোয়ারুল করীম (জ. ১৩৪৩ বাং) কয়েক দশক তিনি লালনের গান ও অধ্যাত্মদর্শন নিয়ে কর্মে ব্রতী। তাঁর গ্রন্থ : *বাউল কবি লালন শাহ* (১৯৬৩), *লালন গীতি* (১৯৬৬), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক* (১৯৬৯), *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান* (১৯৭১), *ফকির লালন শাহ* (১৯৭৬), *রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ* (১৯৭৭), *লালনের গান* (১৯৮৪), *কবিতার কথা* (১৯৯১), *The bauls of Bangladesh* (1980), *The aborigines of Kustia* (1979), *The Myths of Bangladesh* (1988) প্রভৃতি। তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও উন্মুক্ত হয়েছে। **রওশন ইজদানী** (১৯১৭-১৯৬৭) কবি হলেও তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থ *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* (১৯৬৪), *পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসাহিত্য*, *পাকিস্তানের জঙ্গনামা*। সম্পাদনার সাংগঠনিক কাঠামোটি বজায় রয়েছে এসব গ্রন্থে, অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিচেতনায় সাবলীল এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পরিলক্ষিত। **আবুল মনসুর আহমেদ** (১৮৯৭-১৯৭৯) *পাক বাংলার কালচার* (১৯৬৪), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৯), *শেরে*

বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২) বিশ্লেষণধর্মী রাজনৈতিক প্রবন্ধিক। যুক্তিনিষ্ঠ ও বলদর্পী লেখক। মননশীল চেতনায় স্বদীক্ষিত। *পাক বাংলার কালচার* (১৯৬৪), *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৯), *শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু* (১৯৭২) তাঁর প্রবন্ধের বই। **কাজী আকরম হোসেন** (১৮৯৬-১৯৬৩) *ইসলামের ইতিহাস* (১৯২২-১৯২৪), *ইসলামের ইতিকথা* (১৯২৮), *ইসলাম কাহিনী* (১৯৩১) ইতিহাসধর্মী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ। ইতিহাসের আনুগত্যে তিনি এসব রচনায় অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ। বিশেষ আবেগ বা অস্থিরতা নেই এ গ্রন্থসমূহে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনবদ্য ভাষার সরল উক্তিতে পরিবেশন করেছেন তাঁর বক্তব্য। কাজী আকরম হোসেন পরিশ্রমী, ত্যাগী, ধীশক্তিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ। উল্লিখিত সিরিজে তার প্রমাণ আছে। **আবদুস সাত্তার** (জ. ১৯২৭) সাহিত্য-মনস্ক লেখক ও গবেষক। অনেক লিখেছেন। তাঁর *অরণ্য জনপদে* (১৯৬৬), *The Manipuris* (1969), *Tribesmen of Mymensing* (1969), *Proud people the Murangs* (1969), *The Khasis* (1969), *The Marmas* (1970), *The Chakmas* (1970), *The Tipras* (1970), *The Santals* (1970), *The Oraons* (1970), *In the Sylvan Shadows* (1971), *Tribal Culture in Bangladesh* (1975), *Tribal Arts and Crafts of Bangladesh* (1978), *Tribal Music and Dance of Bangladesh* (1978), *The sowing of seeds* (1979), *আধুনিক আরবি সাহিত্য*, *আরবি লোকসাহিত্য*, *আরণ্য সংস্কৃতি*, *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, *আরবি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান*, *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম*, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, *ফারসি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান* গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে যথেষ্ট মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন লেখক। **সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়** (১৩৩৪ ব.-১৯৮৪ ইং.)র প্রথম গ্রন্থ *জসীমউদ্‌দীন* (১৯৬৭)। এটি তাঁর নিরলস গবেষণা। গ্রন্থটি জসীমউদ্‌দীনের কবিকৃতি এবং বাংলা কবিতায় তার স্থান নির্ণয় কিংবা আধুনিক কবি হিসেবে তার প্রামাণ্য যৌক্তিকতা দারুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে। *কবি ফররুখ আহমেদ* (১৯৬৯) গ্রন্থে *সাত-সাগরের মাঝির* মূল্যায়ন আকাশচুম্বী। এছাড়া *মোজাম্মেল হক* (১৯৭০) লিখেছেন। সুনীলকুমারের সংকলিত প্রবন্ধগ্রন্থ *সাহিত্য সমীক্ষা* (১৯৭৬)। তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্য সমালোচনার অনুবাদ। *কাব্যনির্মাণকলা : আরিস্টটল* (১৯৭৬), *হোরেসের কাব্যতত্ত্ব* (১৯৭৯), *লঙিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৯৭) প্রভৃতি। *জসীম উদ্‌দীনের কবিমানস ও কাব্যসাধনা* তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ। **ফয়েজ আহমদ** (১৯৩২-২০১২) সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রাজনৈতিক ও মননধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *পিকিং থেকে লিখছি* (১৯৬৭), *চীনে ক্রান্তিকাল* (১৯৮১), *মধ্যরাতের অশ্বারোহী* (১৯৮২), *সত্যবাবুমারা গেছেন* (১৯৮৪), *নবপর্যায়ে চীন* (১৯৮৪), *অনেক কথার কথা* (১৯৮৫), *বিবিধ ভাবনা* (১৯৮৬), *সমীপেষু* (১৯৯১),

'আগরতলা মামলা' : শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ (১৯৯৪), *কথার শেষ নেই* (১৯৯৩), *সংবাদ তোমার উৎস কোথায়* (১৯৯৩), *চলমান রাজনীতি* (১৯৯৪), *রাজনীতি* (১ম খণ্ড ১৯৯৫; ২য় খণ্ড ১৯৯৬), *রাজনীতি : সাম্প্রতিক* (১৯৯৭) প্রভৃতি। **আবদুল হাফিজ** (জ. ১৯৩৫) সাধারণত লোকজ জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। *লোককাহিনীর দিগ দিগন্ত* (১৯৬৮), *আধুনিক সাহিত্যচর্চা* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য* (১৯৭৫), *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ* (১৯৭৫), *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়* (১৯৭৬) তাঁর প্রবন্ধ-গবেষণা। আবদুল হাফিজের সমালোচনামূলক রচনা *আধুনিক সাহিত্য বিবেচনাসমূহ* (১৯৮২)। এটি লেখকের চৌদ্দটি প্রবন্ধের সংকলন। আধুনিকতার অভিজ্ঞানে তিনি এসব প্রবন্ধ রচনা করেছেন। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে সিকান্দার আবু জাফর কিংবা আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কবির মূল্যায়ন এতে আছে। **মোঃ আনিসুর রহমান** (জ. ১৯৩৩) প্রধানত অর্থনীতির বিষয় নিয়ে লিখেছেন। মানবতাবাদী অর্থনীতিক। তাঁর গ্রন্থ : *East and West Pakistan, a Problem in the Political Economy of Regional Planning* (1968), *Bhoomi Sena, A Struggle for Peoples Power* (1978), *Towards a Theory of Rural Development* (1988), *উন্নয়ন জিজ্ঞাসা* (১৯৯২), *The Lost Moment, Derams With a Nation Born Through Fire* (1993), *অপহৃত বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *অসীমের স্পন্দ : রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা* (১৯৯৫) প্রভৃতি। **মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল** (জ. ১৯৩২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ *ভাষাশিল্পী মশাররফ* (১৯৬৮), *মীর মশাররফ হোসেন* (১৯৭১), *The Prose Work of Mir Mosharraf Hosen* (1975), *মীর মশাররফের গদ্য রচনা* (১৯৭৫), *বাঙলা ভাষার ইতিহাস* (১৯৭৮), *বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন* (১৯৭৮), *প্রমথ চৌধুরী* (১৯৮০), *ভাষাতত্ত্বের সহজ কথা* (১৯৯০), *আধুনিক মাতৃভাষা* (১৯৬৯) প্রভৃতি। তাঁর বেশকিছু সম্পাদনাগ্রন্থ রয়েছে। **আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন** (মৃত্যু ১৯৭২) আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ব্যুৎপত্তি ছিল। গবেষণা অনুরাগী। *পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৬৯), *আরবী বাংলা অভিধান*, *সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (১ম খণ্ড, ১৯৬৪-১৯৬৯) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। **মনিরুজ্জামান** (জ. ১৯৪০) *ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৬৯), *বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির সন্ধান : ১৯৪৭-৭১* (১৯৮২), *ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ডওয়ার্ক* (১৯৮২), *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন* (১৯৮৫), *সান্নিধ্যে ও গৌরবী স্মরণে* (১৯৯২), *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* (১৯৯৩), *Studies in the BanglaLanguage* (1991) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর একক ও যৌথ সম্পাদনার কাজও করেছেন। **হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী** (জ. ১৯৩৪) বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী। *সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ*

চেতনা (১৩৭৭), *প্রবন্ধ সংকলন* (১৩৭৮), *স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলীগড় আন্দোলন* (১৩৮০), *মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম* (১৩৮০), *মানবতার জন্য জাতিসংঘ* (১৩৮২), *মানবতা* (১৩৮৪), *রবীন্দ্র কাব্যে গঙ্গা পদ্মা ইছামতি নদী* (১৩৮২), *গণ-জাগরণে মানুষের কবি নজরুল* (১৩৮৭), *মেঘনাদবধ কাব্য মাইকেল মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি* (১৩৮৭), *জন-দরদি-জন-কণ্ঠ-কবি কিশোর সুকান্ত* (১৩৯২), *বাঙালি বাংলাদেশ জাতির জনক* (১৩৯২), *মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ বাঙালী শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা* (১৯৯২), *ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালীর বাংলাদেশ* (১৯৯২) প্রভৃতি। **শাহাবুদ্দীন আহমদ** (জ. ১৯৩৬) নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদের গ্রন্থ : *শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম* (১৯৭০), *সাহিত্য চিন্তা* (১৯৭৫), *নজরুল সাহিত্য বিচার* (১৯৭৬), *ছোটদের নজরুল* (১৯৭৮), *নজরুল সাহিত্য দর্শন* (১৯৮৩), *দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা* (১৯৯০), *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (১৯৮৯) তাঁর গ্রন্থ। **আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া** (জ. ১৯১৮) প্রত্ন-গবেষক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর গ্রন্থ *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, *বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি* (২ খণ্ড)। প্রত্নচিন্তায় বাংলাদেশে তিনি পথিকৃৎ বলা চলে। **আবদুর রশীদ সিদ্দিকী** (১৮৭৯-১৯৫১) গবেষণামূলক প্রবন্ধ *চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্ব*, *চাটিগ্রামী রোয়াই তত্ত্ব* । বিভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষা বিষয়ে তিনি কিছু কাজ করেছেন। যদিও এটি সে সময়ে বেশ দুরূহ কর্ম বলা চলে। পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল গবেষক। **রাজিয়া সুলতানা** (জ. ১৯৩৭)র গ্রন্থ : *নজরুল অন্বেষা* (১৯৬৯), *কথাশিল্পী নজরুল* (১৯৭৪), *আবদুল হাকিম : জীবন ও কাব্য* (১৯৮৭)। প্রধানত নজরুলবিষয়েই গবেষণা করেছেন। **মোল্লা এবাদত হোসেন** (১৯৩০-২০০২) মেধাবী লেখক। *পদাবলী সমীক্ষা* (১৩৭৬), *চর্যা পরিচিতি* (১৩৭৬) প্রভৃতি তাঁর রচনা। সহজ, স্বাভাবিক ও দ্যুতিময় গদ্যভাষা। তত্ত্বকে চমৎকার করে প্রকাশ করেছেন। মেধাবী, শ্রুতিধর এ লেখকের রচনা বেশ সুপাঠ্য। **আবদুল হালিম** (জ. ১৯৩৭) সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী। এরূপে রচিত *ইতিহাসের রূপরেখা* (১৩৭৬), *সমাজতন্ত্রের পরিচয়* (১৩৭৯), *ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি* (১৯৭৩), *বিশ্বজগতের পরিচয়* (১৯৭৫), *মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ* (১৯৭৭), *চিলি জনগণের অব্যাহত জয়যাত্রা* (১৯৭৪), *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা* (১৯৭৪), *শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ* (১৯৮০) প্রভৃতি গ্রন্থ।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের প্রবন্ধ

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

মুক্তচিন্তক, বিশেষক, ক্ষুরধার প্রাবন্ধিক। সাহিত্য সমালোচনার পাশাপাশি, বাংলাদেশ-বাঙালি বিষয়ে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ যুক্তিনিষ্ঠ, সাংগঠনিক শক্তিসম্পন্ন। *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *বাঙলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে* (১৯৭৫), *বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* (১৯৭৬), *বাঙালী মুসলমানের মন* (১৯৮১), *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭২), *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* (১৯৮০), *শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৯), *আহমদ ছফার প্রবন্ধ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (১৯৯২), *রাজনীতির লেখা* (১৯৯৩), *আনুপূর্বিক তসলিমা অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ* (১৯৯৪), *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ* (১৯৯৫), *সংকটের নানান চেহারা* (১৯৯৬), *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৯৭), *শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (১৯৯৭), *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৮), *আহমদ ছফার প্রবন্ধ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (২০০০), *রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০০০), *বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র* (২০০১), *উপলক্ষের লেখা* (২০০১), *নির্বাচিত প্রবন্ধ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (২০০২), *আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (২০০২), *আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০২), *সেইসব লেখা* (২০০৮) তাঁর রচনা। আহমদ ছফার প্রবন্ধ প্রসাদগুণমণ্ডিত এবং ব্যঞ্জনাদীপ্ত। প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি স্বতন্ত্র স্থান দাবি করতে পারেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (জ. ১৯৪৪)
একাধারে মননশীল প্রাবন্ধিক ও গবেষক। উনিশ শতকের প্রগতিবাদী চেতনা নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ, কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। *মুক্তিসংগ্রাম* (১৯৭২), *কালের যাত্রার ধ্বনি* (১৯৭৩), *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন* (১৯৭৬), *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৯), *নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি* (১৯৮১), *মানুষ ও তার পরিবেশ* (১৯৮৪), *যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা* (১৯৮৫), *মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব* (১৯৮৭), *রাজনীতি ও দর্শন* (১৯৮৮), *আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*। তাঁর সম্পাদনা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *স্বদেশ চিন্তা* (১৯৮৫)।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)
হুমায়ুন আজাদ বহুমাত্রিক লেখক; গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, বক্তব্যের পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রখর যুক্তি; নির্মিত সিদ্ধান্তে স্বকীয়তা, স্পষ্ট বিবেচনা এবং সমাজ-সাপেক্ষ বিশে-ষণ। শিল্পের নন্দনটি নানাদিক যাচাইয়ে তিনি পরীক্ষা করে নেন। চিন্তার স্বচ্ছতার জন্য হুমায়ুন আজাদের গদ্য ঝরঝরে, প্রজ্বল, দ্যুতিময়। তাঁর প্রবন্ধে নানারকমের

পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। গবেষণামূলক প্রবন্ধে যুক্তিবিচার বিবেচনায় তথ্যকে শুধু প্রতিষ্ঠা দেওয়া নয়, করে তোলেন সৃজনশীল। হুমায়ুন আজাদ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে গল্পের ভেতর দিয়ে ক্রমিক-নির্মাণ করেছেন। তাঁর ভাষাবিষয়ক গবেষণাও মনোজ্ঞ, ঐ নির্ভার গদ্যের কারণে। মননশীল প্রবন্ধেও লেখক অনবদ্য। চিন্তাশীল, মেধাবী এ প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ সংখ্যা অনেক। নানারকমের প্রবন্ধের গ্রন্থসমূহের মধ্যে *রবীন্দ্র প্রবন্ধ/ রাষ্ট্র ও সমগ্র চিন্তা* (১৯৭৩), *লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* (১৯৭৬), *শামসুর রাহমান / নিঃসঙ্গ শেরপা* (১৯৮৩), *Pronominalization in Bengali* (1983), *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* (১৯৮৩), *বাক্যতত্ত্ব* (১৯৮৪), *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* (১৯৮৫), *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* (১৯৮৭), *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (১৯৮৮), *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৮), *ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* (১৯৯০), *নারী* (১৯৯২), *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নীচে* (১৯৯২), *নিবিড় নীলিমা* (১৯৯২), *মাতাল তরণী* (১৯৯২), *নরকে অনন্তঋতু* (১৯৯২), *জলপাইরঙের অন্ধকার* (১৯৯২), *সীমাবদ্ধতার সূত্র* (১৯৯৩), *আধার ও আধেয়* (১৯৯৩), *বুকপকেটে জোনাকীপোকা* (১৯৯৩), *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* (১৯৯৬), *আমার অবিশ্বাস* (১৯৯৭), *অর্থবিজ্ঞান* (১৯৯৯), *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* (১৯৯৭), *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (১৯৯৮), *বাক্যতত্ত্ব* (১৯৮৪), *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* (১৯৯২), *সাক্ষাৎকার* (১৯৯৪), *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* (১৯৯৫), *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* (১৯৯৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* (২০০৪) প্রভৃতি।

সম্পাদনা : *বাঙলা ভাষা* (১ম খণ্ড, ১৯৮৪; ২য় খণ্ড, ১৯৮৫), *আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৯৪), *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড ১৯৯৪), *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা* (১৯৯৭)।

এম আর আখতার মুকুল (১৯২৯-২০০৪)

সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক। 'চরমপত্র'খ্যাত লেখক। রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। পাঠ-অভিজ্ঞতায় অর্জন করেন ইতিহাস রাজনীতি বিষয়ে ধারণা। আজীবন প্রগতির পক্ষের লেখক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ : *রূপালী বাতাস* (১৯৭৩), *মুজিবের রক্ত লাল* (১৯৭৬), *লন্ডনে ছক্কু মিয়া* (১৯৮১), *ভাসানী-মুজিবের রাজনীতি* (১৯৮৪), *আমি বিজয় দেখেছি* (১৯৮৫), *চল্লিশ থেকে একাত্তর* (১৯৮৫), *কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী* (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন* (১৯৮৭), *ওরা চারজন* (১৯৮৭), *লেছড়াগঞ্জের লড়াই* (১৯৮৮), *একাত্তরের বর্ণমালা* (১৯৮৯), *একুশের দলিল*

(১৯৯০), *মহাপুরুষ* (১৯৯১), *দু'মুখী লড়াই* (১৯৯২), *আমাকে কথা বলতে দিন* (১৯৯৩), *বাংলা নাটকের গোড়ার কথা* (১৯৯৪), *হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীর চোখে নজরুল* (১৯৯৪), *কে ভারতের দালাল* (১৯৯৫), *বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (১৯৯৭), *পঞ্চাশের দশকের আমরা ও ভাষা আন্দোলন* (১৩৯১), *বায়ান্নোর জবানবন্দী* (১৩৯২) প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে এম. আর. আখতার মুকুল একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁর রচনা রসসমৃদ্ধ।

সম্পাদনা : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* [এক খণ্ডে সমাপ্ত] (১৯৮৮), *স্বাধীনতাযুদ্ধের আলোকচিত্র* (১৯৮৮), *আমিই খালেদ মোশাররফ* (১৯৯০), *বিজয় একাত্তর* (১৯৯১), *নকশালের শেষ সূর্য* (১৯৮৯), *বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন* (১৩৯১)।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯৩০-২০১৪)

রবীন্দ্র গবেষক, ভাষাবিদ, আইনজ্ঞ, ইতিহাসবিদ মুহম্মদ হাবিবুর রহমান। বিচিত্র বিষয়ে কাজ করেছেন। *যথাশব্দ* (১৯৭৪), *মাতৃভাষার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ* (১৯৮৩), *রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার* (১৯৮৩), *কোরানসূত্র* (১৯৮৪), *বচন ও প্রবচন* (১৯৮৫), *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* (১৯৮৫), *রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা* (১৯৮৬), *রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য* (১৯৮৬), *আমি কি যাব না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে* (১৯৯৬), *বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক* (১৯৯৬), *আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা* (১৯৯৭), *বাংলা ভাষার সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত* (১৯৯৭), *কলম এখন নাগালের বাইরে* (১৯৯৭), *একুশে ফেব্রুয়ারী সকল ভাষায় কথা কয়* (১৯৯৯), *মিত্রাক্ষর* (২০০০), *নির্বাচনই যথেষ্ট নয়* (২০১৩) প্রভৃতি। রবীন্দ্র পঠন-পাঠনকে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বাংলা অভিধান বিষয়ক গ্রন্থও গুরুত্বপূর্ণ।

মালেকা বেগম (জ. ১৯২৮)

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও লেখক মালেকা বেগম। নারীমুক্তি বিষয়ে বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। *ভাষার বিকাশে জীবন* (১৯৭৬), *নারী চিত্র : আশির দশক* (১৯৮৭), *বাংলার নারী আন্দোলন* (১৯৯৫), *নারীর চোখে বিশ্ব* (১৯৯৬), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল* (১৯৯৮), *আমি নারী* (২০০০), *রমনীয় নয়* (২০০৫), *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : স্বদেশী ও স্বাদেশিক* (২০০৮), *অগ্নিযুগের দুই নারী : রোকেয়া ও প্রীতিলতা* (২০০৮), *রবীন্দ্রনাথের গল্পে যৌতুক প্রসঙ্গ* (২০১১), *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (২০১১), *নারীর কথা*

(২০১২), *বিপন্ন নারী* (১৯১৩) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ সুপাঠ্য, পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা সংকলন ও সম্পাদনার সঙ্গেও মালেকা বেগম যুক্ত। দীর্ঘায়ু নারী পত্রিকা *বেগম*-এর ৫০বছরের নির্বাচিত রচনার সংকলন ও সম্পদনাও করেছেন তিনি।

মুনতাসীর মামুন (জ. ১৯৫১)
ইতিহাসবিদরূপে প্রতিষ্ঠিত। ঢাকার ইতিহাস রচনায় তিনি এখন প্রতিষ্ঠান বলা চলে। ইতিহাসের অধ্যাপক ও লেখক হলেও সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর কলম ক্ষুরধার, শক্তিশালী। মুক্তবুদ্ধির পথিকৃৎ। মুনতাসীর মামুন জনপ্রিয় কলামলেখকও বটে। প্রচুর কাজ করেছেন। বাংলাদেশের প্রজন্মকে তৈরি করেছেন তিনি বিচিত্র বিষয়ে লেখালেখির ভেতর দিয়ে। সত্যি বলতে কি তাঁর গদ্য আকর্ষণীয়। যুক্তিপরম্পরায় সেখানে তৈরি হয় ভিন্নপাঠ। নির্ভুল এ ইতিহাসবেত্তার গ্রন্থ : *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ* (১৯৫৭-১৯০৫) (১৯৮৬), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১ম খণ্ড ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৮৭, ৩য় খণ্ড ১৯৮৮, ৪র্থ খণ্ড ১৯৯১, ৫ম খণ্ড ১৯৯৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯৭), ঢাকা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ (১৯৯৭), *The Festivals of Bangladesh* (1996), *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে* (১৯৯৬), *ঢাকার প্রথম* (১৯৯৫), *হরিশচন্দ্র মিত্র* (১৯৯৪), *ঢাকা : স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী* (১৯৯৩), *ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান* (১৯৯১), *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান* (১৯৯১), *কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়* (১৯৯০), *পুরনো ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি* (১৯৮৯), *স্মৃতিময় ঢাকা* (১৯৮০), *ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান* (১৯৯৫), *মজিবরের বাড়ি* (১৯৯৫), *মেজর জেনারেল ও ফেরি* (১৯৯৫), *হুকুমের দেশ বাংলাদেশ* (১৯৯৪), *যে দেশে রাজাকার বড়* (১৯৯৪), *ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতায় থাকা* (১৯৯৩), *গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে* (১৯৯৩), *বলে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের গাঁথা* (১৯৯২), *সব সম্ভবের দেশে* (১৯৯১), *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর* (১৯৮৫), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ* (১৯৮৫), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সভা সমিতি* (১৯৮০), *উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার* (১৯৭৯), *ঢাকাপ্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৬৩-৬৪)* (১৯৭৭), *বাংলাদেশের উৎসব* (১৯৯৪), *জেনারেলের সঙ্গে* (১৯৯৩), *এপিটাফ* (১৯৯১), *বিশপ হেবারের চোখে বাংলাদেশ* (১৯৭৪), *সেই সব দিন* (১৯৯৭), *মিছিলে কেন ছিলাম* (১৯৯৭), *ইতিহাসের খেরোখাতা* (১৯৯৮), *বড় আলবদরদের কি হবে* (১৯৯৬), *বাংলাদেশে ফেরা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৫), *ঢাকা সমগ্র-১*, *ঢাকা সমগ্র-২* (২০০৪) প্রভৃতি।

যৌথভাবে রচিত : *বাংলাদেশের সিভিল সমাজের সংগ্রাম* (১৯৯৫), *ইতিহাস কোষ* (১ম খণ্ড) (১৯৮৬), *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ* (১৯৮৭), *Civil Society in Bangladesh Resilience and Retreat* (With J. K. Ray)(1993), *Inside Bureancracy : Bangladesh* (With J. K. Ray) (1987), প্রভৃতি।
সম্পাদনা : *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (১৯৮৬), *বঙ্গভঙ্গ* (১৯৮০), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ* (১৯৭৪), *ঢাকা ১৯৭১* (১৯৯২), *ছুটি* (১৯৮৪), *The Panchayat System of Dhaka* (1990), *Bangladesh Year Book* (1983) প্রভৃতি।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)
যশস্বী সমালোচক ও মনস্বী অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রবন্ধ *শিল্পীর রূপান্তর* (১৯৭৫) ও *কথা ও কবিতা* (১৯৮১)। তাঁর পিএইচ. ডি.র প্রস্তুতকৃত গবেষণা *The Bengali Press and Literary Writing (1818-1831)* (1977)। তাঁর দুটি প্রবন্ধের বই-ই মূল্যবান। বাংলাদেশের সাহিত্য-সমালোচনামূলক এ প্রবন্ধ অত্যন্ত যুক্তিশীল এবং তীক্ষ্ণধী। বিষয়ের মননধর্মী বিশেষণ এখনও এককভাবে মহিমান্বিত। খুব কম লিখলেও সমালোচনা-সাহিত্যে তিনি প্রসিদ্ধ। আবু হেনা মোস্তফা কামালের গদ্য সরল কিন্তু শক্তিশালী, স্নিগ্ধ, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। সেজন্যই তাঁর সমালোচনা সাহিত্যধর্মী হয়ে উঠেছে।

হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯)
শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন হাসান আজিজুল হক। *কথাসাহিত্যের কথকতা* (১৯৮১), *অপ্রকাশের ভার* (১৯৮৮), *অতলের আঁধি* (১৯৯৮), *কথা লেখা কথা* (২০০৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৮), *ছড়ানো ছিটানো* (২০০৮), *রবীন্দ্রনাথ ও ভাষাভাবনা* (২০১৪) তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর লেখালেখি। প্রগতিবুদ্ধীতে প্রদীপ্ত তাঁর রচনা। প্রথম প্রবন্ধে সাহিত্য বিষয়ক যে বক্তব্য প্রণয়ন করেছেন তা অনেকাংশে ঋদ্ধ। নতুন চিন্তার প্রকাশ যেমন আছে তাঁর রচনায় তেমনি ভূমি-মাটি ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ‘পরশপাথর’ ইঙ্গিত আকর্ষণীয়। তাঁর ‘অপ্রকাশের ভার’ প্রবন্ধটির ভাষা বিষয়ক তর্কটি এরকম : ‘আসলে আমরা ভাষা ব্যবহার করেই চিন্তা করতে পারি এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই চিন্তা করতে করতে নতুন করে ভাষা তৈরি করতে থাকি। কাজেই লিখিত গদ্যভাষাকে যেমন কেবলমাত্র স্বভাবের ওপর ছেড়ে দিলেই চলে না, তেমনি তার ওপর হাতুড়ি পেটানোও যায় না।’ ভাষাবিষয়ক চিন্তায় ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতি’ তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ। আকর্ষণীয় এসব অনেক রকমের

প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হক তুলনায় আনেন দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও প্রতিরোধ-সংগ্রামী অব্যর্থ উপমাসমূহ। যা কবির আখ্যান নয় বা তেমন মার্গেরও তত্ত্বকথা নয়, একেবারে নিটোল দুয়ারেপ্রস্তুত বাস্তবতা। প্রবন্ধগাত্রে আবেগের টান আছে, সেটি প্রত্যেকের মতো, স্বাভাবিক, স্বাচ্ছন্দ্যময় কিন্তু কিছুতেই আরোপিত নয়। কথাসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, সমকালীন আর্থ-সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধও আছে, আছে স্মৃতিচারণঋদ্ধ কালের কথা। বাংলাদেশের প্রবন্ধে এ কথনভঙ্গিটিতে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১)
এ সময়ের বর্ষিয়ান বুদ্ধিজীবী কবীর চৌধুরী। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী অনুবাদের দিকে। এদেশে নাটকের চর্চা নিয়ে যেমন তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন তেমনি তার আন্দোলন (movement) ও বিদেশী প্রভাব নিয়েও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেটি বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এনেছে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। শিল্পকলা বিষয়েও শিল্পকলা একাডেমী থেকে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে। দীর্ঘ সময়ে নিরলস পরিচর্যায় তিনি এখনও এসব কর্মে ব্রত। *প্রাচীন ইংরেজী কাব্যসাহিত্য* (১৯৮০), *আধুনিক মার্কিন সাহিত্য* (১৯৮০), *শেকস্পীয়র থেকে ডিলান টমাস* (১৯৮১), *প্রসঙ্গ নাটক* (১৯৮১), *সাহিত্যকোষ* (১৯৮৪), *এ্যবসার্ড নাটক* (১৯৮৫), *ইউরোপের দশ নাট্যকার* (১৯৮৫), *স্তাঁদাল থেকে প্রুস্ত* (১৯৮৫), *সাহিত্য সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব পরিভাষা* (১৯৮৫), *শেকস্পীয়র ও তার মানুষেরা* (১৯৮৫), *অভিব্যক্তিবাদী নাটক* (১৯৮৭), *পুশকিন ও অন্যান্য* (১৯৮৭), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৮৭), *ফরাসী নাটকের কথা* (১৯৯০), *অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম ও অন্যান্য* (১৯৯১), *নজরুল দর্শন* (১৯৯২), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (১ম খণ্ড, ১৯৯২), *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (১ম খণ্ড, ১৯৯২), *বঙ্গবন্ধু, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চা* (১৯৯২), *নজরুল দর্শন* (১৯৯২), *ফরাসী চিত্রশিল্পীদের কথা* (১৯৯২), *শিলার ও অন্যান্য* (১৯৯৩), *Special Change and Nation-Building in Developing areas : An AnnotatedBiobliography* (1965), *রেমব্রান্ত রুবেনস ভেলাসকুয়েজ* (১৯৯৪), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (২য় খণ্ড, ১৯৯৪), *ছোটদের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৯৪), *স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়* (১৯৯৪), *রদ্যাঁ* (১৯৯৪), *ছবি কথা সুর* (১৯৯৫), *আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে* (১৯৯৭), *তসলিমা নাসরীন ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ* (যুগ্মভাবে সৈকত চৌধুরীর সঙ্গে) (১৯৯৭), *পিকাসো* (১৯৯৭), *জন সিঙ্গার সার্জেন্ট* (১৯৯৭), *সান্দ্রো বতিচেলি* (১৯৯৮), *লোরকা ও অন্যান্য* (১৯৯৯), *গয়্যা* (১৯৯৯), *মানব কল্যাণ ও অন্যান্য* (২০০০),

বঙ্গবন্ধু (২০০০), *মার্কিন সাহিত্যের দশ মহারথী* (২০০১), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০১), *বিবিধ রচনা* (২০০১), *সরস ঘটনার সরস কাহিনী* (২০০১), *ভারমিয়ার গুস্তাভ কুরব্যে জন ইভরেট মিল্যে* (২০০১), *মৌলবাদ : তার ইতিহাস ও প্রকৃতি অনুসন্ধান* (২০০২), *সেজান-মাতিস* (২০০২), *পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের কথা* (২০০২), *ইউরোপীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য : এরকি নিউটন অনুসরণে* (২০০৩), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৩য় খণ্ড, ২০০৩), *প্রবন্ধ সমগ্র* (২য় খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৪র্থ খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৫ম খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০৬), *প্রবন্ধ সমগ্র* (৩য় খণ্ড, ২০০৬) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। মননশীল প্রাবন্ধিক, অনেকান্তরূপে ছড়িয়েছেন তিনি। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের অনেক বিষয়কে সহজ ভাষায় কিন্তু প্রাণবন্ত করে তিনি পাঠকের সামনে পরিবেশন করেছেন। সাবলীল ও সাহসী কথক কবীর চৌধুরীর প্রবন্ধভাষা পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, যুক্তিনিষ্ঠ ও নিরঙ্কুশ জীবনবাদী।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮)
নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ (১৯৮১), *থিয়েটারের কথা* (১ম-৪র্থ খণ্ড), *বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা*, *স্ট্যানিসলাভস্কী ও তার অভিনয় তত্ত্ব*, *নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, *বিশ্বনাট্য* প্রত্যেকটিই তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ। নাটকের বিশ্বভ্রমণ সম্পন্ন হয় তাঁর প্রবন্ধে। অনেক নতুন দিকের উন্মোচন করেছেন জিয়া হায়দার তাঁর লেখনিতে। নাট্যনন্দন পরিবেশন কিংবা বিভিন্ন ইজমে নাটকের কৌশল কুশলতা কেমন সে জিজ্ঞাসার বিশ্লেষণ আছে তাঁর লেখায়। নাট্যতত্ত্বের একটি ভিন্নতর পাঠ এখানে বিরাজমান।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)
অনবদ্য প্রবন্ধকার। *হৃৎকলমের টানে*/ ১ম খণ্ড (১৯৯১), *হৃৎকলমের টানে*/ ২য় খণ্ড (১৯৯৭), *মার্জিনে মন্তব্য* (২০০৫) অসামান্য গদ্যগ্রন্থ। আত্মতামূলক এসব প্রবন্ধে সৈয়দ হক কবিমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবন সমাজ-সংস্কৃতির বিচিত্র বিষয়কে তিনি পঠনে এনেছেন। স্বচ্ছচিন্তার পরিপক্ব মননের দৃষ্টান্ত সৈয়দ হক। কয়েক দশকের সাহিত্যচিন্তায় এসব গ্রন্থে তিনি অনেক পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

যতীন সরকার (জ. ১৯৩৬)
বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক। শক্তিশালী প্রাবন্ধিক। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত। তাঁর প্রবন্ধের বই : *সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের কবিগান* (১৯৮৬),

বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য (১৯৮৬), *সংস্কৃতির সংগ্রাম*, *মানবমন মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব* (১৯৯০), *গল্পে গল্পে ব্যাকরণ* (১৯৯৪), *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* (২০০৫), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৮), *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০১২), *মানবমন, মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব* (২০১৩)। এসব গ্রন্থে সহজবোধ্য ভাষায় গভীর ও প্রাঞ্জল ভাষ্যটি তিনি প্রদান করতে সক্ষম। সমাজ-বিবর্তনে ধারায় বাস্তববাদী এ লেখক, গবেষক রাজনৈতিক বিশেষণেও অতুলনীয়। *পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের বই।
জীবনী : *কেদারনাথ মজুমদার* (১৯৮৭), *সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী* (১৯৮৮), *হরিচরণ আচার্য* (১৯৮৯), *চন্দ্রকুমার দে* (১৯৯০)।

সনৎকুমার সাহা (জ. ১৯৪১)
সনৎকুমার সাহা বাংলাদেশের একমাত্র প্রাবন্ধিক, যিনি একাধারে বহুবিষয় কনটেক্সেট্-এ প্রযুক্ত করে অতলে পৌঁছান এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু আহরণ করে অনিবার্য দার্শনিক বুদ্ধিতে পাঠককে একীকৃত করেন। এখানে তাঁর যুক্তিতে কোনো ছাড় নেই, পিছু সরারও সুযোগ নেই। অসামান্য গদ্যকথন। ফ্রেজবন্দি শব্দ, বাক্য 'ছিন্নবাধা পলাতক', বিচিত্রস্পর্শী। রাষ্ট্র-সমাজ কিছুকেই ছাড়েন না, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুঁজির প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির মারপ্যাঁচে কতোদূর চলে সেটি তাঁর মনোলোকে স্পষ্ট। সনৎসাহা রবীন্দ্রধন্য। রবীন্দ্র বিষয়ে তাঁর প্রচুর লেখালেখি, সবই বিশেষণাত্মক, ভিন্ন চিন্তা। ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় অনিবার্যরূপে সমাজতন্ত্রী ও বাস্তববাদী। নির্মম তাঁর যুক্তিবন্ধ। তীক্ষ্ণধী শেষ, বিদ্রূপ; মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে উচ্চারণ, সমাজপাঠের জায়গা থেকে। বিবর্তনশীল সমাজবিশ্বাসে যা সত্য সেটি কার্যকর তাঁর ভাষায়। *সমাজ সংসার কলরব* থেকে পড়লে বোঝা যায় : 'যে ঈশ্বর এক অখণ্ড অনন্ত পরম সত্তা এবং প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাঁরই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, ফলে সেই ধর্মের বিধিবিধানও যথোচিত ধ্রুব ও অমরতাবাহী, এই ধারণা সত্য বলে মানলে ধর্মীয় বিরোধের কোন ভাবগত বা বস্তুগত ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এই বিরোধ ঐতিহাসিকভাবে প্রত্যক্ষ এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকট। তবে কি যা প্রত্যক্ষ, তা প্রকৃত নয়? না কি মূল প্রত্যয়ই প্রশ্নসাপেক্ষ?' এমন জিজ্ঞাসা-উত্তর তাঁর বিচিত্র বিষয়ে। এবং তা পরিব্যাপ্ত নানাদিকে, তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যিক আলোচনায় কিংবা সমাজ শ্রেণিস্তরের পরিবৃত্তে। *সমাজ সংসার কলোরব* (২০০০) ও *কথায় ও কথার পিঠে* (২০০৮), *ফিরে দেখা : রবীন্দ্রনাথ* (২০১২) সনৎকুমার সাহার প্রবন্ধের বই।

২.

নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-১৯৯৮) বাকধ্বনি, উচ্চারণের শিক্ষক। বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী। তাঁর গ্রন্থ : *অলঙ্কার অন্বেষা* (১৯৭৬), *কাব্যতত্ত্ব অন্বেষণা* (১৯৮২), *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৮৯) প্রভৃতি। নরেন বিশ্বাস শুদ্ধস্বরের প্রবর্তক। বাংলা বানান ও উচ্চারণ নিয়ে তাঁর কাজ প্রশংসিত। তাঁর সম্পাদনা : *বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (১৯৮৯)। **জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী** (১৯২৮-২০১৪) *শব্দের সীমানা* (১৯৭৬), *Literature of Bangladesh and other Essays* (1983), *আমার দেশ আমার ভাষা* (১৯৮৪), *অনুবাদ* (১৯৮৫), *পৃথিবী ও পাসপোর্ট* (১৯৮৬), *শান্তিনিকেতনে তিন মাস* (১৯৮৯), *বাঙালির আত্মপরিচয়* (১৯৯১), *প্রবাসে প্রতিদিন* (১৯৯৪), *যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম* (১৯৯৭) ছাড়াও তিনি বেশকিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। সমালোচনায় তাঁর আবেগ নিয়ন্ত্রিত। সেখানে বুদ্ধির প্রলেপ সঞ্চারিত করেন। চিন্তার স্বচ্ছতা আছে, সরল ও সহজ তাঁর উপপাদ্য। সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব কায়েম হয় প্রবন্ধে। অনুবাদ গদ্যটি তাঁর বেশি আকর্ষণীয়। **শাহরিয়ার কবির** (জ. ১৯৫০) *কমরেড মাও সে-তুঙ* (১৯৭৭), *রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে : আনোয়ার হোজার স্মৃতি* (১৯৮৬), *মওলানা ভাসানী* (১৯৯০), *কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার* (১৯৯১), *গণ আদালতের পটভূমি* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র* (১৯৯৪), *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* (১৯৯৫) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রবন্ধ ক্ষুরধার ও যুক্তিনিষ্ঠ। সাবলীল গদ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাই কায়েম থাকে বেশি। এমনটার ভেতর দিয়েই গদ্যে মানবমুক্তি পথ খোঁজেন, অর্জন করেন সমন্বিত দিকদৃষ্টি। যুক্তিনিষ্ঠাতেই পরিপূর্ণ শাহরিয়ার কবিরের গদ্য। এছাড়া বহু গ্রন্থের একক ও যৌথ সম্পাদনা করেছেন। **অজয় রায়** (জ. ১৯২৮) বাংলাদেশের আর্থ-সমাজজিজ্ঞাসার বিশেষণাত্মক প্রবন্ধ *বাঙলা ও বাঙালি* (১৯৭৭), *বাংলাদেশের অর্থনীতি : অতীত ও বর্তমান* (১৯৭৮), *আমাদের জাতীয়তার বিকাশ* (১৯৮২), *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান* (১৯৮৩), *রাজনীতি কি ও কেন* (১৯৮৬), *পুঁজিবাদী অর্থনীতি* (১৯৮৬), *বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ* (১৯৮৭), *সাম্প্রতিক* (১৯৮৬), *শিক্ষানবিশীর হাতেখড়ি* (১৯৯০)। এসব গ্রন্থে তিনি কম্যুনিষ্ট দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। বিশ্বাস ও বাস্তবের সমন্বিত প্রয়াসটি কায়েম হয় তাঁর রচনায়। পুঁজি, ভূমি, কৃষক মুক্তির ধারায় অনেক লেখকের মধ্যে অজয় রায়ের লেখা মানবজিজ্ঞাসায় ব্যতিক্রমী। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের *ভাসানী যখন ইউরোপে* (১৯৭৮) ধ্রুপদী গ্রন্থ। সুবেদী কলমে স্মৃতি-বুদ্ধি দ্যুতিময় সমন্বয় ঘটেছে। সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ পরিলক্ষিত তাঁর রচনায়। কথকতার পরিবেশনা মজার, একদিকে তা

যেমন তথ্যনিষ্ঠ অন্যদিকে তেমনি রসবোধসঞ্জাত। নিসর্গপ্রেমী **দ্বিজেন শর্মা** (জ. ১৯২৯)র প্রবন্ধগ্রন্থ *জীবনের শেষ নেই* (১৯৭৮), *শ্যামলী নিসর্গ* (১৯৮০), *সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব* (১৯৮১), *সতীর্থ বলয়ে ডারউইন* (১৯৮৪), *ফুলগুলির যেন কথা* (১৯৮৮), *স্বদেশে প্রবাসে* (১৯৯৩), *গহন কোন বনের ধারে* (১৯৯৪), *মম দুঃখের সাধন* (১৯৯৪), *ডারউইন ও প্রজাপতির উৎপত্তি* (১৯৯৭) প্রভৃতি। প্রকৃতির রংকে কল্পনামাধুরীতে মিশিয়ে পরিবেশন করেন দ্বিজেন শর্মা। পরিপক্ব গদ্য, চেতনায় গৃহীত সাম্যবাদ, তথ্যউপাত্তের বৃক্ষবন্দনা সবকিছু মিলে ধরিত্রির অধিকার সম্পর্কে সচেতন। গদ্যময় তাঁর বসুধা। মা-মাতৃকায়—অংশীদারকৃত এ প্রকৃতি অনেকটা একার্থক। সুতরাং নিখুঁত তাঁর বয়নভঙ্গি। বেশকিছু সম্পাদনা গ্রন্থও আছে দ্বিজেন শর্মার। **মঞ্জুশ্রী চৌধুরী** (জ. ১৯২৩) শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। *সুশিক্ষক* (১৯৭৮), *বাংলা শিক্ষা পদ্ধতি* (১৯৮২), *শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কথা* (১৯৮৬), *শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান* (১৯৮৮), *শিশুর জীবন বিকাশ* (১৯৯২) প্রভৃতি। শিশুচিন্তনে সীমাবদ্ধ হলেও শিশুর মনোচেতনার অন্ধিসন্ধির সংবাদ সরলবোধ্য করে তোলা সহজ নয়। মঞ্জুশ্রী নির্ভার গদ্যে তা সম্ভব করে তুলেছেন। **আবুল আহসান চৌধুরী** (জ. ১৯৫৩) লোকগবেষক। অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। কুষ্টিয়ার কবিকৃতিদের নিয়ে সামগ্রিক কাজ সম্পন্ন করেছেন আবুল আহসান চৌধুরী। নিরলস গবেষক। তাঁর গ্রন্থ : *কুষ্টিয়ার বাউল সাধক* (১৯৭৪), *সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি* (১৯৭২), *জলধর সেন* (১৯৯০), *লালন শাহ* (১৯৯০), *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার* (১৯৯৮), *মুনসী শেখ জমিরুদ্দরুদ্দীন* (১৯৮৯), *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন* (১৯৮৯), *মোহাম্মদ দাদ আলী* (১৯৯২), *পাগলা কানাই* (১৯৯৫), *নেয়ামাল বাসির* (১৯৯৩), *মীর মশাররফ হোসেন* (১৯৯৩), আজিজন্নেসা খাতুন (১৯৯৫), *মনের মানুষের সন্ধানে* (১৯৯৫), *সমাজ, সমকাল ও লালন সাঁই* (১৯৯৬), *জগদীশ গুপ্ত* (১৯৮৮), *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা* (১৯৯৬), *লোকসংস্কৃতির বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৭), *বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন* (১৯৯৭), *ভাষা আন্দোলনের দলিল* (১৯৮৮) প্রভৃতি। তবে আবুল আহসান চৌধুরী শুধু লালন নয়, মশাররফ বিশেষজ্ঞও বটে। মীরের অনেক অনালোকিত দিক তিনি উন্মোচন করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচিত্র বিষয় নিয়েও বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পাদনা : *লালন স্মারকগ্রন্থ* (১৯৭৪), *মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন স্মারকগ্রন্থ* (১৯৮৮), *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯৭)সহ অনেক গ্রন্থ। **সৈয়দ আবুল মকসুদ** (জ. ১৯৪৬)র প্রবন্ধ গবেষণা ও প্রবন্ধগ্রন্থ : *জার্মানীর জার্নাল* (১৯৭৯), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য ১ম খণ্ড* (১৯৮১), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য* ২য় খণ্ড (১৯৮৩), *যুদ্ধ ও মানুষের*

মূর্খতা (১৯৮৮), *হরিশচন্দ্র মিত্র* (১৯৯০), *ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র* (১৯৯০), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর সাহিত্যকর্ম* (১৯৯০), *গোবিন্দচন্দ্র দাসের ঘর গেরাস্থালি* (১৯৮১), *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ দার্শনিক* (১৯৯২), *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী* (১৯৯৫)। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষণের সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষণও করেন। সাহিত্যের সমালোচনায় নানাদিকে তাঁর প্রসারণ আছে, যদিও তুলনামূলক পাঠটিতে একটু দুর্বল মনে হয় তাঁকে। তবুও মননশীলতায় ঋদ্ধ এ প্রবন্ধকার। **মুহম্মদ নূরুল হুদা** (জ. ১৯৪৯) প্রধানত কবি, গদ্যকারও বটে। তাঁর গদ্য দ্যুতিময়, কাব্যগন্ধি। *শর্তহীন শর্তে* (১৯৮১), *লক্ষণ সংহিতা* (১৯৮২), *মহানবী* (১৯৮৩), *রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৮), *সার্ত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৩), *প্রাণের মিনার শহীদ মিনার* (১৯৯৪), *সৃষ্টিশীলতা ও অন্যান্য* (১৯৯৮) সম্পাদনা : *হে স্বদেশ* (১৯৭২), *কবি মধুসূদন* (১৯৮৪), *কবিতা ১৩৯০* (১৯৮৪), *কবিতা ১৩৯১* (১৯৮৫), *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে কবিতাগুচ্ছ* (১৯৮৪), *হুমায়ুন কবির রচনাবলী* (১৯৮৪), *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৬), *বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৮), *Flaming Flowers : Poets Response to the emergence of Bangladesh* (1986), *কবিতা : গণআন্দোলন* (১৯৯১), *Nazrul : An Evaluation* (1997), *সাহিত্য মঞ্জুষা* (১৯৯১) *শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের পঙক্তি* (১৯৯৫), *নজরুল ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), *নজরুল স্বরলিপি সংগ্রহ* (১৯৯৭), *Poetry of Kazi Nazrul Islam* (1997) প্রভৃতি। **শান্তনু কায়সার** (জ. ১৯৫০)র *বঙ্কিমচন্দ্র ১ম খণ্ড* (১৯৮২) ও *২য় খণ্ড* (১৯৮৪), *কাব্যনাটক* (১৯৮৬), *তৃতীয় মীর* (১৯৮৪), *সুকান্ত ভট্টাচার্য* (১৯৯৫), *গভীর গভীরতর অসুখ*, *গদ্যসত্তার জীবনানন্দ* (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। শান্তনু কায়সার বস্তুনিষ্ঠ গবেষক, ভিন্নচিন্তার দ্যোতক। *তৃতীয় মীর* প্রবন্ধগ্রন্থে মীর মশাররফ বিষয়ে তাঁর আলোচনা ভিন্ন মাত্রার সংযোজন করেছে। মশাররফ-সত্তাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন অন্যমাত্রায়। এখানে তাঁর প্রবন্ধশৈলি জিজ্ঞাসুসূচক ও লক্ষ্যভেদী। প্রমাণসাপেক্ষ ও পদ্ধতিগত বর্ণনা শান্তনু কায়সারের আলোচনাকে করে তোলে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। এমনটাই তাঁর অভিনবত্ব। জীবনী : *অদ্বৈত মল্লবর্মন* (১৯৮৭), *মতিউল ইসলাম* (১৯৯২), *মোহাম্মদ মোর্তজা* (১৯৯৪) সম্পাদনা : *খান মোহাম্মদ ফারাবী রচনাসমগ্র* (১৯৮৫)। **রফিকুল ইসলাম (পিএসসি)** (জ. ১৯৪৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ সরল ও সাবলীল। এক ধরনের মননধর্ম সেখানে বিরাজমান। অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে* (১৯৮৩), *প্রতিরোধের প্রথম প্রহর* (১৯৮৫), *এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী* (১৯৮৫), *বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট* (১৯৮৬), *স্বৈরশাসনের নয় বছর* (১৯৯০), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯১), *বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে*

(১৯৯১), *তেরোজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুদণ্ড* (১৯৯৪), *সামরিক জান্তার রাজনীতি* (১৯৯৩), *ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ* (১৯৯২), *গোলকের কাহিনী* (১৯৮৮), *প্রতিরোধের রূপরেখা : রণনীতির সন্ধানে* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স, এস ফোর্স, কে ফোর্স* (১৯৯২), *ভয়াবহ গণহত্যা* (১৯৯২), *বিদ্রোহী মার্চ ১৯৭১* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (১৯৯৪), *শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৯৫), *স্বাধীনতার বাইশ বছর* (১৯৯৪), *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, বিরোধী শক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী* (১৯৯২), *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের দুশো রণাঙ্গন* (১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধের নৌকমান্ডো* (১৯৯২), *একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ* (১৯৯২), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধে রণকৌশল* (১৯৯৬), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি* (১৯৯৬), *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৬), *পঁচাত্তরের রক্তক্ষরণ* (১৯৯২), *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধে তিনজন* (১৯৯৪), *দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন* (১৯৯৩), *দক্ষিণ রণাঙ্গন* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ* (১৯৯৪), *Education and population Planning : Disturbing Paradox* (1993), *The Military in Politics* (1993) এছাড়া শিক্ষা-সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক তাঁর বেশ কিছু ইংরেজী গ্রন্থ রয়েছে। **শামসুজ্জামান খান** (জ. ১৯৪০) মননশীল লেখক ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রবন্ধ সাবলীল, সুন্দর। বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মীর মশাররফ সম্পর্কে অনেক অনালোকিত তথ্য তিনি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রগতিমূলক প্রবর্তনা থেকেই তিনি প্রবন্ধ লেখেন। তথ্যনির্ভর তাঁর প্রবন্ধ রুচিসম্মত ও মনোগ্রাহী। তাঁর প্রবন্ধ : *নানা প্রসঙ্গ* (১৯৮৩), *মাটি থেকে মহীরুহ* (১৯৯৪), *বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা* (১৯৯৫), *বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য* (১৯৯৪), *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে* (২০০৫), *ফোকলোর চর্চা* (২০০৬), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৭) প্রভৃতি। জীবনী : *মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী*। এছাড়া বহু গ্রন্থের সম্পাদনা এবং বাংলা একাডেমীর বিবিধ অভিধান গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে তিনি যুক্ত। **আনু মুহাম্মদ** (জ. ১৯৫৬) অর্থনীতির বিশেষক। আধিপত্যবাদ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। আনু মুহাম্মদ বামপন্থা চেতনাকে আরোপ করেন না তাঁর লেখায়, তবে পুঁজি বা শ্রেণিচরিত্রের স্বরূপ ও সম্পর্ককে যুক্তির সাহায্যে চিহ্নিত করেন। গদ্যভাষা মার্জিত, তথ্যদীপ্ত। *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন* (১৯৮৩), *গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল* (১৯৮৮), *ক্রান্তিকালের বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য* (১৯৯১),

বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক (১৯৯২), *অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র : সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা* (১৯৯২), *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি সম্ভব?* (১৯৯৫), *সমাজ সময় ও মানুষের লড়াই* (১৯৯৪), *কলম্বাসের আমেরিকা 'আবিষ্কার' ও বহুজাতিক মানুষেরা* (১৯৯৫), *নারী, পুরুষ ও সমাজ* (১৯৯৭), *মানুষের সমাজ* (২০০৬) প্রভৃতি। **সেলিনা হোসেন** (জ. ১৯৪৭) সৃজনশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। স্বদেশ-রাষ্ট্র পরিবৃত্ত, নারী অধিকার, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাকার সব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ। কথাশিল্পীর গদ্য নয়, মননঋদ্ধ তাঁর প্রবন্ধ। যুক্তিনিষ্ঠা এবং অধিকার-মর্যাদার দায়ে তাঁর বোধ প্রক্ষিপ্ত। সমাজ-ইতিহাস তাঁর যুক্তি থেকে অপসৃত না হওয়ায় প্রবন্ধগুলো হয়ে ওঠে বিচিত্রস্পর্শী, ব্যঞ্জনারঞ্জিত। এক্ষেত্রে যেমন সাবলীল এবং শক্তিশালী তিনি, তেমনি দীপিত এবং দ্বিধাহীন। সেলিনা হোসেনের প্রবন্ধগ্রন্থ : *স্বদেশে পরবাসী* (১৯৮৫), *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন* (১৯৮৫), *একাত্তরের ঢাকা* (১৯৯০), *নির্ভয় কর হে* (১৯৯৮) প্রভৃতি। **মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী** (১৯৩৮-২০০৮) গবেষণাধর্মী রচনা *বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৯৪৭-১৯৭০)* (১৯৮৫), *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল* (১৯৮৮), *বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯০) প্রভৃতি। তিনি *জসীমউদ্‌দীন* (১৯৮৮) ও *শহীদ সাবের* (১৯৮৯)-এর জীবনীও লিখেছেন। **মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ** (জ. ১৯৩৯) *শেক্সপীয়র ও বাংলা কবিতা, সমালোচনা* (১৯৮৫), *শব্দের শিল্পরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৫), *হাজার বছরের স্বপ্ন বাংলা একাডেমী* (১৯৯৪), *সত্যের প্রকাশ* (১৯৯৪) অনবদ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। শেক্সপীয়র বিষয়ক গ্রন্থটি ভিন্নমনস্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তাঁর চেতনা প্রজ্ঞাঋদ্ধ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। কবিতার যুক্তিটি তিনি নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। যুক্তিনিষ্ঠ তাঁর গদ্য, শব্দসন্ধানী এ লেখক পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছচিন্তায় উৎকীর্ণ। **রতনলাল চক্রবর্তী** (জ. ১৯৫১) ইতিহাসের লেখক। *বাংলাদেশের দলিল ও সংবাদপত্রে নেতাজী সুভাস* (১৯৯৭), *Rural Indebtedness in Bengal : 1928-1947* (1997), *শহীদ সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য* (১৯৯৭), *শহীদ জীবন* (১৯৯৭), *আবদুল হালিম* (১৯৯৬), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা* (১৯৯৩), *ভাষা আন্দোলন : দলিলপত্র* (১৯৯১), *বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক* (১৯৮৪), *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ* (১৯৮৪), *বাংলাদেশের মন্দির* (১৯৮৯) প্রভৃতি রতনলাল চক্রবর্তীর রচনা। **কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস** (১৯০৬-১৯৭৫) সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতায় পথিকৃৎ; লেখক। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ *সব মুখ চেনা চেনা* (১৯৮৬)। বেশ কিছু প্রবন্ধের সংকলন এ গ্রন্থটি। দীর্ঘ সাংবাদিক অভিজ্ঞতা ও বামপন্থি চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর

মেধা ও মননে এক সমৃদ্ধ রুচির স্বাক্ষর মেলে। নাম প্রবন্ধটি ব্যঙ্গাত্মক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামীপনা, এক শ্রেণির স্বার্থপর মানুষের মজুতদারী, অবসিত ন্যায়নীতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। **সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেমের** প্রবন্ধ সংকলন *অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়*, *স্মৃতিপটে শেখ মুজিব ও অন্যান্য* (১৯৮৬)। এটি দশটি প্রবন্ধের সংকলন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সানাউল হক, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ অনেক বড় ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত। প্রবন্ধকারের আপনদৃষ্টি ও মেজাজে সুলিখিত এ গ্রন্থটি। সমাজ-সংস্কৃতির একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নও এখানে পরিলক্ষিত। **সন্তোষ গুপ্ত** (১৯২৫-২০০৪) 'সত্যসন্ধ, ত্যাগী ও নির্ভীক পুরুষ, বিদ্বান, স্মৃতিমান ও যুক্তিবাদী'। তাঁর *অনুত্তম বক্তব্য* (১৯৮৭) তাঁর সাহিত্য সমালোচনাধর্মী গ্রন্থ। এখানে খ্যাতিমান চিত্রকরদের শিল্পরুচি নিয়ে যেমন আলোচনা আছে তেমনি কবিতা নিয়েও আছে বিশ্লেষণ। সন্তোষ গুপ্তর মননচিন্তার প্রকাশ এ গ্রন্থটি। তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিটিও এখানে অনুমান করা যায়। শক্তিশালী এ লেখকের প্রবন্ধের বই : *স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে* (১৯৯৬), *ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৬), *ইতিহাস আমাদের দিকে* (১৯৯৮), *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প : স্বরূপের সন্ধান* (১৯৯৮), *একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ* (১৯৮৮), *শিল্প সমাজ ও বাস্তবতা* (১৯৯৯), *অসমাপ্ত কবিতা* (১৯৯৯), *সমাজতন্ত্রের অন্য ইতিহাস* (২০০০), *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বনাম সাংবাদিকতা* (২০০০), *অনালোক আলোকস্তম্ভ* (২০০১) ও *ইতিহাসের ঋণাধ্বনি* (২০০৫)। পত্রিকার কলাম লেখক; কমিটেড, স্বচ্ছ প্রগতিমনস্কতার আজীবন পথিকৃৎ। *নানা কথা*, *নানা কথার পরের কথা*, *রুমীর আম্মা*, *নূহের কিশতি*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ* (১৯৯৩), *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *গল্পের গল্প*, *যুক্তিবিদ্যা*, *সঙ্গ প্রসঙ্গের লেখা* (২০১২) **সরদার ফজলুল করিম** (১৯২৫-২০১৪)র গ্রন্থ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ* সরদার করিমের অনবদ্য পুস্তক। আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতার ঢংয়ে রচিত এ গ্রন্থটি চমৎকার ও সুখপাঠ্য। আলাপচারিতায় লেখক ব্যক্তিকথা নয় উঠে আসে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-রাজনীতি-স্বদেশ সবকিছু। সময়ের দলিলে রূপান্তরিত হয় তাঁর রচনা। গ্রন্থটির পদ্ধতিগত বিন্যাস সুন্দর, ভঙ্গি প্রসাদগুণসম্পন্ন। নিপুণভাবে বর্ণিত এ রচনাটি বাংলাদেশের গদ্যবিবেচনায় অভিনব সংযোজন। **মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী** (১৯৫৫-২০১২) সঙ্গীত বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী* (১৯৯২), *বাংলা গানের ধারা* (১৯৯৩), *গানের ঝরনাতলায়* (১৯৯৭) অনুপম প্রবন্ধগ্রন্থ। **খোন্দকার আশরাফ হোসেন** (১৯৫০-২০১৩) *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন* (১৯৯৪), বিশ্ব কবিতার বিচিত্র সংবাদ নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে *বিশ্বকবিতার সোনালী শস্য* (২০০৫) গ্রন্থটি। এতে আছে নেরুদা, লোরকা, জরি গ্রাহাম, টেড

হিউজ, পাউল সেলান প্রমুখ কবির বৃত্তান্ত, চেতনাসংবাদ। বাংলাদেশের কবিতার মুগ্ধ পাঠকদের চিন্তা ও ভাবনার পরিধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এ গ্রন্থটির ভেতর দিয়ে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন কবির গদ্যে, রচিত প্রবন্ধ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সাবলীল। এক ধরনের যুক্তি আছে, বোধের সীমানায় সে যুক্তি একটা সংবেদনমাত্রাও অর্জন করে। খুব মগ্নভাষ্য এবং আকর্ষণীয় প্রবন্ধে তিনি সঙ্গত, যৌক্তিক। আর বিষয়ের গুণে এটি হয়ে উঠেছে আরও মনোমুগ্ধকর পাঠ। তাঁর অন্য গ্রন্থ *কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা* (২০১০) ও *রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস গীতাঞ্জলি* (২০১২)। **জুলফিকার মতিন** (জ. ১৯৪৬) *লক্ষ্য যেথা স্থির* (১৯৯৬), *কবিতার দেশ* (১৯৯৬), *সমাজ ও সাহিত্য : আধুনিকতা অর্জনের ধারা* (২০০১), *বিনাশী সময় অবিনাশী কাল : বাংলাদেশের সাহিত্য* (২০০১) প্রভৃতি গ্রন্থে অসামান্য মনস্বীতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ-মনস্ক চেতনায় বিশ্বাসী। সাহিত্যের নন্দনকে জীবনের জন্য আরাধ্য জ্ঞান করেন। কিন্তু কিছুই আরোপ করেন না, লেখায়। চিন্তার যে আয়োজন তা শ্রেণি-সমাজ-অর্থনীতির যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষা সাবলীল, প্রাঞ্জল, সমকালস্পর্শী। আধুনিক জীবনবীক্ষায় তাঁর সাহিত্যজ্ঞান বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে উচ্চমান-আশ্রয়ী। জীবনীগ্রন্থ : *মোহাম্মদ নজিবর রহমান* (১৯৯৫) *বিবি থেকে বেগম* (১৯৯৬) **আকিমুন রহমান** (জ. ১৯৫৯)র গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। নারীর চিন্তনে, যুক্তিপূর্ণ গদ্যে বাংলাদেশের সাহিত্যে; বিষয়ের ভিন্নতায় এটি একটি অভিনব পুস্তক। ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং একইসঙ্গে আছে সমাজভিত্তিক মূল্যায়ন আছে এটিতে। ভূমি-মাটির সংস্কৃতির পরিকাঠামোয় উঠে এসেছে নারীর সেকাল আর একালের ইতিহাস। এরূপ বিষয়-নির্বাচনেও আকিমুন রহমানের যোগ্যতাটি অনুমান করা যায়। পরিশ্রমী এ কাজে তিনি অনেকান্ত সফল। পরিচিতি মেলে গদ্যদৃষ্টির।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুবাদ

অনুবাদ দুরূহ কর্ম। বিভাগ-পূর্ব সময়ে বড় কবি-সাহিত্যিকদের (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দের মতো) বিচিত্র বিষয়ে অনুবাদে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ প্রবণতা অনেক পরে তৈরি হয়। কারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রুচিজ্ঞানের অভাব। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে যাঁদের নেতৃত্ব আমরা লক্ষ করি তাঁদের লেখক হয়ে ওঠা, সাহিত্যরুচি তৈরি হওয়া বলা চলে একেবারেই তাৎক্ষণিক এবং আনকোরা পর্যায়ের। এ পর্যন্ত তার বয়স পঞ্চাশ কিংবা কিছু অধিক। তবুও আধুনিক বিশ্বে পুঁজির নানামুখি সঞ্চালন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব, অবাধ তথ্য প্রবাহ সবকিছু মিলিয়ে কেউই আর নিশ্চল নয়। সেটা বাধ্য-অবাধ্য যেমন করেই হোক। সাহিত্য-সংস্কৃতিও এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন সেভাবেই এগুচ্ছে, বিবেচিতও হচ্ছে। বাংলাদেশে পূর্বের অভিজ্ঞতা এখন অতীত। অনেকেই অনুবাদে অনুরক্ত। সাফল্য তো হয়েছেনই। আমাদের অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময়ের সাহিত্যে এখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগও বিপুল। এটা অনেকের কাছেই এখন সহজ ও অনিবার্যও। যদি ধরি, ষাটের দশকে অনুবাদ কতোটা দুরূহ আর এখন কতোটা সহজসাধ্য! প্রচারমুখি বিশ্বে এ তাণ্ডব কতোটা জটিল, বহুমাত্রিক? জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী স্বাধীনতার অনতি পরে *শেক্সপীয়রের সনেট* অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন : 'অসুবিধে আছে শেকসপীয়র সনেটের তর্জমায়। ইংরেজীতে সবকথা তিনি সহজে বলেছেন, প্রায় কথ্যভাষার বাগধারায়, বাংলায় প্রায়ই তার কোন প্রতিরূপ নেই... বাংলা রূপান্তরের মধ্যে কৃত্রিমতা চলে আসে।' এটা সবকালের অনুবাদেরই চিরকালীন সমস্যা। তবুও অনুবাদ আছে। ভাষার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের জন্যে, আবিষ্কারের-প্রচারের আনন্দের জন্যে, 'বহুভাষী মানবজাতির অন্তর্গত ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্যে' অনুবাদ বিরাজমান। বাংলাদেশে এটি অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ। ব্যবসায়িক স্বার্থে, প্রচারের বাজারের কারণে অনুবাদের মান যে নিম্নগামি নয় তা-ও নয়। কিন্তু সরদার ফজলুল করিমের *প্লেটোর রিপাবলিক* কিংবা কবীর চৌধুরীর 'বেকেট-বীক্ষা'র গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। অনেক উচ্চ এবং সমৃদ্ধ। শুধু এ সময়েই কেন পরাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালে মুনীর

চৌধুরীর শেক্সপীয়ার-শ' অনুবাদকর্ম কিংবা আবুল কালাম শামসুদ্দীনের *ইলিয়াড*-এর অনুবাদ অমোচনীয়, ধ্রুপদী বললে ভুল হয় না। তবে অনুবাদের সমস্যা অনেক; ভাবগত, ভাষাগত তো বটেই। আর কবিতার অনুবাদ কী কখনও সম্ভব? কবি ব্যক্তিত্ব থাকলে সেটি আরও দুরূহ, ক্রমশ দুরূহতরও বটে। যা হোক, তবুও বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদ একটি নতুন ধারা এবং তা সচল ও বহমান ধারা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে অনেক এবং তার সফল মঞ্চায়নও সম্ভব হয়েছে। নবতর প্রজন্মও এ পথে হয়েছেন অনুগামী। এখানে বিভাগ-পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি অনুবাদকদের একটি তালিকা প্রদান করার চেষ্টা হয়েছে। যথাসাধ্য তাঁদের কৃতকর্মের দৃষ্টিচেতনাও এখানে বিশ্লেষিত। আমাদের এখানে মৌলিক অনুবাদ ও অনূদিত ব্যক্তিরাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, নাটকের অনুবাদ যারা করেছেন তাঁদের এ গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে (নাটক) রাখা হয়েছে।

আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮)
বিভাগোত্তর বাংলাদেশে দস্তয়ভস্কির *অপরাধ ও শাস্তি*, টলস্টয়ের *হাজী মুরাদ*, হেনরী এডামসের আত্মজীবনী, হেনরী জেমস এডামসে *শিক্ষাবিষয়ক আত্মচরিত* (১ম ও ২য় খণ্ড) আকবরউদ্দীনের গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ। রুশ সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের এ অনুবাদ যেমন তীক্ষ্ণধী তেমনি সাবলীল। তাঁর অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ, আকর্ষণীয়। উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনি ও ঘটনার পুনর্বিন্যাস, পরিবেশের সেটিংস যথাযথ। টলস্টয় কিংবা দস্তয়ভস্কির জীবনদৃষ্টি শিল্পমান অনুবাদে রক্ষা করা দুরূহ হলেও অনেকটা সফল হয়েছেন আকবরউদ্দীন। অনুবাদ সুপাঠ্য এবং আস্বাদনযোগ্য।

আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭)
অসকার ওয়াইল্ড-এর *আদর্শ স্বামী* (১৯৮২)র অনুবাদ করেছেন আনিসুজ্জামান। অনুবাদে তাঁর চর্চা কম হলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত সংযমও পরিলক্ষিত। সবচেয়ে বড় পরিবেশগুণ তিনি যথাযথ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

আবদার রশীদ (জ. ১৯১৮)
আবদার রশীদ বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি রঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রসবোধ সম্পন্ন লেখক। জাঁ পল সার্ত্রের *ছায়াহীন কায়া* (১৯৭৭), *ইলেকট্রা* (১৯৭৯), *অ্যান্টিগনি* (১৯৭৭) ইত্যাদি অনুবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ। সার্ত্র নিয়ে যথেষ্ট

জ্ঞানবুদ্ধি অর্জন করেছেন। অনুবাদে তিনি সৎ এবং পরিশ্রমী। চেতনাগত পরিশুদ্ধির চাপ আছে তাঁর কর্মকাণ্ডে। আবদার রশীদের সার্ত্র পঠন বেশ আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের সাহিত্যে এমন অনুবাদ পাঠকের দৃষ্টিচেতনা ও রুচিকে আধুনিক মনস্ক করে তোলে।

আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬)
স্বর্ণগর্দভ (১৯৬৫), *ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা* (১ম ও ২য় খণ্ড)-এর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ করেছেন। এটিই একমাত্র গ্রন্থ যেটি আমাদের নিকট ফ্রয়েডকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি ফ্রয়েড কর্তৃক অনুমোদিত জোয়ান রিভিয়ারের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এটি গ্রহণ করেছেন। স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিচেতনায় আবদুল গনি হাজারী প্রচণ্ড দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে তাঁর ভাষা কবিত্বপূর্ণ নয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও মনন চেতনায় ঋদ্ধ। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আবদুল গনি হাজারী রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডে এটি গ্রথিত রয়েছে। লুসিয়াস এপুলিয়াসের *গোল্ডেন এ্যাস*- এর অনুবাদ *স্বর্ণগর্দভ*। আসলে এটি লুসিয়াসের *রূপান্তর* (metamorphosis)-এর জনপ্রিয় নাম *স্বর্ণগর্দভ*। 'ইন্দ্রজাল সম্পর্কে অদম্য কৌতূহলের ফলে করিন্থের এক অভিজাত বংশের জনৈক লুসিয়াস কিভাবে একটি গাধায় রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি পেরিয়ে দেবী আইসিসের কৃপায় আবার নবরূপ ফিরে পেল'—তারই আখ্যান *স্বর্ণগর্দভ*। সমকালীন রোম সমাজের আলেখ্য এটি মৌলিক রচনার মতোই অনুবাদ করেছেন আবদুল গনি হাজারী। উল্লিখিত দুটো রচনার ক্ষেত্রেই তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (জ. ১৯৪০)
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অনুবাদ *শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস* (১৯৯২), *দ্যাগ হ্যামারশোল্ড* (১৯৬৯)। প্রমিথিউসের ভাবচেতনার স্বরূপ সাবলীল গদ্যে রচিত হয়েছে। তবে অনুবাদে তাঁর বেশি সাফল্য আসে নি। তবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অনুবাদ সুপাঠ্য; নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ভঙ্গির কারণেই। এক ধরনের চেতনাগত বক্তব্যই তিনি এর ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেটি তাঁর স্বাতন্ত্র্য, অবশ্য অনুবাদের মতো ফর্মে এক ধরনের প্রাবন্ধিক উচ্চারণই তিনি করেন। প্রমিথিউস কীরূপে সাফল্য ও একালেও ফলদায়ক তার মূল্যায়ন একটি বক্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়—এর ব্যত্যয় ঘটে না তাঁর লেখায়।

আবদুস সেলিম

বোর্টল্ড ব্রেশ্‌ট এর *গ্যালিলিও* (১৯৭৮)র অনুবাদ করেছেন আবদুস সেলিম। এটি এক অর্থে গ্যালিলিওর চেতনাগত দিক, অন্যদিকে ব্রেশ্‌ট-এর নাট্যফর্মকে বজায় রেখে পাঠককে পরিতৃপ্তি দেওয়া। এসব দুরূহ কর্মপ্রয়াস। ব্রেশ্‌ট আধুনিক নাট্যকার হিসেবে এখন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। তাঁর নাট্যফর্ম গুরুত্বপূর্ণ; এমন বিষয় অনুবাদে বহাল রাখা নিশ্চয়ই যোগ্যতার ব্যাপার। আবদুস সেলিমের গ্যালিলিও সুপাঠ্যও বটে। যাবতীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানচেতনার জয় পাঠক মহলের জন্য একটি অনিবার্য উপযোগ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)
অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। তুর্গেনিভের *The Virgin Soil*-এর অনুবাদ *অনাবাদী জমি* (১৯৩৮), তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের অনুবাদ *ত্রিস্রোতা* (১৯৩৯), তুর্গেনিভের *Torrents of Spring*-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত *খরতরঙ্গ* (১৯৫৩); হোমারের *ইলিয়ড* (১৯৬৭), *সেকালের ও একালের সেরা গল্প* (১৯৬৩)। চমৎকার অনুবাদে আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন এসব গ্রন্থের চরিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন কাল-ভূগোল সীমা অতিক্রম করে সর্বদেশিক ও কালিক আবর্তে। গদ্যভঙ্গি আড়ষ্ট নয়, কথাকারের ভূমিকায় তিনি হয়ে উঠেছেন নিজস্ব। শিল্পের ভাব ও সৌন্দর্য ভাষান্তরিত করা দুরূহ কাজ। কিন্তু অনুবাদক এ কঠিন কাজকে সহজ করেছেন, বজায় রেখেছেন এসব লেখকদের ধ্রুপদী ভাবমূর্তি।

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন
অনুবাদক ও প্রবন্ধকার। আরবী *ছোটগল্প* (১৩৭১), *তুহাফুতুল ফলাসিফা* (১৩৭১) প্রভৃতি গ্রন্থের সফল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। অনুবাদের ভেতর দিয়ে অনেক বিদেশি সাহিত্যের বিষয়কে তিনি পরিচয় করিয়েছেন।

আবু জাফর শামসুদ্‌দীন (১৯১১-১৯৮৮)
কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্‌দীন *শিল্পীর সাধনা* (১৯৬৭) অসম্ভব সুন্দর রচনা। শিল্পীর দৃষ্টিচেতনা, ভাষা, দার্শনিক চেতনা একটা সূক্ষ্মতার সমগ্রতা রচনা করে যেখানে নান্দনিক শুদ্ধতা অনুমান করা যায়। লেখক বাস্তবানুগ শিল্পবুদ্ধিতে বিশ্বাসী। চেতনা আছে দ্বান্দ্বিক সত্তার আবর্ত—যেটি এ গ্রন্থটিকে উচ্চতা দান করেছে। এছাড়া তাঁর অন্য অনুবাদ *খাপছাড়া* (১৯৬৮), *পার্লবার্কের সেরা গল্প* (১৯৬৮)। বিভাগোত্তর কালচেতনার সমৃদ্ধির স্বরূপটি মেলে তাঁর অনুবাদকর্মে।

আবু শাহরিয়ার

শেক্সপীয়রের *হ্যামলেট : ডেনমার্কের রাজকুমার* (১৯৭৯) ও *অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা* (১৯৭৮), ইউজীন ইয়েনেস্কোর তপ্ত *বাতাসে দুজন* (১৯৭৭) অনুবাদ করেছেন আবু শাহরিয়ার। বাংলাদেশে শেক্সপীয়ারের অনুবাদ নতুন নয়। আবু শাহরিয়ার ট্র্যাজেডি নাটক হ্যামলেটকে একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে নিয়ে এসেছেন। এর জন্য পঠনের আলাদা স্বাদ মেলে এবং এটা নিশ্চিত এতে করে মঞ্চেও শেক্সপীয়ার অভিনয়ের একটা বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতটি যথাযথ বজায় রেখেছেন নাট্যকার। ইউজীন ইয়নেস্কোর নাটক অনুবাদেও তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আলম খোরশেদ (জ. ১৯৬১)

অনুবাদের কাজে এ সময়ে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। অনুবাদের দক্ষতাও আছে। *যাদুবাস্তবতা গাথা : ল্যাতিন আমেরিকার গল্প* ছাড়াও বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্পের অনুবাদ করেছেন। তবে যত্নের ঘাটতি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুততা পরিলক্ষিত, এতে মূল লেখক অনুপস্থিত রয়ে যান। যেটা কাম্য নয়।

আলী আনোয়ার (১৯৩৫-২০১৪)

হ্যারল্ড পিন্টারের নাটকের অনুবাদ *অনিকেত বেদনা* (১৯৮৫)। আলী আনোয়ার মনস্বী লেখক। নাটক বিষয়ে তাঁর আছে প্রচুর পাঠ-অভিজ্ঞতা। অনুবাদে তিনি প্রচণ্ডরূপে মূলানুগ এবং সৃজনশীল। হ্যারল্ড পিন্টার ছাড়াও ইবসেনের নাটক নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। নাটকের আবহ এবং তার আধুনিক দৃষ্টিচেতনার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি নির্ভুল, নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী। ভাষা ও দৃষ্টিকোণ পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল। তাঁর পাবলো নেরুদার অনুবাদ অসামান্য ও আকর্ষণীয়।

আলী আহমদ (জ. ১৯৪৮)

কামিলো হোসে সেলা'র অনুবাদ *পাস্কুয়াল দুয়ার্তের পরিবার*, ডেরেক ওয়ালকোটের কাব্যনাট্য অবলম্বনে *স্বপ্নগিরি*, নগীব মাহফুজের অবলম্বনে *চোর ও সারমেয় সমাচার*, ইভান তুর্গেনিভের অনুবাদ *প্রথম প্রেম*, মার্কেস অবলম্বনে *বারো অভিযাত্রীর কাহিনী* এবং *মেঘ ও অন্যান্য দানব*, ওয়ে কেনজাবুরোর অনুবাদ *শিকার ও অন্যান্য গল্প* এবং নগীব মাহফুজের অনুবাদ *খোঁজ*। আলী আহমদ দক্ষ অনুবাদক। এ কাজেই তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগী। মূলত কথাসাহিত্যের অনুবাদে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের অনুবাদে তিনি সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের পরিকাঠামো নির্মাণ, কাহিনি কথনে

তাঁর যথেষ্ট মেধার স্বাক্ষর আছে। আলঙ্কারিক উচ্চতা ও শিল্পগুণ বজায়ে তিনি অনেকটাই মূলানুগ ও পরিচ্ছন্ন। কখনোই আলী আহমেদ স্বীয় কল্পনাকে বা বুদ্ধিকে আরোপ করে না অনুবাদের মধ্যে। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি ঘরানার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

আসকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫)
থর্নটন ওয়াইল্ডার অবলম্বনে *যন্ত্রণার চাপ* (১৯৭৮) অনুবাদ করেছেন আসকার ইবনে শাইখ। ষাটের গুরুত্বপূর্ণ এ নাট্যকার মৌলিক নাটক লিখলেও অনুবাদেও আধুনিক চিন্তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বিশ্বনাটকের গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যক্তিকে তিনি বাঙালির নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিসমাজের অন্তশ্চাপ, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, কী এবং কেন কিংবা ইত্যাকার এমনসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের সমাজজিজ্ঞাসার একরকম বাইরের বিষয়ই ছিল। আসকার ইবনে শাইখ অনুপ্রেরণাবশত এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এবং সফল হয়েছেন। মজার অনুবাদ *যন্ত্রণার চাপ*।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)
আহমদ ছফা অনুবাদ করেছেন *তানিয়া* (১৯৬৭), *ফাউস্ট* (১৯৮৬), *বার্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়ী রচনাবলী*। *ফাউস্টের* অনুবাদ খুব জটিল কর্ম। কাজী আবদুল ওদুদের পর তিনি এ কাজটি করেছেন। তাঁর এ অনুবাদ সুখপাঠ্য হলেও কাব্যমেজাজ একটু আড়ষ্ট। উচ্চমার্গের এ কবির জীবনচেতনা, দার্শনিক বুদ্ধি পরিবর্তিত ভাষায় বজায় রেখে করা কঠিন। তবুও ছফার অনুবাদই বেশি জনপ্রিয় এবং পাঠক গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অন্যান্য অনুবাদেও বেশ মননশীলতার পরিচয় লক্ষণীয়।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১)
কবীর চৌধুরী অনুবাদের জগতে এক বিস্ময়। বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি এখন অনুবাদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। সাহিত্যের সব শাখায় সমান তালে তিনি অনুবাদ করে চলেছেল। তাঁর কর্মপরিধি বিশাল। বাংলাদেশের অনুবাদে তাঁর তুল্য ব্যক্তিত্ব বিরল বললে কম বলা হয় না। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যকর্মের বাংলা অনুবাদ : *শেখভের গল্প* (১৯৬৯), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৭০), *গ্রেট গ্যাটসবি* (১৯৭১), *দি গ্রেপস অব র‍্যাথ* (১৯৮৯), *রূপান্তর* (১৯৯০), *বেউলফ* (১৯৮৫), *অল দি কিংস মেন* (১৯৯২), *ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী* (১৯৯৪), *চুম্বন* (২০০০), *কাফকার নির্বাচিত গল্প* (২০০১), *ব্লুবিয়ার্ড* (২০০১), *প্রেম ও কলেরা* (২০০২), *অরণ্যের গল্পমালা*

(২০০২), *ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন* (২০০১), *ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড* (২০০২), ক্যথরিনা ব্লুমের *হারানো সম্ভ্রম* (২০০৩), *ডিনারপার্টি* (২০০৩), *নেটিভসান* (২০০৫), *হোর্হে বোরহেসের নির্বাচিত গল্প* (২০০৬), *দুই নোবেল বিজয়ীর নির্বাচিত ছোটগল্প* (২০০৬), *ব্ল্যাক বয়* (২০০৬), *দি লেইট বুর্জোয়া ওয়াল্ড* (২০০৬), *ন্যুড চিত্রকর্ম* (২০০৬), *মানুষের চিত্রকর্ম* (২০০৬), *চোখের আলোয় দেখেছিলেম* (২০০৬), *জীবনযাপনের শিল্পকলা* (২০১২)।

নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর

আহ্বান (১৯৬৫), *শত্রু* (১৯৬২), *পাঁচটি একাঙ্কিকা* (১৯৬৩), *অচেনা* (১৯৬৯), *শহীদের প্রতীক্ষায়* (১৯৫৯), *হেক্টর* (১৯৬৯), *ছায়াবাসনা* (১৯৬৬), *সেই নিরালা প্রান্তর* (১৯৬৬), *সম্রাট জোনস* (১৯৬৪), *অমা রজনীর পথে* (১৯৬৬), *প্রাণের চেয়ে প্রিয়* (১৯৭০), *লিসিসট্র্যাটা* (১৯৮৪), *ভেক* (১৯৮৬), *বিহঙ্গ* (১৯৮৬), *জননী সাহসিকা ও তার সন্তানরা* (১৯৮৪), *গডোর প্রতীক্ষায়* (১৯৮১), *ঊষা দিশেহারা ও অন্যান্য নাটিকা* (১৯৯২), *ওথেলো* (১৯৮১), *শাইলোর উন্মাদিনী* (১৯৯০), *মানব বিদ্বেষী* (১৯৯০), *বেকেটের দুটি নাটক* (যুগ্মভাবে) (১৯৯৯), *বেকেটের তিনটি নাটক* (২০০০), *শান্তি* (১৯৯৮), *ফেইড্রা* (১৯৯৬), *হ্যামলেট মেশিন* (১৯৯৭), *গণ্ডার* (২০০০), *সেরা তিন একাঙ্কিকা* (২০০২), *সমরেশ কোথায়* (২০০২), *ওয়াচ অন দি রাইন* (২০০৩), *ক্যাথলিন* (১৯৭৪), *অমা রজনীর পথে* (১৯৮৭), *বেকেটের পনেরো নাটক* (যুগ্মভাবে) (২০০৬)।

কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ

ভাৎসারোভের কবিতা (১৯৮০), *আধুনিক বুলগেরীয় কবিতা* (১৯৮০), *রিস্তো বোতেভের কবিতা* (১৯৮৮), *রিস্তো স্মিনেনস্কির কবিতা* (১৯৮৯), *কাহলির জিবরানের কবিতা* (১৯৯২), *সচিত্র প্রেমের কবিতা* (২০০০)।

গবেষণা গ্রন্থের অনুবাদ

আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য (১৯৬৮), *সপ্তরথী* (১৯৭০), *মার্কিন উপন্যাস ও তার ঐতিহ্য* (১৯৭০), *অবিস্মরণীয় বই* (১৯৬০), *মানুষের শিল্পকর্ম* প্রভৃতি।

খুব স্বল্পকথায় অনেক দূরে পৌঁছান কবীর চৌধুরী। সব বিষয়ে সৃজনী চেতনা ও মননধর্ম তাকে বজায়। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়কে বাঙালি পাঠকের সামনে তিনি উন্মুক্ত করেছেন। কবীর চৌধুরী সাবলীল বক্তব্য বয়ানে, মূলানুগ সত্যতা সুনিশ্চিত তাঁর লেখায়।

কাওসার হুসাইন (জ. ১৯৬৩)

ইতালো কালভিনের গল্প (১৯৯৬), ইউলিয়াম ব্লেইকের *সঙ্গস অব ইনোসেন্স এন্ড এক্সপেরিয়েন্স* অবলম্বনে *শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান* (১৯৯১), *বেকনের প্রবন্ধ*

অনুবাদ করেছেন। মেধাবী এ লেখক অনুবাদে সাবলীল ও সচকিত। গদ্য নির্ভার, পরিশুদ্ধ। কাওসার হুসাইন যথোচিতরূপে মূলকে অনুসরণ করেছেন। কায়েম করেছেন নিজের স্বাতন্ত্র্য। সুপাঠ্য তাঁর রচনা।

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস (১৯০৬-১৯৭৫)
বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রধানত যুক্ত থাকলেও অনুবাদ বিষয়ে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। চীনের গল্প অবলম্বনে শিশু সাহিত্যে আলাদা একটি পাঠ তৈরি করেছেন তিনি। নাটকেও তাঁর বিপুল উৎসাহ ছিল। *স্ট্রীন্ডবার্গের সাতটি নাটক* (১৯৭৮) অনুবাদই তার প্রমাণ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্ট্রীন্ডবার্গের মতো খ্যাতিমান নাট্যকারকে তিনি অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছেন। খুব মননশীল পরিচর্যা পরিলক্ষিত এ অনুবাদে। সাতটি নাটকে পরিপূর্ণ স্ট্রীন্ডবার্গ পাঠকের সামনে উপস্থিত। এবং পরিচিতি মেলে জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক বিষয়ের। এ নাটকটি অনুবাদের ফলে বাংলাদেশের নাট্যজগত হয়েছে সমৃদ্ধ। বিস্মৃতপ্রায় কাজী ইদরিস এ নাটক অনুবাদের ভেতর দিয়েই অমলিন।

খায়রুল আলম সবুজ (জ. ১৯৫২)
গাঙচিল, *আন্তিগোনে* (১৯৯০), *নোরা* (১৯৯৬), *বুড়োবট ও শকুন* (১৯৯৬) খায়রুল আলম সবুজের অনুবাদ। নাটক অনুবাদে তিনি অনেকাংশে সফল। তবে তাঁর অনুবাদ মঞ্চকেন্দ্রিক, সাহিত্য রস সৃজনে পরিপূর্ণ মনে হয় না। নাট্যগুণ বজায়ে তিনি যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। খায়রুল আলম সবুজ এ কর্মে নিজেকে অনুবর্তী করেছেন তিনি, অর্জন করেছেন এদেশীয় কাঠামো ও পরিবেশ। অনুবাদে তাঁর নাট্যক্রিয়া প্রশংসনীয়, পরিশীলিত।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩)
খোন্দকার আশরাফ হোসেন কবি হলেও অনুবাদে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সম্প্রতি *টেরি ঈগলটন সাহিত্যতত্ত্ব* (২০০৪)র অনুবাদে হয়েছেন খ্যাতিমান। কাঠামো, উত্তর-কাঠামো বিষয়ক বিশ্বের সাম্প্রতিক ধারণা এ গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এগুলো ঈগলটনের চেতনারই অংশ কিন্তু অনুবাদক পুনঃসৃষ্টি সম্পন্ন করেছেন তাঁর লেখায়। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের গদ্য সৃজনশীল, সুপাঠ্য। সাহিত্যত্ত্বের আলোচনায় এ গ্রন্থটি একটি অনিবার্য সংযোজন। এছাড়া পুরাণকোষগ্রন্থও আছে তাঁর। সফোক্লিসের *রাজা ঈদিপাস* (১৯৮৬), ইউরিপিডিসের *আলসেস্টিস* (১৯৮৭), *পাউল সেলানের কবিতা* (১৯৯৭), *সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের*

উপাদান (১৯৮৯) এসব গ্রন্থ অনুবাদের ভেতর দিয়ে এ ধারাটিকে তিনি করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। কবির আবেগ শুধু নয়, পঠন-পাঠনে যথেষ্ট প্রদীপ্ত এ সমালোচক, সৃজনশীল-দক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুবাদক।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪)
কবি গোলাম মোস্তফা উর্দু ও আরবি ভাষাজ্ঞ, একই সঙ্গে ইসলামী ভাবচেতনার বিষয়ে ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। কখনোই এ চেতনা থেকে তিনি বিসর্জিত হননি। শুধু আবেগ নয় এক ধরনের বিশ্বাসও ছিল তাঁর এ বিষয়ে। এমন প্রণোদনা থেকে গোলাম মোস্তফার অনুবাদ : *মুসাদ্দাসে-হালী* (১৯৪৯), *কালামে ইকবাল* (১৯৫৭), *আল কুরআন*, *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* (১৯৬০)। ইসলামের প্রশস্তি কীর্তন বিধৃত হয়েছে এসব রচনায়। এক ধরনের আত্মপরিতৃপ্তির অনুষঙ্গ যুক্ত থাকায় এসব রচনা তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না। অবশ্য এ ধরনের রচনায় আবেগ ও স্তুতি স্বভাবতই অচেতন থাকে না। তবে কবি গোলাম মোস্তফার অনুবাদ এসব সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়।

চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-১৯৭৭)
নিষিদ্ধ ফল (১৯৬০), *তাসকিরাতুল ওয়াকিয়াত* (১৯৬৮), *টমাস জেফারসন* (১৯৫৮), *প্রজাপতির বিচিত্র কথা* (১৯৬২), *মেক্সিকো* (১৯৬৭), *আফ্রিকার অভ্যন্তরে* (১৯৬৯) এসব বিচিত্র রকমের অনুবাদে চৌধুরী শামসুর রহমান বেশ সৃজনশীল। তিনি সৃজনশীল সাহিত্যিকও বটে। ষাটের সাহিত্য পরিমণ্ডলে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ কারণে। তার মধ্যে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ। শামসুর রহমানের আগ্রহও যেমন নানামুখি, তেমনি রসবোধ জ্ঞানেও তিনি প্রখর। বোধকরি আগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর রসবোধ। উল্লিখিত অনুবাদে তিনি একটা পর্যায় অতিক্রম করেছেন, সন্দেহ নেই। সাহিত্যের সন্ধিৎসায় এগুলো গুরুত্ববহও বটে কিন্তু পর্যাপ্ত নন তিনি। একমুখি বিষয়ে মনযোগী হলেই তাঁর সাফল্য আরও বাড়ত মনে হয়। যেমন মেক্সিকো বা টমাস জেফারসন বিষয়ের কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ *নিষিদ্ধ ফল*। সেটি যে মানেরই হোক তাতে পাঠকের পাঠ থাকে। তবুও পূর্ব-পাকিস্তানে অনুবাদের পথরেখায় তিনি অমোচনীয় নন।

জাফর তালুকদার (জ. ১৯৫২)
জাফর তালুকদার গল্পের অনুবাদ করেছেন। এসব গল্পে তিনি অনেকটা সাবলীল। তাঁর গল্পকাঠামোর নন্দনে এক রকমের ঐতিহ্যিক সামঞ্জস্য তৈরি হয়। বাইরের কাহিনি হলেও এক ধরনের ঐক্য পাওয়া যায় এদেশীয় ভাবচেতনার সঙ্গে। তাঁর

অনূদিত গ্রন্থ *ইন্দোনেশিয়ার গল্প* (১৯৮৯), *ঢেউয়ের গান* (১৯৯১), *ভিনদেশী মজার গল্প* (১৯৯৬), *ফ্রান্সের রূপকথা* (১৯৯৭), *নানান দেশের রূপকথা* (১৯৯৭), *বিদেশী মজার গল্প* (১৯৯২) প্রভৃতি। অনুবাদের পরিচর্যায় তাঁর যাত্রা পাঠককে আশান্বিত করে।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ *শেক্সপীয়রের সনেট* (১৯৭৭)। একটি দুরূহ কর্ম তিনি এক্ষেত্রে সম্পন্ন করেছেন। শেক্সপীয়ার অনেক বড় কবি, তাঁর সনেটের ছন্দবৈচিত্র্য, আলঙ্কারিক বিভা, উপস্থাপন প্রয়াস একদিকে যেমন মধুর অন্যদিকে তেমনি দুরূহ। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অসাধারণ করে তুলেছেন তাঁর সনেটকে। এ বিষয়ক তাঁর দীর্ঘায়ত ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক, অনুবাদের ফলে বাংলাভাষাভাষীদের কাছে শেক্সপীয়ার অনেক সহজ হয়েছে, কবিবান্ধবকে চিনে নিতে পেরেছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিজেও কবি, সুতরাং কবির মর্ম তার আয়ত্তে, সনেট অনুবাদে সে বিবেচনাটি তিনি বজায় রেখেছেন। *অ্যারিওপাজিটিকা* (১৯৭১), *স্যমসন অ্যাগানিসটিজ* (১৯৭৩), *টেমপেস্ট* (১৯৮৫) প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ। মিল্টন বিষয়ে তাঁর পাঠ-অভিজ্ঞতা আছে, দৃষ্টিকোণ কিংবা দার্শনিক বুদ্ধির জায়গাটি অনুবাদকের করায়ত্ত। বাংলাদেশে মিল্টনচর্চায় তিনিই পথিকৃৎ। এ প্রয়াসটি আমরা তাঁর অনুবাদে লক্ষ করি। নাটকীয় অবয়ব ও আবহ, সংলাপগুণ, আবহগত পরিচর্যা বিদ্যমান অ্যারিওপাজিটিকা কিংবা স্যমসন অনুবাদে। সবচেয়ে বড় অনুবাদের ব্যাপারে দীর্ঘ পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন, পরিচর্যাতেও তিনি যত্নশীল এবং পরিশ্রমী। অনুবাদ বিষয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী একটি গ্রন্থও লিখেছেন।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮)

জিয়া হায়দার নাটকের তত্ত্ব এবং অনুবাদ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিজেও সৃজনশীল নাট্যকার। *এ্যান্টিগোনে* (১৯৯২) তাঁর অনূদিত নাটক। এ নাটকে তিনি মূলানুগ, স্বচ্ছন্দ। গ্রীক থেকে ইংরেজি হওয়ার পর বাংলায় কিংবা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন হয়। জিয়া হায়দারও তেমনটি করেছেন। তাঁর গদ্য কাঙ্ক্ষিত, নাট্যভাষা ঋজু। তবে এটি তেমন পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। কারণ, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। তবুও বাংলাদেশে এটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ, সন্দেহ নেই।

ফতেহ লোহানী (১৯২০-১৯৭৫)

ইউজিন ও'নীলের *নাটক চতুষ্টয়* (১৯৬৭), আর্থার মিলারের *একটি সামান্য মৃত্যু* (১৯৭৯) ফতেহ লোহানী অনূদিত নাটক। বিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশে তিনি নাটকে

গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। ও'নীলের নাটকের অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান এ নাট্যকার বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর অনেক ভাষায় তাঁর নাটক যেমন অনূদিত তেমনি এ বিষয়ক ধারণা বা জ্ঞানও হয়েছে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। আর্থার মিলারের অনেকেই অনুবাদ করলেও ফতেহ লোহানীর অনুবাদ গ্রহণযোগ্য এবং বেশি নাট্যমনস্ক। ফতেহ লোহানী একাধারে নাট্যকার এবং নাট্য অনুবাদক। সে কারণে অনুবাদে তিনি ও'নীল কিংবা মিলারের প্রবণতা ও নাট্যক্ষেত্রটি বুঝে উঠতে সক্ষম। সেটির প্রমাণ তাঁর অনুবাদে মিলেছে।

বদিউর রহমান (জ. ১৯৪৭)
বদিউর রহমান সমাজমনস্ক লেখক। *এরস্টিটলের পোয়েটিক্স* (১৯৯৫), *হোরেসের আর্সপোয়েটিকা* (১৯৯৬), *লঙ্গিনাসের কাব্যতত্ত্ব* (১৯৭৭) এসব অনুবাদে সাহিত্যতত্ত্বের নতুন জগতকে তিনি উন্মোচন করেছেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়ক কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন। বদিউর রহমান হোরেস কিংবা লঙ্গিনুসের পাঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর ভাবনা একটু আড়ষ্ট, দ্বিধান্বিত। পোয়েটিকসও এ কারণেই পাঠকপ্রিয়তা কম পেয়েছে। তবুও বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

মতিনউদ্‌দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০)
অর্থনীতির গোড়ার কথা (১৯৬৪), *ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট* (১৯৬৪), *শত জীবনের কথা* (১৯৬২), *অশান্ত পৃথিবী* (১৯৬০), *জনসংখ্যা বাড়ছে* (১৯৫৯), *বিজন বনের রূপকথা* (১৯৫৯), *হাতের কাছের কলকব্জা কিভাবে চলে* (১৯৬৪), *চালাক হওয়ার পয়লা কিতাব* (১৯৫৮), *জগৎ জুড়ে মজার খেলা* (১৯৬৪) এমন অনেক কাজে তিনি সফল। মতিনউদ্‌দীন পরিশ্রমী এবং মেধাবী লেখক। মেধার পরিচর্যা করেছেন নানা বিষয়ে। বিচিত্রমুখি বিষয়ের চর্চা তিনি করেছেন। প্রধানত গল্পভঙ্গিটিতে তিনি বেশি ক্রিয়াশীল। উল্লিখিত এসব গ্রন্থেও তার প্রমাণ রয়েছে। তবে তাঁর সম্ভাবনা আরও সিরিয়াস কর্মে সমন্বিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

মফিজ চৌধুরী
শেক্সপীয়ারের *কিং লিয়র* (১৯৭৮), *অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা* (১৯৯২)র অনুবাদ করেছেন মফিজ চৌধুরী। অনেকেই এ নাট্যকারের নাটকের অনুবাদ করেছেন এ পর্যায়ে মফিজ চৌধুরী ব্যতিক্রমী। চরিত্র পরিস্ফুটন, আবহ নির্মাণ, গল্প-বর্ণনায়

তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে তাঁর অনুবাদ। তবুও সেটিংস কিংবা মূলানুবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

মান্নান হীরা (জ. ১৯৫৭)
মান্নান হীরার *কোরিওলেনাস* (১৯৭৮) অনুবাদের ফলে নিজের নাটক হিসেবেই পরিগণিত বলা চলে। বাংলাদেশের নাটকে এটি অনবদ্য সংযোজন। দেশীয় আবহটি চমৎকার বজায় রেখেছেন নাট্যকার।

মাফীজ দীন সেখ
মহাকবি গ্যাটের *ক্লাভিগো* (১৯৯৪) নাটকের অনুবাদ করেছেন তিনি। এটি খুব দুরূহ অনুবাদ। বাংলাভাষীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গ্যেটের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিচেতনার সতর্ক বিবেচনা এখানে পরিলক্ষিত।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)
মুনীর চৌধুরী মনস্বী নাট্যকার, তাঁর আধুনিকমনস্কতার তুলনা হয় না। অনুবাদের ক্ষেত্রটিতেও তিনি যথেষ্ট আধুনিক। বলা চলে বাংলাদেশের নাটকের অনুবাদে তিনি পথিকৃৎ। স্বল্প সময়ে অনেক মেধাবী কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বহুমনস্ক, বিরলপ্রজ গুণী এ নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরিত নাটক জর্জ বার্নাড শ'র *You never can tell*-এর রূপান্তর *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৭), জন গলস্‌ওয়ার্দীর *The silver box*-এর রূপান্তর *রূপার কৌটা* (১৯৬৯), জোহান অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গের *The father*-এর রূপান্তর *জনক* (১৯৭০)।
রূপান্তরিত একাঙ্ক নাটক *স্বামী সাহেবের অনশনব্রত* (১৯৪৬), জমা খরচ ও ইজা (১৯৬৮), মহারাজ (১৯৬৮), গুর্গন খাঁর হীরা (১৯৬৮), ললাট লিখন (১৯৬৯)
অনূদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার অবলম্বনে 'টেমিং অব্ দি শ্র'র অবলম্বনে *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০)। এ নাটকে অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে মুনীর চৌধুরী প্রকৃত নাটকীয় আবহ সৃষ্টি, দক্ষ সংলাপ তৈরি এবং রসবোধের তীক্ষ্ণ পরিমার্জনা এনে ইন্দ্রিয়গ্রামে যথেষ্ট প্রাণ সৃষ্টি করেন। নাটকটির অনুবাদক হিসেবে মুনীর চৌধুরী একটি দৃষ্টান্ত।
অনূদিত রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক :
শেকসপীয়রের *ওথেলো*, টেনেসী উইলিয়ামস-এর এ স্ট্রীটকার নেম্‌ড্ ডিজায়ার অবলম্বনে *গাড়ীর নাম বাসনাপুর*, রোমিও-জুলিয়েট, শেকস্‌পীয়রের মাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নাথিং-এর অনুবাদ *অকারণ ডামাডোল*, জর্জ বার্নার্ড শ'র *ম্যান এ্যান্ড*

সুপারম্যান, ইউজীন ও'নীল মর্নিং বিকাস্ ইলেকট্রার অনুবাদ *ইলেকট্রার জন্য শোক*, শেরিডানের *দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল*।

মুস্তাফিজুর রহমান

জাঁ পল সার্ত্রের *নিঃশব্দ নরকে* (১৯৭৬)র অনুবাদক মুস্তাফিজুর রহমান। এটি চমৎকার একটি রচনা। মাঝারী কলেবরের এ গ্রন্থটি বেশ পাঠকপ্রিয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনিক সার্ত্র এবং তাঁর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি মেলে এ রচনায়। মুস্তাফিজুর রহমান সৃজনী প্রেক্ষণে কথক প্রয়াসে অনবদ্য থেকে অনুবাদটি সম্পন্ন করেছেন। রসবোধের প্রাচুর্যও বেশ আকর্ষণীয়। আলবার্তো কামুর *ক্যালিগুলা* (১৯৭৬) তাঁর অন্য অনুবাদ। অ্যাবসার্ড দৃষ্টিভঙ্গি নয়, টেলিং-এর কারণেই তা বেশ গুরুত্ববহ।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯)

পরিবর্তনের পথে (১৯৭২), *আগামেনন* (১৯৮৭), *ইউনুস এমরের কবিতা* (১৯৯২), *বাস্তহারা* (১৯৯৫), *ফ্যবারী ও কনরের গল্প* (১৯৯৭), *নীল সমুদ্রের ঝড়* (১৯৮৪), *রোমিও জুলিয়েট* (১৯৯৮) প্রভৃতি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার অনুবাদগ্রন্থ। নূরুল হুদার কবিতা অনুবাদ বেশ আকর্ষণীয়। খুব দ্রুত তা মর্মে পৌঁছয়। গদ্য ঝরঝরে, মুক্ত, দ্বিধাহীন ও সাবলীল। কবির ভিত্তিতে অন্য কবিদের খোঁজেন তিনি। বিশেষ করে শেক্সপীয়ার তাঁর আগ্রহের বিষয়। শেক্সপীয়ার নাটক লিখলেও কবিমনন ছিল খুবই উচ্চমানের। অনেকের মতে কবিভিত্তিটিই তাঁর প্রধান, এমন সত্যটি অনুধাবন করেন। কবি নূরুল হুদা সে পরিপ্রেক্ষিতে শেক্সপীয়ারকে খুঁজে পেয়েছেন বলেই মনে হয়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থগুলোও মূল্যবান। সর্বোপরি বিষয়ের স্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিকোণের গুণে কবিতা এবং গল্প দুধরনের অনুবাদেই তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রচুর অনুবাদের কাজ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ *রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম* (১৯৪২), *অমিয় শতক* (১৯৪০), *দীওয়ানে হাফিজ* (১৯৩৮), *শিক্ওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ* (১৯৪২), *মহানবী* (১৯৪৬), *বাইঅতনামা* (১৯৪৮), *বিদ্যাপতি শতক* (১৯৫৪), *কুরআন প্রসঙ্গ* (১৯৬২), *মহররম শরীফ* (১৯৬২), *অমর কাব্য* (১৯৬৩), *ইসলাম প্রসঙ্গ* (১৯৬৩), *Hundred Saying of the Holy Prophet* (1945), *Buddhist Mystic Songs* (1960)| ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, এবং সে কারণেই অনুবাদকর্মে তিনি স্বচ্ছন্দ্য, এগুলো প্রত্যেকটিই তাঁর ধ্রুপদীমানের কাজ। তবে

কবিমনস্কতা দুর্বল হওয়ায় ওমর খৈয়াম কিংবা হাফিজ অনুবাদ বেশি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। প্রধানত গবেষণাধর্মী কাজেই তিনি বেশি সফল। বাংলাদেশের অনুবাদের ভিত্তিটি তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠা পায়।

মোবারক হোসেন খান (জ. ১৯৩৮)
বিচিত্র বিষয়ের অনুবাদ করেছেন। রূপকথা, রোম্যান্সধর্মী বিষয় নিয়েই তার অনুবাদ। অনুবাদের চর্চা তাঁর দীর্ঘদিনের। শিশু-কিশোর উপযোগী এসব অনুবাদে তিনি অনেকটা সফল। তবে সব অনুবাদই গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পমান বজায়ও থাকেনি। *তারাস বুলবা* (১৯৯১), *ক্যাপ্টেন দুহিতা* (১৯৮১), *নিঃসঙ্গ* (১৯৭৯), *তিন তরঙ্গ* (১৯৮৩), *শিকারীর গুহা* (১৯৮১), *অ্যারাবিয়ান নাইটস* (১৯৯৬), *টেইল্স ফ্রম শেক্সপীয়ার* (১৯৯৬), *সাগরের হাতছানি* (১৯৯৬), *এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী* (১৯৯৫), *রূপকথার বিশ্ব* (১৯৯৬), *কিশোর চিরায়ত কাহিনী* (১৯৯৪), *এশিয়ার লোককাহিনী* (১৯৮৫), *বিশ্বের অন্যান্য গল্প* (১৯৯৫), *আইভানভ* (১৯৭৮), *পৃথিবীর প্রথম দিনগুলো* (১৯৮৬), *নোবেল বিজয়ীদের নির্বাচিত গল্প* (১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৯১), *পৃথিবীর সেরা গল্প* (১৯৮৭), *সাতনরী গপ্পো* (১৯৮২), *আফ্রিকার নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫), *'বিস্ময়' গ্রহের উপাখ্যান* (১৯৯১), *ঈশপের গল্প* (১৯৯২), *ঈশপের আরো গল্প* (১৯৯২), *শ্রেষ্ঠ থ্রিলার কাহিনী* (১৯৯৫), *বিশ্বনন্দিত গল্প* (১৯৯১), *আমেরিকার ফার্স্টলেডীর বিচিত্র জীবন* (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ।

মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ (জ. ১৯৩৯)
মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ অনুবাদের কাজ মননধর্মী। নিজস্ব শৈলি তিনি অর্জন করেছেন এক্ষেত্রে। *ভাষা চিন্তায় ও কর্মে* (১৯৬৯), *মাছি*, *তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ* (১৯৮৪), *হাসান বয়াতীর সুখ-দুঃখ* (১৯৯৪) তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। হারুন-উর-রশিদ পরিশ্রমী এবং রুচিশীল অনুবাদক। *হাসান বয়াতীর সুখ দুঃখ* কিংবা ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদে সৃজনশীলতার ছাপ আছে। সুপাঠ্য তাঁর অনুবাদ।

রশীদ হায়দার (জ. ১৯৪১)
ফ্রনৎস্ কাফকার *কাঠগড়া* (১৯৮৪)র অনুবাদ করেছেন রশীদ হায়দার। এটি অনুবাদে লেখক অনেকটা সাবলীল। উপস্থাপিত ভাষ্য বেশ আবর্ষণীয়। কাফকা-অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন রুচির নিশানা দেয়। বিশেষ করে সাহিত্যের আধুনিক চিন্তা-চেতনার বিনির্মাণে কাফকা পঠন এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। রশীদ হায়দার

অনুবাদের ভেতর দিয়ে সে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। মূলাশ্রয়ী স্বাধীন এ রচনাটি নিজস্ব স্টাইলে ভাস্বর।

শফি আহমেদ (জ. ১৯৪৮)
জন স্টাইনবেক *মুক্তো* (১৯৮৭), টি. এস. এলিয়ট *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* (১৯৯৩), ওলে সোয়েংকা *দ্য লায়ন এ্যান্ড দ্য জুয়েল* (১৯৯৪), টি. এস. এলিয়ট *পারিবারিক পুনর্মিলনী* (১৯৯৫), *মোমাডের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ* (১৯৯৫), *নারী-কাহিনী* (১৯৯৫) শফি আহমদের অনুবাদ। প্রত্যেকটি কাজেই শফি আহমেদ সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদের সবচেয়ে বড় দিক, এতে তিনি নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। মূল লেখকের কণ্ঠস্বর বজায় রেখে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছেন তিনি এসব রচনায়। সজীব ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে স্টাইনবেক, এলিয়ট, সোয়েঙ্কার রচনায়। তাছাড়া তাঁর অনুবাদের গুণমত মানটুকু সম্পূর্ণ বজায় আছে।

শহীদ আখন্দ (জ. ১৯৩৫)
উইলা ক্যাথারের *মানসী* (১৯৫৯), জাঁ পল সার্ত্রে এর *যখন সুমতি* (১৯৭৮), জাঁ পল সার্ত্রে এর *আরো কিছু জীবন* (১৯৮০), জেড এ ভুট্টোর *আমাকে হত্যা করা হলে* (১৯৮১) শহীদ আখন্দের অনুবাদ। শহীদ আখন্দ মূল্যবান কথাকার। তাঁর অনুবাদ প্রবলরূপে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। সৃষ্টিতে সফলও বলা চলে। সার্ত্রে-এর বর্ণনাকে নিজের মতো করে পরিবেশন করেছেন। *যখন সুমতি* পাঠকনন্দিত অনুবাদ। ভাষার ভেতরে রসবোধ ও প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যের আরাধ্য দিকটিও এখানে কায়েম হয়েছে।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)
শামসুর রাহমান *হ্যামলেট : ডেনমার্কের যুবরাজ* (১৯৯৫) রচনা করেছেন। এটি শেক্সপীয়ারের মূলানুগ রচনা। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। শামসুর রাহমান এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। কিন্তু কবিচিন্তনে তা হয়ে উঠেছে শামসুর রাহমানের রচনা। শেক্সপীয়রের পুনঃসৃষ্টি বলা যেতে পারে এটিকে। স্বতন্ত্র স্বরে নতুন ইঙ্গিতে শামসুর রাহমানের ‘হ্যামলেট’ আমাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে যেন উস্কে দিয়েছে।

শামসুদ্দিন চৌধুরী (জ. ১৯৬৬)
অদৃষ্টবাদী জ্যাক ও তার মনিব (১৩৯৯), *মাইকেলের চেখভের অভিনয় পদ্ধতি* (১৪০৯), *ইলিয়াদ* (১৪১২), *চিলিতে অজ্ঞাতবাস* (১৪১৩), *নব উপন্যাসের পক্ষে*

(১৪১৭), *ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস নির্বাচিত রচনা* (১৪১৭), *নন্দনতত্ত্ব* (১৪১৭)-এর অনুবাদক শামসুদ্দিন চৌধুরী। এমন গ্রন্থের অনুবাদের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষায় বিদেশি চিন্তকদের অনুধাবনের পথ অবমুক্ত করাই শুধু নয় সমলোচনা সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে নতুনমাত্রা। অনুবাদকের ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যময়, অনেকটা মূলানুগ, তবে অনেক ক্ষেত্রে বোধ কুহকময়।

শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১)
বাংলা *ইতিবৃত্ত* (১৯৯৪), মূল রচনা হিরোডোটাস। যার ইংরেজি *আউব্রে দ্য সেলিনকোর্ট*। হিরোডেটাস এর *ইতিবৃত্ত*র অনুবাদক শাহেদ আলী। ইতিহাসের জনকের এ গ্রন্থটি মূল্যবান। হিরোডেটাসের ব্যাপক ইতিহাস ধারণার সূত্র, উৎস এ গ্রন্থে নির্ধারিত। লেখকের অনুবাদ প্রশংসিত।

সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪)
প্লেটোর রিপাবলিক (১৯৭৪) জোয়েট, কর্ণফোর্ড এবং এইচ. ডি. পি. লী'র ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেছেন সরদার ফজলুল করিম। তিনি বলেছেন '*রিপাবলিক*কে সাহিত্যানুরাগী এবং আগ্রহী ছাত্র-সাধারণের নিকট সহজবোধ্য এবং অনুধাবনযোগ্য করার জন্য অধ্যায়ক্রম, টীকা, ব্যাখ্যা এবং আলোচনার' চেষ্টা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে এ মৌলিক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তিনি পাঠকের রুচি ও চিন্তার পরিধিকে দিয়েছেন বাড়িয়ে। অনুবাদক বলেছেন 'প্লেটোর ভাষাশৈলি ছিল বিস্ময়কর। তাঁর বিপুল সংলাপরাজিব্যঞ্জনার দিক থেকে গদ্যকাব্যের ঝঙ্কারময় সৃষ্টি।' এ দিকটি তিনি অনুবাদের সময় যথাযথ বিবেচনায় এনেছেন। এ গ্রন্থের অনুবাদে লেখকের আয়োজন প্রশংসনীয়। ভূমিকা অংশটিও চমৎকার। এটির ভেতর দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রয়াস যেন সম্পন্ন হয়েছে। সংলাপ, কথোপকথনও বেশ উপভোগ্য। সরদার ফজলুল করিমের ভাষা সহজবোধ্য, সরল কিন্তু গভীর। গোটা গ্রন্থটি পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনামও নির্ধারিত। *প্লেটোর সংলাপ*, *এ্যরিস্টটলের পলিটিকস*, এঙ্গেলস রচিত *এ্যান্টিডুরিং*, *রুশোর সোশ্যাল কন্টাক্ট* সরদার ফজলুল করিমের মূল্যবান অনুবাদ গ্রন্থ। সর্বশেষ বেরিয়েছে *আমি রুশো বলছি দি কনফেশন্‌স্* (২০০৬)। রুশোর *দি কনফেশান্‌স্*-এ তিনি বলেছেন, 'রুশোর আত্মকথা বা কনফেশন্‌স্ রুশোর দর্শনের অংশ নয়। তার দর্শন তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে লাভ করা যায়। রুশোর আত্মকথা হচ্ছে রুশোর অস্তিত্ব—তার দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্বের প্রকাশ এবং তার দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই অস্তিত্বেই তার দর্শন। তার দর্শন তার অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছন্ন।' এর অনুবাদ নিয়ে তিনি বলেন, 'রুশোর

কোনও আক্ষরিক বা অনাক্ষরিক অনুবাদ নয় বলতে পারি মর্মানুবাদ। মর্মকে নিয়ে আসাই বড় কর্ম'। বোধ করি এটাই তাঁর অনুবাদের মূল কথা।

সাঈদ-উর রহমান (জ. ১৯৪৮)
মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা (১৯৮৫) গ্রন্থটির সংকলক ও অনুবাদক সাঈদ-উর রহমান। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা মার্কস কিংবা এরূপ চিন্তার যেমন প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, কডওয়েল, লুকাচ, থমসন প্রভৃতির রচনাকে একসঙ্গে করেছেন। মার্কসাবাদী নন্দন দৃষ্টির লেখকরাও এ গ্রন্থে যত্নের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এটিতে মার্কস-নন্দন সম্পর্কেও বিশেষ ধারণা আছে।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)
সিকান্দার আবু জাফর প্রধানত কবি। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে *রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম* (১৯৬৬), *সেন্ট লুইয়ের সেতু* (১৯৬১), বারনাড মালামুডের *যাদুর কলস* (১৯৫৯), *সিংয়ের নাটক* (১৯৭১) প্রভৃতির অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদে তিনি সমৃদ্ধ। তবে একটু আড়ষ্ট মনে হয়। সিংয়ের নাটকে এক ধরনের সম্পূর্ণতা আছে। ব্যাপকতাও পরিলক্ষিত। নাট্যগুণ স্বচ্ছরূপে এখানে বজায় রয়েছে। এটির উন্নত রচনাগুণে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অনেককেই আকৃষ্ট করেছে। *যাদুর কলস* কিংবা *সেতু*র ভেতর দিয়ে অনুবাদক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি পেয়ে যান।

সিরাজুর রহমান (জ. ১৯৩৪)
সরস গদ্যকার সিরাজুর রহমান। *আন্তন চেখভের নাটক*, চার্লস ডিকেন্সের *গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স*, শার্লোট ব্রন্টির *জন এয়ার*, জেন অস্টিনের *প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস* এসব অনুবাদে তিনি যথেষ্ট সফল। জনপ্রিয়ও বটে। মূল-অনুবর্তী অনুবাদ, কিন্তু যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে চেখভকে চেনা যায় নিজের পরিবেশে। সিরাজুর রহমান অনুবাদে পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছা ও যথোচিত সুবোধ্য করার চেষ্টা আছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬)
প্রাচীনতম আকর রচনা *এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব* (১৯৭৫)। এটির অনুবাদ করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অসাধ্য সাধন করেছেন। বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। টীকা ভাষ্যও আছে গ্রন্থটিতে। যথারীতি ইংরেজি থেকেই তিনি এ অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। হেনরিক ইবসেনের *বুনো হাঁস* (১৯৬৫) তাঁর

অন্য অনুবাদ। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদকের ভাষার ব্যাপ্তিতে গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। ইবসেনের এ অনুবাদের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁকে বাঙালিদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৩৪ ব.-১৯৮৪ ইং.)

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লেখক ও গবেষক। পরিশ্রমী অনুবাদকও বটে। সাহিত্যতত্ত্বের অনেক জটিল বিষয়কে সহজভাবে তিনি পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। লঙ্গিনুস কিংবা হোরেসের অনুবাদ তাঁকে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। বাংলাভাষায় এমন সাহিত্যতাত্ত্বিকদের পরিচিত করানো শুধু নয়, যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক নতুন ধ্যান-ধারণাই শুধু নয় নিজের বোধ ও উপলব্ধির একটা মাত্রাও তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। *অ্যারিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৭৬), *হোরেসের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৭৯), *লঙ্গিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৯৭) এগুলো যথাক্রমে অ্যারিস্টটলের *Poetics*, লঙ্গিনুসের *On the Sublime* হোরেসের *Ars Poetica* র অনুবাদ। এসব গ্রন্থের অনুবাদ নানা সময়ে হয়েছে কিন্তু সুনীল কুমারের অনুবাদ স্বাতন্ত্র্য এবং পৃথক পরিবেশ দাবি করে। বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্র নির্বাচন, স্বচ্ছতা, যত্ন সবদিক বিবেচনা করলে সুনীল কুমার সিদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা সরল, তত্ত্ববহুল নয়। নিছক জটিল করে তোলেননি কিছু। উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থেরই ভূমিকা প্রদান করেছেন তিনি। এটি পাঠকের বাড়তি লাভ।

সুব্রত বড়ুয়া (জ. ১৯৪৬)

সুব্রত বড়ুয়ার অনুবাদ *দি রাইট স্টাফ*, *কণা*, *কোয়ন্টাম ও তরঙ্গ* (১৯৮৪), *আমেরিকার ভৌগোলিক রূপরেখা* (১৯৮৬), *শঙ্খচিল* (১৯৯৪), *এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী* (১৯৭২) প্রভৃতি। এগুলো তাঁর গুরুত্ববহ অনুবাদ।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সব্যসাচী অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান। তবে কবিতার অনুবাদেই তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। মেরিডিথের অনুবাদ আকর্ষণীয়। ইমেজ সৃষ্টি, পরিবেশ বর্ণনায় যথেষ্ট শিল্পীমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একইভাবে হুইটম্যানের কবিতার গুরুত্ববহ অনুবাদ তিনি করেছেন। অনুবাদের মতো অনালোকিত দিকে শুধু আলো প্রক্ষেপণই নয় তিনি বিদেশী অনেক লেখককে আমাদের সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে ইডিপাসের অনুবাদের কথা বলে; এটি হয়ে উঠেছে সৈয়দ আলী আহসানের নাটক। অত্যন্ত জনপ্রিয় এ গ্রীক নাটককে বাংলাদেশে

জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *প্রেমের কবিতা* (যুগ্মভাবে ১৯৫৮), *হুইটম্যানের কবিতা* (১৯৬৫), *ইডিপাস* (১৯৬৮), *সাম্প্রতিক জার্মান গল্প* (১৯৭০), *জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী* (১৯৭৪), *উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮২), *সন্দেশ রাসক* (১৯৮৭), *নাহজুল বালাঘা* (১৯৮৮)।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)
সৈয়দ শামসুল হক অনুবাদে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি সৃজনশীল অনুবাদ করেছেন। নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদ করে তিনি বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সৈয়দ হকের *ম্যাকবেথের* অনুবাদ অনেকটা আড়ষ্ট মনে হলেও *শ্রাবণ রাজার* চমৎকার অনুবাদ পাঠক মহলে গৃহীত হয়েছে। *ম্যাকবেথ*, *টেমপেস্ট* (১৯৮৮), *শ্রাবণ রাজা* (১৯৬৯), *গোলাপের বনে দীর্ঘশ্বাস* (২০০০) প্রভৃতি তাঁর অনুবাদকর্ম।

হাবীবুর রাহমান (১৯২২-১৯৭৬)
শিশুসাহিত্যিক, শিশুদের জন্য অনুবাদ করেছেন। *চীনা প্রেমের গল্প* (১৯৬৩), *জন কেনেডী* (১৯৬২), *জীবনের জয়গান* (১৯৬২), *পাল তুলে দাও* (১৯৬১) এসব অনুবাদে তিনি সাবলীল। শিশু মনস্তত্ত্বের বিষয়টি লেখক বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা সরল এবং রসসমৃদ্ধ। গল্পগুলো বাইরের হলেও এদেশীয় আবহে তা করে তুলেছেন তাৎপর্যময়। শিশুসাহিত্যে এ গ্রন্থগুলো প্রয়োজনীয় সংযোজন।

সপ্তম অধ্যায়

শিশুসাহিত্য

আমাদের সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল। তবে অনুর্বর বলা যায় না। জগৎ-জীবন-দর্শনে এটি আবশ্যিক, অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায় (১৮২৭-১৯২৩), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কেমন উন্নত শিশুতোষের ধারা রচনা করেছেন, সেটি মনে রাখলে বিভাগোত্তর বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের চর্চা ক্রমশ ক্ষীণতর হয়েছে বলেই মনে হয়। তবুও সময় পরিপ্রেক্ষিতে তা দুর্বল নয়। তবে উইট, হিউমার ও রসবোধে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে এ ধারাটিতে আরও বেশি শীর্ণ মনে হয়। যদিও এখন অনেক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু গুণ ও মানে যতোটা উন্নতমানের হওয়া দরকার তা লক্ষণীয় নয়। প্রযুক্তির কল্যাণে শিশুরা এখন চটকদার স্কেচ পাচ্ছে, বর্ণিল ছবি দেখছে কিন্তু বুদ্ধিকে আঘাত করা বা চেতনাশাসিত প্রজ্ঞার পরিসর কম পাচ্ছে। তবুও অনেকেই কাজ করার চেষ্টা করছেন। এ ধারায় যুক্ত হয়েছেন অনেক নতুন লেখক। শিশুদের আনন্দজগতে তাঁরা অভিপ্রেত হয়ে উঠছেন। শিশুদের মন যোগানো নয় মন জাগানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সে কাজটি অপেক্ষাকৃত কম। বিভাগ-পরবর্তী সময়ে শিশুসাহিত্যের চর্চা যারা করেছেন, তাঁরাই কার্যত আমাদের সাহিত্যের ধারাটি নির্মাণ করেছেন।

অনামিকা হক লিলি (জ. ১৯৪৮)
অনামিকা হক লিলির রচনা *এসো গল্পের দেশে* (১৯৭৪), *সাহসী ইঞ্জিন* (১৯৮০), *ছড়ার ছন্দে দুলি* (১৯৮২), *ছুটির দুপুরে* (১৯৮০)। গল্পভঙ্গি শিশুমনস্কতায় জারিত। আনন্দময় বৈচিত্র্য রচনার প্রয়াস আছে।

আখতার হুসেন (জ. ১৯৪৫)
সমুদ্র অনেক বড়, *রামধনুর সাঁকো*, *দি টাইগার ও অন্যান্য গল্প*, *হৈ হৈ রৈ রৈ*, *প্রজাপতি ও প্রজাপতি*, *খেলাঘরের পুতুল গুলো*, *চাপাপড়া মানুষ*, *আয় আয়*, *ফ্রিডম ফাইটার* ইত্যাদি আখতার হুসেনের শিশুসাহিত্য। এসব গ্রন্থে শিশুমনস্তত্ত্ব গৃহীত। কখনো তা নীতিমূলক, কখনো নিছক রঙ্গরসে আপ্লুত। কথনভঙ্গি রোম্যান্সসুলভ, আকর্ষণীয়।

আতোয়ার রহমান (জ. ১৯২৭)
বিচিত্র বিষয়ে অবলম্বন আছে। নীতিশিক্ষার প্রশ্রয় আছে রচনায়। অত্যন্ত যত্নশীল। ঐতিহ্যিক আনুগত্য অনস্বীকার্য, সেটি গল্পের পরিবেশষ তৈরি করে। শিশু-মনস্তত্ত্বের পরিবৃত্তে আতোয়ার রহমান লেখেন : *ঝিলিমিলি : সাঁঝের বেলার রূপকথা* (১৯৫৮), *মহাবিপ্লবের বীর সিপাহী* (১৯৬২), *রাজকন্যে কঙ্কাবতী*, *আজব প্রাণী আজব গাছ* [প্রথম খণ্ড] (১৯৬৭) ও [দ্বিতীয় খণ্ড] (১৯৬৮), *টুনটুনের বাঁশি* (১৯৬৭), *বিলেতী ছড়া* (১৯৬৮), *ঝর্নামালা* (১৯৬৯), *রঙে রঙে বোনা* (১৯৭২), *কাচের পাহাড়* (১৯৭৪), *সোনার পাখি* (১৯৭৫), *তেরো নদীর পাড়ে*, *তিন পুণ্যির ঘাট* প্রভৃতি।

আনজীর লিটন (জ. ১৯৬৫)
আনজীর লিটনের লেখায় ব্যঙ্গ আছে। ছড়া শিশু উপযোগী। তবে মাঝে মাঝে পরিপক্ব বুদ্ধিতে তা স্থূল হয়ে পড়েছে। ছড়া : *খাড়া দুটো শিং* (১৯৮৭), *আগে গেলে বাঘে খায়* (১৯৯৫), *আমাদের রাজনীতি চলে বাঁকে বাঁকে* (১৯৯৬)। কিশোর উপন্যাস : *ছদ্মবেশী রোবট* (১৯৯৩), *ডুডুল রাজার পাহাড়ে* (১৯৯৪)।

আনোয়ারা সৈয়দ হক (জ. ১৯৪০)
কিশোর মনস্কতায় লিখেছেন : *ছানার নানাবাড়ি* (১৯৭৭), *বাবার সঙ্গে ছানা* (১৯৮৬), *ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৭), *মুক্তিযোদ্ধার মা মুক্তিযোদ্ধার ছেলে* প্রভৃতি। এগুলো সুন্দর রচনা কিন্তু আপাত বুদ্ধির ক্ষেত্রটি অপরিপক্ব, নিয়ন্ত্রণহীনও বটে। তবে রসবোধ আছে।

আবদুর রহমান (জ. ১৯২৪)
গল্প লিখলেও শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। তবে তাঁর পরিধি বেশি সম্প্রসারিত নয়। নিছক ছড়ার ছন্দে তিনি শিশুদের আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ *ঝড়ের দেশ* (১৯৬৩), *টুটুর হাওয়াই সফর* (১৯৬৭), *রাত নিঝঝুম* (১৯৬৩)। সূক্ষ্মতর রসসঞ্চারী এসব রচনার গুরুত্ব পূর্ব-পাকিস্তানে কম ছিল না। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে তাঁর মননধর্মটিও বুঝে নেওয়া যায় ।

আমীরুল ইসলাম (জ. ১৯৬৪)
আমীরুল ইসলামের ছড়া কিশোর উপযোগী। *খামখেয়ালী* (১৯৮৪), *যাচ্ছেতাই* (১৯৮৭), *রাজাকারের ছড়া* (১৯৯০), *আমার ছড়া* (১৯৯২), *বিলাই* (১৯৯৭), *বীর বাঙালীর ছড়া* (১৯৯৭), *চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে* (১৯৯৭), *ছড়ার তেলে ছড়া ভাজা*

(১৯৯৭) প্রভৃতি। একটু বুদ্ধিমনস্ক। মধ্যমানের এসব ছড়ায় রাজনীতিও তিরোহিত নয়। এ পর্যায়ের মনস্তত্ত্বটিতে আমীরুল ইসলাম তেমন উন্নত নন।

ছোটদের গল্প : *আমি সাতটা* (১৯৮৫), *এক যে ছিল* (১৯৮৬), *দশ রকম দশটা* (১৯৮৯), *সার্কাসের বাঘ* (১৯৮৯), *ভূত এলো শহরে* (১৯৯২), *আমি ওয়ান আমি টু* (১৯৯২), *রোবট রহস্য* (১৯৯২), *আমি মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই* (১৯৯৩), *লুথাদ্বীপের রহস্য* (১৯৯৪), *সাদা ভূত কালো ভূত* (১৯৯৬) প্রভৃতি।

কিশোর উপন্যাস : *অচিন যাদুকর* (১৯৮৫), *আমাদের গোয়েন্দাগিরি* (১৯৯২), *রুমঝুমপুর* (১৯৯২) প্রভৃতি।

আল কামাল আবদুল ওহাব (জ. ১৯৩৮)

কিশোর উপযোগী রচনা। এ্যাডভেঞ্চার আছে। রোমাঞ্চও আছে। কিন্তু পরিবেশ ও ভাষাবুনন উইট পায়নি। *নিরুদ্দেশের পথে* (১৯৬৩), *মুখোশ* (১৯৭৯), *গহন বনের পথে* (১৯৭৯), *বিনাটিকেটের যাত্রী* (১৯৬২), *মেঘবৃষ্টি* (১৯৬৮), *বিজয় অভিযান* (১৯৬৪), *সাতরঙ* (১৯৫৮), *তারার আকাশ* (১৯৭৫), *গহন বনের শিকারী* (১৯৮২) প্রভৃতি আল কামাল আবদুল ওহাবের রচনা।

আলমগীর জলিল (জ. ১৯২৮)

আলমগীর জলিলের ভালো রচনা *হট্টমালার দেশে*। অন্যান্য রচনাও মনোগ্রাহী। এ কিশোর রচনাগুলো পেয়েছে তাঁর অনবদ্য ভাষাভঙ্গি। রসবোধ উচ্চমানের। পরিবেশ দুর্বল নয়। *জুতো পায়ে পুষি বেড়াল* (১৯৬৩), *তাকডুমাডুম* (১৯৬৩), *এক যে ছিল পুতুল* (১৯৬৯), *হট্টমালার দেশে* (১৯৭৫) প্রভৃতি। এগুলোতে এক ধরনের ঐতিহ্য-সমর্থনও আছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদের শিশুতোষ উপন্যাস *জলহস্তী* (১৯৮২)। শিশুকবিতা *সারকাস* (১৯৮৩)। *জন্মভূমি* (১৯৯৯), *কিশোর সমগ্র* (২০০০) তাঁর অন্যান্য রচনা।

আলী ইমাম (জ. ১৯৫০)

আলী ইমাম আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিশুসাহিত্যিক। দীর্ঘদিন তিনি কাজ করে চলেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া* (১৯৭৫), *অপারেশন কাঁকনপুর* (১৯৭৮), *চারজনে* (১৯৭৯), *তিতির মুখীর চৈতা* (১৯৭৯), *সাদা পরী* (১৯৭৯), *পাখিদের নিয়ে* (১৯৭৯), *রূপালী ফিতে* (১৯৭৯), *সোনার তস্তুরী* (১৯৮১) প্রভৃতি।

একটু উচ্চগ্রেডের রচনা, ভাষা যথোচিত কিন্তু পরিবেশ-বর্ণনে একটু অযত্নের ছাপ লক্ষ করা যায়।

আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭)

আশরাফ সিদ্দিকীর লোককাহিনিভিত্তিক, রূপকাথার আঁচড় আদৃত রচনা *সিংহের মামা ভোম্বল দাস* (১৯৬৩), *আমার দেশের রূপকাহিনী* (১৯৬৪), *বাণিজ্যেতে যাবো আমি* (১৯৭৮), *বাংলাদেশের রূপকথা* (১৯৯১), *আমি বাজি ঝনঝন* (১৯৭৯), *রূপকথা রাজ্যে* (১৯৯৩) প্রভৃতি তাঁর রচনা। এসব রচনায় রসবোধের পরিসর কম।

আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩)

কবি আসাদ চৌধুরী শিশুতোষ রচনায় পারদর্শী। *রাজা বাদশার গল্প*, *গ্রাম বাংলার গল্প* ছাড়াও বেশকিছু শিশুতোষ রচনার অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত রচনা : *রাজার নতুন জামা* (১৯৭৯), *ছয়টি রূপকথা* (১৯৭৯), *এশিয়ার গল্প*, *ছোট রাজপুত্র* (১৯৮২) প্রভৃতি। এসব রচনা বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে অনবদ্য সংযোজন।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)

ইব্রাহীম খাঁর রচনা *ব্যঘ্র মামা* (১৯৫১), *শিয়াল পণ্ডিত* (১৯৫২), *নিযাম ডাকাত* (১৯৫০), *বেদুইনদের দেশে* (১৯৫৬), *ছোটদের মহানবী* (১৯৬১), *ইতিহাসের আগে মানুষ* (১৯৬১), *গল্পে ফজলুল হক* (১৯৭৭), *ছোটদের নজরুল ইত্যাদি*। রূপকথামূলক, অভিযাত্রাধর্মী, রোম্যাঞ্চমূলক গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয়। নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টা আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক এ রচনাগুলো একই সঙ্গে ইউট ও হিউমারে সমৃদ্ধ।

এখলাসউদ্দিন আহমদ (জ. ১৯৪০)

এখলাসউদ্দিন আহমেদ এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাস : *এক যে নেংটি* (১৯৬৫), *বেলুন বেলুন* (১৯৬৯), *মাঠ পারের গল্প* (১৯৭০), *হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী* (১৩৮৭), *তুনুর দুপুর* (১৯৮২), *অন্য মনে দেখা* (১৩৯৭), *টাট্টুঘোড়া টাট্টুঘোড়া* (১৯৮৭), *রাজ রাজড়ার গপ্পো* (১৯৮৯), *তুনু ও কেদো বাঘের গপ্পো* (১৯৭৯), *তুনতু বুড়ির আজব সফর* (১৯৯০), *কেঁদোর কাণ্ডকারখানা*, *তুনুকে নিয়ে গপ্পো*, *তুনতুর গপ্পো* প্রভৃতি। লোককথা, ব্রতকথা, হিঁয়ালী, ধাঁধাঁর আশ্রয় আছে। সারপ্রাইজিং কিছু ব্যাপারও আছে। উন্নতমানের এ রচনাগুলোতে লেখক বেশ সৃজনশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক। তুনতুর গল্প ও পরিবেশ, রসবোধ চমৎকার।

গল্পভাষাতেও লেখকের আছে আধিপত্য। যেটি এ পর্যায়ের সৃজনশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ।

হাসির ছড়া মজার ছড়া (১৯৬২), *তুনতুবুড়ির ছড়া* (১৯৬৬), *টুকরো ছড়ার ঝাঁপি* (১৯৬৬), *বাজাও ঝাঁঝর বাদ্যি* (১৯৭০), *ইকরি মিকড়ি* (১৯৭৫), *বৈঠকী ছড়া* (১৯৭৫), *কাটুম কুটুম* (১৯৭৭), *ছোট রঙিন পাখি* (১৯৮১), *প্রতিরোধের ছড়া* (১৯৮৬), *অষ্টাশির ছড়া* (১৯৯২) প্রভৃতি। ছড়াতে তিনি সমানভাবে প্রসাদগুণ লাভ করেছেন।

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস (১৯০৬-১৯৭৫)

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস-এর শিশুতোষ গ্রন্থ *জানোয়ারও যাদু জানে* (২০০২)। চীনা লোকগাথার অংশবিশেষ থেকে এর উৎপত্তি হলেও বাংলাদেশের প্রকৃতি-পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন তিনি এ গ্রন্থে। তাঁর শিশু উপযোগী ভাষা বেশ আকর্ষণীয়। সরল কৌতুকে এটি হয়ে উঠেছে মনোগ্রাহী।

জুবাইদা গুলশান আরা (জ. ১৯৪২)

জুবাইদা গুলশান আরা *মজার ছড়া* (১৯৭০), *ছানাপোনাদের ছড়া* (১৯৭৮), *নিঝুম দ্বীপের গল্পকথা* (১৯৭৯), *কলকাকলীর গান* (১৯৮৪), *ঘুম ভাঙানো নদী* (১৯৮৮), *ফুল ফোটানোর জন্য* (১৯৯১) লিখেছেন। ছড়া এবং কথক উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সব্যসাচী। তবে রসবোধের প্রাচুর্য কম।

জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯)

কিশোর গল্পই লিখেছেন। পরিবেশ ও ঘটনা বর্ণনে এক ধরনের মুন্সীয়ানা আছে। তাঁর গ্রন্থ : *ছোটদের একাঙ্কিকা* (১৯৬৩), *গল্প বলি শোন* (১৯৬৬), *মহাসমুদ্র* (১৯৭৭), *সাবাস সুলতানা* (১৯৮২), *শাহরিয়ারের অ্যাডভেঞ্চার* (১৯৮৪) প্রভৃতি।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৪০-১৯৮৯)

শিশুদের জন্য নাটক লিখেছেন : *ঘুম নেই* (১৯৭৯), *অন্যরকম অভিযান* (১৯৮১), *ওরা ছিল বাগানে* (১৯৮৯), *যেমন খুশী সাজো* (১৯৯১)। এসব নাটকে তেমন পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। অযত্নেরও আছে অভাব। শিশুতোষ নাটক লেখা দুরূহ ব্যাপার। সেটির জন্য উচ্চমাত্রার রসবোধ দরকার। নাজমা জেসমিন চৌধুরী সেক্ষেত্রে তেমন সফল হননি।

ফয়েজ আহমদ (১৯২৮-২০১২)

ফয়েজ আহমদ লিখেছেন : *হাতে খড়ি* (১৯৫৪), *জোনাকী* (১৯৫৬), *তা ধিনতা* (১৯৬৩), *পুতলী* (১৯৬৪), *রিম ঝিম* (১৯৬৫), *তা তা থৈ থৈ* (১৯৭৫), *বোকা আইভান* (১৯৭৬), *হে কিশোর* (১৯৮২), *ছোট ছেলে জামানের* (১৯৮২), *টুকটাক* (১৯৯৫), *টুঙ* (১৯৯৫) প্রভৃতি। বিভাগোত্তর সময় থেকে কয়েক দশক চর্চায় তিনি উত্তরিত। সবগুলো রচনাই সমান মনোগ্রাহী নয় কিন্তু পরিবেশের আলোছায়া, অভিযাত্রা, রঙ্গবুদ্ধি তেমন দুর্বল নয়।শিশুবৃত্তানের জন্য যে বিচিত্রমুখি কল্পনার প্রয়োজন সেটি সর্বাংশে প্রতিষ্টিত নয় তাঁর রচনায়।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)

শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ। *বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা* (১৯৪০), *বোকা জামাই* (১৯৪১), *ছোটদের নজরুল* (১৯৬১), *শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা* (১৩৬৩ ব.), *ছোটদের বিষাদ-সিন্ধু* (১৯৩৯) দুর্দান্ত রচনা। শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা দারুণ, জীবনবোধ অনেক উচ্চে, সেখানে অবশ্যই নীতিশিক্ষাও তিরোহিত নয়। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা নিয়েও বন্দে আলী মিয়া প্রশংসিত। কিশোর উপযোগী রচনাগুলোতেও আত্ম-পরিচর্যায় লিখেছেন, দান করেছেন অনুভববেদ্য সহানুভূতি।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (জ. ১৯৪২)

তাঁর শিশুতোষ গল্প : *সূর্য লুঠের গান* (১৯৮০), *তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম* (১৯৮৫), *আরব্য রজনী* (১৯৮৯), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯১), *সোহরাব রুস্তম* (১৯৮৯), *বাঘের উপর টাগ* (১৯৯৩), *অজগর রাজা* (১৯৯৪), *গ্রাম বাংলার সেরা হাসির গল্প* (১৯৯৫), *ডাকাত ডাকাত* (১৯৯৬), *রক্তঝরা রণ* (১৯৯৭), *জাদুর বাঁশি* (১৯৯৭)। কিশোর গ্রন্থের এ পাঠ রোম্যান্সরস ও বৈজ্ঞানিকবুদ্ধিপ্রসূত। বিপ্রদাস বড়ুয়ার রূপকথাভিত্তিক প্রয়াসটি উচ্চমান অর্জিত। পরিবেশ বয়ানেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাস : *রোবট ও ফুল ফুটানোর রহস্য* (১৯৮৮), *জাদুমানিক স্বাধীনতা* (১৯৯২), *নোভায়া জেমলায়ার বিভীষিকা* (১৯৯৬), *দৈত্য পাহাড়ের ক্ষুদে মানুষ* (১৯৯৬) এসব উপন্যাসে শিল্পমান তেমন সবল নয়। অনেকক্ষেত্রেই তা স্থূলমাত্রায় পর্যবসিত।

বুলবন ওসমান (জ. ১৯৪০)

বুলবন ওসমানের কিশোর গ্রন্থ *কানা মামা* (১৯৬৮), *অপয়া* (১৯৭৭), *ঐরাবত* (১৯৭৫), *অমিতের কথা* (১৯৭৮), *উটকো* (১৯৭৯), *মেঘ মোষ এক সমান*

(১৯৭৯) প্রভৃতি। সুন্দর ও সাবলীল তাঁর কথাভাষ্য। জীবনরসিক এ লেখক গ্রন্থের কাহিনিতে একটু অসংবদ্ধ মনে হয়। তবুও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও চরিত্রবর্ণনায় মুন্সীয়ানা পরিলক্ষিত।

মোবারক হোসেন খান (জ. ১৯৩৮)
রিমির কথাবলা (১৯৮২), *দিল্লীর তিন সম্রাট* (১৯৮২), *তিন মোঘল সম্রাট* (১৯৮২), *হাদিসের কাহিনী* (১৯৮১), *মুসলিম বিশ্বের কেচ্ছা* (১৯৯৩), *শক্তির রাজা সূর্য* (১৯৮৭), *সম্রাট আকবর* (১৯৮৫), *রাজিতের চন্দ্রাভিযান* (১৯৮৬), *রূপকের রূপকথা* (১৯৮৮), *বিজ্ঞানের রহস্য* (১৯৯০), *মহাকাশের গোয়েন্দা* (১৯৯১) প্রভৃতি মোবারক হোসেন খানের রচনা। এগুলো কিশোর পাঠ্য, শিশুতোষ বলা চলে না। তাছাড়া কাহিনিবুদ্ধিতেও যে প্রজ্ঞাঋদ্ধি তা কাংক্ষিত নয়।

মোহাম্মদ নাসির আলী (১৯১০-১৯৭৫)
খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী। ১৩৫৬-তে প্রথম প্রকাশিত বই মনিকণিকা। এছাড়া শিশুতোষ গ্রন্থ *লেবু মামার সপ্তকাণ্ড* (১৯৬৮), *ভিনদেশী এক বীরবল* (১৯৭৯), *আকাশ যারা করলো জয়* (১৯৫৭), *আলিফ লাইলার গল্প*, *একটি কুকুরের কাহিনী*, *ভিনদেশী গল্প*, *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*, *তিমির পেটে কয়েক ঘণ্টা*, *বোকা বকা*, *ইবনে বতুতার সফরনামা (১৩৭৫ ব.)*, *ইতালীর জনক গ্যারিবল্ডি* (১৯৬৩), *ছোটদের ওমর ফারুক*, *অ্যালবার্ট আইনস্টাইন*, *ছোটদের আলমগীর (১৩৭৭ ব.)*, *আমাদের কয়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৩৫৫ ব.)*, *মোহাম্মদ বিন কাসেম* (১৩৭০ ব.), *বীরবলের খোশগল্প* (১৯৬৪), *সাতপাঁচ গল্প* (১৯৬৫), *টলস্টয়ের সেরা গল্প* (১৯৬২), *যোগাযোগ* (১৯৬৮), *শাহী দিনের কাহিনী* (১৩৫৯ ব.)। বিচিত্র বিষয়ে তিনি পরিচয় করিয়েছেন, সরল ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাভঙ্গিতে। তাঁর জীবনীভিত্তিক কাহিনির পরিচর্যাটি বেশি।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪)
হীরের ফুল (১৯৩০), *তাকডুমাডুম* (১৯৩০), *মিসেস লতা সান্যাল ও আরও অনেকে* (১৯৩৩), *কিস্সা শোন* (১৯৫০), *জাপান ঘুরে এলাম* (১৯৫৯), *ডানপিটে দল* (১৯৬৩), *গল্প শোন* (১৩৭১), *এক থলি নাটক* (১৯৭৮), *বউ হারালো হুলো বিড়াল* (১৯৭৯) *বাঘা সিদ্দিকী* এ সব গ্রন্থের ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বহাল রেখেছেন। নীতিশিক্ষা বা জীবনের বয়ান দেওয়ার

চেয়ে তাঁর গ্রন্থে রসবোধের ভেতর দিয়ে হস্যকলরোল সৃষ্টি প্রয়াস অনবদ্য। মোহাম্মদ মোদাব্বের শিশু-মনস্তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই (১৯২৫-১৯৯৯)
হাট্টিমাটিম (১৯৬২) দারুণ জনপ্রিয় পংক্তিমালা। অনবদ্য এ শিশুসাহিত্যিক বাংলাদেশের শিশুদের পিতা, অদম্য এ সংগঠকের কীর্তি আকাশচুম্বী। হাট্টিমাটিম একদিকে যেমন রসবোধে জারিত অন্যদিকে তেমনি উদ্ভট রস-উত্তাপে চাঞ্চল্যকর। খুব অল্পকথায় শিশুর বোধের জগতে পৌঁছতে সক্ষম হন তিনি। ছন্দবিরচন ও মাত্রাজ্ঞানেও তাঁর দক্ষতা শিশু অনুগামী।

লুৎফর রহমান রিটন (জ. ১৯৬১)
ধুত্তুরি (১৯৮২), *ঢাকা আমার ঢাকা* (১৯৮৪), *উপস্থিত সুধীবৃন্দ* (১৯৮৪), *হিজিবিজি* (১৯৮৭), *তোমার জন্য* (১৯৮৯), *ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৯), *রাজাকারের ছড়া* (১৯৯০), *শেয়ালের পাঠশালা* (১৯৯২), *হামটি ডামটি* (১৯৯২), *১০০ রিটন : নির্বাচিত ছড়ার সংকলন* (১৯৯৩), *নাই মামা কানা মামা* (১৯৯৩), *বাঘের বাচ্চা* (১৯৯৪), *ভূতের যাদু* (১৯৯৪), *এক যে ছিল টুই* (১৯৯৪), *ফর অ্যাডাল্টস ওনলি* (১৯৯৪), *শেখ মুজিবের ছড়া* (১৯৯৪), *হবুচন্দ্র রাজার দেশে* (১৯৯৪), *পান্তাবুড়ি* (১৯৯৫), *ভালো কোচিং সেন্টার* (১৯৯৬), *মুক্তিযুদ্ধের ছড়া* (১৯৯৭), *সূর্যমামা ভীষণ রাগী চাঁদমামী খুব ভালো* (১৯৯৭), *ঘোড়ার ডিম* (১৯৯৮), *টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার* (১৯৯৮), *ছড়াসমস্ত* (১ম খণ্ড ১৯৯৮) এরকম অনেক ছড়া লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। তবে অনেক বেশি লেখার কারণে বোধের স্তরচ্যুতিও ঘটেছে। হয়ে পড়েছেন স্থূল। বিষয়-নির্বাচনে অসতর্ক নন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)
শওকত ওসমান খ্যাতিমান লেখক। কিশোরতোষ বিষয়ে লিখে কীর্তিমান, স্মরণীয়। তবে এগুলো তাঁর কিশোর গ্রন্থ। *ওটেন সাহেবের বাংলো* কিংবা *পঞ্চসঙ্গি* মজার উপাখ্যান। বস্তুত নীতিশিক্ষার জন্যই তিনি এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ : *ওটেন সাহেবের বাংলো* (১৯৪৪), *এতিমখানা* (১৯৫৫), *ছোটদের নানা গল্প* (১৯৬৯), *ডিগবাজী* (১৯৬৪), *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৯), *তারা দুই জন* (১৯৪৪), *ক্ষুদে সোশ্যালিস্ট* (১৯৭৩), *কথা রচনার কথা* (১৩৮৯), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *ইতিহাস বিস্তারিত* (১৯৮৫) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

শহীদ সাবের (১৯৩০-১৯৭১)

ছোটদের জন্যে লেখা *ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান* (১৯৫৮); এ প্রতিভাবানের গল্প কিশোর উপযোগী, অনেকটা রোমান্স আধিক্য আছে। তাছাড়া ভাষায় আড়ষ্টতাও আছে বলে মনে হয়। তবু শহীদ সাবের বিভাগ-পরবর্তী সময়ের সময়ের অন্যতম কথাকার।

শাহজাহান কিবরিয়া (জ. ১৯৪১)
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু (১৯৭৪), *বেড়ালের গলায় ঘণ্টা* (১৯৭৭), *চার বুড়ির কাণ্ড* (১৯৮৬), *উল্টোবুড়ি* (১৯৮৮), *আহাম্মকের দেশে* (১৯৮৬), *ইরানের মজার গল্প* (১৯৮৩), *প্রাচ্যের রূপকথা* (১৯৮০), *বাঘা* (১৯৮০), *সুজন আজো ভোলেনি* (১৯৯০) প্রভৃতি কিশোর গল্পে নীতিশিক্ষা কখনোবা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিচেতনার পরিবেশনা চলে। এ পর্যায়ে তেমনটা তেমনটা উন্নত নন ।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)
মোহনভোগ, *ছেলেদের গল্প* , *বালিকা জীবন*, *গুলবদন*, *জাহানারা*, *সুরুচি পাঠ* প্রভৃতি কিশোরদের ব্যঙ্গাত্মক গল্প। উন্নত বোধে জীবনসত্যেরই চর্চা করেছেন কবি। তাঁর রচনা তেমন পঠনযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

সুকুমার বড়ুয়া (জ. ১৯৩৮)
পাগলা ঘোড়া (১৯৭০), *ভিজে বেড়াল* (১৯৭৬), *চন্দনা রঞ্জনার ছড়া* (১৯৭৯), *এলোপাতাড়ি* (১৯৮০), *নানা রঙের দিন* (১৯৮১), *সুকুমার বড়ুয়ার ১০১টি ছড়া* (১৯৯১), *চিচিং ফাক* (১৯৯২), *কিছু না কিছু* (১৯৯৫), *সুকুমার বড়ুয়ার কিছু ছড়া শতক* (১৯৯৭)-এ বেরিয়েছে। ছড়ার ভেতর দিয়ে তিনি বাস্তবতাক অতিক্রম করতে চেয়েছেন। প্রকৃত অর্থে বাস্তবতার বাইরে জীবনের স্বীকৃতিই তো উপভোগ্য সাহিত্য, যেটি শিশুতোষ হলে তো আরও উন্নত হওয়া উচিৎ। সুকুমার বড়ুয়া প্ররম্বিত সময়ে সে চেষ্টাটিই করেছেন। অনেকটা সফলও হয়েছেন।

হাবীবুর রহমান (১৯২৩-১৯৭৬)
কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি। শিশু সংগঠনের জন্যও নিবেদিত। 'দৈনিক সংবাদ' এবং 'দৈনিক আজাদে'র শিশু বিভাগের স্রষ্টা এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সাংগঠনিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর জনপ্রিয় শিশুতোষ গ্রন্থ আগডুম বাগডুম (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৬২)। শিশু মনস্তত্ত্ব, শিশুমনের বিকাশ, জীবনবাদী চেতনার স্ফুরণ এসব নিয়ে নানাকৌণিক নিরীক্ষা আছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরল এ ধারাটি তাঁর হতে পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ

মাত্রা। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *সাগর পারের রূপকথা* (১৯৬২), *বিজন বনের রাজকন্যা* (১৯৬১), *লেজ দিয়ে যায় চেনা* (১৯৬৩), *বনে বাদাড়ে* (১৯৬৩), *পুতুলের মিউজিয়াম* (১৯৬৩), *গল্পের ফুলঝুরি* (১৯৬২), *হীরা মতি পান্না* (১৯৬৭), *মন চলে মোর তেপান্তরে* (১৯৬৭), *বনমোরগের বাসা* (১৯৭৫) প্রভৃতি।

হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী (জ. ১৯৩৪)
পাখির ছড়া (১৯৫০), *ফুলের নামে ছড়া* (১৯৫১), *ভালোবাসি পোষাজীব* (১৯৫২), *হাসিখুশি* (১৯৫২), *ছড়ার খনি* (১৯৯৩), *কিশোর কবিতা ও ছড়া* (১৯৯৩) প্রভৃতি শিশুবান্ধব রচনা।
শিশু-কিশোর প্রবন্ধ : *ছোটদের হযরত মোহাম্মদ* (১৯৭৩), *ছোটদের নজরুল* (১৯৭৫), *ছোটদের রবীন্দ্রনাথ* (১৯৭৫), *ছোটদের শেখ মুজিব* (১৯৭৫)

হালিমা খাতুন (জ. ১৯৩৩)
সোনা পুতুলের বিয়ে (১৯৬৪), *হরিণের চশমা* (১৯৭০), *কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ* (১৯৭৪), *পাখির ছানা* (১৯৭৬), *পশু ও পাখির ছড়া* (১৯৭৬), *কাঁঠাল খাবো* (১৯৭৬), *বাঘ ও গরু* (১৯৮০), *বাচ্চা হাতির কাণ্ড* (১৯৮০), *ছবি ও পড়া* (১৯৮০), *বেবী ফ্রক গায়* (১৯৮৯), *মজার পড়া* (১৯৮৪), *মস্তবড় জিনিস* (১৯৮৫), *যুক্তবর্ণের সেপাই শাস্ত্রী* (১৯৮৭), সবচেয়ে *সুন্দর* (১৯৯০), *রসকদম্ব* (১৯৮৮), *বনের ধারে আমরা সবাই* (১৯৯৩), *পঞ্চমালার বনে* (১৯৯৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা হলেও তাঁদের রসবোধ আকর্ষণীয় নয়।

হাসান জান (১৯২৭-১৯৭৪)
শিশু সাহিত্যিক ও সংগঠক। বেশ কটি জাতীয় দৈনিকে শিশু বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন। *নরম গরম* (১৯৭২), *লাল নীল ছড়া* (১৯৭৪) তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ (জ. ১৯৪২)
হীরে মুক্তো পান্না (১৯৬১), *দেশে দেশে জয়ীর বেশে* (১৯৬২), *সৃষ্টি শুরুর কাহিনী* (১৯৬২), *সূর্যি জাগে জিলান দেশে* (১৯৬২), *নয়া জীবনের দিশারী* (১৯৬২), *সাত সমুদ্দুর তেরো নদী* (১৯৬২), *চুনী মোতির মালা* (১৯৬২) প্রভৃতি ষাটের গল্প। এক ধরনের নীতিকথ্য মূলক কাহিনি তাঁর রচনার গুরুত্বকে দিয়েছে বাড়িয়ে।

হেলেনা খান (জ. ১৯২৯)

রোদ ঝকঝক (১৯৭৫), *সব ভালো যার শেষ ভালো* (১৯৭৯), *চারটি বেলুন* (১৯৮০), *গল্পই শুধু নয়* (১৯৮৩), *সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ* (১৯৮৪), *ডালমুট* (১৯৮৫), *ফুল পাখি সৌরভ* (১৯৮৬), *নীল পাহাড়ের হাতছানি* (১৯৮৮), *গৌতমবুদ্ধের দেশে* (১৯৯০), *নতুন দেশ নতুন মানুষ* (১৯৯০), *রূপকথার রাজ্যে* (১৯৯২), *ব্যাংককের সেই মেয়েটি* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৪), *ভূতের খপ্পরে* (১৯৯৬), *মঞ্চে এর মজার গল্প* (১৯৯৫), *শাবল বাহাদুর* (১৯৯৫), *তুলতুলের দান* (১৯৯৬) প্রভৃতি হেলেনা খানের গ্রন্থ।

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও ভ্রমণসাহিত্য

স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীর ধর্ম আলাদা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যে নেই তা বলা যাবে না। দুটোর পার্থক্য সূক্ষ্মতর। ধরণ আলাদা। বয়ন কৌশলের, প্রবণতাগত তফাৎ আছে। তবে ধরে নেওয়া যায়, লেখকের সবকিছুই ব্যক্তিগত, যা লেখেন তা আত্মস্মৃতি বা জীবনচরিত। সারা জীবনের ডায়েরীই তো লেখকের সবচেয়ে বড় সঞ্চয়। সুতরাং যা লেখা হয় সবই আত্মচরিত, স্মৃতিকথা। তবে আত্মস্মৃতিতে লেখক কি শুধু নিজের জীবনের কথাই বলেন? যাপিত জীবনে কতোকিছুরই তো মুখোমুখি হচ্ছেন লেখক, স্মৃতির নির্মিতি হয় তো সবকিছু মিলেই, পরাজয়-হতাশা-গ্লানি-মনস্তাপ-আত্মসমর্পণ কিংবা সব ছাপিয়ে শ্লাঘাবোধ সবই থাকে। আর সবকিছুরই ঝুলি ঐ স্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* মনোমুগ্ধকর সব কথা, শৈশবের-কৈশোরের। কারও স্মৃতিকথা হতাশার, অসহিষ্ণুতার, ক্ষুণ্নবৃত্তিময় জীবনের। এককথায় স্মৃতিতে যা আছে গৌরব-অগৌরব, কষ্ট-সুখের, শ্লাঘার-যন্ত্রণার, মনস্তাপের-হতাশার সবকিছু। তবে কারও স্মৃতি সততই সুখেরও হতে পারে। স্মৃতিকথা auto-portrait, এতে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, অতীতকে লক্ষ্যগোচর করা, অতীত-দর্শন (retrospection)। এখানে বস্তুনিষ্ঠতার কিছু নেই। তাঁর স্মৃতিই সর্বার্থ, এবং একমাত্র অবলম্বন। অপরদিকে আত্মজীবনী নানা ধরনের। সাহিত্যিকের আত্মজীবনী অবশ্যই ভিন্ন। জীবনকে তিনি সাহিত্যভাষা প্রদান করেন। সেটা নিশ্চয়ই নিছক কোনো ডকুমেন্টশান হবে না! বাস্তব-অবাস্তব, সত্য-অসত্য-সম্ভাব্যতা মিলে যাপিত জীবনকে মুখোমুখি করেন, করেন পুনর্নির্মাণ। কল্পনার সত্যই সেখানে হয়ে ওঠে বড়। আত্মজীবনী বা আত্মচরিত (auto-biography) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে সময়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, নির্ধারিত থাকে সাল-তারিখ। নির্ধারিত পথ ধরে চলে তা, তথ্য-উপাত্ত ধরেই সবকিছু ঘটে, সেখানে কিছু সম্ভাব্যতা বা কল্পনা তৈরি হলেও ঐ ছকের মধ্যেই তা গৃহীত। এককথায় বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে আত্মজীবনী বা জীবনচরিত বা চরিতকথা। এমনকি তা জীবন নিয়ে গবেষণার ব্যাপারও হতে পারে।

ভ্রমণসাহিত্য ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা। উদাহরণ হিসেবে আনা যায়, সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে*, অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে প্রবাসে* কিংবা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *বিলেতে সাড়ে সাত'শ দিন* গ্রন্থটি। পথটাই, পথের অভিজ্ঞতাই ভ্রমণকারিদের মুখ্য। খুঁড়ে তোলেন যেন পথের স্থানিক সত্যকে, তার অতীতকে, প্রত্ন-অভিজ্ঞতাকে। বাংলাদেশের লেখক হাসনাত আবদুল হাই লিখেছেন *আন্দালুসিয়া*, স্পেনের একটি শহরের মনোমুগ্ধকর কাহিনি। ঐতিহাসিক স্থানে পৌঁছালে, মন আনচান করে ঐ ইতিহাসকে ফিরে পেতে, নায়াগ্রা ফল্স এ পৌঁছালে বাস্তব ফিরতে চায় এর উৎসে; এরূপে কল্পনায় ভর করে তুলনা; এদেশ থেকে অন্যদেশ, নিজদেশ থেকে পরদেশ—এভাবে ভ্রমণ হয়ে ওঠে সাহিত্য, যোগায় প্রাণচাঞ্চল্যের রস, স্বীকৃতি দেয় জীবনের, প্রতিষ্ঠা দেয় জীবনবাদকে। এ পর্যায়ে আমাদের সাতচল্লিশ-উত্তর লেখকগণ নিম্নরূপ :

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬)
দ্বিতীয় পৃথিবীতে, *পথ বেঁধে দিল* (১৩৬৭), *দুই সাগরের দেশে* স্মৃতিচারণমূলক রচনা। অনুভবের ছোঁয়ায় জীবনের বিচিত্র আয়োজনের অন্বেষণ-উপলব্ধি তাঁর রচনা। কবির প্রতিবিম্ব রচিত হয়েছে এসব রচনায়। আবেগকে একটা মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন, সংযত ও সংহত রচনাপ্রয়াস। পথের অভিজ্ঞতাকে অনুরাগের রংয়ে রাঙিয়েছেন আ.ন.ম. বজলুর রশীদ।

আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯১৮-১৯৯৭)
আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৯৫) এ স্মৃতিকথায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের ব্যবহারিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ। অত্যন্ত মৃদুভাষী উচ্চারণে অনন্য করে তুলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। আন্তরিক, পরিশ্রমী ও যত্নবান এ লেখক গ্রন্থটিতে কোনো পরিচ্ছেদ বিভাজন করেননি, তথ্য-উপাত্তসমেত অবারিত বলে গেছেন ঘটনাপ্রবাহ। তীক্ষ্ণ মনন-প্রলুব্ধ রচনা।

আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮)
আকবরউদ্দীনের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে লিখেছেন *পথের দিশারী*, *শহীদ লিয়াকত*, *কায়দে আযম*। এটি স্মৃতিচারণাধর্মী কিন্তু সদ্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবেগ ও ব্যক্তিত্বরাই এতে উঠে আসেন। কায়েদে আজম স্মৃতিচেতনায় অনিবার্যতা পান, মুসলিম রাষ্ট্রআদর্শ থেকেই, তবে অনুভব সুপাঠ্য, রুচিশীল। লেখকের লেখায় আত্মতুষ্টির আতিশয্য আছে। যে উচ্ছ্বাসময়তা আছে তার একটু বেশি মাত্রার।

আখতার ইমাম (জ. ১৯১৭)
রোকেয়া হলে বিশ বছর (১৯৮৬), *ইডেন কলেজ থেকে বেথুন* (১৯৯০) আখতার ইমামের কর্ম-অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ। নারীশিক্ষা-সংস্কৃতির বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে স্বতন্ত্রভাষ্যে তুলে এনেছেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (জ. ১৯৪০)
অনবদ্য রচনা *বিদায় অবন্তী* (১৯৯৫)। 'নানান পারম্পর্যহীন উপলক্ষে গোটাকয় স্মৃতিচারণমূলক রচনা লিখেছিলাম বিভিন্ন সময়ে' এটি তারই গ্রন্থরূপ। "জাহানারা ইমাম", "বিদায় অবন্তী!", "অনিশ্চিত কালবেলায়", "'নীরব সংঘ' ও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী"—এমন শিরোনামে সুলিখিত তাঁর প্রবন্ধ। 'তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ঘটনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। সে যৌবন প্রতিনিয়ত শ্রেয়কে স্পর্শের স্পর্ধায় জীবনকে প্রাণিত করে দুঃসাধ্যের রাস্তায়, আত্মবিস্মৃতের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই যৌবনই ছিল সেদিন আমাদের একমাত্র এবং ক্ষমাহীন প্ররোচক'—এমন বর্ণনায় স্মৃতি পেছনে নয় মানুষকে সামনের দিকেই এগিয়ে নেয়।

আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০)
লেখকের আত্মজীবনী *জীবন ক্রমশ* (১ম খণ্ড, ১৯৮৬), *ঠিকানার পথে* (২য় খণ্ড, ১৯৯০), *এখন বর্তমান* (৩য় খণ্ড, ১৯৯৭)। দীর্ঘায়ত এ রচনায় আবু রুশদ তীক্ষ্ণধী, প্রজ্ঞাঋদ্ধ। জীবনের বিচিত্র পথকে আলিঙ্গন করেছেন—সেখানে উজ্জ্বল তাঁর বন্ধু-পরিবৃত্ত, নাগরিক অভিজ্ঞতা, এবং সে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভিত্তি প্রস্তুত করা। আত্মজীবনী তাঁর আত্মকথন নয়। চমৎকার গদ্যে, দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিচর্যায়, চলমান জীবনের প্রত্যয় ও পরিবৃত্তকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)
অতীত দিনের স্মৃতি স্মৃতিময় আখ্যান, আত্মজীবনীও বটে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতাকে রূপময় করে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনা 'তৃতীয় চোখে'র গুরুত্বে অর্জিত। অনেকটা নিজেকে আড়াল করেছেন তিনি এ স্মৃতিকথায়, সেটি হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার, কুলপ্লাবী উচ্চারণ আশা জাগানিয়া। রাজনীতি-ইতিহাসের গুরুত্ব জানার জন্য এটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)
ভ্রমণকাহিনী সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে দিব্যচেতনায় পরিচয় করায়। শুদ্ধ মননে আবু জাফর শামসুদ্দীন **এখন** *আফগানিস্তান* (১৯৮২), *আরেক ভুবন সোভিয়েত ইউনিয়ন* (১৯৮২) রচনা করেছেন। *আত্মস্মৃতি* প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯৮৯-এ। ব্যাখ্যাত হয়েছে জন্মস্থান-প্রকৃতি ও পরিবেশ, ক্রমশ কর্মজীবন এবং ভারতের নানা অঞ্চল, যেখানে সমকালীন প্রসঙ্গ ধরে সমাজ-রাজনীতি-দাঙ্গা বিপুল হয়ে ওঠে। তৃতীয় অংশে আছে ভাষা আন্দোলন, কাগমারী সম্মেলন, আইউব, সোহারাওয়ার্দী, ভাসানী ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতা। পূর্ব-বাংলার সমাজ-রাজনীতির অনুপুঙ্খ চিত্র। লেখকের ভাষা তির্যক, শাণিত কখনোবা বিদ্রূপাত্মক। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, প্রয়োজনে নিজের সম্পর্কেও করেছেন বিরূপ মন্তব্য। অসামান্য এ *আত্মজীবনী* গ্রন্থটি বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের এসব বিরল অভিজ্ঞতা যেন প্রজন্মান্তরের সাক্ষী।
তাঁর অন্য স্মৃতিচারণমূলক রচনা : *মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ* (১৯৮৮)

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)
সাংবাদিক মুজিবর রহমান (১৯৬৭), *শেখ মুজিব : তাকে যেমন দেখেছি* (১৯৭৮) দুটি আবুল ফজলের জীবনী ও স্মৃতিকথা। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে লেখকের স্মৃতিচারণা ও অভিজ্ঞতার বয়ান এ রচনা। সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব মুজিবর রহমান আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিব সম্পর্কে লেখকের অনুরাগ এ রচনায় বিদ্যমান। ব্যক্তিগত হলেও সেখানে হয়ে উঠেছে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। *রেখাচিত্র* (১৯৬৬), *লেখকের রোজনামচা* (১৯৬৯), *দুর্দিনের দিনলিপি* (১৯৭২) এগুলোতে আবুল ফজলের শৈশব-কৈশোরের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি রচিত হয়েছে। এগুলো আত্মজীবনীমূলক। এ সমস্ত রচনায় সময় ও বেড়ে ওঠার চেতনার সত্যতা প্রতিফলিত। সময় ও পরিবেশকে জানা যায় এ রচনায়। তাঁর দিনলিপিও সুপাঠ্য।
আবুল ফজলের ভ্রমণকাহিনি *সফর নামা* (১৩৮২)। ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন লেখক বিপুল রূপবৈচিত্র্যে, প্রতিফলিত হয়েছে অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক পটচিত্র, সম্ভ্রমের সঙ্গে।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯)
প্রথিতযশা রাজনীতিকের স্মৃতিকথা *আত্মকথা* (১৯৭৮)। এটি আবুল মনসুর আহমদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্তর্বয়ন। রচনাটির গুরুত্ব সমকালীন সমাজ-

রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* কিংবা *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু* এসব রচনার পর এটিকে তিনি ভিন্ন রকমে ভিন্ন প্রতিপাদ্যে পাঠকের সামনে এনেছেন। যেখানে ব্যক্তিচেতনা প্রবিষ্ট, কিন্তু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চেতনায় উত্তরিত।

আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪)
কবি আবুল হোসেনের তিনখণ্ডের স্মৃতিকথা বেরিয়েছে। প্রথম খণ্ড *আমার এই ছোট ভুবন* (২০০৩), দ্বিতীয় খণ্ড *আর এক ভুবন* (২০০৫), তৃতীয়খণ্ড *দুঃস্বপ্নের কাল* (২০০৭)। স্মৃতি হয়ে ওঠে প্রজন্মান্তরের পাঠ, সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধের দীক্ষা। আবুল হোসেন বলেন, 'জীবনের দুঃসহতম সময়...'বা '১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট প্রথম স্বাধীনতার দ্বিতীয় দিন থেকে ১৯৭১-এর ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের যে স্মৃতি...' এমনভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকেও আনেন তিনি স্মৃতিকথায়। শক্তিশালী ও সাবলীল গদ্যে, তীক্ষ্ণধী মেধায়, সংযত বচনে, সংহত মেজাজে রচিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯)
আব্বাসউদ্দীন আহমদ লিখেছেন *আমার শিল্পী জীবনের কথা* (১৯৬০)। এটি খ্যাতিমান এ সঙ্গীতশিল্পীর মনোজ্ঞ আত্মজীবনী। কৈশোরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শুরু করে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে জীবনী অংশটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম গানের প্রেরণা, কলেজ জীবন, শিল্পীর আসনে, নবজাগরণে বাংলার মুসলমান, উত্তরকাল, বিদেশ ভ্রমণ, জীবন সায়াহ্নের স্মৃতি—এমন শিরোনামে অনুমিত হয় শুধু শিল্পীর সমগ্রতা নয়, একটি কাল হয়েছে অনুসৃত এ রচনায়। অনবদ্য, সুন্দর এ গ্রন্থ তথ্যে-ভাষ্যে-উপাত্তে অসামান্য, সন্দেহ নেই।

আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭)
একাত্তরের স্মৃতিকথা নিয়ে *আমার একাত্তর* (১৯৯৭)। মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা লেখকের, শুধু যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাই নয়, ব্যক্তিচরিত্র, প্রবণতা, দ্বেষ-হিংসা-অহংকার, স্বার্থ-অস্বার্থ সবমিলে *আমার একাত্তর*। এটি একটি যুদ্ধদলিলও বলা যেতে পারে। সরল গদ্যে, স্মিত ভাষ্যে স্মৃতি হাতড়ে ব্যক্ত করেছেন জীবনের, সম্পর্কের সূত্রগুলোকে। *কাল নিরবধি* (২০০৩) বেশ উঁচু মানের কাজ। এটি তাঁর জীবনচরিত। গোটা বিশ শতকের মুসলিম বাঙালির অভিজ্ঞতার চিত্র তাঁর জীবনের ভেতর দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পিতামহ, প্রপিতামহ থেকে শুরু করে নিজের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, তথ্যনিষ্ঠ পথে অবিরাম বর্ণনা করেছেন লেখক। এটি যে কোনো সংস্কৃতিমনস্ক-

কালজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। স্মৃতিকে সঞ্চয়েই নয় শুধু, জীবনের বিচিত্র বাঁকের তথ্যগুলোও তিনি পরিবেশন করেছেন সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। রবীন্দ্র মৃত্যুর ঘটনা, গান্ধিজী মৃত্যুর পরের পরিবেশ আবেগবর্জিত ও সংহতরূপে বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থে। এ রকম অনেক ব্যক্তিগত বা জাতীয়ভিত্তিক উল্লেখনীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক; সবকিছুই তাঁর প্রবাহকে অর্থাৎ সময়কে যথোচিত রাখার স্বার্থে। কখনোই কোনো ঘটনা আরোপিত নয় আনিসুজ্জামানের লেখায়। 'একুশে ফেব্রুয়ারিতে সারা প্রদেশের মানুষ যাতে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানাতে না পারে, তার জন্যে চেষ্টার অবধি থাকলো না। আমি যদিও জগন্নাথ কলেজ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করি নি, আমার সময় ও সামর্থ্য সবটুকুই ব্যয় হয়েছিল যুবলীগে।'—এভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন আনিসুজ্জামান। এখানে তাঁর দৃষ্টিকোণও ব্যবহার হয়েছে। কখনো কৌতুক, কখনো ঘরোয়া আমেজ, কখনোবা সারল্যে মেলানো তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর* (২০১৩) তাঁর অন্য রচনা।

আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭)
যা দেখেছি যা পেয়েছি (১৯৭৬), *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন* (১৯৭৪), *স্মৃতির আয়নায়* (১ম-৫ম খণ্ড ১৯৮৬), *শান্তিনিকেতনের পত্র (১৯৭৫-১৯৯৭)* আশরাফ সিদ্দিকীর স্মৃতিকথামূলক রচনা। নিজস্ব মননে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বা ধারণা এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অভিজ্ঞতা হয়েছে যুক্ত। *স্মৃতির আয়নায়* তাঁর অনবদ্য আত্মকথন।

আশরাফ উজ জামান (জ. ১৯১১)
সীমান্তে মুসাফির আশরাফ উজ জামানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। এ গ্রন্থে তিনি অনেকটা সাবলীল। সীমান্তের অভিজ্ঞতাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বয়ান করেছেন লেখক।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)
স্মৃতিকথা *যদ্যপি আমার গুরু* (১৯৯৮)। স্মৃতি হাতড়ে তুলেছেন ছফা। গুরু তাঁর আবদুর রাজ্জাক। বিচিত্রস্পর্শে ভরে তুলেছেন লেখক তাঁর গুরু-অভিজ্ঞতাকে। আত্মকথনের টান এতে নেই, তা বলেনও নি, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উপভোগ্য হয় সে কাহিনি। বর্ণনাও সুন্দর। রসাপ্লুত, আনন্দদায়ী আখ্যান। আহমদ ছফার জার্মান অভিজ্ঞতা নিয়ে ভ্রমণ কাহিনি perspective Germany (1991)।

আহমদ রফিক (জ. ১৯২৯)
আহমদ রফিকের স্মৃতিচারণমূলক ইতিহাসগ্রন্থ *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস* (১৯৮৮), *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা* (১৯৯৩), *ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (২০১৩)। ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তথ্যমূলকভাবে বয়ান করেছেন লেখক। তাঁর বাচনপ্রয়াস স্মৃতিপ্রদ।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)
ইস্তাম্বুল পথের যাত্রী (১৯৫৪), *পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে* (১৯৫৫) লেখকের ভ্রমণসাহিত্য। সার্থক নতুনত্ব অর্জিত ইস্তাম্বুল বা পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রায়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ রচনা। ইব্রাহীম খাঁ যাত্রাকে উপভোগ করেছেন, ইতিহাস, প্রত্নচিন্তায় অভিজ্ঞতাতে জারণ করেছেন দুনয়নে। স্বর্গযাত্রার অভিজ্ঞতা যেন অর্জিত, লেখকের রচনায়। আচমকা আবিষ্কারের অধ্যায়ে লেখকের কলম হয়ে উঠেছে রসোদীপ্ত, প্রাণময়।
ইব্রাহীম খাঁর স্মৃতিকথা *বাতায়ন* (১৩৭৪ ব.) ও *লিপি সংলাপ*। এতে ইব্রাহীম খাঁর লেখকসত্তার পূর্ণায়ত রূপটি মেলে না। তবু স্মৃতিচিত্র পঠনে গৌণ মনে হয় না কিছু।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১)
বিচিত্রমুখি লেখাপড়া ও পড়াশোনার সূত্রে বিস্তৃত পরিসরে স্মৃতিকথা লিখেঝেন কবীরচৌধুরী। তাঁর স্মৃতিকথাধর্মী রচনা *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৩য় খণ্ড, ২০০৩), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৪র্থ খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৫ম খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০৬)।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪)
গোলাম মোস্তফার জীবনীগ্রন্থ *বিশ্বনবী* (১৯৪২)। অনস্বীকার্য, অনবদ্য গ্রন্থ। কবিকল্পনার পরিচয় হয়েছে অনুসৃত। জীবনপঞ্জি, সন-তারিখ ধরে নবীজীবনীর সত্যতা গৃহীত এরপর বাকিটুকু কল্পনা। কবি এ সুযোগ পূর্ণাঙ্গরূপে কাজে লাগিয়েছেন। দ্রুততার বর্ণিল আবহে, মরুময় প্রকৃতি, অনুভূতির রসে ব্যঞ্জিত হয়ে চলে। হজরত, গোলাম মোস্তফার দৃষ্টিতে পুনরুত্থিত, নতুন আমেজে পরিবেশিত—পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য হয়ে উঠেছে এ জীবনচরিত। আবেগময় গদ্যে প্রকৃত সত্যের আস্ফালন, চমৎকৃত হওয়ার প্রত্যয় নির্ধারিত।

জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)

একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬) জাহানারা ইমামের অমর গ্রন্থ। গ্রন্থটির মূল্যায়নে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ বলেছেন :''৭১-এর ঢাকা শহরের অবস্থা এবং গেরিলা তৎপরতা বুঝবার জন্য এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।' মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য এ গ্রন্থ। সংবেদনশীল ভাষা, মর্মস্পর্শী বর্ণনাবিন্যাস, সত্যের নিরঙ্কুশ প্রকাশ, যথোচিত পরিবেশ নির্মাণ, জীবন্ত যোদ্ধার প্রতিকৃতি, অকুতোভয় দেশবীর—সবকিছু মিলে অসামান্য এ রচনা।

জুবাইদা গুলশান আরা (জ. ১৯৪২)

জুবাইদা গুলশান আরার গ্রন্থ *স্মৃতির সোনালী দিগন্তে* (১৯৭৯)। ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনাবলীকে আখ্যান আকারে বয়ান করেছেন লেখক। এতে কথকের মুন্সীয়ানা পরিলক্ষিত। ঘটনার বয়ানে পরিবার, তাঁর বেড়ে ওঠা এ গ্রন্থে অনবদ্য ভঙ্গি অর্জন করে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জ. ১৯৩৯)

আত্মস্মৃতি আসলে তাঁর 'শৈশবের সাদা দেয়াল'। 'চোখে দেখা দৃশ্য স্মৃতিতে ধারণের সেই সম্ভবত শুরু' এবং শুরু তাঁর আত্মস্মৃতি। তাঁর বয়স সময় সান্নিধ্য এসব নিয়ে এ স্মৃতিকথা। নৈর্ব্যক্তিক তাঁর কথন প্রয়াস। মৃত্যুদৃশ্য ব্যাখ্যান হয়েছে এভাবে, 'আকালের বছরেই মার মৃত্যু হয়। কলেরায়। তার দশদিন পরে আমার মেজদিদি চলে যান—একই রোগে। আরো পাঁচদিন পরে উঠোনে নামিয়ে দিতে হয় আমার নবজাত ভাইটিকে। মা মারা যাওয়ার একুশ দিনের মাথায় বেণীমাধব কলেরা মহামারীর শিকার হন।...' এভাবে স্পর্শকাতর বর্ণনা চলে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের। একেবারেই নেই কোনো নাটকীয়তা বা অতিরঞ্জন। নিরুত্তাপ অনেক বিষয় লেখকের লেখায় পেয়েছে দুর্বার উত্তাপ।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৮-১৯৯৯)

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ *অতীত জীবনের স্মৃতি* (১৯৮৭)। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এখানে লেখকের শৈশব-কৈশোর ও প্রারম্ভিক যৌবনের খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিচিত্র, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মব্যপদেশের বিবৃতিও এতে আছে। 'দীর্ঘ প্রলম্বিত লয়ের ধারাবাহিক রচনায় কোথাও কোথাও ইতিহাস ও রাজনীতির বিবৃতি, কোথাও নিজের ব্যক্তিজীবনের বিকাশের বর্ণনা আছে।' এটি একটি সুপাঠ্য রচনা।

নাজিম মাহমুদ (১৯৩৫-১৯৯৮)

যখন ক্রীতদাস : স্মৃতি ৭১ (১৯৯০) নাজিম মাহমুদের যুদ্ধস্মৃতি। একাত্তরের স্মৃতি নিয়ে এমন মর্মন্তুদ আখ্যান আর কেউ রচনা করেছেন বলে জানা নেই। দুঃসহ অভিজ্ঞতাকে চিত্রার্পিত করেছেন নাজিম মাহমুদ। তাঁর লেখায় কোনো অতিরঞ্জন নেই, নেই কোনো কীর্তিকথন, শুধু স্মৃতিতাড়িত কণ্ঠস্বর। এমনটাই নাজিম মাহমুদের স্মৃতি। একাত্তরকে এক লহমায় যেন চকিত করে তোলেন তিনি, অনুপম আখ্যানের ভেতর দিয়ে। শক্তিশালী তাঁর ভাষাবুননি। অন্তর্দৃষ্টিও প্রখর।

নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫)

ভলগারতীরে (১৯৮৫), *ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার স্মৃতি* (১৯৯৩), *গীনসবার্গের সঙ্গে* (১৯৯৪), *আমেরিকার জুয়াখেলার স্মৃতি ও অন্যান্য* (১৯৯৫), *শক্তিস্মৃতি ও অন্যান্য* (১৯৯৭), *পুনশ্চ জাপান যাত্রী* (২০০৪), *ভুবন ভ্রমিয়া শেষে* (২০০৪), *দিল্লী* (২০০৪) নির্মলেন্দু গুণের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা। কবির গদ্য নির্ধারিত তাঁর লেখায়। খুব শক্তিশালী গদ্যে পরিবেশটি রচিত। জাপান, ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া, দিল্লীর স্মৃতিচারণ বা বলা চলে ভ্রামণিক বীক্ষা অনবদ্য। সংযত এবং পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে অন্তর্বয়ন, চঞ্চল বিহঙ্গজীবন যাত্রার কাহিনি, স্বতন্ত্র সম্বিৎ ভাবলেশে গৃহীত গুণের দৃষ্টিপাত।

আমার ছেলেবেলা (১৯৮৮), *আমার কণ্ঠস্বর* (১৯৯৫), *রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫* (১৯৯৭) নিখাদ স্মৃতিকথা। কষ্ট-বেদনার চিত্র বৃহৎ সমীক্ষায় উঠে আসে। শ্লেষ-আসক্তি, ক্রোধ-কামনা জড়াজড়ি করে থাকে 'রক্তঝরা নভেম্বর', আর ছেলেবেলার দিনান্ত পর্যালোচনা নিজস্ব শৈলিতে প্রতিষ্ঠিত। আত্মস্মৃতিতে সমাজ-রাজনীতি গন্ধ তিরোহিত নয়। যুগ, কাল, সময়-স্পর্শী স্বেদ-হর্ষ কররেখায় ধরা দেয়। আনন্দময় পরিবেশনায় গুণের এসব রচনা বেশ উপভোগ্য।

বাসন্তী গুহঠাকুরতা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা *একাত্তরের স্মৃতি* (১৯৯১) লিখেছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী এ লেখক গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে বাহাত্তরের ৪ ফেব্রুয়ারির ঘটনাক্রম বিষাদ-মধুর রূপে বর্ণিত। এটি শিহরিত করা কাহিনি। স্মৃতিচারণায় ব্যক্তিগত কথা হয়ে উঠেছে এদেশের ঐ সময়ের হত্যাযজ্ঞের বাস্তব ও সার্বজনীন চিত্র।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

মনিরউদ্দীন ইউসুফের আত্মজীবনীমূলক রচনা *আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা* (১৯৯২)। এখানে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি, পারিবারিক প্রতিবেশ, মুক্তিযুদ্ধ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। কয়েক দশকের অভিজ্ঞতাকে এ গ্রন্থে এনেছেন লেখক।

মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১)
মোমেনের জবানবন্দী, *পল্টন জীবনের স্মৃতি* (১৯৪০), *ইন্দোনেশিয়া* (১৯৫৯), *তুর্কী* (১৯৬০), *সিলোন* (১৯৫৯), *সৌদি আরব* (১৯৬০) মাহবুব-উল আলমের রচনা। *মোমেনের জবানবন্দী* তাঁর উৎকৃষ্টমানের সাহিত্য। ইন্দোনেশিয়া, তুর্কী, সিলোন, সৌদি আরব ভ্রামণিক অভিজ্ঞতায় লেখা রচনা। এতে স্বচ্ছ ও সুন্দরের বার্তা আছে। মাহবুব-উল-আলম বেড়ানোর অভিজ্ঞতাকে নীতিবাগীশ করে তোলেন না। কণ্ঠস্বর আয়ত্তে রেখেই ব্যবধান দূর করে ফেলেন, অমোঘ সত্যটি প্রকাশ করেন, সংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে চেতনাকে অর্থারোপ করেন। ভ্রমণ একান্তই আর তাঁর থাকে না। হয়ে ওঠে পাঠকের। স্মৃতিকথাতেও তিনি আরও সংযমী, নৈর্ব্যক্তিক। এ পর্যায়ের রচনায় তিনি দৃষ্টান্ত, এমনটি বলা যায়।

মুনতাসীর মামুন (জ. ১৯৫১)
বিদেশে বাঙালী (১৯৯৩), *জাপানের ছোট শহর* (১৯৯৩), *কভেন্ট গার্ডেনে সন্ধ্যা* (১৯৯৬) মুনতাসীর মামুনের রচনা। অসম্ভব আর অদ্ভুত আমোদ মিশে থাকে তাঁর রচনায়। ভ্রমণ হয়ে ওঠে নিখাদ সাহিত্য। মনের অনুরাগ-আবেগ প্রাঞ্জল করে তোলেন তিনি ভাষায়। প্রচণ্ড সংযম ও সংহত তাঁর লেখা। পরিচর্যায় যত্নবান। তাঁর জাপান শহরের বর্ণনায় উঠে আসে বৃষ্টিদৃশ্য, সঙ্গীতমুখর স্মৃতিময় রাত, দ্বীপমালার সৌন্দর্য আর শিল্প-সংস্কৃতির ব্যঞ্জনাবহ মনোলগ। মুনতাসীর মামুনের উপলব্ধি আর তখন নিজের থাকে না হয়ে ওঠে অনুভববেদ্য সব মানুষের। তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহও আকর্ষণীয়।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)
বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বহির্বিশ্ব, বাঙালির নিকট ভ্রমণকাহিনির আস্বাদে, খুব কমই মিলেছে। *বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন* (১৯৫৮)-এর মধ্যে আবদুল হাই স্বচ্ছচিন্তনে, গতিশীল উচ্ছ্বাসে; বিলেতের রূপরসগন্ধ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আবহে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনাটির তাৎপর্যময় দিক; ইউরোপের সমাজ-ধর্মদৃষ্টি ও পার্থিব চেতনাকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তুলনায় এনেছেন

নিজের দেশের সঙ্গে। *বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন* আবদুল হাইয়ের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও প্রাঞ্জল রচনা।

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯) আবদুল হাইয়ের পরিশুদ্ধ প্রবন্ধগ্রন্থ না হলেও স্মৃতিকথাকে রসমণ্ডিত করে উপস্থাপনা উপভোগ্য অর্জিত। গল্প-স্মৃতি-প্রবন্ধ মিলে মিশ্রস্বাদের পুস্তক এটি।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)

প্রবন্ধকার এনামুল হকের ভ্রমণকাহিনি *বুলগেরিয়া ভ্রমণ* (১৯৭৮)। শক্তিশালী গদ্যে লেখক বুলগেরিয়াকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন। পরিচয় মেলে সেখানকার প্রকৃতি-মানুষ ও ইতিকথার আবর্তসমূহ। শিল্পিত করে তোলেন সবকিছুকে। এক্ষেত্রে এনামূল হক মননশীল, দ্বিধাসতর্ক। তবে এটি সাবলীল সুন্দর একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার চিত্রপট, সন্দেহ নেই।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (জ. ১৯২৭)

নিবেদন ইতি পূর্ব-খণ্ড (২০০৫) অনবদ্যগদ্যে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের আত্মকথা। অথেনটিক এ রচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালের কথা বর্ণিত হয়েছে অনুপম গদ্যে। তাঁর গদ্য বরাবরই ভিন্ন ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং অর্জিত-অভিজ্ঞতাপ্রসূত। যেটি অন্য আস্তা দেয় পাঠককে।

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯০৪-১৯৭৮)

সাংবাদিক, লেখক। 'লাল কোর্তা' এবং 'ওলী গান্ধী' নামে খ্যাত। ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত *যুগ-বিচিত্রা* (১৯৬৭) গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি মূলত সমকালীন জীবনকেই তথ্যনিষ্ঠ করে তুলেছেন।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪)

শিশু সাহিত্যিক, সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের। বক্তব্যের ঋজুতায়, ভাষার সাবলীলতায় চমৎকার গ্রন্থ *ইতিহাস কথা কয়* (১৯৮১)। নিজের জীবন ও সমকালীন অভিজ্ঞতার অনবদ্য দলিল। *সাংবাদিকের রোজনামচা* (১৯৭৭) সাংবাদিকের সামাজিক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

জাপান ঘুরে এলাম (১৯৫৯), *প্রবাল দ্বীপে* (১৯৬৪) ভ্রমণ কাহিনি। বিভাগ-পরবর্তী সময়ের বিকাশউন্মুখ সাহিত্যে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের ভ্রমণসাহিত্য নিজস্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কল্পনাশক্তির গুণে শুধু নয়, তাঁর

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপরিমণ্ডলও উন্নত রুচিজ্ঞানে উচ্চকিত ছিল। জাপান ভ্রমণকে অর্থারোপ করেছেন লেখক সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যিক আবহে।

রাবেয়া খাতুন (জ. ১৯৩৫)
স্মৃতিচারণায় লিখেছেন *স্বপ্নের শহর ঢাকা* (১৯৯৪), *একাত্তরের নয় মাস* (১৯৯৬), *জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৬)। একেবারেই মূর্ত হয়ে উঠেছে নিজের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধের স্মৃতি নিজের অভিজ্ঞতায় বলেছেন কিন্তু যুদ্ধাবেগ, তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি পায়নি বলেই মনে হয়। আরও গহন অনুসন্ধানের সুযোগ রয়ে যায়। তবুও লেখকের স্মৃতির অর্জন ও উপেক্ষা একান্তই ব্যক্তিচেতনাকৃত। গদ্যরীতিতে কথকমেজাজ, বর্ণনাপ্রবাহে গতিময়তা সার্থক রচনা বলা চলে।
কুমারী মাটির দেশে (১৯৯৪), *টেমস থেকে নায়াগ্রা* (১৯৯৩) *আবার আমেরিকায়* (২০০৬) এসব নামাঙ্কিত গ্রন্থেই ভ্রমণ বৃত্তান্তের পরিবেশ গৃহীত। *টেমস থেকে নায়াগ্রা* তাঁর জনপ্রিয় রচনা। প্রাঞ্জল ভ্রমণাভিজ্ঞতা, দৃষ্টি চেতনায় অর্থ অর্জন করে, রসবোধসঞ্চারি পরিবেশটি পাঠককে উস্কে দেয়, সময় ইতিহাস পায় প্রত্নমাত্রা। রাবেয়া খাতুন সাহিত্যের এ শাখাটিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় মনে হয়।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)
শওকত ওসমানের আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা : *উত্তরপর্ব মুজিবনগর* (১৯৯৩), *কালোরাত্রি খণ্ডচিত্র* (১৯৮৬), *গুডবাই জাস্টিশ মাসুদ* (১৩৯৮), *রাহনামা-১ (ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল)* (২০০৭), *রাহনামা-২ (অন্য রণপ্রান্তরে ও ভুবন জত্তরে)* (২০০৭), *স্বজন স্বগ্রাম* (১৯৮৬), *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর* (১৯৯২)। এগুলো প্রত্যেকটিই সাহিত্যগুণে ঋদ্ধ। তবে অতিরিক্ত আত্মমগ্নতা তিরোহিত তা বলা যাবে না। এক ধরনের পুনরাবৃত্তিও আছে। তবে এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শুধু বিশ্বাসী নন, কর্মপ্রযুক্তিতে-সার্বক্ষণিক তিনি সে প্রমাণ দিয়েছেন। *রাহনামা* সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর বড় কাজ, উত্তরপর্ব ও *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*ও তাঁর অনবদ্য রচনা। আর্থ-সমাজ, ইতিহাসে অনেকটা সাহসিকতার তিনি প্রকাশ করেছেন।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)
পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬) শহীদুল্লা কায়সারের ভ্রমনকাহিনি। মনোজ্ঞ তাঁর এ যাত্রারথ। অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গির গুণে তাঁর লেখা উচ্চ শিল্পমাত্রা অর্জন করে। লেখক অভিজ্ঞতাই মূলত পরিশ্রুত। তাঁর রাজবন্দীর ডায়েরি *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২)। ঘটনাকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী, নির্বিবাদীরূপে পরিবেশন করার

সুযোগ তৈরি করতে হয় লেখককে। সেটি স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করার কৌশলটিও থাকা চাই। শহীদুল্লা কায়সার অত্যন্ত সাবলীল করে ভ্রামণিক জগতকে তুলে আনেন, মুষড়ে পড়া আবেগ সহজেই অনুপ্রাণিত করে পাঠককে। তাঁর *রাজবন্দীর রোজনামচা* সাহিত্য হয়ে উঠেছে, একই সঙ্গে তা তথ্যেও সমৃদ্ধ।

শাহরিয়ার কবীর (জ. ১৯৫০)

শাহরিয়ার কবিরের অনেক লেখালেখি, এর মধ্যে স্মৃতিচারণ বা আত্মচারণমূলক রচনার তালিকাও কম নয়। এটিতেও তিনি কাজ করেছেন। *বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী* (১৯৯০), *ক্রান্তিকালের মানুষ* (১৯৯০), *অন্তরঙ্গ হুমায়ুন আহমেদ* (১৯৯২), *সাধু গ্রেগরির দিনগুলি* (১৯৯৪), *হাত বাড়ালেই বন্ধু* (১৯৯৫), *জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি* (১৯৯৫) তাঁর রচনা। তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাহানারা ইমামের সঙ্গে শেষ দিনগুলোর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটি। কর্মীসঙ্গি হিসেবে সে আবেগটি নিশ্চয়ই অযথা নয় কিন্তু মূল্যবান অভিজ্ঞতা যা পথচলার সহায়ক শক্তিরূপে পরিগণিত তা ছেকে তুলে এনেছেন। এছাড়া অন্যগ্রন্থেও তিনি পরিচ্ছন্ন। কথকতার আমেজে, পরিবেশনার তাৎপর্যটিও প্রশংসনীয়।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)

সত্যেন সেনের বিরাট অভিজ্ঞতায় রচিত স্মৃতিচারণমূলক রচনা *মনোরমা মাসীমা* (১৯৭১), *বিপ্লবী রহমান মাস্টার*, *সীমান্ত সূর্য আবদুল গাফফার খান* (১৩৮৩ ব.)। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে স্পর্শ করেছেন অন্য ব্যক্তিত্বকে। এখানে তিনি উদ্ভাসিত। এসব রচনায় আনুগত্য আছে, আছে আবেগের প্রাবল্য কিন্তু সত্যেন সেন এসব এড়িয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিচেতনায় সামাজিক ব্যক্তিত্বরূপে এ চরিত্রসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'সীমান্ত গান্ধী'খ্যাত খান আবদুল গাফ্ফার খানকে পরিশীলিত ও দার্শনিক বুদ্ধি-বীক্ষণে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রাঞ্জল স্বাক্ষর মাসীমা ও বিপ্লবী মাস্টার। প্রভাবিত আদর্শের পরিমার্জিত চিত্রটি এঁকেছেন সত্যেন সেন।

সা'দত আলি আখন্দ (১৮৯৯-১৯৭১)

প্রাবন্ধিক সা'দত আলি আখন্দ। *তরুণ মুসলিম* (১৩৩৬), *তেরো নম্বরে পাঁচ বছর* (১৯৬৭) স্মৃতিচারণমূলক রচনা হিসেবে অনবদ্য। *অন্য দিন অন্য জীবন* (১৯৬৯) আকর্ষণীয়, *যখন দারোগা ছিলাম* পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা।

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

একালে আমাদের কাল (১৯৮৮) সুফিয়া কামালের আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ। সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে লেখকের হাতে। উঠে এসেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতীভূ ব্যক্তিরা।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-১৯৮১)
আমার কালের কথা (১৯৭৫) জীবনের অভিজ্ঞতা, অতীত স্মৃতির বুননি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। উচ্চমনস্কতায় ও আধুনিক প্রতিশ্রুতিতে তাঁর এ স্মৃতিচারণ আসলে নিজের ব্যাখ্যায়ন নয় কিংবা তা হলেও তাঁর সমাজের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন। কারণ, পূর্ণাঙ্গ সমাজ-সংস্কৃতি- দেশকাল চেতনা উঠে এসেছে নিরপেক্ষরূপে। তাঁর এ অনুষঙ্গি ভাষাও বেশ তাৎপর্যবহ।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)
দেশে বিদেশে (১৯৪৮) ভ্রমণকাহিনী রচনা করে সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুরধিগম্য রহস্যাবৃত আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অপূর্ব শিল্পরূপ *দেশে বিদেশে*। ভাষা মনোরম, অভিনব বাচনভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ রসবোধ সৃষ্টির পারঙ্গমতা এর রচনাশৈলির গুণ। বহু বিচিত্র মানবচরিত্র, দেশ অভিজ্ঞান সুগভীর প্রজ্ঞায় বাঙময় হয়ে উঠেছে মুজতবা আলীর লেখায়। এক্ষেত্রে তাঁর মজলিসি মেজাজ, রঙ্গকে ব্যঙ্গে পরিণত করা কিংবা সরসতায় বুদ্ধিকে আঘাত করে করুণার পরিবেশ সৃষ্টি, মহৎ গুণ। ভ্রমণকাহিনীতে আদর্শ ও বাস্তবের বিশ্বস্ত চরিত্র যেমন থাকে তেমনি মনোলোকের অবাস্তব বায়বীয় চরিত্রও থাকে। এসব চরিত্রকে ব্যাপকতায়, গভীরতায়, সজীবতায়, মনীষায় ছবিময় করে তোলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। ইউরোপ ভ্রমণের মনোমুগ্ধকর বিবরণ নিয়ে *পঞ্চতন্ত্র* (১৯৫২), ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী *জলে-ডাঙায়* (১৯৫৭), *ভবঘুরে ও অন্যান্য* (১৯৬২), *মুসাফির* (১৯৭১)।

সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫)
প্রণীত জীবন (২০০৮) তাঁর পরিকল্পিত জীবনচরিতের প্রথম পর্ব। এতে চরিত্ররূপে আছেন তাঁর বাবা অতঃপর শৈশব-কৈশোর পরিবেশ, ইসলামিক ঐতিহ্য, পেশা-অভিজ্ঞতা—এসবে প্রণীত জীবন সংবাদ। স্মৃতিময় সে আলিঙ্গন। স্পর্শ অন্তরঙ্গ, লেখক বলেন 'আত্মজীবনীকে আমি প্রণীত জীবন বলেই জানি এবং এই প্রণয়নের ভেতরেই ব্যক্তির মূল শাঁসটিকে পাই।' এভাবে স্মৃতি ও শ্রুতিতে হাজির হন তিনি পাঠকের সম্মুখে।

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন

বিপুল, বিপুল পৃথিবী, দূরের সুর ভ্রমণ পরিবৃত্তে সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন পৃথিবীর মাতাল আলিঙ্গনে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন রচনায়। আনন্দময় আহ্বানকে যেন পৌঁছে দেন পাঠক সমীপে।

হারুন হাবীব (জ. ১৯৪৮)

সূর্যোদয় দেখে এলাম হারুন হাবীবের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। তাঁর গদ্য অনুপম। ভ্রমণের রসবোধের আতিথ্য তাঁর রচনায় মেলে। অভিজ্ঞতাকে দান করেন সংজ্ঞার্থ। এটি নিছক আত্মকথা নয়, ভ্রমণের আনন্দে সকলকে উৎসারিত করা এবং তা পাঠের ভেতর দিয়ে। এটি সম্ভব করে তুলেছেন লেখক।

হাসনাত আবদুল হাই (জ. ১৯৩৯)

ট্রাভেলগ (১৯৯২), *ট্রাভেলগ/২* (১৯৯৩), *সাফারি* (১৯৯৪), *আন্দালুসিয়া* (১৪০৫) হাসনাত আবদুল হাইয়ের ভ্রমণকাহিনি। অনুপম তাঁর বর্ণনাভঙ্গি। লেখকের উপলব্ধি আন্দালুসিয়া সম্পর্কে : এ কেবল রাজ কাহিনী, পাথর-মার্বেল তৈরি ভবনের ইতিহাস অথবা ছোট বড় জনপদের চিত্রাবলী নয়। অনেক কিছু দেখা আর জানার পরও আন্দালুসিয়ার যা অবশিষ্ট থাকে সেটা কল্পনার জগৎ'। এরূপ আলেখ্যে-নির্ভর তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

হাসান আজিজুল হক (জ. ১৯৩৯)

তাঁর স্মৃতিকথা *ভোরবেলাকার চোখে*। 'বাতাসহীন সময়টায় দম যেন বন্ধ, কুলকুল করে ঘেমে উঠছে শরীর, এক্ষনি কি হবে কি হবে করে এই আশায় দারুণ ভালো লাগছে আমার। থমকে-যাওয়া সময়টায় শুকনো ধুলো নাকে এসে ঢুকছে। চোখে ধুলোর আঁধার। ঘুনঘুন করে কালো নিকষ ভোমরাটা ঘরে এসে ঢুকলো'—এভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁর কথকতা। নির্মল আনন্দের উপপাদ্য। মেলানো চলে পরিবেশ, লাগামহীন স্মৃতিভাষ্য, কিন্তু অমর আখ্যান। *ফিরে যাই ফিরে আসি, উঁকি দিয়ে দিগন্ত* এটি আকর্ষণীয় স্মৃতিকথা।

পরিশিষ্ট

কবিতা

অনামিকা হক লিলি : *বড়ো আশা বড়ো তৃষা* (১৯৮৮)

অরুণাভ সরকার : *নগরে বাউল* (১৯৭৬), *কেউ কিছু জানে না* (১৯৮০), *নারীরা ফেরে না* (২০০৬)

অরূপ তালুকদার : *সেই নির্বাসন চাই* (১৩৮২)

অলোকা নন্দিতা : *পিননের ভাঁজে মহাকাশ হাঁটে* (১৯৯৭)

অসীম কুমার দাস : *ঝঞ্ঝা ও পুনরুত্থান* (১৯৯২)

অসীম সাহা : *পূর্ব পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়* (১৯৮২), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), *কালো পালকের নীচে* (১৯৮৬), *পুনরুদ্ধার* (১৯৯২), *উদ্বাস্তু* (১৯৯৪), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৫), *মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি* (২০০১), *অন্ধকারে মৃত্যুর উৎসব* (২০০৬), *মুহূর্তের কবিতা* (২০০৬)

আজিজুল হাকিম : *ভোরের সানাই*(১৩৩৯), *মরুসেনা* (১৩৪০), *পথহারা* (১৩৪৩), *ঘরহারা* (১৩৪৪), *বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর* (১৯৫৪), *আজাজিল-নামা* (১৯৫৬)

আতাউর রহমান : *দুই ঋতু* (১৯৫৬), *একদিন প্রতিদিন* (১৯৬৫), *নিষাদনগরে আছি* (১৯৭৭), *ভালোবাসা চিরশত্রু* (১৯৮১), *ইদানীং রঙ্গমঞ্চ* (১৯৯২), *ভালোবাসা এবং তারপর* (১৯৯৩), *সারাটা জীবন ধ'রে* (১৯৯৪)

আনিসুল হক : *খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে* (১৯৮৯), *আসলে আয়ুর চেয়ে বড়ো সাধ তার আকাশ দেখার* (১৯৯৫), *আমি আছি আমার অনলে* (১৯৯৭), *জলরংপদ্য*

আনোয়ার পাশা : *নদী নিঃশেষিত হলে*

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী : *যেহেতু* (১৯৫৪), *আমির সওদাগর* (১৩৬৬)

আবদুর রশীদ খান : *নক্ষত্র : মানুষ : মন* (১৩৫৮), *বন্দী মুহূর্ত* (১৯৫৯) *মহুয়া* (১৯৬৬), *বিস্মিত প্রহর* (১৯৬৮), *নিরন্তর স্বর* (১৩৭৬) *অন্বিষ্ট স্বদেশ* (১৯৭০)

আবদুল হাই মাশরেকী : *দুখু মিয়ার জারী* (১৩৭৭), *মাঠের কবিতা মাঠের গান* (১৯৭০)

আবদুল হাই শিকদার : *আশি লক্ষ ভোর* (১৯৮৯), *আগুন আমার ভাই* (১৯৯১), *রেলিঙ ধরা নদী* (১৯৯২), *যুগলবন্দী ভূগোলময়* (১৯৯২), *মানব বিজয় কাব্য* (১৯৯২), *এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো* (১৯৯৮)

আবদুল কাদির : *দিলরুবা* (১৯৩৩), *উত্তর বসন্ত* (১৯৫৭), *কাব্যমালঞ্চ*

আবদুল গনি হাজারী : *সূর্যের সিঁড়ি* (১৯৬৫), *সামান্য ধন* (১৯৫৯), *জাগ্রত প্রদীপে* (১৯৭০)

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ* (১৯৬৭), *ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ* (১৯৭৪), *জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা* (১৯৬৯), *মাতাল মানচিত্র* (১৯৭০), *কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড* (১৯৮২), *পরাবাস্তব কবিতা* (১৯৮২), *পার্কস্ট্রিটে এক রাত্রি* (১৯৮৩), *মাছ সিরিজ* (১৯৮৪), *পঞ্চশর* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠকবিতা* (১৯৮৭), *আমার সনেট* (১৯৯০), *সকল প্রশংসা তাঁর* (১৯৯৩), *নীরবতা গভীরতা দুই বোন কথা বলে* (১৯৯৭)

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : *মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ* (১৯৮৮)

আবদুস সাত্তার : *বৃষ্টিমুখর* (১৯৫৯), *আরবী কবিতা* (১৯৬৪), *আমার ঘর নিজের বাড়ী* (১৯৭০)

আবদুস সামাদ চৌধুরী : *কওমিয়াত* (১৩৭৫), *উত্তর অন্বেষা* (১৯৭০)

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী : *জওয়াব* (১৯৪৯)

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *মরুসূর্য* (১৯৫৬), *শীতে বসন্তে* (১৯৬৩), *রঙ ও রেখা* (১৩৭৫), *একটি মরমী সেনা* (১৯৭২), *এক ঝাঁক পাখি* (১৩৭৬), *মেহের-নিগার* (১৯৬২), *মেঘ বেহাগ* (১৯৭১)

আবিদ আজাদ : *ঘাসের ঘটনা* (১৯৭৬), *আমার মন কেমন করে* (১৯৮০), *বনতরুদের মর্ম* (১৯৮২), আমি *আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি* (১৯৮৭), *ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭) *তোমার উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি থামে?* (১৯৮৮) *আমার কবিতা* (১৯৮৯), *খুচরো কবিতা* (১৯৯০), *আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে* (১৯৯৩), *আমার অক্ষমতার গল্প* (১৯৯৮)

আবিদ আনোয়ার : *প্রতিবিম্বের মমি* (১৯৮৫), *মরাজোছনায় মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯২), *স্বৈরিণীর ঘরসংসার* (১৯৯৭), *খড়বিচালির বৃক্ষজীবন* (২০০১)

আবু করিম : *পল্টনে আবার জনসভা হবে* (১৯৮৪), *জলের নীচে শুয়ে আছি* , *ছায়া* (১৯৯৩), *যখন তুমি ঘরে ফিরবে* (১৯৯৩), *তিলকের মাটি* (১৯৯৩), *উর তবে উর* (১৯৯৭), *যাত্রা* (১৯৯৯), *কবিতাসমগ্র* (২০০২), *বনসাই* (২০০৩), *মেঘেদের কাজ* (২০০৩), *আমার আনন্দ* (২০০৪)

আবু কায়সার : *আমি খুব লাল একটি গাড়িকে* (১৯৭২), *জাদুঘরে প্রজাপতি* (১৯৮৫), *জোছনায় মাতাল জেব্রাগুলো* (১৯৮৫), *লজ্জার দেরাজ* (১৯৯৭), *নিরুদ্দেশ অক্ষৌহিণী* (২০০০), *মৃগমেঘের হরিণীরা* (২০০৫), *নভো নৌকার মাঝি* (২০০৫)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* (১৯৮১), *সাতনরী হার* (১৯৫৫), *কখনো রং কখনো সুর* (১৯৭০), *কমলের চোখ* (১৯৭৪), *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা* (১৯৮২), *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* (১৯৮৩), *আমার সকল কথা* (১৯৯৩), *মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ* (২০০২), *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*

আবু তাহের মজুমদার : *এবং দেয়ালের ফ্রেমে* (১৯৮৯), *ফেরার পথে* (১৯৮৯), *মানুষ শ্বাপদ হয়* (১৯৯০), *এই পথে* (১৯৯১), *কালহান্তরিতা* (১৯৯৫), *চিঠি দিও* (১৯৯৭), *নিঃশ্বাসের কাছাকাছি* (১৯৯৭)

আবু হাসান শাহরিয়ার : *অন্তহীন মায়াবী ভ্রমণ* (১৯৮৬), *অব্যর্থ আঙুল* (১৯৯০), *তোমার কাছে যাই না তবে যাবো* (১৯৯৬), *একলব্যের পুনরুত্থান*, *নিরন্তরের ষষ্ঠপদী*, *এ বছর পাখিবন্যা হবে*, *ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ* (২০০১), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০৩), *হাটে গেছে জড়বস্তুবাদ* (২০০৩), *বালিকাআশ্রম* (২০০৫)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *আপন যৌবন বৈরী* (১৯৭৪), *যেহেতু জন্মান্ধ* (১৯৮৪) ও *আক্রান্ত গজল* (১৯৮৮)

আবুবকর সিদ্দিক : *ধবল দুধের স্বরগ্রাম* (১৯৬৯), *হে লোকসভ্যতা* (১৯৮৪), *বিনিদ্র কালের ভেলায়* (১৯৭৬), *বৃষ্টির কথা বলি বীজের কথা বলি* (২০০৬), *হে লোকসভ্যতা* (১৯৮৪), *হেমন্তের সোনালতা* (১৩৯৫), *মানুষ তোমার বিক্ষত*

দিন (১৯৮৬), *কালো কালো মেহনতী পাখি* (১৯৯৫), *কংকালে অলংকার দিয়ো* (১৯৯৬), *শ্যামল যাযাবর* (১৯৯৮), *মানবহাড়ের হিম* (২০০১), *মনীষাকে ডেকে ডেকে* (২০০২), *আমার যত রক্ত ফোঁটা* (২০০২) *নিজস্ব এই মাতৃভাষায়* (১৩৯৭)

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ্ : *শীতমৃত্যু ও জলতরঙ্গ*, *বাল্মীকির মৌনকথন*

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন : *নারিন্দা লেন* (১৯৮১), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮৬), *ভাংচুর* (১৯৮৯)

আবুল মোমেন : *চার ভুবনের চারণ* (১৯৭৯), *চড়াই উৎরাই* (১৯৮৯), *অর্থাৎ পৌরুষের* (১৯৯৪), *ভেঙে পড়ার সময়* (১৯৯৮)

আবুল হাশেম : *কথিকা*, *তকবীর* (১৯৬৯), *মোস্তফানামা* (১৯৬০)

আবুল হোসেন : *নব-বসন্ত* (১৯৪০), *বিরস সংলাপ* (১৯৬৯), *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস* (১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (১৯৮৫), *Selected Poems of Abul Hussain* (1986), *এখনও সময় আছে* (১৯৮৬), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৭), *রাজ রাজড়া* (১৯৯৭), *আর কিসের অপেক্ষা* (২০০০)

অনুবাদ কবিতা : *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৮), *অন্য ক্ষেতের ফসল* (১৯৯০)

আবুল হাসান : *রাজা যায় রাজা আসে* (১৯৭৩), *যে তুমি হরণ করো* (১৯৭৪), *আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি* (১৯৭৪), *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫), *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৫)

আমিনুর রহমান সুলতান : *জলের সিঁড়িতে পা* (১৯৮৭), *ফিরে যাও দক্ষিণা চেয়ো না* (১৯৯০), *চরের তিমিরে ডুবে যায় নদী* (২০০০), *মৃন্ময় মুখোশ* (২০০৩), *পানসি যাবে না সাঁতার যাবে* (২০০৮), *সাধুর কর* (২০১০), *একুশের আলো* (২০১০), *নির্বাচিত কবিতা* (২০১০)

আলতাফ হোসেন : *সঙ্গে নিয়ে চলে যাই পাহাড়চূড়োয়*

আলফ্রেড খোকন : *বেঁধে যাই পরস্পর গেঁথে যাই পরস্পর* (১৯৯৭), *উড়ে যাচ্ছ মেঘ* (১৯৯৯), *সম্ভাব্য রোদ্দুরে* (২০০২), *ফাল্গুনের ঘটনাবলী* (২০০৬), *মধু বৃক্ষ প্রতারণা বিষ* (২০০৭)

আল মাহমুদ : *লোক লোকান্তর* (১৩৭০), *কালের কলস* (১৩৭৩), *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩), *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে* (১৯৭৬), *অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না* (১৯৮০), *বখতিয়ারের ঘোড়া* (১৯৮৫), *আরব্য রজনীর রাজহাঁস* (১৯৮৭), *প্রহরান্তের পাশফেরা* (১৯৮৮), *এক চক্ষু হরিণ* (১৯৮৯), *মিথ্যাবাদী রাখাল* (১৯৯৩), *আমি, দূরগামী* (১৯৯৪), *হৃদয়পুর* (১৯৯৫), *দোয়েল ও দয়িতা* (১৯৯৭), *দ্বিতীয় ভাঙন* (২০০০)

আল মুজাহিদী : *হেমলকের পেয়ালা*, *ধ্রুপদ ও টেরাকোটা*, *দূত পারাবত* (১৯৮৪), *মৃত্তিকা অতিমৃত্তিকা*, *ঈভের হ্যামলেট*, *সিলুএট*, *সৌর জোনাকী*, *সহস্র দিবস সহস্র রজনী*, *একা অনন্তে*, *সমুদ্র মেখলা*, *কাঁদো হিরোশিমা কাঁদো নাগাসাকি*, *কালের*

বন্দিশে, যুদ্ধ নাস্তি, প্রিজন ভ্যান, দিদেলাস ও ল্যবরিন্থ, পাথর ও প্যাপিরাস, প্রাচ্য পৃথিবী, সন্ধ্যার বৃষ্টি, ধরিত্রির ধুলো

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ* (১৯৬২), *মানচিত্র* (১৯৬১), *সূর্যজ্বালার সোপান* (১৯৬৫), *লেলিহান পাণ্ডুলিপি* (১৯৭৫), *নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ* (১৯৮৩), *আমি যখন আসবো* (১৯৮৪), *সাজঘর* (১৯৯০), *চোখ* (১৯৯৬), *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অ্যাসেস এণ্ড স্পার্কাস (১৯৮৪), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৭)

আশরাফ রোকন : *দর্জিভোর* (১৯৯৮), *কাঠখড়*(২০০৩)

আশরাফ সিদ্দিকী : *তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৫০), *বিষকন্যা* (১৯৫৫), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৫৫), *উত্তর আকাশে তারা* (১৯৫৮), *কুঁচবরণের কন্যা* (১৯৭৬), *তিরিশ বসন্তের ফুল* (১৯৭৫), *বৃক্ষ দাও : ছায়া দাও* (১৯৮৪), *ঝড় তুফানে* (প্রথমখণ্ড ১৯৮১ ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৯০), *দাঁড়াও পথিকবর* (১৯৯০), কিশোর কবিতা *কাগজের নৌকা* (১৯৬২)

আসলাম সানী : *প্রাণহীন বেঁচে আছো* (১৯৭৮), *বিষণ্ন বিস্তৃতি* (১৯৮০), *প্রেম শুধু তোমারই জন্যে* (১৯৮৪), *হৃদয়ে অগ্নি জল তুমি* (১৯৮৬), *নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু* (১৯৮৮), *আমার কোনো ভালোমন্দ নেই* (১৯৯০), *তুই রাজাকার* (১৯৯৩), *বিজয়ী বাঙালীর নাম বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), *সহি মুজিবনামা* (১৯৯৬)

আসাদ চৌধুরী : *তবক দেওয়া পান* (১৯৭৫), *বিত্ত নাই বেসাত নাই* (১৯৭৬), *প্রশ্ন নেই, উত্তরে পাহাড়* (১৯৭৯), *জলের মধ্যে লেখাজোখা* (১৯৮২), *যে পারে পারুক* (১৯৮৩), *মধ্যমাঠ থেকে* (১৯৮৪), *মেঘের জুলুম পাখির জুলুম* (১৯৮৫), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৫), *আমার কবিতা* (১৯৮৫), *দুঃখীরাও গল্প করে* (১৯৮৭), *নদীও বিবস্ত্র হয়* (১৯৯২), *বাতাস যেমন পরিচিত* (১৯৯৮), *বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই* (১৯৯৮), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮৫)

আসাদ মান্নান : *তুমি মৃত অজগর কোথায় পালাবে* (১৯৯০), *সূর্যাস্তের উল্টোদিকে* (১৯৮১), *সৈয়দ বংশের ফুল* (১৯৮৩), *কাফনের ছায়ালিপি*, *দ্বিতীয় জন্মের দিকে* (১৯৯৩), *ভালোবাসা আগুনের নদী* (১৯৯৫), *নির্বাচিত কবিতা* (২০০৩), *সুন্দর দক্ষিণে থাক* (২০০৫), *তোমার কীর্তন* (২০০৬)

আহমদ ছফা : *জল্লাদ সময়* (১৯৭৪), *দুঃখের দিনে দোহা* (১৯৭৫), *একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা* (১৯৭৭)

আহমেদ রফিক : *নির্বাসিত নায়ক* (১৯৬৭), *বাউল মাটিতে মন* (১৯৭১), *রক্তের নিসর্গে স্বদেশ* (১৯৭৯), *বিপ্লব ফেরারী, তবু* (১৯৮৯), *পড়ন্ত রোদ্দুরে* (১৯৯৪)

আহমেদ নকীব : *শিশু ও হারানো বিড়ালের কথা* (১৯৯৬)

আহসান হাবীব : *রাত্রি শেষ* (১৯৪৭), *ছায়াহরিণ* (১৯৬২), *সারা দুপুর* (১৯৬৪), *আশায় বসতি* (১৩৮১), *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬), *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০), *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* (১৯৮৫)

আয়শা ঝর্ণা : *আঁধার যান* (১৯৯৬), *ঘুমের ভেতর যাত্রা* (১৯৯৮), *ভুবন মহলের দরজা* (২০০০), *মাত্রমানুষ* (২০০৩), *উনুনের গান* (২০০৫), *আয়না রক্ত হল্লা* (২০০৭)

ইউসুফ পাশা : *অপ্রতুল পুতুল নাচে* (১৯৮৪), *প্রণয়ের প্রজাপতি* (১৯৮৫), *রুদ্ধ তোমার দরোজায়, একা একা যাই*

ইউসুফ মুহম্মদ : *জলপ্রবাহের পদচিহ্ন* (১৯৮২), *হাতবাড়ালেই বুকের নদী* (১৯৮২), *যুক্তাঞ্জলি : আয়না ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৭)

ইকবাল আজিজ : *প্রতীকের হাত ধরে অনেক প্রতীক* (১৯৮৭), *ফিরে আসে প্রাচীন পুরুষ* (১৯৮৯), *ইকবাল আজিজের প্রেমের কবিতা* (১৯৯০), *একটি স্বপ্নের কথা* (১৯৯৩), *অন্তহীন সৌরঝড়* (১৯৯৭), *ভালোবেসে দূরে আছি* (১৯৯৮), *ইকবাল আজিজের শ্রেষ্ট কবিতা* (২০০২)

ইমাউল হক : *অনুরাগ*

ওবায়েদ আকাশ : *পতন গুঞ্জনে ভাসে খরস্রোতা চাঁদ* (২০০১), *নাশতার টেবিলে প্রজাপতিগণ* (২০০৩), *দূরারোগ্য বাড়ি* (২০০৪), *কুয়াশা উড়ালো যারা* (২০০৫), *তারপরে, তারকার হাসি* (২০০৭), *রঙ করা দুঃখের তাঁবু* (২০১২)

ওমর আলী : *এদেশে শ্যামল রঙ রমনীর সুনাম শুনেছি* (১৯৬৭), *আত্মার দিকে* (১৯৬৮), *নদী* (১৯৬৯), *নিঃশব্দ বাড়ি* (১৯৭৩), *অরণ্যে একটি লোক* (১৯৭৪), *বিলেতে অনিচ্ছুক একজন* (১৯৭৫), *নরকে বা স্বর্গে* (১৯৭৫), *কিশোরীর মন ?, যে তুমি আড়ালে?* (১৯৮৭)

ওমর শামস্ : *বোধিবৃক্ষতলে* (১৯৮৪), *খোয়াবনামা* (১৯৮৭)

ওমর কায়সার : *প্রাগৈতিহাসিক দুঃখ*

ওয়ালী কিরণ : *মগ্নপ্রতীক* (১৯৯৫), *উৎসভূমি* (১৯৯৭), *রূপান্তরের পাখি* (১৯৯৮), *মিশ্রমানব* (১৯৯৮), *ওই নদী জলমঞ্চ* (২০০১)

কবির মনি : *মূলতঃ ইহা এক নিরাকার টোটেম* (১৯৯৫),

কবির হুমায়ুন : *স্পর্শ সিরিজ* (১৯৯৩), *হাতের আঙ্গুলে খেলা করে পাঁচ পৃথিবীর রোদ* (১৯৯৬)

কাজল কানন : *মাটির মড়মড়* (২০০১), *পইখ উড়ে যাও* (২০০৭)

কাজল শাহনেওয়াজ : *জলমগ্ন পাঠশালা* (১৯৮৯),

কাজলেন্দু দে : *নিশ্চিন্দিপুরের গল্প* (১৯৮৭), *সমুদ্র, জাহাজ ও আকাশের গল্প* (১৯৯২), *উৎকীর্ণ কবিতাবলি* (১৯৯৭)

কাজী আকরম হোসেন : *পল্লীবাণী* (১৯৪৩), *আমরা বাঙ্গালী* (১৯৪৫), *পথের বাঁশী* (১৯৪৫)

অনূদিত : *যুগবাণী* (১৯৪৩), *মুক্তিবাণী* (১৯৪৩), *মসনবীরূমী* (১৯৪৮), *করীমা-ই সাদী* (১৯৪৮), *দীওয়ান-ই-হাফিজ* (১৯৬১) *নওরোজ* (১৯৩৮)

কাজী রোজী :

কাদের নেওয়াজ : *নীল কুমুদী* (১৯৬০)

কামরুজ্জামান কামু : *কবি মুখপত্রহীন* (১৯৯৭),

কামরুল হাসান : *সহস্র কোকিলের গ্রীবা* (১৯৯১), *প্রান্তসীমা অনন্তদূর* (১৯৯২), *ছুলে বিদ্যুল্লতা, না ছুলে পাথর* (১৯৯৩), *পাখি নই আশ্চর্য মানুষ* (১৯৯৪), *দশদিকে উৎসব* (১৯৯৭), *বৃক্ষদের শোভা দেখে যাব* (২০০০), *রূপচৈত্রের অরণ্যটিলায়* (২০০৪)

কামাল চৌধুরী : *মিছিলের সমান বয়সী* (১৯৮১), *টানাপোড়নের দিন* (১৯৯০), *এই পথ এই কোলাহল* (১৯৯৩), *এসেছি নিজের ভোরে* (১৯৯৫), *এই মেঘ বিদ্যুতে ভরা* (১৯৯৭), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৮), *ধূলি ও সাগর দৃশ্য* (২০০০), *রোদ বৃষ্টি অন্ত্যমিল* (২০০৩), *হে মাটি পৃথিবীপুত্র* (২০০৬)

কায়সুল হক : *শব্দের সাঁকো* (১৯৭৪), *রবীন্দ্রনাথের নিরূপম বাগান* (২০০১)

কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার : *সুষম দৃষ্টিতে* (১৯৭৯), *সংঘর্ষ*, *আলো-অন্ধকার* (১৯৮৯), *ছায়া শরীরীর গান* (১৯৯৭), *পাখির রাজার কাছে* (২০০১), *চিবোয় প্রকৃতি* (২০০২), *কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার রচনাসমগ্র* (২০০৫)

কুমার চক্রবর্তী : *উজানে জীবন জাগে*, *জন্ম বীক্ষণ*, *লগপুস্তকের পাতা* (১৯৯৮), *আয়না ও প্রতিবিম্ব* (২০০৩)

খলিল মজিদ : *পালকাপ্য* (২০০০)

খালেদ হামিদী : *আমি অন্তঃসত্ত্বা হবো* (১৯৯৯)

খালেদ হোসাইন : *ইলা মিত্র ও অন্যান্য কবিতা* (২০০০), *শিকার-যাত্রার আয়োজন* (২০০৫), *জলছবির ক্যানভাস* (২০০৬), *পাতাদের সংসার* (২০০৭), *এক দুপুরের ঢেউ* (২০০৮)

খালেদা এদিব চৌধুরী : *আমার দাহ আমার হাত* (১৯৭৮), *পান্থ তোমার ভালোবাসা* (১৯৮৩), *পাথুরে আগুন* (১৯৮৫), *তোমার অনঙ্গ* (১৯৮৬), *দুহাতে আঁধার কেটে* (১৯৯৩), *হে বাঁধন লতার কাঁদন* (১৯৯৫), *দু ফোঁটা চোখের জল* (১৯৯৭), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৮)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *তিন রমনীর ক্বাসিদা* (১৯৮৪), *পার্থ তোমার তীব্র তীর*, *জীবনের সমান চুমুক* (১৯৮৯), *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর* (১৯৯২), *যমুনাপর্ব*, *জন্মবাউল*, *তোমার নামে বৃষ্টি নামে* (২০০৮)

গোলাম কিবরিয়া পিনু : *এখন সাইরেন বাজানোর সময়* (১৯৮৪), *সোনামুখ স্বাধীনতা* (১৯৮৯), *পোর্ট্রেট কবিতা* (১৯৯০), *সূর্য পুড়ে গেল* (১৯৯৫), *কে কাকে পৌঁছে দেবে দিনাজপুরে* (১৯৯৭), *আমরা জোংরাখোটা* (২০০১), *সুধাসমুদ্র* (২০০৮)

গোলাম মোস্তফা : *বনি-আদম* (১৯৫৮), *রক্তরাগ* (১৯২৪), *খোশরোজ* (১৯২৯), *কাব্যকাহিনী* (১৯৩২), *সাহারা* (১৯৩৬), *হাস্নাহেনা* (১৯৩৮), *তারানা-ই-পাকিস্তান* (১৯৪৮), *গীতি-সঞ্চয়ন* (১৯৬৮)

চঞ্চল আশরাফ : *চোখ নেই দৃশ্য নেই* (১৯৯৩), *অসমাপ্ত শিরদাঁড়া* (১৯৯৬), *ও-মুদ্রা রহস্যে মেশে* (২০০২)

ছদরুদ্দীন : *১৪ই আগস্ট* (১৯৫৬), *মানুষ* (১৩৪৬), *পয়গাম* (১৩৫৮), *সংগ্রাম* (১৯৫১), *এক ফালি চাঁদ* (১৩৫৭), *অলস ভাবনা* (১৯৬৮)

জফির সেতু : *বহুবর্ণ রক্তবীজ* (২০০৪), *সহস্র ভোল্টের বাঘ* (২০০৬), *স্যানাটোরিয়াম* (২০০৮), *তাঁবুর নিচে দূতাবাস* (২০১১), *সিন্ধুদ্রাবিড়ের ঘোটকী* (২০১২), *জাতক ও দণ্ডকারণ্য* (২০১৩), *সুতো দিয়ে বানানো সূর্যেরা* (২০১৪), *ময়ূর উজানে ভাসো* (২০১৪)

জরিনা আখতার : *কালো ময়ূরের ডাক* (১৯৮৬), *পঞ্চশর* (যৌথ, ১৯৮৭), *এই ছুরিই আরশি* (১৯৮৯), *সেগুন মেহগনি ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৩)

জয়দুল হোসেন : *স্বরবৃত্তে স্বরাঘাত* (১৯৮৮)

জাহানারা আরজু : *নীলস্বপ্ন* (১৯৬২), *রৌদ্রঝরা গান* (১৯৬৪), *শোণিতাক্ত আখর* (১৯৭১), *আমার শব্দে আজন্ম আমি* (১৯৮৩), *ক্রন্দসী আত্মজা* (১৯৮৪), *স্বনির্বাচিত শত কবিতা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রেমের কবিতা* (১৯৮৮), *বিমুক্ত পংক্তিমালা* (১৯৮৮), *তৃষ্ণার্ত মাটির চুম্বন* (১৯৯০), *আকাশের মাঠটায় মায়াবী ছায়া* (১৯৯৬), *পায়ের তলায় কম্পিত কর্দমাক্ত মাটি* (১৯৯৭)

জাহান-আরা বেগম : *ইচ্ছার অরণ্যে* (১৯৬৬), *কালের কথকতা* (১৯৬৮)

জাহিদ হায়দার : *স্বগত কালের পর্যটক* (১৯৮২), *খোলা দরোজার দিন* (১৯৮৫), *অগ্নিগণ সখা আমার* (১৯৯২), *বলো দূত, অভিসার তিথি* (১৯৯৬), *বন্দনা করি অপেক্ষার* (১৯৯৭), *রূপকথা এঁকেছিল ক'জন* (২০০৬)

জাহিদুল হক : *পকেটভর্তি মেঘ* (১৯৮১), *তোমার হোমার* (১৯৮৪), *নীল দূতাবাস* (১৯৮৫), *সেই নিশ্বাসগুচ্ছ* (১৯৮৯), *পরীগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৪), *এই ট্রেনটির নাম গার্সিয়া লোরকা* (১৯৯৬), *এ উৎসবে আমি একা* (১৯৯৭), *জাহিদুল হকের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৯১)

জিয়া হায়দার : *ভালোবাসা ভালোবাসা* (১৯৯০), *একতারাতে কান্না* (১৯৬৩), *কৌটোর ইচ্ছেগুলো* (১৯৬৭), *দূর থেকে দেখা* (১৯৭৭), *From far away* (1979), *আমার পলাতক ছায়া* (১৯৮২), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৬), *লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা* (১৯৮৮), *অগ্রন্থিত কবিতা*

জুলফিকার মতিন : *স্বৈরিনি স্বদেশ তুই* (১৯৭২), *কোন লক্ষ্যে হে নিষাদ* (১৯৮৯), *তাইতো সংবাদ নেই* (১৯৯৯), *নীলিমাকে চাঁদ দেবো বলে* (২০০০), *বৈশাখে ঝড় জল রোদের কবিতা* (২০০০), *ঘামের ওজন কত ভারী* (২০০১), *দুঃখ ভোলার দীর্ঘশ্বাস* (২০০৫), *এই সংবাদ এই একুশে* (২০০৭)

টোকন ঠাকুর : *অন্তরনগর ট্রেন ও অন্যান্য যাত্রী* (১৯৯৭), *দূরসম্পর্কের মেঘ* (১৯৯৯), *আয়ুর সিংহাসন* (২০০০), *কবিতা কুটিরশিল্প* (২০০১), *ঝাঁ ঝাঁ ঝিঁ ঝিঁ* (২০০৩)

তসলিমা নাসরিন : *শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা* (১৯৮৬), *নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে* (১৯৮৯), *আমার কিছু যায় আসে না* (১৯৯০), *অতলে অন্তরীণ* (১৯৯১), *বালিকার গোল্লাছুট* (১৯৯২), *নির্বাচিত নারী* (১৯৯২), *বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা* (১৯৯৩), *নির্বাচিত কবিতা*

তালিম হোসেন : *দিশারী* (১৯৫৬), *শাহীন* (১৯৬২), *ইসলামী কবিতা* (১৯৮১), *নূহের জাহাজ* (১৯৮৩)

তুষার গায়েন : *নীলভবহ্রদ* (১৯৯৭), *বৃষ্টির অন্তর ত্রাস* (২০০৩)

তুষার দাশ : *সহজপাঠ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৮), *অতিক্রান্ত বাল্যশিক্ষা* (১৯৯১), *দুর্লভ নির্জন আয়না* (১৯৯৬), *অনিবার্য গৃহযুদ্ধ* (১৯৯৯)

তৌহিদ আহমেদ : *জ্বলে চিত্র, মানচিত্র* (১৯৮৯), *তেলাপিয়াদের অসুখবিসুখ* (১৯৯০), *রোমেনার হাঁসগুলি* (১৯৯২), *যে যাঁর নির্জনে* (১৯৯৬), *ও মুজিব ও জীবন্ত বিষাদ* (১৯৯৭), *দীপনের দুপুর* (১৯৯৪), *দীপন তোমার ছড়া* (১৯৯৫), *আপন আকাশ* (১৯৯৭)

ত্রিদিব দস্তিদার : *গৃহপালিত পদ্যেরা* (১৯৯৬), *অঙ্গে আমার বহুবর্ণের দাগ* (১৯৯৮), *ভালো বাসতে বাসতে ফতুর করে দেব* (১৯৯৯), *ভালোবাসার শাদা ছড়ি* (২০০১) *পোড়াবো তাজমহল* (২০০৩)

দাউদ হায়দার : *জন্মই আমার আজন্ম পাপ* (১৯৭৩), *সম্পন্ন মানুষ নই* (১৯৭৫), *আমি ভালো আছি, তুমি* (১৯৭৬), *জেলে লেখা পদ্য* (১৯৭৬), *এই শাওনে পরবাসে* (১৯৭৬), *আপনমুগ্ধ দেশে, একা* (১৩৮৬), *আমি পুড়ছি জল ও আগুনে* (১৯৮২), *পাথরের পুঁথি* (১৯৮৩), *যে দেশে সবাই অন্ধ* (১৯৮৪), প্রিয়তমাসু (১৯৮৪), *ধূসর গোধূলিধুলিময়* (১৯৮৮), *নদীর উৎস ছিল যেখানে* (১৯৯১), *পাষাণদুয়ার* (১৯৯২), *নাম দিয়েছে কুসুমমঞ্জুরী* (১৯৯৮), *প্রেমের কবিতা সমগ্র* (১৯৯৯), *দাউদ হায়দারের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০০)

দিলওয়ার : *রক্তে আমার অনাদি অস্থি* (১৯৮১), *জিজ্ঞাসা* (১৯৫৩), *পূবাল হাওয়া* (১৯৫৩), *ঐকতান* (১৯৬৪), *উদ্ভিন্ন উল্লাস* (১৯৬৯), *স্বনিষ্ঠ সনেট* (১৯৭৭), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৭), *দিলওয়ারের একুশের কবিতা* (১৯৯৩), *দিলওয়ারের স্বাধীনতার কবিতা* (১৯৯৩), *দিলওয়ারের রচনাসমগ্র* প্রথম খণ্ড (১৯৯৯) ও দ্বিতীয় খণ্ড (২০০০)

নাজমুল হাসান : *জ্যোৎস্নার তীর্থে* (১৯৮২)

নাজিম মাহমুদ : *ভালোবাসার কথা* (১৯৮৯), *চেতনার সৈকতে* (১৯৬৮)

নির্মলেন্দু গুণ : *প্রেমাংসুর রক্ত চাই* (১৯৭০), *না প্রেমিক না বিপ্লবী* (১৯৭২), *ও বন্ধু আমার* (১৯৭৫), *আনন্দ কুসুম* (১৯৭৬), *বাংলার মাটি বাংলার জল* (১৯৭৮), *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র* (১৯৭৯), *চাষাভুষার কাব্য* (১৯৮১), *অচল পদাবলী* (১৯৮২), *পৃথিবীজোড়া গান* (১৯৮২), *দূর হ দুঃশাসন* (১৯৮৩), *শান্তির ডিক্রি* (১৯৮৪), *ইস্‌ক্রা* (১৯৮৪), *প্রথম দিনের সূর্য* (১৯৮৪), *আবার একবার ফুঁ দিয়ে দাও* (১৯৮৪), *নেই কেন সেই পাখি* (১৯৮৫), *নিরঞ্জনের পৃথিবী* (১৯৮৬), *চিরকালের বাঁশি* (১৯৮৬),*দুঃখ করো না বাঁচো* (১৯৮৭), *১৯৮৭* (১৯৮৮), *১৯৮৭* (১৯৮৮), *যখন আমি বুকের পাজর খুলে দাঁড়াই* (১৯৮৯), *ধাবমান হরিণের দ্যুতি* (১৯৯২), *অনন্ত বরফবীথি* (১৯৯৩), *আনন্দউদ্যান* (১৯৯৫), *প্রিয় নারী, হারানো কবিতা* (১৯৯৬), *শিয়রে বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *ইয়াহিয়াকাল*

(১৯৯৮), *আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি* (২০০০), *মুঠোফোনের কাব্য* (২০০১), *নিশিকাব্য* (২০০২), *চিরঅনাবৃতা হে নগ্নতমা* (২০০৫)।

নাসরীন নঈম : *যার খুশী যাও* (১৯৮৫), *সুজন যে কেউ নয়* (১৯৮৬), *নির্বাসিত তুমি* (১৯৯৪)

নাসিমা সুলতানা : *মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া* (১৯৮৫), *রচনাসমগ্র*(২০০০), *করতলে রাজদণ্ড চাই* (১৯৮৫); আর *নীল মাছিটি এখন আমার রক্তে*

নাসির আহমেদ : *বৃক্ষমঙ্গল* (১৯৯১), *আকুলতা শুভ্রতার জন্যে* (১৯৮৫), *পাথরগুলো দুঃখগুলো* (১৯৮৬), *তোমাকেই আশালতা* (১৯৮৭), *আমার স্বপ্ন তুমি রাত্রি* (১৯৯৭), *ভালোবাসার এই পথে* (১৯৯৭), *তোমার জন্যে অনিন্দিতা* (১৯৯৮), *বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে যেতে যেতে* (১৯৯৯)

পাবলো শাহি : *ইহা এক অভিনব কাব্য ভজনা* (১৯৯৯), *ক্ষম ওঁ নিঃশ্বাসযান* (২০০০), *মেঘবালিকার মুদ্রা* (২০০১), *বেহেশতি আদি বড় ও সহি হুরীনামা যাহা কেবল নরগণ পাঠ করিবেন* (২০০১), *শব্দবিশারদগণ কহেন উহা পেণ্ডুলাম শরীরের গোলাকার মহাপ্রাণধ্বনি* (২০০১), *কহে কবি নবীন বাল্মীকি* (২০০২), *বর্ষা এবং আমাদের প্রাইভেসি-১* (২০০৩),বর্ষা এবং আমাদের প্রাইভেসি-১ (),

ফজল-এ খোদা : *সূর্য স্বর্ণ দ্বীপ* (১৩৭৫), *বিতর্কিত জ্যোৎস্না* (১৯৭৩), *নামে যার কেঁপে ওঠে* (১৯৯০)

ফজল শাহাবুদ্দীন : *তৃষ্ণার অগ্নিতে একা* (১৯৬৫), *আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর* (১৯৬৯), *আততায়ী সূর্যাস্ত* (১৯৭৫), *ছিন্নভিন্ন কয়েকজন*, *অন্তরীক্ষে অরণ্য* (১৯৮০), *সান্নিধ্যের আর্তনাদ* (১৯৮৩), *আলোহীন অন্ধকারহীন* (১৯৮৪), *সনেটগুচ্ছ*, *অবিনশ্বর দরোজায়*, *আমার নির্বাচিত কবিতা*, *হে নীল সমুদ্র হে বৃক্ষ সবুজ*, *লংফেলোর নির্বাচিত কবিতা* (১৯৬৭)

ফজলুর রহমান বাবুল : *ঋণী হবো সোহাগী জলে (১৯৯৯)*, *সখিকাব্য(২০০৪)*

ফররুখ আহমদ : *সাত-সাগরের মাঝি* (১৯৪৪), *সিরাজাম মুনিরা* (১৯৫২), *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১), *মুহূর্তের কবিতা* (১৯৬৩), *হাতেম তা'য়ী* (১৯৬৬)

ফরহাদ মজহার : *খোকন ও তার প্রতি পুরুষ* (১৯৭২), *ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি* (১৯৭৭), *আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে* (১৯৮৩), *বৃক্ষ* (১৯৮৫), *সুভাকুসুম দুই ফর্মা* (১৯৮৫), *অকস্মাৎ রপ্তানীমুখী নারী মেশিন* (১৯৮৫), *খসড়া গদ্য* (১৯৮৭), *মেঘ মেশিনের সঙ্গীত* (১৯৮৮), *এবাদতনামা* (১৯৯০), *অসময়ের নোটবই* (১৯৯৪), *দরদী বকুল* (১৯৯৪), *গুবরে পোকার শ্বশুর* (২০০০), *কবিতার বোনের সঙ্গে আবার* (২০০৩)

ফরিদ কবির : *হৃৎপিণ্ডে রক্তপাত* (১৯৮৫), *ওড়ে ঘুম, ওড়ে গাঙচিল* (১৯৯৮), *অনন্ত দরোজাগুচ্ছ* (১৯৯১), *মন্ত্র* (১৯৯৯)

ফারুক আলমগীর : *শ্যামলী দেশের ক্ষত প্রান্তর* (১৯৬২), *স্বপ্নের মধ্যে শৈশব* (১৯৮৫), *লোকেশ লৌহিত্য* (১৯৮৭), *আমার দিনরাত্রি* (১৯৮৯), *অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীত :*

পুনরুত্থানের আগে (১৯৯০), *অভ্যুত্থানের আগে : এক দুরাত্মার স্বগতোক্তি* (১৯৯২)

বদরে মুনীর : *আঙুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা* (২০০৩), *মায়ার মুরতি, যাতনার যতি* (২০০৪), *আমরা যারা ভুল করেছিলাম* (২০০৮)

বদরুল হায়দার : *আত্মজ পরিব্রাজক, কালো সিল্কের অন্ধকার, সময় বিক্রির গল্প, নষ্ট ভ্রূণে এক চিৎকার, উন্মাদ সত্য দ্রষ্টা, নারী সিরিজ*

বন্দে আলী মিয়া : *ময়নামতীর চর* (১৯৩২), *অনুরাগ* (১৯৩২),

বাকী বিল্লাহ্ : *লাবণ্যে জড়ানো গল্প* (১৯৮৩)

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী : *দুঃখের আঙুল নড়ে চড়ে* (১৯৮৮), *বাতাস তোমার রক্ত পান কর* (১৯৯১), *শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য* (১৯৯৬), *ত্রিণাচিকেতের নাচ* (২০০২), *কিম্ভূত হবার কথা ছিল* (২০০৫)

ব্রাত্য রাইসু : *আকাশে কালিদাসের লগে মেঘ দেখতেছি* (২০০১)

বেগম সুফিয়া কামাল : *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৩৭১), *দীওয়ান* (১৩৭৩), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৩৭৭)

বেনজামিন রিয়াজী : *দহনের প্রতিসাম্যে* (২০০৬)

বেনজীর আহমদ : *বন্দীর বাঁশী, বৈশাখী* (১৩৬৯)

বেলাল চৌধুরী : *বেলাল চৌধুরীর কবিতা* (১৯৭৩), *আত্মপ্রতিকৃতি, স্থির জীবন ও নিসর্গ* (১৯৭৫), *স্বপ্নবন্দী* (১৯৭৯), *জল বিষুবের পূর্ণিমা* (১৯৮৫), প্রতিনায়কের স্বগতোক্তি (১৯৮৬), *সেলাই করা ছায়া* (১৯৮০), *কবিতার কমলবনে, যাবজ্জীবন সশ্রম উল্লাসে* (১৯৯৭), *বত্রিশ নম্বর* (১৯৯৭), স্ফূলিঙ্গ থেকে দাবানল (২০০১)

বেলাল মোহাম্মদ : *কবিতা নয়* (১৯৫৪), *পর্যায়ক্রম নেই* (১৯৬৯), *অকাল অপাত্র* (১৯৭৭), *শুধু মিত্রাক্ষর* (১৯৮১), *সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৩)

বিমল গুহ : *অহংকার তোমার শব্দ* (১৯৮২), *সাঁকো পার হলে খোলাপথ* (১৯৮৫), *স্বপ্নে জলে শর্তহীন ভোর* (১৯৮৬), *বিমল গুহের ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৯), *নষ্ট মানুষ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৫)

বিশ্বজিৎ চৌধুরী : *তোমার প্রাণের জল, শ্যাওলা শরীরে* (১৯৮৮), যৌথভাবে প্রকাশিত *দ্রৌপদীর প্রেমিকারা* (১৯৮৩), *গোপন গজল* (১৯৯২)

বিষ্ণু বিশ্বাস : *ভোরের মন্দির*

মজনু শাহ : *আনকা মেঘের জীবনী* (১৯৯৯), *লীলাচূর্ণ* (২০০৩), *মধু ও মসলার বনে*

মতিন বৈরাগী : *বিষণ্ন প্রহরে দ্বিধাহীন* (১৯৭৬), *কাছের মানুষ পাশের বাড়ি* (১৯৮০), *খরায় পীড়িত স্বদেশ* (১৯৮৬), *আশা অনন্ত হে* (১৯৯২), *বেদনার বনভূমি* (১৯৯৫)

মযহারুল ইসলাম : *মাটির ফসল* (১৯৫৫), *বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি* (১৯৭০), *আর্তনাদে বিবর্ণ* (১৯৭০), *যখানে বাঘের থাবা* (১৯৭৯) *অপরাহ্নে বিবস্ত্র প্রাতরাশ* (১৯৭৯),

দুঃসময়ের ছড়া (১৯৮৮), *উজানে ফেরার প্রতিধ্বনি* (১৯৯৮), *রাজ বারান্দার তুমি* (১৯৯৮)

মনজুরে মওলা : *নিমগ্ন কি ক'রে পারো* (১৯৭৭), *মাটি হেরে যায়* (১৯৮৩), *পুড়ে পুড়ে* (১৯৮৫), *শ্যাওলা ও ডিঙ্গি, এইদিন মিথ্যে, সুচিত্রা সেনের জন্য* (২০০৫)

ময়ুখ চৌধুরী : *কালো বরফের প্রতিবেশী* (১৯৮৯), *অর্ধেক রয়েছি জলে, অর্ধেক জালে* (১৯৯৯), *তোমার জানালায় আমি জেগে আছি চন্দ্রমল্লিকা* (২০০০), *প্যারিসের নীলরুটি* (২০০১), *আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে* (২০০২) প্রভৃতি।

মহাদেব সাহা : *এই গৃহ, এই সন্ন্যাস* (১৯৭২) এরপর *মানব এসেছি কাছে* (১৯৭৩), *চাই বিষ অমরতা* (১৯৭৫), *কী সুন্দর অন্ধ* (১৯৭৮), *তোমার পায়ের শব্দ* (১৯৮২), *ধুলোমাটির মানুষ* (১৯৮২), *ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস* (১৯৮৪), *লাজুক লিরিক* (১৯৮৪), *আমি ছিন্নভিন্ন* (১৯৮৬), *মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না* (১৯৮৯), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৯), *প্রথম পয়ার* (১৯৯০), প্রেমের কবিতা (১৯৯১), রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯১), *কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ* (১৯৯০), *অস্তমিত কালের গৌরব* (১৯৯২), *আমূল বদলে দাও আমার জীবন* (১৯৯৩), *একা হয়ে যাও* (১৯৯৩), *যদুবংশ ধ্বংসের আগে* (১৯৯৪), *কোথায় যাই, কার কাছে যাই* (১৯৯৪), *সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া* (১৯৯৫), *এসো তুমি পুরাণের পাখি* (১৯৯৫), *বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ* (১৯৯৫), *বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই* (১৯৯৬), *আকাশের আদ্যোপান্ত* (১৯৯৬), *তোমার জন্য অন্ত্যমিল* (১৯৯৬), *ভুলি নাই তোমাকে রুমাল* (১৯৯৬), *তুমিই অনন্ত উৎস* (১৯৯৬), *কেউ ভালোবাসে না* (১৯৯৭), *কাকে এই মনের কথা বলি* (১৯৯৭), *অন্ত্যহীন নৃত্যের মহড়া* (১৯৯৭), *একবার নিজের কাছে যাই* (১৯৯৭), *পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি* (১৯৯৭)

মহীউদ্দিন : ঐকান্তিক *পথের গান* (১৩৩৬), *স্বপ্ন সংঘাত যুদ্ধ বিপ্লব* (১৩৪৯), *অন্ধকারে ষড়যন্ত্র* (১৩৪৯), *এসো বিপ্লব* (১৩৪৯), *গরীবের পাঁচালী* (১৯৬২), *দিগন্তের পথে একা* (১৯৬০), *শিকারে চলেছে প্রভু বাশ্যা কলন্দর* (১৯৬৬), *মল্লিকা* (১৯৭৮), *গান্ধিজী নিহত হয়েছেন* (১৩৫৬), *গরীব দুঃখী গলায় গলায় বিশ্বসাথে গান গেয়ে যায়* (১৯৮২), *সোনার গোলাপ* (১৯৮৩)

মহীবুল আজিজ : *সান্তিয়াগো'র মাছ* (১৯৮৮), *রৌদ্রছায়ার প্রবাস* (১৯৯৭), *হরপ্পার চাকা* (১৯৯৮), *পৃথিবীর সমস্ত সকাল* (২০০১), *নিরান্দপুর* (২০০২), *বৈশ্ব বিশ্বে এক শূদ্র* (২০০৩), *অসুস্থতা থেকে এই মাত্র* (২০০৩), *এই নাও দিলাম সনদ* (২০০৪), *আমার যে রকম প্রস্তুতি* (২০০৪), *আমরা যারা স্যানাটরিয়ামে* (২০০৫), *পালাবার কবিতা* (২০০৫), *দৃশ্য ছেড়ে যাই* (২০০৬)

মাকিদ হায়দার : *রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা* (১৯৭৬), *আপন আঁধারে একদিন* (১৯৮৪), *প্রিয় রোকোনালী* (২০০৩) *রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা* (১৯৭৬), *আপন আঁধারে একদিন* (১৯৮৪), *প্রিয় রোকোনালী* (২০০৩)

মাফরুহা চৌধুরী : *এইসব অশরীরী ছবি* (১৯৯৫), *কাঠগড়ায় আমি ও ঝরনা* (১৯৯৭), *এই শরৎ এই সূর্য সংবাদ* (১৯৯৮)

মারুফ রায়হান : *স্বপ্নভস্মের চারুকর্ম* (১৯৯২), *উদ্বাস্তু গদ্যের গান* (১৯৯৪), *ভালোবাসার ভুলগুলো, ফুলগুলো* (১৯৯৬),

মারুফুল আলম : *স্তব্ধতার ধারাবিবরণী* (২০০৭)

মারুফুল ইসলাম : *মলাটবন্দী মন* (১৯৯৩), *কথা না-বলার করেছি নিজস্ব পণ* (১৯৯৪), *শূন্যপুরাণ* (১৯৯৫), *অনন্তের অলীক অপেক্ষা* (১৯৯৫), *জল-পাথুরে* (১৯৯৬)

মাসুদ খান : *পাখিতীর্থদিনে* (১৯৯৩), *নদীকূলে করি বাস, সরাইখানা ও হারানো মানুষ*

মাসুদুল হক : *টেনে যাচ্ছি কালের গুণ* (১৯৮৭), *অলৌকিক স্পর্শ* (১৯৯০)

মাহবুব উল আলম চৌধুরী : *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি* (সুবর্ণ সং. ঢাকা ১৯৮৮)

মাহবুব কবির : *কৈ ও মেঘের কবিতা* (১৯৯৬), *ধূলির বল্কল* (১৯৯৭)

মাহবুব তালুকদার : *জন্মের দক্ষিণা* (১৯৭২?), *অন্তর মন্তর* (১৯৭৯), *আত্মসমর্পণ* (১৯৮৪), *ক্যায়া সীন হ্যায়* (১৯৯৪)

মাহবুব সাদিক : *স্বপ্নচৈতন্যের ডালপালা* (১৯৮৩), *সুন্দর তোমার নির্জনে* (১৯৮৫), *যায় কল্পান্তের কাল* (১৯৮৬), *আদিগন্ত রোদের তিমিরে* (১৯৯৫), *অনন্ত নক্ষত্র চোখ* (১৯৯৯), *অতৃপ্ত ঈশ্বর* (২০০০), *নিরালোকে জলঝর্ণার ধ্বনি* (২০০৬)

মাহবুব হাসান : *তন্দ্রার কোলে হরিণ* (১৯৮৪), *তোমার প্রতীক* (১৯৮৬), *নিসর্গের নুন* (১৯৯০), *তাজা গ্রেনেড কিংবা দিবাস্বপ্ন* (১৯৯৩), *আমার আকাশ* (১৯৯৮),

মাহমুদ আল জামান : *জ্যোৎস্না ও দুর্বিপাক* (১৯৮৭)

মাহমুদ কামাল : *পরকীয়া* (১৯৯৭), *কবিতার মতো কিছু কথা* (১৯৮৭), *শব্দ কখনো মানতে চায় না ছন্দাছন্দ* (১৯৯০), *স্বপ্নের রাজকন্যা, বিরামচিহ্ন, দ্বিতীয় জীবন, বিকেলের সকল চড়ুই, বালক বয়সে, মেঘেরা কোথায় যায়, মুহূর্তের কবিতা*

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা : *পশারিণী* (১৩৩৮ ব.), *মন ও মৃত্তিকা* (১৩৬৭ ব.), *অরণ্যের সুর* (১৯৬৩)

মিনার মনসুর : *এই অবরুদ্ধ মানিচিত্রে* (১৯৮৩), *অনন্তের দিনরাত্রি* (১৯৮৬), *অবিনশ্বর মানুষ* (১৯৮৯), *আমার আকাশ* (১৯৯১), *জলের অতিথি* (১৯৯৫)

মিহির মুসাকী : *খেয়াল খুশির দেয়াল ভেঙে, কুঠার সম্প্রদায়*

মীজানুর রহমান : *পাকিস্তানী গান* (১৯৪৮), *জিন্দা মুসলমান*

মুজিব ইরম : *মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান* (১৯৯৬), *ইরমকথা* (১৯৯৯), *ইরমকথার পরের কথা* (২০০১), *উত্তরবিরহচরিত* (২০০৩), *ইতা আমি লিখে রাখি* (২০০৫),

মুজিব মেহদী : *চন্দ্রাবতীর কয়েকজন সন্তান* (১৯৯৭), *ময়দানের হাওয়া* (২০০৭)

মুজিবুল হক কবীর : *পা যে আমার অনড় পাথর* (১৯৮৭), *লোপামুদ্রা ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯১), *আমি ও আমার প্রতিবিম্ব* (২০০০), *রাতের শিয়রে আগুন* (২০০১)

মুফাখ্খারুল ইসলাম : *হে পাক ফউজ* (১৩৫৪)

মুনীর সিরাজ : *বিরুদ্ধ স্রোতে যাত্রা* (১৯৭৬), *তিমিরে তরবারী* (১৯৮৪), *তিনটি শিশুর আত্মা* (১৯৮৫), *এখনো আদিমরাত* (১৯৯৬), *ঢাক গুড় গুড়* (১৯৯৭)

মুহম্মদ নূরুল হুদা : *আমরা তামাটে জাতি* (১৯৮১), *শোণিতে সমুদ্রপাত* (১৯৭২), *আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী* (১৯৭৫), *শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি* (১৯৭৫), *অগ্নিময়ী হে মৃন্ময়ী* (১৯৮০) *শুক্লা শকুন্তলা* (১৯৮৩), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৫), *যিসাস মুজিব* (১৯৮৪), *হনলুলু ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৭), *কুসুমের ফণা* (১৯৮৮), *বারো বছরের গল্প* (১৯৮৮), *এক জনমে লক্ষ জন্ম* (১৯৮৮), *গালিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা* (১৯৮৯), *আমি যদি জলদাস তুমি জলদাসী* (১৯৯০), *হ্যামিলনের রাজা* (১৯৯০), *তেলাপোকা* (১৯৯০), *জাতিসত্তার কবিতা* (১৯৯২), *ভিনদেশী প্রেমের কবিতা* (১৯৯৩), *অরক্ষিত সময়* (১৯৯৩), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৪), *দিগন্তের খোসা ভেঙে* (১৯৯৪), *ভালোবাসার বুক পকেটে* (১৯৯৪), *আমার কপালেও সময়ের ভাইফোঁটা* (১৯৯৫), *প্রিয় পঙ্ক্তিমালা* (১৯৯৫), *মৌলাধুনিক* (১৯৯৫), *মুজিববাড়ি* (১৯৯৬), *দেখা হলে একা হয়ে যাই* (১৯৯৮)

মুহম্মদ শফিক : *ছবি প্রকাশিত হলে* (১৯৭৩), *কোকিলের বাণিজ্য ভবন* (১৯৭৫), *ভেতরে নীরব যাত্রী* (১৯৮৮), *অন্ধ শিকারি* (১৯৯৪), *মাহমুদ শফিকের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৪),

মুহম্মদ শামসুর রহমান : *বৃষ্টি ঝরা গান* (১৯৬০)

মুহাম্মদ সামাদ : *একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টো* (১৯৮৩), *আমি নই ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে* (১৯৮৫), *পোড়াবে চন্দন কাঠ* (১৯৮৯), *চলো, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজি* (১৯৯৬), *কবিতাসংগ্রহ* (২০০০)

মোছলেম আহমেদ : *শরাবান তহুরা* (১৯৪৮)

মোফাজ্জল করিম : *অবচেতন রাজাধিরাজ* (১৯৮৩), *একটি সার্টিফিকেট চাই* (১৯৮৪), *ভেবো না বৃষ্টি হবে না* (১৯৮৬), *আড়াল থেকে* (১৯৮৯), *চলে গেলে পারলে যেতে* (১৯৯২), *তোমার হাতে গ্রেনেড এবং আমার বুকে প্রেম* (১৯৯৭), *প্রথম দেখার দিন* (১৯৯৭)

মোহন রায়হান : *জ্বলে উঠি সাহসী মানুষ* (১৯৭৯), *আমাদের ঐক্য আমাদের জয়* (১৯৮০), *সামরিক আদালতে অভিভাষণ* (১৯৮৪), *আর হলো না বাড়ি ফেরা* (১৯৮৫), *ফিরে দাও সেই স্টেনগান* (১৯৮৬), *শকুন সময়* (১৯৮৭), *গোলাপজানের পকেট পঞ্জিকা* (১৯৮৭), *মোহন রায়হানের সংগ্রামী কবিতা* (১৯৮৯), *মোহন রায়হানের প্রেমের কবিতা* (১৯৮৯), *ঘাতক না প্রেমিক* (১৯৯৫), *সবুজ চাঁদরে ঢাকা রক্তাক্ত ছুরি* (১৯৯৮)

মোহাম্মদ কামাল : *এখানে অরণ্যভয় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৯)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *দুর্লভ দিন* (১৯৬১), *শঙ্কিত আলোক* (১৯৬৮), *বিপন্ন বিষাদ* (১৯৬৮), *প্রতনু প্রত্যাশা* (১৯৭৩), *ভালবাসার হাতে* (১৯৭৬), *ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার* (১৯৮৪), *কোলাহলের পর* (১৯৯০), *ধীর প্রবাহে*

(১৯৯৩), *ভাষাময় প্রজাপতি* (১৯৯৭), *অনির্বাণ* (১৯৬৮), *ইচ্ছেমতী* (১৯৭৬), *তৃতীয় তরঙ্গে* (১৯৮৪)

মোহাম্মদ মামুন : *প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার* (১৯৬৩)

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ : *জুলেখার মন* (১৯৫৯), *অন্ধকারে একা* (১৯৬০), *রক্তিম হৃদয়* (১৯৬৬), *আপন ভুবন* (১৯৭৪), *কাব্যসম্ভার* (১৯৮০), *বৈরিতার হাতে বন্দী* (১৯৯৬)

মোহাম্মদ রফিক : *বৈশাখী পূর্ণিমা* (১৯৭০), *ধুলোর সংসারে এই মাটি* (১৯৭৬), *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯), *কপিলা* (১৯৮৩), *খোলা কবিতা* (১৯৮৩), *উপকথা* (১৯৮৫), *গাওদিয়া* (১৯৮৭), *স্বদেশী নিঃশ্বাস-তুমিময়* (১৯৮৮), *মেঘে এবং কাদায়* (১৯৯১), *মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৩), *রূপকথা কিংবদন্তী* (১৯৯৮), *মৎস্যগন্ধা* (১৯৯৯), *মাতি কিসকু* (২০০০), *স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে* (২০০২), *ভালোবাসার জীবনানন্দ* (২০০৩), *বিষখালী সন্ধ্যা* (২০০৩), *কালাপানি* (২০০৬)

মোহাম্মদ হোসেন : *গুলশানে পাকিস্তান (১৯৫০)*

মোস্তফা মীর : *গোলাপের পাশে মুখ* (১৯৮৬)

মোস্তাক আহমাদ দীন : *কথা ও হাড়ের বেদনা* (২০০১), *জল ও ত্রিকালদর্শী* (২০০৫), *জল ও শ্রীমতী* (২০০৯), *ভিখিরিও রাজস্থানে যায়* (২০১২), *বাণপ্রস্থের আগে* (২০১৪)

মুশাররাফ করিম : *পাথরের সাথে কথা* (১৯৮২), *অন্য এক আদিবাসে* (১৯৮৪), *সে নয় সুন্দরী শিরিণ* (১৯৮৮), *কোথায় সেই দীর্ঘ দেবদারু* (১৯৯০), *নিবেদনের গন্ধঢালা* (১৯৯২), *অন্তরের ব্যাকুল ব্যাধি* (১৯৯৭), *কে আছে কেউ কি আছে* (২০০২)

রওশন ইজদানী : *বজ্রবাণী* (১৯৪৭), *রাহগীর* (১৯৪৯), *চিনুবিবি* (১৯৫১), *রঙ্গিলা বন্ধু* (১৯৫১) *খাতামুন নবীঈন* (১৯৬০), *পাকিস্তানের জঙ্গনামা* (১৯৬৫), *মরুর কাফেলা*

রওশন ঝুনু : *নিগূঢ় বাজে তানপুরা (১৯৯৬)*

রকিবুল হাসান : *অনিয়ম চুম্বনের সিঁড়ি ধরে* (১৯৯১), *এক ধরনের অহংকার* (১৯৯৮), *দুঃখময়ী শ্যামবর্ণ রাত* (২০০৮)

রফিক আজাদ : *অসম্ভব পায়ে* (১৯৭৩), *সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে* (১৯৭৪), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৭৫), *চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* (১৯৭৭), *প্রেমের কবিতা* (১৯৮১), *সশস্ত্র সুন্দর* (১৯৮২), *একজীবনে* (১৯৮৩), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), অঙ্গীকারের কবিতা (১৯৮৩), *প্রিয় শাড়িগুলি* (১৯৮৩), *হাতুড়ির নিচে জীবন* (১৯৮৪), *পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ* (১৯৮৫), *রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৭), *গদ্যের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমি এক দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক* (১৯৮৭), *অপর অরণ্যে* (১৯৮৭), *খুব বেশি দূরে নয়* (১৯৮৯), *ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস* (১৯৯২), *করো অশ্রুপাত* (১৯৯৪),

পাগলা গারদ থেকে প্রেমিকার চিঠি (১৯৯৫), *প্রেম ও বিরহের কবিতা* (১৯৯৪), *কবিতাসমগ্র* (১৯৯৬), *কণ্ঠে তুলে আনতে চাই* (১৯৯৬), *প্রেমের কবিতাসমগ্র* (১৯৯৭), *হৃদয়ে কী বা দোষ* (১৯৯৭), *বিরিশিরি পর্ব* (১৯৯৭)

রবিউল হুসাইন : *সুন্দরী ফণা* (১৯৮৪), *কোথায় আমার নভোযান*, *কেন্দ্রধ্বনিতে বেজে ওঠে* (১৯৯৬),

রবীন সমাদ্দার : *শূন্যতার গাথা ভালোবাসার কবিতা* (১৯৯১), *স্বপ্নের অলিন্দে* (১৯৯৪), *হে সময়গ্রন্থি* (১৯৯৭)

রবীন্দ্র গোপ :*পতাকায় রক্তের দাগ* (১৯৮৭), *পালালো কুমারী সাপ* (১৯৮৯), *অরক্ষিত সভ্যতা* (১৯৮১), *দাঁড়াও আসছি* (১৯৮৩), *মানুষ এবং মানুষ* (১৯৮৪), *জলের বাড়ি মাঝ উঠানে* (১৯৯০), *কালরাত্রি* (১৯৯৭)

রহমান হেনরী : *বনভোজনের মতো অন্ধকার* (১৯৯৯), *বিষাদের চন্দ্রবন* (১৯৯৮), *প্রকৃত সারস উড়ে যায়* (২০০০), *আদি ও আসল, ছহি ভেদকথা* (১৯৯৯), *সার্কাস মুখরিত গ্রাম* (২০০১), *গীতঅনার্য* (২০০২), *অন্ধকারবেলা* (২০০০), *খুনঝরা নদী* (২০০৫), *তোমাকে বাসনা করি* (২০০৫), *গোত্রভূমিকাহীন* (২০০৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০৮)

রিফাত চৌধুরী : *আলিঙ্গনের নাম* (১৯৮৪), *জংশন, মেঘের প্রতিভা* (১৯৯০), *উঠন্ত বৃক্ষের পত্র* , *সুপ্রভাত, সূর্য, সূর্যজন্তু, আমি একজন ভৌগলিক, বাঁশঝাড়ের প্রতি, অবশিষ্ট মোম, স্কেচের চাকা, বধির ব-দ্বীপ*

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯), *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম* (১৯৮১), *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৪), *ছোবল* (১৯৮৬), *দিয়েছিলে সকল আকাশ* (১৯৮৮), *মৌলিক মুখোশ* (১৯৯০), *একগ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২), *বিষ বিরিক্ষের বীজ* (১৯৯২)

রুবী রহমান : *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৮৩), *যে জীবন ফড়িঙের* (১৯৯১), *কান পেতে আছি মৌমাছি* (২০০৬)

রেজাউদ্দিন স্টালিন : *পূর্ণপ্রাণ যাবো* (১৯৮৩), *ফিরিনি অবাধ্য আমি* (১৯৮৬), *দাঁড়াও পথিকবর* (১৯৮৬), *ভেঙে আনো ভেতরে অন্তরে* (১৯৮৭), *সেইসব ছদ্মবেশ* (১৯৮৯), *আঙুলের জন্য দ্বৈরথ* (১৯৯২), *আশ্চর্য আয়নাগুলো* (১৯৯২), *ওরা আমাকে খুঁজেছিল সম্ভাবনার নিচে* (১৯৯৬), *পৃথিবীতে ভোর হতে দেখিনি কখনো* (১৯৯৭), *কবিতাসংগ্রহ* (১৯৯৭), *আশীর্বাদ করি আমার দুঃসময়কে* (১৯৯৮), *হিংস্র নৈশভোজ* (১৯৯৯), *আমি পৃথিবীর দিকে আসছি* (২০০০)

শহীদ কাদরী : *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭), *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪), *কোথাও কোন ক্রন্দন নেই* (১৯৭৮), *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দিও* (২০১২)

শান্তনু চৌধুরী : *উৎস থেকে বহ্নি থেকে* (১৯৯৪), *উনুনসূত্র*

শামসুর রাহমান : *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০), *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩), *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭), *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮), *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০), *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২), *দুঃসময়ের মুখোমুখি* (১৯৭৩), *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (১৯৭৪), *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৯৭৪), *এক ধরনের*

অহংকার (১৯৭৫), *আমি অনাহারী* (১৯৭০), *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* (১৯৭৭), *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* (১৯৭৭), *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* (১৯৭৮), *ইকারুশের আকাশ* (১৯৮২), *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২), *মাতাল ঋত্বিক* (১৯৮২), *কবিতার সঙ্গে গেরাস্থলি* (১৯৮৩), *নায়কের ছায়া* (১৯৮৩), *আমার কোনো তাড়া নেই* (১৯৮৪), *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে* (১৯৮৪), *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই* (১৯৮৫), *হোমারের স্বপ্নময় হাত* (১৯৮৫), *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই* (১৯৮৫), *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ* (১৯৮৫), *এক ফোঁটা কেমন অনল* (১৯৮৬), *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* (১৯৮৬), *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে* (১৯৮৬), *অবিরল জলভ্রমি* (১৯৮৬), *আমার ক'জন সঙ্গী* (১৯৮৬), *ঝর্ণা আমার আঙ্গুলে* (১৯৮৭), *খুব বেশি ভাল থাকতে নেই* (১৯৮৭), *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার* (১৯৮৭), *মঞ্চের মাঝখানে* (১৯৮৮), *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* (১৯৮৮), *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো* (১৯৮৯), *সে এক পরবাসে* (১৯৯০), *গৃহযুদ্ধের আগে* (১৯৯০), *খণ্ডিত গৌরব* (১৯৯২), *ধ্বংসের কিনারে ব'সে* (১৯৯২), *হরিণের হাড়*(১৯৯৩), *আকাশ আসবে নেমে* (১৯৯৪), *উজাড় বাগান* (১৯৯৫), *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা* (১৯৯৫), *মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই* (১৯৯৬), *তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃদস্পন্দন* (১৯৯৬), *তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি* (১৯৯৭), *হেমন্ত, সন্ধ্যায় কিছুকাল* (১৯৯৭), *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ* (১৯৯৭)

শামসুল ইসলাম : *জলৌকা হে নীলযমুনার* (১৯৭৫) *চিরবিরিঞ্চির তরু* (১৯৮২), *লোহল নুলিয়া* (১৯৮৫), *কালনেমিকাল* (১৯৮৭), *নষ্টচন্দ্রার চাঁদ* (১৯৮৯), *কনেসুন্দরী আলো* (১৯৯২), *হিচহাইকার ও অন্যান্য পদ্য* (১৯৯৬), *শামসুল ইসলামের কবিতা সংগ্রহ* (১৯৯৬), *একপ্রেমিতে আলকেমিতে* (২০০০)

শামীম আজাদ : *স্পর্শের অপেক্ষা, ভালোবাসার কবিতা, হে যুবক তোমার ভবিষ্যৎ, মধ্যবিত্ত বদলে যাচ্ছে, দুই রমণীর মধ্যে সময়*

শামীমুল হক শামীম : *তপোবনে তোপধ্বনি* (১৯৯১)

শাহনাজ মুন্নী : *ক্ষমঃ গো শ্বেতদুগ্ধ* (১৯৯২), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৮), *আমার নিজের এলাকা* (২০০৩), *আত্মঘাতি সুখ* (২০০৪), *তৃতীয় ঘণ্টা পড়ার আগেই* (২০১১)

শাহাদাৎ হোসেন : *রূপছন্দা* (১৯৫০), *মৃদঙ্গ* (১৩৩৫), *কল্পরেখা* (১৩৩৬)

শাহেরা খাতুন বেলা : *কষ্ট কুড়ানো মেয়ে* (১৯৮৩), *যুগলধারা* (১৯৯১), *সুখের কাবিন ফিরিয়ে দেবো* (১৯৮৬), *গোলাপের অস্ত্রপচার* (১৯৮৭), *আমার শাঁসে তুমি* (১৯৮৮), *আঁজলাতে নেই ভালোবাসা* (১৯৮৮), *নিষিদ্ধ ধুলোয় ফেরা* (১৯৮৯), *এ হৃদয় কৃপণ* (১৯৯২), *দূরে থাকাই ভালো* (১৯৯৩), *চোখ মেলে চোখে দেব* (১৯৯৫), *ভালোবাসায় গ্যাংগ্রিন* (১৯৯৬), *ঘুমিয়ে থেকো আশ্বিনের কোলে* (১৯৯৭), *প্রাণে ধরেছি তোমাকে* (১৯৯৭)

শিমুল মাহমুদ : *মস্তিষ্কে দিনরাত্রি* (১৯৯০), *সাদা ঘোড়ার স্রোত* (১৯৯৮), *প্রাকৃত ঈশ্বর* (২০০০), *জীবাতবে না মৃত্যবে* (২০০১), *কন্যাকমলসংহিতা* (২০০৭), *অধিবিদ্যাকে না বলুন* (২০০৮)

শিহাব সরকার : *লাল যৌবন দিন* (১৯৮২), *তোমার ক্ষত্রিয়* (১৯৮৩), *জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে* (১৯৮৫), *কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৮), *করো গান বনজ্যোৎস্নার* (১৯৯৩), *ব্যাবিলন এক্সপ্রেস* (১৯৯৭), *ভূত তাড়াবার শোক* (১৯৯৯), *মেরিলিন, ঐ যে গুহা* (২০০০), *উড়িছে অন্ধ শঙ্খচিল* (২০০৬)

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী : *আমার প্রিয়া, পীযূস পাবনী, মর্মবীণা, মুক্তিবীণা, হ* (১৯৫৪)

শেখ হবিবুর রহমান : *পারিজাত* (১৯১২), *বাঁশরী* (১৯১৭), *কোহিনূর কাব্য* (১৯১৯), *গুলশান* (১৯২৮)

শোয়েব শাদাব : *অশেষ প্রস্তরযুগ*(১৯৯৮)

সমুদ্র গুপ্ত : *রোদ ঝলসানো মুখ* (১৯৭৭), *স্বপ্নমঙ্গল কাব্য* (১৯৮৭), *এখনো উত্থান আছে* (১৯৯০), *চোখে চোখ রেখে* (১৯৯১), *একাকী রৌদ্রের দিকে* (১৯৯২), *শেকড়ের শোকে* (১৯৯৩), *ঘাসপাতার ছুরি* (১৯৯৬), *সাতসমুদ্র* (১৯৯৭)

সরকার আমিন : *সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ* (১৯৯২), *ইহকাব্য* (১৯৯৯), *What my name is!* (২০০২), *আত্মহত্যার পরিবর্তে এককাপ চা খাও* (২০০৩), *ব্লেড দিয়ে কেটেছিল জল* (২০০৪), *চার পাঁচ হাজার পিঁপড়ের দুঃখ* (২০০৫), *আমাদের পোষা ট্রেন* (২০০৬), *যাকে খুন করার কথা তাকে দেখে হেসে ফেলি* (২০০৭), *প্রেম ও প্যারাসিটামল (২০১২), কবিতাসংগ্রহ-১* (২০১০)

সরকার মাসুদ : *কাচপোকার ঘূর্ণিদৃশ্য* (১৯৮৫), *প্রিয়তমার নৌকাঘাট* (১৯৯৯)

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল : *তৃষ্ণার্ত জলপরী* (১৯৮২), *তবু কেউ কারো নই* (১৯৮৫), *অপেক্ষায় আছি প্রতীক্ষায় থেকো* (১৯৮৭), *ঘাতকের হাতে সংবিধান* (১৯৯০), *শহরের শেষ বাড়ি* (১৯৯১), *একি কাণ্ড পাতা নেই* (১৯৯৫), *দ্রবীভূত গদ্যপদ্য* (১৯৯৯), *ঐক্যের বিপক্ষে একা* (২০০০), *এলামেলো মেঘের মন* (২০০১), *নির্জনে কেন এতো কোলাহল* (২০০৩), *পরের জায়গা পরের জমিন* (২০০৪), *নিদ্রার ভেতর জেগে থাকা* (২০০৪), *ঘৃণিত গৌরব* (২০০৫), *নীড়ে নিরুদ্দেশ* (২০০৭)

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্ : *আমাকে ছাড়া অনেক কিছু* (১৯৭৭), *আঁধির যতো শত্রুমিত্র* (১৯৮০), *অদম্য পথিকের গান* (১৯৮২), *এই যে তুমুল বৃষ্টি* (১৯৮৪), *সরল চালের খেলা* (১৯৮৫), *যদি কিছু পাই* (১৯৮৭), *শাসন নেই, ধমক নেই* (১৯৮৭), *রোজ তোমাকে বেরুতে হয়* (১৯৮৭), *একই টেবিলে দশজন* (১৯৮৭), *এই যে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি, দ্যাখো, দ্যাখো* (১৯৮৯), *চেয়ে দেখি কত কিছু* (১৯৯৪), *চেয়ে দেখি কতো কিছু* (১৯৯৪)

সাজ্জাদ শরীফ : *ছুরিচিকিৎসা* (১৯৮৫)

সানাউল হক : *নদী ও মানুষের কবিতা* (১৯৫৬), *সম্ভবা অনন্যা* (১৯৬২), *সূর্য অন্যতর* (১৯৬৩), *বিচূর্ণ আর্শিতে* (১৯৬৮), *বিচূর্ণ আর্শিতে* (১৯৬৮), *ছড়া ঘরে ঘরে* (১৯৭২), *একটি ইচ্ছা সহস্র পালে* (১৯৭৩), *কাল সমকাল* (১৯৭৫), *পদ্মিনী শঙ্খিনী* (১৯৭৬), *প্রবাসে যখন* (১৯৮১), *কত রঙ কত মেঘ* (১৯৮১), *বিরাশির কবিতা* (১৯৮২), *উত্তীর্ণ পঞ্চাশে* (১৯৮৪), *বিরতিহীন* (১৯৮৭)

সানাউল হক খান : *অন্ধ করতালি* (১৯৮০), *জন্মগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ* (১৯৮৪), *দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিণাম* (১৯৮৫), *লুব্ধ প্রার্থনা* (১৯৮৬), *দুঃখী বাংলার বেখেলহেমে* (১৯৮৯), *তোমার নিয়ম আমার নিয়তি* (১৯৯৭)

সালিম সাবরিন : *দুমুখো ঈগলের কোলাজ* (১৯৯৬), *নদীমহালের জার্নাল* (২০০৯), *যে পৃথিবী জেগে থাকে ঘুমের ভেতর* (২০১৪)

সায্যাদ কাদির : *যথেচ্ছ ধ্রুপদ* (১৯৭০), *রৌদ্রে প্রতিধ্বনি* (১৯৭৬), *দূরতমার কাছে* (১৯৮৫), *দরজার কাছে নদী* (১৯৯২), *আমার প্রিয়* (১৯৯৫)

সিকদার আমিনুল হক : *দূরের কার্নিশ* (১৯৭৫), *তিন পাপড়ির ফুল* (১৯৭৯), *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা* (১৯৮২), *আমি সেই ইলেকট্রা* (১৯৮৫), *বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে* (১৯৮৭), *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল* (১৯৮৭), *এক রাত্রি এক ঋতু* (১৯৯১), *সতত ডানার মানুষ থেকে* (১৯৯১), *সুপ্রভাত হে বারান্দা* (১৯৯৩), *কাফকার জামা* (১৯৯৪), *সুলতা আমার এলসা* (১৯৯৪), *রুমালের আলো ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯৫), *লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো* (১৯৯৭)

সিকান্‌দার আবু জাফর : *বৈরী বৃষ্টিতে* (১৯৬৫), *তিমিরান্তিক* (১৯৬৫), *প্রসন্ন প্রহর* (১৯৬৫), *কবিতা ১৩৭২* (১৯৬৮), *বৃশ্চিক লগ্ন* (১৯৭১), *বাংলা ছাড়ো* (১৯৭১), *কবিতা ১৩৭৪* (১৯৭২)

সিদ্ধার্থ হক : *এ নগর কেঁপে ওঠে ভোরে* (১৯৯৩), *বাতাস মুদ্রণ* (১৯৯৪), *বিবিধ মুখোশ* (১৯৯৬), *আগুন কাজ, ঘুমহীন ক্যানভাস* (১৯৯৯)

সুফী জুলফিকার হায়দার : *ফের বানাও মুসলমান* (১৯৫৯)

সুফী মোতাহার হোসেন : *সনেট সংকলন* বের হয় ১৯৬৫ *সনেট সঞ্চয়ন* (১৯৬৬), *সনেট শতক* (১৯৭০), *সনেটমালা* (১৯৭০),

সুব্রত বড়ুয়া : *হলুদ বিকেলের গান*(১৯৮৫), *কবিতাসমগ্র*(২০০৬)

সুহিতা সুলতানা : *দুঃসহ শুদ্ধতা* (১৯৯১), *অবিরাম শোকার্ত স্বপ্নেরা* (১৯৯৩), *অসংখ্য অভিশাপ আমার নিদ্রার ভোরে* (১৯৯৫)

সৈয়দ আলী আহসান : *অনেক আকাশ* (১৯৫৯), *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৯৬৪), *সহসা সচকিত* (১৯৬৫), *উচ্চারণ* (১৯৬৮), *আমাদের প্রতিদিনের শব্দ* (১৯৭৪), *কাব্য সমগ্র* (১৯৭৪), *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৫), *সমুদ্রেই যাব* (১৯৮৭), *রজনীগন্ধা* (১৯৮৮), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৬)

সৈয়দ শামসুল হক : *বুনোবৃষ্টির গান* (১৯৫৯), *বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা* (১৯৬৯), *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১), *বিরতিহীন উৎসব* (১৯৬৯), *প্রতিধ্বনিগণ* (১৯৭৩), *অপর*

পুরুষ (১৯৭৮), *নিজস্ব বিষয়* (১৯৮২), *পরানের গহীন ভিতর* (১৯৮০), *রজ্জুপথে চলেছি* (১৯৮৭), *এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি* (১৯৮৯), *বেজান শহরের জন্য কোরাস* (১৯৮৯), *অগ্নি ও জলের কবিতা* (১৯৮৯), *কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে* (১৯৯০), *আমি জন্মগ্রহণ করিনি* (১৯৯০) *তোরাপের ভাই* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৯০), *রাজনৈতিক কবিতা* (১৯৯১), *আমার শহর* (১৯৯৫), *নাভিমূলে ভস্মাধার* (১৯৯৬), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৬), *অস্তিত্ব দিনের পথিক* (১৯৯৮), *অধোগামী দিনের পঞ্জিকা* (১৯৯৮), *কবিতা সংগ্রহ* (১৯৯৮), *ভালোবাসার পদাবলী* (২০১২)

সৈয়দ হায়দার : *কোনো সুখবর নেই* (১৯৮৩), *ভুলগুলো নাড়া দেয়* (১৯৮৫), *ধ্বংসের কাছে আছি* (১৯৮৬), *ভাঙলে মাটির মতো* (১৯৮৬), *পাতা থেকে পাখি* (১৯৯১), *কাছে থেকে প্রবাসিনী* (১৯৯২), *উত্তরবঙ্গ* (১৯৯৫), *বয়স যখন দিচ্ছে তাড়া* (১৯৯৫), *অরিস্ট দু'জন দু'জনকে* (১৯৯৬),

সৌমিত্র দেব : *আকাশের রঙ বদলায়* (১৯৯২), *মাধবকুণ্ডের মেয়ে* (১৯৯৬), *শময়িতাদের বাড়ি* (১৯৯৭), *বনপর্যটক* (২০০১)

হাফিজ রশিদ খান : *জোস্না কেমন ফুটেছে* (১৯৮২), *চোরাগুপ্তা ডুবোপাহাড়* (১৯৮৮), *লোহিত ম্যাণ্ডোলিন* (১৯৯১), *আদিবাসী কাব্য* (১৯৯৭), স্বপ্নখণ্ডের বেগম রোকেয়া রুকু (১৯৯৫), *দস্যু রত্নাকর ও অন্যান্য কবিতা* (২০০০), *জুম পাহাড়ের ওম* (২০০২), *টোটেমের রাতে হত্যাকাণ্ড* (২০০২), *এই সুন্দর আমাঙ হারাবো না* (২০০৬)

হাবীবুর রহমান : *উপাত্ত* (১৯৬২)

হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী : *তাজমহল* (১৩৭৫), *হিমালয়* (১৩৮৯), *জনতায় নির্জনতা* (১৩৯০), *মানবতা* (১৩৯১), *কবিতা* (১৯৯৩), *স্বাধীনতা* (১৯৯৩), *১৪০০ সাল পরে* (১৪০১)

হাবীবুল্লাহ সিরাজী : *দাও বৃক্ষ দাও দিন* (১৯৭৫), *মোমশিল্পের ক্ষয়ক্ষতি* (১৯৭৭), *মধ্যরাতে দুলে ওঠে গাস* (১৯৮১), *হাওয়া কলে জোড়া গাড়ি* (১৯৮২), *নোনা জলে বুনো সংসার* (১৯৮৩), *স্বপ্নহীনতার পক্ষে* (১৯৮৪), *আমার একজনই বন্ধু* (১৯৮৭), *পোশাকের বদলে পালা* (১৯৮৮), *কৃষ্ণ কৃপাণ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৯০) *সিংহদরজা* (১৯৯০), *বেদনার চলিশ আঙুল* (১৯৯১), *ম্লানম্রিয়মান নয়* (১৯৯২)

হায়াৎ সাইফ : *সন্ত্রাসে সহবাস* (১৯৮৩), *সব ফেলে দিয়ে* (১৯৮৪), *প্রধানত মাটি ও মানুষ* (১৯৮৯), *এপিঠ ওপিঠ* (১৯৮৯), *হায়াৎ সাইফের কবিতা* (১৯৯৩), *প্রেমের কবিতা* (১৯৯৬)

হাসান হাফিজ : *এখন যৌবন যার* (১৯৮২), *ভালোবাস, তার ভাষা* (১৯৮৬), *অবাধ্য অর্জুন* (১৯৮৬), *তুমি বধূ অবিবাহের* (১৯৮৭), *হয়তো কিছু হবে* (১৯৮৭), *হাসান হাবিবের প্রেমের কবিতা* (১৯৯৪), *দূরে পাহাড়ের ঘুম* (১৯৯৫), *সকল ডুবুরি নয় সমান সন্ধিৎসু* (১৯৯৫), *তৃষ্ণার তানপুরা* (১৯৯৬), *ভালোবাসার*

অগ্নিচুমুক (১৯৯৭), *হৃদয় বড়ো কাঁদছে* (১৯৯৭), *না ওড়ে না পোড়ে প্রেম* (১৯৯৭), *যে মধুমদ তোমার ফুলে* (১৯৯৮)

হাসান হাফিজুর রহমান : *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩), *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮), *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮), *যখন উদ্যত সঙ্গীন* (১৩৭৯), *বজ্রে চেরা আঁধার আমার* (১৯৭৬), *শোকার্ত তরবারী* (১৯৮২), *আমার ভেতরের বাঘ* (১৯৮৩), *ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী* (১৯৮৩), *হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা* (১৯৮৬)

হুমায়ুন আজাদ : *অলৌকিক স্টীমার* (১৯৭৩), *জ্বলো চিতাবাঘ* (১৯৮৫), *সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* (১৯৮৭), *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল* (১৯৮৭), *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* (১৯৯০), *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* (১৯৯৮), *পেরোনোর কিছু নেই* (২০০৪)

হুমায়ুন কবির : *কুসুমিত ইস্পাত* (১৯৭২)

হেনরী স্বপন : *কীর্তনখোলা* (১৯৯৫), *মাটির বুকেও রৌদ্রজ্বলে* (১৯৯৫), *বাল্যকাল ও মোমের শরীর আগুন* (১৯৯৮), *জংধরা ধূলি* (২০০২), *কাস্তে শানানো মোজার্ট*

হেলাল হাফিজ : *যে জলে আগুন জ্বলে* (১৯৮৬)

উপন্যাস

অজয় ভট্টাচার্য : *কুলিমেম* (১৯৭০), *অরণ্যানী* (১৯৮৩), *বাতাসীর মা* (১৯৮৫)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬)

অনামিকা হক লিলি : *অনুখন* (১৯৮৫), *ছায়ার আচ্ছাদনে* (১৯৮৯), *অগ্নি ও জলের ভেতর* (১৯৯০)

অনিল বড়ুয়া : *শঙ্ক নদীরও তীরে* (১৯৬৭)

অরূপ তালুকদার : *সারাদিন সারারাত*, *আশার নাম মৃগতৃষ্ণিকা* (১৩৭৩), *নীলিমায় নীল*, *রংবাজ ফেরে না* (১৩৭৬), *দূরেও না কাছেও না*, *এতটুকু আশা*

অসীম রায় : *শব্দের খাঁচায়*

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *অন্তরাল*, *মনে মনান্তরে*, *পথের ডাক* (১৯৫৬), *নীল দিগন্ত* (১৩৭৪)

আকবরউদ্দীন : *মাটির মানুষ* (১৯৬৬), *বেড়াজাল*, *অভিনেতা*

আকবর হোসেন : *অবাঞ্ছিত* (১৯৫০), দুষ্টক্ষত (১৯৮৯), *কি পাইনি* (১৯৫২), *মোহমুক্তি*(১৯৫৩), *ঢেউ জাগে* (১৯৬১), *দু'দিনের খেলাঘরে* (১৯৬৫), *মেঘ-বিজলী বাদল* (১৯৬৮), *নতুন পৃথিবী* (১৯৭৪), *আভা ও তার প্রথম পুরুষ* (১৯৮৮),

আকিমুন রহমান : *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯), *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭), *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিলো কয়েকটি ধূলিকণা* (২০০৪)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬), *খোয়াবনামা* (১৯৯৬)

আতা সরকার : *তিতুর লেঠেল* (১৯৮৭), *আপন লড়াই* (১৯৮৮), *একদা অনঙ্গ বৌ* (১৯৯০), *চারদিক বৃষ্টি* (১৯৯০), *সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান* (২০০৩)
আতাহার আহমেদ : *উন্মোচন* (১৯৫৬), *সূর্যের নীচে* (১৯৫৮), *পিপাসা* (১৯৫৮)
আনিস চৌধুরী : *প্রশ্ন জাগে* (১৯৫১), *শখের পুতুল* (১৯৬১), *সৌরভ* (১৯৬৮), *মধুগড়* (১৯৭৪), *ঐ রকম একজন* (১৯৮৬)
আনিস সিদ্দিকী : *যমুনার তীরে তীরে* (১৯৬৮), *হেরেমের নায়িকা*, *হেরেম থেকে দূরে* এবং *মোগল হেরেমের অন্তরালে*
আনিসা হোসেন : *দূরের সংলাপ* (১৯৮৯), *পারাবার* (১৯৯৫)
আনিসুল হক : *ফাল্গুনের রাতের আঁধারে* (১৯৯৯), *আয়েশামঙ্গল* (১৯৯৮), *নিধুয় পাথারে* (১৯৯৯), আবার তোরা কিপ্টে হ (২০০৪), একাকী একটি মেয়ে (২০০৪), ক্ষুধা ও ভারোবাসার গল্প (২০০৪), প্রিয় চার উপন্যাস (২০০৪), মনে রেখ প্রিয় পাতা (২০০৪)
আনোয়ার পাশা : *নীড় সন্ধানী* (১৯৬৮), *নিষুতি রাতের গাথা* (১৯৬৮), *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩),
আনোয়ারা সৈয়দ হক : *কার্নিসে ঝুলন্ত গোলাপ* (২০০৫), *নরক ও ফুলের কাহিনী* (২০০৬), *উদয় মিনাকে চায়* (২০০৪), *সেই প্রেম সেই সময়* (২০০৪)
আফরোজা পারভীন : *ভালবাসার মুখ* (১৯৯২), *বিহঙ্গের ডানা* (১৯৯২), *যুদ্ধদিনের কাব্য* (১৯৯৩), *রাজপুত্র* (১৯৯৬)
আফসান চৌধুরী : *বিশ্বাসঘাতকগণ* (১৯৯৩)
আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী : *বান* (১৯৫৮)
আবদুর রাজ্জাক : *কন্যাকুমারী* (১৯৬০), *বঁধুয়ার লাগি* (১৯৬৮)
আবদুর রশীদ সিদ্দিকী : *উপেন্দ্র নন্দিনী*, *মেহেরুন্নেসা*, *নুরুন্নেসা*, *নুরবাহার*
আবদুল গাফফার চৌধুরী : *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৫২), *নাম না জানা ভোর* (১৯৬২), *শেষ রজনীর চাঁদ* (১৩৬৮), *নীল যমুনা* (১৯৬৪)
আবদুল মান্নান সৈয়দ : *পরিপ্রেক্ষিত দাসদাসী* (১৯৭৪), *পোড়ামাটির কাজ* (১৯৮২), *অ-তে অজগর* (১৯৮২), *হে সংসার হে লতা* (১৯৮২), *গভীর গভীরতর অসুখ* (১৯৮৩)
আবদুল্লাহ আল মামুন : *মানব তোমার সারাজীবন* (১৯৮৮), *আহ দেবদাস* (১৯৮৯), *হায় পার্বতী* (১৯৯১), *তাহাদের যৌবনকাল* (১৯৯১)
আবু ইসহাক : *সূর্য-দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫), *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬), *জাল* (১৯৮৮)
আবু জাফর শামসুদ্দীন : *পরিত্যক্ত স্বামী* (১৯৪৭), *মুক্তি* (১৯৪৮), *প্রপঞ্চ* (১৯৮০), *দেয়াল* (১৯৮৬), *ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩), *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪), *সংকর সংকীর্তন* (১৯৮০)
আবুবকর সিদ্দিক : *জলরাক্ষস* (১৯৮৫), *খরাদাহ* (১৯৮৭), *একাত্তরের হৃদয়ভস্ম* (১৯৯৭), *বারুদপোড়া প্রহর* (১৯৯৬)

আবু রুশ্‌দ : *এলোমেলো* (১৩৫৩), *সামনে নূতন দিন* (১৯৫৬), *ডোবা হল দীঘি* (১৯৬০), *নোঙর* (১৯৬৩), *অনিশ্চিত রাগিণী* (১৯৬৯), *স্থগিত দ্বীপ* (১৯৭৪)

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন : *বাতাসীর প্রেমকথা* (১৯৮৪), *দুঃস্বপ্নের জলপায়রা* (১৯৮৪), *বাগদত্তা* (১৯৮৬), *টাকার গাছ* (১৯৮৬), *রেবার প্রেমকথা* (১৯৮৬), *ঝর্না ঝরেরে* (১৯৮৬), *ফুলবানু* (১৯৮৭), *ফেরারী* (১৯৮৭), *যুগলবন্দী* (১৯৮৭), *এখানে নোঙ্গর* (১৯৮৮), *রংমহল* (১৯৮৯), *অসতী* (১৯৯০), *নীলাম্বরী* (১৯৯৩), *কেনিকারও মেন্ডিস* (১৯৯৪), *ঘাসফুল* (১৯৯৫), *কালো কফিন* (১৯৯৫), *মেধাবী মেয়ে* (১৯৯৬)

আবুল ফজল : *চৌচির* (১৯২৭), *প্রদীপ ও পতঙ্গ* (১৯৪০), *সাহসিকা* (১৯৪৬), *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮), *রাঙা প্রভাত* (১৯৫৭), *পরাবর্তন* (১৯৮০)

আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৭-১৯৭৯) *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫), *সত্যমিথ্যা* (১৯৫৩), *আবে হায়াত* (১৯৬৮)

আবুল হাশেম : *পাহাড়ের বন্দী* (১৯৪৭), *আলো ও আলেয়া* (১৯৬৫), *শ্রান্ত বলাকা* (১৯৭০)

আবুল হাসানাত : *বিহঙ্গ মন* (১৯৭০), *দীপিত অরণ্য* (১৯৭৫), *না সুখ না দুঃখ* (১৯৭৬), *একজন বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাস* (১৯৯৪), মুক্তিযুদ্ধের পাঁচালী (১৯৯৭)

আমজাদ হোসেন : *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫), *নিরক্ষর স্বর্গে* (১৯৭৮), *অস্থির পাখিরা* (১৯৮৩), *আগুন লাগা সন্ধ্যা* (১৯৮৮), *শেষ রজনী* (১৯৮৯), *মাধবীর মাধব* (১৯৮৯), *মাধবী সংবাদ* (১৯৯০), *মাধবী ও হিমানী* (১৯৯০), *মাধবী সমগ্র* (১৯৯০), *কেউ কোনদিন* (১৯৯০), *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৯১)

আমিনা মাহমুদ : *পাহাড়ের ওপারে পাহাড়* (১৯৯৪), *ঘরে ফেরা* (১৯৯৫)

আল মাহমুদ : *উপমহাদেশ* (১৯৯৩), *আগুনের মেয়ে* (১৯৯৫), *কাবিলের বোন* (১৯৯৩), *ডাহুকী* (১৯৯২), *নিশিন্দা নারী* (১৯৯৫)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০), *কর্ণফুলী* (১৯৬২), *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪), *পুরুদ্রুজ* (১৯৮৪), *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২), *খসড়া কাগজ* (১৯৮৬), *পাটরাণী* (১৯৮৬), *শ্যামল ছায়ার সংবাদ*(১৯৮৬), *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* (১৯৮৬), *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*(১৯৮৬), *অপর যোদ্ধারা*(১৯৯১), *স্বাগতম ভালবাসা* (১৯৯১), *ক্যামেলিয়া* (১৯৯১), *অনূদিত অন্ধকার* (১৯৯১), *ধানমণ্ডি উপাখ্যান* (১৯৯১), *ক্যাম্পাস* (১৯৯৪), *মাটির সন্তান* (১৯৯১), *জন্মদাতা ১ম পর্ব*, *অপর যোদ্ধারা* (১৯৯২), *পুরানা পল্টন* (১৯৯২), *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজী* (১৯৯২), *প্রিয় প্রিন্স* (১৯৯৫), *স্বপ্নশিলা* (১৯৯২), *কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্রমলিকা* (১৯৯৬), *বিশৃঙ্খলা* (১৯৯৭), *ঠিকানা ছিলো না* (১৯৯৮), *তোমাকে যদি না পাই* (১৯৯৮), *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* (১৯৯৯), *কায়াহীন ছায়াহীন* (১৯৯৯), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯৯)

আলাউদ্দিন খান : *অববাহিকার উপকথা* (১৯৬৪)

আশরাফ উজ জামান : *মন্‌জিল* (১৯৪৮), *শায়েরনামা* (১৯৫৮)

আশরাফ সিদ্দিকী : *শেষ কথা কে বলবে* (১৯৮০), *আরশিনগর* (১৯৮৮)

আহমদ ছফা : *সূর্য তুমি সাথী* (১৯৬৭), *ওঙ্কার* (১৯৭৫), *একজন আলী কেনানের উত্থান পতন* (১৯৮৮), *মরণবিলাস* (১৯৮৯), *অলাতচক্র* (১৯৯৩), *গাভীবৃত্তান্ত* (১৯৯৫), *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* (১৯৯৬), *পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ* (১৯৯৬)

আহসান হাবীব : *অরণ্য নীলিমা* (১৯৬২)

ইমদাদুল হক মিলন : *দুঃখ কষ্ট* (১৯৮২), *ও রাধা ও কৃষ্ণ* (১৯৮২), *এক দেশ* (১৯৮৩), *প্রিয় নারী জাতি* (১৯৮৪), *সুন্দরী কমলা* (১৯৮৫), *ভালোবাসার পাশেই* (১৯৮৯), *কালোঘোড়া* (১৯৮৩?), *উপনায়ক* (১৯৯০), *নদী উপাখ্যান* (১৯৮৫), *ভূমিপুত্র* (১৯৮৫), *কালাকাল* (১৯৮৫), *অভিমান পর্ব* (১৯৮৬), *দিনগুলি* (১৯৮৬), *পরবাস* (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (১৯৮৭), *নায়ক* (১৯৮৮), *মেয়ে মানুষ* (১৯৮৮), *প্রতিনায়িকা* (১৯৮৮), *দ্বিতীয় প্রেম* (১৯৮৮), *দুজনে* (১৯৮৮), *ভালোবাসার নির্বাচিত উপন্যাস* (১৯৮৯), *বালকের অভিমান* (১৯৮৯), *সম্পর্ক* (১৯৮৯), *সারাবেলা* (১৯৮৮), *যৌবনকাল* (১৯৮৮), *ভূমিকা* (১৯৮৮), *রূপনগর* (১৯৮৮), *কথাছিলো* (১৯৮৮), *বনমানুষ* (১৯৮৯), *পরকীয়া* (১৯৮৯), *সখা তুমি* (১৯৮৯), *আজকের দেবদাস* (১৯৮৯), *হে বন্ধু হে প্রিয়* (১৯৮৯), *প্রিয় বা প্রিয়তম* (১৯৮৯), *স্বামীস্ত্রী* (১৯৮৯), *ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস* (১৯৮৯), *প্রেমে বিরহে* (১৯৮৯), *মহাযুদ্ধ* (১৯৮৯), *ভালবাসা ভালো নয়* (১৯৮৯), *তুমি কেমন আছো* (১৯৮৯), *দেখা হবে* (১৯৮৯), *স্বপ্ন* (১৯৮৯), *এক বোন পারুল* (১৯৮৯), *রাজনৈতিক উপন্যাস* (১৯৮৯), *দ্বিতীয় পর্বের শুরু* (১৯৮৯), *আমার মেয়ের সংসার* (১৯৮৯), *যতদূরে যাই* (১৯৮৯), *কোন কাননের ফুল* (১৯৯০), *যাবজ্জীবন* (১৯৯০), *সে আমার* (১৯৯০), *প্রিয়জন* (১৯৯০), *অদ্বিতীয়া* (১৯৯১), *ছেলেমানুষি* (১৯৯০), *বলো তারে* (১৯৯০), *বহুদূরে* (১৯৯০), *রাজাকারতন্ত্র* (১৯৯০), *পিঞ্জর* (১৯৯১), *অপহরণ* (১৯৯১), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯১), *লাইলী* (১৯৯১), *সুদূরতমা* (১৯৯১), *মায়াবিনী* (১৯৯১), *যাও তুমি ফিরে* (১৯৯১), *বিদেশিনী* (১৯৯১), *প্রিয়দর্শিনী* (১৯৯১), *একজন* (১৯৯১), *সজনী* (১৯৯১), *বিরহী* (১৯৯১), *বিচ্ছেদ* (১৯৯১), *রূপ* (১৯৯১) *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস* (১৯৮৯), *নূরজাহান* (১ম পর্ব :১৯৯৫), *পলাশ ফুলের নোলক* (২০০৪), *বন্ধুয়া* (২০০৪), *পরাধীনতা* (২০০৪) *মাটি ও মানুষের উপাখ্যান*, *তুমিই* (২০০৫), *একা* (২০০৫), *পর* (২০০৬)

ইমতিয়ার শামীম : *ডানাকাটা হিমের ভেতর* (১৯৯৬), *আমরা হেঁটেছি যারা* (২০০০), *চরসংবেগ* (২০০১), *অন্ধ মেয়েচি জ্যোৎস্না দেখার পর* (২০০১), *মোল্লাপ্রজাতন্ত্রী পবনকুটির* (২০০৬), *তা হলে বৃষ্টিদিন তা হলে ১৪ জুলাই* (২০০৮), *আমাদের চিঠিযুগ কুউউ ঝিকঝিক* (২০১০)

ইসহাক চাখারী : *পরাজয়* (১৯৫৪?), *মায়ের কলঙ্ক* (১৯৬২), *মেঘবরণ কেশ* (১৯৫৫)

উমরতুল ফজল : *উর্মি* (১৩৭৭)

এম মহিউদ্‌দীন : *মরা গাঙ পোড়া ফসল* (১৩৭৬)
কাজি আফসারউদ্‌দিন আহমদ : *চর-ভাঙা চর* (১৯৫১), *বাতাসী* (১৯৫৮), *নোনা পানির ঢেউ* (১৯৫০), *ইডেনের মেয়ে সায়লা*, *কলাবতী কন্যা* (১৯৫২), *কবীর লস্কর* (১৯৫৪), *অমর যৌবনা*, *সুরের আগুন* (১৯৬০), *নীড় ভাঙা ঝড়* (১৯৬১)
কাজী আবুল হোসেন : *নারাঙ্গী বনের ঝড়* (১৯৫২), *উমাপদ যশোদা সংবাদ* (১৯৫৫), *বনজ্যোৎস্না* (১৯৫৮)
কাজী ফজলুর রহমান : *শিকড়* (১৯৯২)
কাজী মাসুম : *ঢেউ জাগে পদ্মায়* (১৯৫৮)
কায়েস আহমেদ : *দিনযাপন* (১৯৮৬), *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৬)
কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস : *অন্তঃশীলা* (১৯৬৭)
খালেদা এদিব চৌধুরী : *অরণ্যের ক্যানভাস* (১৯৮৫), *তোমার পতাকা যারে দাও* (১৯৮৮), *মা* (১৯৯১), *অগ্নি যাহা করেনি দাহ* (২০০৪)
খালেদা মনযূর-এ-খুদা : *অরণি অনির্বাণ*, *নিরুত্তর নীহারিকা*, *আশ্রয় চাই*
গোলাম কুদ্দুস : *মরিয়ম* (১৯৫৪), *বাঁদী* (২য় সং. ১৩৬২)
চৌধুরী শামসুর রহমান : *শেষ পর্বে শ্রীকান্ত* (১৯৬০), *মস্তানগড়* (১৯৬২), ছবি
জসীম উদ্‌দীন : *বোবা কাহিনী* (১৯৬৪), *বউটুবানীর ফুল* (১৯৯০)
জহির রায়হান : *শেষ বিকেলের মেয়ে* (প্র. প্র. ১৩৬৭ ব.) *হাজার বছর ধরে* (১৩৭১ ব.), *আরেক ফাল্গুন* (১৩৭৫ ব.), *বরফ গলা নদী* (১৩৭৬ ব.), *আর কতদিন* (১৩৭৭ ব.), *তৃষ্ণা* (১৩৮২), *কয়েকটি মৃত্যু* (১৩৮২)
জহিরুল ইসলাম : *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯), *ব্রীজের তলায় থাকি* (১৩৭৩), *অন্য নায়ক* (১৯৬৭), *মেয়েরা পর্দানশীন*
জাকির তালুকদার : *কুরসিনামা* (২০০২), *হাঁটতে থাকা মানুষের গান* (২০০৬), *বহিরাগত* (২০০৮), *মুসলমানমঙ্গল* (২০০৯), *পিতৃগণ* (২০১১), *কবি ও কামিনী* (২০১১), *ছায়াবাস্তব* (২০১৩)
জুবাইদা গুলশান আরা : *অশ্রুনদীর ওপারে* (১৯৮৯), *বিষাদ নগরে যাত্রা* (১৯৯২), *ধলপহরের আলো* (১৯৮২), *দেওদানবের মালিকানা* (১৯৮৫), *প্রমিথিউসের আগুন* (১৯৮৭), *ছোঁবুড়ির দৌড়*, *ঘৃণার জঠরে জন্ম* (১৯৮৮), *ঊষারাগ* (১৯৯০), *ঘাসের উপরে মুখ রেখে* (১৯৯১), *অবিনাশী জলধারা* (১৯৯১), *দুঃখের হাত ধর* (১৯৯১)
জুলফিকার মতিন : *সাদা কুয়াশার পাখি* (১৯৮৯), *রৌদ্রছায়া ভালবাসা* (১৯৯০), *বাড়ির নাম পান্থশালা* (১৯৯০), *মানব মানবী* (১৯৯৬)
জোবেদা খানম : *অভিশপ্ত প্রেম* (১৯৫৯), *দুটি আঁখি দুটি তারা* (১৯৬৩), *অনন্ত পিপাসা* (১৯৬৭)
ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ : *বন্দীদিন বন্দীরাত্রি* (১৯৭৬), *সারেংগীওয়ালা* (১৯৮৫), *যমুনার হোলি খেলা*

কিশোর উপন্যাস : *তুতু আর টুনটুনের গল্প* (১৯৯১), *ডালির মেঘ পুতুল* (১৯৯৩), *ইভানের কাজলাদিদি* (১৯৯৪), *টুসি আমার টুসি* (১৯৯৫), *মুশকিল আসান মামা* (১৯৯৫), *রং মাখা শার্ট* (১৯৯৫), *লালুর মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৭)

তসলিমা নাসরিন : *অপরপক্ষ* (১৯৯২), *শোধ* (১৯৯২), *ভ্রমর কইও গিয়া* (১৯৯৩), *লজ্জা* (১৯৯৩), *আমার মেয়েবেলা* (১৯৯৯), *উতল হাওয়া* (২০০২)

তাসাদ্দুক হোসেন : *মহুয়ার দেশে* (১৯৫৯), *ইস্পাত প্রত্যয়* (১৯৮০), *পৃথিবীর রং* (১৩৬৭), *কৌণিক* (১৯৮৮), *তিমিরাভিসার*

দিলারা হাশেম : *ঘর মন জানালা* (১৯৬৫), *একদা ও অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৭), *আমলকীর মৌ* (১৯৭৮), *বাদামী বিকেলের গল্প* (১৯৮৩), *কাকতালীয়* (১৯৮৫), *মিউর‍্যাল* (১৯৮৬), *শঙ্খকরাত* (১৯৯৫), *অনুক্ত পদাবলী* (১৯৯৮), *সদর অন্দর* (১৯৯৮), *সেতু* (২০০০)

দৌলতুন্নেসা খাতুন : *পথের পরশ* (১৩৭৩), *বধূর লাগিয়া* (১৯৬২), *কমরপুরের ছোট বৌ* (১৯৮৮), *বিবস্ত্র ধরণী* (১৯৮৯)

নয়ন রহমান : *অন্য রকম যুদ্ধ* (১৯৮৯), *লক্ষ্মী পেঁচার ডাইরী* (১৯৯০)।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *সামনে সময়*(১৯৮১), *ঘরের ছায়া* (১৯৮৪)

নাসরীন জাহান : *উড়ুক্কু* (১৯৯৩), *সোনালী মুখোশ* (১৯৮৬), *উড়ে যায় নিশিপক্ষী* (১৯৯৯), *চন্দ্রের প্রথম কলা* (১৯৯৪), *যখন চারপাশের রাস্তার বাতিগুলো নিভে আসছে* (১৯৯৫), *লি* (১৯৯৭), *বৈদেহী* (১৯৯৭), *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার*, *অন্যতমা অন্যদিকে যায়*, *আকাশে অনেক রাত* (২০০৪), *দূর পৃথিবীর গন্ধে* (২০০৪), সামান্তা (২০০৫), *মৃত্যুসখীগণ* (২০০৬)

নির্মলেন্দু গুণ : *দেশান্তর* (১৯৮৪), *অন্তর্জাল* (২০০৫)

কিশোর উপন্যাস : *কালো মেঘের ভেলা* (১৯৮২), *বাবা যখন ছোট্ট ছিলেন* (১৯৮৯)

নীলিমা ইব্রাহীম : *বিশ শতকের মেয়ে* (১৯৫৯), *এক পথ দুই বাঁক* (১৯৫৮), *কেয়াবন সঞ্চারিণী* (১৯৬২), *বহ্নিবলয়* (১৯৮৫)

নুরুল ইসলাম খান : *এতো আলো আকাশে* (১৯৬২)

পান্না কায়সার : *মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে* (১৯৯১), *মুক্তি* (১৯৯২), *নীলিমায় নীল* (১৯৯২), *হৃদয়ে বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *মানুষ* (১৯৯৪), *অন্য কোনখানে* (১৯৯৪), *তুমি কি কেবলি ছবি* (১৯৯৪), *রাসেলের যুদ্ধযাত্রা* (১৯৯৪), *দাঁড়িয়ে আছ গানের ওপারে* (১৯৯৪), *আমি* (১৯৯৪), *না পান্না না চুনি* (১৯৯৫), *অন্যরকম ভালোবাসা* (১৯৯৫), *সূর্যসাক্ষী* (১৯৯৩)

প্রণব ভট্ট : *কতদিন পরে এলে* (২০০৪), *পুতুলের মতো মেয়ে* (২০০৪), *প্রিয়তমা* (২০০৪), *মৌমিতা ভালোবেসেছিল* (২০০৪)

ফখরুজ্জামান চৌধুরী : *ঐরাবত ও অংকুশ* (১৯৯০), *জনারণ্যে কয়েকজন* (১৯৮৮), *একা ও একাকী* (১৯৯২)

ফজল শাহাবুদ্দীন : *দিকচিহ্নহীন* (১৩৭৫),

বদরুদ্দীন আহমদ : *অরণ্য মিথুন* (১৯৬২)

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ : *কাজল দীঘির উপকথা* (১৯৬২), *প্রত্যাবর্তন* (১৯৬০), *বনচন্দ্রিকা* (১৯৬৩), *বর বর্ণিনী* (১৯৬৩), *নূপুর নিক্বন* (১৯৬৯), *আজকের পৃথিবী* (১৯৭০), *সমুদ্রের ঢেউ* (১৯৭৩), *নিরুত্তর* (১৯৭৪), *মাথুরের পারে* (১৯৮৪)

বন্দে আলী মিয়া : *বসন্ত জাগ্রত দ্বারে*, *অরণ্য গোধূলী*

বশীর আল হেলাল : *শেষ পানপাত্র* (১৯৮৬), *কালো ইলিশ* (১৯৭৯), *ঘৃতকুমারী* (১৯৮৪), *নূরজাহানদের মধুমাস* (১৯৮৮),

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : *অচেনা* (১৯৮৫), *সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা* (১৯৯০), *ভয় ভালবাসা ও নির্বাসন* (১৯৮৮), *মুক্তিযোদ্ধারা*, *ভেতরে একজন কাঁদে*, *শ্রমণ গৌতম* (১৯৯৬), *আমি তোমার কাছে সমুদ্রের একটি ঢেউ জমা রেখেছি* (১৯৯৭)

বুলবুল চৌধুরী : *জলটুঙ্গী* (১৯৯৫), *কহ কামিনী* (১৯৯৫), *পাপপুণ্যি* (১৯৯৫), *ঘরবাড়ি* (১৯৯৬), *বল কি অনুভব* (১৯৯৬), *দম্পতি* (১৯৯৭)

বেগম জাহান আরা : *অয়নাংশ* (১৯৯০), *প্রান্তিক তমসায়* (১৯৮৫), *অয়নাংশের অন্য কথা* (১৯৯০), *আর কতো দূর* (১৯৯১), *আপন অন্তরালে* (১৯৯১)

বেদুইন শমসের : *রিকসাওয়ালা* (১৩৫৭ ব.), *বুড়িগঙ্গার বুকে* (দ্বি.স. ১৩৬৩ ব.), *বেঈমান* (১৩৫১ ব.), *দিশাহারা* (১৩৬৩ ব.), *কাঁটা ও ফুল* (১৯৫৬), *চাওয়া পাওয়া* (১৩৭০ ব.), *তার ও ঝংকার* (১৯৫৬)

বেদুঈন সামাদ : *বেলাশেষে* (১৯৫৬), *নিষ্পত্তি* (১৯৫৭), *দুই নদী এক ঢেউ* (১৯৬০), *পথে যেতে যেতে* (১৯৬৩), *ধুমনগরী* (১৯৬৪), *শুনি সেই পদধ্বনি* (১৯৭০), *নিবিড় ঘন আঁধারে* (১৯৭৫), *যোগাযোগ* (১৯৯৬), *যুগের হাওয়া* (১৯৯৭)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *সর্বনাশ চতুর্দিকে* (১৩৮১)

ভাস্কর চৌধুরী : *স্বপ্ন পুরুষ* (১৯৯৮), *মীমাংসা পর্ব* (১৯৯৮), *লাল মাটি কালো মানুষ* (১৯৯৬)

মইনুল আহসান সাবের : *পাথর সময়* (১৯৮৯), *মামুলী ব্যাপার* (১৯৮৪), *আদমের জন্য অপেক্ষা* (১৯৮৬), *পরাজয়* (১৯৯০), *কেউ জানে না* (১৯৯০), *মানুষ যেখানে যায় না* (১৯৯০), *সতের বছর পর* (১৯৯১), *কবেজ লেঠেল* (১৯৯২), *মামুলি ব্যাপার* (১৯৮৪), *আগামী দিনের গল্প* (১৯৮৭), *এসব কিছুই না* (১৯৯১), *এক রাত* (১৯৯১), *কোনো একদিন* (১৯৯১), *অচেনা জায়গা* (১৯৯১), *এ জীবন* (১৯৯১), *সীমাবদ্ধ* (১৯৯১), *অপরাজিতা* (১৯৯১), *ঋষি ও নারী* (২০০৫)

মকবুলা মনজুর : *কালের মন্দিরা* (১৯৯৭), *আর এক জীবন* (১৯৬৮), *বাউল বাতাস*, *এইখানে কখনো*, *জলরং ছবি* (১৯৮৪), *অবসন্ন গান* (১৯৮২), *বৈশাখে শীর্ণ নদী* (১৯৮৩), *আত্মজ ও আমরা* (১৯৮৮) *অচেনা নক্ষত্র* (১৯৯০), *পতিতা পৃথিবী* (১৯৮৯), *প্রেম এক সোনালী নদী* (১৯৮৯), *শিয়রে নিয়ত সূর্য* (১৯৮৯), *কনে দেখা আলো* (১৯৯০), নদীতে অন্ধকার (১৯৯৬), লীলা কমল (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (রুনা প্রকাশনী ১৯৯৩)

মনিরউদ্দীন ইউসুফ : *ঝড়ের রাতের শেষে*, *পনসের কাঁটা*, *ওর বয়েস যখন এগার*।

মঞ্জু সরকার : *নগ্ন আগন্তুক* (১৯৮৪), *তমস* (১৯৮৪), *প্রতিমা উপাখ্যান* (১৯৯০), *আবাসভূমি* (১৯৯৪), *টান* (১৯৯৬), *দাঁড়াবার জায়গা* (১৯৯৪), *ভাঙনের সময় ভালোবাসা* (১৯৯৫), *অমৃতা* (১৯৯৫), *স্বপ্নচোর* (১৯৯৭)

মহীউদ্দিন : *মহামানবের মহাজাগরণ*, *আলোর পিপাসা*, *নির্যাতিত মানবতার নামে*, *শাদী মোবারক*, *নূতন সূর্য*, *শিল্পীর স্বপ্ন*, *বশির*, *কামিনীকাঞ্চন*

মালিহা খাতুন : *এক তুলি কত রং* (১৯৬৪), *এই আঁধারে এই আলোকে* (১৯৯৩), *নীল কষ্টের ইতিকথা* (১৯৯৬)

মাহবুব তালুকদার : *ক্রীড়নক* (১৯৬৯), *অবতার* (১৯৭৩), *অপলাপ* (১৯৮৫), *আরেকজন আমি* (১৯৮৭), *পলাশ ও শিমুলের গল্প* (১৯৮৮), *বদ্ধভূমি* (১৯৯৭)

মাহমুদুল হক : *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *অনুর পাঠশালা* (১৯৭৩), *নিরাপদ তন্দ্রা* (১৯৭৪), *খেলাঘরে* (১৯৭৮), *মাটির জাহাজ* (১৯৯৬), *যেখানে খঞ্জনা পাখি* (১৯৭৩), *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪), *অশরীরী* (২০০৪) । কিশোর উপন্যাস : *চিক্কোর কাবুক*

মিজানুর রহমান শেলী : *পাতালে শর্বরী* (১৯৬৫), *ফেরারী প্রহর*(১৯৭২)

মিরজা আবদুল হাই : *মহাবাহু সুলতান* (১৯৮০), *ফিরে চলো* (১৯৮১), *তোমার পতাকা* (১৯৮৪), *যমনিস সংবাদ* (১৯৮৪), *বিজয়ীর পরাজয়*

মিলা মাহফুজা : *জ তোমার দু'চোখে* (১৯৯৫), *সুধাবিষে* (১৯৯৫), *যুদ্ধদিনে জোনাকি* (১৯৯৭)

মীর আবুল হোসেন : *বিপনী মন* (১৩৭৫)

মুনিরা চৌধুরী : *রৌদ্রছায়া* (১৯৮৭), *অস্থির গন্তব্য* (১৯৮৮), *সুন্দর হে সুন্দর* (১৯৮৯), *সংসর্গ* (১৯৯০), *সে ও দুই রমনী* (১৯৯১), *নীরা শিশিরের পদ্য* (১৯৯৫)

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ : *আবার ভালোবাসবো* (১৯৭৮), *বারোবিলাসিনীর আত্মকথা* (১৯৮০), *রোদরভরা বসন্ত* (১৯৮৪), *পেয়িং গেস্ট* (১৯৮৬), *স্বর্গসুধা* (১৯৮৮), *বসন্তত‍ৃষ্ণা* (১৯৮৮), *রাতের রজনীগন্ধা* (১৯৯১), *আর এক ইন্দ্রনাথ* (১৯৯১), *ভালোবাসি ভালোবাসি* (১৯৯১), *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (১৯৯১), *ফিরে এসো প্রেমকাননে* (১৯৯২), *মধ্যাহ্নবাসর* (১৯৯২)

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : *আকাশ বাড়িয়ে দাও*, *বিবর্ণ তুষার*, *উপন্যাস সমগ্র-১* (২০০৫), *মহব্বত আলীর একদিন* (২০০৬)

কিশোর উপন্যাস : *হাত কাটা রবিন* (১৯৮৬), *দীপু নাম্বার টু* (১৯৮৪), *দুষ্টু ছেলের দল* (১৯৬৮), *আমার বন্ধু রাশেদ* (১৯৯৪), *টি রেক্সের সন্ধানে* (১৯৯৪), *জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়* (১৯৯৫), *রাজু ও আগুনালির ভূত* (১৯৯৬), *স্কুলের নাম পথচারী* (১৯৯৬), *বুবনের বাবা* (১৯৯৮), *হাত কাটা রবিন* (১৯৮৬), *দীপু নাম্বার টু* (১৯৮৪), *দুষ্টু ছেলের দল* (১৯৬৮), *আমার বন্ধু রাশেদ* (১৯৯৪), *টি রেক্সের সন্ধানে* (১৯৯৪), *জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়* (১৯৯৫), *রাজু ও আগুনালির ভূত* (১৯৯৬), *স্কুলের নাম পথচারী*

(১৯৯৬), *বুবনের বাবা* (১৯৯৮), *মহব্বত আলীর একদিন* (২০০৬) প্রভৃতি। উপন্যাস : *আকাশ বাড়িয়ে দাও*, *বিবর্ণ তুষার* প্রভৃতি

মুহম্মদ নূরুল হুদা : *জন্মজাতি* (১৯৯৪), *মৈনপাহাড়* (১৯৯৫),

মেসবাহুল হক : *আরেক পৃথিবী*, *শতাব্দীর ডাক*, *পূর্বদেশ*

মোঃ রুহুল আমিন : *অবশেষে* (১৯৬০), *সোনালী দিগন্তের সীমানায়* (১৯৭১), *প্রত্যুষে অন্ধকার* (১৯৮৩), *অঙ্গনে আগুন* (১৯৮৬)

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী : *জরিনা* (১৩৩২), *নূরুন্নেহার*, *গন্ধর্ব দুহিতা*, *আমীর হামজা*

মোহাম্মদ আবু তাহের : *মানুষের মাটি* (১৯৯১), *অবগাহন* (১৯৯৩), *চন্দ্রালোকে শঙ্খচূড়*(১৯৯৫), *মনুমিয়ার বাই ফোকাল* (১৯৯৩)

মোহাম্মদ মোর্তজা : *চরিত্রহানির অধিকার*

রবীন্দ্র গোপ : *বাতাসে বারুদের গন্ধ* (১৯৮৫), *ঘূর্ণি* (১৯৯০), *নিষিদ্ধ স্বর্গ* (১৯৯৭), *নরকের মানব* (১৯৯৭)

রশীদ করীম : *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১), *প্রসন্ন পাষাণ* (১৯৬৩), *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩), *প্রেম একটি লাল গোলাপ* (১৯৭৮), *সাধারণ লোকের কাহিনী* (১৯৮১), *একালের রূপকথা* (১৯৮১), *শ্যামা* (১৯৮৪), *বড়ই নিঃসঙ্গ* (১৯৮৫), *মায়ের কাছে যাচ্ছি* (১৯৮৯), *চিনি না* (১৯৯০), *পদতলে রক্ত* (১৯৯০), *লাঞ্চবক্স* (১৯৯৩)

রশীদ হায়দার : *খাঁচায়* (১৯৭৫), *অসম বৃক্ষ* (১৯৮২), *অন্ধ কথামালা* (১৯৮৭), *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* (১৯৮২), *সাধ আহ্লাদ* (১৯৮৫), *অসমবৃক্ষ* (১৯৮৭)

রাজিয়া খান : *বটতলার উপন্যাস* (১৯৫৮), *অনুকল্প* (১৯৫৯), *প্রতিচিত্র* (১৯৭৬), *হে মহাজীবন* (১৯৮৩), *চিত্রকাব্য* (১ম ও ২য় খণ্ড) (১৯৮০), *দ্রৌপদী* (১৯৯৩), *পাদবিক* (১৯৯৮),

রাজিয়া মজিদ : *তমসাবলয়* (১৯৬৬), *দিনান্তের স্বপ্ন* (১৯৬৭), *নক্ষত্রের পতন* (১৯৮২), *সেই তুমি* (১৯৮৪), *অশঙ্কিনী সুদর্শনা* (১৯৮৪), *দিনের আলো রাতের আঁধার* (১৯৮৪), *মেঘে জলতরঙ্গ* (১৯৮৫), *এই মাটি এই প্রেম* (১৯৮৫), *দাঁড়িয়ে আছি একা* (১৯৮৭), *অরণ্যে জনতা* (১৯৮৭), *শতাব্দীর সূর্যশিখা* (১৯৮৭), *সুন্দরম* (১৯৮৮), *জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ* (১৯৮৯), *অন্তরলোকে জ্বলে জোনাকী* (১৯৯৩), *বৃষ্টিভেজা মুখ* (১৯৯৪), *ভালবাসার সেই মুখ* (১৯৯৫), *যুদ্ধ ও ভালবাসা* (১৯৯৬)

রাবেয়া খাতুন : *মধুমতী* (১৯৬৩), *রাজারবাগ শালিমারবাগ* (১৯৬৯), *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৫), *মেহের আলী* (১৯৮৫), *অনন্ত অন্বেষা* (১৯৬৭), *ই ভরা ভাদর মাহ ভাদর* (২য় সং. ১৯৯৫), *সাহেব বাজার* (১৯৬৯), *মন এক শ্বেত কপোতী* (১৯৬৫), *অনেকজনের একজন* (১৯৭৬), *জীবনের আর এক নাম দিবস রজনী* (১৯৮০), *নীল নিশীথ*, *পাখি সব করে রব*, *বায়ান্ন গলির এক গলি* (১৯৮৪), *নীল পাহাড়ের কাছাকাছি* (১৯৮৫), *বাগানের নাম মালনিছড়া*, *এই বিরহকাল*

(১৯৯৫), রাবেয়া খাতুনের *নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস* (১৯৯৫), *প্রিয় গুলশানা* (১৯৯৭), শঙ্খ সকাল প্রকৃতি (২০০৫), *উপন্যাস সমগ্র-১* (২০০৫), *স্বপ্নে সংক্রামিত* (২০০৬)

রাহাত খান : *অমল ধবল চাকরি* (১৯৮২), *এক প্রিয়দর্শিনী* (১৯৮৩), *ছায়াদম্পতি* (১৯৮৪), *হে শূন্যতা* (১৯৮৪), *সংঘর্ষ* (১৯৮৪), *হে অনন্তের পাখি* (১৯৮৯), *মধ্যমাঠের খেলোয়াড়* (১৯৯১), *আকাঙ্ক্ষা*, *কয়েকজন*, *অগ্নিদাহ*, *গন্তব্যে* (২০০৫)

রিজিয়া রহমান : *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭), *বং থেকে বাংলা* (১৯৭৮), *একাল চিরকাল* (১৯৮৪), *সূর্য-সবুজ রক্ত* (১৯৮১), *ধবল জোৎস্না* (১৯৮১), *শিলায় শিলায় আগুন* (১৯৮০), *অলিখিত উপাখ্যান* (১৯৮০), *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮), *প্রেম আমার প্রেম* (১৯৮৫), *অরণ্যের কাছে* (১৯৮০), *ঝড়ের মুখোমুখি* (১৯৮৬), *একটি ফুলের জন্য* (১৯৮৬), *শুধু তোমাদের জন্য* (১৯৮৮), *হারুন ফেরেনি* (১৯৯৪), *হে মানব মানবী* (১৯৮৯)

রেজোয়ান সিদ্দিকী : *ভুল জ্যোৎস্নায় পদলেহন* (১৯৮৩), *শূন্যতায় হাত* (১৯৯৫), *পূর্ণগ্রাস* (১৯৯৫), *রোদের পিপাসা* (১৯৮৯), *জানি না* (১৯৯৩), *পালাও জুলিয়া* (১৯৮৯), *এখানে দাঁড়িয়ে আছি* (১৯৯৪), *ঘুরপাক* (১৯৯৫)

শওকত আলী : *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩), *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬), *কুলায় কালস্রোত* (১৯৭৭), *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৭৮), *যাত্রা* (১৯৭৬), *অপেক্ষা* (১৯৮৫), *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *দলিল* (২০০০), *সম্বল* (১৯৮৬), *উত্তরের খেপ* (১৯৯১), *গন্তব্য অতঃপর* (১৯৮৭), *প্রেমকাহিনী*, *ভালবাসা কারে কয়* (১৯৮৮), *যেতে চাই* (১৯৮৮), *বাসর ও মধুচন্দ্রিমা* (১৯৯০)

শওকত ওসমান : *জননী* (১৯৬১), *বনীআদম* (১৯৪৩), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *চৌরসন্ধি* (১৩৭৫), *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *জলাঙ্গী* (১৯৭৪), *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০), *সমাগম* (১৯৬৭), *আর্তনাদ* (১৯৮৫), *রাজসাক্ষী* (১৯৮৫), *পিতৃপুরুষের পাপ* (১৯৮৬)। কিশোর উপন্যাস *তারা দুইজন* (১৯৫৮), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *জুজগগা* (১৯৮৮)

শরীফ খান : *মঙ্গল পূর্ণিমা* (১৯৯২), *শহীদ জনক* (১৯৯৬), *স্বপ্নলোকের ছবি* (১৯৯৬), *সোনালী দরজা* (১৯৯৭), *নজু ডাকাত ও গঙ্গা সাধু* (১৯৯৬), *মিথিলার সিঁথির আগুন* (১৯৯৬), *বনদানবের খপ্পরে* (১৯৯৫), *মেয়েটিকে ভূত ধরেছিল* (১৯৯৪), *ডিসেম্বরের আঠারো* (১৯৯৭),

শহীদ আখন্দ : *পান্না হলো সবুজ* (১৯৬৪), *পাখির গান বনের ছায়া* (১৯৭০), *দুদণ্ড শান্তি* (১৯৮৩), *একদা এক বসন্তে* (১৯৮৪), *সেই পাখি* (১৯৮৬), *আপন সৌরভ* (১৯৮৬), *ভালোবাসায় বসবাস* (১৯৮৭), *নরাধম* (১৯৮৪), *এইখানে কখনো* (১৯৮৫), *আবার আসিব* (১৯৮৮), *কখন কে জানে* (১৯৯৫)

শহীদুল জহির : *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৫), *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮), *মুখের দিকে দেখি* (২০০৬), *আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু* (২০০৯)

শহীদুল্লা কায়সার : *সারেং বৌ* (১৯৬২), *সংশপ্তক* (১৯৬৫)

শামস রশীদ : *উপল উপকূল* (১৯৬৯), *প্রাণবসন্ত* (১৯৭৩), *হৃদয় উপবন* (১৯৭৪), *পঞ্চালিকা* (১৯৭৬), *সিন্ধু বাঁরোয়া* (১৯৭৭), *মন্যকারক* (১৯৮১), *প্রীতমপুর* (১৯৯০)

শামসুল ইসলাম : *বেদনা অপার* (১৯৬৬), *বেঁচে আছি* (১৯৭৪)

শওকত ওসমান : *জননী* (১৯৬১), *বনীআদম* (১৯৪৩), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *জলাঙ্গী* (১৯৭৪), *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০), *সমাগম* (১৯৬৭), *আর্তনাদ* (১৯৮৫), *রাজসাক্ষী* (১৯৮৫), *পিতৃপুরুষের পাপ* (১৯৮৬)

কিশোর উপন্যাস : *তারা দুইজন* (১৯৫৮), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *জুজগগা* (১৯৮৮)

শামসুল হক : *নদীর নাম তিসতা* (১৩৭৩), *নয়ছয়* (১৩৬৬), *চম্পা চামেলী*

শামসুদ্দীন আবুল কালাম : *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *আলমনগরের উপকথা* (১৯৫৫), *মনের মতো ঠাঁই*, *যার সাথে যার* (১৯৮৬), *জায়জঙ্গলের* (১৯৭৮), *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬), *নবান্ন* (১৯৮৭), *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৮)

শামসুর রাহমান : *অক্টোপাস* (১৯৮৩), *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫), *নিয়ত মন্তাজ* (১৯৮৫), *এলো সে অবেলায়* (১৯৯৪),

শাহজাহান চৌধুরী : *সাদা পাখির পালক* (১৯৮৬), *যন্ত্রণার নদী* (১৯৭৩)

শাহরিয়ার কবীর : *ওদের জানিয়ে দাও* (১৯৮৫),

কিশোর উপন্যাস : *অন্যরকম আটদিন* (১৯৯৩), *একাত্তরের যীশু* (১৯৮৫), *পূবের সূর্য* (১৯৭২), *নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়* (১৯৭৬), *হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা* (১৯৭৬), *সীমান্তে সংঘাত* (১৯৮৮), *হানাবাড়ির রহস্য* (১৯৮৯), *নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা* (১৯৮৯), *পাথারিয়ার খনি রহস্য*,(১৯৮৯), *বার্চ বনে ঝড়* (১৯৯১), *বহুরূপী* (১৯৯১), *রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র* (১৯৯৩), *কার্পিথিয়ানের কালো গোলাপ* (১৯৯৪), *অন্যরকম আট দিন* (১৯৯৩), *অনীকের জন্য ভালোবাসা* (১৯৯৩), *একাত্তরের পথে ধারে* (১৯৯৪), *লুসাই পাহাড়ের শয়তান* (১৯৯৪), *বাভারিয়ার রহস্যময় দূর্গ* (১৯৯৪), *আলোর পাখিরা* (১৯৯৫), *ঘাতকের সন্ধানে* (১৯৯৫), *মরুর শয়তান* (১৯৯৫), *রত্নেশ্বরীর কালো ছায়া* (১৯৯৬), *ভয়ঙ্করের মুখোমুখি* (১৯৯৬)

শাহাদুজ্জামান : *৪ তে দুঃখ* (২০০৩), *ক্রাচের কর্নেল* (২০০৯)

শাহাদাৎ হোসেন : *রিক্তা*, *পথের দেখা*, *মরুর কুসুম*, *খেয়াতরী*, *সোনার কাঁকন*, *যুগের আলো*, *কাঁটা ফুল*, *শিরি ফরহাদ*, *সতী মহিমা*, *হিরণ রেখা*, *পারের পথে*, *স্বামীর ভুল*, *ঘরের লক্ষ্মী*, *ইউসুফ জুলেখা*,

শাহীন আখতার : *পালাবার পথ নেই* (২০০০), *তালাশ* (২০০৪),

শীলব্রত চৌধুরী : *সমুদ্র সফেন* (১৩৭৪),

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী : *শেখ সংসার, দরবেশ কাহিনী, নূতন বৌ, প্রেমের পথে* (১৯৫৭), *আদর্শ গৃহিনী* (১৯৫৭), *বঙ্কিম দুহিতা* (১৩২৪ ব.), *রূপের মোহ* (১৯৫৭)

সত্যেন সেন : *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৭), *পাপের সন্তান* (১৯৬৯), *পদচিহ্ন* (১৩৭৪), *উত্তরণ* (১৯৭০), *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৩৭৬), *এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে* (১৯৭১), *আলবেরুনী* (১৩৭৬ ব.), *কুমারজীব* (১৯৬৯), *পুরুষমেধ* (১৯৬৯), *সেয়ানা* (১৩৭৫), *ভোরের বিহঙ্গী* (১৩৬৬ ব.), *রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ* (১৩৭৩ ব.), *সাত নম্বর ওয়ার্ড* (১৩৭৬ ব.), *মা* (১৩৭৭ ব.), *অপরাজেয়* (১৩৭৭ ব.)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন : *আদিগন্ত* (১৩৬৫), *পান্নামোতি* (১৩৭১), *নীল-রঙ-রক্ত* (১৩৭২), *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫), *বেগম শেফালী মির্জা* (১৯৬৮), *শ্রীমতী ক ও খ শ্রীমান তালেব আলী* (১৯৭৩)

সাদিকীন : *সপ্তর্ষির কান্না* (১৯৬২),

সামস রাশীদ : *মনপ্রসূন* (১৯৮২), *উপল উপকূলে* (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭০), *নীলাঞ্জনা* (১৯৭১), *প্রাণবসন্ত* (১৯৭৩), *হৃদয় উপবনে* (১৯৭৪), *পঞ্চালিকা* (১৯৭৬), *সিন্ধু বাঁরোয়া* (উপল উপকূলের ৩য় খণ্ড) (১৯৭৭), *মনকোরক* (১৯৮১), *ক্যামেলিয়া মিনেনমিস* (১৯৮৫), *পর্বত বুরঞ্জী* (১৯৯০), *প্রীতমপুর* (১৯৯০)

সালেহা চৌধুরী : লেখা *আনন্দ* (১৯৯৩), *বিন্নি ধানের খৈ* (১৯৯৪), *ময়ূরীর মুখ* (১৯৯৬), *শেষ সারবেলা* (১৯৯৭)

সিকান্‌দার আবু জাফর : *মাটি আর অশ্রু* (১৯৪২), *পূরবী* (১৯৪৪), *নতুন সকাল* (১৯৪৫),

সিদ্দিকুর রহমান : *তুমি আসবে বলে* (১৯৮১), *ওয়াদিয়া* (১৯৮৫), *স্বাধীনতা আমার অচেনা সীমান্ত* (১৯৯৫)

সুচরিত চৌধুরী : *নদী নির্জন নীল* (১৩১৪)

সুবোধ লাহিড়ী : *ভস্তার বিল* (১৯৬৯)

সুব্রত বড়ুয়া : *গ্রহণের দিন* (১৯৮৬), *দিনগুলি হায় সোনার খাঁচায়* (১৯৮৭),

সেলিনা হোসেন : *যাপিত জীবন* (১৯৮১), *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৭), *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (১৯৯৪-১৯৯৬), *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬), *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮৩), *চাঁদবেনে* (১৯৮৪), *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬), *কাঁটাতারে প্রজাপতি* (১৯৮৯), *কালকেতু ও ফুলরা* (১৯৯২) *পদশব্দ* (১৯৮৩) *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২), *মগ্ন চৈতন্যে শিস* (১৯৭৯), *ক্ষরণ* (১৯৮৮), *খুন ও ভালোবাসা* (১৯৯০), *উত্তর সারথী*(১ম উপন্যাস), *যুদ্ধ* (১৯৯৮), *ভালোবাসা প্রীতিলতা* (১৯৯২), *টানাপড়েন* (১৯৯৪), *দীপান্বিতা* (১৯৯৭), *ঘুমকাতুরে ঈশ্বর* (২০০৪), *মর্গের নীল পাখি* (২০০৫), *অপেক্ষা* (২০০৭), *পূর্ণ ছবির মগ্নতা* (২০০৮), *ভূমি ও কুসুম* (২০১০), *যমুনা নদীর মুশায়রা* (২০১০), *গাছটির ছায়া নাই* (২০১২), *সোনালী ডুমুর* (২০১২)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : *লালসালু* (১৯৪৮), *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)

সৈয়দ মুজতবা আলী : *অবিশ্বাস্য* (১৯৫৪), *শব্‌নম্*(১৯৬০), *শহর্-ইয়ার* (১৯৬৯) *তুলনাহীনা* (১৯৭৪)

সৈয়দ শামসুল হক : *অনুপম দিন* (১৯৬২), *নীলদংশন* (১৯৮১), *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* (১৯৮৬), *আয়না বিবির পালা* (১৯৮৬), *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *দেয়ালের দেশ* (১৯৫৯), *অচেনা* (১৯৬২), *অচিন্ত্য পূর্ণিমা* (১৯৬২), *জনক ও কালোকফি* (১৯৬২), *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪), *খেলারাম খেলে যা* (১৯৭৩), *দূরত্ব* (১৯৮১), *ত্রাহি* (১৯৮২), *অন্য এক আলিঙ্গন* (১৯৮২), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪), *স্মৃতিমেধ* (১৯৮৬), *স্তব্ধতার অনুবাদ* (১৯৮৬), *এক যুবকের ছায়াপথ* (১৯৮৭), *কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন* (১৯৮৯), *স্বপ্ন সংক্রান্ত* (১৯৮৯), *না, যেওনা* (১৯৮৯), *বৃষ্টি ও বিদ্রাহীগণ* (১ম খণ্ড-১৯৮৯, ২য় খণ্ড-১৯৯০), *বারো দিনের শিশু* (১৯৮৯), *বনবালা কিছু টাকা ধার নিয়েছিল* (১৯৮৯), *ত্রাহি* (১৯৮৯), *তুমি সেই তরবারি* (১৯৮৯), *কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন* (১৯৮৯), *নির্বাসিতা* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১৯৯০), *নির্বাসিতা* (১৯৯০), *মেঘ ও মেশিন* (১৯৯১), *ইহা মানুষ* (১৯৯১), *কালধর্ম* (১৯৯২), *আমি বাসি তুমি বাসোতো* (১৯৯৩), *মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার* (১৯৯০), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৯০), *বালিকার চন্দ্রযান* (১৯৯০), *জেসমিন রোড* (১৯৯২), *চোখবাজী* (১৯৯৪), টানটান (১৯৯৪), অন্তর্গত (১৯৯৫), আলোর জন্য (১৯৯৫), বুকঝিম এক ভালোবাসা (১৯৯৬), একমুঠো জন্মভূমি (১৯৯৭), *বৃষ্টি ও বিদ্রাহীগণ* (১৯৯৭), *যৌবন* (১৯৯৭), *শঙ্খলাগা যুবতী ও চাঁদ* (১৯৯৮), *নারীরা* (১৯৯৯), *বাস্তবতার দাঁত ও করাত* (১৯৯৯), *উড়ে যায় মালতী পরী* (২০০৫)

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন : *সাঁঝের বেলার কাহিনী, আকাশ যদি নীল হল, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে, স্বাতী নক্ষত্রের জল, ইহাই তো প্রেম*

হরিপদ দত্ত : *ঈশানে অগ্নিদাহ* (১৯৮৬), *অন্ধকূপে জন্মোৎসব* (১৯৮৭), *অজগর* ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সনে, *উপন্যাস সমগ্র* (২০০৫), *মোহাজের* (২০০৬), *পিতৃহত্যার রাত ও অগ্নিবিন্দু* (২০০৭), *চিম্বুক পাহাড়ের জাতক* (২০০৮), *জলপুত্র* (২০০৮)

হরিশঙ্কর জলদাস : *জলপুত্র* (২০০৮), *কৈবর্তকথা* (২০০৯), *দহনকাল* (২০১০), *রামগোলাম* (২০১২), কসবি (২০১২), *আমি মৃণালিনী নই* (২০১৪)

হাজেরা নজরুল : *উপক্রমণিকা*(১৯৮৬), *অমিত্রাক্ষর ছন্দ*(১৯৯০), *শরবিদ্ধ শিশির*(১৯৯০), *নির্বাসিত নির্ঝর*(১৯৯১), *বরফের ফুল*(১৯৯১)

হাবীবুর রহমান : *লেজ দিয়ে যায় চেনা* (১৩৬৬), *বনে বাদাড়ে* (১৯৬৩), *বন মোরগের বাসা* (১৯৭৬)

হারুন হাবীব : *প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম* (১৯৮২), *অন্তঃশীলা, পাঁচপুরুষ*।,

হাসনাত আবদুল হাই : *তিমি* (১৯৮১), *আমার আততায়ী* (১৯৮০), *সুলতান* (১৯৯১), *সুপ্রভাত ভালবাসা* (১৯৭৭), *মহাপুরুষ* (১৯৮২), *মোরেলগঞ্জ সংবাদ* (১৯৯৫), *বাবুই* (১৯৯৭), *যুবরাজ* (১৯৮০), *সাফারি* (১৩৯৯), *সাতজন* (১৯৯৯), *প্রভু* (১৯৮৬), *সময়* (১৯৯১), *একজন আরজ আলী* (১৯৯৫), *নভেরা* (১৯৯৫), *বাইরে একজন*(১৯৯৫), *হাসান ইদানীং* (১৯৯৫), *সোয়ালো* (১৯৯৬), *সিকস্তি* (১৯৯৭), *ইন্টারভিউ* (১৯৯৭), *বাবুই সুনীতি* (১৯৯৭)

হুমায়ুন আজাদ : *ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল* (১৯৯৪), *সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে* (১৯৯৫), *মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ* (১৯৯৬), *যাদুকরের মৃত্যু* (১৯৯৬), *শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার* (১৯৯৭), *রাজনীতিবিদগণ* (১৯৯৮), *পাক সার জমিন সাদ বাদ* (২০০৪)

হুমায়ূন আহমেদ : *নন্দিত নরকে* (১৯৭৩), *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৪), *নির্বাসন* (১৯৭৪), *সৌরভ* (১৯৮২), *আগুনের পরশমনি* (১৯৮৬), *শঙ্খনীল কারাগার* (১৯৭৩), *এইসব দিনরাত্রি* (১৯৮৬), *নক্ষত্রের রাত* (১৯৮৭), *সাজঘর* (১৯৮৯), *তোমাদের জন্য ভালবাসা*, *অচিনপুর*, *অন্যদিন* (১৯৭৪), *ফেরা* (১৯৮৬), *সবাই গেছে বনে* (১৯৮৪), *তোমাকে* (১৯৮৪), *একা একা* (১৯৮৫), *অমানুষ* (১৯৮৫), *আমার আছে জল* (১৯৮৫), *সূর্যের দিন* (১৯৮৫), *প্রথম প্রহর* (১৯৮৫), *দেবী* (১৯৮৫), *অরণ্য* (১৯৮৭), *নক্ষত্রের রাত* (১৯৮৭), *দূরে কোথায়* (১৯৮৭), *আকাশ জোড়া মেঘ* (১৯৮৮), *অপরাহ্ণ* (১৯৮৮), *বাসর* (১৯৮৯), *দ্বৈরথ* (১৯৮৯), *রজনী* (১৯৮৯), *অন্ধকারের গান*(১৯৮৯), *সমুদ্র বিলাস* (১৯৯১), *জনম জনম* (১৯৯০), *ময়ূরাক্ষী* (১৯৯০), *গৌরীপুর জংশন* (১৯৯০), *অয়োময়* (১৯৯০), *কোথাও কেউ নেই* (১৯৯০), *দারুচিনি দ্বীপ*(১৯৯১), *পাখি আমার একলা পাখি* (১৯৯২), *মিসির আলীর অমীমাংসিত রহস্য* (১৯৯২), *হিমু*(১৯৯৩), *জলজোছনা* (১৯৯৩), *শ্রাবণ মেঘের দিন* (১৯৯৪), *পেন্সিলে আঁকা পরী* (১৯৯৫), *শুভ্র* (২০০০), *জোছনা ও জননীর গল্প* (২০০৪), *লীলাবতী* (২০০৫), *বাদশাহ নামদার* (২০০৫), *লিলুয়া বাতাস* (২০০৬)

হুমায়ুন কবির : *নদী ও নারী* (১৯৪৫)

হুমায়ুন কাদির : *নির্জন মেঘ* (১৯৬৫)

হুমায়ূন মালিক : *দ্রোহী উত্তরসূরি* (২০০৫), *নপুংসকনামা* (২০০৭)

হেলেনা খান : *উত্তুরে বাতাস* (১৯৭০), *আত্মজ ও মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৬), *দুই ধার পৃথিবী* (১৯৯৭)

ছোটগল্প

অজিত কুমার নিয়োগী : *ধূসরলিপি* (১৯৬৪)

অদিতি ফাল্গুনী : *ইমানুয়েলের গৃহে প্রবেশ* (১৯৯৯), *তিতা মিঞার জঙ্গনামা* (২০০৯), *চিহ্নিত বারুদ বিনিময়* (২০০৭), *বানিয়ালুকা ও অন্যান্য গল্প* (২০১৩), *ধৃত-রাষ্ট্রের বালিকারা* (২০১৪)

অনামিকা হক লিলি : *নিলম্বন* (১৯৮৩), *ব্যঞ্জনা* (১৯৮৪), *যাতনা* (১৯৮৮), *অষ্টপ্রহর* (১৯৯০), *কুরে কুরে* (১৯৯১), *আমি তোমাদেরই লোক* (২০০২), *কলম তুমিই বলো* (২০০৩)

অরূপ তালুকদার : *রংবাজ ফেরে না* (১৯৬৯)

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *পথ ও পৃথিবী* (১৯৬৪)

আকবরউদ্দীন : *অসমাপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য গল্প*

আকবর হোসেন : *আলোছায়া* (১৯৬৪)

আকমল হোসেন নিপু : *জলদাসের মৎস্যঘ্রাণ* (১৯৯৮), *বুড়ি চাঁদ ডুবে যাবার পরে* (২০০৩), *আমরা খুব খারাপ সময়ে বেঁচে আছি* (২০০৬)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬), *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫), *খোঁয়ারি* (১৯৮৯), *দোযখের ওম্* (১৯৮৯), *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭)

আজিজুর রহমান: *কালো ফিতা* (১৯৬৫), *দেশী ফুল* (১৯৬৫)*একটি অচল আনি* (১৯৬৬), *উপস্থিত সুধীমণ্ডলী* (১৯৭৮), *পাণ্ডুলিপি ও গয়নার বাক্স* (১৯৭০), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *বুনোবৃষ্টি* (১৯৮৪), *নিজের বাড়ি* (১৯৮৮)

আতা সরকার: *বিপজ্জনক খেলা সম্পর্কে রিপোর্ট*, *নিষিদ্ধ রাজনীতির গল্প*, *সুন্দর তুমি পবিত্রতম*, *ব্রেকহীন বাস চলছে চলছে* (১৯৯৭), *সাহসী মানুষের গল্প*, *নির্বাচিত গল্প*, *রে স্বপ্ন রে দুবৃত্ত*

আফলাতুন : *অলৌকিক পাখি* (১৯৮৮)

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন : *চিরকুট* (১৯৮১), *নেপথ্য নাটক* (১৯৮২), *ওম শান্তি* (১৯৮৩), *শালবনের রাজা* (১৯৮৩), *নলখাগড়ার সাপ* (১৯৮৩), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৬), *আনন্দ ভুবন* (১৯৯৭), *মনোনীত গল্প* (১৯৯৩), *সোনার শরীর* (১৯৯০), *কলেজ গার্ল* (১৯৯১), *নীল ছবির নায়িকা* (১৯৯০), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৮৮)

আবদার রশীদ : *নানান রঙ্গ* (১৯৭৩) ও *রঙ্গ ষোড়শী* (১৯৭৫)

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী : *অলিগলি কতপথ* (১৯৫৯)

আবদুল গাফফার চৌধুরী : *কৃষ্ণপক্ষ* (১৩৩৬), *সম্রাটের ছবি* (১৯৫৯), *সুন্দর হে সুন্দর* (১৯৬০)

আবদুল হাই মাশরেকী : *কুলসুম* (১৯৫৪), *বাউল মনের নকশা* (১৯৭১)

আবদুশ শাকুর : *ক্ষীয়মান* (১৯৬১), *এপিটাফ* (১৯৭৬), *ধস* (১৯৮২), *বিচলিত প্রার্থনা* (১৯৮৩), *নৈসর্গিক গল্প* (১৯৯৭), *গোলাপধোলাই* (১৯৯৭), *গল্পসমগ্র* (২০০২), *আঘাত* (২০০৬), *টোটকা* (২০০৬)।

আবুবকর সিদ্দিক : *ভূমিহীন দেশ* (১৯৮৫), *মরে বাঁচার স্বাধীনতা* (১৯৮৭), *চরবিনাশকাল* (১৯৮৭), *কুয়ো থেকে বেরিয়ে* (১৯৯৪), *ছায়াপ্রধান আঘ্রান* (২০০০), *কান্নাদাসী*

(২০০৬), *বামাবর্ত* (২০০৭), *মুক্তিলাল অভ্যুদয়* (মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প) (২০০৮), *কালোকুম্ভীর* (২০০৮), *হংসভাসীর তীরে* (২০০৮), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (২০০৭), *গল্পসমগ্র* ১ম খণ্ড (২০০৮)

আতোয়ার রহমান : *হলদে লতা* (১৯৬৪), *বলয়* (১৯৬৭)

আন্‌ওয়ার আহমদ : *সতর্ক প্রহরা* (১৯৮৩)

আনোয়ার পাশা : *নিরুপায় হরিণী* (১৯৭০)

আনিস চৌধুরী : *গল্পসংগ্রহ* (২০০৭)

আবু ইসহাক : *হারেম* (১৯৬২), *মহাপতঙ্গ* (১৯৬৩)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬২), *জীবন* (১৯৪৮), *শেষ রাত্রির তারা* (১৯৬৬), *এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য* (১৯৬৭), *রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা* (১৯৭৮), *ল্যাংড়ী* (১৯৮৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৮)

আবুল ফজল : *মাটির পৃথিবী* (১৯৪০), *আয়ষা* (১৯৫১), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *মৃতের আত্মহত্যা* (১৯৭৮)

আবুল মনসুর আহমদ : *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৪), *আসমানী পর্দা* (১৯৬৪)।

আবু রুশ্‌দ : *রাজধানীতে ঝড়* (১৯৩৮), *প্রথম যৌবন* (১৯৪৮), *শাড়ী বাড়ী গাড়ী* (১৯৬১), *মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার* (১৯৮৫), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৭৯), *দিন অমলিন* (১৯৮৫), *বিয়োগ ব্যথা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯০), *গল্পসমগ্র* (২০০০)।

আল মাহমুদ : *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫), *সৌরভের কাছে পরাজিত* (১৯৮৩), *গন্ধবণিক* (১৯৮৬), *প্রেমের গল্প* (১৯৯১), *ময়ূরীর মুখ* (১৯৯৪), *আল মাহমুদের গল্প* (১৯৯১), *গল্পসমগ্র* (১৯৯৭)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভি* (১৯৫৩), *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৮), *উজান তরঙ্গে* (১৯৬২), *যখন সৈকত* (১৯৬৭), *আমার রক্ত স্বপ্ন আমার* (১৯৭২), *জীবন জমিন* (১৯৮৮), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫), *মনোনীত গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প* (১৯৯৯)

আশরাফ উজ জামান : *অরণ্য পর্বত নদী ও সমুদ্র* (১৯৪৯), *খেয়া নৌকার মাঝি* (১৯৫২)

আশরাফ সিদ্দিকী : *রাবেয়া আপা* (১৯৫৫), *প্যারিস সুন্দরী* (১৯৭৫), *শেষ নালিশ* (১৯৯২)।

আশীষকুমার লোহ : *অনেক তারার আকাশ* (১৯৬৬)।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)র *দোলা আমার কনকচাঁপা* (১৯৬৮)। এছাড়া *নিহত নক্ষত্র* (১৯৬৯)**বুলবুল চৌধুরী** (জ. ১৯৪৭) *টুকা কাহিনী* (১৯৬৮), *পরমানুষ* (১৯৯৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৭) তাঁর গল্পগ্রন্থ।

আহমদ মীর : *লালমোতিয়া* (১৯৬৫)

আহমদ রফিক : *অনেক রঙের আকাশ* (১৯৬৪)

আহমাদ মোস্তফা কামাল : এক প্রকার *দ্বিতীয় মানুষ* (১৯৯৮), *আমরা একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছি* (২০০০), *অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে* (২০০৪), *ঘরভর্তি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ্য* (২০০৭)

ইমতিয়ার শামীম : *শীতঘুমে একজীবন* (১৯৯৬) এরপর *গ্রামায়নের ইতিকথা* (২০০০), *কয়েকটি মৃত মুনিয়া* (২০০২), *মাৎসন্যায়ের বাকপ্রতিমা* (২০০৫)

ইমদাদুল হক মিলন : *ভালোবাসার গল্প* (১৯৭৭), *নিরন্নের কাল* (১৯৭৯), *প্রেমের গল্প* (১৯৮৩), *হে প্রেম* (১৯৮৩), *ফুলের বাগানে সাপ* (১৯৮৩), *বালিকারা* (১৯৮৩), *আহারী* (১৯৮৪), *তোমাকে ভালোবাসি* (১৯৮৫), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৮৫), *বাছাই গল্প* (১৯৮৬), *তাহারা* (১৯৮৬), *মর্মবেদনা* (১৯৮৮), *প্রেম নদী* (১৯৮৮), *প্রেমিক প্রেমিকা* (১৯৮৮), *বারো রকম মানুষ* (১৯৮৮), *ভালোবাসার নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৯), *যদি জানতে* (১৯৯০), *প্রেম ভালোবাসা* (১৯৯০), *ভালোবাসা* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯০), *গোপন দুয়ার*

ইফফাত আরা : *রোদনভরা বসন্ত* (১৯৮৯), *নোনাস্বাদের জীবন* (১৯৯০), *একাকী অন্ধকারে* (১৯৯৪)

ইবরাহীম খাঁ : *আলু বোখরা* (১৯৬০), *উস্তাদ* (১৯৬৭), *দাদুর আসর* (১৯৭১), *মানুষ* ।

ইসহাক চাখারী : *জানালা* (১৯৬৭), *স্বপ্নের কুশীলব* (১৯৬৭), *প্রথম কৃষ্ণচূড়া* (১৯৭২), *বিপরীত মানুষ* (১৯৭৭)

এহসান চৌধুরী : *একাত্তরের গল্প* (১৯৮৬)

ওয়াসি আহমেদ : *বীজমন্ত্র*, *তেপান্তরের সাঁকো*, *শিঙা বাজাবে ইসরাফিল* (২০০৬)

কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ : *কোলাহল* (১৯৪৭), *কালনাগিনী* (১৯৫২), *জ্বালাও আলো* (১৯৫৪), *যুদ্ধের ভয়ঙ্কর গল্প* (১৯৫৪), *নূতন প্রেম* (১৯৫৫)

কাজী ফজলুর রহমান : *দর্পণে প্রতিবিম্ব* (১৯৮৭), *যাত্রী* (১৯৮৭), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৮৮), *বিশ্বাসঘাতক* (১৯৯১)।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর : *মৃতের কিংবা রক্তের জগতে আপনাকে স্বাগতম* (২০০৫), *স্বপ্নবাজি* (২০০৭)

কায়েস আহমেদ : *অন্ধতীরন্দাজ* (১৯৭৮), *লাশ কাটা ঘর* (১৯৮৭)

খালেদা এদিব চৌধুরী : *অন্য এক নির্বাসন* (১৯৭৬), *জন মনিষ্যির গল্প* (১৯৮২), *পোড়ামাটির গন্ধ* (১৯৮৫)

গজনফর আলী : *ভাববিলাস* (১৯৫৭)

চৌধুরী শামসুর রহমান : *ফুটপাত* (১৯৬০)

জহির রায়হান : *জহির রায়হানের গল্পসমগ্র* (১৯৭৯)

জাকির তালুকদারের : *স্বপ্নপুরাণ কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ* (১৯৯৭), *বিশ্বাসের আগুন* (২০০০), *কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩), *কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬), *হা-ভাতভূমি* (২০০৬) ও *মাতৃহন্তা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭)

জাফর তালুকদার : *অন্নদাস* (১৯৯০), *মানুষের গন্ধ* (১৯৯০), *প্রেমের গল্প* (১৯৯১), *নির্বাচিত গল্প* (২০০৪)

জুলফিকার মতিন : *রাখ তোমার উদ্যত বাহু* (১৯৯৯), *পাগল হবার রূপকথা* (১৯৯৯), *আকাশ বাসর* (১৯৯৯), *অন্যরকম* (২০০০), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০০১), *অন্ধকারের জন্তুরা* (২০০৭)

জুবাইদা গুলশান আরা : *কায়াহীন কারাগার* (১৯৭৭), *বাতাসে বারুদ রক্তে নিরুদ্ধ উল্লাস* (১৯৮৬), *হৃদয়ে বসতি* (১৯৮৯)

জ্যেতিপ্রকাশ দত্ত : *দুর্বিনীত কাল* (১৯৬৫), *বহে না সুবাতাস* (১৯৬৭), *সীতাংশু তোর সমস্ত কথা* (১৯৬৯), *পুনরুদ্ধার*, *প্লাবনভূমি*, *উড়িয়ে নিয়ে যা কালো মেঘ* (১৯৯২), *ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়*, *নির্বাচিত গল্প*, *গল্পকল্প ও বাঁচামরার জীবন* (২০০৫), *যে যায় সে যায়* (২০১২)

জোবেদা খানম : *খুকুর এ্যাডভেঞ্চার* (১৯৬৭), *একটি সুরের মৃত্যু* (১৯৭৪), *জীবন একটি দুর্ঘটনা* (১৯৮১)

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ : *মুক্তিযুদ্ধের অশ্রুত বাঁশি*, *গোধূলি রং খেলা* (১৯৬৬), *অলকাপুরী* (১৯৮৬), *মখমলে আলপিন* (১৯৮৯), *নূর হোসেনের পদধ্বনি* (১৯৯৪), *নাইট কুইন*

তাপস মজুমদার : *মঙ্গল সংহিতা* (১৯৯৫), *একটি দশ টাকার নোট* (১৯৯৬), *কেউ কাউকে চেনে না* (১৯৯৭)

তাসাদ্দুক হোসেন : *অরণ্য শিশির* (১৯৬৩), *বিকেলের শেষ প্রার্থনা* (১৯৭৯), উত্তমাশা *অন্তরীপে* (১৩৮৪)

দিলারা জামান : *অন্তরাগ* (১৯৬২), *আর্শিতে আমি* (১৯৭৬), *মৃগয়ায় শরবিদ্ধ* (১৯৮৬)

দিলারা হাশেম : *হলুদপাখির কান্না* (১৯৭০), *সিন্ধুপারের উপাখ্যান* (১৯৮৮), *নায়ক* (১৯৮৯)

দৌলতুন্নেসা খাতুন : *গল্পমঞ্জুরী* (১৯৬২)

নাসরীন নঈম : *এখানে পিঞ্জর* (১৯৮৪), *আর যে পারি না মিলাপু* (১৯৯০), *সহসা দুপুরে দহন* (১৯৯১), অপত্য স্নেহের ডালপালা (১৯৯৯)

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *অন্য নায়ক* (১৯৮৫), *মেঘ কেটে গেল* (১৯৮৮)

নাসরিন জাহান : *স্থবির যৌবন* (১৯৮৫), *বিচূর্ণ ছায়া* (১৯৮৮), *সূর্য তামসী* (১৯৮৯), *পথ, হে পথ* (১৯৮৯), *সারারাত বিড়ালের শব্দ* (১৯৯১), *আশ্চর্য দেবশিশু* (১৯৯৫), *পুরুষ রাজকুমারী* (১৯৯৬), *সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে* (১৯৯৭), *এলেন পোর বিড়াল* (২০০৬), *নারীবাদী গল্প* (২০১০), *ছেলেটি যে মেয়ে মেয়েটি তা জানে না* (২০১০)

নেয়ামাল বাসির : *ধূপছায়া* (১৯৬৯)

নির্মলেন্দু গুণ : *আপন দলের মানুষ* (১৯৮৫)।

নীলিমা ইব্রাহীম : *রমনা পার্কে* (১৯৬৪)

পাপড়ি রহমান : *লখিন্দরের অদৃষ্ট যাত্রা* (২০০০), *হলুদ মেয়ের সীমান্ত* (২০০১), *মহুয়া পাখির পালক* (২০০৪), *অষ্টরম্ভা* (২০০৭), *ধূলিচিত্রিত দৃশ্যাবলি* (২০১০)

পারভেজ হোসেন : *ক্ষয়িত রক্তপুতুল* (১৯৯০), *বৃশ্চিকের জাল ও অন্যান্য* (১৯৯৩), *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪)

পূরবী বসুর : *পূরবী বসুর গল্প*, *আজন্ম পরবাসী*, *সে নহি নহি*, *নিরুদ্ধ সমীরণ*

প্রশান্ত মৃধা : *কুহকবিভ্রম* (২০০০), *১৩ ও অবশিষ্ট ছয়* (২০০১), *আরও দূর জন্ম-জন্মান্তর* (২০০৪), *শারদোৎসব* (২০০৬), *বইঠার টান* (২০০৬), *গল্পের খোঁজে* (২০১১)

ফরিদা হোসেন : *অজন্তা* (১৯৬৫), *ঘুম* (১৯৮৫), *শাড়ী* (১৯৮৭), *একটি শীতল মৃত্যু* (১৯৮৭), *হিমালয়ের দেশে* (১৯৯৪), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৪), *ক'জনার কথা* (১৯৯৪)

বন্দে আলী মিয়া : *তাসের ঘর*

বশীর আল হেলাল : কিশোর গল্প *আনারসের হাসি* (১৯৭৪); *প্রথম কৃষ্ণচূড়া*

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : *সাদা কফিন* (১৯৮৪), *যুদ্ধজয়ের গল্প* (১৯৮৫), *গাঙচিল* (১৯৮৭), *নদীর নাম গণতন্ত্র* (১৯৮৭), *বীরাঙ্গনার প্রেম* (১৯৮৭), *উল্কি একটি প্রেমের গল্প* (১৯৮৮), *স্বপ্নমিছিল* (১৯৮৯), *আকাশে প্রেমের বাদল* (১৯৮৯), *স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে* (১৯৯০), *নির্বাচিত প্রেমের গল্প* (১৯৯০), *আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি* (১৯৯১), *স্বপ্নসুন্দরী* (১৯৯৪), *অলৌকিক চুম্বন* (১৯৯৫), *আমি একটি স্বপ্ন কিনেছিলাম* (১৯৯৬), *ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭)

বুলবন ওসমান : *প্রত্যালীঢ়* (১৯৬৭), *মুকুরে মুখ* (১৯৬৯)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০), *দূর দূরান্ত* (১৯৬৮), *কণ্ঠস্বর* (১৩৭৪), *বিশাল ক্রোধ* (১৩৭৬), *মুণ্ডহীন মহারাজ* (১৯৭৪), *এক ধরনের যুদ্ধ* (১৯৮৪), *গণতন্ত্রের প্রথম দিন ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯২), *বিপ্লব দীর্ঘজীবী থেকে* (১৯৯৭)

ভাস্কর চৌধুরী (জ. ১৯৫২)। তাঁর *রক্তপাতের ব্যাকরণ* (১৯৮৪), *বাষট্টি বিঘা নদী* (১৯৮৬), *কোথায় নিবাস* (১৯৮৬), *পতনের সময়* (১৯৮৭)

মকবুলা মনজুর : *সায়াহ্ন যূথিকা* (১৯৭৮), *শকুনেরা সবখানে* (১৯৮৯), *নক্ষত্রের তলে* (১৯৮৯), *মকবুলা মনজুরের প্রেমের গল্প* (১৯৮৯), *একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯১), *দিনরজনী* (১৯৯৩)

ছোটদের কিশোর গল্প : *রঙিন মাছ* (১৯৮২), *অপূর্ব উপহার* (১৯৮২), *নদীর ওপারে মেলা* (১৯৮৬), *কিশোর মহাভারত* (১৯৮৭), *সূর্য কিশোর* (১৯৮৮), *নির্বাচিত কিশোর গল্প* (১৯৮৯), *ছোট ছোট রূপকথা* (১৯৮৯)

মঈদ-উর রহমান *ময়ূরের পা* (১৯৫৮)

মঈনুল আহসান সাবের : *পরাস্ত সহিস* (১৯৮২)। *এরকমই* (১৯৯০), *ভিড়ের মানুষ* (১৩৯৬), *অরক্ষিত জনপদ* (১৯৮৩), *আগমন সংবাদ* (১৯৮৪), *চারদিক খোলা* (১৯৮৫), *স্বপ্নযাত্রা* (১৯৮৪), *নির্বাচিত* (১৯৯৯)

মনিরা কায়েস : *মাটিপুরাণ পালা* (১৯৯৯), *জলডাঙ্গার বায়োস্কোপ* (২০০১), *ধুলোমাটির জন্মসূত্র* (২০০৪), *কথামনুষ্যপুরাণ* (২০০৭)

মশিউল আলম : *আবেদালির মৃত্যুর পর* (২০০৭) গল্পটি রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গল্প *রূপালি রুই ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৪), *আমি শুধু মেয়েটিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম* (১৯৯৯), *মাংশের কারবার* (২০০৪

মঞ্জু সরকার : *অবিনাশী আয়োজন* (১৯৮২), *মৃত্যুবাণ* (১৯৮৫), *পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৬), *উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা* (১৯৯০), *আনন্দ যাত্রা* (১৯৯৫), *অপারেশন জয় বাংলা* (১৯৯৭), *মঙ্গাকালের মানুষ*

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী : *জাগ্রত যে ভালো* (১৯৮৪), *বিষকন্যা* (১৯৮৯), *সোনার খাঁচা* (১৯৮৯)

মতিন উদ্-দীন আহমদ : *চালাক হওয়ার পয়লা কেতাব* (১৯৫৮), *তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ* (১৯৬৪), *এ-তো বড় রঙ্গ যাদু* (১৯৬৯)

মযহারুল ইসলাম : *তাল তমাল* (১৯৫৯)

মফিজ উদ্দীন আহমদ : *রূপ* (১৯৬৬), *স্টার সার্কাস* (১৯৭৭)

মবিন উদ্‌দীন আহমদ : *কলঙ্ক* (১৯৪৬), *হোসেন বাড়ীর বৌ* (১৯৫২), *ভাঙাবন্দর* (১৯৫৪)

মহীবুল আজিজ : *গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ* (১৯৮৮), *দুগ্ধগঞ্জ* (১৯৯৭), *মৎস্যপুরাণ* (২০০০), *আয়নাপড়া* (২০০৬)

মাফরুহা চৌধুরী : *অরণ্যগাথা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৭৬), *কোথাও ঝড়* (১৯৮০), *স্খলিত নক্ষত্র* (১৯৮১), *বিমূর্ত বৃত্তে* (১৯৮৪), *বিদীর্ণ প্রহর* (১৯৮৩), *নিঃশর্ত করতালি* (১৯৮৪), *মাফরুহা চৌধুরীর প্রেমের গল্প* (১৯৮৬), *শব নিয়ে বসবাস* (১৯৮৭), *ছায়া পথের মানচিত্র* (১৯৮৮), *মাফরুহা চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প* (১৯৯০)

মামুন হুসাইন : *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি* (১৯৯৫), *মানুষের মৃত্যু হলে* (২০০০), *আমার জানা ছিল কিছু* (২০০০), *বালক বেলার কৌশল* (২০০২), *নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা* (২০০২), *কয়েকজন সামান্য মানুষ* (২০০৩), *একটি স্মারকগ্রন্থের জীবনপ্রণালী, রাষ্ট্রযন্ত্রের খেলাধুলা, যুদ্ধাপরাধ ও ভূমিব্যবস্থার অস্পষ্ট বিবরণ* (২০১১), *অন্ধজনের জাতককথা* (২০১৪)।

মাহবুব তালুকদার : *সুবর্ণ জয়ন্তী*

মাহমুদুল হক : *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪), *নির্বাচিত গল্প* (২০১০)

মাহ্‌বুব-উল আলম : *মফিজন* (১৯৪৬), *তাজিয়া* (১৯৪৬), *পঞ্চঅন্ন* (১৯৫৩), *গাঁয়ের মায়া* (১৯৪৯)

মালিহা খাতুন : *মনের রং লাল* (১৯৮৭), *মন ভালো নেই* (১৯৯০), *স্মৃতি তুমি বেদনা* (১৯৯৩)

মুনিরা চৌধুরী : *মেঘ ও অতলান্তে* (১৯৮৪), *বুনোঘ্রাণ* (১৯৮৪), *সূর্য মৃত্তিকা* (১৯৮৫), *নির্জন* (১৯৮৬)

মুস্তাফা পান্না : *লোকসকল* (১৯৮৪), *কৃষ্ণপক্ষের প্রতিবাদ* (১৯৮৯)

মিন্নাত আলী : *আমার প্রথম প্রেম* (১৯৫৯), *মফস্বল সংবাদ* (১৯৫৮), *যাদুঘর* (১৯৬৯), *চেনা ও অচেনা* (১৯৮০)

মিরজা আবদুল হাই : *ছায়া-প্রচ্ছায়া* (১৯৭৬), *বিস্ফোরণ* (১৯৭৮), *ফিরে চলো* (১৯৮১)

মুশতারী শফী : *একটি যুদ্ধ* (১৯৭৩), *শঙ্খচিলের কান্না* (১৯৮৩), *জীবনের রূপকথা* (১৯৮৪), *এমনও হয়* (১৯৮৫)

মোহাম্মদ ফজলুল করীম : *কাজল দীঘির পদ্ম* (১৯৬৯), *রূপের মোহে* (১৯৬৯)

রবীন্দ্র গোপ : *রোদহীন বসতি* (১৯৮০), *পরাণের স্বাধীনতা* (১৯৮৬), *স্বপ্ন ও চাঁদের কঙ্কাল* (১৯৯০), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৭), *যুদ্ধজয়ের গল্প* (১৯৯৭)

রশীদ হায়দার : *নানকুর বোধি* (১৯৬৭), *অন্তরে ভিন্ন পুরুষ* (১৯৭৩), *মেঘেদের ঘরবাড়ি* (১৯৮২), *উত্তরকাল* (১৯৮৭), *তখন* (১৯৮৭), *আমার প্রেমের গল্প* (১৯৮৮), *পূর্বাপর* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প* (২০০৫)।

রাজিয়া মাহবুব : *খাপছাড়া* (১৯৫৮), *স্বনির্বাচিত গল্প* (১৯৬২), *দূরভাষিণী* (১৯৬৯), *মুখরিত গহনে* (১৯৮৩)

রিজিয়া রহমান : *অগ্নিস্বাক্ষরা* (১৯৬৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৭৮), *হারকিউলিসের আগুন* (২০১০)

রাবেয়া খাতুন : *মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী*, *আমার এগারোটি গল্প*, *নির্বাচিত ছোটগল্প*

রাহাত খান : *অন্তহীন যাত্রা* (১৯৭৫), *অনিশ্চিত লোকালয়* (১৩৮০), *ভালো মন্দের টাকা* (১৯৮১), *আপেল সংবাদ* (১৯৮৩)

রেজাউর রহমান : *অভয়ারণ্য* (১৯৮৬), *বাক্সবন্দী সব* (১৯৮৭), *বিস্মৃত এক ভুবন* (১৯৮৮), *ওরা কোথায় যে যায়* (১৯৮৯), *সেই কলস পেয়ে যাবেই* (১৯৯৪), *স্মৃতির মানচিত্রে তারার ফাঁদ* (১৯৯৫)

লায়লা সামাদ : *দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে* (১৩৭৩), *কুয়াশার নদী* (১৩৭৬), *অরণ্যে নক্ষত্রের আলো* (১৯৭৫), *অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা* (১৯৭৮)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম : *শাহেরবানু* (১৯৪৫), *পথ জানা নেই* (১৯৪৮), *অনেক দিনের আশা* (১৯৪৯), *ঢেউ* (১৯৫৩), *দুই হৃদয়ের তীর* (১৯৫৫), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৫৩)

শামসুল ইসলাম : *কুসুমের ঋতু* (১৯৬৬), *সিগারেট ও অন্যান্য গল্প* (১৯৭৬)।

শওকত ওসমান : *উপলক্ষ্য* (১৯৬৮), *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮), *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১), *নেত্রপথ* (১৯৬৮), *পিঁজরাপোল* (১৯৫১), *প্রস্তরফলক* (১৯৬৪), *সাবেক কাহিনী* (১৯৫৩), *এবং তিন মির্জা* (১৯৮৬), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৪), *মনিব ও তাহার কুকুর* (১৯৮৬), *বিগত কালের গল্প* (১৯৮৭), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৭৪), *পুরাতন খঞ্জর* (১৯৮৭), *হন্তারক* (১৯৯১), *রাজপুরুষ* (১৯৯৪)

শাহরিয়ার কবির : *একাত্তরের যীশু* (১৯৮৫), *মহাবিপদ সংকেত* (১৯৯০), *জনৈক প্রতারকের কাহিনী* (১৯৯৬)

শাহাদুজ্জামান : *কয়েকটি বিহ্বলগল্প* (১৯৯৬), *পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ* (১৯৯৯), *কেশের আড়ে পাহাড়* (২০১২), *অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প* (২০১৪)

শাহেদ আলী : *জিব্রাইলের ডানা* (১৯৫৩)।*একই সমতলে* (১৯৬৩), *শা'নযর* (১৯৮৬), *অতীত রাতের কাহিনী* (১৯৮৬), *অমর কাহিনী* (১৯৮৭)

শহীদ আখন্দ : *জনতায় নির্জন* (১৩৮০ বাং), *অনিবার্য বান্ধব* (১৯৭৯), *যখন পারি না* (১৯৮২), *হাল্কা হাসির গল্প* (১৯৯৬)

শহীদ সাবের : *এক টুকরো মেঘ* (১৯৫৫), *ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান* (১৯৫৮)

শহীদুল জহির : *পারাপার* (১৯৮৫), *ডুমুর খেকো মানুষ অন্যান্য গল্প* (২০০০), *ডলু নদী হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* (২০০৪)

সরদার জয়েনউদ্দীন : *নয়ান ঢুলী* (১৯৫২), *বীরকণ্ঠির বিয়ে* (১৯৫৫), *খরস্রোত* (১৯৫৫), *অষ্টপ্রহর* (১৯৭০)-এরপর *বেলা ব্যানার্জীর প্রেম* (১৩৮০)

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ : *বুধবারের রাতে* (১৯৭৩)

সাদ কামালী *: নিঃশব্দ অন্তিমে* (১৯৯২), *অভিব্যক্তিবাদী গল্প* (১৯৯৬), *উপকথার আপেল* (১৯৯৬), *আগুনের গ্রহণ* (২০০০)

সাদেকা শফিউল্লাহ : *নিষিদ্ধ সুখের যন্ত্রণা* (১৯৭৮), *যুদ্ধ অবশেষে* (১৯৮০), *শর্তহীন নিঃশব্দে* (১৯৮১), *অনুভূতির রং* (১৯৮২), *কলঙ্কের সুগন্ধ* (১৯৮৪), *অক্ষম বৈঠায়* (১৯৮৫), *চয়ন* (১৯৮৭), *যন্ত্রণার সঞ্চয়* (১৯৯০), *তার তরে* (১৯৯১)

সুশান্ত মজুমদার *রাজা আসেনি বাদ্য বাজাও* (১৯৮৪), *ছেঁড়াখোঁড়া জমি* (১৯৮৫), *শরীরে শীত ও টেবিলে গুণ্ডাপাণ্ডা* (১৯৮৮), *জন্ম-সাঁতার* (১৯৯৮)

সুচরিত চৌধুরী : *আকাশে অনেক ঘুড়ি* (১৯৬১)

সিকান্‌দার আবু জাফর : *যাদুর কলস* (১৯৬৮)

সুব্রত বড়ুয়া : *জোনাকী শহর* (১৯৭০), *কাচপোকা* (১৯৭৫), *অনধিকার* (১৯৭৭), *আত্মচরিত ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৯), *ভালোবাসা ভালোবাসা* (১৯৮৯), *তৃণা* (১৯৯৩)

সেলিনা হোসেন : *উৎস থেকে নিরন্তর* (১৯৬৯), *জলবতী মেঘের বাতাস* (১৯৭৫), *খোল করতাল* (১৯৮২), *পরজন্ম* (১৯৮৬), *মানুষটি* (১৯৯৩), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৩), *মতিজানের মেয়েরা* (১৯৯৫), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০০০), *আকাশপরী* (২০১২)

সেলিম মোরশেদ : *কাটা সাপের মুণ্ডু* (১৯৯৩), *বাঘের ঘরে ঘোগ* (২০০৮)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : *নয়নচারা* (১৯৪৫), *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫)

সৈয়দ ইকবাল : *একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৬), *ভালোবাসার পাঁচ পা* (১৯৮৭)

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪), *থাকা না থাকার গল্প* (১৯৯৫), *প্রেম ও প্রার্থনার গল্প* (২০০৫)

সৈয়দ মুজতবা আলী : *চাচা-কাহিনী* (১৩৫৯), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬১), *শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা* (১৯৬২)

সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ : *আগুনের বিপদ আপদ* (১৯৯৪), *শাদা কাহিনী* (১৯৯৬)

সৈয়দ শামসুল হক : *তাস* (১৯৫৪), *শীতবিকেল* (১৯৫৯), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭), *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান* (১৯৮১), *প্রেমের গল্প* (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯০), *গল্প সমগ্র* (২০০১)

হরিপদ দত্ত : *সূর্যের ঘ্রাণে ফেরা* (১৯৮৫), *একটি পুরাতন উর্দি* (১৯৮৮), *কালবেলার গল্প* (২০০৫), *গল্প সমগ্র* (২০০৫)

হাজেরা নজরুল *জোনাকীর আলো* (১৯৬৮), *ফসিলে সূর্যগ্রহণ* (১৯৮৬), *সুবর্ণসখী* (১৯৮৩), *সময়ের ফুল* (১৯৮৩), *ঘাসের পাখনায় আমার পালক* (১৯৯০)

হারুন হাবীব : *বিদ্রোহী ও আপন পদাবলী* (১৯৮৫), *লালশার্ট ও পিতৃপুরুষ* (১৯৮৫), *অন্ধ লাঠিয়াল* (১৯৯৯), *স্বর্ণপক্ষ ঈগল*, *গল্পসপ্তক*

হাসনাত আবদুল হাই *: একা এবং একসঙ্গে* (১৯৭৭), *যখন বসন্ত* (১৯৭৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৯), *শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪)

হাসান আজিজুল হক : *সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য* (১৯৬৪), *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৫), *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯), *রোদে যাবো* (১৯৯৫), *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮১), *মা মেয়ের সংসারে* (১৯৯৭), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৭), *রাঢ়বঙ্গের গল্প* (১৯৯১), *হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৫), *স্বনির্বাচিত গল্প* (২০১২)

হাসান হাফিজুর রহমান : *আরো দুটি মৃত্যু* (১৯৭০)

হেলেনা খান: *ফসলের মাঠ* (১৯৬৭), *বৃষ্টি যখন নামলো* (১৯৭৮), *কালের পুতুল* (১৯৭৮), *একাত্তরের কাহিনী* (১৯৯০), *পাপড়ির রং বদালায়* (১৯৯১), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৩), *ছায়া কালো কালো* (১৯৯৭), *কারাগারের ভেতরে ও বাইরে* (১৯৯৭)

আবদুল মান্নান সৈয়দ: *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮), *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা* (১৯৭৭), *চলো যাই পরোক্ষে* (১৯৭৩), *গল্প ১৯৬৪* (১৯৭০), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৭), *মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা*

হুমায়ুন আজাদ : *যাদুকরের মৃত্যু* (১৯৯৬)

হুমায়ূন আহমেদ : খাদক, *একটি নীল বোতাম*, *জীবনযাপন*, *খেলা*, *অসুখ*, *ফেরা* গল্প

হুমায়ুন কাদির : *একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প* (১৯৬৬), *আদিম অরণ্যে এক রাত্রি* (১৯৭০), *শীলার জন্য সাধ* (১৯৭৯)

হুমায়ুন মালিক : *গ্রৗমযজ্ঞ* (২০০৫), *গোলাপসংহিতা* (২০০৬)

হোসনে আরা শাহেদ : *গিন্নীর ডায়েরী* (১৯৮৬), *জীবন থেকে* (১৯৮৬), *তির্যক* (১৯৯২), *জীবনানন্দনের জামিন* (১৯৯০), *উষ্ণ চা শীতল হৃদয়* (২০০১), *কেন এ দুয়ারটুকু* (১৯৮৩)

নাটক

অগ্নিদূত : *অন্ধকারের নীচে সূর্য* (১৯৮০), *রবিবারের সকাল* (১৯৮০)

অনন্ত হীরা : *লোকনায়ক* (২০০৫), *বিচার* (২০০১), *ক্ষমাহীন ক্ষমা* (২০০০)

অনিমেশ সাহা লিটু : *কালাকাল*

পথনাটক : *দুঃসহ স্মৃতি* (২০০৩), *বোধোদয়* (২০০৪), *ফিরে আসা* (২০০৫)

অনিলবরণ দত্ত : *স্বীকৃতি* (১৯৭৮), *কে দেবে কবর* (১৯৭৮)

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় : *আনারকলি* (১৯৭৭)

অনুপকুমার ভৌমিক : *শোভনার বাঁধ* (১৯৮৪)

অন্নদামোহন বাগচী : *ঝড়*(১৯৫৭), *মুক্তি* (১৯৬০), *শেষপ্রহর* (১৯৬০), *মসনদ* (১৯৬১), *সূর্যমুখী* (১৯৬১), *রিক্তের বেদন* (নাট্যরূপ) (১৯৬২), *কাদামাটির দূর্গ* (১৯৬৪), *মেঘের পারের মেঘ* (১৯৬৪), *কেদার মাস্টার* (১৯৬৭), *বন্ধন* (১৯৬৮), *দুইপক্ষ* (১৯৬৮)

অভিজিৎ সেনগুপ্ত : *ক্রান্তিকাল* (২০০১), *অর্ফিয়ুস* (২০০১), *বেলা শেষের গল্প* (২০০৪)

অভীক ওসমান : *তিরোহিত সুন্দর আমার* (১৯৭৫), *গন্ধরাজ* (১৯৮৫), *শংখ উপাখ্যান* (১৯৯৩), *রাত ফেরার* (১৯৭৭)

পথনাটক : *অবশেষে জেনারেল* (১৯৮৬)

অমর সাহা : *মরা মানুষের রং* (১৯৮০), *পিপাসার মৃত্যু* (১৯৮১), *সত্য যেখানে মরে গেল* (১৯৮১), *অথবন্ধু সমাচার* (১৯৮১), *মৃত্যু মানে পরাভব* (১৯৮১), *নীলখাম* (১৯৮১), *পাঞ্চ* (১৯৮০), *স্বাধীনতার ঝড়* (১৯৮১), *ভাগীরথী* (১৯৯৪), *পর্ণো কড়চা* (১৯৯৪)

পথনাটক : *চেতনার উন্মেষ* (১৯৮০), *চশমা* (১৯৯৩)

অরুণ কুমার দে : *গরীবের ছেলে* (১৯৮০)

অরুণ চক্রবর্তী : *বাবু খেলা দেখে যান* (১৯৭৭)

অলোক বসু : *ঘরামি* (২০০১) *তেভাগার পালা* (১৯৯৯), *শুধু একাকী* (১৯৯৯)

পথনাটক : *বান্দরের কিস্‌সা* (১৯৯৪), *মাদার* (১৯৯৪), *অস্লদহন* (২০০১),

আকবরউদ্দীন : *সিন্ধু বিজয়* (১৯৩০), *নাদির শাহ* (১৯৫৩), *বন্দীর মুক্তি* (১৩৩৪); *আজান* (১৯৪৬) ও *অভিশাপ* (১৯৪৭), *মুজাহিদ* (১৩৭০), *সুলতান মাহমুদ* (১৩৩৭), *ঝি ফেডারেশন* (১৩৫৩)

আক্তার কমল : *রংহীন সিগন্যাল* (১৯৭২)

আজমিরী ওয়ারেশ : *উন্মোচন* (১৯৭২)

আজহার হাবলু : *বিতাড়িত সুন্দর* (১৯৯৬), *বেদনার নোঙর* (১৯৯৭), *মজার ইস্কুল* (২০০২), *বর্ণমালার চোখে জল* (২০০১), *আল্লারাখা* (১৯৯৯)

আজাদ আবুল কালাম : *সার্কাস সার্কাস* (১৯৯৮ প্র. অ.)

আজিজ মেহের : *টিপু সুলতান* (১৯৬২), *তারাবাঈ* (১৯৬৩), *ঝড়ের পাখি* (১৯৬৫), *বাজিছে দামামা নিরক্ষবৃত্তে* (১৯৬৭), *ম্যাকসিম গোর্কির মা* (১৯৮৬)

আজিজুস সামাদ : *কীর্তিনাশা* (১৯৯২), *কালান্তর* (১৯৯৪), *প্রহেলিকা* (১৯৯৫), *বঙ্গরঙ্গ* (১৯৯৬), *হিং টিং ছট* (১৯৯৭), *বৃত্ত* (১৯৯৮), *বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতা* (২০০০),

পথনাটক : *কল্পতরু* (১৯৯৪), *কাঁটা* (১৯৯৬)

আতাউর রহমান : *ভেঁপুতে বেহাগ* (১৯৭৪), *দ্বাররুদ্ধ*

আনন জামান : *শিখণ্ডী কথা* (২০০২)

পথনাটক : *প্রকৃতি বিলয়* (২০০৪)

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *উত্তর-ফাল্গুনী* (১৯৬৪), *রূপান্তর* (১৯৭০), *ঝড়ের পাখি* (১৯৫৯), *সংযুক্তা* (১৯৬৫), *উত্তরণ* (১৯৬৯), *শিলা ও শৈলী* (১৯৬৭), *সুর ও ছন্দ* (১৯৬৭), *যা হতে পারে* (১৯৬২), *একে একে এক* (১৯৬৯), *ধানকমল* (১৯৬৯), *উত্তরণ* (১৯৬৯), *ত্রিমাত্রিক* (১৩৭৩)

আনিস চৌধুরী : *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এ্যালবাম* (১৯৬৫), *চেহারা* (১৯৭৯), *যেখানে সূর্য* (১৯৭৪), *তবুও অনন্যা, হাইজ্যাকার*

আনোয়ার তালুকদার : *দাঁড়াবো শুধুই* (১৯৭২), *উৎস থেকে সমুদ্দুর* (১৯৭৪)

আফসার আহমেদ : *প্রেমপুরাণ* (১৯৯৯)

আব্দুন নূর : *হুতোম প্যাঁচার দেশে*

আবদুর রউফ : *এরাও মানুষ* (১৯৫২)

আব্দুর রাজ্জাক : *মঞ্চে যা দেখবেন* (১৯৮১), *ময়নার বিয়ে* (১৯৮২), *চুপ থাকবেন না* (১৯৮৪), *ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে* (১৯৮৫), *ভুল যখন ভাঙলো* (১৯৮৫), *রক্তে আঁকা মানচিত্র* (১৯৮৪)

আবদুল জলিল : *খুনে লাল বাংলা*

আবদুল মতিন খান : *মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব* (১৯৮০), *সম্মেলন* (১৯৮১), *শকুন্তলা* (১৯৮১), *গিলগামেশ* (১৯৮২), *বজ্রানলে ও লালু* (১৯৮২)

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *না ফেরেশতা না শয়তান* (১৯৭০-৭১), *সুখ-অসুখ* (১৯৬৭), *যুক্তিহীন যুগ* (১৯৬৮), *এসো অসম্ভব, এসো* (১৩৭৩), *সংসার* (১৯৭০), *একটি ভীষণ খেলা* (১৩৭৩), *বিশ্বাসের তরু,স্বর্গোদ্যান* (১৯৭৯)

আবদুল হক : *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬), *ফেরদৌসী* (১৩৭১), *সোনার ডিম ও অন্যান্য নাটিকা* (১৯৭৬)

অনুবাদ নাটক : *পুতুলের সংসার* (১৯৬৬), *প্রেতাত্মা* (১৯৬৬), *মহাস্থপতি* (১৯৬৬), *রমমার্গ হোম* (১৯৬৭), *হেড্ডা গাবলার* (১৯৬৭), *ইলিনয়ে অব লিঙ্কন* (১৯৬৭), *জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান* (১৯৬৮), *গণশক্র* (১৯৯২)।

আব্দুল হাই দূর্বার : *ময়নার চর* (১৯৭৩), *এরফান বাওয়ালীর কবর* (১৯৮৮), *ধোলাই* (১৯৯৬), *বদহজম*

পথনাটক : *আহত একুশ* (১৯৯৪), *নয়ছয়* (১৯৯৬), *ফিরে দেখা* (২০০০), লড়াই (১৯৮৬), *স্বাধীনতা কথা বলে* (১৯৮৭)

আবদুল হাকিম : *বাংলা রক্ত মঞ্চে*

আব্দুল হালিম আজিজ : *পোস্টার* (১৯৮৪), *শেষ যুদ্ধ* (১৯৮৪), *চিতেশ্বরের কইতরী* (১৯৮৫), *ইচ্ছামতির কিচ্ছা* (১৯৮৬), *তিন পুরুষের মাথায়* (১৯৮৯), *হানাদার* (১৯৯১), *রূপবতী* (১৯৯২), *বুদ্ধ* (১৯৯৭), *মানুষ সংবাদ* (২০০২)

পথনাটক : *রাক্ষস* (১৯৮৫), *মহারাজের দেশে* (১৯৮৭), *লড়াই* (১৯৮৮), *রাজার হলে সাজা* (১৯৯০), *ঘাতক* (১৯৯২), *ঘাতক সমাচার* (১৯৯৮), *খেলাধুলা* (১৯৯৯), *আমাদের কথা* (২০০৩)

আবদুল্লা ইউসুফ ইমাম : *বাংকার*

আবদুল্লাহ আল মামুন : *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪ প্র. অ.), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৪ প্র. অ.), *এবার ধরা দাও* (১৯৭৭), *শপথ*, *সেনাপতি* (১৯৮০, ১৯৭৯ প্র. অ.), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০, ১৯৮২ প্র. অ.), *ক্রসরোডে ক্রসফায়ার* (১৯৮১), *আয়নায় বন্ধুর মুখ* (১৯৮৩), *শাহজাদীর কালো নেকাব* (১৯৮৩), *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪, ১৯৮৩ প্র. অ.), *আমাদের সন্তানেরা* (১৯৮৯), *তৃতীয় পুরুষ* (১৯৮৮), *দূরপাল্লা* (১৯৮৮), *তোমরাই* (১৯৮৮, ১৯৮৭ প্র. অ.), *কোকিলারা* (১৯৮৯), *মুক্তিযুদ্ধের নাটক সমগ্র* (১৯৯৩), *স্পর্ধা* (১৯৯৪, ১৯৯৩ প্র. অ.), *উজান পবন* (১৯৭৫), *বুদ্ধিজীবী* (১৯৭৪), *স্পর্ধা* (১৯৯৩), *মাইক মাস্টার* (১৯৯৭), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯৩, ১৯৯২ প্র. অ.), *তাহারা তখন* (১৯৯৬ প্র. অ.), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৬, ১৯৯৫ প্র. অ.), *মেহেরজান আর একবার* (১৯৯৮, ১৯৯৭ প্র. অ.), *চরিদিকে যুদ্ধ* (১৯৭৬ প্র. অ.) *ডক্টর ফস্টাস*, *একা* (১৯৯৪)

আবদুল্লাহেল মাহমুদ : *কৈবর্তগাথা* (২০০০), *নানকার পালা* (১৯৮৭), *প্রাকৃতজন কথা* (১৯৯৭), *সাত পুরুষের ঋণ* (১৯৮২), *প্রাকৃতজন কথা* (১৯৯৭)

আবদুস সেলিম : *হিম্মতী মা* (১৯৮৫ প্র. অ.), *গ্যালিলিও* (১৯৮৮ প্র. অ.)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *শনিগ্রহ ও পৃথিবী* (১৯৫৩)

আবু যোহা নূর আহমদ : *আনারকলি* (১৯৫৪),

আবু সালেক খান : *প্রত্যাবর্তনের দেশে* (১৯৭৬)

আবু হাসান যশোরী : *স্বাধীন বাংলা*

আবুল ফজল : *একটি সকাল* (১৯৩৬), *আলোকলতা* (১৯৩৬), *স্বয়ম্বরা* (১৯৬৬), *কায়েদে আজম* (১৯৪৬), *ছদ্মবেশী* (১৯৭০), *প্রগতি* (১৯৪৮)

আবুল মোমেন : *সুখ যাত্রা* (১৯৮৬), *স্বপ্নের আগন্তুক* (১৯৭৫)

আবুল হোসেন : *অথচ অন্ধকার*

আমিনুর রহমান : *অলিখিত সংলাপ* (১৯৯১), *একজন তাহমিনা* (১৯৯১), *অংকুরের ডাক* (১৯৯৩)

আযীম উদ্দীন আহমদ : *মহুয়া* (১৯৫২), *কাঞ্চন* (১৯৬২)। *মা* (১৯৬০), *অহঙ্কার* (১৯৬০)

আরিফুল হক রুজু : *জনম দুঃখী মা* (১৯৯২), *লক্ষ্মী নূরজাহান* (১৯৯৩), *কার্তিকের জ্যোৎস্না* (১৯৯৪), *ভালোবাসা বন্ধ থাকবে* (১৯৯৪), *মানচিত্রের গল্প* (১৯৯৭), *তবু স্বপ্ন* (২০০০), *গন্তব্যহীন গন্তব্য* (২০০২)

পথনাটক : *কল্পকাহিনী-১* (১৯৯৪), *একটি কারখানার গল্প* (১৯৯৪), *কল্পকাহিনী-২* (১৯৯৫), *দাদা আর যাবো না* (১৯৯৬)

আল মনসুর : *পোড়াবাড়ী* (১৯৫৫), *বোবা মানুষ* (১৯৫৬), *হে জনতা আরেক বার* (১৯৭৪), *রোলার ও নিহত এল এম জি* (১৯৭২), *বিদায় মোনালিসা* (১৯৭৪), *রেভ্যুলিউশন ও খৃষ্টাব্দ সন্ধান* (১৯৭২)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *ইহুদীর মেয়ে* (১৯৬২), *রঙিন মুদ্রারাক্ষস* (১৯৯৪), *মরক্কোর যাদুঘর* (১৯৫৯), *ধন্যবাদ*(১৯৫১), *নিঃশব্দ যাত্রা* (১৯৭২), *নরকে লাল গোলাপ* (১৯৭৪), *মায়াবী প্রহর* (১৯৬৩), *জোয়ার থেকে বলছি* (১৯৭৪), *সংবাদের শেষাংশ* (১৯৭৫), *মেঠো ফুলের ঠিকানা* (১৯৭৫), *সংবাদ শেষাংশ* (১৯৭৫), *হিজল কাঠের নৌকা* (১৯৭৬), *হে সুন্দর হে জাহান্নাম* (১৯৮৮)

আলী আনোয়ার মোল্লা : *আয়না* (১৯৭৪), *স্টেজ রিহার্সেল* (১৯৭৫), *বোবা মিনার* (১৯৭৫), *চার্টার অব ডিমান্ড* (১৯৭৯)

আলী যাকের : *দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা* (১৯৭৬), *বিদগ্ধ রমনীর কূল* (১৯৭৪), *এই নিষিদ্ধ পল্লীতে* (১৯৭৩, ১৯৭৩ প্র. অ.), *দর্পণ* (১৯৯৩, ১৯৯১ প্র অ.), *সৎ মানুষের খোঁজে* (১৯৭৪, ১৯৭৬ প্র. অ.), *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮০-৮১, ১৯৮১ প্র. অ.), *শঙ্খচিল* (১৯৯৭ প্র. অ.), *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮০ প্র. অ.)

আলো দাশগুপ্ত : *নাম বিভ্রাট* (১৯৭৫)

আসকার ইবনে শাইখ : *বিরোধ* (১৯৪৭), *পদক্ষেপ* (১৯৪৮), *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫১) *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *অনুবর্তন* (১৯৫৯), *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫), *দুর্যোগ* (১৯৫৩), *প্রচ্ছদপট* (১৯৫৮); *রক্তপদ্ম* (১৩৬৮), *অগ্নিগিরি* (১৯৫৭), *অনুবর্তন* (১৯৫৯), *রাজ্য-রাজা-রাজধানী* (১ম ও ২য় পর্যায়)(১৯৮২), এছাড়া *শেষ অধ্যায়* (১৯৫২), *প্রতীক্ষা* (১৯৫৭), *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৫৫), *এপার ওপার* (১৯৫৫), *তীতুমীর* (১৯৫৭), *কর্ডোভায় আগে* (১৯৮০), *রাজপুত্র* (১৯৮০), *মেঘলা রাতের তারা* (১৯৮১), *কন্যা জায়া জননী* (১৯৮৭), *লালন ফকির* (১৯৫৯), *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৪৯)

আশরাফ-উজ-জামান : *সয়লাব* (১৯৫৬)

আশীষ খন্দকার : *একটি শিরোনামহীন নাটক* (১৯৯৮), *আলোছায়া* (১৯৯৯)

আ. স. ম. মাহবুবুর হোসাইন : *রক্ত দিয়ে লেখা*

আসাদুজ্জামান নূর : *মোহনগরী* (১৯৮২)

আসাদুল্লাহ ফারাজী : *মানুষ মানুষ*, *রাইক্ষসের পাচালী*, *বীরাঙ্গনা বিমলরা*, *সী মোরগ*, *সোহাগী বাঈদানীর ঘাট*

পথনাটক : *রাইক্ষসের ক্ষিধা*, *সুখের ঠিকানা-১*, *সুখের ঠিকানা-২*, *যৌতুক*

আসিফ মুনীর : *আসমান তাঁরা শাড়ী* (১৯৯১), *বাজিমাৎ* (১৯৯৪)

আহমদ আল মামুন : *সকিনা*, *নয়ন তারাদের গপ্পো*, *এমন হলে কেমন হয়*, *জীবন যেমন*, *হলুদ ধানের কাব্য*

পথনাটক : *মানুষ মানুষ খেলা*, *ডুগডুগি*, *নূরা পাগলার বিয়া*, *রূপকথা নয়*, *সুনীতি কত দূর*, *ঘামের ফোঁটায় আগুন*, *ক্যামেরা*, *জয়নাব*, *চেয়ার*, *গডজনতা*, *বোবা কান্না*, *আম্বিয়াদের কথা*

আহমেদ কামাল খোকন : *অবশিষ্টাংশ* (১৯৯৯), *চোষকাগজ* (১৯৯৯), *চক্রবন্দী* (২০০০),
পথনাটক : *নমস্য নমস্কার* (১৯৯৯)
আহমেদুজ্জামান : *নিঃসঙ্গ এ যাত্রা, পৃথুলা*
আহমেদ মুসা : *হবুচন্দ্র সমাচার, এক যে ছিল আকাল, নাদের আলীর সাহিত্য সম্মেলন*
আহ্‌মেদ সিদ্দিকী : *সক্রেটিসের সন্ধানে* (১৯৮৫), *চুরি কেইস* (১৯৮৮), *রূপকুমার* (১৯৯৬)
ইউসুফ আলী খোকন : *জলপরী* (২০০৪),
পথনাটক : *খনন* (২০০৩), *লালী* (২০০৫)
ইজিবর রহমান : *মৌচাক, ইদানীং আমরা সেপাই* (১৯৮৯), *মুখোশ* (১৯৯৩), *প্রেক্ষাপট* (১৯৯১), *ক্রমশ, সামনে খোঁড়া কবর, ডাস্টবিন সমাচার*
ইনামুল হক : *গৃহবাসী* (১৯৮৮, ১৯৮৩ প্র. অ.)
ইব্রাহীম খাঁ : *কামালপাশা* (১৩৩৪ ব.), *ঋণ পরিশোধ* (১৯৫৫), *ভিস্তি বাদশা* (১৩৫৭ ব.), *মর্ম্মর স্বপ্ন* (১৩৩৩), *কাফেলা*
ইব্রাহীম খলিল : *সমাধি* (১৯৫৭), *স্পেন বিজয়ী মুসা* (১৯৪৯), *ফিরিঙ্গী হার্মাদ* (১৯৫৩), *ফিরিঙ্গীরাজ* (১৯৫৪), *কিসসা নয়, কাহিনী* (১৯৫৬), *নূরজাহান* (১৯৭০)
ইন্দু সাহা : *বিন্দু থেকে চেতনা* (১৯৭৬), *কিষাণ বৌ* (১৯৭৭), *বাঘ ও পদাতিক* (১৯৭৭), *টার্মিনাল* (১৯৭৮), *টুনি তালসোনাপুর যাচ্ছে* (১৯৭৯), *একজন মুন্সীর পোস্টার* (১৯৮০), *দেয়াল ভাংবোই* (১৯৮৬), *নূরবানু ও মানচিত্র* (১৯৮৮), *অরণ্য জনারণ্য* (২০০৪)
ইসরাফিল শাহীন : *পুতুল খেলা* (১৯৯২)
এ এইচ এম বসিরউদ্দীন : *মোহাম্মদী বেগ* (১৯৫৪), *সংশোধন* (১৯৫৪), *সোহরাব রুস্তম* (১৯৫৪),
এ কে কবীর : *নতুন বিপ্লব, লালু ঠিকাদারের বস্তি, প্রতিবাদ, নির্বাসন, আশ্রয় শিবির, হোয়াইট অক্টোপাস, এই অরণ্যে, মধুপাগলা, বটতলার পাগলা, কিল দেশ, পণ্ডিত মশাই, মাধুরীর বিয়ে, রূপালী চাঁদ, আরশীনগর, সাম্প্রতিক সমাচার*
পথনাটক : *রক্তাক্ত ফাল্গুন, লালগোলাপ, যুদ্ধ যুদ্ধ, কদমতলী আর্মী ক্যাম্প, মুক্তযোদ্ধা*
এম. এ. আজম : *এই শতাব্দী ও তারপর, বিভ্রান্ত অতীত*
এম. এ. ওয়াজেদ : *রক্তের ঋণ* (১৯৮৪), *পল্লী মেয়ে* (১৯৮৫), *বাঁধো ব্যাটাকে* (১৯৮৬), *নতুন সূর্য* (১৯৮৬), *রক্তঝরা একুশে* (১৯৮৭), *সেই কাল রাত* (১৯৮৭)
এম. এ. মজিদ : *মোগল হাটের সন্ধ্যা* (১৯৭৯), *রতন মঞ্জরী* (১৯৭৯), *বিদ্রোহী বান্দা* (১৯৭৯), *কবি চন্দ্রাবতী* (১৯৭৯), *ঘুণে ধরা সমাজ* (১৯৭৯), *ফরিয়াদ* (১৯৮০), *ভিখারীর ছেলে* (১৯৮০), *চাকুরী চাই* (১৯৮১), *রঘু ডাকাত* (১৯৮২), *বিষে ডাকাত* (১৯৮৩), *রক্ত দিল যারা* (১৯৮৪), *নীল কুঠির কান্না* (১৯৮৫), *বাঙ্গালী* (১৯৯৫), *৪২-এর বিপ্লব* (১৯৮৬), *রক্তের দাবী* (১৯৮৭), *দেশের ডাক* (১৯৮৭), *বেহুলা লখিন্দর* (১৯৯৩), *মহুয়া* (১৯৯৪), *লালন ফকির* (১৯৯৪), *ঘুমাও তুমি প্রিয়া* (১৯৯৪), *মহাকবি মাইকেল* (১৯৯৫), *বিদ্রোহী ফকির মজনু*

শাহ (১৯৯৫), *উদয়নালা জ্বলছে* (১৯৯৫), *রক্তে রাঙা সোনার বাংলা* (১৯৯৫), *দাতা হাতেম* (১৯৯৬), *দংশন* (১৯৯৬), *ভাওয়াল সন্ন্যাসী* (১৯৯৬), *এই দেশ এই মাটি* (১৯৯৭), *পেটের জ্বালা* (১৯৯৭), *সুন্দরবনের ডাকাত* (১৯৯৭), ঘুমন্ত *সমাজ* (১৯৯৭), *রক্তে ধোয়া ধান* (১৯৮৭), *ঈশা খাঁ* (১৯৮৭), *থামাও যুদ্ধ* (১৯৮৮), *মানিকব পীরের দরগা* (১৯৮৮), *মাইনে করা মা* (১৯৮৮), *রাই-কমল* (১৯৮৯), *ভাষার ডাক* (১৯৯০), *জনতার শত্রু* (১৯৯০), *সাত কোটির মুজিব* (১৯৯১), *স্বাধীনতার ডাক* (১৯৯২), *চুকনগরের গণহত্যা* (১৯৯৩), *বিদ্রোহী নজরুল* (১৯৯৩), *হাছন রাজা* (১৯৯৩), *নদীর নাম মহানন্দা* (১৯৯৩), *থামাও রক্তপাত* (১৯৯৩), *চারণ কবি মুকুন্দ দাস* (১৯৯৪), *নেতাজীর ডাকে দিল্লী চল* (১৯৯৪), *সাঁই ফকির আলেফ চাঁন* (১৯৯৪), *সালাম বিজয়ী বীর* (১৯৯৪)

এম. এ. মাজেদ : *বন্ধুর চরিত্র* (১৯৫৭)

এম. গোলাম রহমান : *পলাশী* (১৯৫৪), *ইরানের দুহিতা* (১৯৫৫), *ভুল যখন ভাঙলো* (১৯৬১), *চৌধুরী লজ* (১৯৬৬), *জাহাঙ্গীর* (১৯৬৬)

এম. টি. রহমান : *প্রবাহ* (১৯৬৩)

এস. এম জয়নাল আবেদীন : *জীবনযুদ্ধ* (১৯৮৫), *নো ভেকেন্সি* (১৯৮৫), *পলাশডাঙ্গার ময়না* (১৯৮৫), *মাধববাবুর তানপুরা* (১৯৮৫), *স্বর্গের সন্ধানে* (২০০৫)

পথনাটক : *একজন রাহেলা* (২০০৫)

এস. এম. সোলায়মান : *এই দেশে এই বেশে*, *ইঙ্গিত* (১৯৮৫), *গনি মিয়া একদিন* (১৯৯৭), *আমেনা সুন্দরী* (১৯৮৯), *আহ্ কমরেড*, *মুখোমুখি কংস*, *ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *এলেকশান ক্যারিকেচার*, *ইন্সপেক্টর জেনারেল*, *তালপাতার সেপাই*, *রাক্ষস-খোক্কস*, *সক্রেটিসের সন্ধানে* এবং *জনতার শত্রু* (১৯৯০), *কোর্ট মার্শাল*(১৯৯৩)

এস. এম. হাবিবুর রহমান : *মাটির মানুষ* (১৯৫২)

এহসানউল্লাহ্ : *কিংশুক যে মরুতে*

ওবায়েদ-উল-হক : *দিগ্বিজয়ী-চোরাবাজার* (১৯৫০), *এই পার্কে* (১৯৬৩), *টমি আর পুসি* (১৩৪৩)

ওহীদুল আলম : *হালুয়া* (১৯৫৫)

কচি খন্দকার : *জ্বালাতন* (১৯৭৯), *একাল মানুষের গপ্পো* (১৯৯১)

পথনাটক : *ভূতের গদি* (১৯৮৪), *ঐতিহ্য ও কিছু প্রশ্ন* (১৯৯৬), *একটি অসম্ভব প্রত্যাশা* (১৯৯৮), *বিপন্ন দেশ, মানুষ, অস্তিত্ব* (১৯৯৯), *রক্তাক্ত* (১৯৯৯)

কবীর আনোয়ার : *পোষ্টার* (১৯৮৬), *জনে জনে জনতা* (১৯৮৪)

কল্যাণ মিত্র : *জল্লাদের দরবারে* (১৯৭২), *দায়ী কে* (১৯৬০), *প্রদীপ শিখা* (১৯৬১), *টাকা আনা পাই* (১৯৬৫), *কুয়াশা কান্না* (১৯৬৫), *অনন্যা* (১৯৬৭), *ত্রিরত্ন* (১৯৬৭), *শপথ* (১৯৬৭), *শুভ বিবাহ* (১৯৬৭), *সাগর সেচা মানিক* (১৯৬৮), *একটি জাতি একটি ইতিহাস* (১৯৭২), *পাশের বাড়ি* (১৯৭৭), *বাইজী* (১৯৭৭), *লালন ফকির* (১৯৭৭), *চোরা গলি মন* (১৯৬৬)

কাইজার আহমেদ : *বায়ান্নের শকুন* (১৯৮৩)
কাজী জাকির হাসান : *জনৈকের মহাপ্রয়াণ* (১৯৭৮), *শরবিদ্ধ যন্ত্রণা* (১৯৭৮), *দিকচিহ্নহীন* (১৯৭৯), *রাজায় রাজায়* (১৯৭৯)
কাজী মাহমুদুর রহমান : *সাতটি নাটক* (২০০৭)
কাজী মোহাম্মদ ইদরিস : *স্ট্রিন্ডবার্গের সাতটি নাটক*
কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস : *স্মাগলার* (১৩৬১)
কাজী রফিক : *মনসার পালা*
পথনাটক : *সারি সারি লাশ*, *তারামন বিবি*, *চোর*
কাজী রোজী : *কুসুম বেত্তান্ত* (২০০৪)
পথনাটক : *পঞ্চদেব* (২০০৪)
কালাম মাহমুদ : *বিপ্লবের গান* (১৯৯৩)
কালীপদ দাশ : *জয়বাংলা*, *সোনার বাংলা*, *বীর বাঙালি*, *বাংলার মাটি*
কালীপদ দাস : *চারশো বিশ* (১৯৫৬), *বাস্তুহারা* (১৯৫৬), *জয় বাংলা* (১৯৭১)
কুতুব উদ্দিন আহমেদ : *প্রবালের ভিন্ন রং* (১৯৯৮), *নদীতে আগুন জ্বলে* (১৯৯৯), *সাদেক আলী ঘটক* (১৯৯৯), *অতএব শুভসংবাদ* (২০০০), *নাগীন* (২০০১), *একটি সুন্দর প্রেম* (২০০৩)
কুমার প্রীতীশ বল : *কথা ৭১* (২০০৭, ২০০৫ প্র. অ.)
খান মোহাম্মদ ফারাবী : *আকাশের ওপারে আকাশ* (১৯৮২)
খালেদ খান : *শয়তানের আশ্রমী* (২০০২), *বাবার আঁকা লাল সূর্য* (১৯৯৫)
খালেদা হানুম : *সহসা জীবন* (১৯৭৩)
খায়রুল আলম সবুজ : *আন্তিগোনে*(১৯৯২), জাঁ আনুই
খায়রুল বাসার : *জীবন এখানে কোরাস গান* (১৯৯০), *জনৈক ইমান আলী* (১৯৯১), *বার মাসে তের মুখোশ* (১৯৯৪), *পোকা* (১৯৯৬), *হালখাতা* (১৯৯৮), *বাস্তুভিটে* (২০০২)
গগন তানু : *দুঃশাসনের বেড়াজাল*, চমক রতন *বাংলার বীর*, *বীরাঙ্গনা*
গিয়াসউদ্দিন সেলিম : *ঠ্যারো* (১৯৯১), *চিলেকোঠা* (১৯৯১)
গোলজার হোসেন : *বিজয়* (১৯৯০), *স্বাধীন* (১৯৯১), *কদমতলীর কালাচাঁন* (১৯৯৯), *বাঁশ* (২০০৩)
পথনাটক : *আর কতদিন* (১৯৯১), *চোখ থাকতে অন্ধ* (১৯৯১), *সপ্ত ডিঙি পেরিয়ে* (১৯৯২), *নৈরাশ* (১৯৯৩), *হাবুরা* (১৯৯৪), *অচিনপুর* (১৯৯৫), *ভেলকি* (১৯৯৫), *ওরা কারা* (১৯৯৭), *জুলুম* (১৯৯৮)
গোলাম আম্বিয়া নূরী : *কুমারখালির চর* (১৯৮১)
গোলাম শফিক : *শিলারী* (২০০৭)
গোলাম সারোয়ার : *ঘরজামাই* (১৯৯৮), *ভদ্দরনোক* (১৯৯৮, ১৯৮৩ প্র. অ.), *সোঁদামাটির গন্ধে* (২০০০), *পালাকারের নকশা* (১৯৯৭), *ক্ষত মজুর খইমুদ্দিন* (১৯৯১), *পালা বদলের পালা* (১৯৯১)

চিত্তরঞ্জন ঘোষ : *শ্যামা প্রেম*
জগলুল আলম : *ছয় বেহারার পালকি* (২০০০)
জসীম উদ্‌দীন : *পদ্মাপার* (১৯৫০), *মধুমালা* (১৯৫১), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *পল্লীবধূ* (১৯৫৬), *বাদলবাঁশী* (১৯৫৬), *করিম খাঁর বাড়ি* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া*, *জীবনের পণ্য*, *গাজনচরের কাইজা*, *ওগো পুষ্পধনু* (১৯৬৮)
জহুরুল ইসলাম : *নির্ভরযোগ্য গুজবে প্রকাশ* (১৯৭৭), *ঠিকানা পেয়েছি* (১৯৭৭)
জামালউদ্দিন হোসেন : *কবর দিয়ে যাও* (১৯৮৬)
জামিউর রহমান লেমন : *জন হেনরি* (১৯৮৬), *একজন আমেনা* (২০০২),
পথনাটক : *ঐ ওরা আইতাছে* (১৯৮৫), *কুকুর ও বংশদণ্ড* (১৯৮৭), *সোনালী স্বপ্ন* (২০০৩)
জাহাঙ্গীর আলম সুজন : *সূচনা* (১৯৯৩), *ছন্দপতন* (১৯৯৬), *নীলা* (১৯৯৭), *কফি হাউজ* (১৯৯৯), *বিপরীত স্রোত* (২০০০), *তারপর* (২০০০), *দুর্গম পথ* (২০০১), *হৃদয়পুরের বৃত্তান্ত* (২০০২), *তিথির তৃতীয়া* (২০০২), *বিবিসাব* (২০০৪)
পথনাটক : *অন্ধকারে মানুষ* (১৯৯০), *প্রয়োজন বনাম লোভ* (২০০২), *কোন এক নঈমুদ্দী* (২০০২), *অতএব হোসেন আলী* (২০০৫)
জাহাঙ্গীর আলম : পথনাটক : *শেষ ঠিকানা* (১৯৯৪), *ননস্টপ* (১৯৯৫), *কালের লড়াই* (১৯৯৫), *জুতা আবিষ্কার* (১৯৯৫), *ভালো হইতে পয়সা* (২০০০), *বাড়াও দুটি হাত* (২০০১)
জাহিদ রিপন : *পদ্মগোখরো* (২০০৭, ২০০৬ প্র. অ.)
জি এম. মেহেদি হাসান : *বর্তমান দিনকাল* (১৯৯৫), *অনুশোচনা* (১৯৯৬), *শ্রমিকের অধিকার* (১৯৯৮)
পথনাটক : *সঞ্চয়* (১৯৯৬), *আন্দোলন* (১৯৯৭)
জিয়া হায়দার : *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০), *দ্বাররুদ্ধ* (আতাউর রহমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনূদিত, ১৯৭০), *প্রজাপতি নির্বন্ধ* (আতাউর রহমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনূদিত, ১৯৭০), *এলেবেলে* (১৯৮১), *ডক্টর ফস্টাস* (অনুবাদ, ১৯৮১), *দুটি নাটিকা* (উন্মাদ সাক্ষাৎকার ও মুক্তি মুক্তি ১৯৮২), *অ্যান্টিগোনে* (অনুবাদ, ১৯৯০), *তাইরে নাইরে না* (১৯৯২)
জুনায়েদ ইউসুফ : *বাড়িতে একা* (১৯৯৮), *বন্ধু খুঁজছে তনতু* (২০০১)
জোবেদা খানম : *একাঙ্কিকা* (১৩৭০), *ওরে বিহঙ্গ* (১৩৭৫), *ঝড়ের স্বাক্ষর* (১৯৬৭)
ঝিমিত ঝিমিত চাকমা : *অহ্‌দত* (১৯৯৫), *আন্দলত পহর* (১৯৯৬), *কাত্তোন* (২০০০), *বড়গাঙ* (২০০৫)
টি আহমদ : *রক্তস্বাক্ষর*
টিপু সুলতান : *যোগ বিয়োগ* (১৯৬০)
ডাক্তার শাহাদত আলী খান : *ছোটমা* (১৯৫৩), *ভুল* (১৯৫৫), *মাটির বুকে* (১৯৬০), *প্রতিশোধ* (১৯৬৮), *প্রভার বিয়ে* (১৯৬৮), *সংঘাত*, *বিভ্রাট*, *চিরকুমারী সভা*, *মনসবদার* (১৯৬৯)
তানভীর আহমদ সিডনী : *লাশঘর* (২০০৭), *কৃষ্ণকাঠি*, *মঙ্গলমুখ*

তা. ম. আসাদুজ্জামান : *জল্লাদের পতন*, *এক নদী রক্ত*

তারিক আনাম খান : *কঞ্জুস* (১৯৮৩)

তাহমিনা আহমেদ : *ক্রুসিবল* (১৯৯৮প্র. অ.)

তোফাজ্জল লিটন : *পাইতাল*

দিলীপ সরকার : *বাংলার বিজয়*, *বাংলার বীরাঙ্গনা*, *অনেক রক্তের পরে*

নজরুল ইসলাম খান : *গুড বাই ঢাকা* (২০০৩)

নাজমুল আলম : *উপরে উঠার সিঁড়ি*, *সারেং*, *মরা মানুষের পাঠশালা* ও *ফুল্লরা অপেরা* (১৯৯৩)

নাজমুল আহসান : *শিরায় শিরায় ঘণ্টা বাজে* (১৯৭৯), *বিবর্তনের শেষ সনদ* (১৯৮০), *বর্ণমালার মিছিল* (১৯৮০), *প্রেম নেই প্রেম চাই* (১৯৮৩), *গাজী কালু চম্পাবতী* (১৯৮৪), *সুখী রমণী গুনাই বিবির কেচ্ছা* (১৯৮৬), *মহুয়ার পালা* (১৯৯২), *দুই বিঘা জমি* (১৯৯৬), *পালা বদলের পালা* (১৯৯৬), *সৎ মা* (১৯৯৭), *কমলা সুন্দরী* (২০০০)

নাজিম মাহমুদ : *উজীর ঘোড়ার গপ্পো* (১৯৯৪)

নারায়ণ চন্দ্র নন্দী : *আমরাও মানুষ* (২০০০), *মিনার স্বপ্ন* (২০০১),

পথনাটক : *আহ্বান* (১৯৯৯), *ছেলে কার* (২০০০), *আগামী* (২০০০), *সুখির স্বপ্ন* (২০০২), *কলিম চাচার সংসার* (২০০২), *সোনালী দিগন্ত* (২০০২)

নাসরীন জাহান : *স্বপ্নবাজ* (১৯৯৯)

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ : *একাত্তরের পালা* (১৯৯৩)

নাসের সরকার মনি : *টাইসনরা*

পথনাটক : *রফিক ব্রীজ* (১৯৯৪), *ক্যাম্পাস থেকে কারাগারে* (২০০০), *আলোর পানে* (২০০২), *আর্সেনিক বিষক্রিয়া* (২০০২), *মুখপোড়া বর্ণচোরা* (১৯৯৯), *স্বপ্ন* (২০০১)

নিরঞ্জন অধিকারী : *কালো অশোক লাল ফুল* (১৯৭৪)

নির্মল ঘোষ ঝুনু : *রক্তশপথ* (১৯৯৭), *কাফন* (১৯৯৭)

পথনাটক : *প্যাঁচা* (১৯৯৭), *যৌতুক* (১৯৯৯)

নিশান সাবের : *বিমূর্ত বিবর্তন* (২০০০), *এবং* (১৯৯৯), *বাহান্নো* (১৯৯৮)

পথনাটক : *বোবা জননী* (২০০১), *বিস্মৃতি* (২০০১), *ধ্বংশ চাই না* (২০০০), *তামাশা* (২০০২), *ইদারা* (২০০১)

নীলিমা ইব্রাহীম : *দু'য়ে দু'য়ে চার* (১৯৬৪), *যে অরণ্যে আলো নেই* (১৯৭৪), *রোদ-জ্বলা বিকেল* (১৯৭৩), *সূর্যাস্তের পর* (১৯৭৪), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১৯৯৬)

নীহারেন্দু কর : *সুখিয়া দুখিয়ার সুখ দুঃখ*

নুরুল ইসলাম : *ইদানিং ক্লিওপেট্রা* , *রাঙা বৌদি*, *বংশ বিড়ম্বনা*, *বিদ্রোহী মুসা শাহ*

নূরজাহান হাবীব : *ওল্ডম্যান এ্যান্ড দি সী*

নূরুল করিম নাসিম : *সোনার হরিণ*, *বিজন বাড়ি নাই* (১৯৭৪), *মানুষের জন্য* (১৯৭৬), *সম্রাট সাবধান*, *মহারাজ আসবেন*

নুরুল মোমেন : *রূপান্তর* (১৯৪৮); *নেমেসিস* (১৯৪৮), *যদি এমন হোত* (১৯৫৭) পঞ্চাঙ্ক নাটক। *নয়াখান্দান* (১৯৬২), *আইনের অন্তরালে* (১৯৬৭), *শতকরা আশি* (১৯৬৭), *যেমন ইচ্ছা তেমন* (১৯৭০), *হোসেন সফদারের উইল* (১৯৭০), *রূপলেখা* (১৯৭০), *আলোছায়া* (১৯৬২)

নূর আহমদ : *আগামী দিন* (১৯৭৬)

নূরউল আলম : *এক বৃন্তে দু'টি ফুল* (১৯৬৮)

পথনাটক : *খেয়ালী রাজা* (২০০২)

পরেশ আচার্য : *প্রতিজ্ঞা, কার পাপে, কান পেতে শোন, আকাশ অনেক উঁচু, অনেক আলো কিছু অন্ধকার, খোকন, গানের মাস্টার, কনক কেন কাঁদে, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, বিকেলে ভোরের ফুল, প্রতিদিনের একটি দিনে, এরপর তারপর, মেঘে ঢাকা আকাশ, যদি জানতেন*

পান্না কায়সার : *মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে* (১৯৯১), *মুক্তি* (১৯৯২), *নীলিমায় নীল* (১৯৯২), *হৃদয়ে বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *মানুষ* (১৯৯৪), *অন্য কোনখানে* (১৯৯৪), *তুমি কি কেবলি ছবি* (১৯৯৪), *রাসেলের যুদ্ধযাত্রা* (১৯৯৪), *দাঁড়িয়ে আছি গানের ওপারে* (১৯৯৪), *আমি* (১৯৯৪), *না পান্না না চুনি* (১৯৯৫), *অন্য রকম ভালবাসা* (১৯৯৫), *সুখ* (১৯৯৫)

প্রদীপ দেওয়ানজী : *আসবে সুঠাম সময়, অবাক রাজার অবাক কাণ্ড*

প্রসাদ বিশ্বাস : *অবিচার* (১৯৫৮), জবাবদিহি (১৯৫৯), *পাকা রাস্তা* (১৯৬১), *ভোরের স্বপ্ন* (১৯৬২), *নাজেহাল* (১৯৬৩), *ফেরিওয়ালা* (১৯৬৩), *পরাজয়* (১৯৬৩), *বিচার* (১৯৬৩), *বিশ্বজননী সারদামনি* (১৯৮৯)

ফকীর লোকমান : হাকিম *যুগের ডাক* (১৯৫২)

ফতেহ লোহানী : *একটি সামান্য মৃত্যু* , *বিলাপে বিলীন* (১৩৭৪)

ফররুখ আহমেদ : *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১)

ফররুখ শিয়র : *ব্ল্যাকমার্কেট* (১৯৫৩), *সামনের পৃথিবী* (১৯৬০),

ফরহাদ মযহার : *প্রজাপতির লীলালাস্য* (১৯৭৫), *ঘাতক দেশকাল* (১৯৭৮)

ফয়েজ আহমদ : *মুক্তাহার* (১৯৬০), *শেষ ফল* (১৯৬৬), *হারানো মানিক* (১৯৬৮)

ফাল্গুনী হামিদ : *হায়েনা* (১৯৯২ প্র. অ.), *দোররা* (২০০০ প্র. অ.)

ফিরোজ আল মুজাহিদ : *অন্য নাটক স্বপ্ন* (১৯৫৭)

ফুজায়েল আহমদ : *শকুন* (১৯৯২), *গ্রামের নাম রসুলপুর* (১৯৯৩)

পথনাটক : *একটি লাশ ও কিছু কথা* (২০০১), *আরমান আলীর বাংলাদেশ* (২০০৩)

বজলুল করিম : *আর্মস এন্ড দি ম্যান, সবাই আমার ছেলে, সপ্তসূরের থিবী আক্রমণ, দাঁনতোর মৃত্যু* (১৯৭৭)

বন্দে আলী মিয়া : *মস্‌নদ* (১৯৩১), *বনের ফুল* (১৯৩৫), *কামাল আতার্তুক* (১৯৪৮), *বৌদিদি* (১৯৪৯), *রেস্টুরেন্ট* (১৯৪৯), *জোয়ার ভাটা* (১৯৫৫)

বশীর আল হেলাল : *স্বর্গের সিঁড়ি* (১৯৭৭)

বাবুল বিশ্বাস : *হনন* (১৯৯৬), *পোড়ামাটি* (২০০১), *ভোজ* (২০০১)

বিপ্লব বালা : *বিষাদ সিন্ধুর* ১ম পর্ব (১৯৯১ প্র. অ.) ও ২য় পর্ব (১৯৯২ প্র. অ.), *হ্যামলেট ওহ্ হ্যামলেট* (১৯৯৫), গুনাই বিবি (২০০০), কে জাগিবে আজ (১৯৯৪), হায় বাংলা হায় বেহুলা (১৯৯৫)

বিশ্বজিৎ চৌধুরী বাবু : *ফতোয়া* (১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধের কথকতা* (২০০১),

পথনাটক : *মহারাজার খতিয়ান* (১৯৮৮), *সংগ্রাম* (১৯৮৮), *এবং জারজ সন্তান* (১৯৮৮), *রঙ্গিলা রাজা* (১৯৮৮), *গাঁজা* (১৯৯৫), *ভালোবাসা অতঃপর* (১৯৯৫), *ভুল* (১৯৯৬), *মশা* (২০০৩)

বিশ্বনাথ বিশ্বাস : *সূযোদয়ে গন্ধ* (১৯৭৯), *তুমি সে সখা* (১৯৮৪), *অন্যপথ* (১৯৮৪), শেক্সপীয়রের রূপান্তর *শ্রীমতি ভয়ংকরী* (১৯৮৮), *জাতের পদাবলী* (১৯৯৬), *চার কনে এক বর* (১৯৯৭), *বিদায় প্রার্থনা* (১৯৯৮), *তথৈবচ* (২০০০)

বিশ্বামিত্র : *মৃত্যু ও ক্ষুধা* (১৯৫৫), *সীমা* (১৯৫৫)

বুলবন ওসমান : *পাণ্ডুলিপির আড়ত* (১৯৭৩)

বৃন্দাবন দাস : পথনাটক : *কাঁদতে মানা* (১৯৯৭), *অরণ্য সংবাদ* (১৯৯৭), *দড়ির খেলা* (১৯৯৮)

বোরহান উদ্দিন আহমদ : *টিপু সুলতান* (১৯৫২) ও *মীর কাশিম* (১৯৫২)

ভাস্কর : *বিদ্রোহী বাঙালি*

মনজুরুল হাসান দুলাল : *চাঁদের অমাবস্যা* (২০০৭), *কাঁদো নদী কাঁদো* (২০০৭)

মনজুরুল হক মিলন : *জোয়াল* (১৯৯৪), *ঠগ* (১৯৯৭), *হুজুর কেবলা* (২০০০), *গ্রাস* (১৯৯৮), *মহুয়া সুন্দরী* (১৯৯৬), *ইয়াসীন চোরা* (২০০৫)

পথনাটক : *সংবিদ* (১৯৯৩), *পল ইন পুশ ব্যাক* (১৯৯৪), *ফতোয়াবাজ* (২০০১), *কি চমৎকার গণতলা* (১৯৯৫)

মনির হুসেন : *মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন* (১৯৯১), *কালের কাল* (২০০২)

পথনাটক : *মিসকিন* (১৯৯৩), *জঞ্জাল* (১৯৯৪), *বালি* (১৯৯৩), *জনৈক ক্যানভাসার* (১৯৯২) *চীজ* (১৯৯০)

মনোজ সেনগুপ্ত : *থেটোরবাবু* (১৯৭৯), *তিন সংগী* (১৯৭৯), *সূয ওঠার আগে*(১৯৮২), *বিক্রম ও আদালত* (১৯৮৮), *মহড়া চলছে* (১৯৯০)

মমতাজউদদীন আহমদ : *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৯১, ১৯৮৯ প্র. অ.), *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮৮), *বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল* (১৯৭৫), *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৬), *সজলের মা* (২০০৩ প্র. অ.), *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১), *যামিনীর শেষ সংলাপ* (১৯৭৬), *স্পার্টাকার্স বিষয়ক জটিলতা*, *হরিণ চিতা চিল* (১৯৭৪), নাট্যত্রয়ী *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (স্বাধীনতা যুদ্ধবিষয়ক চারটি একাঙ্কিকা :*স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, রচনাকাল ১৯৭১; *এবারের সংগ্রাম*, ১৯৭১; *স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ১৯৭১; *বর্ণচোরা*, রচনাকাল ১৯৭২) (১৯৭৬), *হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার* (১৯৭৭), *চয়ন তোমার ভালোবাসা* (১৯৭৮), *এই সেই কণ্ঠস্বর* (১৯৮৪), *প্রেম বিবাহ সুটকেস* (তিনটি হাসির

নাটক, ১৯৮৪), *বিবাহ* (১৯৮৫), *বকুলপুরের স্বাধীনতা* (কিশোর নাট্য সংকলন, ১৯৮৬), *রঙ্গ পঞ্চদশ* (১৯৮৭),

পুত্র আমার পুত্র (১৯৯৪), *হাস্য লাস্য ভাষ্য* (১৯৯৭), *একই নাটক চার রকম* (১৯৯৭), *তরুকে নিয়ে নাটক* (১৯৯৮), *মনের মতো রাজা* (১৯৯৯), *বটবৃক্ষের ধরম করম* (২০০১ প্র. অ.)

রূপান্তরিত নাটক : *দখিনের জানালায়*, *ক্ষত বিক্ষত* (১৯৮৬), ঝরা পাতা ; *খামাখা খামাখা* (১৯৯৮ প্র. অ.), *জমীদার দর্পণ* (১৯৮৩ প্র. অ.), *রাক্ষুসী* (১৯৯১ প্র. অ.), *গন্তব্য বহুদূর* (১৯৯১ প্র. অ.)

মলয় ভৌমিক : ভূঁই (১৯৯০), *গরু* (১৯৯১), *শতগ্রন্থি* (১৯৯২), *হঠবন্ধ* (১৯৯৯), *শবব্যবচ্ছেদ* (২০০০), *চৌরাস্তা* (২০০১), *দায়-দায়িত্ব* (২০০৩), *বহে প্রান্তজন* (২০০৩ প্র. অ.)

মহিউদ্দিন ছড়া : *হ্যালুসিনেশন* (১৯৯২), *অতএব সাবধান* (১৯৯৪), *ব্যাচেলর* (১৯৯৪), *শয়তান* (১৯৯৭), *পাপচক্রে* (১৯৯৭), *ধলা মিয়ার বিয়ে* (২০০০)

মহীউদ্দীন : *ফাউস্ট* (১৯৭৩)

মাজহারুল হক পিন্টু : *অন্তর বাউল*, *বিষক্ষয়*, *পৃথিবীর জন্যে*, *ধূসরতীর্থ*,

পথনাটক : *অন্তর বাজাও* (১৯৯৮), *ডেট লাইন*(২০০১), *ফিল্মি দুনিয়ার বিষ অর্জন*(১৯৯৫), *ঘনঘোর বরষার* (১৯৯৫), *ক্যানভাস* (১৯৯৭)

গীতিনাট্য : *বাংলাদেশের ঢোল* (১৯৯৬), *কর্মফল* (১৯৯৬)।

একক নাট্য : *জাল* (১৯৯৮)

মানব সরকার : *নো ম্যানস ল্যান্ড*

মান্নান হীরা : *পথনাটক সমগ্র ১* (২০০৭), মৃগনাভী (১৯৮৭/৯১), *শেকল* (১৯৯১), *আদাব* (১৯৯১), *পাথর* (১৯৯২), ফুটপাত, রেফারী, *কোরিওলেনাস*

মঞ্চনাটক : *খেলা খেলা* (১৯৯৮), *আগুনমুখা* (১৯৯৪), *একাত্তরের ক্ষুদিরাম* (১৯৯৬), *ভাগের মানুষ*, *ময়ূর সিংহাসন* (২০০১), *একজন লক্ষিন্দর* (১৯৯৭),

মামুনুর রশীদ : *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২ প্র. অ.), *গন্ধর্ব নগরী* (১৯৭৪ প্র. অ.), *ওরা কদম আলী* (১৯৭৮, ১৯৭৬ প্র.অ.), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *যে দিবস* (১৯৮১), *ইবলিশ* (১৯৮১), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪), *খোলা দুয়ার* (১৯৮৪), *গিনিপিগ* (১৯৮৩), *অববাহিকা* (১৯৮৪), *নীলা* (১৯৮৭), *সমতট* (১৯৮৮), *পাথর* (১৯৯২), *জয়জয়ন্তী* (১৯৯৭, ১৯৯৫ প্র. অ.), *রাষ্ট্র বনাম* (১৯৯৭), *লেবেদেফ* (১৯৯৭, ১৯৯৫ প্র. অ.), *সঙক্রান্তি* (২০০১)

মালিহা খাতুন : *প্রফেসর* (১৯৬৪), *সূর্যের ওপিঠ* (১৯৮৫), *আলো না আলেয়া* (১৯৮০), *অনেক সূর্যের আলো* (১৯৮৫), *সব সোনা কি আলো*

মাসুম রেজা : *আরজচরিতামৃত*, *কাকলাস* (১৯৮৬), *জীবন পোস্টার*, *খোয়াব*, *শারমেয়*, *লেবাস*, *বিরসা কাব্য*, *শামুকবাস*, *নিত্যপুরাণ* (২০০১ প্র. অ.)

মাহতাবউদ্দীন সরকার : *আজাদীর পরে* (১৯৫৫)

মাহবুব তালুকদার : *হ্যারিকেন*

মাহমুদুল ইসলাম সেলিম : *প্রাগৈতিহাসিক* (২০০৭)

মিন্টু বসু : *অন্য এক কালাপাহাড়* (১৯৮৫), *ঢোল* (১৯৮৫), *জনতা আর একবার* (১৯৮৭), *ঘাতক চারিদিকে* (১৯৮৮), *সরাইখানা* (১৯৮৯), *ইদানিং স্বদেশ* (১৯৮৯), *গৌরবগাঁথা* (১৯৯২), *ঐ মহামানব আসে* (১৯৯৪), *স্মরণ* (১৯৯৭), *সবার উপরে মানুষ সত্য* (২০০২), *গ্রাস* (২০০২)

পথনাটক : *বুকের মধ্যে জ্বলন্ত প্রতিবাদ* (১৯৮৮), *ভোটার বিদ্রোহ* (১৯৮৮), *বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি* (১৯৯১), *এ লজ্জা লুকাবো কোথায়* (১৯৯৫), *বিপ্লবের মৃত্যুনেই* (২০০০), *আলোর পথযাত্রী* (২০০০), *এসো প্রতিবাদের রণাঙ্গণে* (২০০৩)

মিতুল সাইফ : *রক্তাক্ত একাত্তর* (১৯৯০), *এই প্রবাহ* (১৯৯০), *দেয়াল মেয়ে মানুষ* (১৯৯২), *সুইট ভাষা বাংলা* (১৯৯৩), *অন্ধকারের দেশে* (১৯৯৪), *উল্টো জীবন* (২০০০), *মরা গাঙে জোয়ার* (২০০০), *পাচু বিবির গপ্প* (২০০০)

পথনাটক : এখনও অন্ধ কার (১৯৯৬), সবুজ গা এর ময়না (১৯৯৪), সোনার বংলা (১৯৯৮)

মির্জা এ কাসেম : *কার ভুলে* (১৯৭৮), *পত্র নং ৩৫৭* (১৯৭৮)

মিলন চৌধুরী : *যায় দিন ফাগুনো দিন* (১৯৭৮), *চর্যাপদের হরিণী* (১৯৭৭), *একজন পিরামিড* (১৯৮৩), *আভ্যন্তরীণ খেলাধুলা* (১৯৮৬), *নিবারণের স্বপ্ন স্বদেশ* (২০০১)

মিহির লাল দত্ত : *এই পৃথিবীতে* (১৯৬০), *অন্ধগলি* (১৯৬০), *এরা কারা* (১৯৬৮), *সম্রাট শাহ্জাহান* (১৯৬৯), *সবাই রাজা* (১৯৬৯), *সম্রাজ্ঞী নূরজাহান* (১৯৬৯)

মিয়া আবদুল গণি : *রক্ত যখন দিয়েছি*

মিয়াজান আলী : *পাক-শিক্ষায় ঘূর্ণিপাক* (১৯৬২), *পাক-ভ্রমণে বিপাক* (১৯৬৩), *বিশ্বরূপ* (১৯৬৬)

মীর শামসুল ইসলাম : *জাহাজের ইঞ্জিন বিকল* (১৯৮৭), *আর কদিন ইস্টিশনে* (১৯৮৮), *আদালতে প্রেমের গল্প* (১৯৮৯)

মুনীর চৌধুরী : *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬১), *চিঠি* (১৯৬৬), *কবর*, *দণ্ডকারণ্য*, *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*, "মানুষ"(রচনা ১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০), "কবর"(রচনা ১৯৫৩, ১৯৬৬, বাংলাদেশে প্র. অ. ১৯৭২), "দণ্ডকারণ্য"(১৯৬৬), *কবিতা মজলিশ* (১৯৪৩), *সংঘাত* (১৯৪৩), *গুণ্ডা* (১৯৪৪), *একটি মশা* (১৯৮২), *নেতা* (১৯৮২), *ঢাক*(১৯৮২), *গতকাল ঈদ ছিল*(১৯৮২), *একাঙ্কিকা*(১৯৪৫), *রাজার জন্মদিন* (১৯৪৬), *বেশরিয়তি* (১৯৪৭), *পলাশী ব্যারাক* (১৯৪৮), *ফিটকলাম* (১৯৪৮), *আপনি কে* (রচনা ১৯৪৮, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫), *নষ্ট ছেলে* (১৯৫০), *মিলিটারী* (১৯৫০), *দণ্ড* (১৯৬৬), *দণ্ডধর* (১৯৬৬), *একতলা দোতলা* (১৯৬৫), *কুপোকাৎ* (১৯৬৬), *মর্মান্তিক* (১৯৬৭), *বংশধর* (১৯৬৭)

রূপান্তরিত নাটক : *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৭), *রূপার কৌটা* (১৯৬৯), *জনক* (১৯৭০), *স্বামী সাহেবের অনশনব্রত*(১৯৪৬), *জমা খরচ ও ইজা* (১৯৬৮),

মহারাজ (১৯৬৮), *গুর্গন খাঁর হীরা* (১৯৬৮), *ললাট লিখন* (১৯৬৯), *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০)

অনূদিত রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক : শেকসপীয়রের *ওথেলো*, টেনেসী উইলিয়ামস-এর এ স্ট্রীটকার নেম্‌ড্‌ ডিজায়ার অবলম্বনে *গাড়ীর নাম বাসনাপুর*, রোমিও-জুলিয়েট, শেকস্‌পীয়রের মাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নার্থিং-এর অনুবাদ *অকারণ ডামাডোল*, জর্জ বার্নার্ড শ'র *ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান*, ইউজীন ও'নীল মর্নিং বিকাস্‌ ইলেকট্রার অনুবাদ *ইলেকট্রার জন্য শোক*, শেরিডানের *দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল*।

মুফাখ্‌খারুল ইসলাম : *আউলাদ* (১৯৫৮), *মুর্‌শিদ* (১৯৫২)

মুম রহমান : *শেষ পূর্ণিমা*

মুশতারী শফি : *বিধ্বস্ত বাসনা*

মৃত্তিকা চাকমা : *দেবংসি আহ্‌ধর কালা ছাবা* (১৯৮৯), *গোঝেন* (১৯৯০), *মহেন্দ্রের বনভাঝ* (১৯৯১), *এক জুর মানেক* (১৯৯২), *জোঘ্য* (১৯৯৪), *হক্কানীর ধনপানা* (১৯৯৯), *এগাত্তুরের তরনী* (২০০১), *ভূদ* (২০০২), *চিত্রনদীর পারে* (২০০৫)

মোকাররম হোসেন টুলা : *ঝিনেদা থেকে বলছি* (২০০৪), *পাওয়া হয় নাই পথ ভুলিয়া* (২০০৫)

পথনাটক : *পিয়ার ঘাটের বাঁশী* (১৯৯৭), *বয়াতীল বিলাপ* (১৯৯৮), *মিলন হবে কতোদিনে* (২০০১)

মোজাহার হোসেন : *জালিম* (১৯০৫)

মোজাহারুল ইসলাম : *বিচার* (১৯৫৬)

মোনাজাতউদ্দিন : *ননপলিটিক্যাল* (১৯৭৯), *বাক্স এক* (১৯৭৯), *বাক্স দুই* (১৯৭৯)

মোমেন খান : *কাল রাত্রি*

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস : *জাগ্রত বাঙালি*

মোহাম্মদ আবুল হাশেম : *গরীবের ক্ষেত* (১৯৫১)

মোহাম্মদ আমিন : *বাতাসে লাশের গন্ধ* (১৯৯২), *জেগে ওঠে জলেশ্বরী* (১৯৯৬), *জলশিকারী*, *প্রেক্ষাপট গণতন্ত্র* (১৯৯১), *গোলমালের জম গোলমালের আযম* (১৯৯২)

মোহাম্মদ ইসহাক রেজা চৌধুরী : *চক্রজাল* (১৩৫৪)

মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ : *কিংশুকে যে মরুতে* (১৯৭৪)

মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন : *বিষাদ-সিন্ধু* (২০০৭), *বিষাদরূপ সিন্ধু* (২০০৭), *৭১'এর গল্পগাথা* (১৯৯৭), *আর কতোদিন* (১৯৯৮), *ঘুনপোকা* (১৯৯৯), *মান্যবর ভুল করেছেন* (২০০১), *উল্টোরথের যাত্রী* (২০০৩)

মোহাম্মদ নেজামউল্লাহ : *শহীদ সেরাজ* (১৯৫২)

মোহাম্মদ বারী : *সমায়ের প্রয়োজনে*

মোহাম্মদ সোলায়মান : *জরীপ* (১৯৫৭)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় : *মৃত্যুসংবাদ* (১৯৭৫)

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী : *রাজাকারের দেশে* (১৯৯০), *এখনও সময় আছে* (১৯৯২)

মোঃ আলাউদ্দিন : *রক্তগোলাপ* (১৯৬৮), *নকল মানুষ* (১৯৬৮), *বোবা কান্না* (১৯৬৬), *আপট্রেন* (১৯৬৬), *একটি তিলের জন্য* (১৯৭৯), *চরিত্রের সন্ধানে নাট্যকার* (১৯৭৯), *পৃথিবী ঘোরে* (১৯৭৯), *কাচমহল* (১৯৭৭), *চিতাপ্রান্তর* (১৯৯৬), *রক্ত দিয়ে আনলাম* (১৯৭২)মোসলেহ উদ্দীন *সিনেমা বিভ্রাট*

মোঃ জালাল উদ্দিন : *গাঁয়ের বুকে* (১৯৬৪), *দুই ভাই* (১৯৬৫), *ডাকাত* (১৯৬৭), *অনেক আঁধার* (১৯৬৭), *ভিখারীর ছেলে* (১৯৬৭), *ভিখারীর মেয়ে* (১৯৬৭), *কুসুম তারা* (১৯৬৭), *রাজ্যহারা* (১৯৬৮), *প্রীতি চন্দন* (১৯৬৮), *মালীর ছেলে* (১৯৬৮), *রাজরক্ত* (১৯৬৮), *রক্তে রাঙা বাংলাদেশ* (১৯৭২), *কিছু খেতে দাও* (১৯৭৫), *রঙ্গিলা একটি মেয়ের নাম* (১৯৯৬), *মাঝির মেয়ে* (১৯৯৬)

মোঃ মতিউর রহমান : *রাজসিংহাসন* (১৩৮২), *গরীবের আর্তনাদ* (১৩৮৫), *যৌতুক হলো অভিশাপ* (১৩৮৮), *মানুষ অমানুষ* (১৩৮৯), *ঘুমন্ত সমাজ* (১৩৯৩), *শাহী ফরমান* (১৯৯৬), *মধুমালতী রূপকুমার* (১৯৯৭)

মোঃ মহসিন : *একখণ্ড জমি* (১৯৮৫), *গেদু মিয়ার বস্তি* (১৯৮৫)

মোঃ ময়নুল হক : *পল্লীশোষক* (১৯৫৭), *নরপিশাচ* (১৯৬৮)

মোঃ রওশন আলী : *বিলাসী* (১৯৯৮), *হৈমন্তী* (১৯৯৮), *কমলান্তের উইল* (২০০২), *দুই বিঘা জমি* (২০০৩), *হৃদয়ে নতুন সূর্য* (২০০২)

মোঃ রফিকুল ইসলাম : *ভিটে* (১৯৯৪), *সূর্যমুখো* (২০০২)

পথনাটক : *বিজয়ের ২৫ বছর* (১৯৯৪), মা-ই সব (২০০৩)

রতনকুমার ঘোষ : *ভূমিকম্পের আগে* (১৯৭৭), *ভূমিকম্পের পরে* (১৯৭৭), *ভোরের মিছিল* (১৯৭৭), *সমুদ্র সন্ধানে* (১৯৭৮), *অমৃতস্য পুত্রা* (১৯৮৪), *দোহাই হাসবেন না* (১৯৭৯), *শেষ বিচার* (১৯৭৪), *রাজার বাড়ী কতদূর* (১৯৭৪), *পিতামহের উদ্দেশে* (১৯৭৫), *আলোকিত যৌবন* (১৯৭৬), *রাজঅভিষেক* (১৯৭৬),

রণেশ দাশগুপ্ত : *ফেরী আসছে* (১৯৭২)

রফিকুল ইসলাম : *একটি পতাকা* (১৯৮৮), *শকুনের দৃষ্টি* (১৯৯০), *আবার কেন রক্ত ঝরে* (১৯৯২), *রক্তাক্ত বর্ণমালা* (১৯৮৯),

পথনাটক : *শিউলী* (১৯৯৯), *বাঁচতে চাই* (২০০১)

রবিউল আলম : *জননীর মৃত্যু চাই* (১৯৭৪), *অথচ অন্ধকার* (১৯৭৫), *সমাপ্তি অন্যরকম* (১৯৭৫), *আকাঙ্ক্ষিত একজন* (১৯৭৬), *কখনো সৈকতে* (১৯৭৮), *শাড়ী বাড়ী গাড়ী* (১৯৭৭), *এক যে ছিল দুই হুজুর* (১৯৭৭), *অ্যাজ ইউ লাইক ইট* (১৯৯২), *রাজা সাহিত্য কারখানা* (১৯৯৬)

রবিউল হাসান : *জননীর মৃত্যু চাই*

রশীদ হায়দার : *তৈল সংকট* (১৯৭৪)

রাজীব হুমায়ুন : *নীলপানিয়া* (১৯৯২)

রাজিয়া খান : *আবর্ত* (১৯৫৫), *তিনটি একাঙ্কিকা* (১৯৮৬), কে. এম. শমসের আলী *সোনার কলম* (১৯৫৫)

রাজিয়া মহ্‌বুব : *সাগর কন্যা* (১৯৬০)

রানা নাসের : *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৮৩৬), *একটি নবজাতক শিশু এবং কিন্তু* (১৯৮৫), *এ লাশ রাখবো কোথায়* (১৯৮৩), *আসমানী* (১৯৮৬), *পাঁচ শয়তানের ব্লাড প্রেসার* (১৯৮৮)

রামেন্দু মজুমদার : *ক্রীতদাসের হাসি*

রাহুল আনন্দ : *বিষ পাঁচালী*, *নো ম্যান ল্যান্ড*, *মান্দার*

রেজা চৌধুরী : *চক্রজাল*

রেজানুর রহমান : *চূড়ান্ত ঘোষণা* (১৯৮৩), *মিছিল* (১৯৮৩), *হ-য-ব-র-ল* (১৯৮৭), *কুকুর হইতে সাবধান* (১৯৯০), *আনন্দ ঢেলা* (১৯৮৯), *বিবৃতি* (১৯৮৯), *উৎসব* (১৯৯০), *রাহু* (১৯৯০), *রং তামাশার খেলা* (১৯৯০), *এক্কাদোক্কা* (১৯৯১), *তাহাদের কথা* (১৯৯৪), *নিঃশব্দ নিয়তি* (১৯৯৬), *হাট্টিমাটিমটিম* (২০০২)

লায়লা সামাদ : *বিচিত্রা* (১৯৬০), *মন্তব্য নিস্প্রয়োজন* (১৯৭৫), *লাল লণ্ঠন*

লিয়াকত আলী লাকী : *সোনাই মাধব* (১৯৯৩), *রঙ্গিণী*, *ববি* (১৯৯৬) ও *বাংলার মুখ* (২০০৪)

পথনাটক : *রয়েল বেঙ্গল টাইগার* (১৯৮৪), *নির্মূল* (১৯৯৩), *নির্মাণ* (১৯৯৮), *মহাপ্রয়াণ* (১৯৯৬)

লুৎফর রহমান : *বঞ্চিত বাংলার উপাখ্যান*

শওকত ওসমান : *মলিয়েরের পাঁচটি নাটক* (১৯৬৫), *কাঁকরমণি* (১৯৪৯), *তস্কর ও লস্কর*(১৯৪৫), *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *বাগদাদের কবি* (১৯৫২), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৮), *ডাক্তার আবদুল্লার কারখানা* (১৯৭৩), তিনটি ছোট নাটক (১৯৮৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)

শফিকুল কবির : *জীবন সংগ্রাম* (১৯৫৫)

শহিদুল হক খান শ্যানন : *ঘুণ* (১৯৯৮), *বাইদ্যানীর গান* (১৯৯৮), *লাল নীল কাব্য* (২০০২), *সে এক রাজ্য* (২০০২), *নরক*

পথনাটক : *সেই দিনগুলি* (১৯৯৮), *পুকুর চুরি* (২০০১), *ঘাস* (২০০২)

শহীদুল আমিন: *মঞ্চ নাটক সমগ্র* (২০০৫)

শহীদুল হক খান : *রক্ত শপথ*

শান্তনু কায়সার : *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৯৪)

শামীম আহসান : *বাহানা*, *জয়ী*

শান্তিময় চাকমা : *যে দিনত যে কাল* (১৯৮৪), *ঝিঝু রামর স্বর্গত যানা* (১৯৮৫), *আন্ধারত জুনি পহ্‌র* (১৯৮৪), *ঝরা পাদার জীংকানী* (১৯৯৪)

শাহ আলম বাবলু : *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮৬), *ফ্যাসাদের দিনকাল* (১৯৮৮), *হায়রে কোষ্টা* (১৯৮৬), *গাঁজা আমার রাজা* (১৯৮৮)

পথনাটক : *কালের সাক্ষী* (১৯৮৮), *আমরা সবাই* (১৯৮৮)

শিশির রহমান : *পদ্মাপাড়ের কথকতা*, *নিলামের বাজার*, *হাসির বিয়ে*, *কুয়াশামুক্ত স্বপ্ন*, *পঞ্চভূতের রং তামাশা*, *গোয়েন্দার বার বছর* (১৯৯২), *রাজা ও শ্রমিক* (১৯৯৩), *কথাডা কি হাছানি* (১৯৯৩)

শাহ্‌জাহান ঠাকুর : *অমর নির্দেশ*

শাহজাহান প্রামাণিক : *অরণ্যে কি*, *রানার রং সাইডে*, *ময়না এখন মুক্ত*, *আমি যদি রাজা হতাম*, *লম্পট রাজার ভণ্ড হুজুর*, *রক্তসূর্য*, *একটি ফুলের জন্য*

গীতিনাট্য : *রক্ত লাল*, *হাজার কোকন জাগবে*, *আমার বাংলা*, *ক্ষেমজুরের দূর্গ*

শাহনুর খান : *পেণ্ডলামের খুনী* (১৯৭২)

শাহমান মৈশান : *অশেষকৃত্য* (২০০৭)

শাহাদত আলী খান : *ভুল* (১৯৫৫)

শাহাদাৎ হোসেন : *শা-জাহান-আলমগীর সংবাদ* (১৯৪১), *জাহাঙ্গীরের আত্মসমর্পণ* (১৯৪২)

শাহিদা খাতুন : *আজাদী* (১৯৫২)

শুভাশিস সিনহা : *মেঘ বৃষ্টি রোদ* (১৯৯৬), *আজবপুরের বর্ষবরণ* (১৯৯৭), *নারাগ ডাঙর ইলি* (মণিপুরী ভাষায়) (১৯৯৭), *নাই রাজার রাজদরবার* (১৯৯৭), *কানাইলালের সানাই* (২০০০), *প্রতিরূপকথা* (২০০৭)

শেখ আকরাম আলী : *মাদারীর খেলা* (১৯৯১), *এখনো যুদ্ধ* (১৯৯৩), *লাশ '৭৪* (১৯৯৩), *সূর্যোদয়ের আগে* (১৯৯৩), *শকুন* (১৯৯৭)

শেখ নজরুল ইসলাম : *নির্বাসিত সত্য* (১৯৮১), *একালের তীতুমীর* (১৯৮৫), *দর্পণ* (১৯৮৫), *আলো থেকে অন্ধকার* (১৯৮১), *এই দেশে* (১৯৯২)

শেখ নুরুল ইসলাম : *মানুষ বাঙালি*

শেখ শামসুল হক : *চাষীর ভাগ্য* (১৩৬৬-২য় সং.), *দাওয়াল* (১৯৬০), *বরণ-ডালা* (১৯৬৮)

শেখ হাবীবুল্লাহ : *রক্তের বিনিময়ে*, *বীর বাঙালি*, *মুজিবের বাংলা*, *রক্ত সূর্য*, *জল্লাদের কারসাজি*

শোভনময় ভট্টাচার্য : *চিক্কুর* (১৯৯৫), *শিকল* (১৯৯৭), *গ্রহণ* (১৯৯৯), *সূর্যসেন* (২০০৭, ২০০২ প্র. অ.), *গন্তব্য* (২০০২)

পথনাটক : *একাত্তরের তেলেসমাতি* (১৯৯৫), *এপিঠ-ওপিঠ* (১৯৯৯), *২১'র ইতিবৃত্ত* (২০০০), *দালাল* (২০০০), *দানব* (২০০৩)

শ্যামল ভাদুড়ী : *তথাপি সূর্য আসে*, *ধ্বস*

পথনাটক : *রক্তবীজের বংশধর*

শংকর সাওজাল : *মহারাজার অনুপ্রবেশ*, *টিয়া পাখির সমাচার*, *সার্কাস*, *জাগে লক্ষ নূর হোসেন*, *নির্বাসন*

সদরুল পাশা: *ম্যাসাকার*

সনজীব বড়ুয়া : *বাজলো রাজার বারোটা* (১৯৭৯), *মহারাজ অসুস্থ* (১৯৯১), *পাথর প্রতীমা* (১৯৯৩)

***সরফরাজ খাঁ* :** *আনারকলি* (১৯৪৫), *নবাব আলীবর্দী*

সাইদুস সাকলায়েন : *দ্য লেসন*

সাইমন জাকারিয়া : *কবি, এ নিউ টেস্টামেন্ট অফ রোমিও*

সাইফুর রহমান মিরন : পথনাটক : *এখানে এখনো* (১৯৯২), *গণরায়* (১৯৯২), *লক্ষ প্রাণের মূল্যে* (১৯৯৩), *যুদ্ধবাজ* (১৯৯৪)

সাঈদ আহমদ : *কালবেলা* (১৯৭৬, ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত হয়ে প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩), লোককাহিনি-ভিত্তিক রূপক নাটক *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯-এ প্রথম প্রকাশ, রচনাকাল ১৯৬৪-৬৬); দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত *মাইল-পোস্ট* (১৯৭৬, ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত হয়ে প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬), *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৮), *Three plays of Sayeed Ahmed* (1979), *শেষ নবাব* (১৯৮৯)

সাঈদ তারেক : *সিন্দাবাদের ভূত*

সাজেদুল আউয়াল : *ফণীমনসা* (১৯৭৯, ১৯৮০ প্র. অ.)

সাদেক বাচ্চু : *কতদিন এই দিন* (১৯৯১), *কতিপয়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯২), *কুলাঙ্গার* (১৯৯৫)

সাবিনা বারী লাকী : *জেনেশুনে বিষ করেছি পান* (১৯৯৯), *আমাদের পৃথিবী* (২০০২)

সামসুজ্জোহা বাবলু : *বাংলার সন্তান* (১৯৭৩), *নাটক কিন্তু নাটক নয়* (১৯৭৭), *বিলাতী* (১৯৮৬), *আজব দেশের আজব রাজা* (১৯৮৬), *নবাব আলী নবাবী* (১৯৮৬), *দেবী* (২০০০)

সায্‌যাদ কাদির : *সাড়ে সাতশো সিংহ* (১৯৭৬), *অপচয়ের যন্ত্রপাতি*

সারোয়ার চৌধুরী : *কাকতারুয়ার পালা* (১৯৯৮), *এখনো মীরজাফর* (১৯৯৮)

সালাম সাকলাইন : *কালো ভেড়া বধ কর* (১৯৮৯)

পথনাটক : *বানরের পিঠা বণ্টন* (১৯৮৬), *মৃত্যুঞ্জয় মানুষেরা* (১৯৯১), *জাহেন আলীরে ধর* (১৯৮৪), *কথাকীত্তন* (১৯৯২), *শিবানী সুন্দরী* (২০০১), *হামেদ আলীর স্বর্গদর্শন* (১৯৯২)

সালাহউদ্দীন আহমদ মিল্টন : *সপাহীবীর মঙ্গল পাণ্ডে* (২০০১), *জলতরঙ্গ* (২০০১), *নষ্ট প্রহর শেষে* (২০০২), *উদরে উঁই পোকা* (২০০২), *মানুষ* (২০০৩)

পথনাটক : *রক্তাক্ত সংগ্রাম* (১৯৯৭), *তৈল মর্দন* (২০০১), *একজন মুক্তিযোদ্ধা* (২০০২), *নো তাফালিং* (২০০৩)

সালে আকরাম : *নিরঞ্জন ফিরে এসো*

সিকান্‌দার আবু জাফর : *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫), *মহাকবি আলাউল* (১৯৬৬), *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) ও *মাকড়সা* (১৯৫৯), *সিংগের নাটক* (১৯৭১)

সিরাজ হায়দার : *আলো একটু আলো* (১৯৭৬), *বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন* (১৯৭৬), *পাগলা কুকুর* (১৯৭৭)

সিরাজুল ইসলাম : *ট্যাবলেট ক্যাপসুল ও ফাইল* (১৯৭২), *সুতরাং পরে হবে* (১৯৭৩), *জলসড়ক* (১৯৭৬), *যুগল সমাধি* (১৯৭৮), *স্পেশাল ট্রেন* (১৯৮০)

পথনাটক : *রাক্ষস* (১৯৭৯), *ভেলকিবাজী* (১৯৯৪), *এদের ধরিয়ে দিন* (১৯৮৯), *সময়ের সাহসী* (১৯৯০), *ফান্দিছে ১ম ও ২য় পর্ব* (১৯৯১ ও ১৯৯২), *মায়ের ডাক* (১৯৯৫)

সুচরিত চৌধুরী : *হাসির রাজা গোপাল ভাঁড়* (১৯৯৩), *জন্মভূমি* (১৯৯৭), *হাইজ টু নো লেট* (১৯৯৯), *মহাকাল* (২০০২), *আবার নন্দিনী* (২০০৪), *ভূত* (২০০৫), *ভবিষ্যৎ* (২০০৫), *একটি অমীমাংসিত রহস্য* (২০০৫)

পথনাটক : *জুঁইখালীর সংগ্রাম* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন* (১৯৯৫), *বীরকন্যা* (১৯৯৬), *বিজয়ী বাঙ্গালী* (১৯৯৮), *মৃত্যুবীজ* (১৯৯৯), *চেৎ তো গং* (২০০১), *নেই মানুষের দেশে* (২০০৩)

সুনন্দ বাশার : *নীল ময়ূরের যৌবন* (২০০৭)

সুনীল কুমার : *একই প্যাচাল* (১৯৯৫), *আশ্রয়* (১৯৯৬), *অমাবশ্যায় চন্দ্রমুখ* (১৯৯৮), *কেষ্টা*

পথনাটক : *যদি এমন হয়* (১৯৯৪), *নগরভবনের নাগর* (১৯৯৭), *ফাগুনের চোখে জল* (১৯৯৮)

সুভাস দাস : *আমার নাম সুলতান* (১৯৮২), *মুক্তিযোদ্ধা সুলতান* (১৯৮২), *আমি মেহেদী বলছি* (১৯৮৪), *নবাব* (১৯৮৬), *চেরাগ আলীর কিচ্ছা* (১৯৮২)

পথনাটক : *নসু মিয়ার প্যাচাল* (১৯৮২), *পলাশীর সুবোধ শয়তান* (১৯৮৬)

সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ : *বঙ্গ গৌরব* (১৯৫৩)

সেলিম আল দীন : *অনিকেত অন্বেষণ* (১৯৭০), *নীল শয়তান : তাহিতি ইত্যাদি* (১৯৭২), *সর্প বিষয়ক গল্প* (প্রথম প্রযোজনা : ১৯৭২), *জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (রচনা ও প্রযোজনা : ১৯৭২), *এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা* (১৯৭৩), *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* (১৯৭৩), *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ* (১৯৭৩), *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী পরে শুধু মুনতাসীর* (১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫ প্র. অ.), *পথনাটক চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারী* (১৯৭৭), *শকুন্তলা* (১৯৭৭/৭৮) এবং *আতর আলীদের নীলাভ পট* (১৯৭৫), *কিত্তনখোলা* (১৯৮০, ১৯৮১ প্র. অ.), *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৫), *হাত হদাই* (১৯৮৯), *চাকা* (১৯৯০, ১৯৯১ প্র. অ.), *হরগজ* (১৯৯২), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩), *বনপাংশুল* (১৯৯৮) ও *প্রাচ্য* (২০০০), *সংবাদ কার্টুন*, *নিমজ্জন* (২০০৪), *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭), *ধাবমান ও পুত্র* (২০০৭)

সৈকত খন্দকার খোকন : *ঘুমপাড়ানীর কড়ি* (১৯৯১), *শ্যাডো* (২০০২)

পথনাটক : *মগজ ধোলাই* (১৯৮৭)

সৈয়দ আবদুল হাই : *ছারপোকা*

সৈয়দ আলী আহসান : *মুশতরী* (১৩৫০), *কোরবানী* (১৩৫০), *জোহর, ইডিপাস* (১৯৫২)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : *বহিপীর* (১৯৬০), *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২), *সুড়ঙ্গ* (১৯৫৫), *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩)

সৈয়দ নূরুল হুদা : *লায়লী মজনু*

সৈয়দ মকসুদ আলী : *ইউরেকা* (১৯৫৯)

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : *কিং লীয়ার* (১৯৯৩)

সৈয়দ মহিদুর রহমান : *মোকরফ ফেরেস্তার দেশে, ৩৪'এর প্যারাসাইট, সাবধান ওরা আছে*

পথনাটক : *ইবলিশের দরবার, এখানে হায়েনার মুখ, সাপের খেইল, আমরা দিওয়ানা, লীলা, শকুন*

সৈয়দ মুফাজ্জল সাদাত মুক্তা : *অন্যতম জঘন্য* (১৯৯৫), *নিয়ামত আলীর সংসার* (২০০১)

পথনাটক : *পিচ্ছিল রাস্তা* (১৯৯৭)

সৈয়দ শামসুল হক : *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮৮, ১৯৮২ তে প্র. অ.), *ঈর্ষা* (১৯৯১), *বাংলার মাটি বাংলার জল*, *খাট্টা তামাশা* (১৯৯৫ প্র. অ.), *আমাদের জন্ম হলো* (১৯৯১ প্র. অ.), *তোরা সব জয়ধ্বনি কর*, *যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* (১৯৮৭, ১৯৮৬ প্র. অ.), *মুখোশ* (১৯৯৩ প্র. অ.), *কৃষ্ণপক্ষ*, *ম্যাকবেথ* (১৯৮৩ প্র. অ.)

সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি : *অস্থির সুস্থিতি*

সোলায়মান মজিদ : *মন্ত্রী কদম আলী* (১৯৮৪), *কৃষ্ণছবি নরকে* (১৯৮৪), *বাদীপক্ষ সরকার* (১৯৮৬), *একুশের গপ্পো* (১৯৯০), *নির্বাসিত সুন্দরী* (১৯৮৫), *পাগলাসুমারী* (১৯৯৮), *কংসে প্রেম ধবংশ* (১৯৯৪), *দেশ ও সখীমন* (১৯৯৮)

হাবিব আহ্‌সান কোহিনুর : *পলাতক পালিয়ে গেছে*, *তরুণ ও বহমান ক্ষত*, *সাক্ষাৎকার*, *ব্যক্তিগত পৃথিবী*

হাবিবুর রহমান : *মায়াকানন* (১৯৭৬), *আলোর ফুল* (১৯৭৬)

হাবিবুর রহমান হাবিব : গরল (১৯৯৩), ব্যামো (১৯৯৩)

হাবিবুল হাসান : *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণ* (১৯৭৩), *কৃষ্ণচূড়ার লাল কিম্বা রজনীগন্ধার সাদা*, *আরেকটা শহর চাই*, *কসাই* (১৯৭৭)

হাবীবুর রহমান : *বিড়ম্বনা* (১৯৭০), *কালের পুতুল* (১৯৭০)

হারুনূর রশিদ : *একদিন এক রাত* (১৯৬১), *বিফল স্বপ্ন* (১৯৬৫)

হুমায়ূন আহমেদ: *স্বপ্ন*, *অসময়*, *১৯৭১*, *নৃপতি*, *মহাপুরুষ* (১৯৮৬ প্র. অ.) হুমায়ূন আহমেদের মঞ্চনাটক। কিশোর নাটিকা *স্মৃতিচিহ্ন*

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য : *একুশের নাম বাংলাদেশ* (১৯৭৭), *জনতার আদালত* (১৯৭৭)

বাংলাদেশের প্রবন্ধ

অজয় রায় : *বাঙলা ও বাঙালি* (১৯৭৭), *বাংলাদেশের অর্থনীতি : অতীত ও বর্তমান* (১৯৭৮), *আমাদের জাতীয়তার বিকাশ* (১৯৮২), *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান* (১৯৮৩), *রাজনীতি কি ও কেন* (১৯৮৬), *পুঁজিবাদী অর্থনীতি* (১৯৮৬), *বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ* (১৯৮৭), *সাম্প্রতিক* (১৯৮৬), *শিক্ষানবিশীর হাতেখড়ি* (১৯৯০)

অনুপম সেন : *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ : সমাজ অর্থনীতির স্বরূপ* (১৯৮৮)

অনুপম হায়াৎ : *চলচ্চিত্রের খোলা জানালায়* (১৯৮২), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* (১৯৮৭), *নাট্যাঙ্গনে নজরুল* (১৯৯৭), *নাট্যকার নজরুল* (১৯৯৭)।

জীবনী : *ফতেহ লোহানী* (১৯৯৪), *সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর* (১৯৯৫)

আকিমুন রহমান : *বিবি থেকে বেগম* (১৯৯৬)

আজহার ইসলাম : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ : আধুনিক যুগ* (১৯৬৯), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ : প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (১৯৭৭), *সাহিত্যে বাস্তবতা* (১৯৮৫), *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (১৯৯২), *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ* (১৯৯৬)

আজিজুল হক : *বাংলাদেশ : সমাজ রাজনীতি গণতন্ত্র* (১৯৯২)

আতাউর রহমান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (১৯৬৩), *কবি নজরুল* (১৯৬৮), *নজরুল কাব্য সমীক্ষা* (১৯৭২), *নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি* (১৯৯৩), *নজরুল জীবনে প্রেম ও বিবাহ* (১৯৯৭)।

জীবনী : *বেনজীর আহমদ* (১৯৯৪)

আতোয়ার রহমান : *সাহিত্য-সংলাপ* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা* (১৯৭৭), *সাহিত্য ও বিবিধ ভাবনা* (১৯৮১), *মেলা* (১৯৮৮), *একাত্তর : নির্যাতনের কড়চা* (১৯৯২), *সূর্যবাদ* (১৯৯২), *শিশু সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (১৯৯৪), *নজরুল বর্ণালী* (১৯৯৪), *লোককৃতি কথাগুচ্ছ* (১৯৯৭), *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯৭)

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৭৫), *স্বরূপের সন্ধানে* (১৯৬৯), *Social Aspects of Endogenous Intelectual Creativity* (১৯৭৯), *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the official Library and Records* (১৯৮১), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ* (১৯৮৩), *পুরনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী* (১৯৮৮), Creativity, Reality & Identity (), Cultural Pluralism (১৯৯৩), Identity, Religion and Recent History (১৯৯৫)

আনু মুহাম্মদ: *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন* (১৯৮৩), *গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল* (১৯৮৮), *ক্রান্তিকালের বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য* (১৯৯১), *বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক* (১৯৯২), *অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র : সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা* (১৯৯২), *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি সম্ভব?* (১৯৯৫), *সমাজ সময় ও মানুষের লড়াই* (১৯৯৪), *কলম্বাসের আমেরিকা 'আবিষ্কার' ও বহুজাতিক মানুষেরা* (১৯৯৫), *নারী, পুরুষ ও সমাজ* (১৯৯৭), *মানুষের সমাজ* (২০০৬)

আনোয়ার পাশা :*সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল* (১৯৬৭)

আনোয়ারুল করীম: *বাউল কবি লালন শাহ* (১৯৬৩), *লালন গীতি* (১৯৬৬), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক* (১৯৬৯), *বাউল সাহিত্য ও বাউল গান* (১৯৭১), *ফকির লালন শাহ* (১৯৭৬), *রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ* (১৯৭৭), *লালনের গান* (১৯৮৪), *কবিতার কথা* (১৯৯১), *The bauls of Bangladesh* (1980), *The aborigines of Kustia* (1979), *The Myths of bangladesh* (1988),

আফজালুল বাসার : *নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন* (১৯৮৬), *বাংলা সাহিত্য সমালোচনা* (১৯৯৩),

আবু জাফর : *রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা* (১৯৮৫), *গল্পকার হাসান আজিজুল হক* (১৯৮৮), *সাহিত্যে সমাজ ভাবনা* (১৯৯৫), *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা* (১৯৯৬)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব-পাকিস্তানী সহিত্য* (১৯৬৪), *Sciology of bengal politics* (১৯৭৩), *সোচ্চার উচ্চারণ* (১৯৭৭), *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (১৯৭৯), *মধ্যপ্রাচ্য ইসলাম ও সমকালীন রাজনীতি* (১৯৮৫), *সোভিয়েট দেশে মুসলিম জীবন* (১৯৮৬), *লোকায়ত সমাজ ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি* (১৯৮৮), *বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা* (১৯৮৯)

আবু হেনা মুস্তাফা কামাল : *শিল্পীর রূপান্তর* (১৯৭৫) ও *কথা ও কবিতা* (১৯৮১)

আবুল আহসান চৌধুরী : *কুষ্টিয়ার বাউল সাধক* (১৯৭৪), *সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি* (১৯৭২), *জলধর সেন* (১৯৯০), *লালন শাহ* (১৯৯০), *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার* (১৯৯৮), *মুনসী শেখ জমিরুদ্দরুদ্দীন* (১৯৮৯), *ভাই গিরিশচন্দ্র সেন* (১৯৮৯), *মোহাম্মদ দাদ আলী* (১৯৯২), *পাগলা কানাই* (১৯৯৫), *নেয়ামাল বাসির* (১৯৯৩), *মীর মশাররফ হোসেন* (১৯৯৩), আজিজন্নেসা খাতুন (১৯৯৫), মনের মানুষের সন্ধানে (১৯৯৫), *সমাজ, সমকাল ও লালন সাঁই* (১৯৯৬), *জগদীশ* গুপ্ত (১৯৮৮), *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা* (১৯৯৬), *লোকসংস্কৃতির বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৭), *বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন* (১৯৯৭), ভাষা আন্দোলনের দলিল (১৯৮৮)

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ: *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (১৯৮৪)

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া : *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি* (২ খণ্ড)

আবুল ফজল : *বিচিত্র কথা* (১৯৪০), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (১৯৬১), *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৫), *বিদ্রোহী কবি নজরুল* (১৯৫৭), *সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র* (১৯৬৮), *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০), *মানবতন্ত্র* (১৩৭৯), *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৪), *শুভবুদ্ধি* (১৯৭৪), *একুশ মানে মাতা নত না করা* (১৯৭৮), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ* (১৯৭৯)

আবুল মাল আবদুল মুহিত : *বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য* (১৯৯১)

আবুল কাশেম চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৮২০-১৮৪৮)* (১৯৮৩),

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন : *পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৬৯), *আরবী বাংলা অভিধান*, *সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (১ খণ্ড, ১৯৬৪-১৯৬৯)

আবুল কাসেম ফজলুল হক: *মুক্তিসংগ্রাম* (১৯৭২), *কালের যাত্রার ধ্বনি* (১৯৭৩), *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন* (১৯৭৬), *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৯), *নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি* (১৯৮১), *মানুষ ও তার পরিবেশ* (১৯৮৪), *যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা* (১৯৮৫), *মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব* (১৯৮৭), *রাজনীতি ও দর্শন* (১৯৮৮), *আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*

আবুল মনসুর আহমেদ : *পাক বাংলার কালচার* (১৯৬৪), *পাক বাংলার কালচার* (১৯৬৪)*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৯), *শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু* (১৯৭২),

আবদুর রশীদ সিদ্দিকী : *চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্ব*, *চাটিগ্রামী রোয়াই তত্ত্ব*

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ : *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ* (১৯১৪), *পুঁথি পরিচিতি* (আহমদ শরীফ সম্পা.) (১৯৫৮), *প্রাচীন পুঁথির বিবরণ* (অপ্রকাশিত)। চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস *ইসলামাবাদ* (সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পা.)(১৯৬৪) এবং মুহাম্মদ এনামূল হকের সহযোগে *আরাকান রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৩৫)

আবদুল কাদির : *ছন্দ সমীক্ষণ* (১৯৭৯), *বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা* (১৯৪৪), *মওলানা মোহাম্মদ নাঈমুদ্দীন* (১৯৭৯), *কাজী আবদুল মওদুদ* (১৯৭৬), *লোকায়ত সাহিত্য* (১৯৮৫)

আবদুল গফুর সিদ্দিকী : *মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*(১৯২২), *শহীদ তিতুমীর* (১৯৬১), *বিষাদ-সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি*

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *শুদ্ধতম কবি* (১৯৭০), *জীবনানন্দ দাশের কবিতা* (১৯৭৪), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (প্রথম খণ্ড ১৯৭৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৭), *নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা* (১৯৭৭), *করতলে মহাদেশ* (১৯৭৯), *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা* (১৯৮০), *বেগম রোকেয়া* (১৯৮৩), *আমার বিশ্বাস* (১৯৮৪), *ছন্দ* (১৯৮৫), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (১৯৮৬), *নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর* (১৯৮৭), *চেতনায় জল পড়ে পাতা নড়ে* (১৯৮৯), *পুনর্বিবেচনা* (১৯৯০), *দরোজার পর দরোজা* (১৯৯১), *ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৩), *বিবেচনা পুনর্বিবেচনা* (১৯৯৪), *শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ* (১৯৯৮)

আবদুল হক : *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২) ও *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৮৬)। এছাড়া লিখেছেন : *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *সাহিত্য ও স্বাধীনতা* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলন : আদিপর্ব* (১৯৭৬), *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৪)

আবদুল হাফিজ : *লোককাহিনীর দিগ দিগন্ত* (১৯৬৮), *আধুনিক সাহিত্য চর্চা* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য* (১৯৭৫), *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ* (১৯৭৫), *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়* (১৯৭৬)

আবদুল হালিম :*ইতিহাসের রূপরেখা* (১৩৭৬), *ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি* (১৯৭৩), *সমাজতন্ত্রের পরিচয়* (১৩৭৯), *বিশ্বজগতের পরিচয়* (১৯৭৫), *মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ* (১৯৭৭), *চিলি জনগণের অব্যাহত জয়যাত্রা* (১৯৭৪), *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা* (১৯৭৪), *শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ* (১৯৮০)

আবদুস সাত্তার : *অরণ্য জনপদে* (১৯৬৬), *The Manipuris* (1969), *Tribesmen of Mymensing* (1969), *Proud people the Murangs* (1969), *The Khasis* (1969), *The Marmas* (1970), *The Chakmas* (1970), *The Tipras* (1970), *The Santals* (1970), *The Oraons* (1970), *In the Sylvan Shadows* (1971), *Tribal Culture in Bangladesh* (1975), *Tribal Arts and Crafts of Bangladesh* (1978), *Tribal Music and Dance of Bangladesh* (1978), *The sowing of seeds* (1979), *আধুনিক আরবি সাহিত্য*, *আরবি লোকসাহিত্য*, *আরণ্য সংস্কৃতি*, *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, *আরবি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান*, *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম*, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, *ফারসি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান*

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৬), *উত্তর প্রজন্ম* (১৯৯২), *নিউইয়র্কের আড্ডায়* (২০০১), *মুখোমুখি* (২০০১), *ভালোবাসার সাম্পান* (২০০২)

আবদুল্লাহ আল-মুতী : *এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে* (১৯৫৫), *অবাক পৃথিবী* (১৯৫৫), *আবিষ্কারের নেশায়* (১৯৬৯), *রহস্যের শেষ নেই* (১৯৬৯), *বিজ্ঞান ও মানুষ* (১৯৭৫), *শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৫), *জানা অজানার দেশে* (১৯৭৬), *সাগরের রহস্যপুরী* (১৯৭৬), *আয় বৃষ্টি ঝেঁপে* (১৯৮০), *এ যুগের বিজ্ঞান* (১৯৮১), *মেঘ, বৃষ্টি রোদ* (১৯৮১), *ফুলের জন্য ভালবাসা* (১৯৮২), *সোনার এই দেশ* (১৯৮৩), *তারার দেশের হাতছানি* (১৯৮৪), *বিচিত্র বিজ্ঞান* (১৯৮৫), *বিপন্ন পরিবেশ* (১৯৮৫), *প্রাণলোক: নতুন দিগন্ত* (১৯৮৬), *বিজ্ঞানের বিস্ময়* (১৯৮৬), *ছবিতে আমাদের পরিবেশ* (১মখণ্ড-১৯৮৭, ২য়খণ্ড-১৯৯০), *টেলিভিশনের কথা* (১৯৮৭), *বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা* (১৯৮৮), *কীটপতঙ্গের বিচিত্র কথা* (১৯৮৮), *কাজী মোতাহার হোসেন* (১৯৮৮), *বিজ্ঞান এগিয়ে চলে* (১৯৯১)

আলমগীর জলিল : *মুসলিম মানস ও লোকসংস্কৃতি* (১৯৬৮), *বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি* (১৯৮৫), *শিশুসাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলিম লেখক* (১৯৮৮)

আল মাহমুদ : *কবির আত্মবিশ্বাস*, *দিনযাপন* (১৯৯০), *কবিতার বহুদূর* (১৯৯৭), *নারী নিগ্রহ* (১৯৯৭), প্রবন্ধ সংগ্রহ (২০০১)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *শিল্পীর সাধনা* (১৯৫৫), *সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু* (১৯৭৪), *নজরুল গবেষণা : ধারা ও প্রকৃতি* (১৯৯২), *মায়াকভস্কি ও নজরুল* (১৯৮৫), *রবীন্দ্র ক্ল্যাসিক আবিষ্কার* (১৯৮২), *সাহিত্য সমালোচনা* (১৯৮৯), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *সাহিত্য সমালোচনার ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত* (২০০০)

আলী রিয়াজ : *ভয়ের সংস্কৃতি* (১৯৯৪), *State, Class & Military rule : Political Economy of Martial law in Bangladesh* (1994), *বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর সংকট* (১৯৯৩), *দূরদেশ* (১৯৯৩), *গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম* (১৯৮৯), *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৭), *লেখকের দেশকাল* (১৯৮৪), *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্য* (১৯৮৩), *বাঙালী জাতীয়তাবাদ* (১৯৭৮)

আশরাফ সিদ্দিকী : *লোকসাহিত্য* (১৯৬৪), *কিংবদন্তীর বাংলা* (১৯৭৫), *শুভ নববর্ষ* (১৯৭৭), *লোকায়ত বাংলা* (১৯৭৮), *Folkloric Bangladesh* (1977), *Bengali Folklore* (1977), *Our Folklore Our \Heritage* (1977), *Tells From Bangladesh* (1976), *Bengali Riddles* (1961), *আবহমান* (১৯৮৭)

আহমদ ছফা : *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *বাঙলা ভাষা : রাজনীতির আলোকে* (১৯৭৫), *বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* (১৯৭৬), *বাঙালী মুসলমানের মন* (১৯৮১), *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭২), *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* (১৯৮০), *শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৯), *আহমদ ছফার প্রবন্ধ(নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (১৯৯২), *রাজনীতির লেখা* (১৯৯৩), *আনুপূর্বিক তসলিমা অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ* (১৯৯৪), *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ* (১৯৯৫), *সংকটের নানান চেহারা* (১৯৯৬), *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৯৭), *শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* (১৯৯৭), *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৮), *আহমদ ছফার প্রবন্ধ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (২০০০), *রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০০০), *বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র* (২০০১), *উপলক্ষের লেখা* (২০০১), *নির্বাচিত প্রবন্ধ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন)* (২০০২), *আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (২০০২), *আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০২), *সেইসব লেখা* (২০০৮)

আহমদ রফিক : *শিল্প সংস্কৃতি জীবন* (১৯৫৮), *নজরুল কাব্যে জীবন সাধনা* (১৯৫৮), *পদ্মাপারের সেই গাল্পিক যাদুকর* (১৯৭৬), *আরেক কালান্তরে* (১৯৭৭), *বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি* (১৯৮৬), *ছোটগল্প : পদ্মাপারের রবীন্দ্রগল্প* (১৯৮৭), *রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ* (১৯৮৭), *কেমন আছেন* (১৯৮৭), *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস* (১৯৮৭), *আদি মানবের সন্ধানে* (১৯৮৯), *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য* (১৯৯১), *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা* (১৯৯৩), *এই অস্থির সময়* (১৯৯৬), *রবীন্দ্র চিত্রশিল্প*

(১৯৯৬), *জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষণা* (১৯৯৭), *এই পৃথিবীর মানুষ* (১৯৯৭), *রবীন্দ্রভুবন পতিসর* (১৯৯৮)।

আহমদ শরীফ : *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (১৯৬৯), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে* (১৯৭০), *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* (১৯৭২), *যুগ-যন্ত্রণা* (১৯৭৪), *কালিক ভাবনা* (১৯৭৪), *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (১৯৭৭),*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড) (১৯৭৮), *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (১৯৭৯), *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড) (১৯৮৩), *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য* (১৯৮৫), *কালের দর্পণে স্বদেশ* (১৯৮৫), *বাঙলা ভাষাসংস্কার আন্দোলন* (১৯৮৬), *ইদানীং আমরা* (১৯৮৬), *এবং আরো ইত্যাদি* (১৯৮৭),*আবদুল করিম*

সাহিত্যবিশারদ (১৯৮৭), *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা* (১৯৮৭), *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি* (১৯৮৯), *একালে নজরুল* (১৯৯০), *বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র* (১৯৯০), *মানবতা ও গণমুক্তি* (১৯৯০), *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা* (১৯৯১), *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা* (১৯৯১), *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালিত্ব* (১৯৯২), *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন* (১৯৯২), *সংস্কৃতি* (১৯৯২), *শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি* (১৯৯৩), *সংকট : জীবনে ও মননে* (১৯৯৩), *মুক্তি নিহিত : নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়* (১৯৯৩), *প্রগতির বাধা ও পন্থা* (১৯৯৪), *এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা* (১৯৯৪), *সময়, সমাজ, মানুষ* (১৯৯৫), *দেশ কাল জীবনের দাবী ও সাক্ষ্য* (১৯৯৫), *স্বদেশচিন্তা* (১৯৯৭), *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা* (১৯৯৭), *উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা* (১৯৯৮), *মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ* (১৯৯৮), *স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র* (১৯৯৮), *বিশ শতকের বাঙালী* (১৯৯৮), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *বিশ্বাসবাদ, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, মৌলবাদ* (২০০০), *কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়* (২০০০), *কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা* (২০০০), *নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে* (২০০৪), *সাহিত্য তত্ত্ব ও বাংলা* (২০০৪)

ইসরাইল খান : *সাময়িকপত্র ও সমাজগঠন : বাংলাদেশ পরিস্থিতি* (১৯৮৮), *ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা* (১৯৮৯), *বাঙলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি* (১৯৯১), *বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্যেসমাজে অবক্ষয়* (১৯৮৯), *বন্দিবিবেক সমাজ ও সাহিত্যজগতে বেশ্যাবৃত্তি* (১৯৯০), *বঙ্কিমচন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষে* (১৯৯০)

এম আর আখতার মুকুল : *রূপালী বাতাস* (১৯৭৩), *মুজিবের রক্ত লাল* (১৯৭৬), *লন্ডনে ছক্কু মিয়া* (১৯৮১), *ভাসানী-মুজিবের রাজনীতি* (১৯৮৪), *আমি বিজয় দেখেছি* (১৯৮৫), *চল্লিশ থেকে একাত্তর* (১৯৮৫), *কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী* (১৯৮৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন* (১৯৮৭), *ওরা চারজন*(১৯৮৭), *লেছড়াগঞ্জের লড়াই* (১৯৮৮), *একাত্তরের বর্ণমালা* (১৯৮৯), *একুশের দলিল*

(১৯৯০), *মহাপুরুষ* (১৯৯১), *দু'মুখী লড়াই* (১৯৯২), *আমাকে কথা বলতে দিন* (১৯৯৩),

বাংলা নাটকের গোড়ার কথা (১৯৯৪), *হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীর চোখে নজরুল* (১৯৯৪), *কে ভারতের দালাল* (১৯৯৫), *বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (১৯৯৭), *পঞ্চাশের দশকের আমরা ও ভাষা আন্দোলন* (১৩৯১), *বায়ান্নোর জবানবন্দী* (১৩৯২)

এস. এম লুৎফর রহমান : *লালন জিজ্ঞাসা* (১৯৮৪), *লালন শাহ্ জীবন ও গান* (১৯৮৪), *বৌদ্ধ চর্যাপদ* (১৯৮৮), *জাতি জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ গবেষণা* (১৯৯০), *আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী* (১৯৯১), *বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান* (১৯৮৯), *দুদ্দুশাহ* (১৯৯০)

এস ওয়াজেদ আলী: *জীবনের শিল্প* (১৯৪১), *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৯৪৩), *ভবিষ্যতের বাঙালী* (১৯৪৩)

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (১৯৭৫), *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা* (১৯৮৩), *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (১৯৮৭), *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* (১ম খণ্ড, ১৯৭৪; ২য় খণ্ড, ১৯৯০), *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী* (১৯৮৫), *বাংলায় বিদেশী পর্যটক* (১৯৯০), *সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮), *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে রূপ ও ভাষা* (১৯৯৪), *প্রবাদ ও প্রবচন* (১৯৯৪), *ধাঁ-ধা* (১৯৯৫), *মন্ত্র* (১৯৯৫)

কবীর চৌধুরী : *প্রাচীন ইংরেজী কাব্যসাহিত্য* (১৯৮০), *আধুনিক মার্কিন সাহিত্য* (১৯৮০), *শেকস্‌পীয়র থেকে ডিলান টমাস* (১৯৮১), *প্রসঙ্গ নাটক* (১৯৮১), *সাহিত্যকোষ* (১৯৮৪), *এ্যাবসার্ড নাটক* (১৯৮৫), *ইউরোপের দশ নাট্যকার* (১৯৮৫), *স্তাঁদাল থেকে প্রুস্ত* (১৯৮৫), *সাহিত্য সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব পরিভাষা* (১৯৮৫), *শেকস্‌পীয়র ও তার মানুষেরা* (১৯৮৫), *অভিব্যক্তিবাদী নাটক* (১৯৮৭), *পুশকিন ও অন্যান্য* (১৯৮৭), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৮৭), *শেক্সপীয়র ও গ্লোব থিয়েটার (১৯৮৭)*, *ফরাসী নাটকের কথা* (১৯৯০), *অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম ও অন্যান্য* (১৯৯১), *নজরুল দর্শন* (১৯৯২), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (১ম খণ্ড, ১৯৯২), *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (১ম খণ্ড, ১৯৯২), *বঙ্গবন্ধু, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চা* (১৯৯২), *নজরুল দর্শন* (১৯৯২), *ফরাসী চিত্রশিল্পীদের কথা* (১৯৯২), *শিলার ও অন্যান্য* (১৯৯৩), *Special Change and Nation-Building in Developing areas : An AnnotatedBiobliography* (1965), *রেমব্রান্ত রুবেনস ভেলাসকুয়েজ* (১৯৯৪), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (২য় খণ্ড, ১৯৯৪), *ছোটদের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৯৪), *স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়* (১৯৯৪), *রদ্যাঁ* (১৯৯৪), *ছবি কথা সুর* (১৯৯৫), *আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে* (১৯৯৭), *তসলিমা নাসরীন ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ* (যুগ্মভাবে সৈকত চৌধুরীর সঙ্গে)(১৯৯৭), *পিকাসো* (১৯৯৭), *জন সিঙ্গার সার্জেন্ট* (১৯৯৭), *সান্দ্রো বতিচেল্লি* (১৯৯৮), *লোরকা ও অন্যান্য*

(১৯৯৯), *গয়্যা* (১৯৯৯), *মানব কল্যাণ ও অন্যান্য* (২০০০), *বঙ্গবন্ধু* (২০০০), *মার্কিন সাহিত্যের দশ মহারথী* (২০০১), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০১), *বিবিধ রচনা* (২০০১), *সরস ঘটনার সরস কাহিনী* (২০০১), *ভারমিয়ার গুস্তাভ কুরব্যে জন ইভরেট মিল্যে* (২০০১), *মৌলবাদ : তার ইতিহাস ও প্রকৃতি অনুসন্ধান* (২০০২), *সেজান-মাতিস* (২০০২), *পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের কথা* (২০০২), *ইউরোপীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য : এরকি নিউটন অনুসরণে* (২০০৩), *প্রবন্ধ সমগ্র* (২য় খণ্ড, ২০০৫), *প্রবন্ধ সমগ্র* (৩য় খণ্ড, ২০০৬)

কাজী আকরম হোসেন : *ইসলামের ইতিহাস* (১৯২২-১৯২৪), *ইসলামের ইতিকথা* (১৯২৮), *ইসলাম কাহিনী* (১৯৩১)

কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ : *সাহিত্যের পরিধি* (১৯৬০), *ইনকিলাবী যুগের ইতিকথা* (১৯৭০), *সাহিত্য ও জীবন* (১৯৭০), *আঙুর* (১৯৭০), *আমরাও বসে থাকিনি* (১৯৭০)

কাজী আবদুল মান্নান : *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (upto 1855)*, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (১৯৬১), *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (১৯৭০), *রবীন্দ্র নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৯), *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ* (১৯৯০),

কাজী দীন মুহম্মদ : *সাহিত্য সম্ভার* (১৯৬৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* [প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ড] (১৯৬৮), *সেকালের সাহিত্য* (১৯৬৯), *সাহিত্য ও আদর্শ* (১৯৭০), *সাহিত্য শিল্প* (১৯৬৯), *পাকিস্তানী সংস্কৃতি* (১৯৬৯), *ইসলামী সংস্কৃতি* (১৯৭০), *মানব জীবন* (১৯৭০), *সুফীবাদের গোড়ার কথা* (১৯৮০), *ভাষাতত্ত্ব* (১৯৭১), *জীবন সৌন্দর্য* (১৯৮৯), *প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা* (১৯৮২), *বর্ণমালা* (১৯৮৪), *সুখের লাগিয়া* (১৯৮৯), *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব* (১৯৯০), *আল কাওসার* (১৯৯১), *নাস্তিকতা ও আস্তিকতা* (১৯৯১)

কাজী ফজলুর রহমান : *আমলার দিনলিপি* (১৯৯৯)।

কাজী মোতাহার হোসেন : *সঞ্চরণ* (১৯৩৭), *নজরুল কাব্য পরিচিতি* (১৯৫৮), *সেই পথ লক্ষ যার* (১৯৭০), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস : *সব মুখ চেনা চেনা* (১৯৮৬)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন* (১৯৯৪), *বিশ্বকবিতার সোনালী শস্য* (২০০৫), *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা* (২০১০)

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস : *ভাসানী যখন ইউরোপে* (১৯৭৮)

খোন্দকার সিরাজুল হক : *মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* (১৯৮৪)

খোন্দকার রিয়াজুল হক : *লালন শাহের পুণ্যভূমি হরিশপুর* (১৯৭২), *লালন-সাহিত্য ও দর্শন* (১৯৭৬), *মারফতী গান* (১৯৮২), *মাইজভাণ্ডারী গান* (১৯৮২), *বারাশে গান* (১৯৮৩), *মরমী কবি আহসান আলী ও তাঁর মারেফতী সংগীত* (১৯৮৩),

বেগম আয়েশা সরদার ও তাঁর কাব্য (১৯৮৪), *বাংলাদেশের মরমী সংগীত* (১৯৮৫), *ঝিনাইদহ জেলার মরমী কবি* (১৯৮৯), *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য* (১৯৯০),

গাজী শামসুর রহমান : *আইনের ভুবনে* (১৩৯৫), গোলাম মঈনউদ্দিন : *কবি ফররুখ আহমদ* (১৯৮৫), *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৮৮), *প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৯৭), *গ্রন্থ উন্নয়ন* (১৯৮৮), *বই সংরক্ষণ ও বিপণন* (১৯৮৪), *বাংলাদেশে গ্রন্থ উন্নয়ন, গ্রন্থনীতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পাঠ অনুরাগ ও বইয়ের বাজার* (১৯৯৮)

গোলাম মুরশিদ : *বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক* (১৯৬৮), *বিদ্যাসাগর* (১৯৭০), *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা* (১৯৮১), *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization* (1983), *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব* (১৯৮৪), *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া* (১৯৮৫), *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (১৮৫৪-১৮৭৬) (১৯৮৫), *কালান্তরে বাংলা গদ্য : ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্য* (১৯৯৩), *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর* (১৯৯৪), *আশার ছলনে ভুলি* (১৯৯৫), *যখন পলাতক : মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (১৯৯৩), *উজান স্রোতে বাংলাদেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, Lured by Hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt* (2003), *The Heart of a Rebel poet : Letters of Michael Madhusudan Dutt* (2003), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (২০০৬), *কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* (২০০৮)।

গোলাম মোস্তফা : *বিশ্বনবী* (১৯৪২), *আমার চিন্তাধারা* (১৯৬২)

গোলাম সাকলায়েন : *পূর্ব-পাকিস্তানের সুফী সাধক* (১৯৬৪), *ফকির গরীবুল্লাহ* (১৯৬২), *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য* (১৯৬২), *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (১৯৬৭), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (১৯৬৯), *সাহিত্য পরিচয়* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য* (১৯৮০), *পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু সন্ত প্রসঙ্গ* (১৯৮৭), *গদ্যশিল্পী শরৎচন্দ্র* (১৯৮৮)

চৌধুরী শামসুর রহমান :*মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রিকা, পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো* (১৯৬৫), *শেরে বাংলা ফজলুল হক* (১৯৬২), *ছেলেদের কায়দে আজম* (১৯৫৪)

জাহাঙ্গীর তারেক : *প্রতীকবাদী সাহিত্য* (১৯৮৮), *শব্দার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা* (১৯৯৭)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : *শব্দের সীমানা* (১৯৭৬), *Literature of Bangladesh and other Essays* (১৯৮৩), *আমার দেশ আমার ভাষা* (১৯৮৪), *অনুবাদ* (১৯৮৫), *পৃথিবী ও পাসপোর্ট* (১৯৮৬), *শান্তিনিকেতনে তিন মাস* (১৯৮৯), *বাঙালির আত্মপরিচয়* (১৯৯১), *প্রবাসে প্রতিদিন* (১৯৯৪), *যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম* (১৯৯৭)

জিয়া হায়দার : *নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ*, *থিয়েটারের কথা* (১ম-৪র্থ খণ্ড), *বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা*, *স্ট্যানিসলাভস্কী ও তার অভিনয় তত্ত্ব*, *নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, *বিশ্বনাট্য*

তসলিমা নাসরিন : *নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য* (১৯৯২), *যাবো না কেন? যাবো* (১৯৯২), *ছোট ছোট দুঃখ কথা* (১৯৯৪)

দিলওয়ার হোসেন : *বঙ্কিম উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের উপাদান*

দ্বিজেন শর্মা : *জীবনের শেষ নেই* (১৯৭৮), *শ্যামলী নিসর্গ* (১৯৮০), *সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব* (১৯৮১), *সতীর্থ বলয়ে ডারউইন* (১৯৮৪), *ফুলগুলির যেন কথা* (১৯৮৮), *স্বদেশে প্রবাসে* (১৯৯৩), *গহন কোন বনের ধারে* (১৯৯৪), *মম দুঃখের সাধন* (১৯৯৪), *ডারউইন ও প্রজাপতির উৎপত্তি* (১৯৯৭)

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *তমুদ্দনের বিকাশ* (১৯৪৯), *সত্যের সৈনিক আবুজর* (১৯৪৯), *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম* (১৯৫৭), *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন* (১৯৬৮), *ইসলাম ও মানবতাবাদ* (১৯৬৮), *নূতন সূর্য* (১৯৭৪), *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে* (১৯৭২), *দর্শনের নানা সমস্যা* (১৯৭৭), *ধর্ম ও দর্শন* (১৯৮১), *মরমী কবি হাসন রাজা* (১৯৭৯), *হাসন রাজা* (১৯৭৭), *আমাদের জাতীয়তাবাদ* (১৯৮৬), *নয়া জিন্দেগী* (১৯৯৬), *বিজ্ঞান ও দর্শন* (১ম খণ্ড ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ১৯৮৫)

নরেন বিশ্বাস : *অলঙ্কার অন্বেষা* (১৯৭৬), *কাব্যতত্ত্ব অন্বেষণা* (১৯৮২), *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৮৯)

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (১৯৮০)

নিতাই দাস : *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*

নীলিমা ইব্রাহীম : *শরৎপ্রতিভা* (১৯৬০), *বাংলার কবি মধুসূদন* (১৯৬১), *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক* (১৯৬৪), *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা* (১৯৭২), *বেগম রোকেয়া* (১৯৭৪), *বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৮৭), *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯১), *সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত : অতঃপর অমানিষার অন্ধকার* (১৯৯৫), *অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি* (১৯৯৫), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১ম খণ্ড ১৯৯৬, ২য় খণ্ড ১৯৯৭), *বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব* (১৯৯৬)

পান্না কায়সার : *স্বাধীনতার শত্রু মিত্র* (১৯৯৩), *হৃদয়ে একাত্তর* (১৯৯৩), *আমরা কি একাত্তরে ফিরে যাচ্ছি* (১৯৯৪)

ফজিলতুন্নেসা : *মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা* (১৩৩৪ ব.), *নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ* (১৩৩৫ ব.), *মুসলিম নারীর মুক্তি* (১৩৩৬ ব.)

ফরহাদ খান : *প্রতীচ্য পুরাণ* (১৯৮৪); এছাড়া *অ্যাকাডেমিক শিরঃপীড়া, ব্যুরোপ্যাথি ও অন্যান্য* (১৯৮৬), *শব্দের চালচিত্র* (১৯৯২), *হারিয়ে যাওয়া হরফের কাহিনী*

ফরহাদ মজহার : *প্রস্তাব* (১৯৭৬), *সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান প্রসঙ্গ* (১৯৮৫), *সংবিধান ও গণতন্ত্র*

ফয়েজ আহমদ : *পিকিং থেকে লিখছি* (১৯৬৭), *চীনে ক্রান্তিকাল* (১৯৮১), *মধ্যরাতের অশ্বারোহী* (১৯৮২), *সত্যবাবুমারা গেছেন* (১৯৮৪), *নবপর্যায়ে চীন* (১৯৮৪), *অনেক কথার কথা* (১৯৮৫), *বিবিধ ভাবনা* (১৯৮৬), *সমীপেষু* (১৯৯১), *'আগরতলা মামলা' : শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* (১৯৯৪), *কথার শেষ নেই* (১৯৯৩), *সংবাদ তোমার উৎস কোথায়* (১৯৯৩), *চলমান রাজনীতি* (১৯৯৪), *রাজনীতি* (১ম খণ্ড ১৯৯৫; ২য় খণ্ড ১৯৯৬), *রাজনীতি : সাম্প্রতিক* (১৯৯৭)

বদরুদ্দীন উমর : *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭), *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৮), *পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বঙ্গদেশের কৃষক* (১৯৭২), *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* (১৯৭৪), *বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা* (১৯৭৪), *যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ* (১৯৭৬), *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮০), *বাঙলাদেশে মার্কসবাদ* (১৯৮১), *বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক* (১৯৮৭), *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন* (১৯৮৪), *মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল* (১ম খণ্ড ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ১৯৮৫), *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, *বাঙলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা*, *বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, *বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি*, *সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি*, *পাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা*, *বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব*, *ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে*, *নব্বইয়ের নাগরিক বুর্জোয়া অভ্যুত্থান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র*, *মুক্তি কোন পথে?*, *আমাদের ভাষার লড়াই*, *বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র*, *বাঙলাদেশে দুর্নীতি সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য*, *সাম্রাজ্যবাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা*, *বাঙলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি*, *বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির দুই রূপ*, *বামপন্থী মহলে অনৈক্য ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রসঙ্গে*, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, *গণ আদালত একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের জের*, *Society and Politics in East Pakistan* (1973), *Politics and Society in Bangladesh*, *Towards the Emergency in Bangladesh*, *General Crisis Bourgeoisic*, *আমাদের সময়কার জীবন*, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশের কম্যুস্বিটদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, *বাঙলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, *বিবিধ প্রসঙ্গ*, *সাক্ষাৎকার*, *জনগণের হাতে ক্ষমতা—নির্বাচন না অভ্যুত্থান*, *প্রতিবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, *বাঙলাদেশের বামপন্থীরা*, *সংসদীয় রাজনীতি জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (২০০৪)

বদিউজ্জামান : *ইসমাইল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৮৮), *ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (১৯৯৩), *মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনীতি* (১৯৯৭), *সংস্কৃতির রাজনীতি* (১৯৯৭), *রাজপথের রাজনীতি* (১৯৯৭)

বদিউর রহমান : *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৯২)

বশীর আল হেলাল : *সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা* (১৯৭৫), *বাংলা গদ্য* (১৯৮৫), *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস* (১৯৮৫), *বাংলা একাডেমীর ইতিহাস* (১৯৮৬), *ইবরাহীম খাঁ* (১৯৮৮), *আদর্শ বাংলা বানান* (১৯৯০) *বেলগ্রেডের ডাক* (১৯৯১), *তাঁদের সৃষ্টির পথ* (১৯৯৩)

বেগম আকতার কামাল : *বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ* (১৯৭৭), *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ* (১৯৯২), *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প* (২০০০), *কবির উপন্যাস* (২০০৭), *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ* (১৯৯৯)

বেগম জাহান আরা : *সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয়, বাঙলা ভাষা সংস্কার : যুগে যুগে* (১৯৮৫), *বাঙলা উচ্চারণ বিধি ও রীতি, বাঙলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান* (১৯৮৫), *আ-মরি বাংলা ভাষা* (১৯৮৭), *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা এবং আমরা* (১৯৮৮), *বাঙলা উচ্চারণ বিধি ও রীতি* (১৯৯৪), *বেগম রোকেয়া রচনাবলী : নারীমুক্তি প্রসঙ্গ* (১৯৮৯), *বাঙলাদেশের নারী সংক্ষিপ্ত : পরিপ্রেক্ষিত* (১৯৯৩)

বেবী মওদুদ : *পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী পাচার* (১৯৯২), *বাংলাদেশের নারী* (১৯৯৫), *বেগম রোকেয়া পাঠ* (১৯৯৫)

সম্পাদনা : *দেহ ব্যবসায়ী বাধ্য কিশোরীরা* (১৯৯৩), *জনতার জয়* (১৯৯১), *বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান* (কবিতা সংকলন, ১৯৮৮), *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান* (যৌথভাবে, ১৯৯৮)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *হত্যার রাজনীতি ও বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *শাহাবুদ্দীন* (১৯৯৭), *আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা* (১৯৯৭), *জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিকতা* (১৯৯৭), *প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে* (১৯৯৬), *জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা* (১৯৯৬), *অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৯৬), *রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা* (১৯৯৫), *বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণীসংগ্রাম* (১৯৯৩), *কামরুল হাসান* (১৯৯১), *এক অনিশ্চিত বসন্তের কাল* (১৯৯১), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ সাহিত্যে রাজনতিতে* (১৯৮৭), *শিল্পকলার ইতিহাস* (১৯৮৫), *মাইকেলের জাগরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বাংলাদেশের গ্রাম* (১৯৮৪), *নিস্তব্ধতার সংস্কৃতি* (১৯৮৩), *বাংলাদেশের লোকশিল্প* (১৯৮২), *বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ* (১৯৭৮), *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশ, জার্নাল ৭১* (১৯৭২), *শ্রাবণে আশ্বিনে* (১৯৭৫), *স্বদেশ ও সাহিত্য* (১৯৬৯), *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা* (২০০০), *The Quest of Zainul Abedin, Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, Rural Society, Power Structure and Class Practice,*

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ* (১৯৮৮), *মিরজা আবদুল হাই* (১৯৮৯), *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য* (দ্বি. সং. ২০০৪), *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি* (১৯৯৮), *দু-চারিটি অশ্রুজল : রবীন্দ্রগল্পের ভিন্নপাঠ* (২০০৫), *কথাশিল্পের কথামালা শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর* (২০০৭)

ভূঁইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র : ১৯৪৭-৭১* (১৯৯১)। জীবনী গ্রন্থ : *আবুল কালাম শামসুদ্দীন* (১৯৮৭), *আনোয়ার পাশা* (১৯৮৮), *শশাঙ্কমোহন সেন* (১৯৯০), *বুদ্ধদেব বসু* (১৯৯২), *স্যার আজিজুল হক* (১৯৯৪)

সম্পাদনা গ্রন্থ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৭৫), *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র* (১৯৮৫)

মতলুব আলী : *শিল্পকলা প্রসঙ্গে* (১৯৭৮), *আমাদের জয়নুল* (১৯৮৫), *লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়* (১৯৭২), *জয়নুলকথা* (১৯৮৭), *এশীয় চারুকলা দ্বি-বার্ষিক : এক দুই তিন চার সমীক্ষণ পর্যালোচনা সমালোচনা* (১৯৯১), *শিল্পী ও শিল্পকলা* (১৯৯৪), *জয়নুলের জলরঙ* (১৯৯৬), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি গ্রন্থটি কেন পড়া দরকার* (১৯৯৫), *একাত্তরের পাণ্ডুলিপি* (১৯৯৭), *জয়নুল স্মৃতি* (১ম খণ্ড ১৯৯৪)

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী : *সুশিক্ষক* (১৯৭৮), *বাংলা শিক্ষা পদ্ধতি* (১৯৮২), *শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কথা* (১৯৮৬), *শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান* (১৯৮৮), *শিশুর জীবন বিকাশ* (১৯৯২)

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাংলার উপন্যাস* (১৯৭৪), *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৪), *বাংলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা* (১৯৯৬), *বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা* (১৯৯৬), *বাঙলাভাষা* (১৯৭৩), *ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি* (১৯৯১), *ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব* (১৯৮৫), পাঠকের পাঠশালা (২০০০), *Language Planning in Srilanka*।

জীবনী : মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ এনামুল হক

সম্পাদনা : *বাঙলাদেশ* (১৯৭৪)

মনিরুজ্জামান : *ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৬৯), *বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির সন্ধান : ১৯৪৭-৭১* (১৯৮২), *ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ডওয়ার্ক* (১৯৮২), *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন* (১৯৮৫), *সান্নিধ্যে ও গৌরবী স্মরণে* (১৯৯২), *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* (১৯৯৩), *Studies in the BanglaLanguage* (1991)

মযহারুল ইসলাম : *কবি পাগলা কানাই* (১৯৫৯), *কবি হেয়াত মামুদ* (১৯৬১), *ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন* (১৯৬৭), *লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস* (১৯৭০), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (১৯৭৪), *সাহিত্যের পথে, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী* (১৯৮০), *ফোকলোর চর্চায় লোকতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি* (১৯৮২), *Social change and Folklore* (1985), *Folkiore : The Pulse of the People* (1984), *A History of Folk Collections in India and Pakistan* (1970)

মহাদেব সাহা : *আনন্দের মৃত্যু নেই* (১৯৮৪), *মহাদেব সাহার কলাম* (১৯৯২), *কবির দেশ ও অন্যান্য ভাবনা* (১৯৯৭)

মহাম্মদ দানীউল হক : *অনুবেদন* (১৯৭২), *সাহিত্য-কথা* (১৯৭৮), *ভাষাতত্ত্বের কথা* (১৯৮৪), *ভাষার কথা* (১৯৯০), *ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান* (১৯৯৩), *ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ* (১৯৯৫)

মালিহা খাতুন : *প্রবন্ধ বিচিত্রা* (১ম খণ্ড ১৯৯৩, ২য় খণ্ড ১৯৯৪), *শান্তির অন্বেষায়* (১৯৯৫), *বাংলাদেশের সাম্প্রতিক শিশু ও নারী* (১৯৯৫), *স্মৃতিতে বেথুন কলেজ* (১৯৯৫), *স্মৃতিতে রোকেয়া সাখাওয়াত* (১৯৯৬), *নতুন করে পেলাম* (১৯৯১)

মালেকা বেগম : *ভাষার বিকাশে জীবন* (১৯৭৬), *নারী চিত্র : আশির দশক* (১৯৮৭), *বাংলার নারী আন্দোলন* (১৯৯৫), *নারীর চোখে বিশ্ব* (১৯৯৬), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল* (১৯৯৮), *আমি নারী* (২০০০), *রমনীয় নয়* (২০০৫), *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : স্বদেশী ও স্বাদেশিক* (২০০৮), *অগ্নিযুগের দুই নারী : রোকেয়া ও প্রীতিলতা* (২০০৮), *রবীন্দ্রনাথের গল্পে যৌতুক প্রসঙ্গ* (২০১১), *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (২০১১), *নারীর কথা* (২০১২), *বিপন্ন নারী* (১৯১৩)

মাসুদুজ্জামান : *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা* (১৯৯৩), *রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৮)

মাহবুব সাদিক : *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ* (১৯৯১), *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৩), *আবদুল হাই মাশরেকী* (১৯৯০), *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত* (১৯৯৫)

মাহবুবা সিদ্দিকা :*সিকান্‌দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার* (১৯৯৩), *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ চেতনা* (১৯৯৪)

মাহবুব-উল আলম : *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (তিন খণ্ড, ১৯৪৭-১৯৫০), *পূর্ব পাকিস্তানের পাখি* (১৯৬০), *পূর্ব পাকিস্তানের বন্যজন্তু* (১৯৬০)

মাহবুবুল হক : *ম্যাক্সিম গোর্কির মা* (১৯৭৯), *Chittagong Guide* (1981), *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (১৯৮২), *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পরিচিতি* (১৯৮১), *বাংলা বানানের নিয়ম* (১৯৯১), *পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম* (১৯৯১), লোকসংস্কৃতি

মাহমুদ শাহ কোরেশী : *ছিন্নমূল* (১৯৫৮), Etude Sur I'evolution Intellectuelle chez les Musulmans du Bengale (1971), Parallile (1977) *চাঁদের অপেরা* (১৯৮৫), *আদ্রেঁ মাল্‌রো : শতাব্দীর কিংবদন্তী* (১৯৮৬), *মাহবুব-উল আলম* (১৯৮৮), *ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (১৯৭৯), *Culture and Development* (1983), *Poems Mystiques Bengalies* (1977)

সম্পাদনা : *বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনার সমস্যা* (১৯৯৭)

মুনতাসীর মামুন : *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ* (১৯৫৭-১৯০৫) (১৯৮৬), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১ম খণ্ড ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৮৭, ৩য় খণ্ড ১৯৮৮, ৪র্থ খণ্ড ১৯৯১, ৫ম খণ্ড ১৯৯৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯৭), ঢাকা ১৮৫৭

সালের বিদ্রোহ (১৯৯৭), *The Festivals of Bangladesh* (1996), *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে* (১৯৯৬), *ঢাকার প্রথম* (১৯৯৫), *হরিশচন্দ্র মিত্র* (১৯৯৪), *ঢাকা : স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী* (১৯৯৩), *ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান* (১৯৯১), *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান* (১৯৯১), *কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়* (১৯৯০), *পুরনো ঢাকার উৎসব ও ঘরবাড়ি* (১৯৮৯), *স্মৃতিময় ঢাকা* (১৯৮০), *ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান* (১৯৯৫), *মজিবরের বাড়ি* (১৯৯৫), *মেজর জেনারেল ও ফেরি* (১৯৯৫), *হুকুমের দেশ বাংলাদেশ* (১৯৯৪), *যে দেশে রাজাকার বড়* (১৯৯৪), *ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতায় থাকা* (১৯৯৩), *গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে* (১৯৯৩), *বলে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের গাঁথা* (১৯৯২), *সব সম্ভবের দেশে* (১৯৯১), *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর* (১৯৮৫), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ* (১৯৮৫), *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সভা সমিতি* (১৯৮০), *উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার* (১৯৭৯), *ঢাকাপ্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৬৩-৬৪)* (১৯৭৭), *বাংলাদেশের উৎসব* (১৯৯৪), *জেনারেলের সঙ্গে* (১৯৯৩), *এপিটাফ* (১৯৯১), *বিশপ হেবারের চোখে বাংলাদেশ* (১৯৭৪), *সেই সব দিন* (১৯৯৭), *মিছিলে কেন ছিলাম* (১৯৯৭), *ইতিহাসের খেরোখাতা* (১৯৯৮), *বড় আলবদরদের কি হবে* (১৯৯৬), *বাংলাদেশে ফেরা* (১৯৯৬), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৫), *ঢাকা সমগ্র-১*, *ঢাকা সমগ্র-২* (২০০৪)

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮), *নজরুল ইসলাম* (১৯৮৩), *বাংলদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা* (১৯৬৯), *মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা* (১৯৭০), *Bengali Muslim Public Opinion* (1976), *উচ্চ শিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ* (১৯৭৬), *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (১৯৭৭), *সমকালে নজরুল ইসলাম* (১৯৮৩), *আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন* (১৯৮৪), *আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ* (১৯৯৪), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৪) প্রভৃতি। এছাড়া সম্পাদনা প্রবন্ধগ্রন্থ : *বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (১৯৯০), *নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ* (১৯৯১), *আবহমান বাংলা* (১৯৯৩), *সেরা সুন্দরম* (২০০৪)

মুস্তাফা মজিদ : *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি* (১৯৯২), *লোকপ্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ* (১৯৯২)

সম্পাদনা : *মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্রবিতর্ক* (১৯৮৭), *বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র* (যৌথভাবে ১৯৮৯), *বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র* (১৯৯১), *নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯১), *রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র* (১৯৯৫), *নেতৃত্বের স্বরূপ* (১৯৯৫), *আহমদ শরীফ : আমাদের অহঙ্কার* (১৯৯৭)

মুহম্মদ আবদুল হাই : *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯), *ভাষা ও সাহিত্য* (১৯৬০), *`A Phonetics and Phonological Study of Nassals and Nasalization in Bengali'* (১৯৬০), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৬৫),

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* [আধুনিক যুগ](১৯৫৬)

মুহম্মদ আবু তালিব : *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : জীবন ও সাহিত্য কথা* (১৯৫৫), *মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা* (১৯৬৬), *পালাজ্বরের ইতিকথা* (১৯৬৬), *মুনশী শেখ জমীর উদ্দীনের আত্মজীবনী* (১৯৬৭), *বাংলা সাহিত্যের ধারা : প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (১৯৬৮), *লালন শাহ ও লালন গীতিকা* (১ম ২য় খণ্ড ১৯৬৮), *লালন পরিচিতি* (১৯৬৮), *বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়* (১৯৬৮), *বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা* (১৯৭০), *উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা : হযরত শাহ মখদুম ও তাঁর সঙ্গীগণ* (১৯৭০), *উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা ৬৫০-১৮০০* (১৯৭৫), *বাংলা সনের জন্মকথা* (১৯৭৫), *মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের জীবনী ও সাহিত্য* (১৯৭৬)

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : *বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৯৪৭-১৯৭০)* (১৯৮৫), *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল* (১৯৮৮), *বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯০)

মুহম্মদ এনামুল হক : *আবাহন বা জাতীয় সঙ্গীত সমষ্টি* (১৯২২), *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (১৯৩৫), *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা, ১৯৩৫), *চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ* (১৯৩৫), *বাংলা ভাষার সংস্কার* (১৯৪৪), *পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলাম* (১৯৪৮), ব্যাকরণ মঞ্জুরী (১৯৫২), *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৫৭), *মনীষা-মঞ্জুষা* ১মখণ্ড (১৯৭৫), *মনীষা-মঞ্জুষা* ২য়খণ্ড (১৯৭৬), *মনীষা-মঞ্জুষা* ৩য়খণ্ড (১৯৮৪)

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর : *কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন* (১৯৮২), *স্মরণীয় সাংবাদিক* (১৯৮৫), *বাংলাদেশে সাংবাদিকতা* (১৯৮৭), *সংবাদপত্রে লেখালেখি* (১৯৮৭), *টেলিভিশন ভাবনা* (১৯৯৭), *বিষয় : সাংবাদিকতা* (১৯৯৮), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল : নতুন ভঙ্গি, নতুন কর্মসূচী* (১৯৯৮)

মুহম্মদ নূরুল হুদা : *শর্তহীন শর্তে* (১৯৮১), *লক্ষণ সংহিতা* (১৯৮২), *মহানবী* (১৯৮৩), *রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৮), *সার্ত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৩), *প্রাণের মিনার শহীদ মিনার* (১৯৯৪), *সৃষ্টিশীলতা ও অন্যান্য* (১৯৯৮)

সম্পাদনা : *হে স্বদেশ* (১৯৭২), *কবি মধুসূদন* (১৯৮৪), *কবিতা ১৩৯০* (১৯৮৪), *কবিতা ১৩৯১* (১৯৮৫), *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে কবিতাগুচ্ছ* (১৯৮৪), *হুমায়ুন কবির রচনাবলী* (১৯৮৪), *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৬), *বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮৮), *Flaming Flowers : Poets Response to the emergence of Bangladesh* (1986), *কবিতা: গণআন্দোলন* (১৯৯১), *Nazrul : An Evaluation* (1997), *সাহিত্য মঞ্জুষা* (১৯৯১) *শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের পঙক্তি* (১৯৯৫), *নজরুল ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৭), *নজরুল স্বরলিপি সংগ্রহ* (১৯৯৭), *Poetry of Kazi Nazrul Islam* (1997)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া : *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা* (১৯৮৪), *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য* (১৯৯৩)

জীবনী : *আলী আহমদ*

সম্পাদনা : *পুরানো বাংলা দলিলপত্র* ১৬৩৮-১৮৮২(১৯৯১), *পদ্মাপুরাণ* (১৯৯৩)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *যথাশব্দ* (১৯৭৪), *মাতৃভাষার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ* (১৯৮৩), *রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার* (১৯৮৩), *কোরানসূত্র* (১৯৮৪), *বচন ও প্রবচন* (১৯৮৫), *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* (১৯৮৫), *রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা* (১৯৮৬), *রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য* (১৯৮৬), *আমি কি যাব না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে* (১৯৯৬), *বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক* (১৯৯৬), *আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা* (১৯৯৭), *বাংলা ভাষার সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত* (১৯৯৭), *কলম এখন নাগালের বাইরে* (১৯৯৭), *একুশে ফেব্রুয়ারী সকল ভাষায় কথা কয়* (১৯৯৯), *মিত্রাক্ষর* (২০০০)

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী* (১৯৯২), *বাংলা গানের ধারা* (১৯৯৩), *গানের ঝরনাতলায়* (১৯৯৭)

মুহাম্মাদ কুদরাত-এ খুদা : *যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প* (১৩৫০), *বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী* (১৯৫৫), *পরমাণু পরিচিতি* (১৯৫৭), *বিচিত্র বিজ্ঞান* (১৩৭১)

মোতাহার হোসেন সুফী : *আবদুল্লাহ উপন্যাস বিচার* (১৯৬২), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৬৭), *সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দিন আহমদ* (১৯৮২), *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য* (১৯৮৬), *কাজী মোহাম্মদ ইদরিস* (১৯৮৯), *স্মরণীয় স্থান* (১৯৯০), *সংস্কৃতি : সংগ্রাম* (১৯৯১)

মোনায়েম সরকার : *ইতিহাস ও রাজনীতি : জাতীয় বিকাশের মূলস্রোত বনাম তৃতীয় ধারা, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (১৯৯৬), *ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯২), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বিকাশে ঐক্য অপরিহার্য* (১৯৯১), *বাংলাদেশে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের উত্থান অনিবার্য* (১৯৮৭), *গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বামপন্থীদের করণীয়* (১৯৯২), *বামপন্থীদের সঙ্কট ও বাংলাদেশের রাজনীতি* (১৯৯২)

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী : *রবি-পরিক্রমা* (১৯৬৩), *সাহিত্যের নবরূপায়ণ* (১৯৬৯), *বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার* (১৩৬৮ ব.), *রঙিন আখর* (১৩৭০ ব.), *Colloqual Bengali* (1963)

মোবারক হোসেন খান : *সংগীত প্রসঙ্গ, বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ, সঙ্গীত সাধন, রাগসংগীত*

মোবাশ্বের আহমদ বর্ণিক : *মুসলিম মনীষীদের বিশ্বকোষ সাধনা* (১৯৮৭), *প্রবন্ধ-মঞ্জুষা* (১৯৮৯), *তমুদ্দুন মজলিসের ইতিবৃত্ত* (১৯৯১), *প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ও তাঁর অবদান* (১৯৯১), *প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি* (১৯৮৯), *একটি ব্যক্তি—একটি প্রতিষ্ঠান* (১৯৮৯), *প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম শ্রদ্ধাস্পদেষু*

(১৯৮৯), *স্বাধীনতা যুদ্ধের বীজবপন থেকে বিদায়* (১৯৯২), *জোড়াসাঁকো* (১৯৯২)

মোবাশ্বের আলী : *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (১৯৬৩), *নজরুল প্রতিভা* (১৯৬৯), *বিশ্বসাহিত্য* (১৯৭৪), *বাংলাদেশের সন্ধানে* (১৯৮৬), *শিল্পীর ট্র্যাজেডি* (১৯৮৫), *রবীন্দ্রনাথ : অন্তরঙ্গ আলোকে* (১৯৮৯), *শেলী : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯০), *বরিস পাস্তেরনাক* (১৯৯০), *এন্টিগোনি* (১৯৯০), *নজরুল : সমাজ পরিবেশ কাল* (১৯৯১), *নজরুল ও সাময়িকপত্র* (১৯৯৪), *গ্রীক ট্র্যাজেডি* (১৯৯৩), *গ্রীসের গল্প* (১৯৯৩), *গ্রীসের দশটি গল্প* (১৯৯৪), *গ্রীসের আরও গল্প* (১৯৯৫), *রবীন্দ্রনাথ : গল্প থেকে নাটক* (১৯৯৪), *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি* (১৯৯৫), *শিল্পীর ভুবন* (১৯৯৬), *গ্রীসের ঐতিহাসিক* (১৯৯৬), *রমনীর রোষ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৭), *সিসিফাস ও অন্যান্য গল্প* (১৯৯৭), *তর্পন বাহকেরা* (১৯৯৭), *দয়ালুরা* (১৯৯৭), *মধুসূদনের বিশ্ব* (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

মোমেন চৌধুরী : *জন্ম বিবাহ* (১৯৮৮), *লোকসংস্কার ও বিবাহ প্রসঙ্গ* (১৯৯৭), *লালন বিষয়ক রচনাপঞ্জি* (১৯৯৫)

জীবনী : *মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন* (১৯৮৮)

মোল্লা এবাদত হোসেন : *পদাবলী সমীক্ষা* (১৩৭৬), *চর্যা পরিচিতি* (১৩৭৬)

মোস্তফা কামাল : *বাঙালি বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৬), *আসাদ থেকে গণঅভ্যুত্থান* (১৯৯৩), *বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট : খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৯৬), *বাংলাদেশের ২৫ বছর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা* (১৯৯৭)

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *মোস্তফা চরিত* (১৯২৩), *সমস্যা ও সমাধান*, *মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য*, *বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম*, *মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, *তফসীরুল কোরআন* ৫ম খণ্ড, *মুক্তি ও ইসলাম*

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা* (১৯৭০), *A Critical Study of Early Bengali Grammars : Halhed to Haughton* (1983), *চকবাজারের কেতাবপট্টি* (১৯৯১), *উনিশ শতকের ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতি* (১৯৯১), *অভিধান* (১৯৮৭), *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা : সমকালের দর্পণে* (১৯৯১), *নানা প্রসঙ্গে নজরুল* (২০০২)

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : *ধর্মের কাহিনী*, *নূরনবী*, *শান্তিধারা*, *মানবমুকুট*

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : *মহামানুষ মুহসীন* (১৯৪০), *মরুভাস্কর* (১৯৪১), *সৈয়দ আহম্মদ*, *কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ* (১৯৪৯), *মানচয়নিকা* (১৯৫১)

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ : *সংবাদ ও সাংবাদিক* (১৯৪৩), *সেকালের কথা* (১৯৪৯), *সেকালের কাহিনী* (১৯৫০), *ফাঁসীর মঞ্চে* (১৯৫২), *বিচিত্র জীবন* (১৯৫২), *সেকাল ও একাল* (১৯৫২), *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম* (১৯৫৩), *জীবন জাগার কাহিনী* (১৯৮২), *যুগবিচিত্রা* (১৯৬৭)

মুনীর চৌধুরী : *মীর-মানস* (১৯৬৫), *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯) ও *বাঙলা গদ্যরীতি* (১৯৭০)

মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান : *কবি কায়কোবাদের কাব্যভাবনা* (১৯৮০), *সুফী জুলফিকার হায়দার : সাহিত্যচিন্তা* (১৯৮৭),*পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেম* (১৯৮৮)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র* (১৯৬২), *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৫), *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্* (১৯৬৯), *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ১৯৫৭-১৯২০* (১৯৭০), *বাংলা কবিতার ছন্দ* (১৯৭০), *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব* (১৯৭৪), *সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা* (১৯৭৮), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী* (১৯৭৮), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত* (১৯৮১), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস : ১৯২১-৮১* (১৯৮২), *রবীন্দ্রচেতনা* (১৯৮৪), *আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত* (১৯৮৫), *ভাষা আন্দোলন : শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা* (১৯৯২), *মধুসূদন* (১৯৯৩), *নজরুলচেতনা* (১৯৯৬)

মোহাম্মদ মাহ্ফুউল্লাহ : *সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা* (১৯৭০), *নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৬৩), *মধুসূদন–রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৭), *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (১৯৬৫), *নজরুল কাব্যের স্বরূপ* (১৯৭৪), *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (১৯৭৮), *কবিতা ও প্রসঙ্গকথা* (১৯৭৫), *সাহিত্যের রূপকার* (১৯৮১), *বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন* (১৯৮০)

জীবনী : *গোলাম মোস্তফা* (১৯৮৭), *সুফী মোতাহার হোসেন* (১৯৮৮)

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *ইতিহাস কথা কয়* (১৯৮১)

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী : *লোকসাহিত্যে ছড়া* (১৯৬২), *লোকসাহিত্যে ধাঁ-ধাঁ ও প্রবাদ* (১৯৬৮), *বাংলার লোকসাহিত্য পরিচিতি*, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত*

মোহাম্মদ হান্নান : *বাংলাদেশের ছাত্রআন্দোলনের ইতিহাস* (১ম খণ্ড-৪র্থ খণ্ড) (১৯৮৪-১৯৯১), *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল* (১৯৯১), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (১৯৯৪), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস* (১৯৯৪), *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের এলবাম* (১৯৯৫), *বাঙালি মুসলমানের নাম* (১৯৯৬), *বাঙালি মুসলমানের পদবী* (১৯৯৬), *বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব* (১৯৯৪)

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ : *শেক্সপীয়র ও বাংলা কবিতা*, *সমালোচনা* (১৯৮৫), *শব্দের শিল্পরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৫), *হাজার বছরের স্বপ্ন বাংলা একাডেমী* (১৯৯৪), *সত্যের প্রকাশ* (১৯৯৪),

মোঃ আনিসুর রহমান : *East and West Pakistan, a Problem in the Political Economy of Regional Planning* (1968), *Bhoomi Sena, A Struggle for Peoples Power* (1978), *Towards a Theory of Rural Development* (1988), *উন্নয়ন জিজ্ঞাসা*

(১৯৯২), *The Lost Moment, Derams With a Nation Born Through Fire* (1993), *অপহৃত বাংলাদেশ* (১৯৯৩), *অসীমের স্পন্দ : রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা* (১৯৯৫)

যতীন সরকার : *সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের কবিগান* (১৯৮৬), *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য* (১৯৮৬), *সংস্কৃতির সংগ্রাম, মানবমন মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব* (১৯৯০), *গল্পে গল্পে ব্যাকরণ, পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন* (২০০৫)

জীবনী : *কেদারনাথ মজুমদার* (১৯৮৭), *সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী* (১৯৮৮), *হরিচরণ আচার্য* (১৯৮৯), *চন্দ্রকুমার দে* (১৯৯০),

রণেশ দাশগুপ্ত : *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে* (১৩৭৩), *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ* (), *উপন্যাসের শিল্পরূপ*

রতনলাল চক্রবর্তী : *1928-1947* (1997), *শহীদ সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য* (১৯৯৭), *শহীদ জীবন* (১৯৯৭), *আবদুল হালিম* (১৯৯৬), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা* (১৯৯৩), *ভাষা আন্দোলন : দলিলপত্র* (১৯৯১), *বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক* (১৯৮৪), *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ* (১৯৮৪), *বাংলাদেশের মন্দির* (১৯৮৯)

রফিকুল ইসলাম : *নজরুল নির্দেশিকা* (১৯৬৯), *ভাষাতত্ত্ব* (১৯৭০), *An Introduction to Calloquial Bengali* (1970), *নজরুল জীবনী* (১৯৭২), *বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা* (১৯৭৩), *ঢাকার কথা* (১৯৮২), *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা* (১৯৯১), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৮২), *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার* (১৯৮২), *বাংলা ভাষা আন্দোলন* (১৯৮৪), *শহীদ মিনার* (১৯৮৬), *আব্দুল কাদির* (১৯৮৭), *আমাদের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯০), *ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৩), *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* (১৯৯৭), *নজরুল প্রসঙ্গে* (১৯৯৭), *বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৯৭), *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী* (১৯৯৮)

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি) : *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে* (১৯৮৩), *প্রতিরোধের প্রথম প্রহর* (১৯৮৫), *এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী* (১৯৮৫), *বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট* (১৯৮৬), *স্বৈরশাসনের নয় বছর* (১৯৯০), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯১), *বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে* (১৯৯১), *তেরোজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুদণ্ড* (১৯৯৪), *সামরিক জান্তার রাজনীতি* (১৯৯৩), *ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ* (১৯৯২), *গোলকের কাহিনী* (১৯৮৮), *প্রতিরোধের রূপরেখা : রণনীতির সন্ধানে* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স, এস ফোর্স, কে ফোর্স* (১৯৯২), *ভয়াবহ গণহত্যা* (১৯৯২), *বিদ্রোহী মার্চ ১৯৭১* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (১৯৯৪), *শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম* (১৯৯৫), *স্বাধীনতার বাইশ বছর* (১৯৯৪), *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, বিরোধী শক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধ*

ও বুদ্ধিজীবী (১৯৯২), *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের দুশো রণাঙ্গন* (১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধের নৌকমান্ডো* (১৯৯২), *একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ* (১৯৯২), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার* (১৯৯৪), *মুক্তিযুদ্ধে রণকৌশল* (১৯৯৬), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতেহার ও চিঠি* (১৯৯৬), *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৬), *পঁচাত্তরের রক্তক্ষরণ* (১৯৯২), *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধে তিনজন* (১৯৯৪), *দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন* (১৯৯৩), *দক্ষিণ রণাঙ্গন* (১৯৯৩), *মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ* (১৯৯৪), *Education and population Planning : Disturbing Paradox* (1993), *The Military in Politics* (1993)

রফিকউল্লাহ খান : *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য* (১৯৮৫), *কবিতা ও সমাজ* (১৯৮৫), *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৩), *রবীন্দ্র-বিষয়ক* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)* (১৯৯৭), *সত্যেন সেনের উপন্যাস : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পবৈচিত্র্য*(২০০০), *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর* (২০০০), অবচেতন ও কবিতা (২০১০)

রশীদ করীম : *আর এক দৃষ্টিকোণ, অতীত হয় নতুন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি* (১৯৯৭)

শফি আহমেদ : *ফিরে চল মাটির টানে* (১৯৮৭), *বিশ্বকোষ* (১৯৮৭), *শেক্সপীয়রের নারী* (১৯৯৪)

শান্তনু কায়সার : *বঙ্কিমচন্দ্র ১ম খণ্ড* (১৯৮২) ও *২য় খণ্ড* (১৯৮৪), *কাব্যনাটক* (১৯৮৬), *তৃতীয় মীর* (১৯৮৪), *সুকান্ত ভট্টাচার্য* (১৯৯৫), *গভীর গভীরতর অসুখ, গদ্যসত্তার জীবনানন্দ* (১৯৯৭)

জীবনী : *অদ্বৈত মল্লবর্মন* (১৯৮৭), *মতিউল ইসলাম* (১৯৯২), *মোহাম্মদ মোর্তাজা* (১৯৯৪)

সম্পাদনা : *খান মোহাম্মদ ফারাবী রচনাসমগ্র* (১৯৮৫)

শামসুজ্জামান খান : *নানা প্রসঙ্গ* (১৯৮৩), *মাটি থেকে মহীরুহ* (১৯৯৪), *বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা* (১৯৯৫), *বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য* (১৯৯৪), *মীর মশাররফ হোসেন : নতুন তথ্যে নতুন ভাষ্যে* (২০০৫), *ফোকলোর চর্চা* (২০০৬), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৭)

জীবনী : *মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী*।

শামসুন নাহার মাহমুদ : *পুণ্যময়ী* (১৯২৫), *রোকেয়া জীবনী* (১৯৩৭), *বেগম মহল* (১৯৩৮), *নজরুলকে যেমন দেখেছি* (১৯৫৮)

শামসুল আলম সাঈদ : *মূল্যবোধ ও বাংলা উপন্যাস* (১৯৮৮), *একাত্তরের জীবনযুদ্ধ* (১৯৯০), *মুক্তিযুদ্ধের মুখ চট্টগ্রাম* (১৯৯০), *চট্টগ্রামের মানস সম্পদ* (১৯৯১), *কাব্য বিশ্বাসের কবি ও কবিতা* (১৯৯৩), *বাঙালি জীবনে একুশ* (১৯৯৪), *একাত্তরের বিজয়* (১৯৯৭)

শাহরিয়ার কবির: *কমরেড মাও সে-তুঙ* (১৯৭৭), *রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে : আনোয়ার হোজার স্মৃতি* (১৯৮৬), *মওলানা ভাসানী* (১৯৯০), *কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার* (১৯৯১), *গণ আদালতের পটভূমি* (১৯৯৩), *বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র* (১৯৯৪), *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* (১৯৯৫)

শাহাবুদ্দীন আহমদ : *শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম* (১৯৭০), *সাহিত্য চিন্তা* (১৯৭৫), *নজরুল সাহিত্য বিচার* (১৯৭৬), *ছোটদের নজরুল* (১৯৭৮), *নজরুল সাহিত্য দর্শন* (১৯৮৩), *দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা* (১৯৯০), *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (১৯৮৯)

শাহেদ আলী : *পাকিস্তান রূপায়ণে তরুণ মুসলিমের ভূমিকা* (১৯৪৬), *ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা* (১৯৪৮), *একমাত্র পথ* (১৯৪৮), *সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া* (১৯৫২), *তরুণের সমস্যা* (১৯৬১), *তাওহীদ* (১৯৬৪), *বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (১৯৬৪), *জীবন নিরবচ্ছিন্ন* (১৯৬৮), *মুক্তির পথ* (১৯৬৯), *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৭০), *বুদ্ধির ফসল, আত্মার আশীষ* (১৯৭০), *The Economic Order of Islam* (1981)

সত্যেন সেন : *মহাবিদ্রোহের কাহিনী* (১৯৫৮), *বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রাম*, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম*, *বিশ্বমানবের মহাতীর্থে*, *মসলার যুদ্ধ* (১৩৭৫), *শহরের ইতিকথা* (১৩৮০ ব.), *মেহনতী মানুষ প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, *মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে* (১৩৭৭), *অভিযাত্রী* (১৩৭৬)

সনজীদা খাতুন : *কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত* (১৯৫৮), *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ* (১৯৮১), *ধ্বনি থেকে কবিতা* (১৯৮৭), *তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে* (১৯৯৪), *রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান* (১৯৯৪), *অতীত দিনের স্মৃতি* (১৯৯৩), রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ (২০০৫)

সনৎকুমার সাহা : *সমাজ সংসার কলোরব* (২০০০), *কথায় ও কথার পিঠে* (২০০৮), *ফিরে দেখা রবীন্দ্রনাথ* (২০১২)

সন্তোষ গুপ্ত : *স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে* (১৯৯৬), *ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু* (১৯৯৬), *ইতিহাস আমাদের দিকে* (১৯৯৭), *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প : স্বরূপের সন্ধান* (১৯৯৭)

সফিউদ্দিন আহমদ : *বাংলা গদ্যের বিবর্তন* (১৯৯৩), *জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা* (১৯৯৪), *ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৫), *জীবন শিল্পী বিদ্যাসাগর* (১৯৯৫), *মুসলিম সাময়িকপত্রে ভাষা সাহিত্য শিক্ষা চিন্তা* (১৯৯৫), *বাংলা গদ্য ও গদ্যশিল্পী* (১৯৭৬), *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৭৫), *মানুষ ও শিল্পী বিদ্যাসাগর* (১৯৮২), *উনিশ শতকের জীবন ও সাহিত্য* (১৯৮৪), *সার্বভৌম কবি* (১৯৯০), *স্বগত ভাবনা* (১৯৯০), *নতুন প্রত্যয়ের আলোকে* (১৯৭৪)

সরদার ফজলুল করিম : *নানা কথা*, *নানা কথার পরের কথা*, *রুমীর আম্মা*, *নূহের কিশতি*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *গল্পের গল্প*, *যুক্তিবিদ্যা*

সাঈদ-উর রহমান : *চারু মজুমদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (১৯৮৩), *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (১৯৮৩), *এ কেমন বাংলাদেশ* (১৯৯৮), *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ* (২০০১), *সামন্তযুগের বাংলা সংস্কৃতি ও কতিপয় বৈশিষ্ট্য* (২০০১), *সাহিত্য-সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে* (২০০২), *একই মায়ের পুত ও অন্যান্য* (২০০২), *অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ* (২০০২)

সালাহউদ্দীন আইয়ুব : *আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা* (১৯৯৪), *সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা* (১৯৯৯)

সালাহ্উদ্দীন আহমদ : *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯১), *বাংলাদেশ : জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র*, (১৯৯৩), *ইতিহাসের সন্ধানে* (১৯৯৫), *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835* (1965), *Bangladesh : Tradition and Transformation* (1947), *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh : An Introductory Outline* (1994)

সিদ্দিকা মাহমুদা : *রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প* (১৯৮১), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী* (১৯৮৭), *এম. ফাতেমা খানম* (১৯৮৯), *সা'দত আলী আখন্দ* (১৯৯০), *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য* (১৯৯২)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *অন্বেষণ* (১৯৬৪), *দ্বিতীয় ভুবন* (১৯৭২), *নিরাশ্রয় গৃহী* (১৯৭৪), *অনতিক্রান্ত বৃত্ত* (১৯৭৬), *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক* (১৯৬৯), *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ* (১৯৭৮), *অন্বেষণ* (১৯৬৪), *তাকিয়ে দেখি* (১৯৭৪), *আরণ্যক দৃশ্যাবলী* (১৯৭৪), *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি* (১৯৮১), আমার পিতার মুখ (১৯৭৬), মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৮৫), আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ (১৯৮৫), *স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়* (১৯৮৮), *বাঙালীকে কে বাঁচাবে* (১৯৯১), *বৃত্তের ভাঙা-গড়া* (১৯৮৯), *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ* (২০০০), *কুমুর বন্ধন* (১৯৭৭),*রাষ্ট্র ও কল্পলোক* (১৯৯১), *উপরকাঠামোর ভেতরেই* (১৯৮৪), *বেকনের মৌমাছিরা* (১৯৭৮), *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি* (১৯৭৯), *একই সমতলে* (১৯৮০), *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ* (১৯৮০), *বাঙালী কাকে বলি* (১৯৮৮), *টলস্টয় অনেক প্রসঙ্গের কয়েকটি* (১৯৮৫), *নেতা, জনতা ও রাজনীতি* (১৯৮৮), *গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে* (১৯৯১), *শেষ মীমাংসার আগে* (১৯৮৮), *উদ্যানে ও উদ্যানের বাইরে* (১৯৮৯), *শ্রেণী, সময় ও সাহিত্য* (১৯৯০), *স্বপ্নের আলোছায়া* (১৯৯১), *কেউ বলে বৃক্ষ, কেউ বলে নদী* (১৯৯০), *দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য মিথ্যা* (১৯৯২), *লেনিন কেন জরুরি* (১৯৯২), *আপনজন* (১৯৯৪), *অপরিচিত নায়ক পরিচিত দুর্বৃত্ত* (১৯৯২), *বাঙালীর জয়-পরাজয়* (১৯৯৪), *লিঙ্কনের বিষণ্ন মুখ* (১৯৯৪), *এর পথ ওর প্রাচীর* (১৯৯৫), *ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি* (১৯৯৫), *মাঝখানের মানুষেরা* (১৯৯৫), *দুই বাঙালীর লাহোর যাত্রা* (১৯৯৬), *পতঙ্গ ভৃত্য ও দৈত্য* (১৯৯৬), *রাষ্ট্রের*

মালিকানা (১৯৯৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০০০), *শেকসপীয়রের মেয়েরা* (২০০৪), *প্রভুর যত ইচ্ছা* (২০০৫), *বিচ্ছিন্নতার সত্য-মিথ্যা* (২০০৮)

সুকুমার বিশ্বাস : *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা : ১৯৪৭-১৯৭১* (১৯৮৮), *অসহযোগ আন্দোলন ৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (১৯৯৬), *বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস* (১৯৯৬), *বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যোৎসব কতিপয় দলিল* (১৯৯৮), *Japan and The Emergence of Bangladesh* (1998)

জীবনী : *আ. ন.ম. বজলুর রশীদ* (১৯৯০), *মনোমোহন দত্ত* (১৯৮৯), *নাজীর আহমদ* (১৯৯৩)

সুগত চাকমা : *বাংলাদেশের উপজাতি* (১৯৮৫), *চাকমা পরিচিতি* (১৯৮৩), *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা* (১৯৮৮), *চাকমা বাঙলা কথাতারা* (চাকমা বাংলা অভিধান) (১৯৭৩)

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : *জসীমউদ্‌দীন* (১৯৬৭) *কবি ফররুখ আহমেদ* (১৯৬৯) *মোজাম্মেল হক* (১৯৭০), *সাহিত্য সমীক্ষা* (১৯৭৬)

সেলিনা হোসেন : *স্বদেশে পরবাসী* (১৯৮৫), *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন* (১৯৮৫), *একাত্তরের ঢাকা* (১৯৯০), *নির্ভয় কর হে* (১৯৯৮)

সেলিম আল দীন : *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* (১৯৯৫)

সেলিম জাহাঙ্গীর : *মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৩), *সুফিয়া কামাল* (১৯৯৪), *লোকায়ত নজরুল* (১৯৯৭)

সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ* (১৯৬৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৮৫), *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য* (১৯৯৭) গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আকরম হোসেনের জীবনীগ্রন্থ : *এস. ওয়াজেদ আলী* (১৯৮৭), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌* (১৯৮৮), *আবদুর রাজ্জাক* (১৯৯০)

সৈয়দ আবুল মকসুদ: *জার্মানীর জার্নাল* (১৯৭৯), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য ১ম খণ্ড* (১৯৮১), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য ২য় খণ্ড* (১৯৮৩), *যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা* (১৯৮৮), *হরিশচন্দ্র মিত্র* (১৯৯০), *ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র* (১৯৯০), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর সাহিত্যকর্ম* (১৯৯০), *গোবিন্দচন্দ্র দাসের ঘর গেরাস্থালি* (১৯৮১), *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ দার্শনিক* (১৯৯২), *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী* (১৯৯৫),

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (১৯৮২), *বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব* (১৯৮৫), *প্রাচীন চীন সভ্যতা* (১৯৮৬), *ক্রান্তিকালের বাংলাদেশ : নব্বুইয়ের গণঅভ্যুত্থান থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ* (১৯৯৩), *বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব* (১৯৯৪), *বাংলাদেশের গণতন্ত্র : আশা-নিরাশার দোলাচল* (১৯৯৪), *বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্ব* (১৯৯৫), *বাংলাদেশ : সংকট-সংলাপের রাজনীতি* (১৯৯৫), *বঙ্গবন্ধুর*

পররাষ্ট্রনীতি, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব (১৯৯৬), *বাংলাদেশ -৯৬ : রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি* (১৯৯৭), *Back to Africa Movement* (1983)

সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (যুগ্মভাবে, ১৯৫৪), *নজরুল ইসলাম* (১৯৫৪), *Essays in Bengal Literature* (1956), *কবি মধুসূদন* (১৯৫৭), *কবিতার কথা* (১৯৫৭), *সাহিত্যের কথা* (১৯৬৪), *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা* (১৯৬৮), *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে* (১৯৭০), *রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা* (১৯৭৪), *মধুসূদন : কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ* (১৯৭৫), *আধুনিক জার্মান সাহিত্য* (১৯৭৬), *সতত স্বাগত* (১৯৮৩), *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (১৯৮৩), *সরহ পার দোহাকোষ গীতি* (১৯৯৩), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ* (১৯৯৪), *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ* (১৯৯৬), *মৃগাবতী* (১৯৯৮), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৫)।

সম্পাদনা : *পদ্মাবতী* (১৯৬৮), *মধুমালতী* (১৯৭২)

সৈয়দ মুজতবা আলী : *পঞ্চতন্ত্র* (১ম ও ২য় পর্ব, ১৯৫২), *ময়ূরকণ্ঠী* (১৯৫৫)

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : *পশ্চিম পাকিস্তান* (১৯৫২), *History of Jainta* (1954), *History of Chittagong* (1964), *Personality Profiles* (1964), *হজরত শাহ্জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (১৯৬৫), *প্রবন্ধ বিচিত্রা* (১৯৬৭), *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৯৭৬),

সৈয়দ শামসুল হক : *হৃৎকলমের টানে/ ১ম খণ্ড* (১৯৯১), *হৃৎকলমের টানে/ ২য় খণ্ড* (১৯৯৭), *মার্জিনে মন্তব্য* (২০০৫),

হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী : *সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ চেতনা* (১৩৭৭), *প্রবন্ধ সংকলন* (১৩৭৮), *স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলীগড় আন্দোলন* (১৩৮০), *মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম* (১৩৮০), *মানবতার জন্য জাতিসংঘ* (১৩৮২), *মানবতা* (১৩৮৪), *রবীন্দ্র কাব্যে গঙ্গা পদ্মা ইছামতি নদী* (১৩৮২), *গণ-জাগরণে মানুষের কবি নজরুল* (১৩৮৭), *মেঘনাদবধ কাব্য মাইকেল মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি* (১৩৮৭), *জন-দরদি-জন-কণ্ঠ-কবি কিশোর সুকান্ত* (১৩৯২), *বাঙালি বাংলাদেশ জাতির জনক* (১৩৯২), *মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ বাঙালী শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা* (১৯৯২), *ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালীর বাংলাদেশ* (১৯৯২)

হামান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা* (১৯৮১), *অপ্রকাশের ভার* (১৯৮৮), *অতলের আঁধি* (১৯৯৮), *কথা লেখা কথা* (২০০৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৮), *ছড়ানো ছিটানো* (২০০৮), *রবীন্দ্রনাথ ও ভাষাভাবনা* (২০১৪)

হামিদা রহমান : *নারীর অধিকার ও মর্যাদা* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার বিদায়* (১৯৮৯), *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহীদ বুদ্ধিজীবী* (১৯৮৯)

হাসান জামান : *ইসলামী তমুদ্দুন* (১৯৫২), *সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (১৯৬৭), *ইসলাম ও কমিউনিজম* (১৯৬১), *ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম* (১৯৫৪)

হাসান হাফিজুর রহমান : *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫) *মূল্যবোধের জন্য* (১৯৭০), *সাহিত্য- প্রসঙ্গ* (১৯৭৩), *আলোকিত গহ্বর* (১৯৭৭)। *প্রবন্ধসমগ্র* (২০০৫)

হারুন হাবীব : *মুক্তিযুদ্ধের দুই যুগ, জনযুদ্ধের উপাখ্যান, ডেটলাইন আগরতলা, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*

সম্পাদনা : *নির্বাচিত গল্প*

হায়াৎ মামুদ : *স্বগত সংলাপ* (১৯৬৭), *মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা* (১৯৬৮), *প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি, বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই* (১৯৮৪), *বাংলাদেশের মাতৃভাষার অধিকার* (১৯৮৬), *সোমেন চন্দ* (১৯৮৭), *সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গান্তর* (১৯৮৮), *প্রতিভার খেলা নজরুল* (১৯৮৮), *দিনযাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ* (১৯৯৮), *গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদফ* (১৯৮৫), *ভ্রমি বিস্ময়ে* (১৯৮৯), *অবহেলিত ধ্রুবপদ ও কিন্নর দল* (১৯৯১), *নষ্ট বঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রব্রজ্যা* (১৯৯৪), *উৎসে ফেরার ছলচাতুরি* (১৯৯৬), *সাহিত্য : কালের মাত্রা* (২০০৩); তাঁর ব্যাকরণ বিষয়ক বই *বাংলা লেখার নিয়ম, মাতৃভাষায় ব্যাকরণ*, হায়াৎ মামুদের আত্মধর্মী গ্রন্থ : *অবহেলিত ধ্রুবপদ ও কিন্নরদল* (১৯৯১)

সম্পাদনা : *ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ, তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ, সত্যেন সেন রচনাসমগ্র* (যৌথ), *ভাষা আন্দোলনের পটভূমি* গ্রন্থমালা (১৯৯০), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৫), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (১৯৯৬), *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* (১৯৯৬), *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্* (উপন্যাসসমগ্র নাটকসমগ্র গল্পসমগ্র) (১৯৯৬)

জীবনী : *সোমেন চন্দ, সিকান্দার আবু জাফর* (১৯৮৮), *আহমদ মীর* (১৯৮৯), *আবু জাফর শামসুদ্দীন* (১৯৯০), *লিয়েফ তলোস্তয়* (১৯৯১),

হুমায়ুন আজাদ : *রবীন্দ্র প্রবন্ধ/ রাষ্ট্র ও সমগ্র চিন্তা* (১৯৭৩), *লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* (১৯৭৬), *শামসুর রাহমান / নিঃসঙ্গ শেরপা* (১৯৮৩), *Pronominalization in Bengali* (1983), *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* (১৯৮৩), *বাক্যতত্ত্ব* (১৯৮৪), *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* (১৯৮৫), *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* (১৯৮৭), *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (১৯৮৮), *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৮), *ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* (১৯৯০), *নারী* (১৯৯২), *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নীচে* (১৯৯২), *নিবিড় নীলিমা* (১৯৯২), *মাতাল তরণী* (১৯৯২), *নরকে অনন্তঋতু* (১৯৯২), *জলপাইরঙের অন্ধকার* (১৯৯২), *সীমাবদ্ধতার সূত্র* (১৯৯৩), *আধার ও আধেয়* (১৯৯৩), *বুকপকেটে জোনাকীপোকা* (১৯৯৩), *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* (১৯৯৬), *আমার অবিশ্বাস* (১৯৯৭), *অর্থবিজ্ঞান* (১৯৯৯), *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* (১৯৯৭), *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (১৯৯৮), *বাক্যতত্ত্ব* (১৯৮৪), *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* (১৯৯২), *সাক্ষাৎকার*

(১৯৯৪), *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* (১৯৯৫), *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* (১৯৯৭), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯), *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* (২০০৪)

হুমায়ুন কবির : *ইম্যানুয়েল কান্ট* (১৯৩৬), *মার্কসবাদ* (১৯৪৮), *বাঙলার কাব্য* (১৯৫৪), *শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব* (),*Kant on philosophy in General* (1935), *Poetry Monods and Society* (1941), *Rabindranath Tagore* (1962), *The Bengali novel* (1968)

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ : স্বাধীনতার সংগ্রাম : *ঢাকায় গেরিলা অপারেশন* (১৯৭২), *অবরুদ্ধ সংবাদপত্র ৭১* এবং *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল* (১৯৮৩), *গানের অতিথি* (১৯৮৬)

জীবনী : *আলতাফ মাহমুদ* (১৯৮২)

বাংলাদেশের অনুবাদ

আকবরউদ্দীন *অপরাধ ও শাস্তি*, *হাজী মুরাদ*, হেনরী জেমস এডামসে *শিক্ষাবিষয়ক আত্মচরিত* (১ম ও ২য় খণ্ড)

আনিসুজ্জামান : *আদর্শ স্বামী* (১৯৮২), *ছায়াহীন কায়া* (১৯৭৭), *ইলেকট্রা* (১৯৭৯), *অ্যান্টিগনি* (১৯৭৭)

আবদুল গনি হাজারী : *স্বর্ণগর্ধভ* (১৯৬৫), *ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা* (১ম ও ২য় খণ্ড)

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : *শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস* (১৯৯২), *দ্যাগ হ্যামারশোল্ড* (১৯৬৯)

আবদুস সেলিম : *গ্যালিলিও* (১৯৭৮)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *অনাবাদী জমি* (১৯৩৮), *ত্রিস্রোতা* (১৯৩৯), *খরতরঙ্গ* (১৯৫৩); *ইলিয়ড* (১৯৬৭), *সেকালের ও একালের সেরা গল্প* (১৯৬৩)

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন : *ছোটগল্প* (১৩৭১), *তুহাফুতুল ফলাসিফা* (১৩৭১)

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *শিল্পীর সাধনা* (১৯৬৭), *খাপছাড়া* (১৯৬৮), *পার্লবার্কের সেরা গল্প* (১৯৬৮)।

আবু শাহরিয়ার : *ডেনমার্কের রাজকুমার* (১৯৭৯), *অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা* (১৯৭৮), তপ্ত *বাতাসে দুজন* (১৯৭৭)

আলম খোরশেদ : *যাদুবাস্তবতা গাথা : ল্যাতিন আমেরিকার গল্প*

আলী আনোয়ার : *অনিকেত বেদনা* (১৯৮৫)

আলী আহমদ : *পাস্কুয়াল দুয়ার্তের পরিবার*, *স্বপ্নগিরি*, *চোর ও সারমেয় সমাচার*, *প্রথম প্রেম*, *বারো অভিযাত্রীর কাহিনী*, *মেঘ ও অন্যান্য দানব*, *শিকার ও অন্যান্য গল্প* এবং *খোঁজ*।

আসকার ইবনে শাইখ : *যন্ত্রণার চাপ* (১৯৭৮)

আহমদ ছফা : *তানিয়া* (১৯৬৭), *ফাউস্ট* (১৯৮৬), *বার্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়ী রচনাবলী*

কবীর চৌধুরী : *শেখভের গল্প* (১৯৬৯), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৭০), *গ্রেট গ্যাটসবি* (১৯৭১), *দি গ্রেপস অব র‍্যাথ* (১৯৮৯), *রূপান্তর* (১৯৯০), *বেউলফ* (১৯৮৫), *অল দি কিংস*

মেন (১৯৯২), *ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী* (১৯৯৪), *চুম্বন* (২০০০), *কাফকার নির্বাচিত গল্প* (২০০১), *ব্লুবিয়ার্ড* (২০০১), *প্রেম ও কলেরা* (২০০২), *অরণ্যের গল্পমালা* (২০০২), *ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন* (২০০১), *ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড* (২০০২), ক্যথরিনা *ব্লুমের হারানো সম্ভ্রম* (২০০৩), *ডিনারপার্টি* (২০০৩), *নেটিভসান* (২০০৫), *হোর্হে বোরহেসের নির্বাচিত গল্প* (২০০৬), *দুই নোবেল বিজয়ীর নির্বাচিত ছোটগল্প* (২০০৬), *ব্ল্যাক বয়* (২০০৬), *দি লেইট বুর্জোয়া ওয়াল্ড* (২০০৬), *ন্যুড চিত্রকর্ম* (২০০৬), *মানুষের চিত্রকর্ম* (২০০৬), *চোখের আলোয় দেখেছিলেম* (২০০৬), *জীবনযাপনের শিল্পকলা* (২০১২)।

নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর

আহ্বান (১৯৬৫), *শত্রু* (১৯৬২), *পাঁচটি একাঙ্কিকা* (১৯৬৩), *অচেনা* (১৯৬৯), *শহীদের প্রতীক্ষায়* (১৯৫৯), *হেক্টর* (১৯৬৯), *ছায়াবাসনা* (১৯৬৬), *সেই নিরালা প্রান্তর* (১৯৬৬), *সম্রাট জোনস* (১৯৬৪), *অমা রজনীর পথে* (১৯৬৬), *প্রাণের চেয়ে প্রিয়* (১৯৭০), *লিসিসট্র্যাটা* (১৯৮৪), *ভেক* (১৯৮৬), *বিহঙ্গ* (১৯৮৬), *জননী সাহসিকা ও তার সন্তানরা* (১৯৮৪), *গডোর প্রতীক্ষায়* (১৯৮১), *ঊষা দিশেহারা ও অন্যান্য নাটিকা* (১৯৯২), *ওথেলো* (১৯৮১), *শাইলোর উন্মাদিনী* (১৯৯০), *মানব বিদ্বেষী* (১৯৯০), *বেকেটের দুটি নাটক* (যুগ্মভাবে) (১৯৯৯), *বেকেটের তিনটি নাটক* (২০০০), *শান্তি* (১৯৯৮), *ফেইড্রা* (১৯৯৬), *হ্যামলেট মেশিন* (১৯৯৭), *গণ্ডার* (২০০০), *সেরা তিন একাঙ্কিকা* (২০০২), *সমরেশ কোথায়* (২০০২), *ওয়াচ অন দি রাইন* (২০০৩), *ক্যাথলিন* (১৯৭৪), *অমা রজনীর পথে* (১৯৮৭), *বেকেটের পনেরো নাটক* (যুগ্মভাবে) (২০০৬)

কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ

ভাৎসারোভের কবিতা (১৯৮০), *আধুনিক বুলগেরীয় কবিতা* (১৯৮০), *রিস্তো বোতেভের কবিতা* (১৯৮৮), *রিস্তো স্মিনেনস্কির কবিতা* (১৯৮৯), *কাহলির জিবরানের কবিতা* (১৯৯২), *সচিত্র প্রেমের কবিতা* (২০০০)

গবেষণা গ্রন্থের অনুবাদ

আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য (১৯৬৮), *সপ্তরথী* (১৯৭০), *মার্কিন উপন্যাস ও তার ঐতিহ্য* (১৯৭০), *অবিস্মরণীয় বই* (১৯৬০), *মানুষের শিল্পকর্ম*

কাওসার হুসাইন : *ইতালো কালভিনের গল্প* (১৯৯৬), ইউলিয়াম ব্লেইকের *সঙ্গস অব ইনোসেন্স এন্ড এক্সপেরিয়েন্স* অবলম্বনে *শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান* (১৯৯১)

কাজী মোহাম্মদ ইদরিস : *স্ট্রীন্ডবার্গের সাতটি নাটক* (১৯৭৮)

খায়রুল আলম সবুজ : *গাঙচিল, আন্তিগোনে* (১৯৯০), *নোরা* (১৯৯৬), *বুড়োবট ও শকুন* (১৯৯৬)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন : *টেরি ঈগলটন সাহিত্যতত্ত্ব* (২০০৪), *রাজা ঈদিপাস* (১৯৮৬), ইউরিপিডিসের *আলসেস্টিস* (১৯৮৭), *পাউল সেলানের কবিতা* (১৯৯৭), *সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের উপাদান* (১৯৮৯)

গোলাম মোস্তফা : *মুসাদ্দাসে-হালী* (১৯৪৯), *কালামে ইকবাল* (১৯৫৭), *আল কুরআন*, *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* (১৯৬০)

চৌধুরী শামসুর রহমান : *নিষিদ্ধ ফল* (১৯৬০), *তাসকিরাতুল ওয়াকিয়াত* (১৯৬৮), *টমাস জেফারসন* (১৯৫৮), *প্রজাপতির বিচিত্র কথা* (১৯৬২), *মেক্সিকো* (১৯৬৭), *আফ্রিকার অভ্যন্তরে* (১৯৬৯)

জাফর তালুকদার : *ইন্দোনেশিয়ার গল্প* (১৯৮৯), *ঢেউয়ের গান* (১৯৯১), *ভিনদেশী মজার গল্প* (১৯৯৬), *ফ্রান্সের রূপকথা* (১৯৯৭), *নানান দেশের রূপকথা* (১৯৯৭), *বিদেশী মজার গল্প* (১৯৯২)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : *শেক্সপীয়রের সনেট* (১৯৭৭), *অ্যারিওপাজিটিকা* (১৯৭১), *স্যমসন অ্যগানিসটিজ* (১৯৭৩), *টেমপেস্ট* (১৯৮৫)

জিয়া হায়দার : *এ্যান্টিগোনে* (১৯৯২)

ফতেহ লোহানী : *চতুষ্টয়* (১৯৬৭), *একটি সামান্য মৃত্যু* (১৯৭৯)

বদিউর রহমান : *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স* (১৯৯৫), *হোরেসের আর্সপোয়েটিকা* (১৯৯৬), *লঙ্গিনাসের কাব্যতত্ত্ব* (১৯৭৭)

মতিনউদ্‌দীন আহমদ : *অর্থনীতির গোড়ার কথা* (১৯৬৪), *ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট* (১৯৬৪), *শত জীবনের কথা* (১৯৬২), *অশান্ত পৃথিবী* (১৯৬০), *জনসংখ্যা বাড়ছে* (১৯৫৯), *বিজন বনের রূপকথা* (১৯৫৯), *হাতের কাছের কলকব্জা কিভাবে চলে* (১৯৬৪), *চালাক হওয়ার পয়লা কিতাব* (১৯৫৮), *জগৎ জুড়ে মজার খেলা* (১৯৬৪)

মফিজ চৌধুরী : *কিং লিয়র* (১৯৭৮), *অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা* (১৯৯২)

মান্নান হীরা : *কোরিওলেনাস* (১৯৭৮)

মুনীর চৌধুরী : *কেউ কিছু বলতে পারে না* (১৯৬৭), *রূপার কৌটা* (১৯৬৯), *জনক* (১৯৭০), *স্বামী সাহেবের অনশনব্রত* (১৯৪৬), জমা খরচ ও ইজা (১৯৬৮), মহারাজ (১৯৬৮), গুর্গন খাঁর হীরা (১৯৬৮), ললাট লিখন (১৯৬৯), *মুখরা রমণী বশীকরণ* (১৯৭০)

অনূদিত রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক :

শেকস্‌পীয়রের *ওথেলো*, টেনেসী উইলিয়ামস-এর এ স্ট্রীটকার নেম্‌ড্ ডিজায়ার অবলম্বনে *গাড়ীর নাম বাসনাপুর*, রোমিও-জুলিয়েট, শেকস্‌পীয়রের মাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নার্থিং-এর অনুবাদ *অকারণ ডামাডোল*, জর্জ বার্নার্ড শ'র *ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান*, ইউজীন ও'নীল মর্নিং বিকাস্ ইলেকট্রার অনুবাদ *ইলেকট্রার জন্য শোক*, শেরিডানের *দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল*।

মুস্তাফিজুর রহমান : *নিঃশব্দ নরকে* (১৯৭৬)

মুহম্মদ নূরুল হুদা : *পরিবর্তনের পথে* (১৯৭২), *আগামেনন* (১৯৮৭), *ইউনুস এমরের কবিতা* (১৯৯২), *বাস্তুহারা* (১৯৯৫), *ফ্ল্যবারী ও কনরের গল্প* (১৯৯৭), *নীল সমুদ্রের ঝড়* (১৯৮৪), *রোমিও জুলিয়েট* (১৯৯৮)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : *রুবাইয়াত-ই-ওমর খয়্যাম* (১৯৪২), *অমিয় শতক* (১৯৪০), *দীওয়ানে হাফিজ* (১৯৩৮), *শিক্ওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ* (১৯৪২), *মহানবী* (১৯৪৬), *বাইঅতনামা* (১৯৪৮), *বিদ্যাপতি শতক* (১৯৫৪), *কুরআন প্রসঙ্গ* (১৯৬২), *মহররম শরীফ* (১৯৬২), *অমর কাব্য* (১৯৬৩), *ইসলাম প্রসঙ্গ* (১৯৬৩), *Hundred Saying of the Holy Prophet* (1945), *Buddhist Mystic Songs* (1960)

মোবারক হোসেন খান : *তারাস বুলবা* (১৯৯১), *ক্যাপ্টেন দুহিতা* (১৯৮১), *নিঃসঙ্গ* (১৯৭৯), *তিন তরঙ্গ* (১৯৮৩), *শিকারীর গুহা* (১৯৮১), *অ্যারাবিয়ান নাইটস* (১৯৯৬), *টেইল্স ফ্রম শেক্সপীয়ার* (১৯৯৬), *সাগরের হাতছানি* (১৯৯৬), *এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী* (১৯৯৫), *রূপকথার বিশ্ব* (১৯৯৬), *কিশোর চিরায়ত কাহিনী* (১৯৯৪), *এশিয়ার লোককাহিনী* (১৯৮৫), *বিশ্বের অন্যান্য গল্প* (১৯৯৫), *আইভানভ* (১৯৭৮), *পৃথিবীর প্রথম দিনগুলো* (১৯৮৬), *নোবেল বিজয়ীদের নির্বাচিত গল্প* (১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৯১), *পৃথিবীর সেরা গল্প* (১৯৮৭), *সাতনরী গপ্পো* (১৯৮২), *আফ্রিকার নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫), *'বিস্ময়' গ্রহের উপাখ্যান* (১৯৯১), *ঈশপের গল্প* (১৯৯২), *ঈশপের আরো গল্প* (১৯৯২), *শ্রেষ্ঠ থ্রিলার কাহিনী* (১৯৯৫), *বিশ্বনন্দিত গল্প* (১৯৯১), *আমেরিকার ফার্স্টলেডীর বিচিত্র জীবন* (১৯৯৭)

মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ : *ভাষা চিন্তায় ও কর্মে* (১৯৬৯), *মাছি*, *তিনটি ফরাসী প্রবন্ধ* (১৯৮৪), *হাসান বয়াতীর সুখ-দুঃখ* (১৯৯৪), *হাসান বয়াতীর সুখ দুঃখ*

রশীদ হায়দার : *কাঠগড়া* (১৯৮৪)

শফি আহমেদ : *মুক্তো* (১৯৮৭), *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* (১৯৯৩), *দ্য লায়ন এ্যান্ড দ্য জুয়েল* (১৯৯৪), *পারিবারিক পুনর্মিলনী* (১৯৯৫), *মোমাডের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ* (১৯৯৫), *নারী-কাহিনী* (১৯৯৫)

শহীদ আখন্দ : *মানসী* (১৯৫৯), *যখন সুমতি* (১৯৭৮), *আরো কিছু জীবন* (১৯৮০), *আমাকে হত্যা করা হলে* (১৯৮১)

শামসুর রাহমান : *হ্যামলেট : ডেনমার্কের যুবরাজ* (১৯৯৫)

শামসুদ্দিন চৌধুরী : *অদৃষ্টবাদী জ্যাক ও তার মনিব* (১৩৯৯), *মাইকেলের চেখভের অভিনয় পদ্ধতি* (১৪০৯), *ইলিয়াদ* (১৪১২), *চিলিতে অজ্ঞাতবাস* (১৪১৩), *নব উপন্যাসের পক্ষে* (১৪১৭), *ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস নির্বাচিত রচনা* (১৪১৭), *নন্দনতত্ত্ব* (১৪১৭)

শাহেদ আলী : *ইতিবৃত্ত* (১৯৯৪)

সরদার ফজলুল করিম : *প্লেটোর রিপাবলিক* (১৯৭৪)

সাঈদ-উর রহমান : *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা* (১৯৮৫)

সিকান্দার আবু জাফর : *রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম* (১৯৬৬), *সেন্ট লুইয়ের সেতু* (১৯৬১), বারনাড মালামুডের *যাদুর কলস* (১৯৫৯), *সিংয়ের নাটক* (১৯৭১)

সিরাজুর রহমান : *আন্তন চেখভের নাটক, গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স,* শার্লোট ব্রন্টির *জন এয়ার,* জেন অস্টিনের *প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস*

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব* (১৯৭৫), *বুনো হাঁস* (১৯৬৫)

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় : *অ্যারিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৭৬), *হোরেসের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৭৯), *লঙ্গিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব* (১৯৯৭)

সুব্রত বড়ুয়া : *দি রাইট স্টাফ, কণা, কোয়ন্টাম ও তরঙ্গ* (১৯৮৪), *আমেরিকার ভৌগোলিক রূপরেখা* (১৯৮৬), *শঙ্খচিল* (১৯৯৪), *এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী* (১৯৭২)

সৈয়দ আলী আহসান : *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *প্রেমের কবিতা* (যুগ্মভাবে ১৯৫৮), *হুইটম্যানের কবিতা* (১৯৬৫), *ইডিপাস* (১৯৬৮), *সাম্প্রতিক জার্মান গল্প* (১৯৭০), *জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী* (১৯৭৪), *উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা* (১৯৮২), *সন্দেশ রাসক* (১৯৮৭), *নাহজুল বালাঘা* (১৯৮৮)।

সৈয়দ শামসুল হক : *ম্যকবেথ, টেমপেস্ট* (১৯৮৮), *শ্রাবণ রাজা* (১৯৬৯), *গোলাপের বনে দীর্ঘশ্বাস* (২০০০)

হাবীবুর রাহমান : *চীনা প্রেমের গল্প* (১৯৬৩), *জন কেনেডী* (১৯৬২), *জীবনের জয়গান* (১৯৬২), *পাল তুলে দাও* (১৯৬১)

শিশুসাহিত্য

অনামিকা হক লিলি: *এসো গল্পের দেশে* (১৯৭৪), *সাহসী ইঞ্জিন* (১৯৮০), *ছড়ার ছন্দে দুলি* (১৯৮২), *ছুটির দুপুরে* (১৯৮০)

আতোয়ার রহমান : *ঝিলিমিলি : সাঁঝের বেলার রূপকথা* (১৯৫৮), *মহাবিপ্লবের বীর সিপাহী* (১৯৬২), *রাজকন্যে কঙ্কাবতী, আজব প্রাণী আজব গাছ* [প্রথম খণ্ড] (১৯৬৭) ও [দ্বিতীয় খণ্ড] (১৯৬৮), *টুনটুনের বাঁশি* (১৯৬৭), *বিলেতী ছড়া* (১৯৬৮), *ঝর্নামালা* (১৯৬৯), *রঙে রঙে বোনা* (১৯৭২), *কাচের পাহাড়* (১৯৭৪), *সোনার পাখি* (১৯৭৫), *তেরো নদীর পাড়ে, তিন পুণ্যির ঘাট*

আনজীর লিটন : *ছড়া : খাড়া দুটো শিং* (১৯৮৭), *আগে গেলে বাঘে খায়* (১৯৯৫), *আমাদের রাজনীতি চলে বাঁকে বাঁকে* (১৯৯৬)। কিশোর উপন্যাস : *ছদ্মবেশী রোবট* (১৯৯৩), *ডুডুল রাজার পাহাড়ে* (১৯৯৪)

আনোয়ারা সৈয়দ হক : *ছানার নানাবাড়ি* (১৯৭৭), *বাবার সঙ্গে ছানা* (১৯৮৬), *ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৭), *মুক্তিযোদ্ধার মা মুক্তিযোদ্ধার ছেলে*

আমীরুল ইসলাম : *খামখেয়ালী* (১৯৮৪), *যাচ্ছেতাই* (১৯৮৭), *রাজাকারের ছড়া* (১৯৯০), *আমার ছড়া* (১৯৯২), *বিলাই* (১৯৯৭), *বীর বাঙালীর ছড়া* (১৯৯৭), *চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে* (১৯৯৭), *ছড়ার তেলে ছড়া ভাজা* (১৯৯৭),

ছোটদের গল্প : *আমি সাতটা* (১৯৮৫), *এক যে ছিল* (১৯৮৬), *দশ রকম দশটা* (১৯৮৯), *সার্কাসের বাঘ* (১৯৮৯), *ভূত এলো শহরে* (১৯৯২), *আমি ওয়ান আমি টু*

(১৯৯২), *রোবট রহস্য* (১৯৯২), *আমি মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই* (১৯৯৩), *লুথাদ্বীপের রহস্য* (১৯৯৪), *সাদা ভূত কালো ভূত* (১৯৯৬)

কিশোর উপন্যাস : *অচিন যাদুকর* (১৯৮৫), *আমাদের গোয়েন্দাগিরি* (১৯৯২), *রুমঝুমপুর* (১৯৯২)

আল কামাল আবদুল ওহাব : *নিরুদ্দেশের পথে* (১৯৬৩), *মুখোশ* (১৯৭৯), *গহন বনের পথে* (১৯৭৯), *বিনাটিকেটের যাত্রী* (১৯৬২), *মেঘবৃষ্টি* (১৯৬৮), *বিজয় অভিযান* (১৯৬৪), *সাতরঙ* (১৯৫৮), *তারার আকাশ* (১৯৭৫), *গহন বনের শিকারী* (১৯৮২)

আলমগীর জলিল : *জুতো পায়ে পুষি বেড়াল* (১৯৬৩), *তাকডুমাডুম* (১৯৬৩), *এক যে ছিল পুতুল* (১৯৬৯), *হট্টমালার দেশে* (১৯৭৫)

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *জলহস্তী* (১৯৮২), *সারকাস* (১৯৮৩)। *জন্মভূমি* (১৯৯৯), *কিশোর সমগ্র* (২০০০)

আলী ইমাম : *দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া* (১৯৭৫), *অপারেশন কাঁকনপুর* (১৯৭৮), *চারজনে* (১৯৭৯), *তিতির মুখীর চৈতা* (১৯৭৯), *সাদা পরী* (১৯৭৯), *পাখিদের নিয়ে* (১৯৭৯), *রূপালী ফিতে* (১৯৭৯), *সোনার তস্তরী* (১৯৮১) প্রভৃতি।

আশরাফ সিদ্দিকী : *সিংহের মামা ভোম্বল দাস* (১৯৬৩), *আমার দেশের রূপকাহিনী* (১৯৬৪), *বাণিজ্যেতে যাবো আমি* (১৯৭৮), *বাংলাদেশের রূপকথা* (১৯৯১), *আমি বাজি ঝনঝন* (১৯৭৯), *রূপকথা রাজ্যে* (১৯৯৩)

ইব্রাহীম খাঁ : *ব্যঘ্র মামা* (১৯৫১), *শিয়াল পণ্ডিত* (১৯৫২), *নিযাম ডাকাত* (১৯৫০), *বেদুইনদের দেশে* (১৯৫৬), *ছোটদের মহানবী* (১৯৬১), *ইতিহাসের আগে মানুষ* (১৯৬১), *গল্পে ফজলুল হক* (১৯৭৭), *ছোটদের নজরুল*

এখলাসউদ্দিন আহমদ : *এক যে নেংটি* (১৯৬৫), *বেলুন বেলুন* (১৯৬৯), *মাঠ পারের গল্প* (১৯৭০), *হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী* (১৩৮৭), *তুনুর দুপুর* (১৯৮২), *অন্য মনে দেখা* (১৩৯৭), *টাট্টুঘোড়া টাট্টুঘোড়া* (১৯৮৭), *রাজ রাজড়ার গপ্পো* (১৯৮৯), *তুনু ও কেদো বাঘের গপ্পো* (১৯৭৯), *তুনতু বুড়ির আজব সফর* (১৯৯০), *কেঁদোর কাণ্ডকারখানা*, *তুনুকে নিয়ে গপ্পো*, *তুনতুর গপ্পো*, *হাসির ছড়া মজার ছড়া* (১৯৬২), *তুনতুবুড়ির ছড়া* (১৯৬৬), *টুকরো ছড়ার ঝাঁপি* (১৯৬৬), *বাজাও ঝাঁঝর বাদ্যি* (১৯৭০), *ইকরি মিকড়ি* (১৯৭৫), *বৈঠকী ছড়া* (১৯৭৫), *কাটুম কুটুম* (১৯৭৭), *ছোট রঙিন পাখি* (১৯৮১), *প্রতিরোধের ছড়া* (১৯৮৬), *অষ্টাশির ছড়া* (১৯৯২),

এস. ওয়াজেদ আলী : *বাদশাহী গল্প* (১৯৪৪), *গল্পের মজলিশ* (১৯৪৪)

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস: *জানোয়ারও যাদু জানে* (২০০২)

জুবাইদা গুলশান আরা : *মজার ছড়া* (১৯৭০), *ছানাপোনাদের ছড়া* (১৯৭৮), *নিঝুম দ্বীপের গল্পকথা* (১৯৭৯), *কলকাকলীর গান* (১৯৮৪), *ঘুম ভাঙানো নদী* (১৯৮৮), *ফুল ফোটানোর জন্য* (১৯৯১)

জোবেদা খানম : *ছোটদের একাঙ্কিকা* (১৯৬৩), *গল্প বলি শোন* (১৯৬৬), *মহাসমুদ্র* (১৯৭৭), *সাবাস সুলতানা* (১৯৮২), *শাহরিয়ারের অ্যাডভেঞ্চার* (১৯৮৪)

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *ঘুম নেই* (১৯৭৯), *অন্যরকম অভিযান* (১৯৮১), *ওরা ছিল বাগানে* (১৯৮৯), *যেমন খুশী সাজো* (১৯৯১)

ফয়েজ আহমদ : *হাতে খড়ি* (১৯৫৪), *জোনাকী* (১৯৫৬), *তা ধিনতা* (১৯৬৩), *পুতলী* (১৯৬৪), *রিম ঝিম* (১৯৬৫), *তা তা থৈ থৈ* (১৯৭৫), *বোকা আইভান* (১৯৭৬), *হে কিশোর* (১৯৮২), *ছোট ছেলে জামানের* (১৯৮২), *টুকটাক* (১৯৯৫), *টুঙ* (১৯৯৫)

বন্দে আলী মিয়া : *বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা* (১৯৪০), *বোকা জামাই* (১৯৪১), *ছোটদের নজরুল* (১৯৬১), *শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা* (১৩৬৩ ব.), *ছোটদের বিষাদ-সিন্ধু* (১৯৩৯)

বিপ্রদাশ বড়ুয়া : *সূর্য লুঠের গান* (১৯৮০), *তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম* (১৯৮৫), *আরব্য রজনী* (১৯৮৯), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯১), *সোহরাব রুস্তম* (১৯৮৯), *বাঘের উপর টাগ* (১৯৯৩), *অজগর রাজা* (১৯৯৪), *গ্রাম বাংলার সেরা হাসির গল্প* (১৯৯৫), *ডাকাত ডাকাত* (১৯৯৬), *রক্তঝরা রণ* (১৯৯৭), *জাদুর বাঁশি* (১৯৯৭) উপন্যাস : *রোবট ও ফুল ফুটানোর রহস্য* (১৯৮৮), *জাদুমানিক স্বাধীনতা* (১৯৯২), *নোভায়া জেমলায়ার বিভীষিকা* (১৯৯৬), *দৈত্য পাহাড়ের ক্ষুদে মানুষ* (১৯৯৬)

বুলবন ওসমান : *কানা মামা* (১৯৬৮), *অপয়া* (১৯৭৭), *ঐরাবত* (১৯৭৫), *অমিতের কথা* (১৯৭৮), *উটকো* (১৯৭৯), *মেঘ মোষ এক সমান* (১৯৭৯)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : *শেষ নবীর সন্ধানে*, *ছোটদের রসুলুল্লাহ* (১৯৬২), *সেকালের রূপকথা* (১৯৬৫)

মোবারক হোসেন খান : *রিমির কথাবলা* (১৯৮২), *দিল্লীর তিন সম্রাট* (১৯৮২), *তিন মোঘল সম্রাট* (১৯৮২), *হাদিসের কাহিনী* (১৯৮১), *মুসলিম বিশ্বেসর কেচ্ছা* (১৯৯৩), *শক্তির রাজা সূর্য* (১৯৮৭), *সম্রাট আকবর* (১৯৮৫), *রাজিতের চন্দ্রাভিযান* (১৯৮৬), *রূপকের রূপকথা* (১৯৮৮), *বিজ্ঞানের রহস্য* (১৯৯০), *মহাকাশের গোয়েন্দা* (১৯৯১)

মোহাম্মদ নাসির আলী : *মনিকণিকা*, *লেবু মামার সপ্তকাণ্ড* (১৯৬৮), *ভিনদেশী এক বীরবল* (১৯৭৯), *আকাশ যারা করলো জয়* (১৯৫৭), *আলিফ লাইলার গল্প*, *একটি কুকুরের কাহিনী*, *ভিনদেশী গল্প*, *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*, *তিমির পেটে কয়েক ঘণ্টা*, *বোকা বকা*, *ইবনে বতুতার সফরনামা (১৩৭৫ ব.)*, *ইতালীর জনক গ্যরিবল্ডি* (১৯৬৩), *ছোটদের ওমর ফারুক*, *অ্যলবার্ট আইনস্টাইন*, *ছোটদের আলমগীর (১৩৭৭ ব.)*, *আমাদের কয়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৩৫৫ ব.)*, *মোহাম্মদ বিন কাসেম* (১৩৭০ ব.), *বীরবলের খোশগল্প* (১৯৬৪), *সাতপাঁচ গল্প* (১৯৬৫), *টলস্টয়ের সেরা গল্প* (১৯৬২), *যোগাযোগ* (১৯৬৮), *শাহী দিনের কাহিনী* (১৩৫৯ ব.)

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *হীরের ফুল* (১৯৩০), *তাকডুমাডুম* (১৯৩০), *মিসেস লতা সান্যাল ও আরও অনেকে* (১৯৩৩), *কিস্‌সা শোনে* (১৯৪৭), *ডানপিটে দল* (১৯৬৩), *গল্প শোনো* (১৯৬৩), *বাঘা সিদ্দিকী*

রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই : *হাট্টিমাটিম* (১৯৬২)

লুৎফর রহমান রিটন : *ধুত্তুরি* (১৯৮২), *ঢাকা আমার ঢাকা* (১৯৮৪), *উপস্থিত সুধীবৃন্দ* (১৯৮৪), *হিজিবিজি* (১৯৮৭), *তোমার জন্য* (১৯৮৯), *ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৮৯), *রাজাকারের ছড়া* (১৯৯০), *শেয়ালের পাঠশালা* (১৯৯২), *হামটি ডামটি* (১৯৯২), *১০০ রিটন : নির্বাচিত ছড়ার সংকলন* (১৯৯৩), *নাই মামা কানা মামা* (১৯৯৩), *বাঘের বাচ্চা* (১৯৯৪), *ভূতের যাদু* (১৯৯৪), *এক যে ছিল টুই* (১৯৯৪), *ফর অ্যাডাল্টস ওনলি* (১৯৯৪), *শেখ মুজিবের ছড়া* (১৯৯৪), *হবুচন্দ্র রাজার দেশে* (১৯৯৪), *পান্তাবুড়ি* (১৯৯৫), *ভালো কোচিং সেন্টার* (১৯৯৬), *মুক্তিযুদ্ধের ছড়া* (১৯৯৭), *সূর্যমামা ভীষণ রাগী চাঁদমামী খুব ভালো* (১৯৯৭), *ঘোড়ার ডিম* (১৯৯৮), *টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার* (১৯৯৮), *ছড়াসমস্ত* (১ম খণ্ড ১৯৯৮)

শওকত ওসমান : *ওটেন সাহেবের বাংলো* (১৯৪৪), *এতিমখানা* (১৯৫৫), *ছোটদের নানা গল্প* (১৯৬৯), *ডিগবাজী* (১৯৬৪), *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৯), *তারা দুই জন* (১৯৪৪), *ক্ষুদে সোশ্যালিস্ট* (১৯৭৩), *কথা রচনার কথা* (১৩৮৯), *পঞ্চসঙ্গী* (১৯৭৫), *ইতিহাস বিস্তারিত* (১৯৮৫)

শহীদ সাবের : *ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান* (১৯৫৮)

শাহজাহান কিবরিয়া : *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু* (১৯৭৪), *বেড়ালের গলায় ঘণ্টা* (১৯৭৭), *চার বুড়ির কাণ্ড* (১৯৮৬), *উল্টোবুড়ি* (১৯৮৮), *আহাম্মকের দেশে* (১৯৮৬), *ইরানের মজার গল্প* (১৯৮৩), *প্রাচ্যের রূপকথা* (১৯৮০), *বাঘা* (১৯৮০), *সুজন আজো ভোলেনি* (১৯৯০)

শাহাদাৎ হোসেন : *মোহনভোগ*, *ছেলেদের গল্প* , *বালিকা জীবন*, *গুলবদন*, *জাহানারা*, *সুরুচি পাঠ*

সুকুমার বড়ুয়া : *পাগলা ঘোড়া* (১৯৭০), *ভিজে বেড়াল* (১৯৭৬), *চন্দনা রঞ্জনার ছড়া* (১৯৭৯), *এলোপাতাড়ি* (১৯৮০), *নানা রঙের দিন* (১৯৮১), *সুকুমার বড়ুয়ার ১০১টি ছড়া* (১৯৯১), *চিচিং ফাক* (১৯৯২), *কিছু না কিছু* (১৯৯৫), *সুকুমার বড়ুয়ার কিছু ছড়া শতক* (১৯৯৭)

হাবীবুর রহমান : আগডুম বাগডুম (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৬২), *সাগর পারের রূপকথা* (১৯৬২), *বিজন বনের রাজকন্যা* (১৯৬১), *লেজ দিয়ে যায় চেনা* (১৯৬৩), *বনে বাদাড়ে* (১৯৬৩), *পুতুলের মিউজিয়াম* (১৯৬৩), *গল্পের ফুলঝুরি* (১৯৬২), *হীরা মতি পান্না* (১৯৬৭), *মন চলে মোর তেপান্তরে* (১৯৬৭), *বনমোরগের বাসা* (১৯৭৫)

হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী : *পাখির ছড়া* (১৯৫০), *ফুলের নামে ছড়া* (১৯৫১), *ভালোবাসি পোষাজীব* (১৯৫২), *হাসিখুশি* (১৯৫২), *ছড়ার খনি* (১৯৯৩), *কিশোর কবিতা ও ছড়া* (১৯৯৩),

শিশু-কিশোর প্রবন্ধ : *ছোটদের হযরত মোহাম্মদ* (১৯৭৩), *ছোটদের নজরুল* (১৯৭৫), *ছোটদের রবীন্দ্রনাথ* (১৯৭৫), *ছোটদের শেখ মুজিব* (১৯৭৫)

হালিমা খাতুন : *সোনা পুতুলের বিয়ে* (১৯৬৪), *হরিণের চশমা* (১৯৭০), *কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ* (১৯৭৪), *পাখির ছানা* (১৯৭৬), *পশু ও পাখির ছড়া* (১৯৭৬), *কাঁঠাল খাবো* (১৯৭৬), *বাঘ ও গরু* (১৯৮০), *বাচ্চা হাতির কাণ্ড* (১৯৮০), *ছবি ও পড়া* (১৯৮০), *বেবী ফ্রক গায়* (১৯৮৯), *মজার পড়া* (১৯৮৪), *মস্তবড় জিনিস* (১৯৮৫), *যুক্তবর্ণের সেপাই শাস্ত্রী* (১৯৮৭), সবচেয়ে *সুন্দর* (১৯৯০), *রসকদম্ব* (১৯৮৮), *বনের ধারে আমরা সবাই* (১৯৯৩), *পঞ্চমালার বনে* (১৯৯৩)

হাসান জান : *নরম গরম* (১৯৭২), *লাল নীল ছড়া* (১৯৭৪) তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ : *হীরে মুক্তো পান্না* (১৯৬১), *দেশে দেশে জয়ীর বেশে* (১৯৬২), *সৃষ্টি শুরুর কাহিনী* (১৯৬২), *সূর্যি জাগে জিলান দেশে* (১৯৬২), *নয়া জীবনের দিশারী* (১৯৬২), *সাত সমুদ্দুর তেরো নদী* (১৯৬২), *চুনী মোতির মালা* (১৯৬২)

হেলেনা খান : *রোদ ঝকঝক* (১৯৭৫), *সব ভালো যার শেষ ভালো* (১৯৭৯), *চারটি বেলুন* (১৯৮০), *গল্পই শুধু নয়* (১৯৮৩), *সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ* (১৯৮৪), *ডালমুট* (১৯৮৫), *ফুল পাখি সৌরভ* (১৯৮৬), *নীল পাহাড়ের হাতছানি* (১৯৮৮), *গৌতমবুদ্ধের দেশে* (১৯৯০), *নতুন দেশ নতুন মানুষ* (১৯৯০), *রূপকথার রাজ্যে* (১৯৯২), *ব্যাংককের সেই মেয়েটি* (১৯৯২), *মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (১৯৯৪), *ভূতের খপ্পরে* (১৯৯৬), *মঞ্চে এর মজার গল্প* (১৯৯৫), *শাবল বাহাদুর* (১৯৯৫), *তুলতুলের দান* (১৯৯৬)

বাংলাদেশের স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও ভ্রমণসাহিত্য

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *দ্বিতীয় পৃথিবীতে*, *পথ বেঁধে দিল* (১৩৬৭), *দুই সাগরের দেশে*

আকবরউদ্দীন : *পথের দিশারী*, *শহীদ লিয়াকত*, *কায়দে আযম*

আখতার ইমাম : *রোকেয়া হলে বিশ বছর* (১৯৮৬), *ইডেন কলেজ থেকে বেথুন* (১৯৯০)

আজিজুর রহমান মল্লিক : *আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৫)

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অনবদ্য রচনা *বিদায় অবন্তী* (১৯৯৫)

আবু রুশদ : *জীবন ক্রমশ* (১ম খণ্ড, ১৯৮৬), *ঠিকানার পথে* (২য় খণ্ড, ১৯৯০), *এখন বর্তমান* (৩য় খণ্ড, ১৯৯৭)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *অতীত দিনের স্মৃতি*, *মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ* (১৯৮৮)

আবুল ফজল : *সাংবাদিক মুজিবর রহমান* (১৯৬৭), *শেখ মুজিব : তাকে যেমন দেখেছি* (১৯৭৮)

রেখাচিত্র (১৯৬৬), *লেখকের রোজনামচা* (১৯৬৯), *দুর্দিনের দিনলিপি* (১৯৭২), *সফর নামা* (১৩৮২)

আবুল মনসুর আহমদ : স্মৃতিকথা *আত্মকথা* (১৯৭৮)।

আবুল হোসেন : *আমার এই ছোট ভুবন* (২০০৩), *আর এক ভুবন* (২০০৫), *দুঃস্বপ্নের কাল* (২০০৭)

আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পী জীবনের কথা* (১৯৬০)।

আনিসুজ্জামান : *কাল নিরবধি* (২০০৩), *আমার একাত্তর* (১৯৯৭), *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর* (২০১৩)

আশরাফ সিদ্দিকী : *যা দেখেছি যা পেয়েছি* (১৯৭৬), *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন* (১৯৭৪), *স্মৃতির আয়নায়* (১ম-৫ম খণ্ড ১৯৮৬), *শান্তিনিকেতনের পত্র (১৯৭৫-১৯৯৭)*

আশরাফ উজ জামান : *সীমান্তে মুসাফির*

আহমদ ছফা : স্মৃতিকথা *যদ্যপি আমার গুরু* (১৯৯৮), perspective Germany (1991)।

আহমদ রফিক : *একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস* (১৯৮৮), *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা* (১৯৯৩), *ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (২০১৩)

ইব্রাহীম খাঁ : *ইস্তাম্বুল পথের যাত্রী* (১৯৫৪), *পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে* (১৯৫৫)

কবীর চৌধুরী : *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৩য় খণ্ড, ২০০৩), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৪র্থ খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৫ম খণ্ড, ২০০৫), *নাইবা হলো পারে যাওয়া* (৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০৬)

জাহানারা ইমাম : *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬)

জুবাইদা গুলশান আরা : *স্মৃতির সোনালী দিগন্তে* (১৯৭৯)

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *অতীত জীবনের স্মৃতি* (১৯৮৭)

নাজিম মাহমুদ : *যখন ক্রীতদাস : স্মৃতি ৭১* (১৯৯০)

নির্মলেন্দু গুণ : *ভলগার তীরে* (১৯৮৫), *ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার স্মৃতি* (১৯৯৩), *গীনসবার্গের সঙ্গে* (১৯৯৪), *আমেরিকার জুয়াখেলার স্মৃতি ও অন্যান্য* (১৯৯৫), *শক্তিস্মৃতি ও অন্যান্য* (১৯৯৭), *পুনশ্চ জাপান যাত্রী* (২০০৪), *ভুবন ভ্রমিয়া শেষে* (২০০৪), *দিল্লী* (২০০৪)

মুহম্মদ এনামুল হক : *বুলগেরিয়া ভ্রমণ* (১৯৭৮)

মুহম্মদ আবদুল হাই : *বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন* (১৯৫৮), *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯)

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : *নিবেদন ইতি পূর্ব-খণ্ড* (২০০৫)

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্ : *যুগ-বিচিত্রা* (১৯৬৭)

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *ইতিহাস কথা কয়* (১৯৮১), *সাংবাদিকের রোজনামচা* (১৯৭৭) *জাপান ঘুরে এলাম* (১৯৫৯), *প্রবাল দ্বীপে* (১৯৬৪)

শহীদুল্লা কায়সার : *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* (১৯৬৬), *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২)

রাবেয়া খাতুন : *স্বপ্নের শহর ঢাকা* (১৯৯৪), *একাত্তরের নয় মাস* (১৯৯৬), *জীবন ও সাহিত্য* (১৯৯৬), *কুমারী মাটির দেশে* (১৯৯৪), *টেমস থেকে নায়াগ্রা* (১৯৯৩) *আবার আমেরিকায়* (২০০৬)

শওকত ওসমান : *উত্তরপর্ব মুজিবনগর* (১৯৯৩), *কালোরাত্রি খণ্ডচিত্র* (১৯৮৬), *গুডবাই জাস্টিশ মাসুদ* (১৩৯৮), *রাহনামা-১ (ছেলেবেলা ও কৈশোর কোলাহল)* (২০০৭), *রাহনামা-২ (অন্য রণপ্রান্তরে ও ভুবন জত্তরে)* (২০০৭), *স্বজন স্বগ্রাম* (১৯৮৬), *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর* (১৯৯২)

শাহরিয়ার কবীর : *বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী* (১৯৯০), *ক্রান্তিকালের মানুষ* (১৯৯০), *অন্তরঙ্গ হুমায়ুন আহমেদ* (১৯৯২), *সাধু গ্রেগরির দিনগুলি* (১৯৯৪), *হাত বাড়ালেই বন্ধু* (১৯৯৫), *জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি* (১৯৯৫)

সত্যেন সেন : *মনোরমা মাসীমা* (১৯৭১), *বিপ্লবী রহমান মাস্টার*, *সীমান্ত সূর্য আবদুল গাফফার খান* (১৩৮৩ ব.)

সা'দত আলি আখ ন্দ : *তরুণ মুসলিম* (১৩৩৬), *তেরো নম্বরে পাঁচ বছর* (১৯৬৭), *অন্য দিন অন্য জীবন* (১৯৬৯)

সুফিয়া কামাল : *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮)

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : *আমার কালের কথা* (১৯৭৫)

সৈয়দ মুজতবা আলী : *দেশে বিদেশে* (১৯৪৮), *জলে-ডাঙায়* (১৯৫৭), *ভবঘুরে ও অন্যান্য* (১৯৬২), *মুসাফির* (১৯৭১

সৈয়দ শামসুল হক : *প্রণীত জীবন* (২০০৮)

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন : *বিপুল, বিপুল পৃথিবী*, *দূরের সুর*

হারুন হাবীব : *সূর্যোদয় দেখে*

হাসনাত আবদুল হাই : *ট্রাভেলগ* (১৯৯২), *ট্রাভেলগ/২* (১৯৯৩), *সাফারি* (১৯৯৪), *আন্দালুসিয়া* (১৪০৫)

হাসান আজিজুল হক : *ভোরবেলাকার চোখে*, *ফিরে যাই ফিরে আসি*, *উঁকি দিয়ে দিগন্ত*

নির্ঘণ্ট

প্রথম অধ্যায় ॥ কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

মুহম্মদ নূরুল হুদা
মেঘনাদবধ কাব্য
মোহিতলাল মজুমদার
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ মামুন
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ
মোহাম্মদ রফিক
মোস্তাক আহমাদ দীন
ম্যাথু আর্নল্ড
'মৌলিক গণতন্ত্র'
ময়ুখ চৌধুরী
মাসুদ খান
মাহবুব হাসান
মাহবুব বারী
মুজিবুল হক কবীর
মুহাম্মদ সামাদ
মাহবুব সাদিক
মোহন রায়হান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র গোপ
রঙ্গলাল
রফিক আজাদ
রাজা যায় রাজা আসে
লোক লোকান্তর
শহীদ কাদরী
শার্ল বোদলেয়ার
শামসুর রাহমান
শামসুল ইসলাম
শামীম রেজা
শাহাদাৎ হোসেন
শিহাব সরকার
যে জলে আগুন জ্বলে
রওশন ইজদানী
রফিক আজাদ
রবিউল হুসাইন

হুমায়ুন আজাদ
হুমায়ুন কবির

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ উপন্যাস

অজয় ভট্টাচার্য
অদ্বৈত মল্লবর্মণ
অনামিকা হক লিলি
অনিল বড়ুয়া
অরূপ তালুকদার
অসীম রায়
অরণ্য নীলিমা
আ. ন. ম. বজলুর রশীদ
আকবরউদ্দীন
আকবর হোসেন
আকিমুন রহমান
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
আতা সরকার
আতাহার আহমেদ
আনিস চৌধুরী
আনিস সিদ্দিকী
আনিসা হোসেন
আনিসুল হক
আনোয়ার পাশা
আনোয়ারা সৈয়দ হক
আফরোজা পারভীন
আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী
আবদুর রাজ্জাক
আবদুর রশীদ সিদ্দিকী
আবদুল গাফফার চৌধুরী
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আবদুল্লাহ আল মামুন
আবু ইসহাক
আবু জাফর শামসুদ্‌দীন
আবুবকর সিদ্দিক
আবু রুশ্‌দ

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
আবুল ফজল
আবুল মনসুর আহমেদ
আবুল হাশেম
আবুল হাসানাত
আমজাদ হোসেন
আমিনা মাহমুদ
আল মাহমুদ
আলাউদ্দিন আল আজাদ
আলাউদ্দিন খান
আশরাফ উজ জামান
আশরাফ সিদ্দিকী
আহমদ ছফা
আহসান হাবীব
ইমদাদুল হক মিলন
ইসহাক চাখারী
উড়ুক্কু
উমরতুল ফজল
এম মহিউদ্দীন
কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ
কাজী আবুল হোসেন
কাজী ফজলুর রহমান
কাজী মাসুম
কাঞ্চনগ্রাম
কাশবনের কন্যা
কায়েস আহমেদ
কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস
কাঁদো নদী কাঁদো
খালেদা এদিব চৌধুরী
খালেদা মনযূর-এ-খুদা
খালেকদাদ চৌধুরী
গোপাল হালদার
গোলাম কুদ্দুস
চৌধুরী শামসুর রহমান

জসীম উদ্দীন

জহির রায়হান
জহিরুল ইসলাম
জুবাইদা গুলশান আরা
জোবেদা খানম
চাঁদরে অমাবস্যা
চোখের বালি
ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ
তসলিমা নাসরিন
তাসাদ্দুক হোসেন
দিলারা হাশেম
দৌলতুন্নেসা খাতুন
দুর্গেশনন্দিনী
নয়ন রহমান
নন্দিত নরকে
নাজমা জেসমিন চৌধুরী
নাসরীন জাহান
নির্মলেন্দু গুণ
নীলিমা ইব্রাহীম
নুরুল ইসলাম খান
পান্না কায়সার
প্রণব ভট্ট
ফখরুজ্জামান চৌধুরী
ফজল শাহাবুদ্দীন
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বদরুদ্দীন আহমদ
বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ
বন্দে আলী মিয়া
বশীর আল হেলাল
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
বুলবুল চৌধুরী
বেগম জাহান আরা
বেদুইন শমসের
বেদুঈন সামাদ
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
ভাস্কর চৌধুরী
মইনুল আহসান সাবের

মকবুলা মনজুর
মনিরউদ্দীন ইউসুফ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্জু সরকার
মহীউদ্দিন
মালিহা খাতুন
মাহবুব তালুকদার
মাহমুদুল হক
মিজানুর রহমান শেলী
মিরজা আবদুল হাই
মিলা মাহফুজা
মীর আবুল হোসেন
মুনিরা চৌধুরী
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
মুহম্মদ নূরুল হুদা
মেসবাহুল হক
মোঃ রুহুল আমিন
মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী
মোহাম্মদ আবু তাহের
মোহাম্মদ মোর্তজা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র গোপ
রশীদ করীম
রশীদ হায়দার
রাইফেল রোটি আওরাত
রাজিয়া খান
রাজিয়া মজিদ
রাবেয়া খাতুন
রাহাত খান
রিজিয়া রহমান
রেজোয়ান সিদ্দিকী
শওকত আলী
শওকত ওসমান
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরীফ খান
শহীদ আখন্দ

শহীদুল জহির
শহীদুল্লা কায়সার
শামসুল হক
শাহজাহান চৌধুরী
শাহরিয়ার কবীর
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম
শামসুর রাহমান
শাহাদাৎ হোসেন
শাহীন আখতার
শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী
সতীনাথ ভাদুড়ী
সত্যেন সেন
সরদার জয়েনউদ্‌দীন
সংশপ্তক
সামস রাশীদ
সুচরিত চৌধুরী
সুব্রত বড়ুয়া
সেলিনা হোসেন
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌
সৈয়দ শামসুল হক
হরিপদ দত্ত
হরিশংকর জলদাস
হাজেরা নজরুল
হাবীবুর রহমান
হারুন হাবীব
হাসনাত আবদুল হাই
হুমায়ুন আজাদ
হুমায়ূন আহমেদ
হুমায়ুন কবির
হুমায়ুন কাদির

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ছোটগল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অজয় ভট্টাচার্য
অনামিকা হক লিলি
অরূপ তালুকদার

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ
আকবর হোসেন
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
আতা সরকার
আনিস চৌধুরী
আনোয়ার পাশা
আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী
আবদার রশীদ
আবদুল গাফফার চৌধুরী
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আবদুল হাই মাশরেকী
আবদুশ শাকুর
আবু ইসহাক
আবু জাফর শামসুদ্‌দীন
আবুবকর সিদ্দিক
আবু রুশ্‌দ
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
আবুল ফজল
আবুল মনসুর আহমেদ
আল মাহমুদ
আলাউদ্দিন আল আজাদ
আশরাফ উজ জামান
আশরাফ সিদ্দিকী
আহমদ ছফা
আহমদ মীর
আহমাদ মোস্তফা কামাল
ইমতিয়ার শামীম
ইমদাদুল হক মিলন
ইব্রাহীম খাঁ
ইসহাক চাখারী
উইলিয়াম ফকনার
এডগার এলেন পো
এস. ওয়াজেদ আলী
ও হেনরী
ওয়াসী আহমেদ
কাজি আফসারউদ্‌দিন আহমদ

কাজী ফজলুর রহমান
কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর
কায়েস আহমেদ
খালেদা এদিব চৌধুরী
গজনফর আলী
চৌধুরী শামসুর রহমান
জহির রায়হান
জাফর তালুকদার
জাকির তালুকদার
জুবাইদা গুলশান আরা
জোবেদা খানম
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তাসাদ্দুক হোসেন
দিলারা জামান
দিলারা হাশেম
দৌলতুন্নেসা খাতুন
নয়নচারা
নাজমা জেসমিন চৌধুরী
নাজমুল আলম
নাসরীন জাহান
নির্মলেন্দু গুণ
নেয়ামাল বাসির
নীলিমা ইব্রাহীম
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রশান্ত মৃধা
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রবোধকুমার সান্যাল
বশীর আল হেলাল
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
বুলবুল চৌধুরী
বুলবন ওসমান
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
ভাস্কর চৌধুরী

মইনুল আহসান সাবের
মঈদ-উর রহমান
মকবুলা মনজুর
মবিন উদ্‌দীন আহমদ
মঞ্জু সরকার
মার্ক টোয়েন
মামুন হুসাইন
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মাহ্‌বুব-উল্‌ আলম
মাহমুদুল হক
মিরজা আবদুল হাই
মিন্নাত আলী
মুনীর চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র গোপ
রশীদ করীম
রশীদ হায়দার
রাজিয়া মাহবুব
রাহাত খান
রিজিয়া রহমান
লায়লা সামাদ
শওকত আলী
শওকত ওসমান
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শাহেদ আলী
শাহাদুজ্জামান
শহীদ আখন্দ
শহীদ সাবের
শহীদুল জহির
শামসুল ইসলাম
শাহরিয়ার কবীর
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম
শাহেরবানু
সরদার জয়েনউদ্‌দীন
সাদেকা শফিউল্লাহ
সাদ কামালী

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ
সিকান্‌দার আবু জাফর
সুচরিত চৌধুরী
সুব্রত বড়ুয়া
সুশান্ত মজুমদার
সেলিনা হোসেন
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
সৈয়দ মুজতবা আলী
সৈয়দ শামসুল হক
সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ
সেলিম মোরশেদ
হরিপদ দত্ত
হাজেরা নজরুল
হাসান হাফিজুর রহমান
হারুন হাবীব
হাসান আজিজুল হক
হাসনাত আবদুল হাই
হুমায়ুন আজাদ
হুমায়ূন আহমেদ
হুমায়ুন কাদির
হুমায়ূন মালিক
হেলেনা খান

চতুর্থ অধ্যায় ॥ নাটক

অনন্ত হীরা
অমৃতলাল বসু
আকবরউদ্দীন
আজাদ আবুল কালাম
আতাউর রহমান
আ. ন. ম. বজলুর রশীদ
আনিস চৌধুরী
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আবদুল হক
আবদুল্লাহ আল-মামুন
আবদুল্লাহেল মাহমুদ

মমতাজউদদীন আহমদ
মলিয়ের
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মার্চেন্ড অব ভেনিস
মামুনুর রশীদ
মুকুন্দদাস
মুনীর চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রণেশ দাশগুপ্ত
রমেশ শীল
রামনারায়ণ তর্করত্ন
রামেন্দু মজুমদার
রিচার্ড জড্রেল
লিয়াকত আলী লাকী
শওকত ওসমান
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শম্ভূ মিত্র
শাহাদাৎ হোসেন
শিশিরকুমার ভাদুড়ী
শেক্সপীয়ার
সাঈদ আহমদ
সাত ঘাটের কানাকড়ি
স্যামুয়েল বেকেট
সিকান্দার আবু জাফর
সেলিম আল দীন
সৈয়দ আলী আহসান
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
সৈয়দ শামসুল হক
হরচন্দ্র ঘোষ
হুমায়ূন আহমেদ
হেনরিক ইবসেন

পঞ্চম অধ্যায় ॥ প্রবন্ধ

অক্ষয়কুমার দত্ত
অজয় রায়
আনিসুজ্জামান
আনু মুহাম্মদ
আনোয়ার পাশা
আবু জাফর শামসুদ্‌দীন
আবু হেনা মুস্তাফা কামাল
আবুল আহসান চৌধুরী
আবুল ফজল
আবুল কাসেম ফজলুল হক
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
আবদুল কাদির
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আবদুল হক
আবদুল্লাহ আল-মুতী
আলাউদ্দিন আল আজাদ
আহমদ ছফা
আহমদ রফিক
আহমদ শরীফ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
এম আর আখতার মুকুল
এস ওয়াজেদ আলী
কবীর চৌধুরী
কাজী আবদুল ওদুদ
কাজী আবদুল মান্নান
কাজী দীন মুহম্মদ
কাজী মোতাহার হোসেন
কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস
গোলাম মুরশিদ
জিয়া হায়দার
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
নরেন বিশ্বাস
নীলিমা ইব্রাহীম
পারস্য প্রতিভা
প্রমথ চৌধুরী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বদরুদ্দীন উমর
বাঙলার কাব্য
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
মযহারুল ইসলাম
মুনতাসীর মামুন
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
মুহম্মদ আবদুল হাই
মুহম্মদ এনামুল হক
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মোতাহার হোসেন সুফী
মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
মুনীর চৌধুরী
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মোহাম্মদ মাহ্ফুউল্লাহ
যতীন সরকার
রণেশ দাশগুপ্ত
রতনলাল চক্রবর্তী
রফিকুল ইসলাম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়
শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব
শান্তনু কায়সার
শামসুজ্জামান খান
সত্যেন সেন
সনৎকুমার সাহা
সন্তোষ গুপ্ত
সবুজপত্র
সংস্কৃতি কথা

সালাহ্উদ্দীন আহমদ
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
সৈয়দ আকরম হোসেন
সৈয়দ আলী আহসান
সৈয়দ আবুল মকসুদ
সৈয়দ শামসুল হক
হাসান আজিজুল হক
হাসান হাফিজুর রহমান
হায়াৎ মামুদ
হুমায়ুন কবির
হুমায়ুন আজাদ

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ অনুবাদ

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আবদুল গনি হাজারী
আবু জাফর শামসুদ্দীন
আলী আহমদ
কবীর চৌধুরী
খোন্দকার আশরাফ হোসেন
মুনীর চৌধুরী
সরদার ফজলুল করিম
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়
সৈয়দ শামসুল হক

সপ্তম অধ্যায় ॥ শিশুসাহিত্য

অনামিকা হক লিলি
আতোয়ার রহমান
আলী ইমাম
ইব্রাহীম খাঁ
এখলাসউদ্দিন আহমদ
কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস
জুবাইদা গুলশান আরা
জোবেদা খানম

ফয়েজ আহমদ
মোহাম্মদ নাসির আলী
মোহাম্মদ মোদাব্বের
রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই
লুৎফর রহমান রিটন
শওকত ওসমান
সুকুমার বড়ুয়া
হাবীবুর রহমান
হালিমা খাতুন
হেলেনা খান

অষ্টম অধ্যায় ॥ স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও ভ্রমণসাহিত্য

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ
আজিজুর রহমান মল্লিক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
আবু জাফর শামসুদ্দীন
আবুল ফজল
আবুল হোসেন
আনিসুজ্জামান
ইব্রাহীম খাঁ
কবীর চৌধুরী
নির্মলেন্দু গুণ
মুহম্মদ আবদুল হাই
মোহাম্মদ মোদাব্বের
শওকত ওসমান
সৈয়দ মুজতবা আলী
সৈয়দ শামসুল হক
হাসনাত আবদুল হাই
হাসান আজিজুল হক